মনীষীদের বক্তৃতা

মনীষীদের বক্তৃতা

সম্পাদনা

বারিদবরণ ঘোষ

পারুল

পারুল

পারুল প্রকাশনী ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯

বর্ণ সংস্থাপন পারুল প্রকাশনী
ই প্রেস ৩০এ কান্যাল ইস্ট রোড কলকাতা ৭০০ ০১১ থেকে মুদ্রিত

প্রা র ম্ভ

মানুষের জীবনের একটা বড়ো সম্পদ তার বাক্‌শক্তি। সে শুধু শব্দ উচ্চারণই করে না—সেই শব্দরাজিকে সে বিন্যস্ত করতে পারে, তাকে অর্থবহ করে তুলতে পারে, আপন ভাব-ভাষায় রূপান্তরিত করে অন্যের কাছে নিবেদন করতে পারে। হয়তো কোনো কোনো জীব এই সামর্থ্যের অধিকারী। কিন্তু তারা অন্যের ভাষা গ্রহণ করতে পারে না বা গ্রহণ করে তা আয়ত্ত করার পর অন্যকে নিবেদন করতে পারে না। মানুষের জীবনের অনুভূতির বাঙ্ময় রূপ তার ভাষা—তার ভাবের বাহন।

উন্নত মানুষ তার ভাবভাষাকে লিপির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে শিখেছে সেই হাইয়ারোগ্লিফ-এর যুগ থেকে। ভাবের লিপিবদ্ধ রূপ দিয়ে সে আপন কথাকে স্থায়িত্ব দিতে শিখেছে। কিন্তু লেখ্যভাষার মধ্যে একটা মানসিক পরিমার্জন ঘটে যায় অগোচরে হয়তো, অথবা সচেতনভাবে। কিন্তু সে-ভাষা যখন স্বতোৎসারিত বেগে অন্যের শ্রুতিগোচর হয়, তখন তার মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ততা এবং আবেগ থাকে—তা অনেক সময় লেখার ভাষায় পাওয়া যায় না। এসব ভাষাবলিকে সংরক্ষণের জন্যে বিবিধ উপায় আছে : শ্রুতিলিখন, রেকর্ডিং বা যন্ত্রমাধ্যমে উন্নততর প্রক্রিয়াগ্রহণ। বহু মানুষের বহু স্মৃতিময়, মনোময়, কখনো-বা মূল্যবহ বক্তব্য এভাবে সংরক্ষিত হয়ে আছে।

আবার আপন বক্তব্য সরাসরি না-বলে তার একটা লেখ্যরূপ দিয়ে প্রচারের—প্রসারের পদ্ধতিটিও বেশ চালু আধুনিক সভ্যযুগে। একে বলা হয়ে থাকে প্রস্তুত-ভাষণ। এর স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন জাগে না। এমনতরো বেশ কিছু ভাষণ—বাংলাভাষায় প্রদত্ত এবং যাদের একটা স্থায়ী মূল্য আছে—আমরা অনেকদিন ধরে সংগ্রহ করছিলাম। স্বভাবতই সাধারণ মানুষের সাধারণ কথায় সাধারণ মানুষের ততখানি আগ্রহ থাকে না, যতখানি আগ্রহ থাকে সমাজে পরিচিত, প্রতিষ্ঠিত মানুষের কথা শোনা ও পড়ার জন্যে। এর বিষয় বিচিত্র—কখনও এর বিষয় সাহিত্য, কখনও এই ভাষণ বিজ্ঞান-বিষয়ে সংলগ্ন, কখনও এর আশ্রয় শিল্পকলা, সংস্কৃতি, সমাজ-সংস্কার, খেলাধুলো, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়। আমরা এমনতরো বেশ কিছু ভাষণ সংগ্রহ করে বাঙালির চিত্তের বৈচিত্র্য, মাধুর্য এবং মননশীলতার একটা ভাণ্ডার গড়ে তুলতে মনস্থ করেছি। এই ভাষণগুলি আমাদের মনের নানা আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ করে পরবর্তীকালকে সমৃদ্ধ করে।

এমন একটি লক্ষ্য নিয়ে আমরা উনিশ-বিশ শতকের বেশ কিছু ঋদ্ধিমান মনীষীর ভাষণ একত্রিত করে একালের পাঠকের কাছে উপস্থিত করে যুগস্পন্দনটি অনুভব করার অবকাশ এনে দিলাম। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের একাধিক ভাষণ আমরা এ-কারণেই গ্রহণ করতে পেরেছি। তবুও রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখের ভাষণ কিছুটা অনায়াসলভ্য তাঁদের রচনাবলির সহজপ্রাপ্যতার কারণে। কিন্তু এখানে এমন বহু ভাষণ রয়েছে, যার সন্ধান ওয়াকিবহালরাও জানেন কি না সন্দেহ। বেশ কিছু ভাষণ রয়েছে যা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র, কোনো গ্রন্থে ইতোপূর্বে সংকলিত হয়নি। এগুলি খুবই দুর্লভ। আমরা বহু আয়াসে এগুলি উদ্ধার করে পিপাসু পাঠকের দরবারে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হয়েছি। এইসব ভাষণ যেমন উদ্দীপক, তেমনি শিক্ষাবহ—এমনকী বর্তমান ও অনাগত সময়ের জন্যেও প্রাসঙ্গিক। এতগুলি বৈচিত্র্যবিহারী ভাষণ বাঙালি জাতির ইতিহাসের উপকরণস্বরূপ।

এই বিষয়টি সম্পাদন করতে গিয়ে আমরা মূল ইংরেজি ভাষণের বঙ্গানুবাদ দিতে চাইনি। কেবলমাত্র স্বামী বিবেকানন্দের দুটি ভাষণের চলিত ভাষায় অনুবাদ দিয়েছি—এর বিষয় গৌরব এবং দুর্লভতার কারণে। এটি যদি পরিকল্পনার ত্রুটি হয়ে থাকে তবুও পাঠক এটিকে বাড়তি লাভ বলে আমাদের উদ্যোগকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে অবলোকন করবেন। এই পরিকল্পনাটি আমার প্রিয় প্রকাশকের কাছে নিবেদন করতে সানন্দে তিনি সম্মত হন যখন, তখন বুঝতে পারি গতানুগতিকতার জাড্যতায় তাঁর ভাবনা জড়তাগ্রস্ত হয়নি। শুধু তাই নয়, তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে কয়েকটি ভাষণ সংগ্রহ করে দিয়ে আমার পরিকল্পনায় উপযুক্ত সংগত করেছেন। ভাবুক প্রকাশক তো বাংলা প্রকাশনায় একটি দুষ্প্রাপ্য বস্তু বিশেষ।

ভাষণগুলি প্রদানের প্রসঙ্গ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভাষণের শিরোনাম বা প্রাসঙ্গিক মন্তব্যে ধরা পড়ে গেছে। ভূমিকায় ভাষণগুলির সম্যক আলোচনা করবার চেষ্টামাত্র করিনি, কারণ এখানে পাঠক একজন শ্রোতামাত্র—তিনি ভাষণ পড়ছেন শুধু নয়, শুনছেনও—যেন আত্মগতভাবে। তাঁর পড়া এবং শোনার মধ্যে তৃতীয় জনের প্রবেশ নিষেধ। 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ'—আমি অন্তত অরসিকের ভূমিকা পালনে সম্মত নই।

এখন পাঠক-শ্রোতা এসব ভাষণে আপ্লুত হবেন—আমার এমনতরো বিশ্বাসে সম্ভবত কেউ অবিশ্বাস করবেন না।

বারিদবরণ ঘোষ

সূচিপত্র

শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ	১৩

সাহিত্য

মধুসূদন দত্ত	বিদ্যোৎসাহিনী সভায় সংবর্ধনা	২৯
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	অভিভাষণ	৩২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বঙ্কিমচন্দ্র	৭১
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		৭৭
অতুলপ্রসাদ সেন	বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে অভিভাষণ	৮২
রাজশেখর বসু	সাহিত্য-শাখার সভাপতির ভাষণ	৯০
ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণ	৯৫
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	সাহিত্য-শাখার সভাপতির ভাষণ	১০২
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির ভাষণ	১০৯
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি	১২৫
ক্ষিতিমোহন সেন	সভাপতির ভাষণ	১৩২
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	রংপুর সারস্বত সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ	১৫৫
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	বঙ্গ-সাহিত্যে ব্যক্তিবোধ ও রাষ্ট্রচেতনার উন্মেষ	১৬২
প্রমথ চৌধুরী	অভিভাষণ	১৭০
জগদিন্দ্রনাথ রায়	অভিভাষণ	১৯০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ	১৯৬
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রগতি সাহিত্য	২১০
দীনেশচন্দ্র সেন	অভিভাষণ	২১৬
মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী	সভাপতির অভিভাষণ	২৩২

স মা জ

দীনবন্ধু মিত্র	হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিসভায় বক্তৃতা	২৪৭
প্রফুল্লচন্দ্র রায়	পাতিত্য-সমস্যা	২৫১
মেঘনাদ সাহা	জাতীয় উন্নতির উপায়	২৫৮
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ	কৃষক ও শ্রমিক এবং শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়	২৬৯
শিবনাথ শাস্ত্রী	নবযুগের নব আকাঙ্ক্ষা	২৭৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	অভিভাষণ	২৯৭
প্রফুল্লচন্দ্র রায়	বাঙালির শক্তি ও তাহার অপচয়	৩০৬
স্বামী বিবেকানন্দ	কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তর	৩১১

রা জ নী তি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সভাপতির অভিভাষণ	৩২৫
চিত্তরঞ্জন দাশ	বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ	৩৩০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলাদেশের নূতন প্রকাশ মুহূর্তে	৩৭০
সুভাষচন্দ্র বসু	তরুণের আহ্বান	৩৭৪
সুভাষচন্দ্র বসু	আগামী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি	৩৭৯
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	কমিউনিস্ট ইস্তেহার প্রকাশের ১৫০ বর্ষপূর্তি	৩৮৩
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	মুক্তিসাধক সত্যেন বসু	৩৯৭
চিত্তরঞ্জন দাশ	সভাপতির অভিভাষণ	৪০১

ভা ষা

রামনারায়ণ তর্করত্ন	প্রকাশ্য বক্তৃতা	৪০৭
রাজেন্দ্রলাল মিত্র	সারস্বত সমাজে পরিভাষা বিষয়ে বক্তৃতা	৪১১

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতির অভিভাষণ	৪১৪
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	সভাপতির অভিভাষণ	৪৪৭

বি জ্ঞা ন

অক্ষয়কুমার দত্ত	হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় বাৎসরিক সভার বক্তৃতা	৪৬৫
সত্যেন্দ্রনাথ বসু	নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ	৪৬৯

শি ল্প

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	অভিভাষণ	৪৭৫
দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী	অভিভাষণ	৪৯৫
আসিতকুমার হালদার	অভিভাষণ	৫০৮

ধ র্ম

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের বৃত্তান্ত	৫১৯
রাজনারায়ণ বসু	হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা	৫৩৩
কেশবচন্দ্র সেন	অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা	৫৭০
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	উপনিষদ ব্রহ্ম	৫৭২
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণকথা	৫৯৩
বিনয় সরকার	হিন্দুধর্মের দিগ্বিজয় ও রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য	৫৯৮

ই তি হা স

যদুনাথ সরকার	সভাপতির অভিভাষণ	৬১৯
রমেশচন্দ্র মজুমদার	হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়	৬২৩
নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়	অভিভাষণ	৬৪৮

শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ

অদ্য বাংলা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই সভা আহ্বান করিয়াছেন। তোমাদিগকে সর্বপ্রথমে সম্ভাষণ করিবার ভার আমার উপরে পড়িয়াছে।

ছাত্রদের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কোন্‌খানে যোগ সেকথা হয়তো তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার। যোগ আছে। সেই যোগ অনুভব করা ও ঘনিষ্ঠ করিয়া তোলাই অদ্যকার এই সভার একটি উদ্দেশ্য।

তোমরা সকলেই জান, আকাশে যে ছায়াপথ দেখা যায় তাহার স্থানে স্থানে তেজ পুঞ্জীভূত হইয়া নক্ষত্র-আকার ধারণ করিতেছে এবং অপর অংশে জ্যোতির্বাষ্প অসংহতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে, কিন্তু সংহত-অসংহত সমস্তটা লইয়াই এই ছায়াপথ।

আমাদের বাংলা দেশেও যে জ্যোতির্ময় সারস্বত ছায়াপথ রচিত হইয়াছে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে তাহারই একটি কেন্দ্রবদ্ধ সংহত অংশ বলা যাইতে পারে, ছাত্রমণ্ডলী তাহার চতুর্দিকে জ্যোতির্বাষ্পের মতো বিকীর্ণ অবস্থায় আছে। এই ঘন অংশের সঙ্গে বিকীর্ণ অংশের যখন জাতিগত ঐক্য আছে, তখন সে ঐক্য সচেতনভাবে অনুভব করা চাই, তখন এই দুই আত্মীয় অংশের মধ্যে আদানপ্রদানের যোগস্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক।

যে ঐক্যের কথা আজ আমি বলিতেছি পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাহা মুখে আনিবার জো ছিল না। তখন ইংরেজি-শিক্ষামদে-উন্মত্ত ছাত্রগণ মাতৃভাষার দৈন্যকে পরিহাস করিতে কুণ্ঠিত হন নাই এবং উপবাসী দেশীয় সাহিত্যকে একমুষ্টি অন্ন না দিয়া বিদায় করিয়াছেন।

আমাদের বাল্যকালেও দেশের সাহিত্যসমাজ ও দেশের শিক্ষিতসমাজের মাঝখানকার ব্যবধানরেখা অনেকটা স্পষ্ট ছিল। তখন ইংরেজি রচনা ও ইংরেজি বক্তৃতায় খ্যাতিলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ছাত্রদের মনে সকলের চেয়ে প্রবল ছিল, এমনকী, যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিতেন তাঁহারা ইংরেজি মাচার উপরে চড়িয়া তবে সেটুকু প্রশ্রয় বিতরণ করিতে পারিতেন। সেইজন্য তখনকার দিনে মধুসূদনকে মধুসূদন, হেমচন্দ্রকে

হেমচন্দ্র, বঙ্কিমকে বঙ্কিম জানিয়া আমাদের তৃপ্তি ছিল না, তখন কেহ বা বাংলার মিল্টন, কেহ বা বাংলার বায়রন, কেহ বা বাংলার স্কট বলিয়া পরিচিত ছিলেন, এমনকি, বাংলার অভিনেতাকে সম্মানিত করিতে হইলে তাঁহাকে বাংলার গ্যারিক বলিলে আমাদের আশ মিটিত, অথচ গ্যারিকের সহিত কাহারও সাদৃশ্যনির্ণয় আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, কারণ গ্যারিক যখন নটলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন তখন আমাদের দেশের নাট্যাভিনয় যাত্রার দলের মধ্যে জন্মান্তর যাপন করিতেছিল।

কিন্তু, প্রথম অবস্থার চেয়ে এই দ্বিতীয় অবস্থাটা আমাদের পক্ষে আশাজনক। কারণ, বাংলায় বায়রন-স্কটের সুদূর সাদৃশ্য যে মিলিতে পারে, এ কথা ইংরেজিওয়ালার পক্ষে স্বীকার করা তখনকার দিনের একটা সুলক্ষণ বলিতে হইবে।

এখনকার তৃতীয় অবস্থায় ওই ইংরেজি উপাধিগুলোর কুয়াশা কাটিয়া গিয়া বাংলা সাহিত্য আর কাহারও সহিত তুলনার আশ্রয় না লইয়া নিজ মূর্তিতে প্রকাশ পাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের সাহিত্যের প্রতি দেশের লোকের যথার্থ সম্মান ইহাতে ব্যক্ত হইতেছে।

ইহার কারণ, বাংলা সাহিত্য ক্রমশ আপনার মধ্যে একটা স্বাধীনতার তেজ অনুভব করিতেছে। ইহাতে প্রমাণ হয়, আমাদের মনটা ইংরেজি গুরুমহাশয়ের অপরিমিত শাসন হইতে অল্পে অল্পে মুক্ত হইয়া আসিতেছে। একদিন গেছে যখন আমাদের শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজি পুঁথির প্রত্যেক কথাই বেদবাক্য বলিয়া জ্ঞান করিত। ইংরেজিগ্রস্ততা এতদূর পর্যন্ত সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল যে, ইংরেজি বিধিবিধানের সহিত কোনোপ্রকারে মিলাইতে না পারিয়া জামাইষষ্ঠী ফিরাইয়া দিয়াছে এবং আমোদ করিয়া বান্ধবের গায়ে আবির-লেপনকে চরিত্রের একটা চিরস্থায়ী কলঙ্ক বলিয়া গণ্য করিয়াছে, এতবড়ো শিক্ষিত-মূর্খতার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি।

এ রোগের সমস্ত উপসর্গ যে একেবারে কাটিয়াছে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আরোগ্যের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। আজকাল আমরা ইংরেজি ছাপাখানার দ্বারে ধন্না না দিয়া নিজে সন্ধান করিতে, নিজে যাচাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এমনকি পুঁথির প্রতিবাদ করিতেও সাহস হয়।

নিজের মধ্যে এই যে একটা স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি, যে অনুভূতি না থাকিলে শক্তির যথার্থ স্ফূর্তি হইতে পারে না, ইহা কোনো একটা দিকে আরম্ভ হইলে ক্রমে সকল দিকেই আপনাকে প্রকাশ করিতে থাকে। ধর্মে, কর্মে, সমাজে, সর্বত্র আমরা ইহার পরিচয় পাইতেছি। কিছুকাল পূর্বে আমাদের দেশের শাস্ত্র এবং শাসন সমস্তই আমরা খ্রিস্টান পাদরির চোখে দেখিতাম, পাদরির কষ্টিপাথরে কোন্‌টাতে কী রকম দাগ পড়িতেছে, ইহাই আলোচনা করিয়া দেশের সমস্ত জিনিসকে বিচার করিতে হইত।

প্রথম প্রথম সে বিচারে দেশের কোনো জিনিসেরই মূল্য ছিল না। তার পরে মাঝে আর-একটু ভালো লক্ষণ দেখা দিল। তখন আমরা গুরুকে বলিতে লাগিলাম, তোমাদের

দেশে যা কিছু গৌরবের বিষয় আছে আমাদের দেশেও তা সমস্তই ছিল ; আমাদের দেশে রেলগাড়ি এবং বেলুন ছিল শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ আছে এবং ঋষিরা জানিতেন সূর্যালোকে গাছপালা অক্সিজেন নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, সেইজন্যেই প্রাতঃকালে পূজার পুষ্পচয়নের বিধান হইয়াছে। এ কথা বলিবার সাহস ছিল না যে, রেলগাড়ি-বেলুন না থাকিলেও গৌরবের কারণ থাকিতে পারে এবং ফাঁকি দিয়া অক্সিজেন বাষ্প গ্রহণ করানোর চেয়ে নির্মল প্রত্যুষে সর্বকর্মারম্ভে সুন্দরভাবে দেবতার সেবায় লোকের মনকে নিযুক্ত করিবার মাহাত্ম্য অধিক।

এখনও এ ভাবটা আমরা যে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারিয়াছি, তা নয়। এ কথা এখনও সম্পূর্ণ ভুলিতে পারি নাই যে, পাদরির কষ্টিপাথরে যাহা উজ্জ্বল দাগ দেয় তাহা মূল্যবান হইতে পারে কিন্তু জগতে সোনাই তো একমাত্র মূল্যবান পদার্থ নয় ; পাথরে কিছুমাত্র দাগ টানে না, এমন মূল্যবান জিনিসও জগতে আছে। যাহা হউক, বন্ধন শিথিল হইতেছে। আজকাল অল্প অল্প করিয়া এ কথা বলিতে আমরা সাহস করিতেছি যে, পাদরির বিচারে যাহা নিন্দনীয়, বিলাতের বিধানে যাহা গর্হিত, আমাদের দিক হইতে তাহার পক্ষে বলিবার কথা অনেক আছে।

আমরা যাহাকে পলিটিক্‌স্‌ বলি তাহার মধ্যেও এই ভাবটা দেখিতে পাই। প্রথমে যাহা সানুনয় প্রসাদভিক্ষা ছিল দ্বিতীয় অবস্থাতে তাহার ঝুলি খসে নাই, কিন্তু তাহার বুলি অন্যরকম হইয়া গেছে, ভিক্ষুকতা যতদূর পর্যন্ত উদ্ধত স্পর্ধার আকার ধারণ করিতে পারে তাহা করিয়াছে। আমাদের আধুনিক আন্দোলনগুলিকে আমরা বিলাতি রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অনুরূপ মনে করিয়া উৎসাহবোধ করিতেছি।

তৃতীয় অবস্থায় আমরা ইহার উপরের ধাপে উঠিবার চেষ্টা করিতেছি। এ কথা বলিতে শুরু করিয়াছি যে, হাতজোড় করিয়াই ভিক্ষা করি আর চোখ রাঙাইয়াই ভিক্ষা করি, এত সহজ উপায়ে গৌরবলাভ করা যায় না, দেশের জন্য স্বাধীন শক্তিতে যতটুকু কাজ নিজে করিতে পারি তাহাতে দুই দিকে লাভ, এক তো ফললাভ, দ্বিতীয়ত নিজে কাজ করাটাই একটা লাভ, সেটা ফললাভের চেয়ে বেশি বই কম নয়, সেই গৌরবের প্রতি লক্ষ করিয়াই আমাদের দেশের গুরু বলিয়াছেন, ফলের প্রতি আসক্তি না রাখিয়া কর্ম করিবে। ভিক্ষার অগৌরব এই যে, ফললাভ হইলেও নিজের শক্তি নিজে খাটাইবার যে সার্থকতা তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

যাহা হউক, ইহা দেখা যাইতেছে যে, সকল দিক দিয়াই আমরা নিজের স্বাধীন শক্তির গৌরব অনুভব করিবার একটা উদ্যম অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতেছি, সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া পলিটিকস্‌ পর্যন্ত কোথাও ইহার বিচ্ছেদ নাই।

ইহার একটা ফল এই দেখিতেছি, পূর্বে ইংরেজি শিক্ষা আমাদের দেশে প্রাচীন নবীন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, উচ্চ নীচ, ছাত্র ও সংসারীর মধ্যে যে একটা বিচ্ছেদের সৃষ্টি করিয়াছিল

এখন তাহার উল্টা কাজ আরম্ভ হইয়াছে, এখন আবার আমরা নিজেদের ঐক্যসূত্র সন্ধান করিয়া পরস্পর ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছি। মধ্যকালের এই বিচ্ছিন্নতাই পরিণামের মিলনকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই মিলনের আকর্ষণেই আজ বঙ্গভাষা বঙ্গসাহিত্য আমাদের ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকেও আপন করিয়াছে। একদিন যেখানে বিপক্ষের দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল সেখান হইতেও বঙ্গের বিজয়িনী বাণী স্বেচ্ছাসমাগত সেবকদের অর্ঘ্যলাভ করিতেছেন।

পূর্বে এমন দিন ছিল যখন ইংরেজি পাঠশালা হইতে আমাদের একেবারে ছুটি ছিল না। বাড়ি আসিতাম, সেখানেও পাঠশালা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া আসিত। বন্ধুকেও সম্ভাষণ করিতাম ইংরেজিতে, পিতাকেও পত্র লিখিতাম ইংরেজিতে, প্রাণের কথা বলিতাম ইংরেজি কাব্যে, দেশের লোককে সভায় আহ্বান করিতাম ইংরেজি বক্তৃতায়। আজ যখন সেই পাঠশালা হইতে, একেবারে না হউক, ক্ষণে ক্ষণে ছুটি পাইয়া থাকি তখন সেই ছুটির সময়টাতে আনন্দ করিব কোথায়? মাতার অন্তঃপুরে নহে কি? দিনের পড়া তো শেষ হইল, তার পরে ক্রিকেট খেলাতেও না-হয় রণজিৎ হইয়া উঠিলাম। তার পরে? তার পরে গৃহবাতায়ন হইতে মাতার স্বহস্তজ্বালিত সন্ধ্যাদীপটি কি চোখে পড়িবে না? যদি পড়ে, তবে কি অবজ্ঞা করিয়া বলিব, 'ওটা মাটির প্রদীপ'? ওই মাটির প্রদীপের পশ্চাতে কি মাতার গৌরব নাই? যদি মাটির প্রদীপেই হয় তো সে দোষ কার? মাতার কক্ষে সোনার প্রদীপ গড়িয়া দিতে কে বাধা দিয়াছে? যেমনই হউক না কেন, মাটিই হউক আর সোনাই হউক, যখন আনন্দের দিন আসিবে তখন ওইখানেই আমাদের উৎসব, আর যখন দুঃখের অন্ধকার ঘনাইয়া আসে তখন রাজপথে দাঁড়াইয়া চোখের জল ফেলা যায় না, তখন ওই গৃহ ছাড়া আর গতি নাই।

আজ এখানে আমরা সেই পাঠশালার ফেরত আসিয়াছি। আজ সাহিত্য-পরিষৎ আমাদিগকে যেখানে আহ্বান করিয়াছেন তাহা কলেজ-ক্লাস হইতে দূরে, তাহা ক্রিকেট-ময়দানেরও সীমান্তরে, সেখানে আমাদের দরিদ্র জননীর সন্ধ্যাবেলাকার মাটির প্রদীপটি জ্বলিতেছে। সেখানে আয়োজন খুব বেশি নাই, কিন্তু, তোমরা এক সময়ে তাঁহার কাছে শ্রান্তদেহে ফিরিয়া আসিবে বলিয়া সমস্ত দিন যিনি পথ তাকাইয়া বসিয়া আছেন, আয়োজনে কি তাঁহার গৌরব প্রমাণ হইবে? তিনি এইমাত্র জানেন যে তোমরাই তাঁহার একমাত্র গৌরব এবং আমরা জানি তোমাদের একমাত্র গৌরব তাঁহার চরণের ধূলি, ভিক্ষালব্ধ রাজপ্রসাদ নহে।

পরীক্ষাশালা হইতে আজ তোমরা সদ্য আসিতেছ, সেইজন্য ঘরের কথা আজই তোমাদিগকে স্মরণ করাইবার যথার্থ আকাশে উপস্থিত হইয়াছে, সেইজন্যই বঙ্গবাণীর হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আজ তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

কলেজের বাহিরে যে দেশ পড়িয়া আছে তাহার মহত্ত্ব একেবারে ভুলিলে চলিবে না।

কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটা স্বাভাবিক যোগ স্থাপন করিতে হইবে।

অন্য দেশে সে যোগ চেষ্টা করিয়া স্থাপন করিতে হয় না। সে-সকল দেশের কলেজ দেশেরই একটা অঙ্গ, সমস্ত দেশের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি তাহাকে গঠিত করিয়া তোলাতে দেশের সহিত কোথাও তাহার কোনো বিচ্ছেদের রেখা নাই। আমাদের কলেজের সহিত দেশের ভেদচিহ্নহীন সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হয় নাই। যেরূপ দেখা যাইতেছে, বিদ্যাশিক্ষা কালক্রমে কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হইয়া এই প্রভেদকে বাড়াইয়া তুলিবে।

এমন অবস্থায় আমাদের বিশেষ চিন্তার বিষয় এটা হইয়াছে, কী করিলে বিদেশিচালিত কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগকে একটা স্বাধীন শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া শিক্ষাকার্যকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে। তাহা না করিলে শিক্ষাকে কোনোমতে পুঁথির গণ্ডির বাইরে আনা দুঃসাধ্য হইবে।

নানা আলোচনা নানা বাদপ্রতিবাদের ভিতর দিয়া পাঠ্যবিষয়গুলি যেখানে প্রত্যহ প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে, যাঁহারা আবিষ্কার করিতেছেন, সৃষ্টি করিতেছেন, প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারাই যেখানে শিক্ষা দিতেছেন, সেখানে শিক্ষা জড় শিক্ষা নহে। সেখানে কেবল যে বিষয়গুলিকেই পাওয়া যায় তাহা নহে, সেইসঙ্গে দৃষ্টির শক্তি, মননের উদ্যম, সৃষ্টির উৎসাহ পাওয়া যায়। এমন অবস্থায় পুঁথিগত বিদ্যার অসহ্য জুলুম থাকে না, গ্রন্থ হইতে যেটুকু লাভ করা যায়, তাহারই মধ্যে একান্তভাবে বদ্ধ হইতে হয় না।

আমাদের দেশেও পুঁথিকে মনের রাজা না করিয়া পুঁথির উপর আধিপত্য দিবার উপায় একটু বিশেষভাবে চিন্তা ও একটু বিশেষ উদ্যোগের সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে। এই কাজের জন্য আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদকে অনুরোধ করিতেছি। আমার অনুনয়, বাঙালি ছাত্রদের জন্য তাঁহারা যথাসম্ভব একটি স্বাধীন শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দিন, যে ক্ষেত্রে ছাত্রগণ কিঞ্চিৎপরিমাণেও নিজের শক্তিপ্রয়োগ ও বুদ্ধির কর্তৃত্ব অনুভব করিয়া চিত্তবৃত্তিকে স্ফূর্তিদান করিতে পারিবে।

বাংলা দেশের সাহিত্য ইতিহাস ভাষাতত্ত্ব লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহা-কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য সমস্তই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়। দেশের এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার ঔৎসুক্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না হইবার কারণ, আমরা শিশুকাল হইতে ইংরেজি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক, যাহা ইংরেজ ছেলেদের জন্য রচিত, তাহাই পড়িয়া আসিতেছি ; ইহাতে নিজের দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশের জিনিস আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হইয়া আসিয়াছে।

এজন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের দেশের যথার্থ বিবরণ আজ পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই, সেইজন্য যদিও আমরা স্বদেশে বাস করিতেছি তথাপি স্বদেশ আমাদের জ্ঞানের কাছে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া আছে।

এইরূপে স্বদেশকে মুখ্যভাবে সম্পূর্ণভাবে আমাদের জ্ঞানের আয়ত্ত না করিবার একটা

দোষ এই যে, স্বদেশের সেবা করিবার জন্য আমরা কেহ যথার্থভাবে যোগ্য হইতে পারি না। আর একটা কথা এই, জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে বস্তু চতুর্দিকে বিস্তৃত নাই, যে বস্তু সম্মুখে উপস্থিত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চা যদি প্রধানত তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে, তবে সে জ্ঞান দুর্বল হইবেই। যাহা পরিচিত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে যথার্থভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে।

আমাদের বিদেশি গুরুরা প্রায়ই আমাদিগকে খোঁটা দিয়া বলেন যে, এতদিন যে তোমরা আমাদের পাঠশালে এত করিয়া পড়িলে, কিন্তু তোমাদের উদ্ভাবনাশক্তি জন্মিল না, কেবল কতকগুলো মুখস্থবিদ্যা সংগ্রহ করিলে মাত্র।

যদি তাঁহাদের এ অপবাদ সত্য হয় তবে ইহার প্রধান কারণ এই, বস্তুর সহিত বহির সহিত আমরা মিলাইয়া শিখিবার অবকাশ পাই না। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা যে-সকল দৃষ্টান্ত আশ্রয় করে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর নহে। আমরা ইতিহাস পড়ি, কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের দেশের জনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে বাহিরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিস তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতেই পারে না। আমরা ভাষাতত্ত্ব মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করি, কিন্তু আমাদের নিজের মাতৃভাষা কালে কালে প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া যে নানা রূপান্তরের মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা তেমন করিয়া দেখি না বলিয়াই ভাষারহস্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না। এক ভারতবর্ষে সমাজ ও ধর্মের যেমন বহুতর অবস্থাবৈচিত্র্য আছে, এমন বোধ হয় আর কোনো দেশে নাই। অনুসন্ধানপূর্বক অভিনিবেশপূর্বক সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া দেখিলে সমাজ ও ধর্মের বিজ্ঞান আমাদের কাছে যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, এমন দূর দেশের ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় বই পড়িবামাত্র কখনো হইতেই পারে না।

ধারণা যখন অস্পষ্ট ও দুর্বল থাকে তখন উদ্ভাবনাশক্তির আশা করা যায় না। এমনকি, তখনকার সমস্ত উদ্ভাবনা অবাস্তবিক অদ্ভুত আকার ধারণ করে। এইজন্যই আমরা কেতাবে ইতিহাস শিখিয়াও ঐতিহাসিক বিচার তেমন করিয়া আয়ত্ত করিতে পারি নাই ; কেতাবে বিজ্ঞান শিখিয়াও অভূতপূর্ব কাল্পনিকতাকে বিজ্ঞান বলিয়া চালাইয়া থাকি ; ধর্ম, সমাজ, এমনকি, সাহিত্য-সমালোচনাতেও অপ্রমত্ত পরিমাণবোধ রক্ষা করিতে পারি না।

বাস্তবিকতা-বিবর্জিত হইলে আমাদের মনই বল, হৃদয়ই বল, কল্পনাই বল, কৃশ এবং বিকৃত হইয়া যায়। আমাদের দেশহিতৈষা ইহার প্রমাণ। দেশের লোকের হিতের সঙ্গে এই হিতৈষার যোগ নাই। দেশের লোক রোগে মরিতেছে, দারিদ্র্যে জীর্ণ হইতেছে, অশিক্ষা ও

কুশিক্ষায় নষ্ট হইতেছে, ইহার প্রতিকারের জন্য যাহারা কিছুমাত্র নিজের চেষ্টা প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হয় না তাহারা বিদেশি সাহিত্য-ইতিহাসের পুঁথিগত পেট্রিয়টিজম্‌ নানাপ্রকার অসংগত অনুকরণের দ্বারা লাভ করিয়াছি বলিয়া কল্পনা করে। এইজন্যই, এতকাল গেল, তথাপি এই পেট্রিয়টিজম্‌ আমাদিগকে যথার্থ কোনো ত্যাগস্বীকারে প্রবৃত্ত করিতে পারিল না। যে দেশে পেট্রিয়টিজম্‌ অবাস্তব নহে, পুঁথিগত অনুকরণমূলক নহে, সেখানকার লোক দেশের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতেছে; আমরা সামান্য অর্থ দিতে পারি না, সময় দিতে পারি না, আমাদের দেশ যে কীরূপ তাহা সন্ধানপূর্বক জানিবার জন্য উৎসাহ অনুভব করি না। যোশিদা তোরাজিয়ো জাপানের একজন বিখ্যাত পেট্রিয়ট ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রথমাবস্থায় চাল-চিঁড়া বাঁধিয়া পায়ে হাঁটিয়া ক্রমাগতই সমস্ত দেশ কেবল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। এইরূপে দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া তাহার পরে ছাত্র পড়াইবার কাজে নিযুক্ত হন, শেষদশায় তাঁহাকে দেশের কাজে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। এরূপ পেট্রিয়টিজমের অর্থ বোঝা যায়। দেশের বাস্তবিক জ্ঞান এবং দেশের বাস্তবিক কাজের উপরে যখন দেশহিতৈষা প্রতিষ্ঠিত হয় তখনি তাহা মাটিতে বদ্ধমূল গাছের মতো ফল দিতে থাকে।

অতএব এ কথা যদি সত্য হয় যে, প্রত্যক্ষবস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বল, ভাবই বল, চরিত্রই বল, নির্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে, তবে আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিষ্ফলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম, ইহারই ভাষা সাহিত্য ইতিহাস সমাজতত্ত্ব প্রভৃতিকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আপনার আলোচ্য বিষয় করিয়াছেন। পরিষদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, এই আলোচনা ব্যাপারে তাঁহারা ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়া লউন। তাহা হইলে প্রত্যক্ষবস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিবে এবং নিজের চারিদিককে, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানিবার অভ্যাস হইলে অন্য সমস্ত জানিবার যথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে। তা ছাড়া, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানার চর্চা নিজের দেশকে যথার্থভাবে প্রীতির চর্চার অঙ্গ।

বাংলা দেশে এমন জেলা নাই যেখান হইতে কলিকাতায় ছাত্রসমাগম না হইয়াছে। দেশের সমস্ত বৃত্তান্তসংগ্রহে ইহাদের যদি সহায়তা পাওয়া যায়, তবে সাহিত্য-পরিষৎ সার্থকতা লাভ করিবেন। এ সাহায্য কিরূপ এবং তাহার কতদূর প্রয়োজনীয়তা তাহার দুই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

বাংলা ভাষায় একখানি ব্যাকরণ রচনা সাহিত্য-পরিষদের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহ একটি দুরূহ ব্যাপার। বাংলা দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ করিতে থাকিলে এই

বিচিত্র উপভাষার উপকরণগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

বাংলায় এমন প্রদেশ নাই যেখানে স্থানে স্থানে প্রাকৃত লোকদের মধ্যে নূতন নূতন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হইতেছে। শিক্ষিত লোকেরা এগুলির কোনো খবরই রাখেন না। তাঁহারা একথা মনেই করেন না, প্রকাণ্ড জনসম্প্রদায় অলক্ষ্য গতিতে নিঃশব্দচরণে চলিয়াছে ; আমরা অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের দিকে তাকাই না বলিয়া যে তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছে, তাহা নহে, নূতন কালের নূতন শক্তি তাহাদের মধ্যে পরিবর্তনের কাজ করিতেছেই ; সে পরিবর্তন কোন্ পথে চলিতেছে, কোন্ রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না জানিলে দেশকে জানা হয় না। শুধু যে দেশকে জানাই চরম লক্ষ্য, তাহা আমি বলি না, যেখানেই হোক না কেন, মানব সাধারণের মধ্যে যা-কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে তাহা ভালো করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে। পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে ; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে-কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না। পরিষদের অধিনায়কতায় ছাত্রগণ যদি স্ব স্ব প্রদেশের নিম্নশ্রেণির লোকের মধ্যে যে সমস্ত ধর্ম-সম্প্রদায় আছে তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে একটা শিক্ষা তাহাও লাভ করিবেন এবং সেইসঙ্গে দেশেরও কাজ করিতে পারিবেন।

আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ ethnology-র বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুন আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম, কৈবর্ত-বাগদি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে তা তখনি বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে, পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। কিন্তু, জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে একবার যদি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা থাকিবে না। আমাদের ছাত্রগণ যদি তাঁহাদের এই সকল প্রতিবেশীদের সমস্ত খোঁজে একবার ভালো করিয়া নিযুক্ত হন, তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত, দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে এই কথা মনে রাখিয়াই সাহিত্য-পরিষৎ নিজের কর্তব্য নিরূপণ করিয়াছেন।

আমাদের ছাত্রগণকে পরিষদের কর্মশালায় সহায়স্বরূপে আকর্ষণ করিবার জন্য আমার

অনুরোধ পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই অদ্যকার এই সভায় আমি ছাত্রগণকে আমন্ত্রণ করিবার ভার লইয়াছি। সেই কাজে প্রবৃত্ত হইবার সময় আমাদের তরুণাবস্থার কথা আমার মনে পড়িতেছে।

আমাদের তরুণাবস্থা বলিলে যে অত্যন্ত সুদূরকালের কথা বোঝায় এতবড়ো প্রাচীনত্বের দাবি আমি করিতে পারি না ; কিন্তু, আমাদের তখনকার দিনের সঙ্গে এখনকার দিনের এমন একটা পরিবর্তন দেখিতে পাই যে, সেই অদূরবর্তী সময়কে যেন একটা যুগান্তর বলিয়া মনে হয়। এই পরিবর্তনটা বয়সের দোষে আমি দেখিতেছি অথবা এই পরিবর্তনটা সত্যই ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। একটু বয়স বেশি হইলেই প্রাচীনতর লোকেরা তাঁহাদের সেকালের সঙ্গে তুলনা করিয়া একালকে খোঁটা দিতে বসেন, তাহার একটা কারণ, সেকাল তাঁহাদের আশা করিবার কাল ছিল এবং একালটা তাঁহাদের হিসাব বুঝিবার দিন : তাঁহারা ভুলিয়া যান, একালের যুবকেরাও আশা করিয়া জীবন আরম্ভ করিতেছে, এখনো তাহারা চশমা চোখে হিসাব মিটাইতে বসে নাই। অতএব, আমাদের সেদিনকার কালের সঙ্গে অদ্যকার কালের যে প্রভেদটা আমি দেখিতেছি তাহা যথার্থ কী না তাহার বিচারক একা আমি নহি, তোমাদিগকেও তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

সত্যমিথ্যা নিশ্চয় জানি না, কিন্তু মনে হয়, এখনকার ছেলেদের চেয়ে তখন আমরা অনেক বেশি ছেলেমানুষ ছিলাম। সেটা ভালো কী মন্দ তাহার দুই পক্ষেই বলিবার কথা আছে, কিন্তু, ছেলেমানুষ থাকিবার একটা গুণ এই ছিল যে, আমাদের আশার অন্ত ছিল না, ভবিষ্যতের দিকে কী চোখে যে চাহিতাম, কিছুই অসাধ্য এবং অসম্ভব বলিয়া মনে হইত না। তখন আমরা এমন সকল সভা করিয়াছিলাম, এমন সকল দল বাঁধিয়াছিলাম, এমন সকল সংকল্পে বদ্ধ হইয়াছিলাম যাহা এখনকার দিনের তোমরা শুনিলে নিশ্চয় হাস্যসংবরণ করিতে পারিবে না, এবং আমাদের সাহিত্যে কোনো কোনো স্থলে আমাদের সেদিনকার চিত্র হাস্যরসরঞ্জিত তুলিকায় চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

কিন্তু, সব কথা যদি খুলিয়া বলি তবে তোমরা এই মনে করিয়া বিস্মিত হইবে যে, আমাদের সেকালে আমরা, বালকেরা, সকলেই যে একবয়সী ছিলাম তাহা নহে আমাদের মধ্যে পক্ককেশের অভাব ছিল না এবং তাঁহাদের আশা ও উৎসাহ আমাদের চেয়ে যে কিছুমাত্র অল্প ছিল, তাহাও বলিতে পারি না। তখন আমরা নবীনে-প্রবীণে মিলিয়া ভয়-লজ্জানৈরাশ্য কেমন নিঃশেষে বিসর্জন দিয়াছিলাম, তাহা আজও ভুলিতে পারিব না।

সেদিনের চেয়ে নিঃসন্দেহেই আজ আমরা অনেক বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছি, কিন্তু আজ আকাশে আশার আলোক যেন ম্লান এবং পথিকের হস্তে আনন্দের পাথেয় যেন অপ্রচুর।

কেন এমনটা ঘটিল তাহার জবাবদিহি এখনকার কালের নহে, আমাদের দিতে হইবে। যে আশার সম্বল লইয়া যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহা পথের মধ্যে কোন্‌খানে উড়াইয়া-পুড়াইয়া দিয়া আজ এমন রিক্ত হইয়া বসিয়া আছি।

অপরিমিত আশা-উৎসাহ আমাদের অল্পবয়সের প্রথম সম্বল ; কর্মের পথে যাত্রা করিবার আরম্ভকালে বিধাতৃমাতা এইটে আমাদের অঞ্চলপ্রান্তে বাঁধিয়া আশীর্বাদ করিয়া প্রেরণ করেন। কিন্তু অর্থ যেমন খাদ্য নহে, তাহা ভাঙাইয়া তবে খাইতে হয়, তেমনি আশা-উৎসাহমাত্র আমাদিগকে সার্থক করে না, তাহাকে বিশেষ কাজে খাটাইয়া তবে ফললাভ করি। সে কথা ভুলিয়া আমরা বরাবর ওই আশা উৎসাহেই পেট ভরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।

শিশুরা শুইয়া শুইয়াই হাত-পা ছুঁড়িতেথাকে, তাহাদের সেই শরীরসঞ্চালনের কোনো লক্ষ্য নাই। প্রথমাবস্থায় শক্তির এইরূপ অনির্দিষ্ট বিক্ষেপের একটা অর্থ আছে, কিন্তু, সেই অকারণ হাত-পা ছোঁড়া ক্রমে যদি তাহাকে সকারণ চেষ্টার জন্য প্রস্তুত করিয়া না তোলে তবে তাহা ব্যাধি বলিয়াই গণ্য হইবে।

আমাদেরও অল্পবয়সে উদ্যমগুলি প্রথমে কেবলমাত্র নিজের আনন্দেই বিক্ষিপ্তভাবে উদ্দামভাবে চারিদিকে সঞ্চালিত হইতেছিল, তখনকার পক্ষে তাহা অদ্ভুত ছিল না, তাহা বিদ্রূপের বিষয় ছিল না। কিন্তু ক্রমেই যখন দিন যাইতে লাগিল এবং আমরা কেবল পড়িয়া পড়িয়া অঙ্গসঞ্চালন করিতে লাগিলাম কিন্তু চলিতে লাগিলাম না, শরীরের আক্ষেপবিক্ষেপকেই অগ্রসর হইবার উপায় বলিয়া কল্পনা করিতে লাগিলাম, তখন আর আনন্দের কারণ রহিল না, এবং এক সময়ে যাহা আবশ্যক ছিল অন্য সময়ের পক্ষে তাহাই দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল।

আমাদের প্রথম বয়সে ভারতমাতা, ভারতলক্ষ্মী প্রভৃতি শব্দগুলি বৃহদায়তন লাভ করিয়া আমাদের কল্পনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু মাতা যে কোথায় প্রত্যক্ষ আছেন তাহা কখনো স্পষ্ট করিয়া ভাবি নাই ; লক্ষ্মী দূরে থাকুন, তাঁহার পেচকটাকে পর্যন্ত কখনো চক্ষে দেখি নাই। আমরা বায়রনের কাব্য পড়িয়াছিলাম, গারিবলডির জীবনী আলোচনা করিয়াছিলাম এবং পেট্রিয়টিজ্‌মের ভাবরসসম্ভোগের নেশায় একেবারে তলাইয়া গিয়াছিলাম।

মাতালের পক্ষে মদ্য যেরূপ খাদ্যের অপেক্ষা প্রিয় হয় আমাদের পক্ষেও দেশহিতৈষার নেশা স্বয়ং দেশের চেয়েও বড়ো হইয়া উঠিয়াছিল। যে দেশ প্রত্যক্ষ তাহার ভাষাকে বিস্মৃত হইয়া, তাহার ইতিহাসকে অপমান করিয়া, তাহার সুখদুঃখকে নিজের জীবনযাত্রা হইতে বহুদূরে রাখিয়াও, আমরা দেশহিতৈষী হইতেছিলাম। দেশের সহিত লেশমাত্র লিপ্ত না হইয়াও বিদেশির রাজদরবারকেই দেশহিতৈষিতার একমাত্র কার্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য করিতেছিলাম, এমন অবস্থাতেও, এমন ফাঁকি দিয়াও, ফললাভ করিব, আনন্দলাভ করিব, উৎসাহকে বরাবর বজায় রাখিব, এমন আশা করিতে গেলে বিশ্ববিধাতার চক্ষে ধুলা দিবার আয়োজন করিতে হয়।

আইডিয়া যত বড়োই হউক, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাহা ক্ষুদ্র হউক, দীন হউক, তাহাকে লঙ্ঘন

করিলে চলিবে না। দূরকে নিকট করিবার একমাত্র উপায় নিকট হইতে সেই দূরে যাওয়া। ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণ সুরে বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র, কিন্তু, ভারতমাতা যে আমাদের পল্লিতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ প্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা। যে ভারতমাতা ব্যাস-বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের তপোবনে শমীবৃক্ষমূলে আলবালে জলসেচন করিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাকে করজোড়ে প্রণাম করিলেই যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ঘরের পাশে যে জীর্ণচীরধারিণী ভারতমাতা ছেলেটাকে ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিখাইয়া কেরানিগিরির বিড়ম্বনার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার জন্য অর্ধাশনে পরের পাকশালে রাঁধিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে তো অমন কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া সারা যায় না।

যাহাই হউক, কিছুই হইল না। বিজয়ীর মতো বাহির হইলাম, ভিখারির মতো পরের দ্বারে দাঁড়াইলাম, অবশেষে সংসারী হইয়া দাওয়ায় বসিয়া সেভিংস্ ব্যাঙ্কের খাতা খুলিলাম। কারণ, যে ভারতমাতা, যে ভারতলক্ষ্মী কেবল সাহিত্যের ইন্দ্রধনুবাষ্পে রচিত, যাহা পরানুসরণের মৃগতৃষ্ণিকার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, তাহার চেয়ে নিজের সংসারটুকু যে ঢের বেশি প্রত্যক্ষ, নিজের জঠরগহ্বরটা যে ঢের বেশি সুনির্দিষ্ট, এবং ভারতমাতার অশ্রুধারা ঝিঁঝিট-খাম্বাজ রাগিণীতে যতই মর্মভেদী হউক না, ডেপুটিগিরিতে মাসে মাসে যে স্বর্ণঝংকারমধুর বেতনটি মিলে তাহাতে সম্পূর্ণ সান্ত্বনা পাওয়া যায়, ইহা পরীক্ষিত। এমনি করিয়া যে মানুষ একদিন উদারভাবে বিস্ফারিত হইয়া দিন আরম্ভ করে সে যখন সেই ভাবপুঞ্জকে কোনো প্রত্যক্ষবস্তুতে প্রয়োগ করিতে না পারে, তখন সে আত্মম্ভরি স্বার্থপর হইয়া ব্যর্থভাবে দিন শেষ করে। একদিন যে ব্যক্তি নিজের ধনপ্রাণ সমস্তই হঠাৎ দিয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হয় সে যখন দান করিবার কোনো লক্ষ্য নির্ণয় করিতে পারে না, কেবল সংকল্প-কল্পনার বিলাসভোগেই আপনাকে পরিতৃপ্ত করে, সে একদিন এমন কঠিনহৃদয় হইয়া উঠে যে, উপবাসী স্বদেশকে যদি সুদূরপথে দেখে, তবে টাকা ভাঙাইয়া সিকিটি বাহির করিবার ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। ইহার কারণ এই যে, শুদ্ধভাবে ভাব যত বড়োই হউক, ক্ষুদ্রতম প্রত্যক্ষবস্তুর কাছে তাহাকে পরাস্ত হইতে হইবে।

এইজন্যই বলিতেছিলাম, যাহা আমরা পুঁথি হইতে পড়িয়া পাইয়াছি, যাহাকে আমরা ভাবসম্ভোগ বা অহংকারতৃপ্তির উপায়স্বরূপ করিয়া রসালসজড়ত্বের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি ও ক্রমে অবসাদের মধ্যে অবতরণ করিতেছি, তাহাকে প্রত্যক্ষতার মূর্তি, বাস্তবিকতার গুরুত্ব দান করিলে তবে আমরা রক্ষা পাইব। শুধু বড়ো জিনিস কল্পনা করিলেও হইবে না, বড়ো দান ভিক্ষা করিলেও হইবে না এবং ছোটো মুখে বড়ো কথা বলিলেও হইবে না, দ্বারের পার্শ্বে নিতান্ত ছোটো কাজ শুরু করিতে হইবে। বিলাতের প্রাসাদে গিয়া রোদন করিলে হইবে না, স্বদেশের ক্ষেত্রে বসিয়া কণ্টক উৎপাটন করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের

শক্তির চর্চা হইবে, সেই শক্তির চর্চামাত্রেই স্বাধীনতা, এবং স্বাধীনতামাত্রেই আনন্দ।

আজ তোমাদের তারুণ্যের মধ্যে আমার অবারিত প্রবেশাধিকার নাই, তোমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আদর্শ যে কী, তাহা স্পষ্টরূপে অনুভব করা আজ আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু, নিজেদের নবীন কৈশোরের স্মৃতিটুকুও তো ভস্মাবৃত অগ্নিকণার মতো পক্ককেশের নীচে এখনো প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, সেই স্মৃতির বলে ইহা নিশ্চয় জানিতেছি যে, মহৎ আকাঙ্ক্ষায় রাগিণী মনে যে তারে সহজে বাজিয়া উঠে তোমাদের অন্তরের সেই সূক্ষ্ম সেই তীক্ষ্ণ সেই প্রভাতসূর্যরশ্মিনির্মিত তন্তুর ন্যায় উজ্জ্বল তন্ত্রীগুলিতে এখনও অব্যবহারের মরিচা পড়িয়া যায় নাই, উদার উদ্দেশের প্রতি নির্বিচারে আত্মবিসর্জন করিবার দিকে মানুষের মনের যে একটা স্বাভাবিক ও সুগভীর প্রেরণা আছে তোমাদের অন্তঃকরণে এখনো তাহা ক্ষুদ্র বাধার দ্বারা বারংবার প্রতিহত হইয়া নিস্তেজ হয় নাই। আমি জানি, স্বদেশ যখন অপমানিত হয় আহত অগ্নির ন্যায় তোমাদের হৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, নিজের ব্যবসায়ের সংকীর্ণতা ও স্বার্থসাধনের চেষ্টা তোমাদের সমস্ত মনকে গ্রাস করে নাই ; দেশের অভাব ও অগৌরব যে কেমন করিয়া দূর হইতে পারে সেই চিন্তা নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে তোমাদের রজনীর বিনিদ্র প্রহর ও দিবসের নিভৃত অবকাশকে আক্রমণ করে ; আমি জানি, ইতিহাসবিশ্রুত যে-সকল মহাপুরুষ দেশহিতের জন্য লোকহিতের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিয়া মৃত্যুকে পরাস্ত, স্বার্থকে লজ্জিত ও দুঃখক্লেশকে অমর মহিমায় সমুজ্জ্বল করিয়া গেছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তোমাদিগকে যখন আহ্বান করে তখন তাহাকে আজও তোমরা বিজ্ঞ বিষয়ীর মতো বিদ্রূপের সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে চাও না—তোমাদের সেই অনাঘ্রাত পুষ্প অখণ্ড পুণ্যের ন্যায় নবীন হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আমি আজ তোমাদের দেশের সারস্বতবর্গের নামে আহ্বান করিতেছি, ভোগের পথে নহে, ভিক্ষার পথে নহে, কর্মের পথে। কর্মশালার প্রবেশদ্বার অতি ক্ষুদ্র, রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারের ন্যায় ইহা অভ্রভেদী নহে। কিন্তু গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে নিজের শক্তি সম্বল করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, ভিক্ষাপাত্র লইয়া নহে, গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে প্রবেশের জন্য দ্বারীর অনুমতির অপমান স্বীকার করিতে হয় না, ঈশ্বরের আদেশ শিরোধার্য করিয়া আসিতে হয়, এখানে প্রবেশ করিতে গেলে মাথা নত করিতে হয় বটে, কিন্তু সে কেবল নিজের উচ্চ আদর্শের নিকট, দেশের নিকট, যিনি নত ব্যক্তিকে উন্নত করিয়া দেন সেই মঙ্গলবিধাতার নিকট। তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া এ পর্যন্ত কেহ তো সম্পূর্ণ নিরাশ হন নাই ; দেশ যখন বিলাতি বিষাণ বাজাইয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছিল তখন তোমরা পশ্চাৎপদ হও নাই, প্রাচীন শ্লোকে যে স্থানটাকে শ্মশানের ঠিক পূর্বেই বসাইয়াছেন সেই রাজদ্বারে তোমরা যাত্রা করিয়া আপনাকে সার্থক জ্ঞান করিয়াছ, আর, আজ সাহিত্য-পরিষৎ তোমাদিগকে যে আহ্বান করিতেছেন তাহার ভাষা মাতৃভাষা ও তাহার কার্য মাতার অন্তঃপুরের কার্য বলিয়াই কি তাহা ব্যর্থ হইবে, সে আহ্বান দেশের 'উৎসবে ব্যসনে

চৈব', কিন্তু 'রাজদ্বারে শ্মশানে চ' নয় বলিয়াই কি তোমাদের উৎসাহ হইবে না? সাহিত্য-পরিষদে আমরা দেশকে জানিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি, দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণ পত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লির কৃষিকুটীরে পরিষৎ যেখানে স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন সেখানে বিদেশি লোকে কোনোদিন বিস্ময়দৃষ্টিপাত করে না সেখান হইতে সংবাদপত্রবাহন খ্যাতি সমুদ্রপারে জয়ঘোষণা করিতে যায় না, সেখানে তোমাদের কোনো প্রলোভন নাই, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ মাতার নিঃশব্দ আশিস্‌মাত্রকে যদি রাজমহিষীর ভোজ্যাবশেষের চেয়ে অধিক মনে করিতে পার তবে মাতার নিভৃত-অন্তঃপুরচারী এই সকল মাতৃসেবকদের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হও এবং দিনের পর দিন বিনা বেতনে বিনা পুরস্কারে খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করো। তাহা হইলে অন্তত এইটুকু বুঝিবে যে, যদি শক্তি থাকে তবে কর্মও আছে, যদি প্রীতি থাকে তবে সেবার উপলক্ষ্যের অভাব নাই, সেজন্য গভর্নমেন্টের কোনো আইন পাশের অপেক্ষা করিতে হয় না এবং কোনো অধিকারভিক্ষার প্রত্যাশায় রুদ্ধ দ্বারের কাছে অনন্যকর্মা হইয়া দিনরাত্রি যাপন করা অত্যাবশ্যক নহে।

আমার আশঙ্কা হইতেছে, অদ্যকার বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে আমি ঠিক মাত্রারক্ষা করিতে পারি নাই। কথাটা তো শুধুমাত্র এই যে, দেশি ভাষার ব্যাকরণ চর্চা করো, অভিধান সংকলন করো, পল্লি হইতে দেশের আভ্যন্তরিক বিবরণ সংগ্রহ করো। এই সামান্য প্রস্তাবের অবতারণার জন্য এমন করিয়া উচ্চভাবের দোহাই দিয়া দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করা কিছু যেন অসংগত হইয়াছে। হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু কালের গতিকে এইরূপ অসংগত ব্যাপার আমাদের দেশে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। যদি কোনো মাতার এমন অবস্থা হয় যে, ছেলের প্রতি তাঁহার কর্তব্য কী তাহাই নিরূপণ করিবার জন্য দেশবিদেশের বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র পড়িয়া তিনি কূলকিনারা পাইতেছেন না, তবে তাঁহাকে এই অত্যন্ত সহজ কথাটি যত্ন করিয়া বুঝাইতে হয়, আগে দেখো তোমার ছেলেটা কোথায় আছে, কী করিতেছে, সে পাৎকুয়ায় পড়িল কি আলপিন গিলিয়া বসিল, তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে কি শীত করিতেছে। এসব কথা সাধারণত বলিতেই হয় না, কিন্তু যদি দুর্দৈবক্রমে বিশেষ স্থলে বলা আবশ্যক হইয়া পড়ে, তবে বাহুল্য করিয়াই বলিতে হয়। বর্তমান কালে আমাদের দেশে যদি বলা যায় যে, দেশের জন্য বক্তৃতা করো, সভা করো, তর্ক করো, তবে তাহা সকলেই অতি সহজেই বুঝিতে পারেন; কিন্তু যদি বলা হয়, দেশকে জানো ও তাহার পরে স্বহস্তে যথাসাধ্য দেশের সেবা করো, তবে দেখিয়াছি, অর্থ বুঝিতে লোকের বিশেষ কষ্ট হয়। এমন অবস্থায় দেশের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে দুটো-একটা সামান্য কথা বলিতে যদি অসামান্য বাক্যব্যয় করিয়া থাকি, তবে মার্জনা করিতে হইবে। বস্তুত, সকালবেলায় যদি ঘন কুয়াশা হইয়া থাকে তবে অধীর হইয়া ফল নাই এবং হতাশ হইবারও প্রয়োজন দেখি না, সূর্য সে কুয়াশা ভেদ করিবেনই এবং করিবামাত্র সমস্ত

পরিষ্কার হইয়া যাইবে। আজ আমি অধীরভাবে অধিক আকাঙ্ক্ষা করিব না, অবিচলিত আশার সহিত আনন্দের সহিত এই কথাই বলিব, নিবিড় কুজ্ঝটিকার মাঝে ওই যে বিচ্ছেদ দেখা যাইতেছে, সূর্যরশ্মির ছটা খরধার কৃপাণের মতো আমাদের দৃষ্টির আবরণ তিন-চারি জায়গায় ভেদ করিয়াছে, আর ভয় নাই, গৃহদ্বারের সম্মুখেই আমাদের যাত্রাপথ অনতিবিলম্বে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে তখন দিগ্‌বিদিক সম্বন্ধে দশ জন মিলিয়া দশ প্রকারের মত লইয়া ঘরে বসিয়া বাদ-বিতণ্ডা করিতে হইবে না, তখন সকলে আপন-আপন শক্তি অনুসারে আপন-আপন পথ নির্বাচন করিয়া তর্কসভা হইতে, পুঁথির রুদ্ধ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িবে, তখন নিকটের কাজকে দূর মনে হইবে না এবং অত্যাবশ্যক কাজকে ক্ষুদ্র বলিয়া অবজ্ঞা জন্মিবে না। এই শুভক্ষণ আসিবে বলিয়া আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে, সেইজন্য, পরিষদের অদ্যকার আহ্বান যদি তোমাদের অন্তরে স্থান না পায়, বাংলা দেশের ঘরের কথা জানাকে যদি তোমরা বেশি একটা কিছু বলিয়া না মনে কর, তবু আমি ক্ষুব্ধ হইব না এবং আমার যে মাতৃভূমি এতদিন তাঁহার সন্তানগণের গৃহ-প্রত্যাগমনের জন্য অনিমেষদৃষ্টিতে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিব, জননী, সময় নিকটবর্তী হইয়াছে, ইস্কুলের ছুটি হইয়াছে, সভা ভাঙিয়াছে, এইবার তোমার কুটীরপ্রাঙ্গণের অভিমুখে তোমার ক্ষুধিত সন্তানদের পদধ্বনি ওই শোনা যাইতেছে, এখন বাজাও তোমার শঙ্খ, জ্বালো তোমার প্রদীপ, তোমার প্রসারিত শীতলপাটির উপরে আমাদের ছোটো বড়ো সকল ভাইয়ের মিলনকে তোমার অশ্রুগদ্‌গদ আশীর্বচনের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকো।

ক্লাসিক থিয়েটারে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত। ১৭ চৈত্র ১৩১১ তারিখের এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সা হি ত্য

মধুসূদন দত্ত

বিদ্যোৎসাহিনী সভায় সংবর্ধনা

মেঘনাদবধ, ১ম খণ্ড প্রকাশিত হলে, বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের জন্য গুণগ্রাহী কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কবিবর মধুসূদন দত্তকে সংবর্ধিত করবার আয়োজন করেন। বঙ্গসাহিত্যের সেবা করে দেশবাসীর দ্বারা সংবর্ধিত হবার সৌভাগ্য বোধ হয়, মধুসূদনের অদৃষ্টেই প্রথম ঘটে। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ তারিখে কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজগৃহে এই সংবর্ধনা-সভার অনুষ্ঠান করেন। এই সভায় উপস্থিত থাকার জন্য মাইকেলের গুণানুরক্ত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আমন্ত্রণ-লিপি পেয়েছিলেন। কালীপ্রসন্নের এই আমন্ত্রণ-লিপিটি ছিল :

My dear Sir,

Intending to present Mr. Michael M.S Dutt with a silver trifle as a mute of encouragement for having introduced with success the Blank verse into our language I have been advised to call a meeting of those who might take a lively interest in the matter at my house on the occasion of the presentation, in order to impart as much of solemnity as it is capable of receiving, while retaining its private character and therefore to serve perhaps its purpose better . I shall therefore be obliged, and I have no doubt all will be pleased, by your kind presence at mine on Tuesday next, the 12th Instant at 7 p.m

Yours truly
Kaly Prussunno Singh
Calcutta the 9th February 1861.

সংবর্ধনা-সভায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, গৌরদাস বসাক প্রমুখ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ কবিবরকে একখানি

মানপত্র ও একটি মূল্যবান সুদৃশ্য রজত-পানপাত্র উপহার
চরিতকারগণ বহু অনুসন্ধানেও এই মানপত্র এবং ইহার উত্তরে মধুসূদনের বাংলা বক্তৃতা সংগ্রহ করতে পারেননি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এটি আবিষ্কার করেন। মানপত্রখানি এইরূপ :

এড্রেস।—

মান্যবর শ্রীল মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় সমীপেষু।

কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সবিনয় সাদর সম্ভাষণ নিবেদনমিদং।

যে প্রকারে হউক বাঙ্গলা ভাষার উন্নতিকল্পে কায়মনোবাক্যে যত্ন করাই আমাদের উচিত, কর্তব্য, অভিপ্রেত ও উদ্দেশ্য। প্রায় ছয় বর্ষ অতীত হইল বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার স্থাপনকর্তা তাহার সংস্থাপনের উদ্দেশে যে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন তাহা সাধারণ সহৃদয় সমাজের অগোচর নাই। আপনি বাঙ্গলা ভাষায় যে অনুত্তম অশ্রুতপূর্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমনকি আমরা পূর্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কালে বাঙ্গলা ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। আপনি বাঙ্গলা ভাষার আদি কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গলা ভাষাকে অনুত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাঙ্গলা ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্য আমরা আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী সভাসংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছি। আপনি যে অলোকসামান্য কার্য করিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামান্য। পৃথিবীমণ্ডলে যতদিন যেখানে বাঙ্গলা ভাষা প্রচলিত থাকিবেক তদ্দেশবাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক, বঙ্গবাসীগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই কিন্তু যখন তাঁহারা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্রুটি করিবেন না। আজি আমরা যেমন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার সহবাস লাভ করিয়া আপনি আপনি ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইলাম, হয়ত সেদিন তাঁহারা আপনার অদর্শনজনিত দুঃসহ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু যদি আপনি সে সময় বর্তমান না থাকুন বাঙ্গলাভাষা যতদিন পৃথিবীমণ্ডলে প্রচারিত থাকিবে ততদিন আমরা আপনার সহবাস সুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা বিনীতভাবে প্রার্থনা করি আপনি উত্তরোত্তর বাঙ্গলা ভাষার উন্নতিকল্পে আরও যত্নবান হউন। আপনা কর্তৃক যেন ভাবি বঙ্গসন্তানগণ নিজ দুঃখিনী জননীর অবিরল বিগলিত অশ্রুজল মার্জনে সক্ষম হন। তাঁহাদিগের দ্বারা যেন বঙ্গভাষাকে আর ইংরেজি ভাষা সপত্নীর পদাবনত হইয়া চিরসন্তাপে কালাতিপাত করিতে না হয়। প্রত্যুত আমরা আপনাকে এই সামান্য উপহার অর্পণ উৎসবে যে সকল মহোদয়গণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি ইহাতে তাঁহাদিগের নিকট চিরবাধিত রহিলাম, তাঁহারা কেবল

আপনার গুণে আকৃষ্ট ও আমাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহারা যেন জীবনের বিশেষ ভাগ গুণগ্রহণে বিনিয়োগ করেন।

কলিকাতা

বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিদ্যোৎসাহিনী সভা সভ্যবর্গাণাম্*

২ ফাল্গুন ১৭৮২ শকাব্দ।

এই মানপত্রের উত্তরে মধুসূদন বাংলায় একটি বক্তৃতা করেন। সেটি নীচে উদ্ধৃত হল :

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্যন্ত বর্ধিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

স্বদেশের উপকার করা মানব জাতির প্রধান ধর্ম; কিন্তু আমার মতো ক্ষুদ্র মনুষ্য দ্বারা যে এদেশের তাদৃশ কোনো অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, ইহা একান্ত অসম্ভবনীয়; তবে গুণানুরাগী আপনারা আমাকে যে এতদূর সম্মান প্রদান করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনার সৌজন্য ও সহৃদয়তা।

বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায়। ভগবতী বসুমতী সেই জল প্রাপ্তে যাদৃশ উর্বরতরা হন, উৎসাহ প্রদানে বিদ্যাও তাদৃশী প্রকৃতি ধারণ করেন আপনার সেই বিদ্যোৎসাহিনী সভা দ্বারা এ দেশের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য।

আমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন। সুতরাং আপনার এ প্রকার সমাদর ও অনুগ্রহের যথাবিধি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম। কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন আমি যাবজ্জীবন আপনার এবং এই সামাজিক মহোদয়গণের এইরূপ অনুগ্রহভাজন থাকি। ইতি—

* ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ তারিখের *সোমপ্রকাশ*-এ মুদ্রিত

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

অভিভাষণ

অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতির সম্বোধন

মহারাজাধিরাজ ও সমবেত সাহিত্যসেবীগণ,

আপনারা বর্তমান সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ শুনিলেন। যিনি এই অভিভাষণ পড়িলেন, তিনি বর্ধমানবাসী বর্ধমানের রাজা, সুতরাং বর্ধমানের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি একা বর্ধমানের নহেন, তিনি সারা বাংলার সর্বপ্রধান ব্যক্তি। গভর্নমেন্ট তাহাকে আদর করিয়া মহারাজাধিরাজ বাহাদুর উপাধি দিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা মহারাজাধিরাজ বলিয়াই জানি। সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও তাঁহার প্রতিনিধিবর্গের পরেই তিনিই বাঙালির নেতা। তাঁহার আহ্বানে বাংলা সাহিত্য কৃতার্থ হইয়াছে।

মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের অভিভাষণ অতি সুন্দর হইয়াছে। সংসারে তাঁহার যেরূপ প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা, তাহার অনুরূপ অভিভাষণ হইয়াছে। এ অভিভাষণের বিশেষত্ব এই যে, উহা অল্প, সংক্ষেপ। লোকে বলে 'রসের সার চুট্‌কি'—উহাতে বাগাড়ম্বর নাই, বর্ধমানের ইতিহাস দিবার চেষ্টা নাই, বাংলারও ইতিহাস দিবার চেষ্টা নাই। উহার প্রধান চেষ্টা, আমাদের সংবর্ধনা। সে সংবর্ধনা যে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

এখন আমার কথা। আপনারা আমাকে সভাপতি মনোনীত করিয়াছেন, আমি কীরূপে আপনাদের মনোরঞ্জন করিব অনেক দিন ভাবিয়াছি। শেষে স্থির করিয়াছি, আমাদের বাংলার প্রাচীন গৌরবের কতকগুলি কথা লইয়া আলোচনা করিব। পুরানো কথা শুনিতে সকলেরই ভালো লাগে। সে পুরানো কথা যদি আবার আপনাদের হয়, তাহা হইলে আরো ভালো লাগে। আবার যদি এখন আমাদের গৌরব কিছুই না থাকে এবং পূর্বকালে অত্যন্ত অধিক থাকে, তাহা হইলে সে আলোচনা লোককে মাতাইয়া

তুলিতে পারে। সেই জন্যই, সেই ভরসাতেই আমার এই সম্বোধনে আমি কেবল প্রাচীন গৌরবেরই আলোচনা করিব। কারণ, সুখের স্মৃতি সকল সময়ই মধুর।

আমার এ সম্বোধনে অনেকগুলি পরিচ্ছেদ আছে। আমি পরিচ্ছেদ শব্দ ব্যবহার করি নাই। তাহার জায়গায় গৌরব শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, যেমন প্রথম গৌরব, দ্বিতীয় গৌরব ইত্যাদি। অতি প্রাচীন কাল হইতে এ পর্যন্ত যাহা বাংলার গৌরবের কথা বলিয়া মনে হইয়াছে, সেইগুলিকেই সংগ্রহ করিয়া লইয়াছি।

প্রথম গৌরব : হস্তী-চিকিৎসা

বেদের আর্যগণ যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা হাতি চিনিতেন না, কারণ ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে হাতি পাওয়া যায় না। বেদের আর্যজাতির প্রধান কীর্তি 'ঋগ্বেদে' 'হস্তী' শব্দটি পাঁচ বার মাত্র পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে তিন জায়গায় সায়ণাচার্য অর্থ করিয়াছেন, হস্তযুক্ত ঋত্বিক্ বা পদযুক্ত ঋত্বিক্। দুই জায়গায় তিনি অর্থ করিয়াছেন, হাতি। সে দুইটি জায়গা এই :

মহিষাসো মায়িনশ্চিত্রভানবো
গিরয়ো ন স্বতবসো রঘুষ্যদঃ।
মৃগা ইব হস্তিনঃ খাদথা বনা
যদারুণীষু তবিষীরযুগ্ধং ॥ ১।৬৪।৭

'হে মরুৎগণ, তোমরা বড়োলোক, জ্ঞানবান; তোমাদের দীপ্তি অতি বিচিত্র। তোমরা পাহাড়ের মতো আপন বলে বলীয়ান। তোমরা হস্তী মৃগের মতো বনগুলি খাইয়া ফেল। অরুণবর্ণ দিক্‌সমূহে তোমার বল যোজনা করো।'

সূর উপাকে তন্বং দধানো
বি যত্তে চেত্যমৃতস্য বর্পঃ।
মৃগো ন হস্তী তবিষীসুষাণঃ
সিংহো ন ভীমঃ আয়ুধানি বিভ্রৎ ॥ ৪।১৬।১৪

'হে ইন্দ্র, তুমি যখন সূর্যের নিকটে আপনার রূপ বিকাশ করো, তখন সে রূপ মলিন না হইয়া আরো উজ্জ্বল হয়। পরের বলনাশক হস্তী মৃগের ন্যায় তুমি আয়ুধ ধারণ করিয়া সিংহের মতো ভয়ংকর হও।'

এ দুই জায়গায়ই, হস্তী মৃগের ন্যায়, 'মৃগা ইব হস্তিনঃ', 'মৃগো ন হস্তী' এইরূপ প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ এই যে, উঁহারা হস্তী নূতন দেখিতেছেন। উহাকে মৃগবিশেষ বলিয়া তাঁহাদের ধারণা হইয়াছে। তাই তাঁহারা মৃগজাতীয় হাতি বলিয়া উহার উল্লেখ করিতেছেন। পলিনেসিয়ার ওটাহিটি দ্বীপের লোক কেবল শূকর চিনিত। ইউরোপীয়েরা

যখন সেখানে ঘোড়া, কুকুর, ভেড়া, আরো নানারকম জানোয়ার লইয়া গেলেন, তখন তাহারা ঘোড়াকে বলিল চি-হিঁ-হিঁ শুয়ার, কুকুরকে বলিল ঘেউ-ঘেউ শুয়ার, ভেড়াকে বলিল ভ্যা-ভ্যা শুয়ার। আর্যগণ সেইরূপ মৃগ চিনিতেন, কেননা তাঁহারা শিকারে খুব মজবুত ছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া যখন তাঁহারা হাতি দেখিলেন, তখন তাঁহারা হাতওয়ালা মৃগ বলিলেন।

হাতির আসল বাসস্থান বাংলা, পূর্ব-উপদ্বীপ, বোর্নিও, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপ। পশ্চিমে দেরাদুন পর্যন্ত হাতি দেখা যায়, দক্ষিণে মহিশূর ও লংকায় দেখা যায়। আফ্রিকায়ও হাতি দেখা যায়, কিন্তু এত বড়ো নয়, এত ভালোও নয়। সুতরাং বৈদিক আর্যেরা যে হাতির বিষয়ে অল্পই জানিতেন, সেকথা একরকম স্থির।

'ঋগ্বেদে' হাতির নাম তো ওই দুই বার আছে। ও যে ঠিক হাতিরই নাম সে বিষয়েও একটু সন্দেহ। কারণ, 'হাতওয়ালা' মৃগ বলিতেছে, যদি স্পষ্ট করিয়া 'শুঁড়ওয়ালা' বলিত, তবে কোনো সন্দেহই থাকিত না। আরো সন্দেহের কারণ এই যে সংস্কৃতে হাতির অনেক নাম আছে যেমন, করী, গজ, দ্বিপ, মাতঙ্গ, ইহার একটি শব্দও 'ঋগ্বেদে' নাই, এমনকি ঐরাবতের নাম পর্যন্তও নাই। যাহারা কালো হাতিই চিনিত না, তাহারা সাদা হাতি কেমন করিয়া জানিবে?

'ঋগ্বেদে' হাতির নাম থাকুক বা না থাকুক, 'তৈত্তিরীয় সংহিতা'য় উহার নাম আছে। অশ্বমেধের কথা বলিতে বলিতে, যখন কোন্ দেবতাকে কোন্ জানোয়ার বলি দিতে হইবে এই প্রশ্ন উঠিল, তখন প্রথম এগারো জন দেবতাকে বন্য জন্তু দিতে হইবে স্থির হইল। কোনো কোনো মতে ঐই বন্য জন্তুর ছবি বলি দিলেই হইল : কোনো কোনো মতে বলিল, 'না, যেমন গ্রাম্য জন্তুর বেলায় আসলেরই ব্যবস্থা, বন্য জন্তুর বেলায়ও সেইরূপ।' এই দেবতা ও জন্তুদিগের নাম যথা,

রাজা ইন্দ্রকে শূকর দিতে হইবে, বরুণ রাজাকে কৃষ্ণসার হরিণ দিতে হইবে, যমরাজাকে ঋষ্য মৃগ দিতে হইবে, ঋষভ দেবকে গবয় বা নীলগাই দিতে হইবে, বনের রাজা শার্দূলকে গৌর মৃগ দিতে হইবে, পুরুষের রাজাকে মর্কট দিতে হইবে, শকুনরাজ বা পক্ষীরাজকে বতক পাখি দিতে হইবে, নীলঙ্গ সর্পরাজকে ক্রিমি দিতে হইবে, ওষধিদের রাজা সোমকে কুলঙ্গ দিতে হইবে, সিন্ধুরাজকে শিংশুমার দিতে হইবে, আর হিমবান্‌কে হস্তী দিতে হইবে।

'ঋগ্বেদে' হিমবান্ বলিয়া দেবতার কথা নাই। দশম মণ্ডলে একবার হিমবন্ত শব্দ আছে, তাহার অর্থ বরফের পাহাড়, ওই পাহাড় ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু 'তৈত্তিরীয় সংহিতা'য় হিমবান্ দেবতা হইয়াছেন এবং বন্য হস্তী, এখন আর্যগণ যাহা ভালো করিয়া চিনিয়াছেন, তাহাই তাঁহার বলি হইয়াছে। হিমবানের দেবতা হওয়া ও বন্য হস্তীর তাঁহার বলি হওয়া, এই দুই ঘটনায় স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, আর্যগণ

এখন ভারতবর্ষের মধ্যে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছেন।

হিমবান্ এক কালে দেবতা ছিলেন না, পরে দেবতা হইয়াছেন। ইহার একটা কারণ 'বিষ্ণুপুরাণে' দেওয়া আছে। সে পুরাণে প্রজাপতি বলিতেছেন, 'আমি যজ্ঞের উপকরণ সোমলতাদির উৎপত্তির জন্য হিমালয়ের সৃষ্টি করিয়াছি।' তাই দেখিয়াই কালিদাস বলিলেন, 'যজ্ঞাঙ্গযোনিত্বমবেক্ষ্য যস্য' ইত্যাদি। অর্থাৎ হিমালয়ের দেবত্ব পরে প্রজাপতি করিয়াছেন এবং যজ্ঞে তাঁহার ভাগও একটু পরে নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে হাতি পোষা খুব চলিত হইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধদেবের এক হাতি ছিল। তাঁহার ভাই দেবদত্তেরও হাতি ছিল। বুদ্ধদেব কুস্তি করিতে করিতে একটা হাতি শুঁড় ধরিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দেন, তাহাতে হাতি যেখানে পড়ে সেখানে একটি ফোয়ারা হইয়া গিয়াছিল। উদয়ন রাজার 'নলাগিরি' নামে একটি প্রকাণ্ড হাতি ছিল। তাঁহার নিজের ও চণ্ডপ্রদ্যোতের বড়ো বড়ো হাতিশালা ছিল, হাতি ধরারও খুব ব্যবস্থা ছিল।

এই যে হাতি ধরা ও পোষমানানো, তাহার চিকিৎসা, তাহার সেবা, যুদ্ধের জন্য তাহাকে তৈয়ারি করা, এসব কোথায় হইয়াছিল? এই প্রশ্নের এক উত্তর আছে। আমরা এখন যে দেশে বাস করি, যাহা আমাদের মাতৃভূমি, সেই বঙ্গদেশই এই প্রকাণ্ড জন্তুকে বশ করিতে প্রথম শিক্ষা দেয়। যে দেশের একদিকে হিমালয়, একদিকে লৌহিত্য ও একদিকে সাগর, সেই দেশেই হস্তিবিদ্যার প্রথম উৎপত্তি। সেই দেশেই এমন এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, যিনি বাল্যকাল হইতেই হাতির সঙ্গে বেড়াইতেন, হাতির সঙ্গে খাইতেন, হাতির সঙ্গে থাকিতেন, হাতির সেবা করিতেন, হাতির পীড়া হইলে চিকিৎসা করিতেন, এমনকী এক রকম হাতিই হইয়া গিয়াছিলেন। হাতিরা যেখানে যাইত, তিনিও সেইখানেই যাইতেন। কোনোদিন পাহাড়ের চূড়ায়, কোনোদিন নদীর চড়ায়, কোনোদিন নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে, হাতির সঙ্গেই তাঁহার বাস ছিল। হাতিরাও তাঁহাকে যথেষ্ট ভালো বাসিত, তাঁহার সেবা করিত, তাঁহার মনের মতো খাবার জোগাইয়া দিত, ব্যারাম হইলে তাঁহার শুশ্রূষা করিত।

অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ বঙ্গবাসীর সুপরিচিত। তিনি রাজা দশরথের জামাই ছিলেন। তাঁহার একবার শখ হইল, 'হাতি আমার বাহন হইবে। ইন্দ্র স্বর্গে যেমন হাতি চড়িয়া বেড়ান, আমিও তেমনি করিয়া হাতির উপরে চড়িয়া বেড়াইব।' কিন্তু হাতি কেমন করিয়া বশ করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি সমস্ত ঋষিদের নিমন্ত্রণ করিলেন। ঋষিরা পরামর্শ করিয়া কোথায় হাতির দল আছে, খোঁজ করিবার জন্য অনেক লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা এক প্রকাণ্ড আশ্রমে উপস্থিত হইল। সে আশ্রম 'শৈলরাজাশ্রিত', 'পুণ্য' এবং সেখানে 'লৌহিত্য সাগরাভিমুখে বহিয়া যাইতেছে।' সেখানে তাহারা অনেক হাতি দেখিতে পাইল এবং তাহাদের সঙ্গে একজন মুনিকেও

দেখিতে পাইল, দেখিয়াই তাহারা বুঝিল যে, এই মুনিই হাতির দল রক্ষা করেন। তাহার ফিরিয়া আসিয়া রাজা ও ঋষিদিগকে খবর দিল। রাজা সসৈন্য সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঋষি আশ্রমে নাই; তিনি হস্তীসেবার জন্য দূরে গমন করিয়াছেন। রাজা হাতির দলটি তাড়াইয়া লইয়া চম্পানগরে উপস্থিত হইলেন ও ঋষিদের পরামর্শ মতো হাতিশালা তৈয়ার করিয়া সেখানে হাতিদের বাঁধিয়া রাখিয়া ও খাবার দিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। ঋষি আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার হাতিগুলি নাই। তিনি চারিদিকে খুঁজিতে লাগিলেন ও কাঁদিয়া আকুল হইলেন। অনেকদিন খুঁজিয়া খুঁজিয়া শেষে চম্পানগরে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার হাতিগুলি সব চম্পানগরে বাঁধা আছে, তাহারা রোগা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের গায়ে ঘা হইয়াছে, নানারূপ রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ লতা, পাতা, শিকড়, বাকড় তুলিয়া আনিয়া বাটিয়া তাহাদের গায়ে প্রলেপ দিতে লাগিলেন, হাতিরাও নানারূপে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। অনেক দিনের পর পরস্পর মিলনে তাঁহার ও তাঁহার হাতিদের মহা-আনন্দ। রাজা সব শুনিলেন, তিনি কে, কী বৃত্তান্ত জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। মুনি কাহারো সহিত কথা কহিলেন না। ঋষিরা আসিলেন, তাঁহাদের সহিতও কথা কহিলেন না; রাজা নিজে আসিলেন, মুনি তাঁহার সহিতও কথা কহিলেন না। শেষে অনেক সাধ্য সাধনার পর মুনি আপনার পরিচয় দিলেন। তিনি বলিলেন:

> হিমালয়ের নিকটে যেখানে লোহিত্য নদ সাগরাভিমুখে যাইতেছে, সেখানে সামগায়ন নামে এক মুনি ছিলেন। তাঁহার ঔরসে ও এক করেণুর গর্ভে আমার জন্ম। আমি হাতিদের সহিতই বেড়াই, তাহারাই আমার আত্মীয়, তাহারাই আমার স্বজন। আমার নাম পালকাপ্য। আমি হাতিদের পালন করি, তাই আমার নাম পাল। আর কাপ্যগোত্রে আমার জন্ম, সেই জন্য আমার নাম কাপ্য। লোকে আমায় পালকাপ্য বলে। আমি হস্তিচিকিৎসায় বেশ নিপুণ হইয়াছি।

তাহার পর রাজা তাঁহাকে হাতিদের বিষয়ে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তাহার উত্তরে তিনি হস্তীর আয়ুর্বেদশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার শাস্ত্রের নাম 'হস্ত্যায়ুর্বেদ' বা 'পালকাপ্য'। উহা প্রাচীন সূত্রের আকারে লেখা। অনেক জায়গায় পদ্য আছে, অনেক জায়গায় গদ্যও আছে। আধুনিক সূত্র-সকল কেবল বিভক্তিযুক্ত পদ, তাহাতে ক্রিয়াপদ নাই। প্রাচীনসূত্রে যথেষ্ট ক্রিয়াপদ আছে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে 'ব্যাখ্যাসামঃ' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা আছে। প্রাচীন সূত্রের সহিত 'পালকাপ্যে'র প্রভেদ এই যে, এখানে রাজা ও মুনির কথোপকথনচ্ছলে সূত্র লেখা হইয়াছে। 'ভরত-নাট্যশাস্ত্র' ভিন্ন অন্য কোনো প্রাচীন সূত্রে এরূপ কথোপকথন নাই। বোধ হয়, কোনো একখানি প্রাচীন হস্তীসূত্র পরে পুরাণের আকারে লেখা হইয়াছে।

এখন কথা হইতেছে যে, ঋষি বলিলেন, 'কাপ্যগোত্রে আমার জন্ম।' কিন্তু চেন্তসাল রাও সি. আই. ই. যে 'গোত্রপ্রবরনিবন্ধকদম্বম্' সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার শেষে তিনি প্রায় সাড়ে চারি হাজার গোত্রের নাম দিয়াছেন, ইহাতে কাপ্যগোত্র নাই। অর্থাৎ যে সকল গোত্র প্রবরের গ্রন্থ এদেশে চলিত আছে, তাহার কোথাও কাপ্যগোত্রের নাম নাই। তবে পালকাপ্য কীরূপে কাপ্যগোত্রের লোক হইলেন কীরূপেই বা তাঁহাকে আর্য বা ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এই পুস্তকের প্রথমে লোমপাদ যে-সকল মুনিদের আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাপ্য বলিয়া একজন মুনি আছেন, আশ্বলায়ন বৌধায়নাদির সূত্রে তাঁহার নাম পাওয়া যায় না। সুতরাং অনুমান করিতে হইবে, তিনি আর্যগণের মধ্যে চলিত গোত্রের লোক নহেন, এ গোত্র বোধ হয় বাংলা দেশেই চলিত ছিল। পালকাপ্য বঙ্গদেশের লোক ছিলেন। লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রের ধারে, সমুদ্রে ও হিমালয়ের মধ্যে তাঁহার জন্মভূমি ও শিক্ষার স্থান। যদিও অঙ্গরাজ্যে চম্পানগরে তাঁহার আয়ুর্বেদ লেখা ও প্রচার হয়, তিনি আসলে বাংলা দেশেরই লোক। এই যে প্রকাণ্ড জন্তু হস্তী, ইহাকে বশ করিয়া মানুষের কাজে লাগানো ইহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, এ সমস্তই বাংলাদেশে হইয়াছিল। পালকাপ্য পড়িতে পড়িতে অনেক স্থানে মনে হয় যেন, উহা অন্য কোনো ভাষা হইতে সংস্কৃতে তর্জমা করা হইয়াছে, অনেক সময় মনে হয় উহা সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে চলিতেছে না। এ গ্রন্থ যে কত প্রাচীন তাহা স্থির করা অসম্ভব। কালিদাস ইহাকে অতি প্রাচীন শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন। রঘুর ষষ্ঠ সর্গে তাঁহার শুনন্দা অঙ্গরাজ্যকে লক্ষ করিয়া বলিতেছেন যে, বহুকাল হইতে শুনা যাইতেছে যে, স্বয়ং সূত্রকারেরা ইহার হাতিগুলিকে শিক্ষা দিয়া যান, সেই জন্যই ইনি পৃথিবীতে থাকিয়াই ইন্দ্রের ঐশ্বর্য ভোগ করিতেছেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'হস্তিপ্রচার' অধ্যায়ে হস্তী-চিকিৎসকের কথা আছে। পথে যদি হাতির কোনো অসুখ হয়, মদক্ষরণ হয়, অকর্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে চিকিৎসক তাহার প্রতিবিধান করিবেন, ইহার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং কৌটিল্যেরও পূর্বে যে হস্তী-চিকিৎসার একটি শাস্ত্র ছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে। যে আকারে পালকাপ্যের সূত্র লেখা, তাহা হইতেও বুঝা যায় যে, উহা অতি প্রাচীন। সুতরাং ম্যাক্সমুলার [Friedrich Max Muller] যাহাকে 'Suttra Period' বলেন, সেই সময়েই পালকাপ্য সূত্র রচনা করিয়াছিলেন। বিউলার সাহেব [Johan Georg Buhlr] বলেন, আপস্তম্ব ও বোধায়ন খ্রিস্ট-পূর্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে সূত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাহারো আগে বশিষ্ঠ ও গৌতমের সূত্র লেখা হয়। পালকাপ্যও সেই সময়েরই লোক বলিয়া বোধ হয়।

ভারতের পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, সূত্র-রচনার কাল আরো একটু আগে হইবে, কিন্তু সেকথা লইয়া বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। খ্রিস্ট-পূর্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে

যদি বাংলা দেশে হস্তী-চিকিৎসার এত উন্নতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেটা বঙ্গদেশের কম গৌরবের কথা নয়।

দ্বিতীয় গৌরব : নানা ধর্মমত

পূর্বে অনেক জায়গায় আভাস দিয়াছি যে, জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, আজীবকধর্ম এবং যে-সকল ধর্মকে বৌদ্ধেরা তৈর্থিক মত বলিত, সে-সকল ধর্মই বঙ্গ, মগধ ও চের জাতির প্রাচীন ধর্ম, প্রাচীন আচার, প্রাচীন ব্যবহার, প্রাচীন রীতি, প্রাচীন নীতির উপরই স্থাপিত। আর্য জাতির ধর্মের উপর উহা ততটা নির্ভর করে না। একথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহা বঙ্গদেশের কম গৌরবের কথা নয়। এরূপ মনে করিবার অনেকগুলি কারণ আছে। এই-সকল ধর্মেরই উৎপত্তি পূর্ব-ভারতে বঙ্গ, মগধ ও চের জাতির অধিকারের মধ্যে, যে-সকল দেশের সহিত আর্যগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, সে-সকল দেশের বাহিরে। এ-সকল ধর্মই বৈরাগ্যের ধর্ম। বৈদিক আর্যদের ধর্ম সম্পূর্ণরূপে গৃহস্থের ধর্ম। ঋগ্বেদে বৈরাগ্যের নামগন্ধও নাই। অন্যান্য বেদেও যাগযজ্ঞের কথাই অধিক, সেও গৃহস্থেরই ধর্ম। সূত্রগুলিতেও গৃহস্থের ধর্মের কথা। একভাগ সূত্রের নামই তো গৃহ্যসূত্র। সূত্রগুলিতে চারি আশ্রম পালনের কথা আছে। শেষ আশ্রমের নাম ভিক্ষুর আশ্রম। ভিক্ষুর আশ্রমেও বিশেষ বৈরাগ্যের কথা দেখা যায় না। এ আশ্রমের লোক ভিক্ষা করিয়াই খাইবেন, এই কথাই আছে। কিন্তু আমরা যে-সকল ধর্মের কথা বলিতেছি, তাহাদের সকলেই বলিতেছে গৃহস্থ-আশ্রম ত্যাগ করো। গৃহস্থ-আশ্রমে কেবল দুঃখ। গৃহস্থ-আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাহাতে জন্ম, জরা, মরণ, এই ত্রিতাপ নাশ হয় তাহারই ব্যবস্থা করো। আর তাহা নাশ করিতে গেলে 'আমি কে?', 'কোথা হইতে আসিলাম?' 'কেন আসিলাম?' এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে হয়। সেই চিন্তার ফলে কেহ বলেন আত্মা থাকে, কিন্তু সে 'কেবল' হইয়া যায়, সংসারের সহিত তাহার আর কোনো সংস্রব থাকে না, সুতরাং সে জরামরণাদির অতীত। কেহ বলেন, তাহার অহংকার থাকে না; যখন তাহার অহংকার থাকে না, তখন সে সর্বব্যাপী হয়, সর্বভূতে সমজ্ঞান হয়, মহাকরুণার আধার হইয়া যায়। এ-সকল কথা বেদ, ব্রাহ্মণ বা সূত্রে নাই। এসব তো গেল দর্শনের কথা, চিন্তা-শক্তির কথা, যোগের কথা।

বাহিরের দিক হইতেও দেখিতে গেলে, এই সকল ধর্মের ও আর্য ধর্মের আচার-ব্যবহারে মিল নাই। আর্যগণ বলেন, পরিষ্কার কাপড় পরিবে, সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে, নিত্য স্নান করিবে। জৈনরা বলেন, উলঙ্গ থাকো, গায়ের ময়লা তুলিও না, স্নান করিও না। মহাবীর মলভার বহন করিতেন। অনেক জৈন যতি গৌরব করিয়া

'মলধারী' এই উপাধি ধারণ করিতেন। আর্যগণ উষ্ণীষ, উপানহ্ ও উপবীত ধারণ করিতেন ; তাঁহারা খালি মাথায় থাকিতেন, জুতা পরিতেন না, এক ধুতি ও এক চাদরেই কাটাইয়া দিতেন। আর্যগণ সর্বদাই খেউরি হইতেন। অনেক ধর্মসম্প্রদায় একেবারে খেউরি হইত না। তাহাদের নখ চুল কখনও কাটা হইত না। আর্যেরা মাথা মুড়াইলে মাথার মাঝখানে একটা টিকি রাখিতেন। বৌদ্ধেরা সব মাথা মুড়াইয়া ফেলিত। আর্যগণ দিনে একবার খাইতেন, রাত্রিতে একবার খাইতেন। বৌদ্ধেরা বেলা ১২টার মধ্যে আহার করিত : ১২টার মধ্যে আহার না হইয়া উঠিলে তাহাদের সেদিন আর আহারই হইত না। রাত্রিতে তাঁহারা রস বা জলীয় পদার্থ ভিন্ন আর-কিছুই খাইতে পারিত না। খাট ছাড়া আর্যগণের শয়ন হইত না। বৌদ্ধেরা উচ্চাসন, মহাসন একেবারে ত্যাগ করিত, তাহারা মাটিতেই শুইয়া থাকিত। আর্যগণ সংস্কৃতে লেখাপড়া করিতেন, অন্য-সকল ধর্মের লোক নিজ দেশের ভাষাতেই লেখাপড়া করিত।

ইহারা এত নূতন জিনিস কোথা হইতে পাইল? এ-সকল নূতন জিনিস যখন আর্যদের মতের বিরোধী, তখন তাহারা আর্যদের নিকট হইতে সে-সব পায় নাই। উত্তর হইতে তাহারা এই সব জিনিস পাইতে পারে না, কেন-না উত্তরে হিমালয় পর্বত। হিমালয়ের উত্তর দেশের লোকের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিতেই পারে না। দক্ষিণ হইতেও ওইসব জিনিস আসিতে পারে না, কেন-না দক্ষিণের সহিত তাহাদের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাহার কোনো প্রমাণ নাই ; বরং বিন্ধ্যগিরি পার হইয়া যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং যাহা-কিছুই উহারা পাইয়াছে পূর্বাঞ্চল হইতেই পাইয়াছে এবং পূর্বাঞ্চলেই আমরা এই সকল নূতন জিনিস কতক কতক এখনো দেখিতে পাই।

জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর ৩০ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন, তাহার পর কিছুদিন বৈশালীর জৈন-মন্দিরে বাস করেন, তাহার পর বারো বছর নিরুদ্দেশ থাকেন। এ সময় তিনি পূর্বাঞ্চলেই ভ্রমণ করিতেন। বারো বৎসরের পর তিনি জ্ঞান লাভ করিয়া বৈশালিতে ফিরিয়া আসেন। তাঁহারো পূর্বের তীর্থংকর পার্শ্বনাথ কাশীতে জন্ম গ্রহণ করেন, ৩০ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন, তাহার পর নানাদেশে ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণও পূর্বাঞ্চলেই অধিক। শেষ জীবনে তিনি সমেতগিরিতে বাস করেন, সমেতগিরি পরেশনাথ পাহাড়। তাঁহারো পূর্বে যে ২২জন তীর্থঙ্কর ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সমেতগিরিতেই বাস করিতেন ও সেইখানেই দেহ রক্ষা করেন।

সাংখ্য-মত এই সকল ধর্মেরই আদি। সাংখ্যের দেখাদেখিই জৈনেরা কেবলী হইতে চাহিত, কৈবল্য চাহিত। বৌদ্ধেরা বলেন তাঁহারা সাংখ্যকে ছাড়াইয়া উঠিয়া ছিলেন। কিন্তু সাংখ্য-মত আর্য-মত নহে, উহার উৎপত্তি পূর্বদেশে। কতকগুলি আধুনিক সময়ের

উপনিষৎ ও মনু প্রভৃতি কয়েক জন শিষ্টলোক উহার আদর করায়, শংকর উহার খণ্ডন করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। একথা তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন। নচেৎ তাঁহার মতে উহা শিষ্টগণের গ্রাহ্য নহে। উপনিষদে যে সাংখ্য-মত আছে, শংকর তাহাও স্বীকার করেন না, বলেন ও-সকলের অর্থ অন্যরূপ। সাংখ্যকার কপিলের বাড়ি পূর্বাঞ্চলে, পঞ্চশিখের বাড়িও পূর্বাঞ্চলে। মহাভারতের শান্তিপর্ব 'অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনং' বলিয়া আরম্ভ করিয়া এক জায়গায় বলিয়া গিয়াছে যে, পঞ্চশিখ জনক রাজার রাজসভায় আসিয়া রাজাকে উপদেশ দেন। সাংখ্য-মত যে পূর্বাঞ্চলের, একথা অনেকবার বলিয়াছি। তাই আর এখানে বেশি করিয়া বলিব না।

তৃতীয় গৌরব : রেশম

বাংলার তৃতীয় গৌরব রেশমের কাজ। ইউরোপীয়েরা চিনদেশ হইতে রেশমের পোকা আনিয়াছিলেন এবং অনেক শত বৎসর চেষ্টা করিয়া তাঁহারা রেশমের কারবার খুলিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের সংস্কার চিনই রেশমের জন্মস্থান, চিনেরাও তাহাই বলে। তাহারা বলে খ্রিস্টের ২৬৪০ বৎসর পূর্বে চিনের রানি তুঁত গাছের চাষ আরম্ভ করেন। রেশমের ব্যবসা সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকাল হইতেই চিন দেশে অনেক লেখা পড়া আছে। চিনেরা রেশমের চাষ কাহাকেও শিখিতে দিত না। ওইটি তাহাদের উপনিষৎ বা গুপ্ত বিদ্যা ছিল। জাপানিরা অনেক কষ্টে খ্রিস্টের তৃতীয় শতকে কোরিয়ার নিকট রেশমের চাষ শিক্ষা করে। ইহারই কিছুদিন পরে চিনের এক রাজকন্যা ভারতবর্ষে উহার চাষ আরম্ভ করেন। ইউরোপে খ্রিস্টের প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে স্থলপথে চিনের সহিত রেশমের ব্যবসা চলিত। অনেকে মনে করেন, এই রেশমের ব্যবসার জন্যই পাঞ্জাবের শকরাজারা বেশি করিয়া সোনার টাকা চালান। ইউরোপে রেশমের চাষ ইহার অনেক পরে আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু আমরা চাণক্যের 'অর্থশাস্ত্রে' দেখিতে পাই, বাংলা দেশে খ্রিস্টের তিন-চারি শত বৎসর পূর্বে রেশমের চাষ খুব হইত। রেশমের খুব ভালো কাপড়ের নাম 'পত্রোর্ণ' অর্থাৎ পাতার পশম। পোকাতে পাতা খাইয়া যে পশম বাহির করে, সেই পশমের কাপড়ের নাম 'পত্রোর্ণ'। সেই পত্রোর্ণ তিন জায়গায় হইত ; মগধে, পৌণ্ড্রদেশে ও সুবর্ণকুড্যে। নাগ বৃক্ষ, লিকুচ, বকুল আর বটগাছে এই পোকা জন্মিত। নাগবৃক্ষের পোকা হইতে হলদে রঙের রেশম হইত ; লিকুচের পোকা হইতে যে রেশম বাহির হইত, তাহার রঙ গমের মতো ; বকুলের রেশমের রঙ সাদা ; বট ও আর-আর গাছের রেশমের রঙ ননীর মতো। এই সকলের মধ্যে সুবর্ণকুড্যের 'পত্রোর্ণ' সকলের

চেয়ে ভালো। ইহা হইতেই কৌষেয় বস্ত্র ও চিনভূমিজাত চিনের পট্টবস্ত্রেরও ব্যাখ্যা হইল।

উপরে যেটুকু লেখা হইল, তাহা প্রায়ই 'অর্থশাস্ত্রের' তর্জমা। 'অর্থশাস্ত্রে' যে অধ্যায়ে কোন্ কোন্ ভালো জিনিস রাজকোষে রাখিয়া দিতে হইবে, তাহার তালিকা আছে, সেই অধ্যায়ের শেষ অংশে ওই-সকল কথা আছে। অধ্যায়ের নাম 'কোষপ্রবেশ্যরত্নপরীক্ষা'। এখানে রত্ন শব্দের অর্থ কেবল হিরা জহরৎ নয়, যে পদার্থের যাহা উৎকৃষ্ট, সেইটির নাম রত্ন। এই রত্নের মধ্যে অগুরু আছে, চন্দন আছে, চর্ম আছে, পাটের কাপড় আছে, রেশমের কাপড় আছে ও তুলার কাপড় আছে। যে অংশ তর্জমা হইল, তাহাতে মগধ ও পৌণ্ড্রদেশের নাম আছে, এই দুইটি দেশ সকলেই জানেন। মগধ, দক্ষিণ-বিহার আর পৌণ্ড্র, বারেন্দ্রভূমি। সুবর্ণকুড্য কোথায়? প্রাচীন টীকাকার বলেন, সুবর্ণকুড্য কামরূপের নিকট। কিন্তু কামরূপের নিকট যে রেশম এখন হয়, তাহা ভেরাণ্ডা পাতায় হয়। আমি বলি, সুবর্ণকুড্যেরই নাম শেষে কর্ণসুবর্ণ হয়। কর্ণসুবর্ণও মুর্শিদাবাদ ও রাজমহল লইয়া এখানকার মাটি সোনার মতো রাঙা বলিয়া, এ দেশকে কর্ণসুবর্ণ, কিরণসুবর্ণ বা সুবর্ণকুড্য বলিত। এখানে এখনও রেশমের চাষ হয় এবং এখানকার রেশম খুব ভালো। নাগবৃক্ষ এখানে খুব জন্মায়। নাগবৃক্ষ শব্দের অর্থ নাগকেশরের গাছ। নাগকেশর বাংলার আর কোনোখানে বড়ো দেখা যায় না, কিন্তু এখানে অনেক দেখা যায়। লিকুচ মাদার গাছ। মাদারগাছেও রেশমের পোকা বসিতে পারে। বকুল ও বটগাছ প্রসিদ্ধই আছে। কৌটিল্য যেভাবে চিনদেশের পট্টবস্ত্রের উল্লেখ করিলেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি চিনদেশের রেশমি-কাপড় অপেক্ষা বাংলার রেশমি-কাপড় ভালো বলিয়া মনে করিতেন। রেশমি-কাপড় যে চিন হইতে বাংলায় আসিয়াছিল তাহার কোনো প্রমাণই 'অর্থশাস্ত্রে' পাওয়া যায় না। চিনের রেশম তুঁতগাছ হইতে হয়। বাংলার রেশমের তুঁতগাছের সহিত কোনো সম্পর্কই নাই। সুতরাং বাঙালি যে রেশমের চাষ চিন হইতে পাইয়াছে, একথা বলিবার জো নাই। এখন পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইলে এই কথা বলিতে হইবে যে, রেশমের চাষ বাংলাতেও ছিল, চিনেও ছিল। তবে তুঁতগাছ দিয়া রেশমের চাষ চিন হইতেই সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যত্র যে রেশমের চাষ ছিল, একথা চাণক্য বলেন না। তিনি বলেন বাংলায় ও মগধেই রেশমের চাষ ছিল। কারণ, পৌণ্ড্রও বাংলায় সুবর্ণকুড্যও বাংলায়। চাণক্যের পরে কিন্তু ভারতবর্ষের নানা স্থানে রেশমের চাষ হইত। কারণ মান্দাসোরে খ্রি. ৪৭৬ অব্দে যে শিলালেখ পাওয়া যায়, তাহাতে লেখা আছে যে, সৌরাষ্ট্র হইতে একদল রেশম-ব্যবসায়ী মান্দাসোরে আসিয়া রেশমের ব্যবসা আরম্ভ করে এবং তাহারাই চাঁদা করিয়া এক প্রকাণ্ড সূর্যমন্দির নির্মাণ করে।

'অর্থশাস্ত্র' হইতে আমরা যে সংবাদ পাইলাম, সেটি বাংলার বড়োই গৌরবের

কথা। যদি বাঙালিরা সকলের আগে রেশমের চাষ আরম্ভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তো তাঁহাদের গৌরবের সীমাই নাই। যদি চিনেই সর্বপ্রথম উহার আরম্ভ হয়, তথাপি বাঙালিরা চিন হইতে কিছু না শিখিয়াই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে যে রেশমের কাজ আরম্ভ করেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কারণ, তাঁহারা তো আর তুঁতপাতা হইতে রেশম বাহির করিতেন না, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। যে-সকল গাছ বিনা চাষে তাঁহাদের দেশে প্রচুর জন্মায়, সে-সকল গাছের পোকা হইতেই তাঁহারা নানা রঙের রেশম বাহির করিতেন। চিনের রেশম সবই সাদা তাহা রঙ করিতে হয়। বাংলার রেশম রঙ করিতে হইত না। গাছবিশেষের পাতার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন রঙের সূতা হইত। আর এ বিদ্যা বাংলার নিজস্ব, ইহা কম গৌরবের কথা নয়।

চতুর্থ গৌরব : বাকলের কাপড়

বাংলার চতুর্থ গৌরব বাকলের কাপড়। প্রথম অবস্থায় লোকে পাতা পরিত। কটকের জঙ্গল-মহলে এখনো দু-এক জায়গায় লোকে পাতা পরিয়া থাকে। তাহার পর লোকে বাকল পরিত ; গাছের ছাল পিটিয়া কাপড়ের মতো নরম করিয়া লইত, তাহাই জড়াইয়া লজ্জা নিবারণ করিত এবং কাঁধের উপর একখানি ফেলিয়া উত্তরীয় করিত। সাঁচী পাহাড়ের উপর এক প্রকাণ্ড স্তূপ আছে, উহার চারিদিকে পাথরের রেলিং আছে, রেলিং-এর চারিদিকে বড়ো বড়ো ফটক আছে। দুই-দুইটি থামের উপর এক-একটি ফটক। এই থামের গায়ে অনেক চিত্র আছে। এই চিত্রের মধ্যে বাকল-পরা অনেক মুনিঋষি আছেন। তাঁহাদের কাপড় পরার ধরন দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি, কেমন করিয়া সেকালে লোকে বাকল পরিয়া থাকিত। তাহার পর লোকে আর বাকল পরিত না, বাকল হইতে সুতা বাহির করিয়া কাপড় বুনিয়া লইত ; শণ, পাট, ধঞ্চে, এমনকী অতসীগাছের ছাল হইতেও সুতা বাহির করিত। এখন এই-সকল সুতায় দড়ি ও থলে হয়। সেকালে উহা হইতে খুব ভালো কাপড় তৈয়ার হইত এবং অনেক কাপড় খুব ভালোও হইত। বাকল হইতে যে কাপড় হইত, তাহার নাম 'ক্ষৌম', উৎকৃষ্ট ক্ষৌমের নাম 'দুকূল'। ক্ষৌম পবিত্র বলিয়া লোকে বড়ো আদর করিয়া পরিত।

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'র মতে বাংলাতেই এই বাকলের কাপড় বুনা হইত। বঙ্গে 'দুকূল' হইত, উহা শ্বেত ও স্নিগ্ধ, দেখিলেই চক্ষু জুড়াইয়া যাইত। পৌণ্ড্রেও দুকূল হইত, উহা শ্যামবর্ণ ও মণির মতো উজ্জ্বল। সুবর্ণকুড্যে যে সুকূল হইত, তাহার বর্ণ সূর্যের মতো এবং মণির মতো উজ্জ্বল। এই অংশের শেষে কৌটিল্য বলিতেছেন, ইহাতেই কাশীর ও পৌণ্ড্রদেশের ক্ষৌমের কথা 'ব্যাখ্যা' করা হইল। ইহাতে বুঝা যায় বাংলাতেই বাকলের কাপড় সকলের চেয়ে ভালো হইত এবং 'দুকূল' একমাত্র

বাংলাতেই হইত। সুতরাং ইহা আমরা বাংলার চতুর্থ গৌরবের বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিলাম।

এখানে আমরা কাপাসের কাপড়ের কথা বলিলাম না। কারণ, চাণক্যের মতে কাপাসের কাপড় যে শুধু বাংলাতেই ভালো হইত, এমন নয় ; মধুরার কাপড়, অপরান্তের কাপড়, কলিঙ্গের কাপড়, কাশীর কাপড়, বৎস দেশের কাপড় ও মহিষ দেশের কাপড়ও বেশ হইত। মধুরা পাণ্ড্যদেশ, মহিষ দেশ নর্মদার দক্ষিণ, অপরান্ত বোম্বাই অঞ্চলে। কিন্তু চাণক্যের অনেক পরে কাপাসের কাপড়ও বাংলার একটা প্রধান গৌরবের জিনিস হইয়াছিল। ঢাকাই মসলিন ঘাসের উপর পাড়িয়া রাখিলে ও রাত্রিতে তাহার উপর শিশির পড়িলে, কাপড় দেখাই যাইত না। একটা আংটির ভিতর দিয়া এক থান মস্‌লিন অনায়াসেই টানিয়া বাহির করিয়া লওয়া যাইত। তাঁতিরা অতি প্রত্যুষে উঠিয়া একটি বাখারির কাটি লইয়া কাপাসের খেতে ঢুকিত। ফট্ করিয়া যেমন একটি কাপাসের মুখ খুলিয়া যাইত, অমনি বাখারিতে জড়াইয়া তাহার মুখের তুলাটি সংগ্রহ করিত। সেই তুলা হইতে অতি সূক্ষ্ম সুতা পাকাইত, তাহাতেই মস্‌লিন তৈয়ার হইত। আকবর যখন বাংলা দখল করিয়া সুবাদার নিযুক্ত করেন, তখন সুবাদারের সহিত তাঁহার বন্দোবস্ত হয় যে, তিনি বাংলার রাজস্ব-স্বরূপ বৎসরে পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র লইবেন, কিন্তু দিল্লির রাজবাড়িতে যত মালদহের রেশমি কাপড় ও ঢাকার মস্‌লিন দরকার হইবে, সমস্ত সুবাদারকে যোগাইতে হইবে।

পঞ্চম গৌরব : থিয়েটার

প্রাচীন বাংলার পঞ্চম গৌরব থিয়েটার। থিয়েটারের সেকালের নাম 'প্রেক্ষাগৃহ' বা 'পেক্‌খা ঘরঅ'। ইউরোপের অনেক পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষে থিয়েটার ছিল না, থিয়েটারের ব্যাপার গ্রীস হইতে এখানে আসিয়াছে, থিয়েটার রাজাদের নাচ-ঘরে থাকিত একথা একেবারে ঠিক নয়। আমাদের নিজ গৌরবের কথা আলোচনা করিতেছি। পরনিন্দায় আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, এক সময়ে দেবাসুরের ঘোর দ্বন্দ্ব হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে জিতিয়া ইন্দ্র এক ধ্বজা খাড়া করিয়া দেন। ধ্বজার নীচে দেবতার দল আমোদ আহ্লাদ করিতে থাকেন। আমোদ করিতে করিতে তাঁহারা দেবাসুরের যুদ্ধ অভিনয় করিয়া বসিলেন। দেবতারা দেখিলেন যে 'বা! ইহাতে তো বেশ আমোদ হয়। যখনই শক্রধ্বজ তুলা যাইবে, তখনই এইরকম অভিনয় করিতে হইবে।' অসুরেরা বলিল, 'বা। আমাদের ছোটো করিবার জন্য তোমরা একটা নূতন কীর্তি করিবে, ইহা আমরা কিছুতেই হইতে দিব না।' এই বলিয়া তাহারা অভিনয় ভাঙিয়া দিবার যোগাড় করিয়া

তুলিল। ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া এক বাঁশ লইয়া তাহাদিগকে তাড়া করিলেন। অসুর মারিতে মারিতে বাঁশের ডগাটি ছেঁচিয়া গেল, তাহার নাম হইল 'জর্জর'। জর্জর সেই অবধি নাটকের নিশান হইল। প্রেক্ষাগৃহ তৈয়ার করিতে গেলে আগে জর্জর পুঁতিতে হইত, নাটক আরম্ভ করিতে গেলে আগে জর্জরের পূজা করিতে হইত। জর্জরের ছয়টি পাব ছয় রকম নেকড়া দিয়া জড়ানো থাকিত। ছয় জন বড়ো বড়ো দেবতা উহাতে বাস করিতেন। তাঁহাদের ছয় জনেরই পূজা করিতে হইত। থিয়েটারের ঘর তিন রকম হইত, একরকম টানা ; অর্থাৎ আগা সরু, গোড়া সরু, মাঝখানটা মোটা, ইহা ১০৮ হাত লম্বা, এরূপ ঘর দেবস্থানেই হইত ; আর-একরূপ ঘর চৌকোণা, ৬৪ হাত লম্বা, ৩২ হাত চেটাল, ইহা রাজাদের জন্য ; আর সাধারণ ভদ্র লোকেদের বাড়িতে যে থিয়েটার হইত, তাহা তেকোণা, সমবাহু-ত্রিভুজ, প্রত্যেক বাহুর পরিমাণ ৩২ হাত। থিয়েটার করিবার সময় কানা, খোঁড়া, কুঁজা, কুরূপ কোনো লোককে সেখানে যাইতে দেওয়া হইত না, এমনকি মজুরি করিতেও ওইরূপ লোক লওয়া হইত না ; সন্ন্যাসী, ভিখারিকেও সেস্থানে যাইতে দেওয়া হইত না। ঘর করিবার সময় ঠিক মাঝখানে জর্জর পুঁতিয়া রাখিতে হইত। থিয়েটারের অর্ধেকটা প্রেক্ষকদিগের জন্য। অর্ধেকটা নটদিগের জন্য। থিয়েটারও দোতালা হইত, প্রেক্ষকদিগের জায়গাও দোতালা হইত। দোতালা স্টেজ (রঙ্গ) পৃথিবীর আর-কোনো দেশে এখনো নাই। পৃথিবীর ব্যাপার একতালায় হইত, স্বর্গের ব্যাপার দোতালায় হইত। প্রেক্ষকদিগের যে অর্ধেকটা স্থান থাকিত, তাহার সম্মুখটা ব্রাহ্মণদিগের জন্য, সেখানকার থাম সাদা। তাহার পিছনে ক্ষত্রিয়দের স্থান, সেখানকার থামগুলি রাঙা। তাহার পিছনে বৈশ্যের ও শূদ্রের অর্ধেক অর্ধেক করিয়া স্থান, সেখানকার থাম কালো ও হলদে। সম্মুখের সারির অপেক্ষা পিছনের সারি ১হাত উচা' তাহার পিছনে আর ১হাত উচা, তাহার পিছনে আর ১হাত উচা, এইরূপে গেলারি করা ছিল। দোতালার অবস্থাও এইরূপ। স্টেজের পিছনে সাজঘর ও বাজনার ঘর, তাহার পিছনে বিশ্রাম ঘর, তাহারো পিছনে দেবতাদের পূজা করিবার স্থান। স্টেজে চিত্র থাকিত; কিন্তু সেগুলি নড়ানো যাইত না। স্টেজের দেওয়ালের গায়ে উজ্জ্বল বর্ণে কোথাও বাগান, কোথাও বাড়ি, কোথাও শোবার ঘর, কোথাও নদীতীর, কোথাও পর্বত আঁকা থাকিত। স্টেজের উপরে জর্জরের পূজা হইত ও নান্দী পাঠ হইত। স্টেজের দুই পাশে দুই দরজা থাকিত, সেইখান দিয়া পাত্রের প্রবেশ হইত।

যাঁহারা অভিনয় করিতেন, তাঁহারা প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণই ছিলেন। ঋষিদের উপর কটাক্ষ করিয়া কয়েকখানি প্রহসন করায় ঋষিরা শাপ দেন, 'তোমরা শূদ্র হইয়া যাইবে।' সেই অবধি উঁহারা শূদ্র হইয়া যান। চাণক্যের 'অর্থশাস্ত্রে' উঁহাদিগকে শূদ্রই বলা হইয়াছে।

থিয়েটারের কথা বলিতে গিয়া ভরতমুনি উহার কতকটা ইতিহাস দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, অনেক সম্প্রদায়ের নটসূত্র ছিল। প্রত্যেক সূত্রেরই ভাষ্য ছিল, বার্তিক ছিল, নিরুক্ত ছিল, সংগ্রহ ছিল, কারিকা ছিল। এই সমস্ত সূত্র একত্র করিয়া 'ভরত-নাট্যশাস্ত্র' হইয়াছে। এই নাট্যশাস্ত্রখানি বোধ হয় খ্রিস্টের দুই শত বৎসর পূর্বে লেখা হইয়াছিল। কারণ, উহাতে শক, যবন ও পহ্লব এই তিনটি জাতির নাম একত্র পাওয়া যায়। জার্মান পণ্ডিত নোলকি বলেন, যে-কোনো পুস্তকে শক, যবন, পহ্লব এই তিনটি নাম একত্র পাওয়া যাইবে, সেই পুস্তক খ্রিস্টের ২০০ শত বৎসর পূর্ব হইতে ২০০ শত বৎসর পর, ইহার মধ্যে লেখা। নাট্যশাস্ত্রে কিন্তু পহ্লব শব্দ উহার অতি প্রাচীন আকারে আছে, অর্থাৎ বৎসর এই আকারে আছে। পার্থিব বা পারদ নামে এক জাতি কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণে আজার-বিজানের পাহাড়ে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। খ্রিস্টপূর্ব ২৫০ হইতে খ্রিস্টের পর ২২২ বৎসর পর্যন্ত তাহারা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। তাহাদের একদিকে রোম, অন্য দিকে ভারত, দুই দিকেই তাহারা আপনাদের রাজ্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করিত। ভারতবাসীরা তাহাদের শেষ অবস্থায় তাহাদিগকে পহ্লব বলিত ; প্রথম প্রথম উহাদের নাম ছিল পাথ্রব। এখন, ওই প্রাচীন জাতিকে পুরাণে পারদ বলে। ভরতসূত্র যদি খ্রিস্টের ২০০ শত বৎসর পূর্বে লেখা হয় তাহা হইলে তাহারো পূর্বে অনেক নাট্য সম্প্রদায় ছিল। পাণিনিতে আমরা ২খানি নটসূত্রের নাম পাই, একখানি শিলালির, অপরটি কৃশাশ্বের। ভাসের নাটকে আছে যে, বৎসরাজ উদয়ন সূত্রকার ভরতকে আপনার পূর্বপুরুষ মনে করিয়া অত্যন্ত গর্বিত হইয়াছিলেন।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের প্রবৃত্তির অনুসারে নাটকের প্রবৃত্তি চারি রকম ছিল। সেই চারিটি প্রবৃত্তির নাম ; আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী ও ওড্রমাগধী। দাক্ষিণাত্যের লোকে নাটকে নৃত্য, গীত, বাদ্য বেশি বেশি দেখিতে ভালোবাসিত, তাহারা অভিনয়ও ভালোবাসিত, কিন্তু উহা চতুর, মধুর ও ললিত হওয়া আবশ্যক ছিল। এইরূপ পূর্বাঞ্চলের লোকেরও একটা প্রবৃত্তি ছিল, তাহার নাম ওড্রমাগধী। ওড্রমাগধী প্রবৃত্তি যে-সকল দেশে প্রচলিত ছিল, তাহার মধ্যে বঙ্গদেশ প্রধান। কারণ বঙ্গদেশ হইতেই মলচ, মল্ল, বর্ষক, ব্রহ্মোত্তর, ভার্গব, মার্গব, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, পুলিন্দ, বৈদেহ, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি দেশ নাটকের প্রবৃত্তি গ্রহণ করিত। এই নাটকের প্রবৃত্তি এই যে, ইহারা প্রহসন ভালোবাসিত, ছোটো ছোটো নাটক ভালোবাসিত, পূর্বরঙ্গে আশীর্বাদ ও মঙ্গলধ্বনি ভালোবাসিত, কথোপকথন ভালোবাসিত, আর সংস্কৃত পাঠ ভালোবাসিত; স্ত্রীর অভিনয় তাহাদের আদৌ ভালো লাগিত না, পুরুষের অভিনয়ই তাহাদের পছন্দ ছিল। তাহারা নাটকে গান, বাজনা, নাচ, এসব ভালোবাসিত না। কী আশ্চর্যের বিষয়, অমৃতবাবুর [অমৃতলাল বসু] মুখে শুনিতে পাই, এখনো বাঙালিরা নাচ-গান তত পছন্দ করে না। তবে এখনকার থিয়েটারে যে নাচ-গান হয়, সে কেবল বড়োবাজারের খাতিরে।

খ্রিস্টের দুই শত বৎসর পূর্বেও যদি বাংলায় নাটকের একটা স্বতন্ত্র রীতি চলিয়া থাকে, তবে তাহা বাঙালির কম গৌরবের কথা নয়।

ষষ্ঠ গৌরব : নৌকা ও জাহাজ

বাংলায় যেরূপ বড়ো বড়ো নদী আছে, তাহাতে বাঙালিরা যে অতি প্রাচীনকালেও নৌকা গড়িত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নৌকাও অনেক রূপ ছিল ; দোনা, দুনি, ডিঙি, ভেলা, নৌকা, বালাম, ছিপ, ময়ূরপঙ্খী ইত্যাদি। এ সকলই ছোটো ছোটো নৌকো। সকল দেশেই আছে। বাংলায় কিন্তু বড়ো জাহাজও ছিল।

বুদ্ধদেবেরও আগে বঙ্গদেশে বঙ্গনগরে একজন রাজা ছিলেন, তিনি কলিঙ্গ দেশের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজার এক অতি সুশ্রী কন্যা হয়, কিন্তু সে অতি দুষ্ট ছিল। সে একবার পলাইয়া গিয়া মগধ-যাত্রী এক বণিকের দলে ঢুকিয়া যায়। তাহারা যখন বাংলার সীমানায় উপস্থিত হইল, তখন এক সিংহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। বণিকেরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। কিন্তু রাজকন্যা সিংহের পিছু লইলেন। তিনি সিংহকে সেবায় এতদূর তুষ্ট করিলেন যে, সিংহ তাহাকে বিবাহ করিল। কালক্রমে রাজকন্যার এক পুত্র ও এক কন্যা হইল। পুত্রের হাত দুইখানি সিংহের মতো হইল, এইজন্য তাহার নাম হইল সিংহবাহু। সিংহবাহু বড়ো হইলে মা ও ভগিনীকে লইয়া সিংহের গুহা হইতে পলায়ন করিল। বাংলার সীমানায় উপস্থিত হইলে সীমারক্ষক রাজার শালা রাজকন্যা ও তাহার ছেলে-মেয়েকে বঙ্গনগরে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে সিংহ গুহায় আসিয়া ছেলে-মেয়েদের না পাইয়া বড়োই কাতর হইল। সেও খুঁজিতে খুঁজিতে বাংলার সীমানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে যে গ্রামেই যায়, গ্রামের লোক ভয় পাইয়া রাজার কাছে দৌড়িয়া গিয়া বলে সিংহ আসিয়াছে। রাজা ঢেঁটরা দিলেন, যে সিংহ মারিয়া দিতে পারিবে, তিনি তাহাকে যথেষ্ট বকশিশ দিবেন। কেহই তাহাতে স্বীকার করিল না। রাজা সিংহবাহুকে বলিলেন, 'তুমি যদি সিংহ ধরিয়া দিতে পার, আমি তোমাকে রাজা করিয়া দিব।' সে সিংহ মারিয়া আনিল ও রাজা হইল এবং আপনার ভগিনীকে বিবাহ করিল। তাহার অনেকগুলি ছেলেপিলে হইল। বড়ো ছেলের নাম হইল বিজয়। সে বড়ো দুরন্ত, লোকের উপর বড়ো অত্যাচার করে। লোকে উত্যক্ত হইয়া উঠিল, রাজাকে বলিল, 'ছেলেটিকে মারিয়া ফেল।' রাজা ৭০০ অনুচরের সহিত বিজয়কে এক নৌকা করিয়া দিয়া সমুদ্রে পাঠাইয়া দিলেন। বিজয়ের ও তাহার অনুচরবর্গের ছেলেদের জন্য আর এক নৌকা দিলেন ও তাহাদের স্ত্রীদের জন্য আরো একখানা নৌকা দিলেন। ছেলেরা একটা দ্বীপে নামিল, তার নাম হইল নগ্নদ্বীপ ; মেয়েরা আর একটি দ্বীপে নামিল, তাহার নাম হইল নারী দ্বীপ। বিজয় ঘুরিতে

ঘুরিতে এখন যেখানে বোম্বাই, তাহার নিকটে সুপ্পরাক নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল, সংস্কৃতে উহার নাম সুপরার্ক, এখন উহার নাম সুপারা। বিজয় সেখানেও অত্যাচার আরম্ভ করিল। লোকে তাহাকে তাড়া করিল, সেও আবার নৌকায় চড়িয়া পালাইয়া গেল ও লংকাদ্বীপে আসিয়া নামিল। সে যেদিন লংকাদ্বীপে নামে সেদিন বুদ্ধদেব কুশীনগরে দুই শালগাছের মাঝে শুইয়া নির্বাণ লাভ করিতেছিলেন। তিনি ইন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন 'আজ বিজয় লংকাদ্বীপে নামিল। সে সেখানে আমার ধর্ম প্রচার করিবে, তুমি তাহাকে রক্ষা করিও।'

যে তিনখানি নৌকায় সিংহবাহু বিজয় ও তাহার লোকজন উহাদের ছেলেপিলে ও পরিবারবর্গ পাঠাইয়া দেন সে তিনখানিই খুব বড়ো নৌকা ছিল। ৭০০ লোক যে নৌকায় যায়, সে তো জাহাজ। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বাংলা দেশে ওইরূপ বড়ো বড়ো নৌকা তৈয়ার হইত। বিজয় যে জাহাজে লংকা যান, সে জাহাজের একখানি ছবি অজন্তা-গুহার মধ্যে আছে। তাহাতে মাস্তুল ছিল, পাল ছিল, স্টিম এঞ্জিন হইবার আগে যেসব জিনিস তাহাতে দরকার, সবই ছিল। অনেকে মনে করেন যে এসব কথা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু সেই ছবিটা তো এখনও আছে তাহা তো অবিশ্বাস করা যায় না। সে ছবিও অল্পদিনের নয়, অন্তত ১৪০০ বৎসর হইয়া গিয়াছে। তখনও লোকে মনে করিত, বিজয় এইভাবে এইরূপ নৌকায় লংকায় নামিয়া ছিলেন।

বুদ্ধের আগেও ভারতবর্ষের অন্যত্র এরূপ অনেক বড়ো বড়ো নৌকা ছিল। বোম্বাই-এর কাছে ভরুকচ্ছ বা ভড়ৌচ [বর্তমান ব্রোচ] একটি বড়ো বন্দর ছিল। সেখান হইতে বড়ো বড়ো জাহাজ ববেরু বা বাবিলন যাইত। সুপারা হইতেও জাহাজ যাইত। এক জাহাজে ৭০০ লোক যাইবার কথা অনেক জায়গায় শুনা যায়। কিন্তু তাম্রলিপ্তি বা বাংলা হইতে এরূপ জাহাজ যাইবার কথা বুদ্ধদেবের আগে বা পরেও অনেক বৎসর ধরিয়া আর শুনা যায় না। তথাপি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করেন, বুদ্ধের সময়ও তাম্রলিপ্তি একটি বড়ো বন্দর ছিল। 'অর্থশাস্ত্রে' বলে যে, যিনি রাজার 'নাবধ্যক্ষ' থাকিতেন, তিনি 'সমুদ্রসংযানে'রও অধ্যক্ষতা করিতেন। সুতরাং তখনও যে বঙ্গ মগধ হইতে সমুদ্রে জাহাজ যাইত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বঙ্গ মগধ হইতে জাহাজ যাইতে হইলে, তাম্রলিপ্তি ছাড়া আর বন্দরও নাই।

'দশকুমারচরিত' একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। উইলসন সাহেব মনে করেন যে উহা খ্রিস্টের জন্মের ছয়শত বৎসর পরে লিখিত। অনেকে কিন্তু মনে করেন, উহা খ্রিস্টের জন্মের পূর্বেই লেখা হইয়াছে। উহাতে তাম্রলিপ্তি নগরের বিবরণ আছে। সেখান হইতে অনেক পোত বঙ্গসাগরে যাইত। দশকুমারের এক কুমার তাম্রলিপ্তি হইতে সেইরূপ এক পোতে চড়িয়া দূর সমুদ্রে যাইতেছিলেন। রামেষু নামে এক যবনের

পোত তাঁহার পোতকে ডুবাইয়া দেয়। 'রামেষু নাম্নো যবনস্য' পড়িয়া ইজিপ্টের রাজা রামেসিসের কথা মনে পড়ে। দশকুমার যখন লেখা হয়, তখন বোধ হয় রামেসিসের স্মৃতি কিছু কিছু জাগরূক ছিল।

খ্রিস্টের জন্মের চারি শত বৎসর পরে ফাহিয়েন তাম্রলিপ্তি হইতে এক জাহাজে চড়িয়া চিন যাত্রা করিয়াছিলেন। সে জাহাজে নানা দেশের লোক ছিল। চিন-সমুদ্রে ভয়ংকর ঝড় উঠে জাহাজ ডুবু ডুবু হয় ফাহিয়েন বুদ্ধদেবের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ও ঝড় থামিয়া গেল।

তাহার পরও তাম্রলিপ্তি হইতে চিন ও জাপানে জাহাজ যাইত শুনা যায়। কিছুদিন পর হইতেই সুমাত্রা, জাভা, বালি প্রভৃতি দ্বীপে ভারতবাসীরা যাইয়া বাস করেন এবং তথায় শৈব, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহারা কলিঙ্গ ও ভরুকচ্ছ হইতেই গিয়াছিলেন, তাম্রলিপ্তি হইতেও যাওয়া সম্ভব, কিন্তু এখনও তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন বৃত্তান্তে লেখা আছে যে, মগধ হইতে অনেকবার লোকে যাইয়া ব্রহ্মদেশ দখল করে ও তথায় সভ্যতা বিস্তার করে। ডুসেল সাহেবের রিপোর্টে প্রকাশ যে, পেগানে বহু পূর্বে মগধ হইতে লোকজন গিয়াছিল ও তথায় ভারতবর্ষের ধর্ম প্রচার করিয়াছিল।

কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন, বাংলার রাজারা নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন। পালরাজাদের যে যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা থাকিত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। খালিমপুরে ধর্মপালের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে, তাহাতে ধর্মপালের যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা প্রস্তুত থাকিত, একথা স্পষ্ট লেখা আছে। রামপাল নৌকার সেতু করিয়া গঙ্গা পার হইয়াছিলেন, একথা 'রামচরিতে' স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে। ইংরেজি ১২৭৬ খ্রিস্টাব্দে তাম্রলিপ্ত হইতে কতকগুলি বৌদ্ধভিক্ষু জাহাজে চড়িয়া পেগানে গিয়া তথাকার বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করেন, এ কথাও কল্যাণী নগরের শিলালেখে স্পষ্ট করিয়া বলা আছে।

কিন্তু মনসা ও মঙ্গল-চণ্ডীর পুঁথিতেই আমরা বাংলা দেশের নৌকাযাত্রার খুব জাঁকাল খবর পাই ; চৌদ্দ, পনেরো, ষোলোখানি জাহাজ একজন সওদাগর একজন মাঝির অধীনে ভাসাইয়া লইয়া গঙ্গা বাহিয়া সমুদ্রে পড়িতেন, সমুদ্র বাহিয়া সিংহলে যাইতেন এবং তথা হইতেও ১৪/১৫ দিন বাহিয়া মহাসমুদ্রের মধ্যে নানা দ্বীপ উপদ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। চাঁদ সদাগরের প্রধান জাহাজের নাম মধুকর। কোনো কোনো পুঁথিতে লেখে যে, মধুকরের ১২০০ শত দাঁড় ছিল। দ্বিজ বংশীদাসের মনসা ভাসানে লেখা আছে, সিংহল হইতে ১৩ দিন মহাসমুদ্রে যাওয়ার পর ভীষণ ঝড় উঠিল, তুলারাশির মতো ফেনরাশি নৌকার উপর দিয়া চলিতে লাগিল। চাঁদ সদাগর কাঁদিয়াই আকুল, 'আমার যথাসর্বস্ব এই নৌকাগুলিতে আছে, ইহাদের একখানিও

দেখিতে পাই না। আমার নিজের প্রাণও যায়।' তিনি মাঝিকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন, 'তুমি ইহার একটা উপায় করো।' মাঝি তাঁহাকে ঠান্ডা করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, যখন পারিলেন না, তখন মধুকর হইতে কতকগুলা তেলের পিপা খুলিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিলেন, ঢেউ থামিয়া গেল ; দূরে দূরে সব জাহাজগুলি দেখা গেল। চাঁদ সদাগর তো আহ্লাদে আটখানা. এই সকল বই লেখার পরও যখন কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্য খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তাহারা সর্বদাই নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন, অনেক সময় দূরদূরান্তরও যাইতেন। কিন্তু তখন তাহাদের সহায় ছিল পোর্তুগীজ বোম্বেটের দল। ইহার পরেও আবার যখন আরাকানের রাজা ও পোর্তুগীজ বোম্বেটেরা বাংলায় বড়োই অত্যাচার আরম্ভ করিল, দেশটাকে সত্য সত্যই 'মগের মুল্লুক' করিয়া তুলিল, তখন আবার বাঙালি মাঝি দিয়াই শায়েস্তা খাঁ তাহাদের শাসন করিলেন। বঙ্গসাগরে বোম্বেটেগিরি থামিয়া গেল।

সপ্তম গৌরব : বৌদ্ধ শীলভদ্র

'অভিধর্মকোষ' ব্যাখ্যার মঙ্গলাচরণে লেখা আছে যে, গ্রন্থকার বসুবন্ধু দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় বিরাজ করিতেন। একথা যদি ভারতবর্ষের পক্ষে সত্য হয়, তবে তাহা হইলে সমস্ত এশিয়ার পক্ষে যুয়াং চুয়াং যে দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় বিরাজ করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চিনে যত বৌদ্ধ-পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন, যুয়াং চুয়াং তাহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো। তাঁহারই শিষ্য-প্রশিষ্য এক সময় জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছিল। যুয়াং চুয়াং বৌদ্ধধর্ম ও যোগ শিখিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি যাহা শিখিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাহার চেয়ে অনেক বেশি শিখিয়া যান। যাঁহার পদতলে বসিয়া তিনি এত শাস্ত্র শিখিয়াছিলেন, তিনি একজন বাঙালি। ইহা বাঙালির পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। ইহার নাম শীলভদ্র, সমতটের এক রাজার ছেলে। যুয়াং চুয়াং যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন তিনি নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ, বড়ো বড়ো রাজা এমনকি সম্রাট হর্ষবর্ধন পর্যন্ত তাঁহার নামে তটস্থ হইতেন, কিন্তু সে-পদের গৌরব, মানুষের নহে। শীলভদ্রের পদের গৌরব অপেক্ষা বিদ্যার গৌরব অনেক বেশি ছিল। যুয়াং চুয়াং একজন বিচক্ষণ বহুদর্শী লোক ছিলেন। তিনি গুরুকে দেবতার মতো ভক্তি করিতেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, নানা দেশে নানা গুরুর নিকট বৌদ্ধ-শাস্ত্রের ও বৌদ্ধ-যোগের গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিয়া, তাঁহার যে-সকল সন্দেহ কিছুতেই মিটে নাই, শীলভদ্রের উপদেশে সেই সকল সন্দেহ মিটিয়া গিয়াছে। কাশ্মীরের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ-পণ্ডিত তাঁহার যে সমস্ত সংশয় দূর করিতে পারেন নাই, শীলভদ্র তাহা এক-এক কথায় দূর করিয়া দিয়াছিলেন। শীলভদ্র মহাযান

বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধদিগের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমস্ত গ্রন্থই তাঁহার পড়া ছিল। এ তো অনেক বৌদ্ধরই থাকিতে পারে, বিশেষ যাঁহারা বড়ো বড়ো মহাযান বিহারের কর্তা ছিলেন, তাঁহাদের থাকাই তো উচিত, কিন্তু শীলভদ্রের ইহা অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল, তিনি ব্রাহ্মণদের সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পাণিনি তাঁহার বেশ অভ্যাস ছিল এবং সে সময় উহার যে-সকল টীকা-টিপ্পনী হইয়াছিল, তাহাও তিনি পড়াইতেন। ব্রাহ্মণের আদি গ্রন্থ যে বেদ, তাহাও তিনি যুয়াং চুয়াংকে পড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মতো সর্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ভারতবর্ষেও আর দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তাঁহার যেমন পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনি মনের উদারতা ছিল। যুয়াং চুয়াং-এর পাণ্ডিত্য ও উৎসাহ দেখিয়া যখন নালন্দার সমস্ত পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে দেশে যাইতে দিবেন না স্থির করিলেন, তখন শীলভদ্র বলিয়া উঠিলেন, 'চিন একটি মহাদেশ, যুয়াং চুয়াং ওইখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিবেন, ইহাতে তোমাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়। সেখানে গেলে ইঁহার দ্বারা সদ্‌ধর্মের অনেক উন্নতি হইবে, এখানে বসিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না।' আবার যখন কুমাররাজ ভাস্করবর্মা যুয়াং চুয়াংকে কামরূপ যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং তিনি যাইতে রাজি হইলেন না, তখনও শীলভদ্র বলিলেন, 'কামরূপে বৌদ্ধধর্ম এখনও প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই, সেখানে গেলে যদি বৌদ্ধধর্মের কিছুমাত্র বিস্তার হয়, তাহাও পরম লাভ।' এই সমস্ত ঘটনায় শীলভদ্রের ধর্মানুরাগ, দূরদর্শিতা ও নীতিকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার বাল্যকালের কথাও কিছু এখানে বলা আবশ্যক। পূর্বেই বলিয়াছি যে, তিনি সমতটের রাজার ছেলে, তিনি নাকি ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার বিদ্যায় অনুরাগ ছিল এবং খ্যাতি-প্রতিপত্তিও খুব হইয়াছিল। তিনি বিদ্যার উন্নতির জন্য সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া ত্রিশ বৎসর বয়সে নালন্দায় আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে বোধিসত্ত্ব ধর্মপাল তখন সর্বময় কর্তা। তিনি ধর্মপালের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই ধর্মপালের সমস্ত মত আয়ত্ত করিয়া লইলেন। এই সময়ে দক্ষিণ হইতে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মগধের রাজার নিকট ধর্মপালের সহিত বিচার প্রার্থনা করেন। রাজা ধর্মপালকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ধর্মপাল যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলেন। শীলভদ্র বলিলেন, 'আপনি কেন যাইবেন?' তিনি বলিলেন, 'বৌদ্ধধর্মের আদিত্য অস্তমিত হইয়াছে। বিধর্মীরা চারিদিকে মেঘের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উহাদিগকে দূর করিতে না পারিলে সদ্‌ধর্মের উন্নতি নাই।' শীলভদ্র বলিলেন, 'আপনি থাকুন, আমি যাইতেছি।' শীলভদ্রকে দেখিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হাসিয়া উঠিলেন, 'এই বালক আমার সহিত বিচার করিবে?' কিন্তু শীলভদ্র অতি অল্পেই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া দিলেন। সে শীলভদ্রের না যুক্তি খণ্ডন

করিতে পারিল না বচনের উত্তর দিতে পারিল, লজ্জায় অধোবদন হইয়া সে সভা ত্যাগ করিয়া গেল। শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা তাঁহাকে একটি নগর দান করিলেন। শীলভদ্র বলিলেন, 'আমি যখন কাষায় গ্রহণ করিয়াছি, তখন অর্থ লইয়া কী করিব?' রাজা বলিলেন, 'বুদ্ধদেবের জ্ঞানজ্যোতি তো বহুদিন নির্বাণ হইয়া গিয়াছে, এখন যদি আমরা গুণের পূজা না করি, তবে ধর্ম কীরূপে রক্ষা হইবে? আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না।' তখন শীলভদ্র তাঁহার কথায় রাজি হইয়া নগরটি গ্রহণ করিলেন এবং তাহার রাজস্ব হইতে একটি প্রকাণ্ড সংঘারাম নির্মাণ করিয়া দিলেন।

যুয়াং চুয়াং এক জায়গায় বলিতেছেন যে, শীলভদ্র বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্মানুরাগ, নিষ্ঠা প্রভৃতিতে প্রাচীন বৌদ্ধগণকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি দশ-কুড়িখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি যে-সকল টীকা-টিপ্পনী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি পরিষ্কার ও তাহার ভাষা অতি সরল।

যুয়াং চুয়াং-এর গুরু শীলভদ্র বাঙালি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সর্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত অতি বিরল। ইহা বাঙালির গৌরবের বিষয় কিনা, তাহা আপনারাই বিবেচনা করিবেন।

অষ্টম গৌরব : বৌদ্ধ লেখক শান্তিদেব

আমি মনে করি যে, যিনি বৌদ্ধধর্মের কয়েকখানি খুব চলিত পুথি লিখিয়া গিয়াছেন, সেই মহাত্মা শান্তিদেব বাঙালি ছিলেন। কিন্তু তারনাথ আমার বিরোধী। তিনি বলেন, শান্তিদেবের বাড়ি সৌরাষ্ট্রে ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, আমি শান্তিদেবের যে অমূল্য জীবনচরিতখানি পাইয়াছি, তাহাতে কে তাঁহার জন্মভূমির নামটি কাটিয়া গিয়াছে, এমন করিয়া কাটিয়াছে যে, পড়িবার জো নাই। কিন্তু তাঁহার লীলাক্ষেত্র মগধের রাজধানী ও নালন্দা। তিনি যখন বাড়ি হইতে বাহির হন তাঁহার মা বলিয়া দিয়াছিলেন, 'তুমি মঞ্জুজ্ঞান লাভ করিবার জন্য মঞ্জুবজ্রসমাধিকে গুরু করিবে।' সৌরাষ্ট্রে মঞ্জুশ্রীর প্রাদুর্ভাব বড়ো শোনা যায় না। সেখানে বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবই বড়ো কম ছিল।

তাঁহাকে বাঙালি বলিয়া মনে করিবার আরো একটি কারণ আছে। নালন্দায় তাঁহার একটি 'কুটি' বা কুঁড়ে ঘর ছিল। লোকে দেখিত, তিনি যখন ভোজন করিতে বসিতেন, তাঁহার মুখ প্রসন্ন থাকিত, যখন শয়ন করিতেন, তাঁহার মুখ প্রসন্ন থাকিত, যখন কুটিরে বসিয়া থাকিতেন, তখনও তাঁহার মুখ প্রসন্ন থাকিত ; সেইজন্য :

> ভুঞ্জানোপি প্রভাস্বরঃ
> সুপ্তোপি প্রভাস্বরঃ
> কুটীং গতোপি প্রভাস্বরঃ।

এইজন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল 'ভুসুকু'। তিনি যখন মগধের রাজধানীতে থাকিতেন, তখন তিনি 'রাউতের' কার্য করিতেন। এমন কতকগুলি বাংলা গান আছে যাহার ভণিতায় লেখা আছে, 'রাউতু ভণই কট, ভুসুকু ভণই কট।' এখন এই রাউতু, ভুসুকু ও শান্তিদেব একই ব্যক্তি কিনা, ইহা ভাবিবার কথা। তিন জনই এক, ইহাই অধিক

আরো এক কথা, শান্তিদেব তিনখানি পুস্তক লিখিয়াছেন : ১. 'সূত্র-সমুচ্চয়', ২. 'শিক্ষাসমুচ্চয়' ও ৩. 'বোধিচর্যযাবতার'। শেষ দুইখানি পাওয়া গিয়াছে ও ছাপা হইয়াছে। প্রথমখানি এখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ভুসুকুর নামে আমরা আর একখানি বই পাইয়াছি, সেখানি ভুসুকুর লেখা। উপরের দুইখানির মতো এইখানিও সংস্কৃতে লেখা, তবে মাঝে মাঝে বাংলা আছে। উপরের দুইখানির মধ্যেও আবার 'শিক্ষাসমুচ্চয়ে' অনেক অংশ সংস্কৃত ছাড়া অপর আর-এক ভাষায় লেখা। এখন আপত্তি উঠিতে পারে যে, শান্তিদেবের যে দুইখানি পুস্তক ইতিপূর্বেই পাওয়া গিয়াছিল, সে দুইখানিই মহাযানের বই ; শেষে যেখানি পাওয়া গিয়াছে, সেখানি হয় বজ্রযানের, না-হয় সহজযানের। এক লোক কি দুই যানের পুস্তক লিখে? এ সম্বন্ধে বেন্‌ডল সাহেব [Cecil Bendall] বলেন যে, 'শিক্ষাসমুচ্চয়ে'ও তান্ত্রিকধর্মের অনেক কথা পাওয়া যায়। আমরাও দেখিয়াছি যে, বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযান মহাযান ছাড়া নয়। এই সকল যানের লোকেরা মনে করিত যে, 'আমরা মহাযানেরই লোক, কেবল আমরা মহাযানকে সহজ করিয়া তুলিয়াছি ও উহার অনেক উন্নতি করিয়াছি। এখনও নেপালি বৌদ্ধেরা বলে, 'আমরা মহাযান বৌদ্ধ।' কিন্তু তাহারা বাস্তবিক বজ্রযান বা সহজযানের উপাসক।

'বোধিচর্যাবতারে' শান্তিদেব বার বার বিপক্ষদের একটি কথা বলিয়া গালি দিয়াছেন। সে গালিটি কিন্তু বাংলা ছাড়া আর কোথাও শুনি নাই, সে কথাটি 'গূথ-ভক্ষক'। আমাদের দেশে দিনরাত্রি এই গালিটি শুনা যায়।

আরো কথা, একটি ভুসুকুর গান আছে :

আজ ভুসুকু তু, ভেলি বঙ্গালী।
নিজ ঘরিনী চণ্ডালী লেলী ॥

আজ ভুসুকু তুই সত্য সত্য বাঙালি হইয়াছিস ইত্যাদি।

এই সকল কারণে আমি শান্তিদেবকে আমাদের অষ্টম গৌরব মনে করি। তেঙ্গুর গ্রন্থে লেখা আছে, শান্তিদেবের বাড়ি জাহোর। জাহোর কোথায় জানি না, তবে উহার সন্ধান হওয়া আবশ্যক।

নবম গৌরব : নাথ-পন্থ

আমাদের দেশে এখন যেসব যোগীরা আছেন, তাঁহাদের সকলেরই উপাধি নাথ। তাঁহারা বলেন, 'আমরা এদেশে রাজাদের গুরু ছিলাম, ব্রাহ্মণেরা আমাদের গুরুগিরি কাড়িয়া লইয়াছে।' তাই এখন আবার তাঁহারা পইতা লইয়া ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টায় আছেন। নাথেদের আচার-ব্যবহার কিন্তু ব্রাহ্মণদের মতো নয়। এই জাতি কোথা হইতে আসিল, অনেক বৎসর ধরিয়া আমি অনুসন্ধান করিতেছি। রয়েল এশিয়াটিক্ সোসাইটির জার্নালে পুরানো পর্যায়ে ১৬শ খণ্ডে হজসন সাহেবের মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজন নাথের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়িয়া আমার প্রথম ধারণা হয় যে নাথপন্থ (Nathism) নামে এক প্রবল ধর্ম-সম্প্রদায় বহু শত বৎসর ধরিয়া বাংলায় এবং পূর্ব-ভারতে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছে। পূর্বে সকলেরই ধারণা ছিল যে, গোরক্ষনাথের 'হঠযোগপ্রদীপিকা'য় যে চৌদ্দজন নাথের নাম করা আছে, তাঁহারা সকলেই কবিরের সময়ের লোক। কবিরের সঙ্গে গোরক্ষনাথের কথাবার্তা লইয়া কবিরপন্থীদের একখানি বই আছে। ['গোরক্ষনাথ কী গোষ্ঠী'], সুতরাং গোরক্ষনাথ ও কবির এককালের লোক। কিন্তু বাসিলীফ [V. P. Vasilev] তিব্বতীয়-গ্রন্থমালা হইতে দেখাইয়া দিয়াছেন যে, গোরক্ষনাথ খ্রিস্টের আটশো বছর পরের লোক। নেপালে বৌদ্ধদিগের সংস্কার যে, সব নাথেরাই বৌদ্ধ ছিলেন, কেবল গোরক্ষনাথ বৌদ্ধধর্ম ছাড়িয়া শৈব হন। বৌদ্ধ অবস্থায় তাঁহার নাম ছিল রমণবজ্র, কী অনঙ্গবজ্র। ক্রমে খুঁজিতে খুঁজিতে 'কৌলজ্ঞানবিনিশ্চয়' [মহাকোলজ্ঞান বিনির্ণয়] নামে মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মচ্ছন্দপাদের 'অবতারিত' একখানি তন্ত্র পাইলাম। উহা যে অক্ষরে লেখা সে অক্ষর খ্রিস্টের নয় শত বৎসরের পর উঠিয়া গিয়াছে। তাহাতে কিন্তু বৌদ্ধধর্মের নামগন্ধও নাই। একখানি বৌদ্ধ-গ্রন্থে মীননাথের একটি বাংলা পদ তুলিয়া বলিয়াছে যে, ইহা পরদর্শনের মতো। আরো অনেক কারণ আছে, যাহাতে বেশ বোধ হয় যে, নাথেরা না-হিন্দু, না-বৌদ্ধ এমন একটি ধর্মমত প্রচার করেন।

শিব তাঁহাদের দেবতা। তাঁহাদের বইগুলি হরপার্বতী সংবাদে তন্ত্রের আকারে লেখা। তাঁহারাই সেইগুলি কৈলাস হইতে নামাইয়া লইয়া আসেন। তাঁহারাই হঠযোগ প্রচার করেন। নানারূপ আসন করিয়া যোগ করা তাঁহাদের ধর্ম। তাঁহাদের ধর্মের মূল কথাগুলি এখনও পাওয়া যায় নাই। যা-কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে, তাঁহারা লোককে গৃহস্থাশ্রম ছাড়িতেই পরামর্শ দিতেন। তাঁহাদের ধর্মে স্বর্গ-অপবর্গের দিকে তত ঝোঁক ছিল না। তাঁহাদের চেষ্টা সিদ্ধিলাভ। এই সিদ্ধি পরিণামে ভেলকি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মূল নাথেরা কী করিতেন জানা যায় না ; কিন্তু এখন অনেক নাথেরা ভেলকি দেখাইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইন্দ্রিয়সেবায় নাথেদের কোনো আপত্তি নাই।

এখন যোধপুরের মহামন্দির নাথেদের একটি প্রধান স্থান। নাথজি খুব বড়ো মানুষ। তাঁহার মহামন্দির একটি প্রকাণ্ড শহর, চারিদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। নাথজিদের মন্দিরে গিয়া দেখিলাম, নাথজিরা পূর্ব-পূর্ব নাথেদের পদচিহ্ন পূজা করেন। লোকে নাথজিদের দেবতা বলিয়া মনে করে। তাঁহারা বিবাহ করেন না, কিন্তু তাঁহাদের সন্তানসন্ততি হইবার কোনো আপত্তি নাই, মদমাংসেও তাঁহাদের কোনো আপত্তি নাই। নাথজির এক ভাটি মদ নামিতে দশ হাজার টাকা খরচ হয়।

নাথেরা যে বাংলা দেশের বা পূর্ব-ভারতের লোক, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ, মীননাথের একটি পদ পাইয়াছি, সেটি খাঁটি বাংলা। গোরক্ষনাথের লীলাক্ষেত্র বাংলাতেই অধিক। তাঁহারই চেলা হাড়িপা আমাদের ময়নামতী গানের নায়ক। মীননাথ যখন তাঁহার নিজের ধর্ম ভুলিয়া গিয়াছিলেন, গোরক্ষনাথই তখন তাঁহাকে সেকথা মনে করাইয়া দেন। মৎস্যেন্দ্রনাথকে অনেক সময়ে মচ্ছঘ্ননাথ বলে, অর্থাৎ তিনি জেলের ছেলে ছিলেন। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহার বাংলা দেশের লোক হওয়াই সম্ভব।

ক্রমে নাথপন্থ খুব প্রবল হইয়া উঠিলে বৌদ্ধেরা ও হিন্দুরা নাথেদের উপাসনা করিত। মৎস্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের নামগন্ধ না থাকিলেও তিনিই এখন নেপালি বৌদ্ধদিগের প্রধান দেবতা। তাঁহার রথযাত্রায় নেপালে যেমন ধুমধাম হইয়া থাকে, এমন আর-কোনো দেবতার কোনো যাত্রায় হয় না। গোরক্ষনাথের উপর নেপালি বৌদ্ধেরা সকলে খুশি না থাকিলেও অনেক বৌদ্ধেরা এখনও তাঁহার পূজা করে, তিব্বতেও তাঁহার পূজা হয়।

এই সকল কারণেই নাথপন্থকে আমি বাংলার নবম গৌরব বলিয়া মনে করি।

দশম গৌরব : দীপংকর শ্রীজ্ঞান

বাংলা দেশের দশম গৌরব দীপংকর শ্রীজ্ঞান। তাঁহার নিবাস পূর্ববঙ্গে বিক্রমণিপুর। তিনি ভিক্ষু হইয়া বিক্রমশীল বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হন। সে সময় মঠের অধ্যক্ষ তাঁহাকে সুবর্ণদ্বীপে প্রেরণ করেন। তিনি সুবর্ণদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করিয়া প্রসিদ্ধ হন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিলে তিনি বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ হন। তখন নালন্দার চেয়েও বিক্রমশীলের খ্যাতি-প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। অনেক বড়ো বড়ো লোক, অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিত, বিক্রমশীল হইতে লেখাপড়া শিখিয়া, শুধু ভারতবর্ষে নয়, তাহার বাহিরেও গিয়া বিদ্যা ও ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। বিক্রমশীল বিহারের রত্নাকর শান্তি একজন খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি নৈয়ায়িক ছিলেন। প্রজ্ঞাকরমতি, জ্ঞানশ্রী ভিক্ষু প্রভৃতি বহুসংখ্যক গ্রন্থকার ও পণ্ডিতের নাম বিক্রমশীলের মুখ উজ্জ্বল করিয়া

রাখিয়াছিল।

এরূপ বিহারের অধ্যক্ষ হওয়া অনেক সৌভাগ্যের কথা। দীপংকর অনেক সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অন্য যানাবলম্বীদিগের সহিত ঘোরতর বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন ও তাহাতে জয়লাভ করিতেন। এই সময় তিব্বত দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রায় লোপ হইয়া আসে ও বন-পার দল খুবই প্রবল হইয়া উঠে, তাহাতে ভয় পাইয়া তিব্বত দেশের রাজা বিক্রমশীল-বিহার হইতে দীপংকর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। দীপংকর দুই-একবার যাইতে অসম্মত হইলেও, বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া পরিণামে তথায় যাইতে স্বীকার করেন। তিনি যাইতে স্বীকার করিলে, তিব্বতরাজ অনেক লোকজন দিয়া তাঁহাকে সসম্মানে আপন দেশে লইয়া যান। যাইবার সময় তিনি কয়েক দিন নেপালে স্বয়ম্ভূক্ষেত্রে বাস করেন। তথা হইতে বরফের পাহাড় পার হইয়া তিনি তিব্বতের সীমানায় উপস্থিত হন। যিনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া নিজ দেশে লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার রাজধানী পশ্চিম-তিব্বতে ছিল। যে-সকল বিহারে তিনি বাস করিয়াছিলেন, সে-সকল বিহার এখনও লোকে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করে। ফ্রাঙ্কে সাহেব যে আর্কিয়লজিক্যাল রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন, তাহাতে দীপংকর শ্রীজ্ঞান বা অতিশার কর্মক্ষেত্র সকল বেশ ভালো করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। অতিশা যখন তিব্বত দেশে যান, তখন তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর। এরূপ বৃদ্ধ বয়সেও তিনি তিব্বতে গিয়া অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং তথাকার অনেক লোককে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে তিব্বতে নানা বৌদ্ধসম্প্রদায়ের উদয় হইয়াছে। তিব্বতে যে কখনও বৌদ্ধধর্ম লোপ পাইবে, এরূপ আশঙ্কা আর হয় নাই। তিনি তিব্বতে মহাযান মতেরই প্রচার করেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, তিব্বতিরা বিশুদ্ধ মহাযানধর্মের অধিকারী নয় ; কেননা, তখনও তাহারা দৈত্যদানবের পূজা করিত ; তাই তিনি অনেক বজ্রযান ও কালচক্রযানের গ্রন্থ তর্জমা করিয়াছিলেন ও অনেক পূজাপদ্ধতি ও স্তোত্রাদি লিখিয়াছিলেন। তেঙ্গুর ক্যাটালগে প্রতি পাতেই দীপংকর শ্রীজ্ঞান বা অতিশার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। আজিও সহস্র সহস্র লোকে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। অনেকে মনে করেন, তিব্বতীয়দিগের যা-কিছু বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা, এ সমুদায়ের মূল কারণ তিনিই। এরূপ লোককে যদি বাংলার গৌরব মনে না করি, তবে মনে করিব কাহাকে?

একাদশ গৌরব : জগদ্দল মহাবিহার ও বিভূতিচন্দ্র

রাইট সাহেব নেপাল হইতে কতকগুলি পুঁথি কুড়াইয়া লইয়া গিয়া কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিকে দেন। তাহার মধ্যে শান্তিদেবের 'শিক্ষাসমুচ্চয়' নামে একখানি পুথি

থাকে। পুথিখানি কাগজের, হাতের লেখা, অধিকাংশ বাংলা। বেন্ডল সাহেব যখন এই পুথিগুলির ক্যাটালগ করেন, তখন তিনি বলেন যে, এ পুথিখানি খ্রিস্টের জন্মের ১৪শো বা ১৫শো বছর পরে লেখা। তাহার পর তিনি যখন উহা ছাপান, তখন তিনি ভূমিকায় লেখেন, 'না, আর একশো বছর আগাইয়া যাইতে পারে, কাগজ কি এর চেয়েও পুরানো হবে?' বেন্ডল সাহেব একজন বড়ো লোক। তাঁহার সহিত আমার সদ্ভাব ছিল ; তিনি ও আমি দুই জনে একবার নেপাল গিয়াছিলাম [১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে]। তথাপি এ জায়গায় আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি না। আমি নেপালে এর চেয়েও পুরানো কাগজের পুথি দেখিয়াছি এবং দুই-একখানি আনাইয়াছি। সুতরাং কাগজ বলিয়া যদি পুথিখানি নূতন হয়, তাহা হইলে আমি তাহাতে রাজি নই। ডা. হার্নলি সম্প্রতি দেখাইয়াছেন যে, অনেক পূর্বে নেপালে 'কায়গদ' ছিল। 'কায়গদ' শব্দটি চিনের। আমরা কাগজ পরে পাইয়াছি, কেননা আমরা উহা সরাসরি চিন হইতে পাই নাই, মুসলমানদের হাত হইতে পাইয়াছি, মুসলমানেরা চিন হইতে পাইয়াছিল। মুসলমানেরা কায়গদ শব্দটিকে কাগজ করিয়া তুলিয়াছে।

পুথিখানির শেষে লেখা আছে, 'দেয় ধর্মোয়ং প্রবরমহাযানযায়িনো জাগদ্দল পণ্ডিত বিভূতিচন্দ্রস্য' ইত্যাদি।

বেন্ডল সাহেব বলিয়াছেন, 'মহাযানপন্থী জগদ্দল পণ্ডিত বিভূতিচন্দ্র কে আমি জানি না।' ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে আমি আবার নেপালে গিয়া কয়েকখানি পুথিতে জগদ্দল-মহাবিহারের নাম পাই ; কিন্তু আমিও তখন সে মহাবিহার কোথায়, কী বৃত্তান্ত জানিতাম না। সেই বারে আমি বিভূতিচন্দ্রেরও নাম পাই। তিনি 'অমৃতকর্ণিকা' নামে 'নামসংগীতির' একখানি টীকা করেন, ওই টীকা কালচক্রযানের মতে লিখিত হয়।

তাহার পর 'রামচরিত' কাব্য ছাপাইবার সময় জানিতে পারি, রামপাল রামাবতী নামে যে নগর বসান, 'জাগদ্দল মহাবিহার' তাহারই কাছে ছিল। উহা গঙ্গা ও করতোয়ার সঙ্গমের উপরেই ছিল। এখন করতোয়া গঙ্গায় পড়ে না, পড়ে যমুনায় ; গঙ্গাও এক সময় বুড়িগঙ্গা দিয়া যাইত। তাই ভাবিয়াছিলাম, রামপাল নামে মুন্সিগঞ্জে যে এক পুরানো গ্রাম আছে, হয়তো সেই রামাবতী ও জগদ্দল উহারই নিকটে কোথাও হইবে। আমি একথা প্রকাশ করার পর, অনেকেই জগদ্দল খুঁজিতেছেন, কেহ মালদহে, কেহ বগুড়ায় ; কিন্তু খোঁজ এখনও পাওয়া যায় নাই, পাওয়া কিন্তু নিতান্ত দরকার। কারণ, মগধে যেমন নালন্দা, পেশোয়ারে যেমন কনিষ্ক-বিহার, কলম্বোতে যেমন দীপদন্তম-বিহার, সেইরূপ বাংলার মহাবিহার জগদ্দল। তেঙ্গুরে কোথাও লেখে উহা বরেন্দ্রে ছিল, কোনো কোনো জায়গায় লেখে বাংলায়, কোনো কোনো জায়গায় লেখে পূর্ব-ভারতে।

যাহা হউক উহা একটি প্রকাণ্ড বিহার ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। রামপালই যে

ওই বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। এই বিহারে অনেক বড়ো বড়ো ভিক্ষু থাকিতেন, তাহাদের মধ্যে বিভূতিচন্দ্রই প্রধান। বিভূতিচন্দ্র অনেকগুলি সংস্কৃত বৌদ্ধ-গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনী লিখিয়া ছিলেন। যখন তিব্বত দেশে এই সকল বৌদ্ধ-গ্রন্থ তর্জমা হইতেছে, তখন তিনি অনেক পুস্তকের তর্জমায় সাহায্য করিয়াছেন এবং নিজেও দুই চারিখানি পুস্তক তর্জমা করিয়াছেন। জগদ্দলের আর-একজন মহাভিক্ষুর নাম দানশীল। তিনিও এইরূপ অনেক পুস্তক তর্জমায় সাহায্য করিয়াছেন। সুতরাং তিব্বতওয়ালারা যে এক সময় জগদ্দল-ভিক্ষুদের উপর অনেকটা নির্ভর করিত, সেটা বেশ বুঝা যায়।

সম্প্রতি শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে একখানি কেঙ্গুরের পুস্তক কিনিয়া সাহিত্য-পরিষদকে উপহার দিয়াছেন, 'সোসাইটির' লামা বলেন, সে পুস্তকখানি হাতের লেখা, কাঠের ছাপা নয়, ১০২৬ বৎসর পূর্বে পুস্তকখানি লেখা হয়, দানশীল উহা তর্জমা করেন। এ দানশীল যদি জগদ্দলের দানশীল হন, তাহা হইলে জগদ্দল বিহারও পুরানো, বিভূতিচন্দ্রও পুরানো, আর বেন্ডল সাহেবের পুথিও, তিনি যে সময় বলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আরো তিন-চারি শত বৎসর পুরানো। তাই বলিতেছিলাম, জগদ্দল বিহার ও বিভূতিচন্দ্র বাংলার গৌরবের জিনিস।

দ্বাদশ গৌরব : লুইপাদ ও তাঁহার সিদ্ধাচার্যগণ

বাংলার দ্বাদশ গৌরব লুইপাদ[৬৬] ও তাঁহার সিদ্ধাচার্যগণ। লুইপাদের কথা পূর্বে দুই-একবার বলিয়াছি। তিনি আদি-সিদ্ধাচার্য ছিলেন। অনেক জায়গায় তাঁহাকে আদি-সিদ্ধাচার্য বলিয়াছেন। তাঁহার বাড়ি বাংলায় ছিল। রাঢ় দেশে এখনও তাঁহার নামে পূজা হয়, তাঁহার নামে পাঁঠা ছাড়িয়া দেয়। ময়ূরভঞ্জেও তাঁহার পূজা হয়, তিব্বতিরা তাঁহাকে সিদ্ধাচার্য বলিয়া পূজা করে। তিনি অনেক বাংলা গান লিখিয়াছেন, অনেক সংস্কৃত বৌদ্ধ-গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনীও লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি একটি সম্প্রদায়ই সৃষ্টি করিয়াছেন। সে সম্প্রদায় হয় সহজযান হইবে, না হয় সহজযানেরই কোনো ভাগ হইবে।

সিদ্ধাচার্যগণ এককালে যে বাংলায় ও পূর্ব-ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার আমরা একটি প্রমাণ পাইয়াছি। খ্রিস্টের জন্মের ১৩ শত বৎসর পরে হরিসিংহ নামে একজন রঘুবংশী মিথিলায় রাজা হইয়াছিলেন। তিনি এক সময় নেপাল আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ভয়ে বাংলা ও দিল্লির মুসলমানেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পরিণামে তাঁহারই বংশের সন্তান নেপালে রাজা হন। হরিসিংহের মন্ত্রী চণ্ডেশ্বর অনেকগুলি স্মৃতির পুস্তক লেখেন। তাঁহার সভায় একজন কবি ছিলেন, তিনি সংস্কৃতে

বেশ প্রহসন লিখিতেন। ইঁহার নাম জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য। ইনি বোধ হয় বাংলাতেও কবিতা লিখিতেন। ইঁহার আধা-বাংলা, আধা-সংস্কৃত একখানি অপূর্ব পুস্তক আছে, তাহার নাম 'বর্ণনরত্নাকর'। কবিতা লিখিতে গেলে কাহার কিরূপ বর্ণনা করিতে হয়, সেই বিষয়ে উপদেশ দেওয়া পুস্তকের উদ্দেশ্য। তিনি ওই পুস্তকে চৌরাশি সিদ্ধের নাম করিতে গিয়া ৭৬ জনের নামমাত্র করিয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে লুইয়ের অনেকগুলি শিষ্যের নাম আছে। হরিসিংহের সময় পর্যন্ত লুইয়ের দল যে চলিয়া আসিতেছিল, ইহাতেই বোধ হয়, লুই একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন।

তেঙ্গুরে লেখা আছে যে, লুইকে মৎস্যান্ত্রাদ বলিত, অর্থাৎ, তিনি মাছের পোঁটা খাইতে বড়োই ভালোবাসিতেন। (কোন্ বাঙালিই বা না বাসেন।) তেঙ্গুরে আবার সেইখানেই লেখা আছে, 'তাই বলিয়া লুই মৎস্যেন্দ্রনাথ নহেন, মৎস্যেন্দ্রনাথ মীননাথের পুত্র, লুই মহাযোগীশ্বর।'

সিদ্ধাচার্যগণের মধ্যে লুই, কুক্কুরী, বিরুআ, গুড়বি, চাটিল, ভুসুকু, কাহ্নু, কামলি, ডোম্বি, শান্তি, মহিত্তা, বীণা, সরহ, শবর, আযদেব, ঢেনঢন, দারিক, ভাদে, তাডক এই কয়জনের 'চর্যাপদ' বা কীর্তনের গান পাওয়া গিয়াছে। ওই সকল পদ মুসলমান-বিজয়ের পূর্বেই দুর্বোধ হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সহজিয়া মতে উহার সংস্কৃত টীকা করিতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও বহু-সংখ্যক দোহাকোষ ছিল। ওই-সকল দোহাকোষেরও সংস্কৃত টীকা ছিল। অনেকগুলি দোহাগীতিকা ছিল, তাহারো সংস্কৃত টীকা ছিল এই সমস্তেরই ভুটিয়া ভাষায় তর্জমা আছে। যে কয়জন সিদ্ধাচার্যের নাম করিলাম, ইঁহাদের সকলেরই গ্রন্থ আছে, সমস্তই ভুটিয়া ভাষায় তর্জমা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভুটিয়া ভাষাগ্রন্থ, বিশেষ তেঙ্গুর গ্রন্থ খুঁজিলে যে শুধু বাঙালিদের ধর্মমত পাওয়া যাইবে, এমন নয়, বাংলা সাহিত্যেরও একটি ইতিহাস পাওয়া যাইবে। বাঙালির পূর্বপুরুষের কথা বাঙালি কিছুই জানেন না, কিন্তু তাঁহাদের শিষ্য ভুটিয়ারা বিশেষ যত্ন করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থ রক্ষা করিতেছে। এটা বাঙালির কলঙ্কের কথা হইলেও তাঁহার পূর্বপুরুষগণের বিশেষ গৌরব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সিদ্ধাচার্যগণের কথা, তাঁহাদের গানের কথা, তাঁহাদের দোহার কথা, তাঁহাদের ধর্মের কথা, আগেও দুই-একবার বলিয়াছি, আবার তো খুলিয়া বলিতে হইবে, তাই এইখানেই এবারকার মতো বিশ্রাম।

ত্রয়োদশ গৌরব : ভাস্করের কাজ

বাংলার ত্রয়োদশ গৌরব ভাস্কর-শিল্প। মহাযান হইতে যতই নূতন নূতন ধর্ম বাহির হইতে লাগিল, হিন্দুদের মধ্যে যতই তন্ত্রের মত প্রবেশ করিতে লাগিল, ততই নূতন নূতন দেবতা, নূতন নূতন বুদ্ধ, নূতন নূতন বোধিসত্ত্ব-পূজা আরম্ভ হইল। এক-এক

দেবতারই নানা মূর্তি হইতে লাগিল, কখনো ক্রোধমূর্তি, কখনও শান্তমূর্তি, কখনও করুণামূর্তি, নানারূপ মুদ্রা বাহির হইতে লাগিল। সে-সকল মুদ্রার, সে-সকল মূর্তির ও সে-সকল দেবতার নাম অসংখ্য। বৌদ্ধদের এক সাধনমালায় ২৫৬ রূপ মূর্তির সাধনের কথা বলা আছে। তেঙ্গুরে ১৭৯ বাণ্ডিলে প্রায় ১৬৬ দেবতার সাধন আছে। নেপালের চিত্রকর জাতির লোকে এখনও এই-সকল দেখিয়া মূর্তি আঁকিয়া দিতে পারে। বাংলায় এরূপ আঁকিয়া দিবার লোক কত ছিল বলা যায় না। পাথর তাহারা মোমের মতো ব্যবহার করিত। পাথর দিয়া যে তাহারা কত রকম মূর্তি গড়িয়া দিত, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। এই মূর্তিবিদ্যার ইংরেজি নাম Iconography। সেদিন একজন প্রসিদ্ধ Iconographist এক সভায় বলিয়াছেন যে, মূর্তিবিদ্যা শিখিবার একমাত্র জায়গা বাংলা। বাস্তবিকই হিন্দু ও বৌদ্ধগণের কত মূর্তিই যে ছিল, আর কত মূর্তিই যে পাথরে গড়া হইত, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়। বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি অনেক মূর্তি সংগ্রহ করিয়াছেন। সাহিত্য পরিষদেও অনেক মূর্তি সংগ্রহ হইয়াছে। সকল মিউজিয়ামেই কিছু কিছু মূর্তি সংগ্রহ আছে, তথাপি বনে, জঙ্গলে, পুরানো গ্রামে, পুরানো নগরে এখনও গাড়ি গাড়ি মূর্তি পাওয়া যাইতে পারে। এই সকল মূর্তির এখন আর পূজা হয় না। সুতরাং মিউজিয়ামই তাহাদের উপযুক্ত স্থান। যে-সকল মূর্তির এখনও পূজা হয়, তাহাই বা কত সুন্দর! এক-একটি কৃষ্ণমূর্তির ভাব দেখিলে সত্য সত্যই মোহিত হইতে হয়। এখনও ভাস্করেরা নানারূপ সুন্দর সুন্দর মূর্তি নির্মাণ করিয়া থাকে। দাঁইহাটের ভাস্করদের কথা তো সকলেই জানেন। চৈতন্যের সময়েও চমৎকার চমৎকার মূর্তি নির্মাণ হইত। পালরাজাদের সময়েই এই ভাস্কর-শিল্পের চরম উন্নতি হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সর্বত্রই এখানকার ভাস্করেরা কার্য করিত। তাম্রপত্রলেখা, শিলালেখ বারেন্দ্র কায়স্থদিগের যেন একচেটিয়াই হইয়াছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও মূর্তি নির্মাণ হইত। মহিশূর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি দেশেও নানারূপ মূর্তি পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহাতে সাজসজ্জাই বেশি; গহনা, ফুল, সাজ, ইহাতেই পরিপূর্ণ ভাব, দেখাইবার চেষ্টা খুব কম। যেভাবে ভাবুকের মন মুগ্ধ করে, সেভাবে কেবল বাংলাতেই ছিল, কতক কতক এখনও আছে। অনেক সময় মূর্তি দেখিলে মনে হয় যে, উহা কথা কহিতেছে। অনেক সময় মনে হয় যেন উহা এই নৃত্য করিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণ বাঁশি হাতে দাঁড়াইয়া আছেন, আমরা যেন সে বাঁশির আওয়াজ শুনিতেছি। শিল্পের এত উন্নতি অল্প সাধনার ফল নয়। বাঙালি এককালে সে সাধনা করিয়াছিল, তাহার ফলও পাইয়াছে। শুধু পাথরে নয়, পিতলে, তামায়, রূপায়, সোনায়, অষ্টধাতুতে, যাহাতেই বলো, মূর্তিগুলি যেন সজীব।

চৈতন্যদেবের পর গরিব বৈষ্ণবেরা কাঠের ও মাটির মূর্তি তৈয়ার করিত। মহাপ্রভুর দুই-একটি কাঠের মূর্তি দেখিলে সত্যসত্যই মনে হয়, মহাপ্রভু কথা কহিতেছেন, ঠোঁট

দুটি যেন নড়িতেছে। চৈতন্যের কীতর্নমূর্তি অনেকেই দেখিয়াছেন, কী সুন্দর। মাটির মূর্তিতে কৃষ্ণনগরের কুমারেরা এখনও বোধ হয় ভারতে অদ্বিতীয়। একজন ইউরোপের ওস্তাদ কতকগুলি মাটির গড়া মানুষের মূর্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইহারা সত্য সত্যই অনেক দিন ধরিয়া মানুষের শিরা-ধমনী পর্যন্ত তলাইয়া দেখিয়াছে ও বুঝিয়াছে।'

চতুর্দশ গৌরব : বাংলায় সংস্কৃত

মুসলমান আক্রমণের পূর্বে বাংলায় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। ভবদেব একজন প্রকাণ্ড পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃতে যাহা কিছু পড়িবার ছিল, তিনি যেন সবই পড়িয়াছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার প্রশস্তি লিখিয়াছেন। সেই প্রশস্তিতে যাহা লেখা আছে, তাহা যদি চারি ভাগের এক ভাগও সত্য হয়, তাহা হইলেও ভবদেব যে দেশে জন্মিয়াছিলেন, সে দেশ ধন্য। তাঁহার কত পুস্তক ছিল, আমরা এখনও জানিতে পারি নাই। তবে সামবেদীদের পদ্ধতি ছাড়া তাঁহার আরো দশ বারো খানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

লোকে বলে বাংলায় বেদের চর্চা ছিল না, এ কথা সত্য। অন্য জায়গায় যেমন সমস্ত বেদটা মুখস্থ করে, বাঙালিরা তাহা করিত না, তাহারা তত আহম্মুক ছিল না। তাহারা যেটুকু পড়িত, অর্থ করিয়া পড়িত ; নিজের কর্মকাণ্ডের জন্য যতখানি জানা দরকার, সবটুকু বেশ ভালো করিয়া পড়িত। সুতরাং প্রথম বেদের ব্যাখ্যা বাংলাতেই হয়। সায়ণাচার্যের দুই-তিন শত বৎসর পূর্বে নুগড়াচার্য এক নূতন ধরনের বেদব্যাখ্যা সৃষ্টি করেন। নুগড়ের পুস্তক এখনও পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তাঁহার সম্প্রদায়ের পুস্তক অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। হলায়ুধ তাঁহার সম্প্রদায়ের, গুণবিষ্ণু তাঁহার সম্প্রদায়ের। ইঁহাদের ব্যাখ্যা বেশ পরিষ্কার ও বেশ সুগম।

দর্শনশাস্ত্রে বৌদ্ধদের সঙ্গে সর্বদাই তাঁহাদের বিচার করিতে হইত। সুতরাং বাঙালি ব্রাহ্মণমাত্রকেই দর্শনশাস্ত্রের কিছু চর্চা রাখিতে হইত। শ্রীধরের লেখা প্রশস্তপাদের টীকা এখন ভারতবর্ষে খুব প্রচলিত।

স্মৃতিতে গৌড়ীয় মতই একটা স্বতন্ত্র ছিল। কাশী, মিথিলা ও নেপাল দেশের প্রাচীন স্মৃতি-নিবন্ধে অনেকবার গৌড়ীয় মতের নাম করিয়াছে। মনুর টীকাকার গোবিন্দরাজ যে 'স্মৃতিমঞ্জরী' বলিয়া এক প্রকাণ্ড স্মৃতি-নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িলে আশ্চর্য হইতে হয়। আমরা উহার যে পুথিখানি পাইয়াছি, তাহা খ্রি. ১১৪৫ সালে কাপি করা। দায়ভাগকার জীমূতবাহন, জিকন, শ্রীকর প্রভৃতি অনেক স্মৃতি-নিবন্ধকারের ও জোগ্লোক, অন্ধুক ভট্ট প্রভৃতি অনেক জ্যোতিষ নিবন্ধকারের নাম করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে যাহা করিয়া তুলিয়াছেন, সেই তো একটি অদ্ভুত

জিনিস। সম্পত্তি পূর্বে বংশগত ছিল, তিনি তাহাকে ব্যক্তিগত করিয়া গিয়াছেন, এ কাজটি তো ভারতে আর-কেহই করিতে পারেন নাই। বল্লালও তো নিজে দুখানি বিরাট গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, একখানি 'দানসাগর' ও আর একখানি 'অদ্ভুতসাগর'। শ্রীনিবাসাচার্যের শুদ্ধির গ্রন্থও তো স্মৃতি ও জ্যোতিষের একখানি ভালো বই।

পঞ্চদশ গৌরব : বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ ও রঘুনন্দন

ধর্মের গৌরব, বিদ্যার গৌরব ও শিল্পের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া বৌদ্ধগণ ও হিন্দুগণ বাংলা দেশে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন। বৌদ্ধেরা তিব্বতে গিয়া সেখানে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন, ব্রাহ্মণেরাও বাংলায় নূতন সমাজের সৃষ্টি করিতেছিলেন। এমন সময় ঘোর বন্যার ন্যায় আফগান দেশ হইতে মুসলমানেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বন্যায় রাজা-প্রজা, বৌদ্ধ-হিন্দু, বজ্রযান-সহজযান, ন্যায়-স্মৃতি, দর্শন-বিজ্ঞান, সব ভাঙিয়া, ভাসিয়া গেল। বাঙালি বিহারি শিল্পের ভালো ভালো জিনিসগুলি, বড়ো বড়ো অট্টালিকা, বড়ো বড়ো মন্দির, দেবমূর্তি, মনুষ্যমূর্তি, ক্রোধমূর্তি, শান্তমূর্তি, হিন্দুমূর্তি, বৌদ্ধমূর্তি, তালপাতার পুথি, ভূর্জপত্রের পুথি, ছালের পুথি, তেড়েতের পুথি, নানারূপ চিত্র, নানারূপ কারুকার্য, সব নাশ হইয়া গেল। ওদন্তপুরে মুসলমানেরা সিপাই বলিয়া হাজার হাজার বৌদ্ধ-ভিক্ষুকে মারিয়া ফেলিল কেল্লা বলিয়া মহাবিহারটিকে সমভূম করিয়া দিল, বৌদ্ধ-মূর্তি ও যাত্রার সাজ-সজ্জা সব লুটিয়া লইয়া গেল, সোনারূপার মূর্তিগুলি গালাইয়া ফেলিল, পুথিগুলি পুড়াইয়া ফেলিল। প্রতি বিহারেই এইরূপ হইতে লাগিল। ওদন্তপুরের বিহার এখানও চেনা যায়, সে জায়গাটা এখনও তিরিশ ফুট উঁচু ; নালন্দার নাম পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে। পাশের একটি ক্ষুদ্র পল্লিগ্রামের নামে তাহার নাম হইয়াছে 'বড়গাঁয়ের ঢিবি'; বিক্রমশীলার সন্ধানও পাওয়া যায় নাই ; জগদ্দল খুঁজিয়া মিলিতেছে না ; মুসলমানেরা এমনি করিয়া নষ্ট করিয়াছে যে, তাহাদের স্মৃতি পর্যন্ত লোপ পাইয়াছিল। ভাগ্যে নেপাল ছিল, তিব্বত ছিল, তাই এতদিনের পর তাহাদের স্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। ভাগ্যে ইংরাজ রাজা হইয়াছেন, তাই খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া আমরা আমাদের পূর্বগৌরবের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইতেছি।

পুষ্যমিত্রের ঘোরতর হত্যাকাণ্ডেও যে ধর্মের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই, কুমারিল, শংকরের প্রাণপণ চেষ্টাতেও যে ধর্ম পূর্ব-ভারতে অক্ষুণ্ণ ছিল, ব্রাহ্মণদের নিরন্তর বিদ্বেষ সত্ত্বেও যে ধর্ম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, এক মুসলমান আক্রমণেই সে ধর্ম শুধু যে ধ্বংস হইল তাহা নয়, বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া গেল। লাভ হইল মঙ্গলিয়ার, লাভ হইল তিব্বতের, লাভ হইল পূর্ব-উপদ্বীপের, লাভ হইল সিংহলের। তলোয়ারের

মুখ হইতে যাহারা অব্যাহতি পাইয়াছিল, তাহারা ওই সকল দেশে গিয়া আশ্রয় লইল। তাহাদিগকে পাইয়া ওই সকল দেশ কৃতার্থ হইয়া গেল ; তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি হইল, ধর্ম বুদ্ধি হইল, জ্ঞান বৃদ্ধি হইল, শিল্প বৃদ্ধি হইল ; ক্ষতি যাহা হইবার তাহা বাংলারই হইয়া গেল!

দুই শত বৎসর পর্যন্ত বাঙালিরা প্রাণের ভয়ে অস্থির হইয়া আপন দেশে বাস করিতে লাগিল। এই সময় দেশের কী অবস্থা হইয়াছিল, কুলগ্রন্থই তাহার সাক্ষী। দুই শত বৎসর নিরন্তর মারামারি কাটাকাটির পর একবার একজন হিন্দু বাংলার রাজা হইয়াছিলেন। অমনি আবার হিন্দু সমাজে সংস্কৃত সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য জাগিয়া উঠিল। যে মহাপুরুষের একান্ত আগ্রহ, একান্ত যত্ন ও দূরদর্শিতার ফলে সংস্কৃত সাহিত্য আবার বাঁচিয়া উঠে, তাঁহার নাম বৃহস্পতি, উপাধি রায়মুকুট। তিনি নিজে অনেক সংস্কৃত কাব্যের টীকা লিখিয়া একখানি স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করিয়া, অমরকোষের টীকা লিখিয়া, অনেক পণ্ডিতকে প্রতিপালন করিয়া, আবার সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই কার্যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন শ্রীকর। ইনিও বৃহস্পতির ন্যায় নানা গ্রন্থ রচনা করেন এবং দুইজনে মিলিয়া অমরকোষের আর একখানি টীকা লিখেন। শ্রীকরের পুত্র শ্রীনাথ পুরা এক সেট নিবন্ধ সংগ্রহ করিয়া আবার হিন্দু সমাজ বাঁধিবার চেষ্টা করেন। তিনি বিশেষরূপ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার শিষ্য রঘুনন্দন সমাজ বাঁধিয়া দিয়া গেলেন। তাঁহার বাঁধা সমাজ এখনও চলিতেছে। বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ ও রঘুনন্দন আমাদের সমাজ বাঁধিয়া দিয়াছেন বলিয়া আমরা আজিও হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেছি। ইঁহারা আমাদের পূজা নমস্য এবং গৌরবের স্থল।

ষোড়শ গৌরব : ন্যায়শাস্ত্র

মুসলমান আক্রমণে অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায়, দর্শনশাস্ত্রও লোপ হইয়াছিল। রাজা গণেশের পর হইতে যে আবার সংস্কৃত চর্চা আরম্ভ হইল, তাহার ফলে ন্যায়ের চর্চা আরম্ভ হইল। এই চারি শত বৎসরের মধ্যে বাংলার ন্যায়শাস্ত্র ভারতবর্ষময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের যেখানেই যাও। যিনি নৈয়ায়িক, তিনি কিছু-না-কিছু বাংলা কথা কহিতে পারেন। নবদ্বীপে না আসিলে তাঁহাদের চলে না। সুতরাং তাঁহাদের নবদ্বীপে আসিতেও হয়, বাংলা ভাষা শিখিতেও হয়। দেশে গিয়া যদিও বাংলা ভুলিয়া যান তথাপি বাঙালি দেখিলেই আবার তাঁহাদের দুটা বাংলা কথা কহিবার ইচ্ছা হয়। কাশ্মীর যাও, পাঞ্জাব যাও, নেপাল যাও, হিন্দুস্থান যাও রাজপুতানা যাও, মান্দ্রাজ যাও, মহীশূর যাও, ত্রিবাঙ্কুর যাও, নৈয়ায়িকের মুখে দুচারটি বাংলা কথা শুনিতে পাইবে। বাঙালির

এটা বড়ো কম গৌরবের কথা নয়। ভারতে বাঙালির এই প্রাধান্য যাঁহারা করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই আমাদের পূজা ও নমস্য। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম বাসুদেব সার্বভৌম। তিনি কিন্তু কেনো গ্রন্থ রাখিয়া যান নাই বা তাঁহার কোনো গ্রন্থ চলিত হয় নাই। দ্বিতীয় রঘুনাথ শিরোমণি। ইঁহার বুদ্ধি খুরের ধারের মতো সূক্ষ্ম ছিল। তিনি ন্যায় ও বৈশেষিক সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইঁহার 'তত্ত্বচিন্তামণি'র টীকাই লোকে বেশি জানে। তিনি যে শুধু বাসুদেব সার্বভৌম ও পক্ষধর মিশ্রের নিকট পড়িয়াছিলেন, এমন নহে, তিনি মহারাষ্ট্র দেশে যাইয়া রামেশ্বরের নিকটও পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্র যে শুধু বাংলা দেশেই ছিল, এমন নহে, দ্বারবঙ্গের রাজার পূর্বপুরুষ মহেশ পণ্ডিতও তাঁহার ছাত্র ছিলেন। শিরোমণির পর আমাদের দেশের লোক হরিরাম, জগদীশ ও গদাধরকেই চিনে ও ইঁহাদের টীকা-টিপ্পনী পাঠ করে। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে এককালে ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের বড়োই আদর হইয়াছিল। মহাদেব পুন্তামকর ভবানন্দের টীকারই টীকা লিখিয়াছেন ও সেই টীকা এখনো দুই-চারি জায়গায় চলে। ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থকারদিগের মধ্যে সকলের শেষ বিশ্বনাথ। তিনি কয়েকটি কারিকার মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের সমস্ত দুরূহ সিদ্ধান্তের যেরূপ সমাবেশ করেন, তাহা দেখিয়া সকল দেশেরই লোক আশ্চর্য হইয়া যায়। এখনও তাঁহার তিন শত বৎসর পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু ভারতের সর্বত্রই তাঁহার কারিকা ও তাঁহার 'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী' চলিতেছে। বাংলায় তাঁহার টীকাকার কেহ জন্মে নাই, তাঁহার টীকাকার একজন মারহাট্টি, তাঁহার নাম মহাদেব দিনকর। এখন বলিতে গেলে, এই নৈয়ায়িকগণই এখনও ভারতে বাংলার নাম বজায় রাখিয়াছেন। কারণ, বাংলার স্মার্তকে অন্য দেশের লোকের চিনিবার দরকার নাই, কিন্তু বাংলার নৈয়ায়িকদের না চিনিলে ভারতবর্ষে কাহারো চলে না।

সপ্তদশ গৌরব : চৈতন্য ও তাঁহার পরিকর

বৌদ্ধ মতগুলি যখন ক্রমে ক্রমে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল, বিলুপ্তই বা বলি কেন, ধ্বংস হইয়া গেল, তখন বৌদ্ধধর্মের কী দশা হইল? পাদরি না থাকিলে খ্রিস্টানদের যে দশা হয়, ব্রাহ্মণ না থাকিলে হিন্দুদের যে দশা হয়, মৌলবি না থাকিলে মুসলমানদের যে দশা হয়, বৌদ্ধধর্মের ঠিক সেই দশা হইল। বাহির হইতে কেহ উহা আক্রমণ করিলে রক্ষা করিবার লোক রহিল না। ভিতরে গোলযোগ হইলে তাহার সংস্কার করিবার লোক রহিল না। রহিল কেবল মূর্খ পুরোহিতকুল, আর অসংখ্য কৃষক, বণিক ও কারিকর। মুসলমানেরা জোর করিয়া অনেককে মুসলমান করিয়া ফেলিল। প্রায়ই দেখা যায়, যেখানে বড়ো বড়ো বিহার ছিল, অনেক নিষ্কর জমি বিহারওয়ালার ভোগ করিত। মুসলমানেরা সে-সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া আফগান

সিপাহিদিগকে ভাগ করিয়া দিল। ওদন্তপুর ও নালন্দার জমি লইয়া মল্লিক নামে এক মুসলমান-কুলেরই উৎপত্তি হইয়াছে। বাংলার বিহারের খবর জানি না, তবে একটা খবর জানি বলিয়া বোধ হয়। বালাণ্ডা পরগনায় খুব ভালো মাদুর হয় ; তখনও হইত, এখনও হয়। সেখানে একটি বৌদ্ধ-বিহার ছিল, অনেক ভিক্ষু ছিল, পুথি কাপি হইত, ঠাকুর দেবতার পূজা হইত। বালাণ্ডার একখানি 'অষ্টমসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' এখনও নেপাল-দরবার লাইব্রেরিতে আছে, বালাণ্ডার বৌদ্ধ-কীর্তির এইমাত্র স্মৃতি জাগরূক আছে। এখন সেই বালাণ্ডায় সব মুসলমান। মুসলমানেই মাদুর বুনে, মাদুর বুনিবার জন্য এক ঘরও হিন্দু নাই। বিহারগুলি এইরূপে শুধু যে ধ্বংস হইল এমন নহে, সেখানে মুসলমান আসিয়া বসিল এবং তাহারা অনায়াসেই চারি পাশের লোককে মুসলমান করিয়া ফেলিল। তাই আজ বাংলায় অর্ধেকের উপর মুসলমান।

বাকি যাহারা ছিল, তাহারা হিন্দু হইয়া গেল। তাহাদিগকে হিন্দু করিল কে? ব্রাহ্মণেরা। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের তো এ বিষয়ে কৃতিত্ব আছেন, সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই দল ব্রাহ্মণ তাহাদের সহায় হইলেন। একদলের নেতা চৈতন্য, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ। আর-এক দলের নেতা গৌড়ীয় শংকর, ত্রিপুরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ ও আগমবাগীশ। একদল বৈষ্ণব, আর একদল শাক্ত।

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চৈতন্যদেব একটি প্রকাণ্ড সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে বাঙালি ছিলেন, তাঁহার পরিকরও প্রায় সবই বাঙালি। ইঁহারা অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং বাংলা ভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রূপ, সনাতন, জীব গোপাল ভট্ট, কবিকর্ণপুর, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ হইতে আরম্ভ করিয়া উপেন্দ্র গোস্বামী পর্যন্ত কত লোক যে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। বাংলার তো কথাই নাই। বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া রঘুনন্দন গোস্বামী পর্যন্ত কত কত বৈষ্ণব লেখক বাংলায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বাংলা ভাষাকে মার্জিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, নূতন জীবন দিয়া গিয়াছেন। বাংলায় বৈষ্ণবদিগের প্রধান কীর্তি—কীর্তনের পদ। বৌদ্ধদিগের চর্যাপদের অনুকরণে এই সকল পদাবলির সৃষ্টি। পদাবলির পদকর্তা অসংখ্য। রাধামোহন দাস ৮০০, ৮৫০ পদ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার দুই পুরুষ পরে বৈষ্ণবদাস ৩৩০০ পদ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, এখনও সংগ্রহ করিলে ২০ হাজারেরও অধিক হইবে। ভাবের মাধুর্যে, ভাষার লালিত্যে, সুরের বৈচিত্র্যে এই সকল গান সকল সমাজেরই পরম আদরের জিনিস। এই সকল পদ গান করিবার জন্য নানারূপ কীর্তনের সৃষ্টি হইয়াছে। সেকালে যেমন বাংলায় নাটকের একটা স্বতন্ত্র 'প্রবৃত্তি' ছিল, এখনও কীর্তনের সেইরূপ নানারূপ 'প্রবৃত্তি' হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুইটি প্রধান, মনোহরশাহি ও রেনেটি।

'ভক্তিরত্নাকরে' লেখা আছে যে, শ্রীখণ্ডে যখন প্রথম কীর্তন হয়, তখন স্বর্গ হইতে চৈতন্য সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখনও বোধ হয় ভালো কীর্তন জমিলে সেখানে চৈতন্য সপরিকর আবির্ভূত হন। বাংলার কীর্তন একটা সত্য সত্যই উপভোগের জিনিস। তাহার জন্য চৈতন্যদেবের ও তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট আমরা সম্পূর্ণরূপে ঋণী।

অষ্টাদশ গৌরব : তান্ত্রিকগণ

তন্ত্র বলিলে কী বুঝায়, এখনও বুঝিতে পারি নাই। বৌদ্ধেরা বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান—সকলকেই তন্ত্র বলে। কাশ্মীরি শৈবদের সকল গ্রন্থই তন্ত্র। নাথপন্থের সকল গ্রন্থই তন্ত্র। অন্যান্য শৈব সম্প্রদায়ের গ্রন্থও তন্ত্র। আবার শাক্তদের সব গ্রন্থও তন্ত্র। এখন আবার বৈষ্ণবদের পঞ্চরাত্রগুলিকেও তন্ত্র বলিতেছে। বাস্তবিকই বৈষ্ণবদের কয়েকখানি তন্ত্র আছে। এরূপ অবস্থায় তন্ত্র বলিলে হয় সব বুঝায়, না হয় কিছুই বুঝায় না।

অনেকে তন্ত্রে বলে, বেদে কিছু হয় না বলিয়াই আমাদের উৎপত্তি। আবার অনেকে বলেন, অথর্ববেদই তন্ত্রের মূল। মূলতন্ত্রগুলি হয় বুদ্ধদেবের মুখ হইতে উঠিয়াছে, না-হয় হরপার্বতী-সংবাদ রূপে উঠিয়াছে। যেগুলি হরপার্বতী-সংবাদ, সেগুলি কেহ-না-কেহ কৈলাস হইতে পৃথিবীতে 'অবতারিত' করিয়াছেন, না হইলে লোকে তাহা জানিবে কীরূপে? একজন বৌদ্ধতন্ত্রকার বলিয়াছেন, 'আমরা ব্রাহ্মণদের মতো সুশব্দবাদী নহি। আমরা সোজা কথায় লিখি। যে ভাষা সকলে বুঝিতে পারিবে, আমরা এমন ভাষায় লিখি।' মূলতন্ত্রে ব্যাকরণের বড়ো ধার ধারে না। কিন্তু মূলতন্ত্র বড়ো একটা পাওয়া যায় না, যাহা পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই সংগ্রহ। একজন তান্ত্রিক পণ্ডিত দুই-চারিখানি মূলতন্ত্র ও বহুসংখ্যক সংগ্রহ একত্র করিলেন, আবার তাহার উপর নিজের একখানি সংগ্রহ বাহির করিলেন। তাঁহার দলে সেই সংগ্রহ চলিতে লাগিল। এইরূপে অনেক সংগ্রহ চলিয়া গিয়াছে।

বাংলায় এই সকল সংগ্রহ-কর্তাদের প্রথম ও প্রধান, গৌড়ীয় শংকরাচার্য। তাঁহার অনেকগুলি সংগ্রহ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার স্তবগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লেখা। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। তিনি নানা ছন্দে নানা স্তব লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনেক গ্রন্থ বড়ো শংকরাচার্যের বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু বড়ো শংকরাচার্য অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তিনি তন্ত্র লিখিতে যাইবেন কেন? তন্ত্রের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া একটা নতুন। উহা ব্রাহ্মণের কোনো সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সহিত মিলে না। কিন্তু এখন বাংলার

লোকে ওইরূপ সৃষ্টি-প্রক্রিয়াই জানে। সংগ্রহকারেরা মূলতন্ত্র অনেক পরিষ্কার করিয়া তুলিয়াছেন। মূলতন্ত্রে অনেক প্রক্রিয়া আছে, যাহা সভ্যসমাজে বাহির করা চলে না। সংগ্রহকারেরা উহা মার্জিত করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু মার্জিত করিয়া লইলেও তাঁহাদের গুহ্য উপাসনা বড়ো সুবিধার নয়। আমার বিশ্বাস তন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা যত কম হয়, ততই ভাল। কিন্তু যে সকল মহাপুরুষেরা এই লোকায়ত তন্ত্রশাস্ত্রকে মার্জিত করিয়া সভ্য সমাজের উপযোগী করিয়া গিয়াছেন এবং এইরূপ করায় অনেক লোক হিন্দু হইয়াছে ও হিন্দু রহিয়াছে, তাঁহারা যে খুব দূরদর্শী ও সমাজনীতি-কুশল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক শংকরের পর ত্রিপুরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দ পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধদিগকে হিন্দু করিয়া লইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দের পুস্তকে অক্ষোভ্য, বৈরোচন প্রভৃতি বুদ্ধের নাম পাওয়া যায়। অক্ষোভ্য এখানে ঋষি হইয়াছেন, বৈরোচন দেবতা হইয়াছেন। যে তারামন্ত্র সাধনের জন্য বশিষ্ঠদেবকে চিনে যাইয়া বুদ্ধদেবের শরণ লইতে হইয়াছিল, ব্রহ্মানন্দ সেই তারার পূজারই রহস্য লিখিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধমতে তারা অক্ষোভ্যেরই শক্তি। বৌদ্ধমতে তারা, একজটা, নীলসরস্বতীর উপাসনা আছে, 'তারা-রহস্যে'ও তাই। বৌদ্ধেরা শূন্যবাদী, 'তারা-রহস্যে'ও শূন্যের উপর শূন্য, তাহার উপর শূন্য, এইরূপে ষষ্ঠ শূন্য পর্যন্ত উঠিয়াছে। বৌদ্ধ মতে এইসকল দেবীর ধারণী আছে, সাধন আছে, 'তারারহস্যে' তাঁহাদের গায়ত্রী আছে। বোধ হয় ওই অঞ্চলে অনেক বৌদ্ধ ছিল বলিয়া, এই উপায়েই ব্রহ্মানন্দ তাহাদিগকে হিন্দু করিয়া লইয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দের শিষ্য পূর্ণানন্দ একজন খুব ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সংগ্রহগুলি আরও মার্জিত। তাঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। তিনি বেশ সংস্কৃত লিখিতে পারিতেন। পূর্ববঙ্গে ও বরেন্দ্রে তাঁহার বংশধরেরাই গুরুগিরি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের শিষ্যশাখা অসংখ্য।

রাঢ়ে আগমবাগীশের সংগ্রহ আরও মার্জিত। তাঁহার গ্রন্থে পঞ্চমকারের কথা নাই বলিলেই হয়, তাই এদেশে তাঁহার বড়োই আদর। কিন্তু তাঁহারো গ্রন্থে মঞ্জুঘোষের উপাসনার ব্যাপার আছে। মঞ্জুঘোষ যে একজন বোধিসত্ত্ব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তান্ত্রিক সংগ্রহকারেরা হতাবিশিষ্ট বৌদ্ধগণকে নানা উপায়ে হিন্দু করিয়া লইয়াছেন, আপনার করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা বাংলা সমাজের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন।

তান্ত্রিক মহাশয়েরা বঙ্গ-সমাজের অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাংলা ভাষার সাহিত্যে তাঁরা সাক্ষী। তাঁহাদের দলে বাংলা বই প্রচুর না হইলেও যথেষ্ট আছে এবং সেগুলি বেশ ভালো। তাঁহাদের শ্যামাবিষয়ক গানগুলি বাংলার

একটি শ্লাঘার বিষয়। আজিও কেহ সংগ্রহ করে নাই, তাই তাহাদের সংখ্যা করা যায় না। রামপ্রসাদের গান শুনিয়া মোহিত হয় না এমন বাঙালি কি কেহ আছে? দেওয়ানজী মহাশয়ের (দেওয়ান রঘুনাথ রায়) ও কমলাকান্তের গান অনেক সময় হৃদয়ের নিগূঢ় তন্ত্রীগুলি বাজাইয়া দেয়।

বাঙালি হিন্দুর মধ্যে একেবারে বৈষ্ণব, অর্থাৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের অপেক্ষা স্মার্ত পঞ্চোপাসকের দলই অধিক। ইঁহারা যদিও শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত নন, কিন্তু বাঙালিরা জানে হিন্দু হইলেই, হয় তাহাকে বৈষ্ণব, না হয় শাক্ত হইতে হইবে। সেইজন্য যাহারা বৈষ্ণব নহে, তাহারা সকলেই শাক্ত, শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলেও শাক্ত। কিন্তু এই দলকে বৈষ্ণবের গান অপেক্ষা শ্যামাবিষয়ক গানেই বেশি মাতাইয়া তোলে।

একোনবিংশ গৌরব : বাঙালি ব্রাহ্মণ

বাঙালি ব্রাহ্মণ, শুধু বাংলার নয়, সমস্ত ভারতেরই গৌরবের স্থল। বিদ্যা, বুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহারা কোনো জাতীয় ব্রাহ্মণ হইতেই ন্যূন নহে, বরং তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিচারশক্তিতে তাঁহাদের স্থান সর্বাপেক্ষা উপরে। কিন্তু আমরা এখন সে-সকল গৌরবের কথা এখানে বলিব না। তাঁহাদিগকে বাংলার গৌরব বলিয়াছি, বাংলায় তাঁহারা কি করিয়াছেন, তাহাই দেখাইব এবং সেইজন্য তাঁহাদের গৌরব করিব।

এই যে এত বড়ো একটা অনার্য দেশ, এখানে বৌদ্ধ, জৈন এবং অন্যান্য অব্রাহ্মণ ধর্মের এত প্রাদুর্ভাব ছিল, অথচ এখন এদেশে জৈন, বৌদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাদের কীর্তিকলাপ পর্যন্ত লোকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে, চারিদিকের লোকে জানে বাংলা হিন্দুধর্মের দেশ, এটা কে করিল? কাহার যত্নে, কাহার দূরদর্শিতায়, কাহার নীতিজ্ঞানে এই দেশটা আর্য আচারে, আর্য বিদ্যায়,ে আর্য ধর্মে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে? এ প্রশ্নের তো এক উত্তর। বাঙালি ব্রাহ্মণেরাই এই কাজটি করিয়াছেন। বাংলায় রাজশক্তি তো তাঁহাদের অনুকূল ছিল না, বরং অনেক স্থানে অনেক সময় ঘোর প্রতিকূলই ছিল। এই রাজশক্তির বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রাম করিয়া দেশটাকে হিন্দু করিয়া তোলা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার, বঙ্গের ব্রাহ্মণেরা তাহা সুসিদ্ধ করিয়াছেন, আর এমনিভাবে সুসিদ্ধ করিয়াছেন যে, মুসলমান ঐতিহাসিকেরা জানেন না যে, তাঁহাদের আগমনের সময়েই এদেশে হিন্দু ছাড়া আরো একটা প্রবল ধর্ম ছিল। মুসলমানেরা প্রাচীন সমাজ বিশেষ প্রাচীন বৌদ্ধসমাজ, একেবারে ধ্বংস করিয়া দিলে, তাহার পর কীরূপে ব্রাহ্মণেরা আবার ধীরে ধীরে সেই সমাজ আবার গড়িয়া তুলিলেন,

তাহা পূর্ব পূর্ব গৌরবে অনেকটা দেখাইয়াছি। স্মৃতি, দর্শন, বৈষ্ণবধর্ম, শাক্তধর্ম তাঁহাদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেই ব্রাহ্মণেরা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, দেশীয় ভাষায় ছড়া লিখিয়া, দেশীয় ভাষায় গান গাইয়া বৌদ্ধেরা কেমন দেশটাকে মাতাইয়া তুলিত। সুতরাং দেশ মাতাইতে হইলে যে মাতৃভাষা ভিন্ন হয় না, এ তাঁহাদের বেশ জ্ঞান হইয়াছিল। তাই তাঁহারা প্রথম হইতেই রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি বাংলা করা আরম্ভ করিয়া দেন।

এইরূপ করায় তাঁহাদের দুই কাজই হইয়াছিল। লোকের দৃষ্টি বৌদ্ধের দিক হইতে হিন্দুর দিকে পড়িয়াছিল এবং মুসলমানদের হাত হইতে উদ্ধার হইবার একটা বেশ যন্ত্র হইয়াছিল। রাজনীতিজ্ঞ মুসলমানেরাও একথা বেশ অনুভব করিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা ঘরের পয়সা দিয়া বাংলা লেখার সাহায্য করিতেন। বাস্তবিকই স্মৃতি ও দর্শন অপেক্ষা এই সকল বাংলা তর্জমায় হিন্দু সমাজের বন্ধন বেশ শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু এ তর্জমার মূলে ব্রাহ্মণ। এ কথাটা প্রথম তাঁহাদেরই মাথায় আসিয়াছিল এবং তাঁহারাই আগ্রহসহকারে এই কার্য করিয়া বাঙালির গৌরব যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

বিংশ গৌরব : কায়স্থ ও রাজা

পরে কিন্তু ব্রাহ্মণেরা এ বিষয়ে কায়স্থদের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্বেই বোধ হয় একটু দোটানায় ছিলেন, বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁহাদের আগে বেশ শ্রদ্ধা ছিল, কেননা, অনেক কায়স্থ অনেক বৌদ্ধ-গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ধর্মপালের সময় হইতে বল্লাল সেনের সময় পর্যন্ত তেঙ্গুরে আমরা অনেক কায়স্থের নাম দেখিতে পাই। পরে, যখন তাঁহারা দেখিলেন বৌদ্ধধর্ম আস্তে আস্তে লোপ হইল, তখন তাঁহারা একেবারে ব্রাহ্মণের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং ব্রাহ্মণদের হইয়া পুরাণাদি বাংলা করিতে লাগিলেন। গুণরাজ খাঁর 'কৃষ্ণমঙ্গল' ও কাশীদাসের 'মহাভারত' বাঙালিকে অনেক বড়ো করিয়া দিয়াছে। কাশীদাসের আরো দুই ভাই গদাধর ও কৃষ্ণদাস ভালো ভালো বই লিখিয়া গিয়াছেন। সকলেরই উদ্দেশ্য সেই এক, বাঙালি হিন্দু হউক। কায়স্থেরা শুধু বই লিখিয়াই সমাজের উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। এদেশের অনেক জমিই তাঁহাদের হাতে ছিল, জমিদারভাবেও দেশের ও সমাজের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন। রাজা গণেশ ও তাঁহার সন্তানসন্ততি বাংলার সুলতান না হইলে রায়মুকুট বড়ো কিছু করিতে পারিতেন না। হিরণ্য ও গোবর্ধন না থাকিলে চৈতন্য সম্প্রদায় গড়িতেই পারিতেন কিনা সন্দেহ। বুদ্ধিমন্ত খাঁ না থাকিলে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজকে অর্থের জন্য বিস্তর কষ্ট পাইতে হইত। এইরূপে কায়স্থ-ব্রাহ্মণে মিশিয়া মুসলমান সত্ত্বেও বাংলায় একটা প্রকাণ্ড হিন্দু সমাজ গড়িয়া তুলিলেন।

এমন সময় মোগলেরা বাংলায় আসিল। মোগলদের সঙ্গে অনেক বিদেশি হিন্দু এদেশে আসিয়া বড়ো বড়ো চাকরি ও বড়ো বড়ো জমিদারি পাইতে লাগিলেন। পাঠানের সহায় বলিয়া কায়স্থদের উপর তাঁহাদের বেশ একটু রাগও হইল, অনেক কায়স্থের জমিদারি গেল। তাহাদের জায়গায় হয় ব্রাহ্মণ, না-হয় কোনো বিদেশি আসিয়া বসিলেন। ক্রমে বাংলায় ব্রাহ্মণ ও বিদেশি জমিদারই বেশি হইয়া গেল। বিদেশিদের মধ্যে প্রধান হইলেন মহারাজাধিরাজ বর্ধমান ; ব্রাহ্মণদের মধ্যে হইলেন কৃষ্ণনগর, নলডাঙা, নাটোর ও মুক্তাগাছা। ব্রাহ্মণের ঘরগুলি ক্রমে ভাগ-বাঁটোয়ারায় ও অন্যান্য কারণে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু মহারাজাধিরাজ এখনও অক্ষুণ্ণ আছেন। তাঁহারা এই তিন শত বৎসর ধরিয়া বাংলার হিন্দু সমাজের একটা প্রকাণ্ড স্তম্ভ সদৃশ হইয়া আছেন। তাঁহারা কত ব্রাহ্মণপণ্ডিত প্রতিপালন করেন, বাংলা লেখায় কত উৎসাহ দেন, তাহার সীমা নাই। 'হরিহর-মঙ্গলের' লেখক মহারাজাধিরাজেরই আত্মীয় ও তাঁহারই উৎসাহে ওই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঘনরাম মহারাজাধিরাজের যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। ভালো কবি হইলে যতদিন বর্ধমানে মুজরা না পাইতেন, ততদিন তিনি কবি বলিয়াই গণ্য হইতেন না। ভালো কথক বর্ধমানে বৎসরে একদিন মাত্র কথা কহিতে পারিলে কৃতার্থ মনে করিতেন। ভালো যাত্রার দল, বর্ধমানে না গাইলে পসার হইত না। বর্ধমানও ভালো জিনিসের যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন, বৃত্তি দিতেন, বার্ষিক দিতেন। এ পর্যন্ত মহারাজাধিরাজেরা বাংলার সাধারণ সভায় কখনও যোগ দিতেন না। তাঁহাদের যেরূপ পদমর্যাদা ও গৌরব, সেরূপ সাধারণ সভা বোধ হয় হইত না বলিয়াই তাঁহারা যোগ দিতেন না। আমাদের বর্তমান মহারাজাধিরাজ আপনাদের পূর্বপুরুষের সকল গৌরবই বজায় রাখিয়াছেন, তাহার উপর আবার সেদিন বীরের ন্যায় নিজের জীবন দিয়া বঙ্গেশ্বরের জীবন রক্ষা করিতে গিয়া পূর্বপুরুষের 'মহারাজাধিরাজ' এই উপাধির উপর আবার 'বাহাদুর' উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের পূর্বপুরুষের পথ ত্যাগ করিয়া একটি সৎকার্য করিয়াছেন, তিনি এখন বাংলার সাধারণ সভায় আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার দূরদর্শিতা ও নীতিবোধের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বৃটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে যাইবামাত্র তাঁহারা ইঁহাকে সভাপতি করিয়া লইয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি দেশের যত হিতকর সভাসমিতি আছে, সর্বত্রই মহারাজাধিরাজ। এত দিনে সত্য সত্যই তিনি বাংলার মহারাজাধিরাজ হইয়াছেন। বাঙালি সকল কাজেই এখন হইতে তাঁহার মুখাপেক্ষা করিবে। তিনিও বাঙালিকে আপন করিয়া লইবেন। মহারাজ বাংলার নতুন সাহিত্যের দিকে মন দিয়াছেন, নিজে কবিতা লিখিতেছেন, নাটক লিখিতেছেন

এবং মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিতেছেন। আমরা আজ এইখানে দেশসুদ্ধ লোক মিলিয়াছি, ইহা সেই মহারাজাধিরাজেরই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের ফল। বাংলা সাহিত্য যেন কখনও মহারাজাধিরাজের অনুগ্রহে বঞ্চিত না হয়। তিনি আমাদের গৌরবের স্থল, আমরা তাঁহার গৌরবে আমাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি।

'বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন
অষ্টম অধিবেশনের কার্য বিবরণ',
'ক' পরিশিষ্ট,
বর্ধমান ১৩২১।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্কিমচন্দ্র

আজকে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বঙ্কিমের যে প্রভাব নবযুগের বাংলা দেশের প্রতি আর এখানকার সাহিত্যের প্রতি, সেই কর্তা বিবৃত করে বলেছেন আমি তার উপর আর বেশি কিছু বলতে ইচ্ছা করি না। দুটি-একটি কথা আমার তরফ থেকে বলবার ইচ্ছা আছে, অল্প কিছু বলব খুব সংক্ষেপে, আপনারা যদি ধৈর্য ধরে শুনতে পারেন।

আমাদের এই বাংলা দেশ পলিমাটির দেশ। এই পলিমাটির একটা গুণ হচ্ছে যে খুব পুরোনো কালের কীর্তিগুলিকে রাখতে পারে না, তলিয়ে যায়, বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেখানে কঠিন মাটি, মাদ্রাজ বলুন বা পশ্চিমভারত বলুন, সেখানে বহু শতাব্দীর যে সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন তা এখনও সমস্ত স্থাবর হয়ে আছে। কঠিন মাটির সঙ্গে পলিমাটির তফাত হচ্ছে এই যে ঘর গড়া তৈরি করা জিনিস, যা কাঠ-পাথর দিয়ে তৈরি, তা কঠিন মাটিতে থাকে বটে, কিন্তু অস্থাবর জিনিস যা বৎসর বৎসর নূতন প্রাণ আনে, সে জিনিস কঠিন মাটিতে তেমন করে উৎপন্ন হয় না। প্রাণের চর্চা এই প্রাণবান মাটিতেই হয়। সে কোমল বটে, কিন্তু তার ভিতর সেই তেজ আছে যাতে করে সে নব নব কালে এবং নব নব ঋতুতে নূতন করে প্রাণের সঞ্চার করে সমস্ত দেশে। বিপিনবাবু বলেছেন যে বাংলা প্রদেশের একটা বিশেষত্ব আছে, বাঙালির জীবনের ভিতর তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। উনি বলেছেন যে বাংলার প্রকৃতিতে একটা মুক্তির ভাব রয়েছে। প্রশ্ন এই, সেই মুক্তির ভাবটি কোথা থেকে আমরা পেলুম। আমার মনে আছে, আমি যখন মাদ্রাজে গিয়েছিলাম, আমাকে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আপনাদের প্রদেশে অনেক প্রতিভাশালী লোককে দেখতে পাই যাদের প্রতিভার একটা স্বকীয়তা আছে কিন্তু আমাদের প্রদেশে সেটা দেখতে পাই না কেন। আমি বললাম মানুষের প্রকৃতির সম্বন্ধে কার্যকারণের যে ধারা সেটা অতি সূক্ষ্ম, সে সমস্ত বিশ্লেষণ করবার মতন ক্ষমতা আমার নাই, সময়ও নাই। একটা কথা যেটা

বারবার মনেতে লাগে সেটা হচ্ছে এই যে, যে সমস্ত স্থাবর জিনিস অত্যন্ত অধিক পরিমাণে মানুষের সমস্ত চিত্তকে অভিভূত করে তার প্রভাবটা অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। আমি ওই মাদ্রাজেই থাকতে দেখি একজন শেঠি, তিনি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে তখন প্রস্তুত ছিলেন, কী করবার জন্য? না ঠিক বহুপূর্ব অতীত যুগে একটা মন্দির তাঁর দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারই অনুরূপ আর-একটি মন্দির রচনার পুনরাবৃত্তির জন্য। বাংলা দেশে সেটা সম্ভবপর নয়। আমাদের মনে নূতনত্বের প্রতি একটা স্বাভাবিক অনুরক্তি আছে। প্রাচীন যে-কোনো জিনিস প্রাণকে নতুন করে প্রকাশ করে না, যা বিগতকালের একটা স্থায়ী সাক্ষ্যরূপে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে, তা যদি বর্তমান কালের চলমান প্রাণের প্রবাহকে অতিমাত্রায় প্রতিহত করে তবে তা মানুষের মননশীল বুদ্ধিবৃত্তিকে অকর্মণ্য করে দেয়।

এই বাংলা দেশ, যাকে আমাদের নদীমাতৃগণ আপনার কোলের জিনিস দিয়ে তৈরি করে দিয়েছেন, তার প্রাণবান মাটি প্রাচীনের নিশ্চল মৃতভার চিরদিন স্তব্ধভাবে বহন করবার পক্ষে অনুকূল নয় কিন্তু নূতন প্রাণের বীজগুলিকে সফল করে তোলবার যোগ্যতা তার আছে। শিমুলের বীজগুলি যখন পরিপক্ক হয়ে ওঠে তখন আবরণ বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে সেগুলি বাতাসের বেগে দূরে দূরে ছড়িয়ে যায়। সেইরকম এক-একটা সময় এক-একটা জাতির প্রাণশক্তি এমন একটি পরিপক্কতা লাভ করে যে আবরণের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে সে থাকতে পারে না। আমাদের ইতিহাসে আমরা দেখেছি যে বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষের চিত্তশক্তি যখন বিশেষ একটি পরিণতি পেয়েছিল তখন সে কোনো একটি ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেনি। যে ঝড়ে তার প্রাণবান বীজগুলিকে দূর ক্ষেত্রে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল সে হচ্ছে মৈত্রীর ঝড়; সে হচ্ছে সর্বমানবের প্রতি প্রেম। মানুষ আপনার কোনো মহৎ সম্পদকে আপনারই ভোগের মধ্যে আবদ্ধ রাখবে, মানুষের ভগবান এমন দুর্গতি তাকে দেননি। ছোটো ছোটো সম্পত্তিই কেবল আমরা আপনার করে রাখতে পারি, অত্যন্ত নিকটের স্বার্থ যেসব, পরিবারের মধ্যে যা নিয়ে ঈর্ষা হয়, ভাগ রাখবার জন্য মারামারি ঘটে, সেসব জিনিস আমরা লোহার সিন্দুকে বদ্ধ করে রাখি। সকলের চেয়ে বড়ো সম্পদ যা সে ভগবান চুরি করে রাখতে দেননি, সে তাঁর জিনিস, আমাদের নয়। কাজেই সে আমাদের দান করতেই হবে সমস্ত মানুষকে. এ যেমনতরো বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে দেখেছি তেমনি বর্তমান যুগেও দেখতে পাচ্ছি, বস্তুতত্ত্বমূলক বিদ্যার দ্বারা, এই বিজ্ঞানের দ্বারা, বিশ্বতত্ত্বের সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের যে একটি নূতন বিশেষ যোগ স্থাপিত হয়েছে, যাতে করে ভৌতিক জগতের বিরাটকে মানুষের প্রত্যক্ষগোচর করে দিয়েছে সেই চিত্তসম্পদও য়ুরোপ কেবলমাত্র আপনার মধ্যে আপনি ধারণ করতে পারেনি। যে ঝড়ে তার বীজ দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে সেটা মৈত্রীর আবেগ নয়। সে লোভের

প্রকৃতি, শক্তিপিপাসা, কৌতূহল। যাই হোক না, সেই প্রবৃত্তিতে য়ুরোপের উদ্যমকে পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। সেই উদ্যম যদি বর্তমান যুগের সম্পদকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নানাস্থানে বহন করে এনে থাকে তা হলে দেখবার বিষয়, কোথায় মানুষ তাকে গ্রহণ করতে পারলে, কোথায় পারলে না। কোথায় তা অঙ্কুরিত হল, কোথায় তা হতে পারল না। যদি কেউ আস্ফালন করে বলেন যে, দেখো য়ুরোপের সভ্যতাপ্রবাহে জ্ঞান বিজ্ঞান যা কিছু এল আমরা তা নিইনি, নিতে চাইনি, তা হলে বলতেই হবে সেটা তোমাদের অশক্তির পরিচয়। ঝড়ের উপর রাগ করে কি মাটি বলতে পারে যে, সে ঝড় যে বীজ এনেছে সে যেন অঙ্কুরিত না হয়? মরুপাথর গর্ব করতে পারে যে বীজকে আমি গ্রহণ করি নে, কিন্তু উর্বরা ভূমি গর্ব করে যে আমার মধ্যে বীজ সফল হয়। আমাদের বড়ো গৌরবের কথা যে বাংলাদেশ পাশ্চাত্য চিত্তক্ষেত্র থেকে যে বীজ এসে পৌঁছল, বাংলার মাটি তাকে প্রত্যাখ্যান করলে না। প্রত্যাখ্যান করাটাকে বাহিরের দিক থেকে শক্তি বলেই বোধ হয়, কেননা তা কঠোর, কিন্তু সে কঠোরতা মৃত্যুরই কঠোরতা।

ভারতবর্ষের পুরাতন যুগে যখন আমরা সজীব ছিলাম তখন গ্রীসের সঙ্গে রোমের সঙ্গে এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের শুধু বস্তুপণ্যের নয়, চিত্তসামগ্রীরও আদানপ্রদান ঘটেছিল। আমাদের মধ্যে অনেকে ভারতসভ্যতার একান্ত অবিমিশ্রতার স্পর্ধা করে ঘোষণা করতে চেষ্টা করেন যে, আমরা কিছুই গ্রহণ করিনি। বড়ো লজ্জার কথা যদি গ্রহণ না করে থাকি। অন্তত আজকের দিনে আমরা গৌরব করে বলতে পারি, যে, য়ুরোপের বিদ্যা আমাদের প্রাঙ্গণের সামনে আসবার আরম্ভক্ষণেই বাংলা দেশ তাকে সমাদর করতে প্রস্তুত হয়েছিল। কোনো নূতন সত্য যখন প্রথম আত্মপ্রকাশ করে তখন গতানুগতিকের দলরা তাকে প্রাণপণে অস্বীকার করে, যাঁদের উদার আত্মার মধ্যে সত্যের যাচাই সহজেই হয় সেই মহাত্মারাই তার আহ্বানে সাড়া দেন, তাকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হন না। বাংলা দেশে রামমোহন রায় দিয়েছিলেন। তিনি গ্রহণ করেছিলেন বর্জন করেন নি। গ্রহণ করেছিলেন মানে তিনি যে কেবল বিদেশের সামগ্রীকেই বর্জন করেননি তা নয়, নিজেদের সারবিদ্যাকেও বর্জন করেননি। তাঁর যে শক্তি তাঁর স্বদেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে আয়ত্ত করেছিল সেই শক্তিই তাঁকে প্রবৃত্ত করেছিল বাইরের সম্পদকে গ্রহণ করতে।

বিপিনবাবু বাংলা সাহিত্যে তিনটি যুগের কথার উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে প্রথম যুগকে তিনি ব্রাহ্মযুগ নাম দিয়েছেন। এই ব্রাহ্মযুগের সাহিত্যকে তিনি কতকটা পরিমাণে বিশেষ ধর্মসমাজের সাম্প্রদায়িকতার সাহিত্য বলে মনে করেন। কোনো একটি ধর্মসংস্কার প্রচারের সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের প্রথম যুগের যে যোগ তাকে আমি মুখ্যভাবে সাম্প্রদায়িকতা বলি নে। যে মুক্তিসাধনাকে বিপিনবাবু বাংলা সাহিত্যের

প্রকৃতিগত বলেছেন, ব্রাহ্মযুগের সাহিত্য সেই মুক্তিসাধনাকেই বহন করেছে। বাংলা দেশের মধ্যে নবযুগের স্বাতন্ত্র্যবোধের বাণী যাঁদের হৃদয়ে এসে পৌঁচেছিল তাঁদের প্রথম দৃষ্টি পড়েছিল কোন্ বন্ধনের পরে? সকলের চেয়ে বড়ো বন্ধন আমাদের দেশে সেই ধর্ম যা প্রধানত আচারমূলক হয়ে গিয়ে মানুষের চিত্তকে অবরুদ্ধ ও পরস্পরের সঙ্গে তার যোগকে বিচ্ছিন্ন করেছে। বাহ্য আচারের জড়-অভ্যাসে ভারতবর্ষ যে কেবল কর্মক্ষেত্রেই পরাস্ত হয়েছে তা নয়, তার বুদ্ধিবৃত্তিও বাঁধ-বাঁধা হয়ে নিশ্চল ও অন্ধ সংস্কারে দূষিত হয়েছে। এই কারণে, স্বাধীনতার জন্যই আমাদের চিত্তে যে আকাঙ্ক্ষা নূতন জাগ্রত হয়ে উঠেছিল, দেশের অন্ধ আচারমূলক ধর্মের বন্ধনই সর্বপ্রথমে ও সকলের চেয়ে বড়ো করে তাকে আঘাত করেছিল। তাই এই স্বাধীনতার ঔৎসুক্য ধর্মসংস্কারের প্রয়াসেই আপনাকে প্রথম প্রকাশিত করেছি, তাতে দেশে তুমুল ক্ষোভ উৎপন্ন হয়েছিল।

নবযুগের য়ুরোপের ধাক্কায় আমাদের মনে যে একটা প্রকাশের উদ্যম জেগেছিল তার মধ্যে বয়সের ক্রমবিকাশ আছে। প্রথম বাল্য-অবস্থার কৌতূহল ও সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি মানুষকে বাহিরের জিনিস সংগ্রহে নিযুক্ত করে। তখন সে যা শিখেছে তাই নিজে আওড়ায় এবং অন্যকে শোনাতে থাকে। এটা যেন ইস্কুলের বালক এবং ইস্কুলের মাস্টারের সংযোগে পাঠ্য বিষয়ের উৎপত্তি। বাংলা দেশে তেমনি নবসাহিত্যের আদিযুগ প্রধানত চারুপাঠ, বস্তুবিচার, বোধোদয়, সীতার বনবাস রচনার দিন ছিল। বস্তুত তখনকার সাহিত্য সম্প্রদায়ের সাহিত্য নয়, তা পাঠ্য পুস্তকের সাহিত্য। পাশ্চাত্য বিদ্যা যাদের প্রথম থেকে শিক্ষা দিতে হবে তাদেরই দাবি তখন সর্বাগ্রগণ্য ছিল। এই অবস্থাকে একেবারেই উত্তীর্ণ হওয়া কারো সাধ্য ছিল না এবং এর ভিতর দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। তখনকার কালের গদ্যভাষা যেন হামাগুড়ির অবস্থা থেকে সবে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। এই অপরিণত বাংলা গদ্যেই রামমোহন রায় যখন ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখতেন তখন তাঁকে গদ্য বাক্য-বিন্যাসের পদ্ধতি সম্বন্ধে পাঠকদের বুঝিয়ে লিখতে হয়েছিল। স্বভাবতই সাহিত্যের এই আদিপর্বটি ভিত খোঁড়ার এবং মাল-মশলা সংগ্রহ করার পর্ব।

তার পরে তখনকার কালের অগ্রণীদের মধ্যে অন্তত রামমোহন রায়ের এবং আমার পিতৃদেবের মধ্যে স্বজাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদের প্রতি সুগভীর একটি নিষ্ঠা ছিল। তা যদি না থাকত, বড়ো বিপদ হত। তখন পশ্চিম দেশের শিক্ষার জোয়ার বিপুল শক্তি নিয়ে আমাদের মনকে ভিটেছাড়া করে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সুতরাং যদি তাঁদের নিজেদের এক জায়গায় প্রতিষ্ঠা না থাকত তা হলে তাঁরাও ভাসতেন এবং অন্যকেও ভাসাতেন। এই স্বজাতির প্রতি নিষ্ঠা এটা তাঁদের ব্রাহ্ম সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা খর্ব হয়েছিল এটা যেন কেউ মনে না করেন। তাঁদের সে সম্বন্ধে একটা তীব্র

বোধশক্তিই ছিল বলে আমি তো জানি।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষত্ব কী? তিনি আজীবন কী এনে দিয়েছেন আমাদের সামনে? বাল্যকাল আমাদের পার হয়ে গেল, সেই যৌবনের বার্তাটি এসে পৌঁছল বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে। তার আগে আমরা সকলে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা ছিলাম ইস্কুলের ছেলে। বঙ্কিম বললেন, তোমরা ইস্কুলের ছেলে নও, তোমাদের বয়স হয়েছে। যেই তিনি খবর দিলেন সকলে চমকে উঠে পড়ল ; বললে, আমাদের যৌবন এসেছে। দেশসুদ্ধ লোককে এই বলানো এবং ভাবানো এইটেই আমার কাছে মনে হয় বঙ্কিমের সকলের চেয়ে বড়ো কীর্তি। একেই বলে সোনার কাঠি ছোঁয়ানো। কোনো বাহ্য সামগ্রী দেওয়ার চেয়ে বড়ো দান হচ্ছে জাগরণ-দান।

তারপর বিপিনবাবুর সঙ্গে একটি জায়গায় আমার মতভেদ আছে। সাহিত্যের মন্দিরে মেসেজ নামক পদার্থটি সর্বোচ্চ চূড়ার মতো খাড়া করে তোলা আমি ভালো বুঝি নে। বঙ্কিমের আনন্দমঠে হোক বা দেবী চৌধুরানিতে হোক বঙ্কিম কী পরিমাণ ইংরাজ-রাজত্ব স্বীকার করেছেন কী পরিমাণে করেননি, সেসব তর্কের কথা, রসের কথা নয়। আনন্দমঠের শেষকালে বঙ্কিম বলেছেন যে, ইংরেজ রাজত্বে আমাদের দরকার ছিল ; কেননা তার সাহায্যে আমাদের বহির্বিষয়ক জ্ঞানলাভ হবে। আমি হয়তো বলব, বরঞ্চ ইংরাজ আমাদের য়ুরোপীয় সভ্যতা থেকে অনেক পরিমাণে বঞ্চিত করেছে ; যেহেতু পরিবেশনের ভার তার উপরে, সেইজন্যেই সম্পূর্ণ করে আমাদের পাতে য়ুরোপের জ্ঞান সে দেয় না। অতএব এজন্য আমি কৃতজ্ঞ হতে রাজি নই। এই তো জাপান য়ুরোপীয় শাসনকে হাতির পিঠে মাহুতের মতো মাথায় করে নেয় বলে কি য়ুরোপীয় সভ্যতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে? যাই হোক, এসব হল তর্কের কথা, এই যাকে বলো 'মেসেজ'। কিন্তু সাহিত্য তো তর্কের কথা নয়। সাহিত্যে আনন্দরূপের সৃষ্টি হয়, তা ভুল মেসেজ নিয়েও হতে পারে। আমি সেখানেই আনন্দ পাই এবং সেখানেই আমি বঙ্কিমের কাছে কৃতজ্ঞ যেখানে মেসেজ দেননি, যেখানে উনি আপনার সৃষ্টি করবার আনন্দকে রূপদান করেছেন। এই যে রূপদান করাটি কত বড়ো দান এটি বুঝতে হবে। এই রূপটি প্রাণের সহজ সৃষ্টি এবং এই রূপটিই প্রাণকে ধারণ করে থাকে। প্রাণের গুণ হচ্ছে সে স্তব্ধ থাকে না, সে নিয়ত আমাদের প্রাণকে উদ্‌বোধিত করে। প্রাণময় বাণী প্রাণের বাণী-উৎসকে উৎসারিত করতে থাকে। যে ভাষার মধ্যে নানা আকারে সাহিত্যের আনন্দরূপ বিরাজ করে সে ভাষার প্রাণশক্তি নিত্য সক্রিয়। সে ভাষা আপন প্রাণবেগের জোরেই সাহিত্যরচয়িতার কাছ থেকে তার প্রাণের কথাটি পূর্ণভাবে টেনে নিতে পারে। আনন্দময় সাহিত্য ভাষাকে প্রাণময় জগৎ করে তোলে, মেসেজের সে শক্তি নেই। এইজন্য সাহিত্যসংসারে আমরা তাঁদেরই নমস্কার করি যাঁরা তাঁদের প্রতিভা থেকে সাহিত্যের ভিতর প্রাণের চিরন্তন সুর ঢেলে দিয়ে থাকেন।

তাঁদের সঙ্গে আমাদের সাম্প্রদায়িক দিকে মনের মিল না থাকতে পারে, তাঁদের উপরে সামাজিক অসামাজিক নানা কারণে রাগও হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব তাঁরা আমাদের মস্ত দান করেছেন, যা দিলেন এ আর কেউ দিতে পারত না।

নব্যভারত, ভাদ্র ১৩৩০
শান্তিনিকেতন, কার্তিক ১৩৩০

রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণের আগে 'নবযুগের বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র' বিষয়ে বলেছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, ভবানীপুর সাহিত্য সম্মিলনীতে, ২৮ জুন ১৯২৩।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভিভাষণ

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

একদিন কলকাতা ছিল অখ্যাত, অসংস্কৃত পল্লি, সেখানে বসল বিদেশি বাণিজ্যের হাট, গ্রামের শ্যামল আবেষ্টন সরিয়ে দিয়ে শহরের উদ্ধত রূপ প্রকাশ পেতে লাগল। সেই শহর আধুনিক কালকে দিল আসন পেতে ; বাণিজ্য এবং রাষ্ট্রের পথে দিগন্তের পর দিগন্তে সেই আসন বিস্তৃত হতে চলল।

এই উপলক্ষ্যে বর্তমান যুগের বেগবান চিত্তের সংস্রব ঘটল বাংলা দেশে। বর্তমান যুগের প্রধান লক্ষণ এই যে, সে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতায় বদ্ধ বা ব্যক্তিগত মূঢ় কল্পনায় জড়িত নয়। কী বিজ্ঞানে, কী সাহিত্যে, সমস্ত দেশে সমস্ত কালে তার ভূমিকা। ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সভ্যতা সর্বমানবচিত্তের সঙ্গে মানসিক দেনা-পাওনার ব্যবহার প্রশস্ত করে চলেছে।

একদিকে পণ্য এবং রাষ্ট্র বিস্তারে পাশ্চাত্য মানুষ এবং তার অনুবর্তীদের কঠোর শক্তিতে সমস্ত পৃথিবী অভিভূত, অন্য দিকে পূর্বে পশ্চিমে সর্বত্রই আধুনিক কালের প্রধান বাহক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অমোঘ প্রভাব বিস্তীর্ণ। বৈষয়িক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের আক্রমণ আমরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রতিরোধ করতে পারিনি, কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে আমরা ক্রমে ক্রমে স্বতই স্বীকার করে নিচ্ছি। এই ইচ্ছাকৃত অঙ্গীকারের স্বাভাবিক কারণ এই সংস্কৃতির বন্ধনহীনতা, চিত্তলোকে এর সর্বত্রগামিতা, নানা ধারায় এর অবাধ প্রবাহ, এর মধ্যে নিত্যউদ্যমশীল বিকাশধর্ম নিয়ত-উন্মুখ কোনো দুর্গম্য কঠিন নিশ্চল সংস্কারের জালে এ পৃথিবীর কোণে কোণে স্থবিরভাবে বদ্ধ নয় ; রাষ্ট্রিক ও মানসিক স্বাধীনতার গৌরবকে এ ঘোষণা করেছে, সকল প্রকার যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাসের অবমাননা থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করবার জন্যে এর প্রয়াস। এই

সংস্কৃতি আপন বিজ্ঞানে দর্শনে সাহিত্যে বিশ্ব ও মানবলোকের সকল বিভাগভুক্ত সকল বিষয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত, সকল কিছুই পরীক্ষা করছে, বিশ্লেষণ, সংঘটন, বর্ণনা করছে, মনোবৃত্তির গভীরে প্রবেশ করে সূক্ষ্ম-স্থূল যত কিছু রহস্যকে অবারিত করছে। তার অন্তহীন জিজ্ঞাসাবৃত্তি প্রয়োজন অপ্রয়োজনে নির্বিচার, তার রচনা তুচ্ছ মহৎ সকল ক্ষেত্রেই উপাদান সংগ্রহে নিপুণ। এই বিরাট সাধনা আপন বেগবান প্রশস্ত গতির দ্বারাই আপন ভাষা ও ভঙ্গিকে যথাযথ অত্যুক্তিবিহীন এবং কৃত্রিমতার জঞ্জাল বিমুক্ত করে তোলে।

এই সংস্কৃতির সোনার কাঠি প্রথম যেই তাকে স্পর্শ করেছে, অমনি বাংলা দেশ সচেতন হয়ে উঠেছে। এ নিয়ে বাঙালি যথার্থই গৌরব করতে পারে। সজল মেঘ, নীল নদীর তট থেকেই আসুক, আর পূর্বসমুদ্রের বক্ষ থেকেই বাহিত হোক, তার বর্ষণে মুহূর্তেই অন্তর থেকে সাড়া দেয় উর্বরা ভূমি, মরুক্ষেত্র তাকে অস্বীকার করার দ্বারা যে অহংকার করে, সেই অহংকারের নিষ্ফলতা শোচনীয়। মানুষের চিত্তসম্ভূত যা-কিছু গ্রহণীয়, তাকে সম্মুখে আসবাবমাত্র চিনতে পারা ও অভ্যর্থনা করতে পারার উদার শক্তিকে শ্রদ্ধা করতেই হবে। চিত্তসম্পদকে সংগ্রহ করার অক্ষমতাই বর্বরতা, সেই ক্ষমতাকেই মানসিক আভিজাত্য বলে যে মানুষ কল্পনা করে, সে কৃপাপাত্র।

প্রথম আরম্ভে ইংরেজি শিক্ষাকে ছাত্ররূপেই বাঙালি যুবক গ্রহণ করেছে। সেটা ধার করা সাজসজ্জার মতোই তাকে অস্থির করে রাখলে, বাইরে থেকে পাওয়া জিনিসের অহংকার নিয়ত উদ্যত হয়ে রইল। ইংরেজি সাহিত্যের ঐশ্বর্যভোগের অধিকার তখন ছিল দুর্লভ এবং অল্পসংখ্যক লোকের আয়ত্তগাম্য, সেই কারণেই এই সংকীর্ণ শ্রেণিগত ইংরেজি পোড়োর দল নূতন লব্ধ শিক্ষাকে অস্বাভাবিক আড়ম্বরের সঙ্গেই ব্যবহার করতেন।

কথায়-বার্তায়, পত্রব্যবহারে, সাহিত্যরচনায় ইংরেজি ভাষার বাইরে পা বাড়ানো তখনকার শিক্ষিতদের পক্ষে ছিল অকৌলীন্যের লক্ষণ। বাংলা ভাষা তখন সংস্কৃত পণ্ডিত ও বাঙালি পণ্ডিত দুই দলের কাছেই ছিল অপাঙ্‌ক্তেয়। এ ভাষার দারিদ্র্যে তাঁরা লজ্জাবোধ করতেন। এই ভাষাকে তাঁরা এমন একটি অগভীর শীর্ণ নদীর মতো মনে করতেন, যার হাঁটুজলে পাড়াগেঁয়ে মানুষের .প্রতিদিনের সামান্য ঘরের কাজ চলে মাত্র, কিন্তু দেশ-বিদেশের পণ্যবাহী জাহাজ চলতে পারে না।

তবু এ কথা মানতে হবে এই অহংকারের মূলে ছিল পশ্চিম মহাদেশ হতে আহরিত নূতন সাহিত্য-রস-সম্ভোগের সহজশক্তি। সেটা বিস্ময়ের বিষয়, কেননা, তাঁদের পূর্বতন সংস্কারের সঙ্গে এর সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ছিল। অনেককাল মনের জমি ঠিকমতো চাষের অভাবে ভরা ছিল আগাছায়, কিন্তু তার অন্তরে অন্তরে সফলতার শক্তি ছিল প্রচ্ছন্ন, তাই কৃষির সূচনা হবামাত্রই সাড়া দিতে সে দেরি করলে না। পূর্বকালের থেকে

বর্তমান অবস্থার যে প্রভেদ দেখা গেল তা দ্রুত এবং বৃহৎ। তার একটা বিস্ময়কর প্রমাণ দেখি রামমোহন রায়ের মধ্যে। সেদিন তিনি .বাংলা ভাষায় ব্রহ্মসূত্রের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হলেন, সে ভাষার পূর্বপরিচয় এমন ... না, যাতে করে তার উপরে এত বড়ো দুরূহ ভাব অর্পণ সহজে সম্ভবপর মনে হতে থাকে, .. ভাষায় তখন সাহিত্যিক গদ্য সবে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে নদীর তটে সদ্যশায়িত ... । এই অপরিণত গদ্যেই দুর্বোধ তত্ত্বালোচনার ভারবহ ভিত্তি সংঘটন করতে ... না।

এই যেমন গদ্যে, পদ্যে তেমনি অসম সাহস প্রকাশ করলেন মধুসূদন। পাশ্চাত্য হোমর মিলটন রচিত মহাকাব্যসঞ্চারী মন ছিল তাঁর । তার রসে তিনি একান্তভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন বলেই তার ভোগমাত্রেই স্তব্ধ থাকতে পারেননি। আষাঢ়ের আকাশে সজলনীল মেঘপুঞ্জ থেকে গর্জন নামল, গিরিগুহা থেকে তার অনুকরণে প্রতিধ্বনি উঠলমাত্র, কিন্তু আনন্দচঞ্চল ময়ূর আকাশে মাথা তুলে সাড়া দিলে আপন কেকাধ্বনিতেই! মধুসূদন সংগীতের দুর্নিবার উৎসাহ ঘোষণা করবার জন্যে আপন ভাষাকেই বক্ষে টেনে নিলেন। যে যন্ত্র ছিল ক্ষীণধ্বনি একতারা, তাকে অবজ্ঞা করে ত্যাগ করলেন না, তাতেই তিনি গভীর সুরের নানা তার চড়িয়ে তাকে রুদ্রবীণা করে তুললেন। এ যন্ত্র একেবারে নতুন, একমাত্র তাঁরই আপন গড়া। কিন্তু তাঁর এই সাহস তো ব্যর্থ হল না। অপরিচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ঘন-ঘর্ঘরমন্দ্রিত রথে চড়ে বাংলা সাহিত্যে সেই প্রথম আবির্ভূত হল আধুনিক কাব্য।*

সেদিন সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারি থেকে সংস্কৃত বই-এর তালিকা আনিয়ে দেখি, তাঁরা সংস্কৃত বই কিছু দেবনাগীর অক্ষরে ছাপেন ও কিছু বাংলা অক্ষরে। এতে অযথা অর্থ, সময় ও পরিশ্রম ব্যয় হয়। যদি আমরা বাংলা অক্ষরের মায়া ত্যাগ করে দেবনাগর অক্ষর গ্রহণ করি তা হলে কত সুবিধা। বাঙালির অন্ন সমস্যার দিনে কিছু অধিক আয়ের উপায় হবে। অনেক হিন্দুস্থানি ভদ্রলোক যাঁরা হিন্দি ও সংস্কৃত জানেন তাঁরা সহজে বাংলা শিখে ফেলবেন ও বাংলা বই পড়তে পারবেন। বাঙালি ছেলেমেয়েদের দুইটা লিপি শিখবারও দরকার হবে না।

স্বীকার করি বাংলা অক্ষরের উপর আমাদের একটা মায়া ও মমতা আছে। কিন্তু যে ক্ষতি স্বীকার করতে বলছি সেটা মোটেই ক্ষতি নয়। ধরুন Bengal Legislative Council থেকে আমরা আইন করাই যে আজ থেকে ১০ বৎসর পরে কোনো বইয়ে বাংলা অক্ষরের স্থানে দেবনাগরী ব্যবহার হবে। ১০ বৎসরের মধ্যে ছাপাখানায় যে সকল টাইপ এখন ব্যবহার হচ্ছে, সেগুলি ক্ষয় হয়ে যাবে। নূতন টাইপ সকলেই দেবনাগরী ব্যবহার করতে পারবেন। ১০ বৎসর আমাদের কারো পক্ষে দেবনাগরী অক্ষর শিখতে অল্প সময় নয়।

ইন্দোর অধিবেশনের সময়ে আমি দেবনাগরী অক্ষর প্রচলনের পক্ষে কিছু বলি।

সেদিনকার সভা ভঙ্গ হলে একটি বাঙালি যুবক আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি দেবনাগরী অক্ষর না চালিয়ে রোমান (Roman) অক্ষর চালানো যায় তা হলে কেমন হয়? কথাটা আমার মনে লাগে ও তার পর আমি এ বিষয় সামান্য চিন্তাও করেছি। এখন আমার মনে হয় যে Roman অক্ষর, তাতে উপযুক্ত অক্ষর বাড়িয়ে, চালালে সমস্ত ভারতবর্ষের ও পরে সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল হবে।

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য অনেক ছিল। কিন্তু সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি অত্যন্ত সারগর্ভ আলোচনা আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় পড়েছি। সেটি এত যুক্তিপূর্ণ ও এত বিস্তারিতভাবে লেখা যে তার উপর আমার বেশি কিছু বলবার নাই। আমি আপনাদিগকে ওই প্রবন্ধটি পড়তে বলি।

আমাদের ভারতবর্ষে অনেকগুলি লিপি প্রচলিত। সকল দেশেই লোকের নিজের দেশের লিপির প্রতি একটা টান আছে, যেমন আমাদের বাংলা লিপির প্রতি। যদি আমরা দেবনাগরী অক্ষর চালাই সেও কতকভাবে এক প্রদেশের লিপিতে অন্য প্রদেশের লিপির উপর স্থান দেওয়া হবে। তাতে অনেকের প্রাদেশিক মনে ঘা লাগতে পারে। কিন্তু সকলেই একটা নূতন অক্ষর গ্রহণ করতে রাজি হতে পারেন। এ বিষয়ে চেষ্টা করে লোকমত গঠন করে, আজ থেকে ধরুন ২০ বৎসর পরে আমাদের নিজের চেষ্টায় আইন করে আমরা Roman অক্ষর চালালে, সে কাজটা সহজ হবে, আর মঙ্গলের তো কথাই নাই।

বড়ো আদর্শের কাছে ছোটো স্বার্থ ত্যাগ করাই বিধেয়। দুই বা চারি প্রদেশের চেয়ে সমস্ত ভারতবর্ষের মঙ্গল বেশি প্রার্থনীয়। কিছুকাল পূর্বে অধুনা স্বর্গগত শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় এক লিপি বিস্তারের জন্য একটি সমিতি গঠন করে ও একটি পত্রিকা প্রকাশিত করে দেবনাগর অক্ষর চালাবার চেষ্টা করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি বিশেষ সাফল্য পান নাই। কিন্তু সেজন্য আমাদের ভগ্নোৎসাহ হবার কারণ নাই। এখন আমরা আরও উচ্চ আদর্শ নিয়ে কাজ করতে পারি ও যখন উদ্দেশ্য সমস্ত ভারতবর্ষে এমন লিপি বিস্তার করা, যার বিস্তারে প্রাদেশিক দেশ-গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকবে, তখন সফলতাও বেশি কঠিন হবে না।

শ্রীযুক্ত সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটি লিপি গঠন প্রস্তাব করেছেন ও তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে সেই লিপিতে উর্দু, ফার্সি, সংস্কৃত প্রভৃতি সকল ভাষাই লেখা ও ছাপা যেতে পারে। তাঁর প্রস্তাব ও প্রবন্ধকে আলোচনার ভিত্তি করে আমরা কাজ আরম্ভ করতে পারি ও যদি দরকার হয় আইনের সাহায্য নিয়ে কাজটা সহজে করতে পারি। যদি দেশের লোকে Roman লিপির উপকারিতা বোঝেন, তা হলে আইন সভার ইংরাজ সভ্যগণ আপত্তি তো করবেনই না, বরং সরকার থেকে প্রস্তাবিত আইনের অনুমোদনই আশা করি। ধরুন যদি আইন হয় যে, আইন লিপিবদ্ধ হবার ১০ বা ১৫ বৎসর পরে বাংলা অক্ষরে কোনো বই ছাপা হবে না, কেবলমাত্র Roman অক্ষরে ছাপা হবে তা হলে

ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশেও ওইরূপ আইন হতে মোটেই দেরি হবে না।

যদি আপনারা অনুমোদন করেন তাহা হলে এই অধিবেশন উপলক্ষ্যেই একটি একলিপিবিস্তার সভা গঠিত করে কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে। সভ্যদের মধ্যে অধিকাংশ বাংলা দেশবাসীরাই থাকবেন। প্রবাসী বাঙালি ২/১ জন মাত্র ওই সভার সভ্য হলেই চলবে।

বাংলা দেশে অন্য প্রদেশ ও দেশ থেকে অনেক লোক এসে ব্যাবসা ও হাতের কাজ করে অন্নসংস্থান করছেন। ফলে বাংলা দেশের খাঁটি অধিবাসীরা অন্নহীন হচ্ছেন। নানান কারণে এই অবস্থা ঘটছে। প্রধান কারণ যোগ্যতর ব্যক্তিরা অন্ন উপার্জন করছে। আমরা আমাদের শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার জন্য সংসার সংগ্রামে হটে যাচ্ছি। যা ঘটছে তাতে মঙ্গল ও অমঙ্গল দুই আছে। অমঙ্গলের দিকটা খুবই স্পষ্ট। মঙ্গলের দিক এই যে যাঁরা এখন অবাঙালি তাঁরা কিছুদিন পরে খাঁটি বাঙালি হয়ে দাঁড়াবেন। নূতন রক্তের আমদানিতে দেশের শক্তিবৃদ্ধি হবে। বিহারের ও যুক্তপ্রদেশের পক্ষে, সেখানে বাঙালির বাস দেশের মঙ্গল করেছে। যদি আমরা এমন অক্ষরে বাংলা ভাষার বই ছাপি যাতে অবাঙালি শিক্ষিতেরা সহজে পড়তে পারবেন, তা হলে তাঁদের বাঙালি করা খুবই সহজ হবে। লিপির অন্তরাল যদি উঠে যায় বা সহজে লঙ্ঘনীয় হয়, তা হলে আদানপ্রদান বাড়বে ; ফলে আমরাও বিদেশিদের বেশি ভালো করে বুঝতে পারব ও জানতে পারব যে তাঁরা কী গুণে আমাদের দেশকে জয় করেছেন। এদিক দিয়েও Roman অক্ষরের উপকারিতা অনেক।

কী করলে বাঙালি অবাঙালির সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা গত গোরক্ষপুরের অধিবেশনে করেছিলাম। তা প্রবাসীতে ছাপা হয়েছিল। আমার অভিভাষণ এমনিই বেশি বড়ো হয়ে পড়েছে। সেইজন্য ওই বিষয়ে কিছু বললুম না। অন্নসমস্যা বড়োই কঠিন হয়ে পড়ছে বলে তাহার উল্লেখ মাত্র করলুম।

পরিশেষে আমার নিবেদন এই যে, আপনারা প্রবাসী ভাইবোনেদের আহ্বান করে তাদের প্রতি যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করেছেন ও সেই স্নেহের গুণে তাঁদের মধ্যে একটি এমন লোককে সাহিত্যসভায় সম্মানের স্থান দিয়েছেন যিনি তার উপযুক্ত নন। সেই স্নেহের জন্য আমার বিনীত ও আন্তরিক ধন্যবাদ পুনরায় গ্রহণ করুন।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ পৌষ ১৩৪১। [১১ পৌষ ১৩৪১ তারিখে টাউন হলে প্রদত্ত ভাষণ।]

*এই অংশ পর্যন্ত *বিচিত্রা*-র মাঘ ১৩৪১ সংখ্যায় 'বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' নামে প্রকাশিত হয়েছে এবং তার পর নতুন অনেকখানি যোজনা আছে সেই প্রবন্ধে। দ্র. রচনাবলি-১০. পৃ-৫৪৮-৫৩।। বক্তৃতার এই চিহ্নিত স্থান থেকে পরবর্তী দীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ যে অংশ সে-প্রবন্ধে বর্জিত, তা এখানে সংযোজিত হল।

অতুলপ্রসাদ সেন

বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে অভিভাষণ

স্বাগত সুধীমণ্ডলী,

আপনারা লখনৌ নিবাসী বাঙালিগণের বিনম্র নমস্কার গ্রহণ করুন। অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি। এ সাহিত্যোৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। আপনাদের অভ্যর্থনা ও আতিথ্যের যথোচিত আয়োজন করিতে পারি নাই ; সে ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাহিতেছি।

হয়ত আপনারা ভাবিয়াছিলেন যে, নবাব-প্রধান লখনৌ শহরে নবাবোচিত সৌজন্য ও আতিথ্যের বিপুল ব্যবস্থা হইবে। সত্য, এককালে লখনৌ নগর প্রচুর সুখ-স্বচ্ছন্দতা, মনোরম সৌজন্য ও অপরিমেয় আতিথেয়তার জন্য সর্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। একদিন সচ্ছল-অবকাশ-সাপেক্ষ মধুর সঙ্গীতে এদেশ ঝঙ্কৃত হইত ; ঐশ্বর্য-পরিপুষ্ট শিল্পকলা এদেশে সকলের মনোরঞ্জন করিত ; লখনৌর রাজগণ যদিচ কুক্কুট কিংবা বটের সংগ্রামে যেরূপ পারদর্শী ছিলেন রাজ্যশাসন বিষয়ে তদ্রূপ দক্ষ ছিলেন না তথাপি তাঁহাদের অধিকাংশই উদারচেতা ও মুক্তহস্ত ছিলেন। মচ্ছিভবনের অধিষ্ঠাতা নবাব আসদৌল্লা সাহেবের দানশীলতা এরূপ জনবিশ্রুত ছিল যে, এখনও চৌকের কোনো কোনো বণিক প্রাতে আপনার বিপণিদ্বার উদ্‌ঘাটন করিবার পূর্বে এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করে :

জিস্‌কো ন দে মৌলা, উসকে দে আসফদৌল্লা।

অর্থাৎ যাহাকে ভগবান বঞ্চিত করেন, আসফদৌল্লা তাহাকেও বঞ্চিত করেন না। জনপ্রবাদ আছে যে, লখনৌ উদ্যানের অপূর্ব শোভা ও পুষ্পসম্পদ ভূতকালে নন্দনেও এত খ্যাতি লাভ করিয়াছিল যে, একদা নন্দনের উদ্যানপালক লখনৌর কুসুম-সম্ভারের শোভা নিরীক্ষণ করিবার জন্য লালায়িত হইলেন; এবং দেবগণের অনুমতিক্রমে কিছুদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করিয়া মর্ত্যভূমের উদ্যানভূমি লখনৌ নগরে অবতীর্ণ হইলেন; কিন্তু

অনতিকাল পরে স্বর্গরাজ্যের নিকট এই মর্মে পত্র লিখিলেন, 'দেবরাজ, ক্ষমা করিবেন ; আমি আর নন্দনে ফিরিতে পারিব না।' কিন্তু যেদিন হইতে লখনৌ বাদশার 'ছোড় চলে লখনৌ নগরী', যেদিন হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতার শোষণ যন্ত্র এদেশের বক্ষস্থলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সে দিন হইতে কমলার অনুকম্পা ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে, বিশ্বকর্মাও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমাদের অভ্যর্থনার দারিদ্র্য সেই অপহৃত বৈভবের অনুকৃতি মাত্র। 'ভুখা নবাবের' দেশে ভুখা বাঙালির নিমন্ত্রণ তাই এত সাজসজ্জাহীন।

কিন্তু যদিচ লখনৌর পুরাতন গৌরবরশ্মি নিতান্ত হীনপ্রভ হইয়াছে তথাপি এই মহানগরী সম্পূর্ণ হতশ্রী হয় নাই। এখনও এদেশ শস্যশ্যামলা ; এখনও পূতসলিলা বঙ্কিমগতি গোমতী তাহার শীতল আলিঙ্গনে এদেশকে সুশীতল করিতেছে। এখনও লোহিতাভ সন্ধ্যায় যখন লখনৌর সমাধি-সৌধের উচ্চ মুকুট এবং শৃঙ্গাবলি আকাশপটে চিত্রিত হয় তখন গত গৌরবের ধূসর স্মৃতিতে আমায়ের নয়ন মধুর বিষাদে আর্দ্র হয়। যদিও প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞগণ লখনৌ নগরী হইতে চিরবিদায় লইয়াছেন তথাপি এখনও রাজপথ পথচারীর সুললিত সঙ্গীতে মুখরিত। এখনও সুকবিগণ তাঁহাদের মধুর 'মারসিয়া' সঙ্গীতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের চিত্তবিনোদন করেন। এখনও 'মুসায়েরা' সম্মিলনে ধনি ও দরিদ্র, সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত কাব্যামোদিগণ একাসনে বসিয়া একপাত্রে কাব্যসুধা পান করেন। পুরাতন শিল্পকলা ও কারুকার্য যদিও এখন নিঃশেষপ্রায় তথাপি তাহার ক্ষীণাবিশিষ্ট এখনও বিদ্যমান। যদিও মুসলমান-রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সভ্যতার প্রতিপত্তি প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে, তথাপি এখনও অসামান্য সৌজন্য, উর্দুভাষার অপূর্ব সৌষ্ঠব, কথোপকথনের মোহন প্রণালী, মনোহারী ভাষাবিন্যাস ইত্যাদি সভ্যতার নির্দশন তিরোহিত হয় নাই। অত্যন্ত সুখের বিষয় এই যে, আমাদের লখনৌ নগরী উত্তরোত্তর পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভের পথে অগ্রসর হইতেছে। হয়ত অচিরে লখনৌ নবীন সম্পদে সম্পন্ন এবং নবীন গৌরবে গৌরবান্বিত হইবে।

তিন বৎসর পূর্বে কানপুরের কতিপয় সাহিত্যপ্রেমী বাঙালি বহির্বঙ্গে বাংলা সাহিত্যের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার একান্ত আবশ্যকতা অনুভব করিয়া এই সাহিত্য-সম্মিলনের সূচনা করেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। যাঁহারা এই মহৎ ব্রত সাধনের প্রথম পথপ্রদর্শক তাঁহাদের মধ্যে আমাদের পরমবন্ধু কানপুরের জনপ্রিয় শুভকর্মী লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় অন্যতম। তৎপর বৎসর ভাগীরথী তীরে পুণ্যভূমি কাশী নগরে তথাকার সাহিত্যানুরাগী ও উদ্‌যোগী বাঙালিগণ বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের এক চিরস্মরণীয় মহাসভার অনুষ্ঠান করেন। বর্তমান সাহিত্য-জগতের শ্রেষ্ঠতম কবি অতুল-প্রতিভাসম্পন্ন বাংলার কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সে সাহিত্যযজ্ঞের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়া সে অনুষ্ঠানের সফলতা সম্পাদন করেন। বলাবাহুল্য যে, তাঁহার অপূর্ব অভিভাষণে শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

গত বৎসরে গঙ্গাযমুনার সন্ধিস্থলে পবিত্র প্রয়াগনগরীতে এই সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হয়। সেখানকার কৃতী ও সাহিত্য-সেবী বাঙালিগণ অতি সুচারুরূপে সম্মিলনের কার্য সুসম্পন্ন করেন। বাংলাসাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রবাসীকুলগৌরব শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সে সভার সভাপতিত্বে বৃত হন ; কিন্তু অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি সে সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই ; তাঁহার মনোরম ও সারগর্ভ অভিভাষণ সভাস্থলে পঠিত হয়। তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতির কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

এ বৎসর লখনৌ সে সৌভাগ্যের অধিকারী। কাশী কিংবা প্রয়াগের ন্যায় এ নগর তীর্থভূমি নহে ; তথাপি এ প্রদেশ পুণ্যভূমি। পূর্বদিকে পুণ্যতোয়া সরযূর উপকূল রঘুকুলমণির রাজধানী অযোধ্যানগরী, অধুনা দেবমন্দির-সমাকুল তীর্থভূমি, পশ্চিম গোমতীতীরে মহাভারত রচয়িতা ঋষিকুলপুঙ্গব বেদব্যাসের পবিত্র তপোবন নৈমিষারণ্য। উত্তরে দেবত্রাতা, আত্মত্যাগের চরম আদর্শ রাজর্ষি দধীচির সমাধিভূমি এবং তীর্থসমূহের মিশ্রণভূমি মিশ্রিত। দক্ষিণে পূতসলিলা জাহ্নবী। কেন্দ্রস্থলে বিনয়াবতার লক্ষ্মণদেবের রাজধানী ক্ষুদ্রগ্রাম লক্ষ্মণপুর, যে স্থলে আজ বৃহৎ লখনৌ মহানগরী বিরাজিত। আমরা অযোগ্য হইলেও ভারতীর পূজার জন্য এদেশ অযোগ্য নহে।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এ ভারতীর পূজায় ভারতীর বরকন্যা ভারতীসম্পাদিকা অধিনায়িকার পদ গ্রহণ করিয়াছেন। বহুকাল প্রবাসে থাকিয়া, কর্মসাধনার পঞ্চধারার মধ্যেও যে তিনি বাংলা-সাহিত্য-সেবা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন ইহা প্রবাসী বাঙালিদের পক্ষে বিশেষ শ্লাঘার বিষয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই বিদুষী মহোদয়ার নেতৃত্বে ও সস্নেহ পরিচর্যায় আমাদের এই প্রবাসী সাহিত্য-শিশু স্বাস্থ্য ও সৌষ্ঠবে বর্ধিত হইবে।

আমাদের এই নবীন শিশুটি আমাদের এত আদরের যে ইতিমধ্যেই ইহার একাধিকবার নামকরণ হইয়া গিয়াছে। প্রথম ইহার নাম রাখা হয় 'উত্তর-ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন'। গত বৎসর ইহাকে 'প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যদি এ সম্মেলন 'বাঙলার' বহির্ভূত বাঙালি মাত্রেরই সম্মিলন হয় তবে উহাকে 'উত্তর ভারতীয়' বলা সঙ্গত নহে ; কেন না মধ্য-ভারত ও দক্ষিণ-ভারতে বাঙালি বাস করেন, তাঁহারাও এ সম্মিলনের সভ্যপদের অধিকারী।

'প্রবাসী' নামটি অপেক্ষাকৃত সুপরিচিত ; কিন্তু এ নামটিও সম্পূর্ণ নিরাপত্তিতে গ্রহণ করা চলে না ; ইহার কারণ প্রধানতঃ এই যে, এদেশে বহুসংখ্যক বাঙালি এমন আছেন যাঁহারা দীর্ঘকাল হইতে এবং বংশপরম্পরায় এখানে স্থায়িভাবে বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগকে ঠিক প্রবাসী বলা চলে কি না সন্দেহ। তারপর 'প্রবাসী' শব্দ দূরত্বব্যঞ্জক ও আগন্তুকতার পরিচায়ক। বাঙালি এবং এদেশবাসী আমরা সকলেই ভারতমাতার সন্তান, সুতরাং ভারতে বাস করিয়া নিজেকে 'প্রবাসী' বলা সমীচীন বোধ হয় না। আমরা নিজবাসভূমে পরবাসী

নহি, বরঞ্চ যদি আমরা নিজেকে পরবাসভূমে নিজবাসী বলিয়া মনে করিতে পারি তবেই প্রশস্ততার সমর্থনা করা হইবে। তবে নামকরণ লইয়া আমি পুনরায় মতান্তর কিংবা আলোচনার সৃষ্টি করিতে চাহি না। সম্মিলনের সদুদ্দেশ্য সিদ্ধিই আমাদের মুখ্য সাধনা, নামকরণ অতিশয় গৌণ।

এমন বাঙালি বোধ হয় কেহই নাই যাঁহারা সাহিত্য-সম্মিলনের উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান। এদেশবাসী আমরা অনেকেই বহুকাল হইতে মাতৃভাষার প্রচার ও প্রসার সাধনকল্পে ও বাঙালিজাতির উন্নতি ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা মানসে সম্মিলিত চেষ্টার আবশ্যকতা বিশেষভাবে অনুভব করিয়া আসিতেছি। ভগবৎ কৃপায় আমাদের এ উদ্দেশ্য ফলবতী হইবার পূর্বাভাস দৃষ্টিগোচর হইতেছে। কিন্তু আমাদের এ সম্মিলনকে স্থায়ী ও হিতপ্রদ করিতে হইলে যে নিরলস সাধনা ও দলবদ্ধ প্রয়াসের প্রয়োজন তাহা আমাদের ন্যায় জীবিকান্বেষী ও নিরবসর বাঙালির সাধ্যায়ত্ত কি না সে সম্বন্ধে মনে দ্বিধা উপস্থিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। তথাপি প্রবাসী বাঙালিদের হৃদয়ে অধুনা মাতৃভাষার প্রতি যে নবীন অনুরাগের উদ্দীপনা দেখিতেছি তাহাতে আশা করা হয়, যে, আমাদের এ নব-প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যমন্দির নিতান্ত ভঙ্গুর হইবে না।

অভিনন্দন সমিতির সম্ভাষণে বাংলা-সাহিত্য-সম্মিলনের সার্থকতা এবং বহির্বঙ্গে বাংলাভাষা ও বাংলা-সাহিত্যের প্রচার ও উৎকর্ষ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়ত সুশোভন হইবে না। কেবল সংক্ষেপে আমার দুই-একটি বক্তব্য নিবেদন করিবার অনুমতি চাহিতেছি।

প্রবাসী বঙ্গসন্তানগণের অন্তত বৎসরান্তে একবার সহিত্যোৎসবে সম্মিলিত হওয়ার সফলতা বহুবিধ। সামাজিকতার দিক দিয়া বিচার করিলেও ইহার উপকারিতা অতি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। সামাজিক পরিচয় ও আত্মীয়তার সাফল্য হয়ত কেহই অস্বীকার করিবেন না। অথচ প্রবাসী বাঙালি আমরা অনেকেই পরস্পরের নিকট অপরিচিত। বরঞ্চ অনেক স্থলে বাংলাদেশের বাঙালিদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ অধিকতর ঘনিষ্ঠ। আমাদের অভাব, আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির অন্তরায়, ভবিষ্যৎ উন্নতির পন্থা, আত্মরক্ষার এক উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু একত্র হইবার সুযোগ না থাকায়, পরিচয় ও ভাববিনিময়ের অভাবে আমরা বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের সহায়তা হইতে বঞ্চিত ; সুতরাং আমরা দুর্বল। যদি সাহিত্যসূত্রে আমরা কখনো কখনো একত্র হইতে পারি এবং আমাদের শুভাশুভের আলোচনা করিবার অবসর পাই তবে আমাদের সমূহ লাভ, ইহা সকলেরই স্বীকার্য।

প্রবাসে বাংলা-সাহিত্যের প্রচার ও উন্নতিসাধন করিতে হইলে সাহিত্য-সম্মিলন অপরিহার্য। এদেশের সাহিত্যসাধনা কী প্রকারে হইতে পারে, কোন্ পন্থা প্রশস্ত সে সম্বন্ধে বিবেচ্য বিষয় অনেক আছে ; তন্মধ্যে মাত্র দু-একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

সর্বপ্রথমে আমাদের কর্তব্য প্রবাসে বাঙালি বালক-বালিকাদিগের বাংলা-শিক্ষার

সুব্যবস্থা করা। যেখানে বহু সংখ্যক বাঙালির বাস সেখানে সুপরিচালিত বাংলা স্কুল সংস্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা ব্যয়সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি সকলে নিজের উপার্জনের এক ক্ষুদ্রাংশও এ উদ্দেশ্যে ব্যয় করেন, তবে তথায় অন্তত মেয়েদের একটি পাঠশালা উত্তমরূপে চলিতে পারে।

প্রবাসে বাঙালিদের বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বোধ হয় নিতান্ত অল্প হইবে না ; কিন্তু যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার খুব সুবন্দোবস্ত আছে এরূপ বিদ্যালয় বিরল। তাহার কারণ এ বিষয়ে আমরা কথঞ্চিৎ অলস ও উদাসীন। যাহাদের সংগতি অল্প তাহারা যদি আপন পুত্রকন্যাদের শিক্ষার ব্যয় বহন করে তাহা হইলেই যথেষ্ট । কিন্তু যাহাদের সাংসারিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল, তাহাদের এ সম্বন্ধে গুরুতর দায়িত্ব আছে। তাহাদের দরিদ্র বাঙালি ভাইয়ের পুত্র-কন্যারা যদি অর্থাভাবে বাংলা-ভাষা শিক্ষা করিতে না পারে তাহা হইলে তাহাদের সাংসারিক স্বচ্ছন্দতা নিরর্থক।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা দেব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বংশধর, স্বর্গীয় তারকনাথ পালিত এবং রাসবিহারী ঘোষের স্বজাতি। আমাদের নিকট বিদ্যা বিতরণ বিষয়ে দানশীলতার পরম সার্থকতা কেবলমাত্র শাস্ত্রের অনুশাসন নহে ; উহা প্রত্যক্ষীকৃত সত্য। বাঙালি জাতির মধ্যে এ ব্রতে সিদ্ধ স্বার্থত্যাগী পুরুষের অভাব নাই।

তৎপর, বাঙালি জনসাধারণের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের প্রচার করিতে হইলে, যেখানে যেখানে সম্ভব বাংলা পুস্তকাগার সংস্থাপন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। লাইব্রেরি সংক্রান্ত একটি কথা নিবেদন করা যুক্তিসংগত মনে করি। পুস্তকালয়ের উদ্দেশ্যে পাঠকসাধারণের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তার করা। যে সাহিত্যপাঠে মনের উচ্চবৃত্তিগুলি পরিস্ফুট হয় সেই সাহিত্যপাঠে পাঠক-সমাজকে প্রলুব্ধ করাই পুস্তকাগারের মুখ্য উদ্দেশ্য। জনসাধারণ যাহা পাঠ করিতে চায় শুধু তাহা সংগ্রহ করাই পুস্তকাগারের কর্তব্য নহে, উহা পুস্তকবিক্রেতার লক্ষ্য হইতে পারে। লঘু সাহিত্যের প্রতি স্বতঃই লোকের আকর্ষণ অধিক, যে সাহিত্য চিন্তাশক্তিকে সক্রিয় করে তৎপ্রতি সাধারণের দৃষ্টি অল্প। তাই সচরাচর পুস্তকাগারে গল্প ও উপন্যাসের বাহুল্য দেখিতে পাই। সে বিষয়ে আমাদের একটু সতর্ক হওয়া আবশ্যক। বাংলা ভাষায় সুখপাঠ্য সদ্‌গ্রন্থের অভাব নাই ; লোকের মনোরঞ্জন করিতে হইলেও কেবলমাত্র হতোস্মিপূর্ণ কিংবা রোমাঞ্চক সাহিত্যের শরণাপন্ন হইবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু আজকাল লঘু সাহিত্য যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং যেরূপ ত্বরিতগতিতে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে মনে আশঙ্কা হয় ; গল্প-সাহিত্যের অসামান্য কলেবর বৃদ্ধি দেখিয়া মনে ভীতির সঞ্চার হয়। আজকাল একশ্রেণির ছোটোগল্পের প্রাবল্য দেখা যায়। এগুলিতে প্রশংসার যোগ্য যদি কিছু থাকে তাহা এই যে, সেগুলি ছোটো। পাঠক-সমাজকে বিশেষত পাঠাগার সংস্থাপকদিগকে এ সাহিত্যের প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষার জন্য সচকিত হইতে অনুরোধ করি। বাংলা-সাহিত্যে অনেক অমূল্য রত্ন রহিয়াছে। এ রত্নভাণ্ডার ক্রমেই

নূতন ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যশালী হইতেছে। অতি অল্পকালের মধ্যে সুলেখক ও সুসাহিত্যিকের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। পাঠক-সমাজকে আজকাল অন্য সাহিত্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। প্রায় সকল প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় আমাদের বাংলা ভাষায় লিখিত হইয়াছে এবং হইতেছে। তবে আমাদের সাহিত্যের পরিমাণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবর্জনাও বাড়িতেছে ; সুতরাং প্রবাসী পাঠক-সমাজের একটু সাবধান হওয়া আবশ্যক। এক প্রকার নবসাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে তাহার গতিবিধি আমার নিকট শিব কিংবা সুন্দর মনে হয় না। উহার ভাব ভাষা ও ভঙ্গি আমাদের সাহিত্যকে লঘু করিতেছে। উহার ভাব নিতান্তই প্রচ্ছন্ন, ক্ষীণ এবং কখনো কখনো মলিন ; ভাষা অযথা উদ্বেলিত ও তরল, ভঙ্গি অন্যের অনুকারী এবং কৃত্রিম। এ দলের সাহিত্যিকেরা এবং এ সাহিত্যের পাঠকেরা না বুঝিতে পারার আনন্দে বিভোর!

মহাকবি কালিদাস হইলে বলিতেন, 'ইহাদের বাক্ আছে অর্থ নাই ; পার্বতী আছে পরমেশ্বর নাই!' প্রবাসী পাঠকবর্গ এবং নবীন সাহিত্যিকেরা যেন এ সাহিত্যের মোহে মুগ্ধ না হন।

প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে সাহিত্য-সাধনার একটা প্রবল ইচ্ছা দেখা দিয়াছে, তাহার ফলে বাঙালিবহুল কাশীনগরী হইতে কয়েকখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে 'অলকা' অলিখিত, 'প্রবাসজ্যোতি' নির্বাপিত প্রায়। সম্প্রতি সাহিত্যপ্রেমী শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী কাশীধাম হইতে *প্রবাসী-বাঙালি* নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা বাহির করিতেছেন। আমি তাঁহার সাহিত্যোৎসাহের প্রশংসা করি এবং তাঁহার সুলিখিত পত্রিকার স্থায়িত্ব কামনা করি।

আমি কিন্তু তাঁহাকে একটি মনোরম ও সারগর্ভ মাসিক পত্রিকা সম্পাদন বিষয়ে সহায়তা করিতে অনুরোধ করিতেছি। পত্রিকাখানি সচিত্র হইবে। উত্তর-ভারতে আজকাল একাধিক খ্যাতনামা বাঙালি চিত্রশিল্পী বাস করেন। আমার বিশ্বাস, এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার, শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিল প্রমুখ চিত্রবিদ্যাবিশারদ বাঙালিদের সহায়তা অনায়াসে পাইতে পারি। সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক বন্ধুবর ডাক্তার রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন এরূপ আশা করি। পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, লখনৌ এবং লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনেক সুযোগ্য বিদ্বান বাঙালি অধ্যাপনার কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা অনেকে সাহিত্যিক ও সুলেখক। তাঁহারা কষ্ট স্বীকার করিলে অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধাদি এ পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে পারে। ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা এদেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধীয় অনেক অনাবিষ্কৃত তথ্য প্রকাশিত করিতে পারেন। যাঁহারা উর্দুভাষায় পারদর্শী তাঁহারা দাগ, গালিব, জোখ, আমির, আতস, রতননাথ, আকবর, হালি প্রভৃতি সুকবিদের কাব্যভাণ্ডার হইতে রত্নসঞ্চয় করিয়া আমাদের বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে

পারেন। যাঁহারা হিন্দি ভাষায় সুশিক্ষিত, তাঁহারা তুলসীদাস, সুরদাস, কবীর, বিহারীদাস, কেশবদাস, ভূষণ, মীরাবাঈ, রসখাঁন, পদ্মাকর, রহিম, হরিশ্চন্দ্র, প্রতাপ, শ্রীধর পাঠক প্রমুখ প্রসিদ্ধ হিন্দি কবিগণের কাব্যকুসুম হইতে মধু আহরণ করিয়া আমাদের মধুচক্রটিকে আরও মধুময় করিতে পারেন। এদেশের তীর্থাদি, এদেশের জনপ্রবাদ, এদেশের লোকাচার ইত্যাদি সাহিত্যের প্রকৃষ্ট উপকরণ যথেষ্ট বিদ্যমান। আমার ধারণা এসব উৎকৃষ্ট উপাদান অবলম্বন করিয়া যদি একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রবাসে নিয়মিতরূপে সম্পাদন করা যায় তাহা হইলে বর্হিবঙ্গীয় বাঙালিগণের মাতৃসাহিত্যসেবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করা হইবে, সাহিত্যপ্রেমীদিগকে মাতৃভাষার প্রবন্ধ ও কবিতাদি রচনা করিতে উদ্বুদ্ধ করা হইবে। প্রবাসী বাঙালিদিগের জাতীয়তা রক্ষা ও উন্নতিসাধন বিষয়ে চিন্তাশীলেরা এ পত্রিকায় আলোচনা কারবেন।

বাংলা-সাহিত্য আমাদের অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া আরও সমৃদ্ধ হইবে। আমি এ বিষয়ে সাহিত্য-সম্মেলনের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

প্রবাসী বাঙালির আর একটি দায়িত্ব আছে যাহা সাহিত্যসেবী বাঙালিদের মনে রাখা কর্তব্য। যাহাতে বাঙালিজাতি ভিন্ন এদেশীয়দের মধ্যেও বাংলা-সাহিত্যের প্রতিপত্তি ও প্রসার সংসাধিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে আমাদিগকে যত্নবান হইতে হইবে। আপনারা লক্ষ করিয়া থাকিবেন যে আধুনিক হিন্দি ভাষা অনেকটা বাংলা ভাষার অনুকরণে গঠিত হইতেছে। হিন্দি, মারাঠি, গুজরাঠি ভাষায় বাংলা-সাহিত্যের বিস্তর গ্রন্থাদি অনূদিত হইয়াছে, বিশেষত বাংলার গল্প ও উপন্যাস। আমার বোধ হয় বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশিত করিলে এবং অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যের উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি টীকাসহ বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত করিলে আদান-প্রদানের দ্বারা বাংলা-সাহিত্যের সম্পদবৃদ্ধি ত করা হইবেই, অন্যান্য ভারতীয় ভাষাকেও আমাদের বাংলা-সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত করা হইবে। আজকাল ভারতের অন্য প্রদেশীয় সাহিত্যিকেরা বাংলা-সাহিত্য সাদরে শিক্ষা করিতেছেন। হয়ত কালে আমাদের বাংলা-সাহিত্য বিশ্বভারতের সাহিত্য হইবে। প্রবাসী বাঙালিদের যত্ন ও অধ্যবসায় দ্বারাই আমাদের এ অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে।

প্রবাসী বন্ধুগণ, আপনাদিগের সহিত মিলিত হইয়া আজ আমি কৃতার্থ বোধ করিতেছি। সম্মিলনের শুভ অবশ্যম্ভাবী, যদি আমরা আমাদের গুরুতর দায়িত্ব সকল ভুলিয়া না যাই। মনে রাখিবেন, আমাদিগকে বঙ্গবাণীর পূজার জন্য নূতন উপচার সংগ্রহ করিতে হইবে। নূতন ভুষায় তাঁহাকে ভূষিত করিতে হইবে ; বিবিধ সাহিত্যকুসুম হইতে পরিমল সংগ্রহ করিয়া আমাদের মধুভাণ্ডারকে আরও মধুর করিতে হইবে। সাহিত্যসম্রাট রবীন্দ্রনাথ আজ বিশ্বজগতে আমাদের সাহিত্যকে যশস্বী করিয়াছেন। ভারতের দেশ-বিদেশে প্রবাসী বাঙালিগণ বাংলা-সাহিত্যের মহৎ বার্তা বহন করিবেন এবং প্রচার করিবেন। আমাদের সাহিত্য সত্য ; আমাদের সাহিত্য শিব ; আমাদের সাহিত্য সুন্দর। এই সত্য-শিব-সুন্দরেব

মন্দির ভারতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বাঙালির সর্বোচ্চ সম্পদ তাহার সাহিত্য ; ইহাকে সযত্নে রক্ষিত ও বর্ধিত করিতেহইবে।

সাহিত্য-প্রেমী বন্ধুগণ, আমরা বহুদিন পরে প্রবাসে বঙ্গবাণীর উৎসব-মন্দির স্থাপন করিলাম। পুরোহিত কিংবা উপাসকের অভাব হইবে না ; কিন্তু ইহাকে চিরস্থায়ী করিতে হইলে হৃদয়ের ভক্তি চাই। গভীর নিষ্ঠা চাই, প্রচুর ধৈর্য চাই ; নতুবা আমাদের সাহিত্য-সাধনা নিষ্ফল হইবে। ক্ষণিক উৎসাহ কিংবা ভাবুকতায় আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না ; কার্যতৎপরতা, অধ্যবসায়, শৃঙ্খলা, স্বার্থত্যাগ, পরার্থপরতা এ সদ্‌গুণ সমূহের সমাবেশ হইলে তবে আমরা সফল মনোরথ হইব। ভগবৎচরণে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের সাহিত্য-সেবা সার্থক করুন।

পুনরায় আমি শ্রদ্ধা-সহকারে প্রতিনিধি মহোদয়গণকে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। আপনারা ভক্তিভরে ভারতীর পূজায় প্রবৃত্ত হউন।

১৯২৫ সালের এপ্রিল মাসে লখ্‌নৌতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ।

রাজশেখর বসু

সাহিত্য-শাখার সভাপতির ভাষণ

সংকেতময় সাহিত্য

যে আবিষ্কার বা উদ্‌ভাবন আমাদের সমকালীন তার মূল্য আমরা সহজে ভুলি না। রেলগাড়ি, টেলিফোন, মোটর, সিনেমা, রেডিয়ো প্রভৃতির আশ্চর্যতা এখনও আমাদের মন থেকে লুপ্ত হয়নি। আধুনিক সভ্যতার এইসব ফলভোগ করছি বলে আমরা ধন্য জ্ঞান করি, যদিও মনের গোপন কোণে একটু দীনতাবোধ থাকে যে, উদ্‌ভাবনের গৌরব আমাদের নয়।

কিন্তু যে আবিষ্কার অত্যন্ত পুরাতন, কিংবা যে বিষয়ের পরিণতি প্রাচীনকালের বহু মানবের চেষ্টায় ধীরে ধীরে হয়েছে, তার সম্বন্ধে এখন আর আমাদের বিস্ময় নেই। দীর্ঘকাল ব্যবহারে আমরা এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, তার উপকারিতা মোটর, সিনেমা, রেডিয়োর চেয়ে লক্ষগুণ-বেশি হলেও আমরা অকৃতজ্ঞচিত্তে আলোবাতাসের মতোই সুলভ জ্ঞান করি। আগুন, কৃষি আর বয়নবিদ্যার আবিষ্কার কে করেছিল তা জানবার উপায় নেই। এগুলির উপর আমরা একান্ত নির্ভর করি, কিন্তু এদের অভাবে আধুনিক জীবনযাত্রা যে অসম্ভব হত, তা খেয়াল হয় না। এইসব বিষয়ের চেয়েও যা আশ্চর্য, যার জন্য মানব-সভ্যতা ক্রমশ উন্নতিলাভ করেছে, যার প্রভাবে শুধু ঐশ্বর্যবৃদ্ধি নয়, বুদ্ধি আর চিত্তেরও উৎকর্ষ হয়েছে, যার উপযুক্ত প্রয়োগে হয়তো একদিন সমগ্র মানবজাতি একসত্তায় পরিণত হবে, এমন একটি বিষয়ের উদ্‌ভাবন পুরাকালে হয়েছিল এবং তার প্রসার এখনও হচ্ছে। এই অসীম শক্তিশালী পরম সহায়ের নাম 'সাহিত্য'।

Literature শব্দের অর্থ সংকীর্ণ, শুধুই লিখিত বিষয়। 'সাহিত্য' শব্দের মৌলিক অর্থ সাহিত্যের ভাব বা সম্মেলন, যার ফলে বহু মানব একক্রিয়ান্বয়ী বা একভাবে ভাবিত হয়। এমন সার্থক আর ব্যাপক নাম বোধ হয় অন্য ভাষায় নেই। ভাব প্রকাশের আদিম উপায় অঙ্গভঙ্গী ও শব্দভঙ্গী, তারপর এল বাক্য। সুভাষিত বাক্য যখন বলা হল এবং শুনে মনে রাখা হল তখনই সাহিত্যের উৎপত্তি। শ্রুতি আর স্মৃতিই এদেশের প্রথম সাহিত্য। প্রথম

যুগে যখন বাক্যই সম্বল ছিল, তখন সাহিত্যের দেবী হলেন বাণী বা বাগ্‌দেবী। সঙ্গীত আর লেখার উৎপত্তির পর বাগ্‌দেবী বীণাপুস্তকধারিণী হলেন। এখন সাহিত্যের দেবী রাশি রাশি মুদ্রিত পুস্তককে অধিষ্ঠান করে বিশ্বব্যাপিনী হয়েছেন।

প্রথমে যখন লেখার উদ্‌ভাবন হল, তখন তার উদ্দেশ্য ছিল অতি স্থূল, নিজের জিনিস চিহ্নিত করা, সম্পত্তির হিসাব রাখা, দানবিক্রয়াদির দলিল করা, ইত্যাদি। তারপর সংবাদ পাঠাবার জন্য চিঠির এবং রাজাজ্ঞা ঘোষণার জন্য অনুশাসনলিপির প্রচলন হল। ক্রমশ লিপির প্রয়োগ আরও ব্যাপক হল, যে সাহিত্য পূর্বে শ্রুতিবদ্ধ ছিল তা লিপিবদ্ধ এবং অবশেষে মুদ্রিত হওয়ায় প্রচারের আর সীমা রইল না।

মুখের কথার প্রভাব অল্প নয়, কিন্তু বেশি লোকে তা শুনতে পায় না, যারা শোনে, তারাও চিরদিন মনে রাখতে পারে না। লিপি-আবিষ্কারের পূর্বে সকল বিদ্যাই গুরুমুখে শুনে বারংবার আবৃত্তি করে স্মৃতিপটে নিবদ্ধ করতে হত। প্রাচীন প্রথায় শিক্ষিত টোলের পণ্ডিতদের মধ্যে এখনও স্মরণশক্তির অসামান্য উৎকর্ষ দেখা যায়, কিন্তু শ্রুতিবিদ্যা কণ্ঠস্থ করা সাধারণ লোকের সাধ্য নয়। লেখা অক্ষয় হয়ে থাকতে পারে, দরকার হলেই পড়া যেতে পারে। রচয়িতার মৃত্যু হয়, কিন্তু তাঁর লেখা বহু শত বছর পরেও জীবিত থাকে। লেখা যদি ছাপা হয়, তবে তার প্রভাব সর্ব মানবসমাজে ব্যাপ্ত হতে পারে।

আমি একটি অতি উত্তম কাব্য বা গল্প বা ভ্রমণবৃত্তান্ত বা তথ্যমূলক গ্রন্থ পড়ছি। পড়তে পড়তে লেখকের ভাব, রসবোধ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, যুক্তি আর জ্ঞান আমাতেও সঞ্চারিত হচ্ছে। লেখক যা অনুভব করেছেন, কল্পনা করেছেন, দেখেছেন, বা জেনেছেন, আমিও তা যথাসাধ্য উপলব্ধি করছি। এই আশ্চর্য ব্যাপারের সাধনযন্ত্র কি। শুধুই কাগজের উপর কালির চিহ্নশ্রেণি। শ্রুতিগ্রাহ্য বাঙ্ময় সাহিত্য দৃষ্টিগ্রাহ্য সংকেতময় হয়েছে। মুখের ভাষাও সংকেত, কিন্তু মাতৃভাষা শেখবার একটা সহজ প্রবণতা আমাদের আছে। শিশুকালের কথা বুঝতে আর বলতে সহজেই শিখেছি, লেশমাত্র আয়াস হয়নি। কিন্তু বাক্যের কৃত্রিম প্রতীকস্বরূপ অক্ষরমালা আয়ত্ত করতে কতই বা কষ্ট পেয়েছি। প্রথমে লেখার অর্থ একেবারেই অগ্রাহ্য ছিল, একমাত্র লক্ষ্য এক-একটি চিহ্নের পরিচয় এবং তার নাম। তারপর ধীরে ধীরে চিহ্নপরম্পরা আয়ত্ত হল, পাঠের জন্য চেষ্টার প্রয়োজন রইল না, লিখিত বাক্যের উচ্চারণ সহজ হল, অবশেষে ক্রমশ অর্থবোধ এল। শিশু রবীন্দ্রনাথ 'জল পড়ে পাতা নড়ে' পাঠ করে সাহিত্যের যে প্রথম আস্বাদ পেয়েছিলেন, সকল ভাগ্যবান শিশুই তা একদিন পায়। পাখি যেমন করে তার বাচ্চাকে উড়তে শিখিয়ে আকাশচারী করে, মানুষও সেই রকম তার সন্তানকে সংকেতের প্রয়োগ শিখিয়ে সাহিত্যচারী অর্থাৎ বিদ্যার্জনের যোগ্য করবার চেষ্টা করে। উপযুক্ত শিক্ষা এবং অভ্যাসের ফলে সংকেতের কৃত্রিমতা আর লক্ষ হয় না, পড়া আর লেখার শক্তি উঠা-হাঁটার মতোই স্বভাবে পরিণত হয়।

এদেশে অসংখ্য হতভাগ্য অক্ষর পরিচয়েরও সুযোগ পায় না, অনেকে কোনো রকমে

অক্ষর চেনে কিন্তু অর্থ বোঝে না। সামান্য লেখাপড়া শিখেও যে শক্তিলাভ হয় তার মর্ম আমরা সহজে বুঝি না, ছেলেবেলায় অনেকের সঙ্গে যা পাওয়া যায় তা তুচ্ছ মনে হয়। কয়েক বছর পূর্বে একজন উড়িয়া ব্রাহ্মণকে যখন রাঁধবার কাজে বহাল করি তখন সে এক টাকা বেশি মাইনে চেয়েছিল, কারণ সে চতুঃশাস্ত্রে পণ্ডিত। জানতে চাইলাম কী কী শাস্ত্র। উত্তর দিলে, পড়তে জানি, লিখতে জানি, যোগ দিতে পারি, এ-বি-সি-ডি চিনি। লোকটির শাস্ত্রজ্ঞান যতই অল্প হোক, সে তার নিরক্ষর আত্মীয়-স্বজনের তুলনায় শিক্ষিত, এই অসামান্যতার গৌরব সে বুঝেছিল।

স্মরণশক্তি এবং বিচারশক্তির সাহায্যের জন্য মানুষ নানারকম প্রতীক বা সংকেতের উদ্‌ভাবন করেছে। পদার্থবিজ্ঞানী তাঁর আলোচ্য পদার্থের ধর্ম ও সম্বন্ধের প্রতীকস্বরূপ বিবিধ অক্ষর প্রয়োগ করেন। রসায়নী শাখা-প্রশাখাময় ফরমুলার দ্বারা বস্তুর গঠন নির্দেশ করেন। বিজ্ঞানচর্চার জন্য এই সব সংকেত অপরিহার্য, কিন্তু এদের প্রকাশশক্তি অতি সংকীর্ণ। কোনো বস্তু যখন উপর থেকে নীচে পড়ে, তখন তার বেগের ক্রমবৃদ্ধির হার বোঝাবার জন্য G অক্ষর চলে। কিন্তু এই অক্ষরটি দেখলে কোনোও বস্তুর পতন আমাদের মনে প্রত্যক্ষবৎ অনুভূত হয় না। জলের সংকেত H_2O দেখলে তৃষ্ণাহার পানীয় বা বৃষ্টিধারা বা মহাসাগর কিছুই মনে আসে না। সংগীতের জন্য স্বরলিপি উদ্‌ভাবিত হয়েছে। তা দেখে অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাল-মান-লয়ের বিন্যাস বুঝতে পারেন, কিন্তু তাতে গান-বাজনা শোনার ফল হয় না। হয়তো খুব অভ্যাস করলে স্বরলিপি পড়েই সংগীতের স্বাদ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সম্ভবত এরকম অভ্যাসের প্রয়োজন কোনো কালে হবে না। সঙ্গীত যতই কাম্য হোক তা এমন আবশ্যক নয় যে শ্রুতিগত সাক্ষাৎ উপলব্ধির অভাবে সংকেতজনিত কল্পনার শরণ নিতে হবে।

সত্যমূলক বা কাল্পনিক কোনো ব্যাপার প্রতিরূপিত করবার যত উপায় আছে তার মধ্যে নাটকাভিনয় শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়, কারণ তা দেখা যায়, শোনাও যায়। তার পরেই মুখর চলচ্চিত্রের স্থান। শুনতে পাই এখন আর talkie যথেষ্ট নয়, smellie উদ্‌ভাবিত হচ্ছে, যাতে চিত্রার্পিত ঘটনার আনুষঙ্গিক গন্ধও পাওয়া যাবে। পরে হয়তো tastie আর touchie-র আবিষ্কারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের তর্পণ পূর্ণ হবে, ভোজের দৃশ্যে দর্শককে খাওয়ানো এবং দাঙ্গার দৃশ্যে কিঞ্চিৎ প্রহার দেওয়া হবে। কিন্তু অভিনয় বা সিনেমা কোনোটি সহজলভ্য নয়, বিশেষ বিশেষ বিদ্যার সংকেতও আমাদের কাছে প্রত্যক্ষতুল্য নয়। লিখিত সাহিত্যই একমাত্র উপায় যাতে জ্ঞান বা অনুভূতি সঞ্চারের জন্য কোনো আড়ম্বর দরকার হয় না, নূতন সংকেতও অভ্যাস করতে হয় না।

সাহিত্যের যা বিষয় তা এতই বিচিত্র আর জটিল যে তার প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পাওয়া অসম্ভব। কবি বর্ণিত নিসর্গদৃশ্য বা মানবচরিত্র অথবা ভূগোলবর্ণিত বিভিন্ন দেশ-নদী-পর্বত-সাগরাদি, আমরা ইচ্ছা করলেই দেখতে পারি না। ঐতিহাসিক ঘটনা বা

গ্রহনক্ষত্রের রহস্য আমাদের দৃষ্টিগম্য নয়। মৃত মহাপুরুষদের মুখের কথা শোনাবার উপায় নেই। বিজ্ঞান বা দর্শনের সকল তথ্যের সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ অসম্ভব। অথচ অনেক বিদ্যা অল্পাধিক পরিমাণে শিখতেই হবে, নতুবা মানুষ পঙ্গু হয়ে থাকবে। হিতোপদেশে আছে :

অনেকসংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকম্।
সর্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য ন্যস্ত্যন্ধ এব সঃ।।

অনেক সংশয়ের উচ্ছেদক, অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রদর্শক, সকলের লোচনস্বরূপ শাস্ত্র যার নেই সে অন্ধই। শাস্ত্র অর্থাৎ বিদ্যা শেখবার এই প্রয়োজন থেকেই সংকেতময় লিখিত সাহিত্যের উৎপত্তি। যা মনোগ্রাহ্য হতে পারে না তা সভ্য মানবের পূর্বপুরুষদের চেষ্টায় কৃত্রিম উপায়ে চিরস্থায়ী এবং সকলের অধিগম্য হয়েছে। একজন যা জানে তা সকলে জানুক, সাহিত্যের এই সংকল্প মুদ্রণের আবিষ্কারে পূর্ণতা পেয়েছে।

যে ভাষা অবলম্বন করে সাহিত্য রচিত হয় সেই ভাষাও সংকেতের সৃষ্টি। এই সংকেতে শব্দাত্মক ও কাব্যাত্মক, কিন্তু বিজ্ঞানাদির পরিভাষার তুল্য স্থির নয়, প্রয়োজন অনুসারে শব্দের ও বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত হয়। আমাদের আলঙ্কারিকগণ শব্দের ত্রিবিধ শক্তির কথা বলেছেন, অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। প্রথমটি কেবল আভিধানিক অর্থ প্রকাশ করে, আর দুটি থেকে প্রকরণ অনুসারে গৌণ অর্থ পাওয়া যায়। শব্দের যেমন ত্রিশক্তি, বাক্যের তেমন। উপমা রূপক প্রভৃতি বহুবিধ অলঙ্কার। সাহিত্যের বিষয়ভেদে শব্দ ও বাক্যের অভিপ্রায় এবং প্রকাশশক্তি বদলায়। স্থূল বিষয়ের বর্ণনা বা বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের ভাষা অত্যন্ত সরল না হলে চলে না, তাতে শব্দের অভিধা বা বাচ্যার্থই আবশ্যক, লক্ষণা আর ব্যঞ্জনা বাধাস্বরূপ। উপমার কিছু প্রয়োজন হয় ; কদাচিৎ একটু রূপকও চলতে পারে, কিন্তু উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অন্যান্য অলঙ্কার একেবারেই অচল। 'হিমালয় যেন পৃথিবীর মানদণ্ড', এ ভাষা কাব্যের উপযুক্ত কিন্তু ভূগোলের নয়।

যন্ত্রাদি বা মানবদেহের গঠন বোঝাবার জন্য যে নক্সা আঁকা হয় তা অত্যন্ত সরল, তার প্রত্যেক রেখার মাপ মূলানুযায়ী, তা দেখে অঙ্গ-প্রতঙ্গের অবস্থান, আকৃতি আর আয়তন সহজেই মোটামুটি বোঝা যায়। যন্ত্রবিদ্যা, শারীরবিদ্যা প্রভৃতি শেখবার জন্য নক্সা অত্যাবশ্যক, কিন্তু তা শুধুই একসমতলাশ্রিত মানচিত্র বা diagram. তাতে মূল বস্তু প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয় না। তার জন্য এমন ছবি চাই যাতে অঙ্গের উচ্চতা নিম্নতা, দূরত্ব নিকটত্ব প্রভৃতি পরিস্ফুট হয়। ছবিতে চিত্রকর পরিপ্রেক্ষিতের নিয়ম রেখা বিকৃত করেন, উচ্চাবচতা বা আলো-ছায়ার ভেদ প্রকাশের জন্য মসীলেপের তারতম্য করেন, ফলে মাপের হানি হয়, কিন্তু বস্তুর রূপ ফুটে ওঠে। ঠিক অনুরূপ প্রয়োজনে লেখককে ভাষার সরল পদ্ধতি বর্জন করতে হয়। যেখানে বর্ণনার বিষয় মানবপ্রকৃতি বা হর্ষ, বিবাদ, অনুরাগ, বিরাগ, দয়া, ভয়, বিস্ময়, কৌতুক প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় চিত্তবৃত্তি, সেখানে শুধু শব্দের বাচ্যার্থ আর নিরলংকার

বৈজ্ঞানিক ভাষায় চলে না। নিপুণ রচয়িতা সে স্থলে ত্রিবিধ শব্দবৃত্তি এবং নানা অলঙ্কার প্রয়োগে ভাষার যে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেন তাতে অতীন্দ্রিয় বিষয়ও পাঠকের বোধগম্য হয়।

অনেক আধুনিক লেখক নতুনতর সাঙ্কেতিক ভাষায় কবিতা লিখছেন। এই বিদেশাগত রীতির সার্থকতা সম্বন্ধে বহু বিতর্ক চলেছে, অধিকাংশ পাঠক এসব কবিতা বুঝতে পারেন না। জনকতক নিশ্চয়ই বোঝেন এবং উপভোগ করেন, নয়তো ছাপা আর বিক্রয় হত না। চিত্রে cubism আর sur-realism-এর তুল্য এই সঙ্কেতময় কবিতা কি শুধুই মুষ্টিমেয় লেখকের প্রলাপ, না অনাস্বাদিতপূর্ব রস-সাহিত্য? মীমাংসার সময় এখনও আসেনি। নূতন পদ্ধতির লেখকরা বলেন, এককালে রবীন্দ্রকাব্যও সাধারণের অবোধ্য ছিল, অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত চিত্রকলাও উপহাস্য ছিল। ভাবী গুণগ্রাহীদের জন্য সবুর করতে আমি রাজি আছি। হয়তো এঁদের কথা ঠিক, কারণ নূতন সঙ্কেতে অভ্যস্ত হতে লোকের সময় লাগে। হয়তো এঁদের ভুল, কারণ সঙ্কেতেরও সীমা আছে। নূতন কবিদের কেউ কেউ হয়তো সীমার মধ্যেই আছেন, কেউ কেউ বা সীমা লঙ্ঘন করেছেন। বিতর্ক ভাল, তার ফলে সদ্‌বস্তুর প্রতিষ্ঠা অথবা অসদ্‌বস্তুর উচ্ছেদ হতে পারে। যাঁরা বিতর্কে যোগ দিতে চান না. তাঁদের পক্ষে এখন সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখাই উত্তম পন্থা।

সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীরাজশেখর বসু অসুস্থতাবশত অনুপস্থিত থাকায় তাঁর ভাষণটি পাঠ করেন শ্রীদেবেশ দাস। ভাষণটি নিখিলভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের নিউ দিল্লি অধিবেশনে (১৯৪৪) প্রদত্ত হয়।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণ

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইতেছি। বঙ্গ-সাহিত্যের বিশাল বনস্পতির ছায়াতলে আমরা বৎসরে একবার করিয়া বাংলার বাহিরে সম্মিলিত হই। এই সম্মেলন ভারতের নানাস্থান হইতে সমাগত বঙ্গ-সাহিত্যসেবক ও সাহিত্যা মোদীদের পারস্পরিক মিলনের এক সার্থক উপলক্ষ্য।

এবারকার সম্মেলনের অধিবেশন-স্থান ভারতের রাজধানী দিল্লি ; অতীত ইতিহাসের সুদূর অস্পষ্ট দিনেও দিল্লির উপকণ্ঠে আর্যরাষ্ট্র-শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইয়াছে, পাঠান-মোগল-ইংরাজ-রাজত্বের অবসান ঘটিয়াছে, কিন্তু দিল্লির মহিমাসূর্য অস্তমিত হয় নাই। ইংরেজ কবি বলিয়াছেন, 'Soft ! thy tread is on an empire's dust.' দিল্লি কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনই না দেখিয়াছে—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

> তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
> উড়ে যায় দিল্লীর পথের ধূলি 'পরে।

ইতিহাসবিধাতার প্রিয় লীলাভূমি এই নগরীতে যেখানে বিংশ শতাব্দীর বাঙালি বীর ও ভারতের নেতাজি সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন সত্য হইয়া উঠিয়াছে,—লালকেল্লায় ভারতীয় স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়াছে, সেই দিল্লিতে আপনাদিগকে অভ্যর্থনা জানাইয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছি।

এই সম্মেলনের পরিধি সংকীর্ণ নহে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ-বিভাগের নীতি বহুক্ষেত্রে স্বীকৃত হইলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে নীতি অচল ; প্রাদেশিক বিভাগের দ্বারা সাহিত্যের ক্ষেত্র বিভক্ত বা সীমাবদ্ধ হয় না বা করা যায় না। সকল সভ্যদেশেই ইহা স্বীকৃত।

সাহিত্যের মানচিত্রে প্রান্ত-প্রত্যন্তের সীমারেখা অবলুপ্ত। আজিকার সাহিত্য সম্মেলনে তাই ভারতের সকল প্রদেশবাসীকেই আমরা সাদরে আহ্বান করি।

প্রতি বৎসর আপনারা ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে সমাগত হইয়া এই সম্মেলনে জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে ভাবের আদান-প্রদান করেন। দীর্ঘকাল এই বাৎসরিক সম্মেলন ভারতে বাঙালি সমাজের বিস্তার এবং ঐক্যের পরিচয় দিয়াছে। নিজ প্রদেশের বাহিরে গিয়াও বাঙালি বঙ্গদেশকে ভোলে নাই, বাঙলার সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ রাখিয়া তাহাকে বৈচিত্র্য দানে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বাঙলার সঙ্গে প্রবাসী বাঙালির সহমর্মিতা স্বাভাবিক এবং দীর্ঘকাল ধরিয়াই বিদ্যমান রহিয়াছে। অদৃষ্টের নানা ঘাতপ্রতিঘাতেও ইহা লুপ্ত হয় নাই।

পাঁচ বৎসর পূর্বে ১৩৫০ বঙ্গাব্দে এই দিল্লি-নগরীতেই প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যের একবিংশতম অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। বাংলা সেদিন মন্বন্তরে মুমূর্ষু ; লোভীর নিষ্ঠুর লোভ ও বঞ্চিতের নিত্য-চিত্তক্ষোভে সমগ্র দেশ আলাড়িত। আজ ভারত স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে বটে, কিন্তু আজও বাঙালির দুর্দিনের অবসান হয় নাই। আজ বাংলা খণ্ডিত হইয়াছে। তাহার বৃহৎ এক অংশ ভারতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। অগণিত বাস্তুহীন বাঙালির যেন আজ ধরণীর কোলে কোথাও স্থান নাই। দুর্ভিক্ষ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিপীড়ন শেষ হইতে না হইতে বাঙালি আবার গৃহহীন সর্বহারা হইয়া পড়িয়াছে। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে আজ ছয় কোটি বাঙালির অধিকাংশ প্রবাসী কেবল প্রবাসী নহে তাহারও অধিক,—রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্ন .

যে সমস্ত বাঙালি বাংলার বাহিরে ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রদেশে বাস করেন, তাঁহাদের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব ও অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু পূর্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে যে অগণিত বাঙালি ভারতীয় রাষ্ট্রের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছেন তাঁহাদের সমস্যার কি প্রতিকার হইবে? তাঁহাদিগকে লইয়া বাঙালি সমাজের যে সমগ্রতা তাহা রক্ষা করার কী কী ব্যবস্থা হইবে? ইহা আমাদের সম্মুখে এক প্রকাণ্ড সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান চিন্তা করিতে সাহিত্য-সাধকগণকে আমি অনুরোধ জানাইতেছি। রাজনীতি ও রাষ্ট্র আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে ছেদ ঘটাইয়াছে তাহার ওপর দিয়া মিলনের সেতু রচনা করিতে সাহিত্যিকগণকে আমি আহ্বান করিতেছি।

বাঙালি বলিয়া আমরা যদি গৌরব বোধ করি, আশা করি কেহ তাহাকে স্পর্ধা বলিয়া বিবেচনা করিবেন না। আমাদের জীবনেও দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে, অপমান-অত্যাচার আছে এবং হয়তো কিছু বেশি পরিমাণেই আছে। তাহার জন্য আক্ষেপ করিব না ; দুই শতাব্দীর পরাধীনতা আমাদের দেহমনকে যতটা পীড়িত করিয়াছে আর কাহাকেও ততটা আঘাত করিয়াছে কিনা সন্দেহ। আজ বিদেশি শাসনের অবসান ঘটিয়াছে ; সংগ্রামে আমরা জয়লাভ করিয়াছি, কিন্তু আমাদের ক্ষতচিহ্ন এখনও মুছিয়া যায় নাই। কখনো যদি নাই মুছে, তাহাতেই বা দুঃখ কী? ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, প্রদেশগত সুবিধার জন্য

নহে, সমগ্র দেশের ও সমগ্র জাতির কল্যাণের দিকে চাহিয়া যাহারা বুক পাতিয়া আঘাত সহ্য করে তাহাদের ত্যাগ ব্যর্থ হয় না।

কিছুকাল যাবৎ ভারতের স্থানে স্থানে সংকীর্ণ প্রাদেশিক বুদ্ধির অতিমাত্রায় প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে। এখন হইতেই এই ভাব দূর করিতে না পারিলে সাম্প্রদায়িকতার ন্যায় প্রাদেশিকতাও ভারতের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে। বিহার বিহারির জন্য, আসাম অসমীয়াদের জন্য, বাংলাদেশ বাঙালির জন্য এই প্রকার ভাবধারা জাতীয়তা এবং ঐক্যের পরিপন্থী। এই সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা দূর করিতে হইলে প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসীদের মতো প্রবাসীদেরও তত্তৎপ্রদেশের প্রতি কর্তব্য আছে। এ কর্তব্য প্রতি প্রদেশের প্রবাসীদের পক্ষে প্রযোজ্য। ইংরেজরা যেভাবে ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল বাস করিয়া দূরবিন দিয়া দূর হইতে এ দেশবাসীকে দেখিয়া তাহাদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন না করিয়াই স্বদেশে চলিয়া যাইতেন, ভারতবর্ষের এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশে বাস করিবার সময়ে যেন সেই মনোবৃত্তি অবলম্বন না করেন।

ভারতে বিভিন্ন প্রদেশগুলির যে স্বাতন্ত্র্যই গড়িয়া উঠুক না কেন, প্রত্যেকেরই ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূলে রহিয়াছে এক সংস্কৃত ভাষা এবং এক ভারতীয় সংস্কৃতি। সুতরাং ভারতের বিভিন্ন ভাষা এবং সংস্কৃতিতে ঐক্যের সন্ধান-পাওয়া শুধু সম্ভবপর নয়, অনায়াস সাধ্য। বিভিন্ন প্রাদেশিক লিপি এ-ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে তাহা দূর করা কিছুমাত্র দুঃসাধ্য নহে। আজ যদি সমস্ত প্রাদেশিক ভাষাই স্বীয় লিপির সঙ্গে সঙ্গে দেবনাগরী লিপিও গ্রহণ করে, অর্থাৎ যদি দেবনাগরী লিপিতেও প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির মুদ্রণ হয়, তবে তাহাতে শুধু যে প্রদেশগুলির পক্ষে পরস্পরের সংস্কৃতির স্বাদ গ্রহণ করার পথ সুগম হইবে তাহা নয়, আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন সংস্কৃতিগুলি একটা স্বাভাবিক সমন্বয় এবং সর্বভারতীয় ঐক্যের পথে চলিবে। শুধু অনুবাদের ভিতর দিয়া কেবল বিভিন্ন সাহিত্যের মূল রস পূর্ণভাবে আস্বাদ করা যায় না। সর্বভারতীয় ঐক্যের জন্য একটি সর্বভারতীয় লিপি আবশ্যক—এক্ষেত্রে দেবনাগরীই হইবে সেই লিপি। অবশ্য একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, লিপি ভাষা নহে, ভাষার চিহ্নমাত্র। সমগ্র ইউরোপে একই রোমান লিপি প্রচলন থাকা সত্ত্বেও সেখানে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকীর্ণতা ও দ্বন্দ্বের লাঘব হয় নাই। তাহা হইলেও যেখানে বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের মূল উৎসব অভিন্ন, সেখানে সর্বভারতীয় লিপির প্রচলনের দ্বারা প্রদেশগুলির মধ্যে আত্মীয়তা ও সম্প্রীতি বর্ধিত, প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হইবে এবং সর্বভারতীয় ঐক্য একটা দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য আজ যে স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা যেমন বাঙালির গৌরব, তেমনই ভারতের গৌরব ; সাহিত্যের দিক দিয়া পৃথিবীর মানচিত্রে বাঙালিই যে ভারতের স্থান করিয়া দিয়াছে একথা ভারতবর্ষ উপলব্ধি করে এবং আনন্দের সহিত স্বীকার করে। বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্যে আজ ভারতের সর্বসাধারণের অধিকার। সে অধিকার

যাহাতে তাহার প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করিতে পারে তাহার সুযোগ করিয়া দেওয়া আমাদের বিশেষ কর্তব্য। বিশ্বভারতীর উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের *সঞ্চয়িতা* গ্রন্থ দেবনাগরী অক্ষরে (বাংলা ভাষাতেই) প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ইহা আনন্দের সংবাদ সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু *সঞ্চয়িতা* নহে, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য বাংলা রচনারও এইরূপ দেবনাগরী সংস্করণ আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সুপ্রতিষ্ঠিত বাঙালি সাহিত্যিকদিগের পরিচয় এ-পর্যন্ত অনুবাদের সাহায্যেই অবাঙালি পাঠক-পাঠিকারা লাভ করিয়া আসিয়াছে। ইঁহাদের গ্রন্থাবলিরও দেবনাগরী সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। ভারতের বিভিন্ন অংশের সাংস্কৃতিক মিলন সাধনের পক্ষে প্রস্তাবিত এই উপায়কে আপনাদের বিবেচনার জন্য এই সভা সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। এই প্রসঙ্গে আরও একটি উপায় বিশেষ চিন্তনীয়। প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মেলন পৃথকভাবে আপন আপন সমস্যা আলোচনা করে ও করিবে। কিন্তু ইহা ছাড়া তাহাদের প্রতিনিধিদের লইয়া সর্বভারতীয় সাহিত্য-সম্মেলনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কীভাবে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহাদের প্রসার ও প্রচার ঘটিতে পারে, কীভাবে সাহিত্যসাধনার ভিতর দিয়া প্রাদেশিকতার ভাব দূর হয়, ভারতের জাতীয় ঐক্য পরিপুষ্ট হয় ও ভারতীয় সংস্কৃতি শক্তিশালী হইতে পারে, ইহাই সেই সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে। আমি আশা করি, আমার এই প্রস্তাব বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মেলনের কর্তৃপক্ষেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

বাংলা সাহিত্যে এক অভাবনীয় জাগরণ শুরু হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীতে। ইহার মূলে ছিল যেমন বাঙালির প্রতিভা, অবস্থাও ছিল তেমনই অনুকূল। উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং চিন্তাধারার স্রোত বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে জোয়ার আনিয়াছিল। এই রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ। বাঙালি সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য ভাবধারার সন্ধান পাইয়াছিল ; তাই নূতন যুগের বাণী সর্বপ্রথম বাঙালির কণ্ঠেই উচ্চারিত হইয়াছিল। এই ঘটনা দ্বারা ইহা প্রমাণ হয় জাতীয় জীবনে বিচ্ছিন্নতা এবং সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু। সমস্ত পৃথিবীতে জীবনের ধারা বহিয়া চলিয়াছে তাহার সঙ্গে যোগ স্থাপনেই জীবন এবং অগ্রগতি। পিছনে থাকিয়া স্বদেশের সংস্কৃতিতে বিধি নিষেধের সংকীর্ণ প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাহিলে আমরা শুধু অচলায়তনই গড়িয়া তুলিব। তাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গতি অব্যাহত রাখিতে হইলে অন্য ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে যোগ রাখিতে হইবে, বিদেশের ভাবধারায়ও অবগাহন করিতে হইবে। এই জন্যই বাঙালিকে এখন পূর্বাপেক্ষাও অধিকভাবে ইংরেজি, ফরাসি ইত্যাদি বিদেশি ভাষার সঙ্গে পরিচয় রাখিতে হইবে। এতকাল ভারতীয়দের ইংরেজি শিখিতে হইয়াছিল রাষ্ট্রভাষা ছিল বলিয়া, কিন্তু বাঙালি ইংরেজি ভাষা এবং সাহিত্য আত্মস্থ করিয়াছে তাহার সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যের জন্য। শুধু চাকরির প্রয়োজনে যে শিক্ষার দরকার ছিল বাঙালি তাহা অপেক্ষা অধিক শিখিয়াছে এবং সে

শিক্ষাকে আনন্দে পরিণত করিয়াছে। আজ চাকরির প্রয়োজনে ইংরেজির মূল্য কমিলেও বাঙালি-প্রতিভার নিকট বিদেশি ভাষা ও সাহিত্যের মূল্য এবং প্রয়োজন কমিতে পারে না। পশ্চিমে যে দ্বার একদিন খুলিয়া গিয়াছিল, সে দ্বার যদি আরও প্রসারিত করিতে না পারি, তবে স্বাধীনতার সার্থকতা কোথায়? যে সমস্ত মহাপুরুষ বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙালি সমাজের উন্নতির ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই একদিন পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে বাঙালি জীবনের বিপুল বিকাশ দেখাইয়া গিয়াছেন। আজ বাঙালি সমাজের সর্বাধিক গৌরবের সামগ্রী বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য। আমাদের যে দেশপ্রীতির বন্যা একদিন সমস্ত ভারতকে প্লাবিত করিয়াছিল সে দেশপ্রীতি শুধু কর্মেই নিঃশেষিত হয় নাই ; সেদিন বাংলার চিত্তের উন্মাদনা সাহিত্যরূপেও প্রকাশ পাইয়াছে, আবার সাহিত্যই তাহাকে জন্ম দিয়াছে, পুষ্ট করিয়াছে। বাঙালি ভারতবর্ষে অর্থসম্পদে প্রাধান্য পায় নাই। কিন্তু চিত্তের সম্পদে যেমন নিজেকে পরিপুষ্ট করিয়াছে তেমনই দেশমাতৃকার সেবা করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছে।

স্বদেশি আন্দোলনের বহু পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র *আনন্দমঠে* সনাতন-ধর্মের আদর্শ। ঘোষণা করিয়াছেন, সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য বন্দে মাতরম্ মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব সংগীত বাঙালি-চিত্তে দেশপ্রীতির উৎস খুলিয়া দিয়াছে। বাঙালি গাহিয়াছে :

ও আমার দেশের মাটি,
তোমার পরে ঠেকাই মাথা,
তোমাতে বিশ্বময়ীর,
তোমাতে বিশ্বমায়ের
আঁচল পাতা।

বাঙালির রাজনীতি যে শুধু শুষ্ক তর্কনির্ভর নয়, তাহার প্রমাণ মিলিল যখন অসহযোগ আন্দোলন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মতো কবিকেও গ্রাস করিয়া ফেলিল। রাজনীতির কঠোর জীবনের মধ্যে, স্বাধীনতার যজ্ঞে আত্মাহুতির মধ্যে তিনি *সাগর সঙ্গীত* শুনিতে পাইলেন। সাহিত্য-সেবা দেশ-সেবায় পর্যবসিত হইয়া তাঁহার জীবন একটি সার্থক সুন্দর সুমহৎ কবিতায় পরিণতি লাভ করিল।

শুধু দেশপ্রীতিই যে বাংলা কাব্যে গান গাহিয়া উঠিয়াছে তাহা নয়, বাংলা কাব্যের সরস্বতী বহুসুরবিশিষ্ট। কাব্য এবং কথা-সাহিত্যে বাঙালির কীর্তি লইয়া আমরা যথার্থই গর্ব অনুভব করিতে পারি। কিন্তু যতদূর অগ্রসর হইয়াছি তাহাতে গৌরব অনুভব করিয়া সেখানেই থামিয়া যাওয়া জীবনের লক্ষণ নয়। বরং আমাদের কীর্তিতে কোথাও ফাঁক রহিয়াছে কি না সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সেই ফাঁক পূরণ করিয়া নূতন নূতন সম্ভাবনার দিকে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের সাহিত্যের যে দিকটা অপেক্ষাকৃত

দুর্বল তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজ মনে করি। কাব্যের তুলনায় আমাদের প্রবন্ধ-সাহিত্য দরিদ্র ইহা অস্বীকার করা চলে না। অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ মনীষীগণ অতীতে প্রবন্ধ-সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন সত্য এবং কাব্যের মতো গগনস্পর্শী না হইলেও, প্রবন্ধ-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের কীর্তি যে বিরাট ইহা স্বীকার করিয়াও বলা যায় যে, বৈচিত্র্য এবং প্রাচুর্যের দিক দিয়া বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য বর্তমানে আশানুরূপ সমৃদ্ধ নয়। বাংলা-সাহিত্যে আজ পর্যন্ত যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে তাহা রাষ্ট্রশক্তির আনুকূল্যের অপেক্ষা রাখে নাই। কাজেই অবস্থা এবং পারিপার্শ্বিকের দোষ দিয়া লাভ নাই। আমাদের স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিতে হইবে কি উপায়ে বর্তমানে বাঙলা সাহিত্যের এই উপেক্ষিত অংশ বলিষ্ঠ করা যায়। যে প্রখর বাস্তবনিষ্ঠা গভীর মননশীলতা এবং বলিষ্ঠ চিন্তাশীলতা প্রবন্ধ-সাহিত্যের উৎকর্ষের মূলে তাহার যথাযোগ্য অনুশীলন আজকাল দেখা যাইতেছে না। বাংলা সাহিত্যের যাঁহারা দিকপাল তাঁহাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করি।

আজ বাঙালি সমাজের সম্মুখে বিভিন্ন এবং বিচিত্র প্রকার কঠিন সমস্যা দেখা দিয়াছে। এই সমস্যাগুলির সন্তোষজনক সমাধান না হইলে বাঙালি সমাজ সম্মানের সঙ্গে বাঁচিতে পারিবে না। হীন এবং দুর্বল হইয়া পড়িলে বাংলাদেশ ভারতবর্ষকেও দুর্বল করিবে, কেননা অংশের শক্তিই সমগ্রের শক্তির উৎস। দুর্গতি হইতে বাংলাদেশকে বাঁচাইবার ভার সমগ্র বাঙালি সমাজের ওপর। আজ কি উপায়ে সেই মহৎ কর্তব্য পালন করা সম্ভব তাহাই আপনাদিগকে ভাবিতে বলি। এ-বিষয়ে গত শতাব্দীতে যে সমস্ত মনীষীর প্রতিভার জন্য আজ বাঙালি শ্রদ্ধেয়, তাঁহাদের জীবন হইতে আমরা এক বিশেষ শিক্ষালাভ করিতে পারি। বস্তুত আজিকার দিনে এই শিক্ষা গ্রহণেরই প্রয়োজন হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—'চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না।' এই পরম সত্য কথা আজ বিশেষভাবে স্মরণ করিবার সময় হইয়াছে। সাধনা ও নিষ্ঠা, সততা ও শৃঙ্খলাপরায়ণতা, নিয়মানুবর্তিতা ও শ্রমশীলতা অবলম্বন না করিয়া আমরা বড়ো হইতে পারিব না। এই গুণসমষ্টির অভাবে জাতি বাঁচিতেই পারে না, বড়ো হওয়া দূরের কথা। কিছুকাল পূর্বেও শিক্ষা, সাহিত্য এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে অগ্রণী হইয়া বাঙালি ভারতে নেতৃত্বের অধিকার পাইয়াছিল। ইহার পিছনে ছিল বাঙালির বিরাট সাধনা। আজিকার দুর্দিন অতিক্রম করিতে হইলে আমাদের পূর্ববর্তীগণ যে সাধনার বলে বড়ো হইয়াছিলেন তাহারই অনুশীলন করা কর্তব্য। আজ আমরা যে সংকটের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি বাঙালি-সমাজের ইতিহাসে এমন সংকট ইতিপূর্বে আসে নাই। প্রথম হইতে বাঙালি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রণী হইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া ত্যাগ স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য শেষ পর্যন্ত বাংলাকে খণ্ডিত হইতে হইয়াছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইহার নিদারুণ প্রতিক্রিয়া হইতে বাঙালি সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাহিত্যিক ভবিষ্যৎকে বাঁচাইতে

হইলে বাঙালিকে আবার পুরুষসিংহের মতো দাঁড়াইতে হইবে। শুধু পূর্বগৌরবের কথা প্রচারের দ্বারা শ্লাঘা বোধ করিলে চলিবে না, অথবা বর্তমান দুর্দশার কথা বারবার ঘোষণা করিয়াও মুক্তি আসিবে না। কঠিন হস্তে সকল মলিনতা ও দুর্বলতাকে দূর করিতে হইবে এবং স্বীয় চরিত্রশক্তি সম্বল করিয়া কর্তব্যসাধনের ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে ; তবেই সমাজ রক্ষা পাইবে, পুনরুত্থান সম্ভব হইবে। সাহিত্যের দিক দিয়া এক্ষেত্রে যাহা কর্তব্য, বর্তমান সম্মেলনে আপনারা তাহা বিবেচনা করিবেন। ৭৭ বৎসর পূর্বে জাতিগঠনের মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া বঙ্কিমচন্দ্র *বঙ্গদর্শন* স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন সাহিত্য শুধু জীবন প্রতিফলিত করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, সাহিত্য জাতির পথপ্রদর্শনও করিয়া থাকে। সাহিত্য জাতির আশা আকাঙ্ক্ষাকে যেমন রূপায়িত করে, তেমনই তাহাকে গতিও দেয়। ভাষা এবং সাহিত্যের পথ দিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র জাতিগঠনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কী অসামান্য কীর্তির প্রতিষ্ঠাই তিনি করিয়াছিলেন, তাহার আজ আমরা তাঁহার পরবর্তীরা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। তাঁহার তিরোধানের পর প্রত্যক্ষে হউক, পরোক্ষে হউক, রবীন্দ্রনাথ বাঙালি-সমাজের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। বাঙালির সাহিত্য-প্রতিভা একদিন জাতিগঠনের প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছে, আজ চরম দুর্দিনে সমাজকে রক্ষা করিবার প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তাহার প্রাণে পুনরায় বল সঞ্চার করুক, ইহাই প্রার্থনা।

বন্দে মাতরম্।

* প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন, ১৩৫৫, দিল্লি

দিল্লিতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, ১৩৫৫ অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সাহিত্য-শাখার সভাপতির ভাষণ

মানুষকে প্রণাম। যে মানুষ সাহিত্যের উপজীব্য তাকে। যে মানুষ সাহিত্যের রচয়িতা তাকেও।

কেন লিখি? এক কথায় বলতে পারি নিজেকে ব্যক্ত করতে, প্রকাশিত করতে। চারদিকে যে আনন্দময় প্রকাশ দেখি, অজস্র ও বিচিত্র, অকৃপণ ও অপরিমেয়, প্রত্যহের সূর্যোদয়ে তৃণোজ্জ্বল মাঠে, তারাভরা রাত্রিতে, আশেপাশের মুখগুলিতে, তারই সুর লাগে বাঁশিতে, রং ধরে রক্তে। ইচ্ছে হয় আমিও প্রফুল্ল হয়ে পরিপূর্ণ হয়ে বিকশিত হয়ে উঠি। প্রকৃতির পৃষ্ঠায় সুনীলে-শ্যামলে ধূসরে-পাটলে যে চিঠি লেখা হচ্ছে দিনরাত, দিই তার একটি যোগ্য প্রত্যুত্তর। এই ধ্বনির জগতে আমি কেন মূক হয়ে থাকি, রঙের জগতে বিষণ্ণ বিবর্ণ। অকৃপণের সংসারে এসে আমি কেন ঠকি, কেন ক্ষুদ্র ও খর্ব অল্প ও আংশিক হয়ে থাকি? আকাশময় আনন্দ না থাকলে কে প্রাণধারণ করত। এই আকাশময় আনন্দের দিকে তাকিয়ে কেন বলতে পারব না, নাও আমার জীবনময় অভিনন্দন।

এ ব্যাখ্যা হয়তো কারু-কারু মনঃপূত হবে না। তাঁরা বলবেন দেশের ভালো করবার জন্যে লিখি, লিখি সমাজের অব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করতে, সংগ্রামের প্রেরণা জোগাতে। এ ছোটো কথা, আংশিক কথা। যাকে বলেছে 'এহ বাহ্য আগে কহ আর'। এর উপরে আরো কিছু কথা আছে, এর বাইরে আরও একটা পথ আছে, যেখানটায় অন্ত বলছেন তাঁরা, সেখান থেকেই আবার নতুন দিগন্তের শুরু। দেশের ভালো কে না চায়, কে না চায় অভাবের নিরসন, অব্যবস্থার অবসান। কিন্তু হিতকামীরা সবাই কি আর লেখে? না, হিতকামীদের সব লেখাই সাহিত্য হয়? ছাঁচে-ঢালা অঙ্ক-কষা ফর্মুলা মানা বিজ্ঞাপন বা বিবৃতি, প্রচারপত্র বা প্রাচীর-পত্রকে কি সাহিত্য বলব? শুধু সেই সাহিত্যিক যে দুই চক্ষু দিয়ে দেখেও আরেক চক্ষু, তৃতীয় চক্ষু দিয়ে দেখে। বাস্তবের কালির সঙ্গে মেশায় তার হৃদয়রসের নির্যাস। অভাবের সংসারে থেকেও যে ভাবকে অভাবনীয় ভাবে না। তুচ্ছের

মুখশ্রীতেও যে অসামান্যের বিস্ময়টিকে খুঁজে পায়। বেশভূষা ছাপিয়ে যেমন সৌন্দর্য তেমনি ভাষার সমস্ত স্পষ্টতার ঊর্ধ্বে যে একটি অনির্বচনীয়তার ইঙ্গিত রাখে। উপায় নেই, সাহিত্য করতে গেলেই ভাবের ঘরে বসত করতে হবে, করতে হবে ভাবের হাটে বেচাকেনা।

অভাবের কথা বলো, কতক্ষণ বলবে? অভাবের শেষ আছে। কিন্তু ভাবের কথা বলো, বলবে অফুরন্ত। ভাবের শেষ নেই। জ্ঞানের কথা একবার জানলেই বাসি হয়ে যায়। প্রয়োজন মিটে গেলে আর কার কাছে ফর্দফিরিস্তি দাখিল করবে? উদ্দেশ্যসাধনের পর কোথায় যাবে, কোন্ অনির্দেশ্যের সাধন করতে?

তাই, বলতে সঙ্কোচ করে লাভ নেই, হৃদয়ের কথাটিই সাহিত্যের প্রাণবস্তু। যখনই জ্ঞানের কথা বলবে প্রমাণ চাইব। যখনই জৈববৃত্তির কথা বলবে বিজ্ঞানের বই খুলে দেখব মিলিয়ে। যখনই বাস্তবভূমির কথা বলবে জিগ্যেস করব কোন্ পাড়ায় তাকে দেখে এলে? কিন্তু হৃদয়ের কথা বলো, ষোলো আনার উপর আরো দু আনা মেনে নেবো। তোমার যা বাঁধাবরাদ্দ তার উপর পেয়ে যাবে কিছু উপরি পাওনা। আমার অকারণের খুশি। আমার সৌহার্দ্যের নৈবেদ্য। বস্তুত, তুমিও তো আমার হৃদয়কেই আকাঙ্ক্ষা করো, আমার হৃদয়ের মধ্যেই চাও তোমার প্রবেশ-প্রতিষ্ঠা। তুমি তো প্রচারিত হতে চাও না, সঞ্চারিত হতে চাও। যদি আমার 'সহিত' হতে চাও আর 'সহিত' না হলে তোমার সাহিত্য কোথায়, তবে, লজ্জা কোরো না, হৃদয়ের কথা বলো। আর যা কিছু আনতে চাও এনো, ধুলো আর ধোঁয়া, কাঁটা আর কাদা সংসারে যখন তা আছে, আর যখন সমগ্রকে নিয়েই তোমার কারবার, তখন তা ফেলবে কী করে, সঙ্গে সঙ্গে নিরাবিল নীল আকাশেরও খবর দিও। আকাশও তো আছে যিনি সকল দিক থেকে জগতের প্রকাশক তিনিই আকাশ, মাথার উপর থেকে তাকেই বা ফেলতে পাচ্ছ কই? যে আকাশ গণনাহীন সূর্যশশীতারকার খেলে বেড়াবার মাঠ, যে আকাশ পুরোনো হয়েও চিরনতুন।

আমরা আহার করি কেন? শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে? শুধু পুষ্টিসাধনের জন্যে? তাই যদি হবে তবে পরিমিত আমিষ, শর্করা, চর্বি ও স্নেহপদার্থ খেয়ে নিলেই তো হয়। কিন্তু শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তি বা পুষ্টিসাধনের জন্যেই খাই না, সঙ্গে আবার তুষ্টি চাই, চাই একটি সুস্বাদ। সেই তো ষোলো আনার উপরে দু আনা। খিদে মিটল এ কথা বলে আমাদের সুখ নেই, পেট ভরল এটি বলতে চাই। মা'র হাতের রান্না কেন এত মধুর? মা তাঁর ব্যঞ্জনে এমন একটি মশলা মেশান যা বেনের দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না। তা হচ্ছে তাঁর সন্তানের প্রতি অনুরাগ, সন্তানের প্রতি শুভধ্যান। সেইটিই সন্তানের কাছে, স্বাদগ্রাহীর কাছে, বাঁধাবরাদ্দের উপর উপরি পাওনা। একটি অতিরিক্ত স্পর্শ, অতিরিক্ত সুর। এই অতিরিক্তটিই হচ্ছে হৃদয়ের সামগ্রী। ব্যঞ্জনের নুন, মাল্যের গ্রন্থি। এই অতিরিক্তটি মেশাও তোমার সাহিত্যে। এটি না হলে তোমার সাহিত্য শুষ্ক শূন্য শ্রীহীন।

যখন বলছি ভাবের কথা তখন এ বলছি না ভাবালুতাই সাহিত্যের সত্যলক্ষণ। ভূমিত্যাগী ব্যোমবিহার আর যাই হোক মানুষের লক্ষণ নয়। আর, প্রধানত মানুষই যখন সাহিত্যের উপজীব্য তখন মূল মানুষ, সম্পূর্ণ মানুষটাকেই চাই। যদি ধর্মের কথা বলি তা মানুষের ধর্ম। যা জগতের মঙ্গল করে তাই ধর্ম। সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ উন্নতিই ধর্ম। তাই যদি ভূমার কথা বলি তা মানবিক ভূমা। মানুষের পরমতম প্রসারণের বিন্দু। 'আদ্য অন্ত এই মানুষ বাইরে কোথাও নাই।' তাই মানুষকে কেটে-ছেঁটে বাদ দিয়ে ছোটো করে নেওয়া যাবে না, ঢেকে রাখা যাবে না তার অখণ্ড পরিচয়, তার অনন্ত কৌলীন্য। মানুষই পরমপুরুষ। শুধু উদরপূর্তিতেই তার পরিপূর্ণতা, প্রয়োজনসাধনই তার জীবনের প্রসাধন, এই সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞায় মানুষকে আবদ্ধ করা মানেই মানুষকে অবজ্ঞা করা, অস্বীকার করা। যখন মোট মানুষটাকে চাই তখন তার শুধু উদরের খবর নিলে চলবে না, নিতে হবে হৃদয়ের খবর। শুধু ইন্দ্রিয়ের বর্ণচ্ছটা নয়, প্রেমের ইন্দ্রজাল। মানুষ যে অধীন নয়, সে যে স্বাধীন, এ গোপন করলে মানুষেরই অগৌরব।

তাই সাহিত্যে এই মানুষেরই আনাগোনা। কাছের মানুষ দূরের মানুষ, কিন্তু সব সময়েই আজকের মানুষ। যা সম্যকরূপে আজ তাই তো সমাজ। সমাজের মধ্যে থেকে তাকে এড়িয়ে যাব কী করে? চারদিকে যখন দেখব তাকিয়ে তখন শুধু চাঁদ দেখব ফুল দেখব পাখি দেখব, নির্যাতিত পরাভূত প্রবঞ্চিত মানুষগুলিকে দেখব না তাই বা হয় কী করে? আমি যদি ওদেরকে না দেখি, ওদের কথা না বলি তাহলে কে দেখবে কে বলবে? কিন্তু ওদেরকে ওই সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞায় চিহ্নিত করে দেখা সত্য দেখা হবে না। আসল সত্য সব সময়ে প্রত্যক্ষের উপরেই ভেসে বেড়ায় না, অপ্রত্যক্ষের মধ্যেও নিহিত থাকে। ওদের সঙ্গে করিয়ে দিতে হবে সেই অপ্রত্যক্ষের সাক্ষাৎকার। ওদেরও মধ্যে যে রয়েছে মহতের সত্তা বৃহতের আয়তন, উল্লেখ করতে হবে সেই বিচিত্রবাণী। কুণ্ঠিত পরিধির মধ্যে বিকৃত করে দেখার অমর্যাদা থেকে তাকে মুক্তি দিতে হবে। সে যে বিরাটের প্রতিনিধি, তার জীবনের বৃত্তবলয় যে বৃহত্তর হবার সম্ভাবনা রাখে, শোনাতে হবে সেই দৈববাক্য। দিতে হবে তাকে দারিদ্র্যমোচনের আশ্বাস। আসল দারিদ্র্য উপকরণহীনতায় নয়, পরিচয়হীনতায়। আমার কিছু নেই, তার চেয়েও বড়ো দুঃখ আমার আছে অথচ জানি না। সে দুঃখ পেতে দেব না মানুষকে। তাকে শুধু ভাঙনের কাজে লাগানো নয়, লাগাতে হবে বিস্তীর্ণ মঙ্গলব্যাপারে, জীবনের বৃহৎ অভ্যুদয়ে। তার শুধু বাঁচবার অধিকার এটুকু বলে থাকলেই চলবে না, বলতে হবে তোমার অমৃতের অধিকার।

তাই দুটো জিনিসকে মেশাতে হবে। সোনার সঙ্গে সোহাগা। উদরের সঙ্গে হৃদয়, বুদ্ধির সঙ্গে কল্পনা, দেহের সঙ্গে আত্মা। প্রয়োজনের সঙ্গে অনাবশ্যক। খণ্ডকালের সঙ্গে নিত্যকাল। কল্যাণের সঙ্গে সৌন্দর্য। যুগকে অস্বীকার কে করবে, কিন্তু উলঙ্ঘন করে নয়,

অতিক্রম করে যোগ রাখতে হবে সেই যুগাতীতের সঙ্গে। সাহিত্যের সৌধ ইদানীন্তনের ভিত্তিতে চিরন্তনের সৌধ। ক্ষণকালীনের ঘরে চিরকালীনের আতিথ্য। সীমান্বিতা পৃথিবীকে ঘিরে অন্তহীন নীলাম্বরের আলিঙ্গন।

চিরকালকে নিয়ে টানাটানি কেন? মানুষ জানে দেহে তার টিকে থাকা অসম্ভব, তাই সে তার সাহিত্যে বেঁচে থাকতে চায়। সাহিত্যে বেঁচে থাকা মানে আগামীকালের সুদূর কালের মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকা। হৃদয়ের মধ্যে বাঁচতে হলে হৃদয় হয়েই বাঁচতে হবে। অন্যের ভাবটি যেখানে নিজের ভাব হয়ে উঠবে, অন্যের অব্যক্তটি যেখানে হবে নিজের বক্তব্য, সেখানেই পাওয়া যাবে আহ্বান। সেই ভাবের বিকাশবিস্তার চিরন্তনের নিকেতনে। হৃদয় ছাড়া আর তীর্থ নেই। সাহিত্যই সেই তীর্থকে স্থায়ী করে রাখছে, দৃঢ় করে রাখছে মানসযাত্রী মানুষের পুণ্যস্নানের জন্যে। স্নান-শেষে সে নতুন করে অনুভব করবে নবজীবনের লাবণ্য।

নাই বা টিকল, ক্ষণিকের ঘরে ক্ষুদ্রকে নিয়ে থাকব, এ সাহিত্যের কথা নয়। এ একবেলার খবরের কাগজের কথা। আমাদের বাংলা সাহিত্যে একদিন যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ নিয়ে বিস্তর লেখা হয়েছিল, বেশির ভাগই এক ঋতুর শীতের পাতার মতো ঝরে পড়েছে। এর মধ্যে শুধু সেই কটিই টিকে থাকবে যাতে লেগেছে শাশ্বতকালের সুর। সাহিত্যে বাঁচবার অভিলাষ নেই, এ বলা প্রাণধারণ করতে ইচ্ছুক নই এ বলার সামিল। অহরহই মানুষের চেষ্টা কি করে বাঁচব, বংশে, সাহিত্যে, কীর্তিতে। সেই বাঁচাই সার্থক যাতে মানুষ দিতে পারে তার পরম পরিচয়, সে যে সুন্দর, সে যে আনন্দময় তার অভিজ্ঞান। আর এই সুন্দর ও আনন্দময়ের শাশ্বত সাক্ষর সাহিত্যে।

কত বিচিত্র স্রোতে বয়ে চলেছে বাংলা সাহিত্যের প্রাণধারা। সেই অভঙ্গ বঙ্গভূমি আর নেই, বিখণ্ড-বিকীর্ণ হয়ে গেছে। তার কত সমস্যা কত যন্ত্রণা, বলে লিখে শেষ করা যাবে না। তবু সহস্র বাধাবিপদের মধ্যেও তার প্রাণ উন্মুখ হয়ে রয়েছে সাহিত্যে, দুর্দিনের দুর্যোগ তাকে রুদ্ধ বা স্তব্ধ করতে পারেনি। কিন্তু ইদানীং এই কি মনে হচ্ছে না যে নদীর বহুবিস্তৃত শাখাপ্রশাখাই আছে, কিন্তু যেন সেই স্রোতচাঞ্চল্য নেই, নেই বা স্বচ্ছশীতল গভীরতা। যেন এক বৃহৎ হাজামজার দেশে এসে গিয়েছে, জটিল জঙ্গলের আবর্জনায় আটকে গিয়ে হারিয়েছে তার গতি-দ্যুতি। কত লেখা, কত লেখক, কিন্তু সর্বত্রই কেমন যেন একটা হতাশার সুর, নিষ্ফলতার চেতনা। আসলে কী বলতে চাই সে কথাটা চেপে রেখে কী কথা বললে জনতার মনোনীত হব তার জন্যে আগ্রহ। যেন একটা নমুনা সামনে রেখে তার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে সাহিত্যদ্রব্য সরবরাহ করার চেষ্টা। সাহিত্য যেন আজ জনতার কাছে জবানবন্দি, সাহিত্যিকের দায় যেন জনতার কাছে জবাবদিহির দায়। মনের গোপনে রয়েছে অপ্রসাদ, তাই ভাষায় আড়ষ্টতা। অথচ জনতার কাছে ছাড়পত্র

পাওয়ার লোভে মনের যে এই বন্ধন, তার থেকে মুক্তির সংগ্রাম নেই। এইখানেই আবার নবতর বিদ্রোহের সূচনা। যুগের আসনকে মানব কিন্তু তার শাসনের কাছে দাসখৎ দিতে পারবে না। জনতার কী জিজ্ঞাসা তারই খোঁজ নেব, জীবনের কী জিজ্ঞাসা তার খোঁজ নেব না এ মানতে রাজি নই। জনসমুদ্রের চেয়েও বড়ো জীবনসমুদ্র। কোথাও জাদুদণ্ড নেই সর্বত্রই মানদণ্ড, এর ব্যতিক্রম জীবনে দেখেও তা ভুলে থাকব এই বা কেমন সত্যভাষণ। এইখানে আবার শিল্পীর মুক্তির জন্য নতুন সংগ্রামের ক্ষেত্র রচনা হবে। নবীন বর্ষার মেঘ দেখে মন উচাটন হবে না উদাসীন হবে না, জাগবে না বিরহবেদনার আভাস, শুধু কোথায় জলে ভেসে গেল মাঠঘাট তারই কাহিনি বুনব এই কি সত্যদৃষ্টি? ফুলকে শুধু উদ্ভিদতত্ত্বের একটি প্রমাণ বলেই মানব, ফুলকে ফুলরূপে দেখেও আর একটু বেশি করে দেখব না এ তো শিল্পীর দেখা নয়। শুধু দশকে দেখব দেশকে দেখব না কেনই বা এই একদেশদর্শিতা? শুধু সাময়িক কালকে দেখব অখণ্ডদণ্ডায়মান মহাতপস্বী মহাকালকে দেখব না এই বা কেমন কথা? বামচক্ষু আছে কিন্তু দক্ষিণচক্ষুকে বাদ দিয়ে নয়। দুই চক্ষে দেখাই সর্বাঙ্গীণ দেখা, সমীচীন দেখা, দেখা সেই সমস্তসুন্দরকে।

'ঢুলি ভাই, বাজনা থামাও, মায়ের কাঁদন শুনি।' বিবাহান্তে কন্যা চলেছে পতিগৃহে। নানা বাদ্যোদ্যম চলেছে, চারদিকে লৌকিকতার প্রবল কোলাহল। কিন্তু কন্যার কান সমস্ত কোলাহলের বাইরে শুনতে চাইছে তার মায়ের কান্না। বলছে, 'ঢুলি ভাই, বাজনা থামাও, মায়ের কাঁদন শুনি।' তেমনি সাময়িক কালের সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে শুনতে চাইছি সেই শাশ্বতী আকুতি।

তাই সত্যশিল্পী তো শুধু অধুনাকে দেখে না, বর্তমানকে স্বাগত জানিয়ে অনাগত কালকেও দেখে। দূর-দূরান্তের ভবিষ্যৎকে সংবর্ধনা জানায়। সে দেখে মানুষ শুধু যন্ত্রায়িত নয়, শুধু জড়পিণ্ড নয়, নয় শুধু জৈববৃত্তিতে আবর্তিত, সে তার চেয়ে অনেক কিছু উপরে, অনেক কিছু বেশি। সেই অধিকতর সেই ঊর্ধ্বতরকে যে দেখে সেই ঠিক-ঠিক দেখে। তাই সেই সব চেয়ে প্রোগ্রেসিভ বা প্রাগ্রসর। কেননা যা আবার দেখা হবে লেখা হবে তাই দেখছে, লিখে রাখছে। শুধু শাখাপল্লবকেই সে দেখে না, সে শিকড়কেও দেখে। যে শিকড়কে অবলম্বন করেই এই শাখাপল্লবের নবীনতা। শাখাপল্লবের মতো শিকড়ও যদি বলে আমি নতুন হব, তাহলে স্বয়ং বৃক্ষেরই উৎসাদন। মানুষ নির্যাতিত হতে পারে বিপর্যস্ত হতে পারে, কিন্তু সাধ্য নেই সে মূলচ্যুত হয়, তার অন্তর্মগ্ন বৃহত্ত্ব ও মহত্ত্বকে সে অস্বীকার করে। তার জীবনের যে পরম তাৎপর্য তার অস্তিত্বের যে নিগূঢ়ার্থ তাকে সে ভুলে থাকে। প্রগতি যতই এগোক তাকে ফিরে আসতে হবে প্রণতিতে। এই ফিরে আসাই এগিয়ে যাওয়া। কেননা প্রগতি ঘুরছে চক্রবৎ আর চক্র ঘুরছে একটি ধ্রুব নির্লক্ষ্য বিন্দুকে আশ্রয় করে। সে ধ্রুবের কথা, নিত্যের কথা যে বলে সে প্রতিক্রিয়াশীল নয়, সেই সত্যদ্রষ্টা, সম্যকদ্রষ্টা, সেই অগ্রগামী।

শুনতে পাই পলায়নী বৃত্তির কথা। কে বলে? পলায়ন নয়, সংগ্রাম। মানুষকে ছোটো মাপে, ছোটো ঘরে যারা খর্ব করে রাখতে চায় তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মানুষ যে তার মহৎস্বরূপকে প্রকাশিত ও প্রসারিত করবার জন্যেই যাত্রা করেছে উভয় দিগন্ত থেকে উদার দিগন্ত পর্যন্ত, এ কথা যারা চেপে রাখতে চায় তাদের বিরুদ্ধে। দীনহীন ভাগ্যের কার্পণ্যে মানুষ যে শীর্ণশুষ্ক নয় তার অমোঘমহিমা যে অমর জ্যোতিতে উদ্‌বারিত, প্রাণের সম্মানে প্রেমের সম্মানেই যে সে চরিতার্থ, এ ঘোষণা যুদ্ধজয়ের ঘোষণা। তাই যেমন মানুষকে যারা দলিত-দমিত করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তেমনি মানুষকে যারা আবার নিঃস্ব ও নিঃস্বত্ব করে রেখেছে সংগ্রাম তাদেরও বিরুদ্ধে। বঞ্চনা দুটোই। আর্থিক বঞ্চনার চেয়ে আত্মিক বঞ্চনাই বরং কঠিন। আর্থিক বঞ্চনার ক্ষতিপূরণ একদিন হয় কিন্তু আত্মিক বঞ্চনার ক্ষতি সুদূরগামী। সে শুধু নিজেকে বঞ্চনা নয় সমগ্র সমাজকে বঞ্চনা। আমার জীবন তো আমার একার জন্যে নয়, সমগ্র সমাজের জন্যে, দেশের জন্যে। তাই দেশকে আত্মস্থ করবার জন্যে যে সাহিত্যচেষ্টা, সেটাও সংগ্রাম। অসংখ্যেয় সাধারণ মানুষের দুঃখে ত্যাগে শ্রমে সাহসে ধৈর্যে উদ্যমে রয়েছে যে এক মহত্ত্বের অঙ্গীকার, বৃহত্ত্বের প্রতিশ্রুতি, জীবনের এই জয়ন্ত জ্বলন্ত রূপের প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও সংগ্রাম ছাড়া কিছু নয়। তারাই পালায় যারা মানুষের সাময়িক দৈন্য ও দ্বেষ, ঘৃণা ও কাতরতার বিকৃত সত্তার বিবরে গিয়ে আত্মগোপন করে। যারা মানুষকে মনে করে শুধু অন্নের প্রত্যাশী, মনে করে না পরমান্নের প্রসাদের অংশীদার।

কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা হয়তো এই, যে সাহিত্যসৃষ্টি করছে সে নিজেকেও সৃষ্টি করুক। সে শুধু সাহিত্যশিল্পী নয় সে জীবনশিল্পী। সাহিত্য যদি সাধনার জিনিস হয় তবে সাহিত্যিককেও সাধক হতে হবে। কীসের সাধক? যে সুন্দরকে সে দেখেছে, যে আনন্দময়কে, অপরিমেয়কে, তার। তাকেই এবার সে প্রতিফলিত করুক তার জীবনে। সুন্দরের আলয়ে আনন্দময় দীপ জ্বালতে-জ্বালতে সে নিজেও একটি দীপ হয়ে জ্বলুক। মানুষকে যে সে গভীর বাণী শুনিয়েছে, সে বাণীকে সে মূর্তি দিক নিজের মধ্যে। প্রকাশের সাধনায় ব্রতী হয়ে নিজে প্রকাশিত হবে না এ ফাঁকির কারবার যেন সে না করে। যে মহতের যে বৃহতের চিত্র সে দেখেছে মানুষের মধ্যে, তারই প্রতিরূপ সে উদ্‌ঘাটিত করুক। 'পশ্য দেবস্য কাব্যং, ন জীর্যতি, ন মমার।' জরাহীন মৃত্যুহীন সেই কাব্যের একটি অক্ষয় শ্লোক হয়ে সে বিরাজ করুক।

দলে-দলে এগিয়ে আসছে নবীনকালের পন্থীরা। তাদের অভ্যর্থনা জানাই। সমানতীর্থসেবীরা চলেছি বটে বিচিত্র পথে, কিন্তু একই রাজতীর্থের উদ্দেশে। কীসের রাজতীর্থ? মানুষের রাজতীর্থ। সাময়িক কালের সামান্য কুটিরে সে মানুষ বাস করুক তার গৌরবের চূড়া শাশ্বত আকাশের সীমানায় এসে ঠাঁই নিক। আর সে মানুষকে সত্য

সত্তায় আরূঢ় করতে চেয়েছে যে সাহিত্যিক সেও পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়ে মানুষরূপেই প্রমাণিত হোক।

তাই বলি মানুষকে প্রণাম। যে মানুষ সাহিত্যের উপজীব্য তাকে। যে মানুষ সাহিত্যের রচয়িতা তাকেও।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁর ভাষণটি লখ্‌নৌতে অনুষ্ঠিত ১৯৫৪ সালের অধিবেশনে পাঠ করা হয়।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির ভাষণ

সমাগত সুধীবৃন্দ,

কালচক্রের আবর্তনে আবার নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের বহু ইপ্সিত মিলন-লগ্নটি ফিরিয়া আসিয়াছে, এবং সুদীর্ঘ এক বৎসরের অদর্শনের পর আমরা ইহারই উৎসব-মণ্ডপে আবার পরমাত্মীয় প্রিয় সুহৃদবর্গের স্নিগ্ধ সাহচর্য-লাভের সুযোগ পাইয়াছি। এবার কিন্তু আমার পক্ষে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত মন লইয়া বন্ধু-বান্ধবের সহিত প্রীতি-বিনিময় করার সৌভাগ্য হইল না ; এবার নিতান্ত আকস্মিকভাব গুরুভার দায়িত্বের উচ্চমঞ্চ হইতেই তাঁহাদের সম্ভাষণ করিতে হইল। এখানকার অভ্যর্থনা সমিতি এবার সাহিত্যশাখা-পরিচালনার দুরূহ সম্মান আমার এই অযোগ্য স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া আমাকে বিব্রত করিয়াছেন। ঘরের লোককে যদি হঠাৎ নিমন্ত্রিত অতিথির তিলক পরানো হয়, তবে যে খানিকটা কৌতুককর অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়, এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে, আমি নিজগৃহে আতিথ্য-লাভের অস্বস্তিকর আনন্দ অনুভব করিতেছি। যাহাই হউক, এই একান্ত পরিচিত প্রিয় পরিবেশে আমার অযোগ্যতার জন্য কুণ্ঠিত হইবার কোনো কারণ নাই। নিশ্চিত জানি যে আপনাদের নিকট এতকাল ধরিয়া প্রশ্রয় লাভ করিয়া আসিতেছি তাহাই আমার সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতিকে উপেক্ষা করিয়া আমার অযোগ্য প্রয়াসকেও প্রসন্ন অভিনন্দনে ধন্য করিয়া তুলিবে। সেই প্রসন্ন দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করিয়াই আমার এই গুরুদায়িত্ব পালনে অগ্রসর হইতেছি।

পূর্ব-পূর্ব বৎসরে যে সমস্ত মনীষী এই গৌরবময় আসনকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমার বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও প্রতিভাবান মৌলিক স্রষ্টা ছিলেন, বাংলা সাহিত্যে তাঁহারা চিরন্তন প্রতিষ্ঠার অধিকারী। সে হিসাবে আমি তাঁহাদের সমপর্যায়ে আসনলাভের অনুপযুক্ত। সাহিত্যের যে অন্দরমহলে সৃষ্টিকার্যের অপরূপ বিস্ময় অভিনীত হয়, আমার সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। আমি কেবল দুই একটা অর্ধরুদ্ধ ক্ষুদ্র গবাক্ষের ভিতর দিয়া

সেই রহস্য-নিকেতনে উঁকিঝুঁকি মারি ও সেখানকার নিগূঢ় ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার এক-আধটু বার্তা বাহিরে বহন করিয়া আনিয়া সারস্বত গোষ্ঠীর সকলের সহিত উপভোগ করি। সুতরাং আমার কাছে আপনারা ভিতরের আর বিশেষ কিছু পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারেন না ; বাহিরে টুকি-টাকি খবরেই আপনাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। সমুদ্র মন্থনে উত্থিত সুধা কিছুক্ষণের জন্য ঘাসের উপর রক্ষিত হইয়াছিল ; পরে সেখান হইতে উহা অপসারিত হইলে আস্বাদনে অনধিকারী কোনো প্রাণী ওই তৃণখণ্ডকেই লেহন করিতে গিয়া নিজ নিজ জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিল। সাহিত্য-সমালোচকের অবস্থা অনেকটা এই খণ্ডিত-জিহ্বা প্রাণীর ন্যায় ; যে রসনায় সে প্রকাশাতীত রহস্যের স্বাদ অনুভব করে, সেই রসনার সাহায্যেই তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না ; লাভের মধ্যে তাহার স্বাদের রসনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের রসনা দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া উহার বাক্-শক্তি ক্ষুণ্ণ করে।

তথাপি উহা অবিসংবাদিত সত্য যে সাহিত্য প্রধানত সামাজিকের জন্য ; উহার স্রষ্টার সংখ্যা মুষ্টিমেয়, কিন্তু উহার রসাস্বাদন-পিপাসু পাঠক অসংখ্য। বিশেষত আমাদের সাহিত্য সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য সাহিত্য-সৃষ্টির রহস্যোদ্ভেদ নহে, সমাজচিত্তে সাহিত্যের প্রভাব-নির্ণয় ও সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে সহজ ও অনুকূল সম্বন্ধ স্থাপন। স্রষ্টার আসন সভা-সমিতির জনাকীর্ণতায় নহে, প্রগাঢ় উপলব্ধি ও আত্মসমীক্ষার নিঃসঙ্গতায়। সম্মিলিত সমাজচিত্ত হইতে যে ভাব-প্রেরণা শতধারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, সাহিত্যিক তাহা পান করিবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু নিজ অন্তরানুভূতির উত্তপ্ত কটাহে উহাকে বারবার আবর্তিত করিয়া উহার সমস্ত রূঢ়, স্থূল ও আকস্মিক অংশকে বর্জন করিয়া উহার শাশ্বত রূপ ও নিগূঢ় রস নির্যাসটিকেই তাহার রচনায় সুন্দর ও স্মরণীয় অভিব্যক্তি দিবেন। সুতরাং স্রষ্টা সামাজিক হইয়াও একক ; তাহার কণ্ঠধ্বনি কেবল সমাজ কোলাহলের প্রতিধ্বনি নহে। মনুমেন্টের পাদদেশে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভার তীব্র, উচ্চকণ্ঠ চীৎকার রচনায় পুনরাবৃত্ত হইবে না। হিমালয়ের আরণ্য-জটিল, দুর্বার প্রবৃত্তি-গুচ্ছ হইতে উদ্ভূত খরবেগা গঙ্গা কবি জহ্নুর প্রশান্ত স্বীকরণের সংযম-শাসিতা হইয়া, অভিশপ্ত, আধি-ব্যাধি-জর্জর মানবের মোক্ষদায়িনী ভাগীরথীরূপে পরম কল্যাণের সাগর-সঙ্গমে যাত্রা শেষ করিবেন। মানবের উদ্দাম, বাধাবন্ধনহীন কামনার আতিশয্যে যাহার জন্ম, কবি নিজ অনুভূতির আত্মস্থতায় তাহাকে মার্জিত ও সংশোধিত করিয়া সমাজের উন্নততম শ্রেয়সাধনে তাহাকে নিয়োগ করিবেন, গঙ্গা-প্রবাহের ন্যায় সাহিত্যধারাও এই বিধি-নির্দিষ্ট গতিপথ ও জীবন-পরিণতি। সমাজের সঙ্গে সাহিত্যিকের যোগসূত্র নিশ্চয়ই থাকিবে, কিন্তু সেই যোগ বস্তুপুঞ্জের ভারবহনের জন্য নহে, উহার পিছনে যে ভাবসত্য বর্তমান তাহাকেই আবিষ্কার ও প্রকটিত করিবার জন্য। তিনি যেন একাধারে পার্থিব জগৎ ও সৌরমণ্ডলের অধিবাসী ; তিনি জগৎকে প্রদক্ষিণ করিবেন শুধু উহার সঙ্কীর্ণ কক্ষপথে নহে, উহার উদার-বিস্তৃত, সৃষ্টিসীমা-প্রসারিত, বৃহত্তর আবর্তন-বৃত্তানুসরণে। লাবণ্য যেমন অমিতকে বলিয়াছে, তেমনি সমাজও

কবি-সাহিত্যিককে বলিবে 'গ্রহণ করেছ যত, ঋণী তত করেছ আমারে', স্রষ্টা একসঙ্গে জীবনানুসারী ও জীবনাতিগ।

এই পর্যন্ত কবিস্রষ্টার দিকের কথা বলা হইল। কিন্তু আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সমাজ-জীবনের উপর সাহিত্যের প্রভাব। সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে পরস্পর নির্ভর সম্পর্ক ; সমাজ হইতে সাহিত্য প্রেরণা পায় ; কিন্তু ইহার সাহায্যে সাহিত্য যে ছন্দ-সুষমা, যে উন্নততর জীবনবোধ, জীবন-প্রক্রিয়ার যে আদর্শায়িত প্রতিরূপ সৃষ্টি করে তাহার প্রভাব কতটুকু আমাদের সমাজ-চেতনায় সংক্রামিত হইতেছে, তাহাই সাহিত্যরসিক সামাজিকের আসল জিজ্ঞাস্য। আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকগোষ্ঠী সাহিত্যকে উচ্চতম মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। 'কবিরেব প্রজাপতিঃ ও কাব্যাস্বাদ ব্রহ্মাস্বাদাসহোদর' এইরূপ উচ্ছ্বসিত প্রশস্তিবাক্যের মধ্যেই তাঁহারা কাব্যের প্রতি কী অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন তাহার ইঙ্গিত মিলে। যে সমাজ-ব্যবস্থায় ভগবানের লীলাবিলাস অনুভব, সৃষ্টিরহস্যের আবিষ্কার ও ব্রহ্মানুভূতি মানবজীবনের প্রধান কাম্য ছিল ও কবি এই দিব্যচেতনাস্ফুরণের প্রধান সহায়ক ছিলেন, সেই অতীত যুগের স্মৃতি এই বিচারের মধ্যে প্রতিবিম্বিত। পাশ্চাত্য সমালোচকদের মধ্যে প্লেটো, আরিস্ততল, সিডনি ও শেলি এই অতীন্দ্রিয়রহস্যদ্যোতক কবিকৃতির প্রতি পূজা-অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। বাংলার বৈষ্ণব কবিতার সমস্ত কাব্য-সৌন্দর্য ও আবেগের আন্তরিকতা চিরসুন্দরের আরতিরূপে সেই মূলীভূত সৌন্দর্যবিগ্রহের চারিদিকে আবর্তিত হইয়াছে ; শাক্ত পদাবলির সরল, নিরাভরণ আকুতি আত্মবিস্মৃত শিশুর ন্যায় স্নেহময়ী বিশ্বজননীর অঞ্চলতলে আশ্রয় লইয়াছে। এমনকি মঙ্গলকাব্যের আপেক্ষিকভাবে উৎকর্ষবিহীন রচনাও মানবের হীন প্রবৃত্তির সঙ্গে দেবনির্ভর ভক্তিবাদের একটা আপোষ নিষ্পত্তির প্রয়াস পাইয়াছে। কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ প্রাচীন যুগের ক্ষাত্রধর্মকঠোর, তত্ত্বপ্রধান আখ্যানের মধ্যে ভক্তি-বিহ্বলতার কোমল প্রলেপ পুরিয়া এই মহাকাব্যদ্বয়ের কাব্যৈশ্বর্যকে বাঙালির সমাজচেতনা ও ভাবাদর্শের সহিত মিশাইয়া দিয়াছে, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ বাঙালির মনোলোকে নবজন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ বাংলা সাহিত্য শুধু নিজ সৌন্দর্য-কল্পনা-লোকেই স্বপ্নরোমন্থনরত ছিল না, সমাজচিত্তের বিশুদ্ধিসাধন, উচ্চতম আদর্শের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা ও অনুরাগ সঞ্চারও উহার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল।

এমনকী যখন ধর্মভাবসর্বস্ব সাহিত্যধারার অবসান ঘটিয়া সাহিত্যে আধুনিক মানবিকতা ও সংস্কারমুক্তির সূত্রপাত হইল, তখনও ইহার কল্যাণধর্মিতার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রহিল। উনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রবুদ্ধ ধর্মচেতনার সূক্ষ্মতর অনুভূতিও বিকশিত হইল। প্রথম আধুনিক লেখক রাজা রামমোহন রায়ের যুক্তিবাদ বেদান্তধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ও বিকৃত ধর্মসংস্কারের মূলোচ্ছেদে নিয়োজিত হইল, আপন ধর্ম ও সমাজকে কলুষমুক্ত

করিবার কার্যেই তিনি নিজ জ্ঞানচর্চার প্রয়োগ করিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম মানস-অনুভূতি ও প্রকৃতি-প্রেম অধ্যাত্মসাধনার স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপশিখায় তৈলনিষেক করিল, তাঁহার হিমালয়-ভ্রমণে তীর্থযাত্রার মহিমা প্রকটিত হইল। নবরীতির বাঙলা কাব্যের উপর ঐতিহ্যবাহিত সমাজ-বোধের অনিবার্য প্রভাবের আশ্চর্যতম নিদর্শন পাই বিপ্লবী কবি মধুসূদন দত্তের রচনায়। যে শৃঙ্খল ভাঙিতে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প, যে অতীতকে মুছিয়া ফেলিতে তিনি বদ্ধপরিকর, যে উত্তরাধিকারকে তিনি অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে উদ্যত, কেমন করিয়া জানি না, তাহাই তাঁহার জীবনব্যাপী বিরোধিতাকে পরিহাস করিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার কবিচিত্তের মর্মমূলে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে, বিদ্রোহের উদ্ধত স্পর্ধার সঙ্গে করুণ আত্মনিবেদনের সুর মিশিয়া গিয়াছে। এই অস্বীকৃত ঐতিহ্যানুরাগের পরশপাথরের স্পর্শে রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাগল সন্ন্যাসীর ন্যায় মধুসূদনেরও কটিনিবদ্ধ লৌহশৃঙ্খল কখন যে সোনায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে তাহা কবি জানিতে পারেন নাই। যে রাবণ স্বেচ্ছাচারের প্রতিমূর্তি, যে লঙ্কারাজত্ব অসংস্কৃত ঐশ্বর্যসমারোহের প্রলয়বহ্নিদীপ্ত, তাহার মধ্যেও শাশ্বত কল্যাণের আদর্শ অনুপ্রাণিত করিয়াছে, এই দম্ভস্তূপের উপরেও তুলসীতলার শান্ত দেউটি জ্বলিয়াছে, সীতা-সরমার কারুণ্যরসসিক্ত পূর্বকথাস্মরণ রণকোলাহলের কানে শান্তিমন্ত্র গুঞ্জরিত করিয়াছে, ইন্দ্রজিতের রণক্ষেত্রে মৃত্যু ও প্রমীলার চিতারোহণ দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের ভক্তিপ্লুত শোকোচ্ছ্বাসের অশ্রুপ্রবাহ ঝরাইয়াছে। মধুসূদনের মহাকাব্যে আমরা সমস্ত পাশ্চাত্য ভূভাগের সাহিত্যশিল্প-পরিক্রমা শেষ করিয়া সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছি। জ্বলন্ত ধূপ সমস্ত ভাবাকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটাছুটি করিয়া শেষে একটি স্নিগ্ধ দীপশিখার অচঞ্চল, অনির্বাণ উজ্জ্বলতায় জ্বালাময় অশান্ত আবেগ সংহরণ করিয়াছে।

মধুসূদনের অব্যবহিত পরবর্তী যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-সাহিত্যেও এই নূতন-পুরাতনের সমন্বয় ও সমীকরণ-প্রয়াসের আর একটি স্তরপরিণতি প্রত্যক্ষ করি। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস পাশ্চাত্যপ্রভাবসঞ্জাত এক সম্পূর্ণ নূতন শিল্পরূপ। পাশ্চাত্য জীবন-পর্যবেক্ষণনীতি অনুসারে বাঙালি জীবনের তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন ব্যাপারে লেখকের স্বাধীনতা কোনো পূর্বনির্ধারিত শিল্পবিন্যাসের আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। বঙ্কিমের কল্পনানেত্রে এই নবজাত সাহিত্য-শিল্পের যে রূপ উদ্ভাসিত হইয়াছিল তাহা আখ্যানকাব্যের নিকট-আত্মীয়-কল্প ও গীতিকবিতাধর্মী। বাঙালির ঘরের কথাকে মনস্তত্ত্বের সূত্রে গাঁথিতে হইবে, তাহার স্বপ্নকল্পনা এই ঘরের কথার পার্থিব জগতের উপর নীলাকাশের মায়া বিস্তার করিবে, তাহার প্রাত্যহিক ঘটনাজালের ফাঁকে ফাঁকে বাঙালির সহজ-অনুভব-বেদ্য কল্পলোকের দিব্যদ্যুতি উদ্ভাসিত হইবে, তাহার সনাতন জীবননীতি এই পরীক্ষার আগুনে পুড়িয়া খাঁটি সোনার মতো উজ্জ্বল হইবে, এই ছিল তাঁহার মোটামুটি ধারণা। আঘাত ও আলোড়ন আসিবে পাশ্চাত্য ভাবতরঙ্গ হইতে, কিন্তু ইহা প্রতিহত হইবে হিন্দুজীবনের চিরন্তন

ধর্মসংস্কৃতি-জীবনচর্চার সুরক্ষিত তটভূমির উপর। যে উপনিষদ-গীতা-পুরাণ রসে হিন্দুর জীবনধারা পুষ্ট হইয়াছে, চরম সংঘাত ও সঙ্কটমুহূর্তে উহাদের প্রভাব যে অনিবার্যভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে, ইহাকে তিনি স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে ধরিয়া লইয়াছিলেন। কাজেই তিনি এই জীবনকাহিনী হইতে অতিপ্রাকৃতকে বাদ দেন নাই, ধর্মতত্ত্বের উপর বহিষ্কারের হুকুমজারি করেন নাই। সমাজকল্যাণের আদর্শকে জীবনসত্যবিরোধী প্রক্ষেপরূপে দেখেন নাই। ধর্ম ও সমাজনীতি-নিরপেক্ষ প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক অনুসরণকে বঙ্কিম জীবনের কেন্দ্রশক্তিরূপে স্বীকার করেন নাই, কেননা বাঙালির বাস্তব জীবনে এই প্রবৃত্তি-নিরোধের প্রেরণাও অবিসংবাদিত সত্য। বাঙালি জীবনে অধ্যাত্মলোক জীবলোকের উপর এমন নিবিড় একান্তভাবে ঝুঁকিয়াছিল যে উহাদের মধ্যে অতিনৈকট্যজনিত স্পর্শ এড়ানো যায় না। যেখানে সামগ্রিক কল্যাণবোধ জীবনের সহজগতিকে অবরুদ্ধ না করিয়া উহার ছন্দকে নিরূপিত করে, সেখানে সুনির্দিষ্ট জীবনাদর্শের অনুকরণে সমাজ ব্যক্তিত্বের সম্পূরক ও পূর্ণতা-বিধায়ক, যেখানে জীবনের চিত্র হইতে উহাকে বাদ দিলে চিত্র অবাস্তব ও অসম্পূর্ণ হইবে। যতদিন মানুষের বাড়ি থাকে, ততদিন তাহার গৃহস্থ জীবনই তাহার সত্যজীবন, তাহার জীবনবিকাশকে এই সামগ্রিক জীবনযাত্রার আদর্শেই নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। বঙ্কিমের যুগে অন্তত এই গৃহ রক্ষা করাই সাহিত্যের একটা প্রধান কর্তব্য ছিল। সে যুগে সমাজ যে ধূলিসাৎ হইবে ও সমাজবন্ধনমুক্ত, আত্মরতিবিলাসী মানবাত্মা যে নিজ আনন্দ-বেদনার স্বতন্ত্র উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিবে, প্রবৃত্তি-চালিত পথে চরিতার্থতা খুঁজিবে ইহা পূর্ব হইতে কল্পনা করা সহজ ছিল না। 'পথ বেঁধে দিল চলতি হাওয়ার গ্রন্থি', এই কবিকল্পনা তখনও সামাজিক সত্যে পরিণত হয় নাই। কাজেই বঙ্কিমের যাঁহারা বিরুদ্ধবাদী, তাঁহারা বঙ্কিম-সাহিত্যকে পরবর্তীকালের পরিবর্তিত মানদণ্ডে বিচার করিতে গিয়া তাঁহার সৃষ্টি-প্রেরণার আসল তাৎপর্যটিই ভুল বোঝেন। বঙ্কিমের ঊর্ধ্বচারী শিথিলমূল কল্পনা 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে সমগ্র দেশে যে গভীর দেশাত্মবোধ ও ভাবসমুন্নতি জাগ্রত করিয়াছে, কোনো অনবদ্য শিল্পাধিকারী মৃত্তিকারসপায়ী ঔপন্যাসিকের রচনায় তাহার অনুরূপ কিছু মিলে কি?

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবিরূপে আমাদের নিকট পরিচিত, কিন্তু তাঁহার সার্বভৌম বিশ্বানুভূতি ভারতীয় সংস্কৃতির আধারের মধ্যেই রক্ষিত। তাঁহার কল্পনার বিচিত্র প্রসার, তাঁহার মনের সর্বতোমুখী বিস্তার, তাঁহার বিষয় ও ভাবের অফুরন্ত অভিনবত্ব, সবই ভারতীয় অধ্যাত্ম সংস্কার ও জীবনাদর্শের স্থির আশ্রয়ভূমির উপরই অধিষ্ঠিত। ঔপনিষদিক তত্ত্বচেতনা, নিখিল পরিব্যাপ্ত ঐশী লীলার নিঃসংশয় উপলব্ধি, পার্থিব জীবনের পটভূমিকায় যুগযুগান্ত প্রসারিত অনন্ত জীবনের বিস্তার, জড়প্রকৃতি ও মানবচিত্তের মধ্যে আনন্দময়-প্রীতি-বন্ধন, অতলস্পর্শ রহস্যের মধ্যে মানবাত্মার সত্য পরিচয়ের সন্ধান, এই সবই শুধু রবীন্দ্রনাথের প্রথাগত ধর্মসংস্কারমাত্র নহে। তাঁহার কাব্য-প্রেরণার জীবন্ত উৎস, তাঁহার কবি-চেতনার

মর্মগত প্রত্যয়। সুতরাং তাঁহার কাব্য কেবল সুন্দরের রূপসজ্জা নহে, কেবল ললিতকলার প্রয়োগ-কুশলতা নহে, ইহা জীবনের রহস্য-উদ্‌ঘাটন ও স্বরূপ-নির্ণয়ের গভীর তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়াস। জীবন-সত্য যে মায়াজালে আবৃত এবং এই মায়াবরণকে অপসারিতনা করিলে ইহা অননুভবনীয়, এই বিশ্বাসে রবীন্দ্রনাথের সহিত উপনিষদের কোনো পার্থক্য নাই। তবে তাঁহাদের এই আবরণ-উন্মোচনের পদ্ধতি পৃথক। উপনিষদকার ধ্যান-ধারণা-তপস্যার মধ্য দিয়া যে সত্য-উপলব্ধির প্রয়াসী, রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে গভীর অনুপ্রবেশের দ্বারা, মুহূর্তের চকিত আভাসসমূহের সাঙ্কেতিকতায়, মানবিক প্রেমের লীলা বিলাসের মাধ্যমে সেই একই লক্ষ্যে পৌঁছিতে চাহেন। অর্থাৎ অসীমের সন্ধান, অনন্তের প্রতি আকুতিই যে এই মানবজীবনের আসল কাজ ইহা রবীন্দ্রনাথের কেবল কবিকল্পনা বা দর্শন-বিলাস নহে, ইহা তাঁহার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়া অনুভব সত্য। বাংলা কবিতার সুপ্রাচীন ভক্তিবাদ, ভগবানের নিকট আত্মনিবেদন আবার এই আধুনিক যুগের তীক্ষ্ণমননসম্পন্ন, নিখিল বিশ্বের ভাবধারায় অভিস্নাত, জড়বাদ ও বিজ্ঞানের নেতিমূলক সংশয়ের সহিত নিবিড়ভাবে পরিচিত কবির মধ্যে, তাঁহার গভীর ও বিচিত্র কল্পনার মাধ্যমে আশ্চর্য পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে। আর এই জীবনাদর্শের কথা কেবল তাঁহার কবিতাতেই রূপ পায় নাই, তাঁহার সমস্ত গদ্যরচনাতেও পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হইয়াছে। তিনি যে ধনতান্ত্রিক ও ভোগলোলুপ প্রতীচ্য সভ্যতার বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন তাহা নিতান্ত শূন্যগর্ভ আস্ফালন নহে, তাহা নিজের দেশে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রীতি-স্নিগ্ধ ও ধর্মকেন্দ্রিক সমাজ-ব্যবস্থা পুনঃ-প্রবর্তনের নিশ্চিত-আশ্বাস-প্রণোদিত। ভগবানকে বাদ দিয়া শুধু নীতিবোধের উপর নির্ভরশীল সমাজ উহার উচ্চ আদর্শে কখনোই স্থির থাকিতে পারিবে না ইহা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সমস্ত রচনার মধ্যে তিনি আধুনিক মননশীলতার সঙ্গে প্রাচীন ধর্মসাধনাকে মিশাইয়া, যুগ-সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-মনকে নূতন করিয়া গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। উপনিষদের তত্ত্বচেতনা যে আধুনিক কালের অনুপযোগী, ইহা যে সক্রিয় জীবনবোধের অঙ্গীভূত না হইয়া কেবল নিঃসঙ্গঅধ্যাত্ম সাধনার বিষয়, ইহা তিনি কোনোদিনই স্বীকার করেন নাই। পাশ্চাত্য শিল্পবিজ্ঞানকে ধর্মবোধের দ্বারা সংশোধন না করিয়া একান্তভাবে গ্রহণ করিলে, পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ-নির্ভর ব্যক্তিজীবনবাদকে সম্পূর্ণভাবে অবলম্বন করিলে, পাশ্চাত্য নিরঙ্কুশ আত্মপ্রসারকে চরম মর্যাদা দিলে যে পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার ব্যাধিজর্জর পরিণামকে বরণ করিতে হইবে, শক্তিমত্ততার দম্ভ ও ভোগমত্ততার মোহের অনিবার্য ফল যে মহতী বিনষ্টি, ইহা তিনি সুস্পষ্টভাবে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার কবিতার সমস্ত সৌন্দর্য-সুষমা ও ছন্দলালিত্যের পিছনে এই অখণ্ডনীয় বিধিলিপি আগ্নেয় অক্ষরে প্রজ্বলন্ত।

রবীন্দ্রনাথই শেষ কবি যিনি আমাদের বিপর্যস্ত জীবনবোধকে ছিন্ন-সূত্রে সংযোজনের দ্বারা সামগ্রিকভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে, ছন্দোভ্রষ্ট জীবনযাত্রার ছন্দসুষমা পুনঃপ্রবর্তন

করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় আমরা তাঁহার কাব্যের এই জীবন-নিয়ামক মর্যাদা কার্যত স্বীকার করি নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অনুরাগী অনেকেই আছেন, তাঁহাদের মধ্যে বোধ হয় কেহই তাঁহার জীবনসাধনার নির্দেশ মানিয়া লন নাই। কবির কাব্য আমাদিগকে আনন্দ দিবে, আমাদের সৌন্দর্যবোধকে উদ্দীপ্ত করিবে, আমাদের কল্পনাকে প্রত্যক্ষ বাস্তবের সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত করিয়া দূরাভিসারের প্রেরণা যোগাইবে। আমাদের ক্ষণিক ভাবানুভূতিকে বিলীন হইতে না দিয়া চিরন্তনত্বের বেষ্টনীর মধ্যে বাঁধিয়া রাখিবে, কবির সহিত আমাদের সম্পর্ক এই পর্যন্তই ; কিন্তু আমাদের ব্যক্তিত্ববোধের আতিশয্য তাঁহাকে সমগ্র জীবন-নিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে মোটেই প্রস্তুত নহে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালির মনে এক অদ্ভুত, স্ববিরোধপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি আমাদের কাব্য-চেতনাকে প্রভাবিত করিয়াছেন, কিন্তু জীবন-চেতনাকে ক্ষীণভাবে স্পর্শ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। তাঁহার অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও অসীম সাধনার যে আমাদের জীবনের প্রতি কোনো আবেদন থাকিতে পারে তাহা আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। সুতরাং আমরা নব্য কোনো পূর্বতন কবির সম্বন্ধে যাহা করি নাই, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাহাই করিতেছি, তাঁহার কাব্য-শিল্পকে তাঁহার সত্যানুভূতি হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া শুধু তাঁহার সত্তার একাংশের প্রতি প্রতিভার প্রাপ্য শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি। যে প্রাণবায়ু নিষ্কাশিত করিলে কাব্যে জ্যোতির্গোলক শূন্যগর্ভ রঙিন ফানুসে পর্যবসিত হয়, আমরা তাহাই লইয়া লোফালুফি করিয়া পরম আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছি ; শুক্তির গর্ভ হইতে মুক্তা বাহির করিয়া দিয়া উহার উপরের চিত্রিত খোলসটিই সযত্নে গৃহসজ্জার মহামূল্য উপকরণরূপে ব্যবহার করিতেছি। রবীন্দ্রনাথের নামে উদ্যান, রাস্তা, শিল্পশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের নূতন নূতন উপায় খুঁজিয়া সারা হইতেছি। যে কবির সত্য আসন আমাদের অন্তরের সিংহাসনে, তাঁহাকে যাত্রার দলের রাজার রাজমুকুট পরাইয়া ভক্তির আড়ম্বরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছি। যে কবি আমাদের জীবনরথের সারথি হইবেন, তাঁহাকে রথের চাকায় বাঁধিয়া, বর্ণ-বিচিত্র পতাকা উড়াইয়া, তাঁহার নামের জয়ধ্বনি তুলিয়া, জীবন-শোভা-যাত্রায় বাহির হইয়াছি। এইরূপে অতিস্তুতি ও আংশিক গ্রহণের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের সামাজিক তাৎপর্যটি আমরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিতে চলিয়াছি ; মোহনিদ্রাভিভূত জাতির ঘুম ভাঙাইতে যে ভাস্বর সূর্য আমাদের আকাশে উদিত হইয়াছিল, আমরা সেই জ্যোতির্ময় আবির্ভাবকে দিয়া আমাদের স্বপ্নাবেশ নিবিড়তর করিয়া তুলিতেছি, বিধাতার বিধানের সঙ্গে আমরা এইভাবেই সহযোগিতা করিতেছি।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সমাজ-চেতনা সর্বজনস্বীকৃত ও সমাজ-মনের উপর তাঁহার প্রভাবও অনস্বীকার্য। সমাজের অনুবাদ রক্ষণশীলতা ও অযৌক্তিক সংস্কার হইতে তিনি আমাদের যতটা মুক্ত করিয়াছেন এমন আর কোনো লেখক করেন নাই। আধুনিক জীবনযাত্রার মোটামুটি রূপ ও উহার পিছনকার ভাবপ্রেরণার মূলে আছে তাঁহার উপন্যাসের জীবন-মূল্যায়ন। তবে তিনি যতটা অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিলেন, আমরা তাহার অপেক্ষা অনেকদূর

বেশি আগাইয়া গিয়াছি ও তাঁহার জীবনাদর্শের গঠনমূলক দিকের পরিবর্তে তাঁহার সমর্থিত বন্ধন-শিথিলতাকেই চূড়ান্ত সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছি। তিনি সমাজকে উদার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমরা সমাজকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। তিনি যে উন্নততর আদর্শ ও ব্যক্তিজীবনের শ্রেষ্ঠ বিকাশের প্রয়োজনে সংস্কারমূঢ় সমাজ-নিয়ন্ত্রণে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহার পরিবর্তে নিছক প্রবৃত্তি বা খেয়ালের দাবিতেই সমাজ-শাসন ছিন্ন করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করিতেছি না। অতি আধুনিক যুগের দুই একজন অসাধারণ ব্যতিক্রমকে বাদ দিলে, বোধ হয় শরৎচন্দ্রই যে শেষ লেখক যাঁহার রচনায় যৌথ পরিবারের চিত্র অঙ্কিত ও সমাজনীতির শাশ্বত মূল্য স্বীকৃত হইয়াছে। সমাজের সংস্কার করিতে গিয়া যাহাতে উহাকে সংহার না করি সেদিকে তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সমাজবিধি-উল্লঙ্ঘনের যে গুরুতর কারণ থাকা দরকার, ও ইহার জন্য যে মানুষের আজন্মপোষিত সংস্কারে টান পড়ে, গভীর ও রক্তস্রাবী অন্তর্দ্বন্দ্ব জাগে, এই জীবন-সত্য তাঁহার সমস্ত উপন্যাসে পরিস্ফুট। যুগযুগব্যাপী সমাজাদর্শ ও ধর্মসংস্কারের প্রবল প্রভাব যে কত দুরতিক্রম্য, ইহার জন্য ওষ্ঠসংলগ্ন জীবন-চরিতার্থতার সুধাপাত্রও যে হস্তস্খলিত হয়, প্রবৃত্তিপূরণের সুখের মধ্যেও যে অন্তরাত্মার অপ্রশমিত অতৃপ্তি মিশাইয়া থাকে, সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, অচলার চরিত্রে তাহা উদাহৃত। সমাজের মূঢ় শাসন অতিক্রম করিয়া আবার সমাজেই ফিরিব, উহার বিকারের প্রতিষেধকরূপে উহার মধ্যে নূতন প্রাণশক্তির সঞ্চার করিব, সংশোধিত সমাজে যুগোপযোগী উন্নততর আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিব ইহাই ছিল তাঁহার আন্তরিক আকাঙক্ষা। বঙ্কিম্ কোনো অবস্থাতেই প্রতাপ শৈবলিনীর মিলন কামনা করিতে পারেন নাই ; তিনি প্রতাপকে অবৈধ আকর্ষণের অতীত, মোহহীন স্বর্গে পাঠাইয়াছেন। শরৎচন্দ্র বর্তমান পল্লিসমাজে রমা ও রমেশের মিলন সাধন করিতে পারেন নাই, কিন্তু ভবিষ্যতের সমাজে এ মিলনে যে কোনো বাধা থাকিবে না তাহা সর্বান্তঃকরণে আশা করিয়াছেন। তিনি এই তরুণ-তরুণীকে অসামাজিক প্রেমের নির্জন, আত্মকেন্দ্রিক নির্বাসনে প্রেরণ করেন নাই ; যে দিন নবপ্রবুদ্ধ সমাজে তাহাদের অনুমোদিত আসন সুদৃঢ় হইবে তাহারই জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার ব্রাহ্মণ-সন্তান মৃত্যুঞ্জয় অন্ত্যজজাতীয়া নারী বিলাসীর ভালোবাসা প্রকাশ্য সমাজেই স্বীকার করিয়াছে, পলায়নে নিরাপত্তা খোঁজে নাই বা কলিকাতার অ-কৌতূহলী জনসমুদ্রে আত্মগোপন করে নাই। সমাজের ক্রূর জিঘাংসা যে মহাপ্রাণের বলির রক্তেই একদিন নির্বাপিত হইবে, এই আত্মবিসর্জনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমাজ যে সুস্থ আত্মচৈতন্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবে এ ভরসা শরৎচন্দ্র কোনোদিন ত্যাগ করেন নাই। শরৎচন্দ্রের পরবর্তী যুগে ব্যক্তিজীবন হইতে সমাজ-প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। আজকাল সমাজের হয়ত একটা ভৌগোলিক পরিচয় আছে, কিন্তু উহার আত্মিক সত্তা, কতকগুলি স্বেচ্ছাকৃত খণ্ড সংস্থায় বিভক্ত হইয়া, অণুপরমাণুতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এখন ব্যক্তিমানব ও তাহার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার মধ্যে, তাহার রুচি ও

বিবেক-বুদ্ধি ছাড়া আর কোনো মধ্যবর্তী নিয়ামক সংস্থার অস্তিত্ব নাই।

শরৎচন্দ্রের পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমাদের সাহিত্য ও সমাজ-চেতনায় একটা যুগান্তর আনিয়াছে। এই প্রলয়ের মহাঝটিকায় বাঙালি জাতির জীবন-মহীরুহ উহার যুগ-যুগান্তরের সাংস্কৃতিক ভূমি হইতে উৎপাটিত হইয়া নিখিল বিশ্বের সাধারণ মৃত্তিকায় নূতন রসাশ্রয় খুঁজিতেছে। অকস্মাৎ এক নিদারুণ বিপর্যয়ে সমস্ত অতীত উহার তাৎপর্য-গৌরব হারাইয়াছে। জীবনের মূল্য ও মর্যাদা অভাবনীয়রূপে বদলাইয়া গিয়াছে। বস্তুজগতের ভূমিকম্প মনোজগতে ফাটল ধরাইয়াছে। ধর্মের সান্ত্বনা, সংস্কৃতির আশ্বাস, আদর্শবাদের আশ্রয়, পুরুষপরম্পরাগত জীবনচর্চার অভ্রান্ত সংস্কার ও নির্ভরযোগ্য অভিজ্ঞতা সব এক মুহূর্তে মায়া-মরীচিকার ন্যায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। আমরা যেন এক নতুন জগতের অজ্ঞাত নিয়ম-কানুনের জটিলতা-জালের মধ্যে প্রথম পথিকের বিভ্রান্তি ও বিমূঢ়তা লইয়া পথ খুঁজিয়া মরিতেছি। আমাদের পারিবারিক জীবনের চিরদিনের নিশ্চিন্ত নির্ভর আজ বিভীষিকার মুখব্যাদান করিয়াছে ; মাতৃস্নেহ আর অমৃত-নির্ঝর নহে, ছদ্মবেশী কামায়ণের কলুষ প্রবাহ; দাম্পত্য প্রেম মর্মান্তিক ব্যক্তিত্ব-সংঘর্ষের রণাঙ্গন, ভূগর্ভস্থ আগ্নেয়গিরির শ্যামল তৃণাচ্ছাদন। জীবনের সমস্ত সক্রিয়তার মূলে এক উৎকট আত্মপ্রসারের বিকৃত প্রেরণা। সমাজ-বিন্যাস আগাগোড়া ভুল ; ইহার শ্রেণিবিভাগ সাম্যনীতির বিপর্যয় ; ইহার স্থায়িত্ব অবিমিশ্র অশুভের হেতু ; ইহার আশু উচ্ছেদই ইহার সম্বন্ধে একমাত্র করণীয়। মানুষের সমস্ত সম্পর্কের মূলে যেমন প্রচ্ছন্ন কামপ্রবৃত্তির সর্বব্যাপিত্ব, তেমনি উহার শিল্প-সাহিত্য ও সুকুমার গুণের বিকাশের মূলে আছে অর্থনীতির নিগূঢ় প্রভাব। আমাদের প্রাচীন কাব্যসাহিত্য হঠাৎ আমাদের কানে বেসুরো বাজিয়া উঠিল, বিমুখ মনের দ্বারদেশ হইতে অভিনন্দনহীন হইয়া ফিরিয়া গেল। উহার ছন্দে ঘুম-পাড়ানি গান, উহার ললিত শব্দ-সংযোজনা বর্বরোচিত অলঙ্কারপ্রিয়তা, উহার ভাবসত্য অবাস্তর কল্পনাবিলাস, উহার আদর্শবাদ ছেলেভুলানো স্তোক-বাক্যরূপে প্রতিভাত হইল। আমাদের সমস্ত চিত্ত এক বিরাট বিতৃষ্ণা ও তিক্ত নৈরাশ্য-বোধে কানায় কানায় পূর্ণ হইল। স্বাধীনতার অনুষঙ্গী সাম্প্রতিক দুর্যোগ পরম্পরা দেশবিভাগ, সাম্প্রদায়িক সংগ্রাম, আশ্রয়ার্থীর দীর্ঘতর মিছিল, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, ধনী-দরিদ্রের নিদারুণ অবস্থা-বৈষম্য, সামাজিক ক্লীবত্ব ও সংহতির অভাব, আমাদের মন হইতে পূর্বযুগের আশা ও আনন্দের উজ্জ্বল চিত্র একেবারে মুছিয়া দিল। আমরা জগৎব্যাপী কোলাহলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া, সমাজের উপর দারুণ আঘাত হানিয়া, মানবের উচ্চ সম্ভাবনায় সমস্ত আস্থা হারাইয়া আমাদের অস্তিত্বের মূল সূত্রকেই ছিন্ন করিতে লাগিয়া গেলাম। আমাদের কবিগোষ্ঠী বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে বর্ণিত হৃদ্‌সর্বস্বা নগ্নিকা মাতার রূপহীনতা অঙ্কনে সর্বশক্তি নিয়োগ করিলেন।

আপাতত ইউরোপের বহু-বিস্তৃত, নানা বিরোধী শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জটিল পরিস্থিতি বাদ দিয়া বাংলা দেশের স্বল্পায়তন ও সমউপাদান-গঠিত পটভূমিকার প্রতি দৃষ্টি

নিবদ্ধ করা যাউক। ইউরোপের মানস প্রতিক্রিয়া দুঃখকর হইলেও সহজবোধ্য। যে জাতিসংঘ আজ প্রায় চারি শতাব্দী ধরিয়া রাষ্ট্রশাসনে, মানবিক কল্যাণবোধে, উন্নত মননের, সৃষ্টি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশে সমগ্র মানব সমাজে অগ্রণী ও আদর্শস্থানীয় ছিল, তাহাদের এই কল্পনাতীত অধোগতি, সভ্যতার পালিশের নীচে জঘন্য পাশবিকতার লুকানো বীভৎসতা সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে এমন একটা স্তম্ভিত বিস্ময় ও বেদনার সৃষ্টি করিল যাহাতে তাহাদের চারিশত বছরের ইতিহাস, ক্রমোন্নতিবাদের আশ্বাস সমস্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়া গেল। কোটিপতি হঠাৎ পথের ভিখারিতে পরিণত হইলে উহার চোখে মুখে যে নিরুপায় নৈরাশ্য ফুটিয়া উঠে, ইউরোপের মানস-চেতনায় তাহারই কৃষ্ণচ্ছায়া গভীর রেখায় অঙ্কিত হইল। উহাদের রাষ্ট্রনীতি হয়ত ভুলপথে চলিয়াছে, কিন্তু উহাদের শিল্প-সাহিত্যের মধ্যেও কি অমৃতের সঞ্চয় কিছু ছিল না, এই ভয়াবহ সংশয় উহাদের আত্মপ্রত্যয়কে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিল। কবির অমর সংগীত, দার্শনিকের গভীর মনন, শিল্পীর সৌন্দর্যপূজা, আদর্শবাণীর আত্মদান, ধার্মিকের ভগবদনুভূতি, সবই কি অবিমিশ্রিত ব্যর্থতারই সাক্ষ্য বহন করিল, রাষ্ট্রনেতা ও সামাজিকের চিত্তে ইহার কি কোনো প্রভাব অবশিষ্ট রইল না? এই আর্ত প্রশ্ন ইউরোপের প্রতি রাজধানীতে, প্রতি সংস্কৃতি-কেন্দ্রে, প্রতিটি ধর্মমন্দিরে অসহায় প্রতিধ্বনি তুলিয়া শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। তাহারা অর্জন করিয়াছে কিন্তু সঞ্চয় ও আত্মসাৎ করে নাই, এই নিদারুণ সত্যই তাহাদের মানসপটে ফুটিয়া উঠিল।

যুদ্ধোত্তর বাংলা দেশের অবস্থা অবশ্য খানিকটা ইউরোপের অনুরূপ, কিন্তু এখানে ইউরোপের মতো সার্বিক বিপর্যয় ঘটে নাই। যুদ্ধ-ধূমকেতুর জ্বলন্ত পুচ্ছ বার্মা দেশের আকাশকে স্পর্শ করিয়া গিয়াছিল, উহার ভূমি-সংস্থানকে উৎখাত করে নাই। শূন্যে বোমার গর্জন শুনা গিয়াছিল, বিধ্বংসকারী বর্ষণ ঘটে নাই। বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য প্রধানত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল ; সমাজনীতিতে ও জীবনবোধে যে ফাটল দেখা গিয়েছিল তাহা অর্থনৈতিক বিপর্যয়েরই পরোক্ষ ফল। কিন্তু বাঙালির মনে যাহা প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছিল, তাহা শুধু আর্থিক অভাব ও অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিদারুণ অপ্রাচুর্য নহে, এই অভাবের পিছনে চোরাকারবারি ও কালোবাজারি বণিক সংঘের ঐশ্বর্য-লোলুপ চক্রান্ত ও রাষ্ট্রের ঔদাসীন্য ও গোপন প্রশ্রয়। বাঙালির মানস-আকাশে সচ্ছলতা, সূর্যের দীপ্তি যে নিভিয়া গেল শুধু তাহাই নহে, সেখানে মাংসাশী শকুনের পক্ষবিস্তার অন্ধকারকে আরও ঘোরালো ও প্রেতলোকের বিভীষিকাময় করিয়া তুলিল। ইহাতেই তাহার মানুষের উপর আস্থা চলিয়া গেল, প্রচলিত সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মনীতির অন্তঃসারশূন্যতা তাহার নিকট ভয়াবহরূপে প্রকটিত হইল। এই সর্বব্যাপী শূন্যতার নিরালম্ব পরিপ্রেক্ষিতেই আধুনিক বাংলা কবি-সাহিত্যিকগোষ্ঠী নবযুগের অভিনন্দন-স্তোত্র রচনা করিলেন।

হয়ত এই অবিমিশ্র, নীরন্ধ্র নৈরাশ্যবাদের মধ্যে খানিকটা আতিশয্য ; খানিকটা পাশ্চাত্যের অনুকরণ-প্রবণতা আছে। আমাদের কণ্ঠে সর্বহারার বিলাপ কতটা সঙ্গত সে সম্বন্ধে সন্দেহ

হইতে পারে ; আমাদের জীবনে ঘনঘটা, দুর্যোগ-বর্ষণ নামিয়া আসিলেও সূর্য যে চির-অস্তমিত হইয়াছেন, এই প্রতীতি স্থির বিচারে হয়ত সমর্থিত হইবে না। অতীতের সংস্কৃতি-সঞ্চয় যে একেবারেই রিক্ত, উহা যে বর্তমান সঙ্কটমুহূর্তে আমাদের কোনো কাজে আসিবে না এরূপ ধারণাও হয়ত ভ্রান্ত। কিন্তু এই মনোভাবের মধ্যে গভীর আন্তরিকতার অস্তিত্বও অস্বীকার করা যায় না। বিশেষত স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে যে সীমাহীন প্রত্যাশা জাগিয়াছিল, তাহা কতকটা বাস্তবের রূঢ় সংঘাতে, কতকটা আমাদের অযোগ্য ও সময় সময় অসাধু পরিচালনা-ব্যবস্থার ত্রুটিতে যখন কুণ্ঠিত ও বিপর্যস্ত হইয়া গেল, তখন আমরা একেবারে নিরাশার অন্ধতম গভীরে নিমগ্ন হইয়া গেলাম ও আমাদের চারিপাশে ঘনায়মান অন্ধকার ক্ষীণতম আলোকবিন্দুরও প্রবেশপথ রুদ্ধ করিয়া দিল। ইহার উপর পূর্ববঙ্গ হইতে আগত লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারার অবর্ণনীয় দুর্গতি ও লাঞ্ছনা, তাহাদের মানবাত্মার কল্পনাতীত অপমান আমাদের বাস্তব পরিবেশকে অসহনীয় ধূম্রজ্বালায় শ্বাসরোধী করিয়া তুলিল। এই পরিপ্রেক্ষিতকে সম্মুখে রাখিয়াই আমাদিগকে আধুনিক কাব্যসাহিত্যের অভাবনীয় রূপান্তরের কথা ভাবিতে হইবে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিচার ও মূল্যায়ন আমার উদ্দেশ্য নহে, কেবল ইহার সামাজিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধেই বলার অভিপ্রায়। ইহাতে যে নূতন অনুভূতি রূপ পাইয়াছে তাহার প্রকাশভঙ্গী ও উপস্থাপনারীতিও পূর্বতম কাব্যের তুলনায় সম্পূর্ণ অভিনব। হৃদয়ের মর্মদাহী জ্বালা, সর্বব্যাপী সংশয় ও অবিশ্বাস বৈষ্ণব কবিতার সরল, মধুর গুঞ্জনে বা রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যসারময়, কল্পনার ঐশ্বর্যে মহীয়ান ভাষণভঙ্গীতে প্রকাশ হইবার নহে, ইহার জন্য চাই ভাষার তীক্ষ্ণ খোঁচা, বক্র-কুটিল ব্যঞ্জনা, বার বার হোঁচট-খাওয়া, চমক লাগানো অসম ছন্দ, মুহুর্মুহু ছিন্নসূত্র অর্থের আপাত-অসঙ্গতি ও অসংলগ্নতা। বিশেষত রবীন্দ্র-অনুকারী গোষ্ঠীর হাতে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যাভিসার ও ছন্দ-সুষমা যেন অর্থক্ষীণ, উদ্দেশ্য-শিথিল, সুরবিহ্বল ভঙ্গী-সর্বস্বতায় পর্যবসিত হইবার পথে চলিতেছিল। কাব্যের সুর ও বাস্তব অনুভূতির মাত্রাছন্দের মধ্যে যদি গুরুতর ব্যবধান গড়িয়া উঠে, তবে কাব্য জীবনের সার্থক প্রতিবিম্ব হয় না। আধুনিক হৃদয়-সমস্যা বৈষ্ণব কবিতার আত্মনিবেদন এমনকি রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম আকুতির সুরে অভিব্যক্ত হইলে একটা কৃত্রিম ভাবালুতারই সৃষ্টি হয়। সেই দিক দিয়া আধুনিক কবিতার ভাবানুগ, বাহুল্য-বর্জিত, উচ্ছ্বাসহীন ভাষা কাব্যপ্রাণে নূতন রক্ত সঞ্চার করিয়াছে ইহা সম্পূর্ণ স্বীকার্য। আরও দুইটি দিক দিয়া এই কবিতা পূর্বযুগের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। প্রথম, আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় ইহার বিস্তার ও দ্বিতীয়, ইহার তীক্ষ্ণ ও মননশীল জীবনজিজ্ঞাসা ইহার এই দ্বিবিধ উৎকর্ষের দাবি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রথমত, আন্তর্জাতিক মননের প্রসার নির্দেশ করিলেও নিছক কাব্যের উৎকর্ষের নিদর্শনরূপে কতটা গ্রহণীয় তাহা বিচার্য। প্রগতিশীল চিন্তাই যে শ্রেষ্ঠ গুণ তাহা ঠিক

যথার্থ নহে এই চিন্তা আমাদের অন্তরের কত গভীরে প্রবেশ করিয়াছে, আমাদের আবেগকে কতখানি উদ্রিক্ত করিয়াছে, সৌন্দর্যবোধের অন্যান্য উপাদানের সহিত নিবিড়ভাবে মিশ্রিত হইয়া ভাবে ছন্দে, রূপে এক অখণ্ড সত্তায় পরিণত হইয়াছে কিনা ইহাই বিচারের প্রকৃত মানদণ্ড, জ্ঞানের প্রসার বাড়িলেই যে কাব্যানুভূতির গভীরতা বাড়িবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য নয়, প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। আমাদের আন্তর্জাতিক মিলন এখনও প্রধানত রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ সুতরাং মূলত প্রয়োজনাত্মক। এই মেলা-মেশার ফলে কিছুটা সামাজিক সৌন্দর্য ও শিষ্টাচারের গণ্ডী বিস্তৃত হইয়াছে ও সর্বমানবিকতার একটা বোধ সবেমাত্র জাগিয়াছে। অন্যদেশের রীতি-নীতি, সমাজ-বিন্যাস ও জীবনযাত্রা প্রণালীর সহিত পরিচিত হইয়া কিছুটা কৌতূহল ও বিস্ময় বোধও উদ্রিক্ত হইয়াছে। কিন্তু অনুভূতির যে গভীর স্তরে সাহিত্য-প্রেরণার উৎস, এই বৈঠক, খানাপিনা, দেশভ্রমণ ও কৌতূহল-পরিতৃপ্তি সেই স্তরে পৌঁছিতে পারিয়াছে কি? আমাদের বহু-বিজ্ঞাপিত বিশ্ব-লেখক-সম্মেলন, এশিয়া-লেখক-গোষ্ঠীর জল্‌সা, এমনকী সর্বভারতীয় সাহিত্য-সভা আমাদের সামাজিকভাবে সম্প্রসারণ ঘটাইতে পারে, কিন্তু নিগূঢ়-অন্তর-স্থায়ী সৃষ্টি-প্রেরণাকে কি সত্যই উদ্দীপ্ত করিয়াছে? আমাদের চিন্তা মনন ও অনুভূতি কি সত্যই উহাদের চিরাভ্যস্ত রসাকর্ষণের ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া আন্তর্জাতিকতার বৃহত্তর কক্ষপথে স্বচ্ছন্দ বিচরণের শক্তি অর্জন করিয়াছে? বিজ্ঞানের চমকপ্রদ আবিষ্ক্রিয়াসমূহ যে পরিমাণে বিস্ময়-রোমাঞ্চ জাগাইতেছে সেই পরিমাণে কি মানস-স্বীকৃতি ও অন্তরঙ্গতা লাভ করিয়াছে?

আমরা চন্দ্রলোকে রকেট পাঠাইতেছি, যাওয়ার জন্য টিকিট কাটিবার আয়োজন করিতেছি, কিন্তু সেখানকার মরমের বার্তা লইয়া কি কোনো আলোকদূত আমাদের অন্তরের নিকট আমন্ত্রণ জানাইয়াছে, চন্দ্রলোকের চন্দ্রালোক কি আমাদের মনের শূন্য গহ্বরে উহার স্নিগ্ধ স্পর্শ পাঠাইয়াছে? সৌরমণ্ডলের শেষ প্রান্তে যাইতে পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়াছি, কিন্তু যাত্রার উপকরণস্বরূপ চিড়া-মুড়ি সঞ্চিত হইয়াছে কি, না সেই সুদূর-সীমান্ত হইতে কেবল ভাববিলাসের বায়ু ভক্ষণ করিয়াই ফিরিতে হইবে? কাজেই আমাদের জ্ঞান ও বৈষয়িক সম্পর্কের সীমা-প্রসারণে আপাতত কবি-সাহিত্যিকের উল্লসিত হইবার বিশেষ কোনো কারণ নাই। হয়ত কিছুসংখ্যক দূরগামী পথিকের যাতায়াতে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের একটা পথের চিহ্ন পড়িয়াছে মাত্র ; কিন্তু যে বহুপদচিহ্নাঙ্কিত, বহু তীর্থযাত্রীর আনন্দ-বেদনার স্মৃতি-সুরভিত রাজপথের উপর দিয়া সাহিত্যের বিজয়-রথ অগ্রসর হইয়া যায়, তাহার নির্মাণে এখনও অনেক দেরি আছে।

আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের জীবন-জিজ্ঞাসা একটা প্রধান সুর ও বিশিষ্ট গৌরব, এই দাবিও শোনা যায়। জীবন-জিজ্ঞাসা কথাটি ম্যাথিউ আর্নল্‌ডের 'Criticism of life'-এর বাংলা প্রতিশব্দ। কিন্তু ম্যাথিউ আর্নল্‌ড কাব্যে জীবন-সমালোচনার সঙ্গে আর একটি অতি প্রয়োজনীয় শর্ত জুড়িয়া দিয়াছিলেন—তাহা হইল কাব্যে সুপ্রতিষ্ঠিত সৌন্দর্য-রীতির

সহিত ইহার সামঞ্জস্য-সাধন। কবির জীবন-বীক্ষণ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজতান্ত্রিক, ঔপন্যাসিক প্রভৃতির সহিত বিভিন্ন এই জন্য যে ইহাতে সৌন্দর্যের দাবি আগে মিটাইতে হইবে। বাস্তবিক কাব্যে সমালোচনাটা গৌণ ; সমালোচনার সূত্র ধরিয়া একটি সৌন্দর্যময় অনুভূতি, একটা সুষমাময় পরিবেশ, একটা ছন্দোময় জীবনচর্যাকে রূপ দেওয়াই কবির প্রধান কাজ। কবি যদি জীবন-জিজ্ঞাসার কণ্টকবৃক্ষে সৌন্দর্যের ফুল ফুটাইতে পারেন তবেই তাঁহার কাঁটাবনে পদক্ষেপ সার্থক। আমরা তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা চাহি না, চাহি উত্তর বা উত্তরের আভাস; জিজ্ঞাসার আবেগজাত ধ্যানদৃষ্টির উন্মোচন, অনাগতের অঙ্কুর-উন্মেষ। নেতিবাচক নৈরাশ্যকূপে নিমজ্জনই যদি কবির ধর্ম হয়, তবে কবির সঙ্গে গদ্য লেখকের পার্থক্য কোথায়? এই নৈরাশ্যের অন্ধকূপ হইতে আশার আলো, পুনর্গঠনের ইঙ্গিত, ছন্দভ্রষ্ট, কেন্দ্রচ্যুত জীবনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নবজীবনের সূচনা, ইহাই আমরা কবির নিকট প্রত্যাশা করি। পলায়নী-মনোবৃত্তি নহে, আকাশ-কুসুম-চয়ন নহে, মহামায়ার ত্রিশূল-ভিন্ন অসুর-বক্ষের রক্তধারার ন্যায় প্রজ্ঞাদৃষ্টি দ্বারা পুঞ্জীভূত অশুভরাশির মর্মভেদ ও ক্লেদনিঃসারণ। কবি যদি মহত্তর ভবিষ্যতের স্বপ্ন না দেখিবেন ও সেই দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত স্বর্গরাজ্যের জন্য মানবমনে তীব্র আকুতি না জাগাইবেন তবে মানুষ চিরতরে স্বর্গচ্যুত হইবে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেলীর কাবের ফরাসি বিপ্লবের রক্তবৃষ্টি মানব-এষণার সুধাবর্ষণে পরিণত হইয়াছিল ; বর্তমানের কালোছায়ার মধ্যে জ্যোতিরুৎসবের পূর্বাভাস ও প্রতিশ্রুতি কি কোনো ভবিষ্যৎ কবির ধ্যানদৃষ্টির নিকট উদ্ভাসিত হইবে না?

একথা ভুলিলে চলিবে না যে আজ আমরা বিশ্বসভ্যতার এক চরম সঙ্কট-মুহূর্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি ; ইতিহাস এক বিরাট প্রশ্ন চিহ্ন লইয়া আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। বিশ্বমানবের সমস্ত সভ্যতার অহঙ্কার ও সংস্কৃতির গৌরব আজ এক সর্বগ্রাসী ধ্বংস-গহ্বরের প্রান্তদেশে পৌঁছিয়া প্রাণপণ শক্তিতে হেলিয়া নিজ আসন্ন পতনকে নিরোধ করিতেছে। মানব-মনীষার শ্রেষ্ঠতম কীর্তি আজ হিংসা-দ্বেষে অন্ধ, পাশবিকতায় বিমূঢ় মানুষের অন্তরলোকে প্রবেশের পথ পাইতেছে না ; সংস্কৃতির সঞ্জীবনী সুধা বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় তাহার ওষ্ঠাধর অতিক্রম করিয়া রসনা পর্যন্ত পৌঁছিতেছে না। রাজনীতির অর্থনীতির সমস্ত ব্যবস্থাপত্র উল্টো ফল প্রসব করিতেছে। নিরাপত্তার সন্ধান বিপদ বাড়াইতেছে ; শান্তির অন্বেষণ অশান্তির পথ প্রশস্ত করিতেছে; বাণিজ্যনীতির পিছন দ্বার দিয়া যুদ্ধের প্রেতমূর্তি উঁকি মারিতেছে। সাধারণ মানুষ অসহায়ভাবে এই প্রলয়ের মেঘাড়ম্বর দেখিতেছে ; ধর্ম নীরবতার গুহাতলে নিজ লজ্জা-ক্লিন্ন মুখ লুকাইয়াছে। সর্বাপেক্ষা অশুভ লক্ষণ এই যে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য নিদাঘক্লিষ্ট বৃক্ষপত্রের ন্যায় এক ম্লান, বিবর্ণ ছায়ারূপে উহার বর্ণোচ্ছলতা ও প্রাণপ্রাচুর্যকে সংহরণ করিয়াছে। সভ্যজগতের কোথায়ও প্রথম শ্রেণির সাহিত্য সৃষ্ট হইতেছে না, ভাবিলে ইহার ভয়াবহ তাৎপর্যটি আমাদের নিকট পরিস্ফুট হইয়া উঠে। যে কবি সাহিত্যিক কিছুদিন পূর্বেও জীবন-নিয়ামক

ছিলেন, তাঁহার আজ মানব-চিত্ত-নিয়ন্ত্রণে কোনো বিশেষ সক্রিয় অংশ নাই ; তিনি আজ রাস্তার কোণে, চৌরাস্তার মোড়ে ফিরিওয়ালার ন্যায় নিজের কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহার উৎকর্ষ বিজ্ঞাপন করেন। কখনও বা রাজনীতিকের ভাব-ভঙ্গীর অনুকরণে, বক্তৃতার চড়া সুরে, ব্যঙ্গরসিকের অতিরঞ্জিত অঙ্গসঞ্চালনে তিনি মানব-চিত্ত-আকর্ষণে ব্যর্থ-করুণ চেষ্টা করিতেছেন। মানুষের হৃদয়বৃত্তি স্ফুরিত করিবার, তাহার সুকুমার অনুভূতি জাগাইবার, তাহার মধ্যে সুস্থ ও সুন্দর জীবন-বোধ উদ্বুদ্ধ করিবার, পরিচিত পরিবেশ ও অজ্ঞাত রহস্যের সহিত তাহার সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করিবার যে প্রধান উপায় ছিল, তাহার ব্যর্থতা আজ ফলের দ্বারাই প্রমাণিত। কবির মর্যাদা-লোপই কি তাঁহার শক্তি-হ্রাসের কারণ ? তাঁহার আত্মপ্রত্যয়ের অভাবই হয়ত তাঁহার কল্পনা-লীলার স্বচ্ছন্দতায় বাধা দিতেছে। কিন্তু কবিতার মধুর রস জনসমাজের চিত্তে সঞ্চারিত করিতে না পারিলে মানব-জাতির অপমৃত্যু প্রতিরোধ দুঃসাধ্য হইবে।

এই মর্মান্তিক সত্যটাই আজ এই সম্মেলনের সভামণ্ডপে আপনাদিগকে বিশেষ করিয়া ভাবিবার জন্য আবেদন জানাইতেছি। সুকুমার শিল্প-সাহিত্যের সত্যিকার কাজ হইল সুস্থ জীবনচর্চায় দীক্ষিত করা, যাহাকে বলে art of right living তাহাই শেখানো। কাব্যের এই পরম ফলশ্রুতি। তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে ইহা নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে কাব্য নিজ একক শক্তিতে মনুষ্যচিত্তের এই বিশুদ্ধীকরণ, মানব-জীবনের এই সুষ্ঠু ও শোভন প্রয়োগ-কলা-সাধনে অসমর্থ। শেকস্‌পিয়র মিল্‌টনের জাতি পরস্বাপহরণে উন্মুখ, গ্যেটের জাতি মারণাস্ত্র-প্রয়োগে তৎপর, রুশো-ভলটেয়ার-হিউগোর জাতি ঔপনিবেশিক শোষণে কুণ্ঠাহীন। কাব্য-রসাস্বাদনের সহিত জীবন সাধনার, উচ্চতত্ত্ব-চিন্তার সহিত ব্যবহারিক প্রয়োগ মিলাইতে না পারিলে কাব্যের রসার্দ্রতা মরুভূমিতে বারিবিন্দুবৎ শুকাইয়া যাইবে। বাস্তব অভাবের সূর্যতাপ যত প্রখর, মাথার উপর স্নিগ্ধ আচ্ছাদনের যত অভাব এই বিশোষণ-প্রক্রিয়া ততই দ্রুততর হইবে। সুতরাং শ্রেষ্ঠ কবিতা ও সাহিত্য সৃষ্টির যত প্রয়োজন, জনগণের মধ্যে উহার গ্রহণশীলতা, উহার প্রতি অনুকূল মনোভাব বৃদ্ধিরও ঠিক ততটাই প্রয়োজন। কাব্য-মেঘের অকৃপণ দাক্ষিণ্যকে রসিক চিত্তের গভীরে জলাশয়ে ধরিয়া রাখিতে না পারিলে উহাতে মনোকর্ষণের বিশেষ সুবিধা হইবে না। এই চিত্ত-প্রস্তুতির অভাবের জন্যই রবীন্দ্র-প্রতিভা আমাদের সামাজিক-জীবনবোধকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। অতি-আধুনিক কাব্যের দুর্বোধ্যতা যেমন উহাকে সম্প্রদায়-সীমাবদ্ধ করিয়াছে, তেমনি উহার নৈরাশ্যবাদও ইহাকে সাধারণের রসস্বীকৃতি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। তথাকথিত বিদগ্ধ রুচির দোহাই দিয়া কবিতাকে সর্বজন-আস্বাদ্যতা হইতে দূরে রাখিলে ইহার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ইহা হইবে ঘিঞ্জি শহরের মধ্যে সাধারণ পার্কের মতো, ধূমধূলিরুদ্ধ শ্বাসযন্ত্রে নূতন, সতেজ হাওয়া সঞ্চারের পথ। রামায়ণ-মহাভারত, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলির যুগে আগে হয়ত ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তাহার বিকল্প ব্যবস্থা না করিলেও নয়।

সেকালে সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম তত্ত্বসমূহ সর্বসাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য যে ব্যাপক ব্যাখ্যা ও প্রচারের আয়োজন হইয়াছিল, একালেও আধুনিক কবিতার ভাববস্তু ও রস-আবেদন কি সেইভাবে প্রকৃতজনের গোচরীভূত করা যায় না?

যাহা হউক, অতীতে ফেরা যদি বা অসম্ভব হয়, উহার তুলনামূলক পর্যালোচনায়ও কোনো আপত্তি নাই। যখন দেখি যে ধর্মসহচর সাহিত্য জীবনচর্যার অঙ্গীভূত হইয়া অত্যাজ্য সহজ সংস্কারের উদ্দীপন করিয়াছে, তখন অনুভব করি যে উহা জীবনসার্থকতার সহায়ক হইয়াছে। ধর্মসাধনার দৃঢ় পাত্রে কাব্যরস বিধৃত হইয়া দেহে-মনে সর্বসঞ্চারী হইয়াছে, ইহা প্রাণের নিগূঢ় উৎসমুখে গিয়া পৌঁছিয়াছে। তখন কাব্যরসিক ও ভক্তসাধকের মধ্যে কোনো কৃত্রিম ব্যবধান ছিল না; সৌন্দর্যানুভূতি অধ্যাত্মবোধের মূর্ত প্রকাশরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। আজ যখন দেখি আয়ু-সীমান্তে উপনীত বৃদ্ধ অস্তগামী সূর্যের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া সান্ত্বনাহীন চিত্তে শেষ দিনটির প্রতীক্ষা করিতেছে, তখন একশত বর্ষ পূর্বেকার যে মৃত্যুপথযাত্রী স্থির অধ্যাত্ম প্রত্যয়ে বলীয়ান হইয়া মরণকে স্পর্ধিত আমন্ত্রণ জানাইয়াছে ও অন্তিম মুহূর্তে কালীনাম-স্মরণের সহিত গঙ্গাজলে দেহবিসর্জনের কল্পনা করিয়াছে, তাহার কাব্যপাঠ যে তাহার জীবনায়নের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে সংযুক্ত হইয়াছে অন্তত এটুকু অনুভব করি। যখন পাশ্চাত্য কাব্য-সাহিত্যে আকণ্ঠপীত তরুণ-তরুণীকে উদ্দেশ্যহীন, আদর্শহীন জীবন অসার আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করিতে দেখি, যখন তাহাদের অসংযম ও শৃঙ্খলাবোধ ও শ্রদ্ধার অভাব সমাজে ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে দারুণ নীতিবিপর্যয় ঘটায়, তখন এই চিন্তা অনিবার্যভাবে মনে জাগে যে কাব্যরস ও উচ্চতম চিন্তা উহাদের অন্তরকে বিন্দুমাত্র সরস করিতে পারিল না কেন? তখন যাঁহারা বিদ্যামন্দিরে শান্ত আশ্রমের আবহ সৃষ্টি করিতেন, যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানকে কর্মসাধনার দ্বারা দৃঢ়ীভূত করিতেন, যাঁহারা গুরুগৃহবাসকে গার্হস্থ্যাশ্রমের ভূমিকারূপে পরিকল্পনা করিতেন, যাঁহারা সংসারের শত-প্রলোভন ও চিত্তবিক্ষেপের মধ্যে তরুণ শিক্ষার্থীকে ত্যাগ, তিতিক্ষা, সর্বভূতহিতের মহাব্রতে অটল রাখিতেন, তাঁহাদের পাঠক্রম যতই সংকীর্ণ ও এক-পেশে হউক না কেন তাঁহারা যে সুষ্ঠু জীবনচর্যার রহস্য আয়ত্ত করিয়াছিলেন একথা কে অস্বীকার করিবে? যখন আমাদের শিশুকুল উদ্ভিদতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব মাথা বোঝাই করিয়া সর্ববিদ্যাবিশারদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে, তখন তাহাদের শিশুসুলভ আনন্দ, শৈশব কল্পনার মাধুর্য, সরল মনের স্বতঃস্ফূর্ত সেবাপ্রবৃত্তি ভক্তিপ্রবণতা যে কোথায় কেমন করিয়া উবিয়া যায় তাহা কি আমরা লক্ষ করি ও এই অমূল্য মানবিক সম্ভাবনার অপচয়ের কোনো প্রতিরোধ-ব্যবস্থার কথা ভাবি? যখন আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের শান্ত, প্রসন্ন মুখশ্রীর উপর একটা গূঢ় অতৃপ্তির ছায়াপথ লক্ষ করি, তখন বুঝি যে তাহাদের সমস্ত প্রসাধন-সজ্জা ও চটুল আমোদপ্রিয়তা তাহাদের নির্বাপিত আন্তরদীপ্তির মলিনতাকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে না, তখন অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারই যে শূন্য হইয়া আসিল, জীবন-

সরোবরের প্রস্ফুটিত পদ্ম যে শুকাইয়া গেল এই মর্মান্তিক প্রতীতিই কি মনে সুদৃঢ় হয় না? এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আমাদের সমাজ-উন্নয়ন ও মানস প্রকর্ষসাধনের সর্ববিধ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। বাঙালির কাব্যপ্রীতি তাহার যুগযুগান্ত হইতে আগত, অত্যাজ্য মানস সংস্কার, সে অশেষ দুর্গতির মধ্যেও কাব্যচর্চা ভোলে নাই। সে ভগবানকে ভুলিয়াছে, নিজ অতীত সংস্কৃতি ও সাধনাকে ভুলিতে বসিয়াছে, কিন্তু তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে এক সরস্বতীরই কিছুটা মান রাখিয়াছে। ইহাই তাহার মানস-মুক্তি, তাহার প্রবৃত্তি-উর্ধ্বায়নের একমাত্র খোলা পথ। এই পথ বাহিয়াই তাহার মস্তকে দিব্যের আশীর্বাদ বর্ষিত হইবে ইহাই একমাত্র আশা। এক রুচিবান, অনুশীলিত, আদর্শে দৃঢ় সমাজ গড়িয়া উঠুক এবং এই সমাজই আমাদের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মনন ও উন্নততম কাব্যানুভূতিকে বাস্তব জীবনচর্যার মাধ্যমে জিয়াইয়া রাখুক। ধর্মের পরিত্যক্ত সিংহাসন সাহিত্যের দ্বারা অধিকৃত হউক, জাতির ভাগ্যনিয়ন্তার প্রতি প্রার্থনা জানাইয়া এবং এই প্রার্থনা পূরণের জন্য বাংলায় বিদগ্ধ মনীষী সমাজের আনুকূল্য ও সহযোগিতার সবিনয় আবেদন জানাইয়া এবং আপনাদের ধৈর্যের প্রতি অত্যাচারের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করিয়া আমার এই দীন ভাষণের উপসংহার করিলাম।

বন্দে মাতরম্!

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, ১৯৫৮ সালে জব্বলপুরে অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি

আমি জানি, সাহিত্য-শাখার সভাপতি হবার যোগ্য আমি নই এবং আমারই মতো যাঁরা প্রাচীন, আমারই মতো যাঁদের মাথার চুল এবং বুদ্ধি দুই-ই পেকে সাদা হয়ে উঠেছে তাদেরও এ বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নেই। কারো মনে ব্যথা দেবার আমার ইচ্ছা ছিল না তবুও যে এই পদ গ্রহণে সম্মত হয়েছিলাম, তার একটি মাত্র কারণ এই যে, নিজের অযোগ্যতা ও ভক্তিভাজনগণের মনঃপীড়া, এত বড়ো বড়ো দুটো ব্যাপারকে ছাপিয়েও তখন বারংবার এই কথাটাই আমার মনে হয়েছিল যে, এই প্রত্যাশিত মনোনয়নের দ্বারা নবীনের দল আজ জয়যুক্ত হয়েছেন। তাঁদের সবুজ-পতাকার আহ্বান আমাকে মানতেই হবে, ফল তার যাই কেন না হউক। আর এ প্রার্থনাও সর্বান্তঃকরণে করি, আজ থেকে যাত্রা-পথ যেন তাঁদের উত্তরোত্তর সুগম ও সাফল্যমণ্ডিত হয়।

ষোল বৎসর পূর্বে বাঙলার সাহিত্যিকগণের বার্ষিক সম্মিলনের আয়োজন যখন প্রথম আরম্ভ হয়, আমি তখন বিদেশে। তারও বহুদিন পর পর্যন্তও আমি কল্পনাও করিনি যে, সাহিত্য-সেবাই একদিন আমার পেশা হয়ে উঠবে। প্রায় বছর-দশেক পূর্বে কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিকের আগ্রহ ও একান্ত চেষ্টার ফলেই আমি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়ে পড়ি।

বাংলার সাহিত্য-সাধনার ইতিহাসে এই বছর-দশেকের ঘটনাই আমি জানি। সুতরাং এ বিষয়ে বলতেই যদি কিছু হয়, ত এই স্বল্প কয়টা বছরের কথাই শুধু বলতে পারি।

মাস-কয়েক পূর্বে পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলেছিলেন, এবারে যদি তোমার লক্ষ্ণৌ সাহিত্য-সম্মিলনে যাওয়া হয় ত অভিভাষণের বদলে তুমি একটা গল্প লিখে নিয়ে যেও। অভিভাষণের পরিবর্তে গল্প! আমি একটু বিস্মিত হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি শুধু উত্তর দিয়েছিলেন, সে ঢের ভালো।

এর অধিক আর কিছু তিনি বলেননি। এতদিন বৎসরের পর পর বৎসর যে সাহিত্য-সম্মিলন হয়ে আসছে, হয় তার অভিভাষণগুলির প্রতি তাঁর আগ্রহ নাই, না হয়, আমার যা কাজ,·সেই আমার পক্ষে ভালো, এই কথাই তাঁর মনের মধ্যে ছিল। একবার ভেবেছিলাম

লক্ষ্ণৌ যখন যাওয়াই হল না, তখন যেখানে যাচ্ছি সেখানেই তাঁর আদেশ পালন করব। কিন্তু নানা কারণে সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত করতে পারলাম না। কিন্তু আজ এই অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর লেখা পড়তে উঠে আমার কেবলই মনে হচ্ছে, সেই আমার ঢের ভালো ছিল। একজন সাধারণ সাহিত্য-সেবকের পক্ষে এত বড়ো সভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সাহিত্যের ভালো মন্দ বিচার করতে যাওয়ার মতো বিড়ম্বনা আর নেই।

বঙ্গসাহিত্যের অনেকগুলি বিভাগ ; দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস। সেই সেই বিভাগীয় সভাপতিদের পাণ্ডিত্য, অসাধারণ বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ এবং মার্জিত ; তাঁদের কাছে আপনারা অনেক নব নব রহস্যের সন্ধান পাবেন, কিন্তু আমি সামান্য একজন গল্প লেখক। গল্প লেখার সম্বন্ধেই দু-একটা কথা বলতে পারি, কিন্তু সাহিত্যের দরবারে তার কতটুকুই বা মূল্য ! কিন্তু সেটুকু মূল্যও আমি আপনাদের নির্বিচারে দিতে বলিনে, কোনো দিন বলিনি আজও বলব না। এ শুধু আমার নিতান্তই নিজের কথা। যে কথা সাহিত্য-সাধনার দশ বৎসরকাল আমি নিঃসংশয়ে, অকুণ্ঠিতচিত্তে ধরে আছি।

এই দশ বৎসরে একটা জিনিস আমি আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে লক্ষ করে এসেছি যে, দিনের পর দিন এর পাঠকসংখ্যা নিরন্তর বেড়ে চলেছে। আর তেমনি অবিশ্রান্ত এই অভিযোগেরও অন্ত নেই যে, দেশের সাহিত্য দিনের পর দিন অধঃপথেই নেমে চলেছে। প্রথমটা সত্য, এবং দ্বিতীয়টা সত্য হলে, ইহা দুঃখের কথা, ভয়ের কথা ; কিন্তু ইহার প্রতিরোধের আর যা উপায়ই থাক, সাহিত্যিকদের কেবল কটু কথার চাবুক মেরে মেরেই তাঁদের দিয়ে পছন্দমতো ভালো ভালো বই লিখিয়ে নেওয়া যাবে না। মানুষ ত গোরু ঘোড়া নয় ! আঘাতের ভয় তার আছে, এ কথা সত্য, কিন্তু অপমানবোধ বলেও যে তার আর একটা বস্তু আছে, এ কথাও তেমনই সত্য। তার কলম বন্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু ফরমায়েশি বই আদায় করা যায় না। মন্দ বই ভালো নয়, কিন্তু তাকে ঠেকাবার জন্যে সহিত্য-সৃষ্টির দ্বার রুদ্ধ করে ফেলা সহস্রগুণ অধিক অকল্যাণকর।

কিন্তু দেশের সাহিত্যে কি নবীন সাহিত্যিকের হাতে সত্য সত্যই নীচের দিকে নেমে চলেছে? এ যদি সত্য হয়, আমার নিজের অপরাধও কম নয়, তাই এই কথাটাই আজ আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই। এ কেবল আলোচনার জন্যেই আলোচনা নয়, এই শেষ কয় বৎসরের প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা দেখে আমার মনে হচ্ছে, যেন সাহিত্য-সৃষ্টির উৎস-মুখ ধীরে ধীরে অবরুদ্ধ হয়ে আসছে। সংসারে রাবিশ বই-ই কেবল একমাত্র রাবিশ নয়, সমালোচনার ছলে দায়িত্ববিহীন কটূক্তির রাবিশেও বাণীর মন্দিরপথ একেবারে সমাচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর চারিদিকের সাহিত্যিকমণ্ডলী একদিন বাংলার সাহিত্যাকাশ উদ্ভাসিত করে রেখেছিলেন। কিন্তু মানুষ চিরজীবী নয়, তাঁদের কাজ শেষ করে তাঁরা স্বর্গীয় হয়েছেন। তাঁদের প্রদর্শিত পথ, তাঁদের নির্দিষ্ট ধারার সঙ্গে নবীন সাহিত্যিকদের অনৈক্য ঘটেছে ;

ভাষা, ভাব ও আদর্শে। এমনকী, প্রায় সকল বিষয়েই। এইটেই অধঃপথ কিনা, এই কথাই আজ ভেবে দেখবার।

আর্ট-এর জন্যই আর্ট, এ কথা আমি পূর্বেও কখনও বলিনি, আজও বলিনে। এর যথার্থ তাৎপর্য আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। এটা উপলব্ধির বস্তু, কবির অন্তরের ধন।

সংজ্ঞা নির্দেশ করে অপরকে এর স্বরূপ বুঝান যায় না। কিন্তু সাহিত্যের আর একটা দিক আছে, সেটা বুদ্ধি ও বিচারের বস্তু। যুক্তি দিয়ে আর একজনকে তা বুঝান যায়। আমি এই দিকটাই আজ বিশেষ করে আপনাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করতে চাই। বিষ্ণুশর্মার দিন থেকে আজও পর্যন্ত আমরা গল্পের মধ্য থেকে কিছু একটা শিক্ষা লাভ করতে চাই। এ প্রায় আমাদের সংস্কারের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। এদিকে কোনো ত্রুটি হলে আর আমরা সইতে পারিনে। সক্রোধ অভিযোগের বান যখন ডাকে, তখন এই দিককার বাঁধ ভেঙেই তা হুঙ্কার দিয়ে ছোটে। প্রশ্ন হয়, কী পেলাম, কতখানি এবং কোন্ শিক্ষালাভ আমার হল। এই লাভালাভের দিকটাতেই আমি সর্বপ্রথমে দৃষ্টি দিতে চাই।

মানুষ তার সংস্কার ভাব নিয়েই ত মানুষ ; এবং এই সংস্কার ও ভাব নিয়েই প্রধানতঃ নবীন সাহিত্য-সেবীর সহিত প্রাচীনপন্থীর সংঘর্ষ বেধে গেছে। সংস্কার ও ভাবের বিরুদ্ধে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায় না, তাই নিন্দা ও কটুবাক্যের সূত্রপাতও হয়েছে এইখানে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি। বিধবা-বিবাহ মন্দ, হিন্দুর ইহা মজ্জাগত সংস্কার। গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে বিধবা নায়িকার পুনর্বিবাহ দিয়ে কোনো সাহিত্যিকেরই সাধ্য নাই, নিষ্ঠাবান হিন্দুর চক্ষে সৌন্দর্য সৃষ্টি করবার। পড়বামাত্রই মন তাঁর তিক্ত-বিষাক্ত হয়ে উঠবে। গ্রন্থের অন্যান্য সমস্ত গুণই তাঁর কাছে ব্যর্থ হয়ে যাবে। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন গভর্নমেন্টের সাহায্যে বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ করেছিলেন, তখন তিনি কেবল শাস্ত্রীয় বিচারই করেছিলেন, হিন্দুর মনের বিচার করেননি। তাই আইন পাশ হল বটে, কিন্তু হিন্দুসমাজ তাকে গ্রহণ করতে পারলে না। তাঁর অতবড় চেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেল। নিন্দা, গ্লানি, নির্যাতন তাঁকে অনেক সইতে হয়েছিল, কিন্তু তখনকার দিনের কোনো সাহিত্যসেবীই তাঁর পক্ষ অবলম্বন করলেন না। হয়ত, এই অভিনব ভাবের সঙ্গে তাঁদের সত্যই সহানুভূতি ছিল না, হয়ত তাঁদের সামাজিক অপ্রিয়তার অত্যন্ত ভয় ছিল, যে জন্যই হউক, সেদিনের সে ভাবধারা সেইখানেই রুদ্ধ হয়ে রইল, সমাজতন্ত্রের স্তরে স্তরে, গৃহস্থের অন্তঃপুরে সঞ্চারিত হতে পেলে না। কিন্তু এমন যদি না হত, এমন উদাসীন হয়ে যদি তাঁরা না থাকতেন, নিন্দা, গ্লানি, নির্যাতন সকলই তাঁদিগকে সইতে হত সত্য, কিন্তু আজ হয়ত আমরা হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থার আর একটা চেহারা দেখতে পেতাম। সে দিনের হিন্দুর চক্ষে যে সৌন্দর্য-সৃষ্টি কদর্য, নিষ্ঠুর ও মিথ্যা প্রতিভাত হত, আজ অর্ধশতাব্দী পরে তারই রূপে হয়ত আমাদের নয়ন ও মন মুগ্ধ হয়ে যেত। এমনই ত হয়, সাহিত্য সাধনায় নবীন সাহিত্যিকের

এই ত সব চেয়ে বড়ো সান্ত্বনা। সে জানে, আজকের লাঞ্ছনাটাই জীবনে তার একমাত্র এবং সবটুকু নয়, অনাগতের মধ্যে তারও দিন আছে; হউক সে শত বর্ষ পরে, কিন্তু সে দিনের ব্যাকুল, ব্যথিত নর-নারী শত লক্ষ হাত বাড়িয়ে আজকের দেওয়া তার সমস্ত কালি মুছে দেবে। শাস্ত্রবাক্যের মর্যাদা হানি করা আমার উদ্দেশ্য নয়, প্রচলিত সামাজিক বিধি-নিষেধের সমালোচনা করবার জন্যও আমি দাঁড়াইনি। আমি শুধু এই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, শত কোটি বর্ষের প্রাচীন পৃথিবী আজও তেমনি বেগেই ধেয়ে চলেছে, মানব-মানবীর যাত্রা-পথের সীমা আজও তেমনই সুদূরে। তার শেষ পরিণতির মূর্তি তেমনই অনিশ্চিত, তেমনই অজানা। শুধুই কি কেবল তার কর্তব্য ও চিন্তার ধারাই চিরদিনের মতো শেষ হয়ে গেছে? বিচিত্র ও নব নব অবস্থার মাঝ দিয়ে তাকে অহর্নিশি যেতে হবে, তার কত রকমের সুখ, কত রকমের আশা-আকাঙ্ক্ষা—থামবার জো নেই, চলতেই হবে, শুধু কি তার নিজের চলার উপরেই কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না? কোন্ সুদূর অতীতে তাকে সেই অধিকার হতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করা হয়ে গেছে। যাঁরা বিগত, যাঁরা সুখ-দুঃখের বাহিরে, এ দুনিয়ার দেনা-পাওনা শোধ দিয়ে যাঁরা লোকান্তরে গেছেন, তাঁদের ইচ্ছা, তাঁদেরই চিন্তা, তাঁদের নির্দিষ্ট পথের সংকেতই কি এত বড়ো? আর যাঁরা জীবিত, ব্যথায় বেদনায় হৃদয় যাঁদের জর্জরিত, তাঁদের আশা, তাঁদের কামনা কি কিছুই নয়? মৃতের ইচ্ছাই কি চিরদিন জীবিতের পথ রোধ করে থাকবে? তরুণ-সাহিত্য ত শুধু এই কথাটাই বলতে চায়! তাদের চিন্তা, ভাব আজ অসঙ্গত, এমনকী অন্যায় বলেও ঠেকতে পারে, কিন্তু তারা না বললে বলবে কে? মানবের সুগভীর বাসনা, নর-নারীর একান্ত নিগূঢ় বেদনার বিবরণ সে প্রকাশ করবে না ত করবে কে? মানুষকে মানুষ চিনবে কোথা দিয়ে? সে বাঁচবে কী করে?

আজ তাকে বিদ্রোহী মনে হতে পারে, প্রতিষ্ঠিত বিধি-ব্যবস্থার পাশে হয়ত তার রচনা আজ অদ্ভুত দেখাবে, কিন্তু সাহিত্য ত খবরের কাগজ নয়! বর্তমানের প্রাচীর তুলে দিয়ে ত তার চতুঃসীমানা সীমাবদ্ধ করা যায় না। গতি তার ভবিষ্যতের মাঝে। আজ যাকে চোখে দেখা যায় না, আজও যে এসে পৌঁছেনি, তারই কাছে তার পুরস্কার, তারই কাছে তার সংবর্ধনার আসন পাতা আছে।

কিন্তু তাই বলে আমরা সমাজ-সংস্কারক নই। এ ভার সাহিত্যিকের উপরে নাই। কথাটা পরিস্ফুট করবার জন্য যদি নিজের উল্লেখ করি, অবিনয় মনে করে আপনারা অপরাধ নেবেন না। *পল্লী-সমাজ* বলে আমার একখানা ছোটো বই আছে। তার বিধবা রমা বাল্যবন্ধু রমেশকে ভালোবেসেছিল বলে আমাকে অনেক তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে। একজন বিশিষ্ট সমালোচক এমন অভিযোগও করেছিলেন যে, এত বড়ো দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে গ্রামে বিধবা আর কেউ থাকবে না। মরণ-বাঁচনের কথা বলা যায় না, প্রত্যেক স্বামীর পক্ষেই ইহা গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আর একটা দিক্‌ও ত আছে। ইহার প্রশ্রয় দিলে

ভালো হয় কী মন্দ হয়, হিন্দু-সমাজ স্বর্গে যায় কী রসাতলে যায়, এ মীমাংসার দায়িত্ব আমার উপরে নাই। রমার মতো নারী ও রমেশের মতো পুরুষ কোনো কালে, কোনো সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দু সমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হল এই যে, এত বড়ো দুটি মহাপ্রাণ নর-নারী এ জীবনে বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু হয়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে বেদনার এই বার্তাটুকুও যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি ত তার বেশি আর কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের সাহিত্যিকের নয়। রমার ব্যর্থ জীবনের মতো এ রচনা বর্তমানে ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের বিচারশালায় নির্দোষীর এত বড়ো শাস্তিভোগ একদিন কিছুতেই মঞ্জুর হবে না, এ কথা আমি নিশ্চয় জানি। এ বিশ্বাস না থাকলে সাহিত্যসেবীর কলম সেইখানেই সে দিন বন্ধ হয়ে যেত।

আগেকার দিনে বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে আর যা নালিশই থাক, দুর্নীতির নালিশ ছিল না ; ওটা বোধ করি তখনও খেয়াল হয়নি। এটা এসেছে হালে। তাঁরা বলেন আধুনিক সাহিত্যের সব চেয়ে বড়ো অপরাধই এই যে, তার নর-নারীর প্রেমের বিবরণ অধিকাংশই দুর্নীতিমূলক এবং প্রেমেরই ছড়াছড়ি। অর্থাৎ নানাদিক দিয়ে এই জিনিসটাই যেন মূলত গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তু হয়ে উঠেছে।

নেহাত মিথ্যে বলেন না। কিন্তু তার দুই-একটা ছোটোখাটো কারণ থাকলেও মূল কারণটাই আপনাদের কাছে বিবৃত করতে চাই। সমাজ জিনিসটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে মানিনে। বহুদিনের পুঞ্জীভূত নর-নারীর বহু মিথ্যা, বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিলে আছে। মানুষের খাওয়া-পরা-থাকার মধ্যে এর শাসনদণ্ড অতি সর্তক নয়, কিন্তু এর একান্ত নির্দয় মূর্তি দেখা দেয় কেবল নর-নারীর ভালোবাসার বেলায়। সামাজিক উৎপীড়ন সব চেয়ে সইতে হয় মানুষকে এইখানে। মানুষ একে ভয় করে, এর বশ্যতা একান্তভাবে স্বীকার করে, দীর্ঘদিনের এই স্তূপীকৃত ভয়ের সমষ্টিই পরিশেষে বিধিবদ্ধ আইন হয়ে ওঠে, এর থেকে রেহাই দিতে কাউকে সমাজ চায় না। পুরুষের তত মুশকিল নেই, তার ফাঁকি দেবার রাস্তা খোলা আছে, কিন্তু কোথাও কোনো সূত্রেই যার নিষ্কৃতির পথ নেই সে শুধু নারী। তাই সতীত্বের মহিমা-প্রচারেই হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ সাহিত্য। কিন্তু এই propaganda চালানোর কাজটাকেই নবীন সাহিত্যিক যদি তার সাহিত্যসাধনার সর্বপ্রধান কর্তব্য বলে গ্রহণ করতে না পেরে থাকে, ত তার কুৎসা করা চলে না ; কিন্তু কৈফিয়তের মধ্যেও যে তার যথার্থ চিন্তার বহু বস্তু নিহিত আছে, এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না।

একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা নবীন সাহিত্যিক বোঝে, এর প্রতি তার সম্মান ও শ্রদ্ধার অবধি নেই, কিন্তু সে সইতে যা পারে না, সে এর নাম করে ফাঁকি। তার মনে হয়, এই

ফাঁকির ফাঁক দিয়েই ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যে-অসত্য তাদের আত্মায় সংক্রামিত করে নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সেই তাদের সমস্ত জীবন ধরে ভীরু, কপট, নিষ্ঠুর ও মিথ্যাচারী করে তোলে। সুবিধা ও প্রয়োজনের অনুরোধে সংসারে অনেক মিথ্যাকেই হয়ত সত্য বলে চালাতে হয়, কিন্তু সেই অজুহাতে জাতির সাহিত্যকেও কলুষিত করে তোলার মতো পাপ অল্পই আছে। আপাত-প্রয়োজন যাই থাক, সেই সংকীর্ণ গণ্ডী হতে একে মুক্তি দিতেই হবে। সাহিত্য জাতীয় ঐশ্বর্য ; ঐশ্বর্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত। বর্তমানের দৈনন্দিন প্রয়োজনে তাকে যে ভাঙিয়ে খাওয়া চলে না, এ কথা কোনো মতেই ভোলা উচিত নয়।

পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়ো, এই কথাটা একদিন আমি বলেছিলাম। কথাটাকে যৎপরোনাস্তি নোংরা করে তুলে আমার বিরুদ্ধে গালিগালাজের আর সীমা রইল না। মানুষ হঠাৎ যে ক্ষেপে গেল। অত্যন্ত সতী নারীকে আমি চুরি, জুয়াচুরি, জাল ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দেখেছি এবং ঠিক এর উলটোটা দেখাও আমার ভাগ্যে ঘটেছে। এ সত্য নীতি-পুস্তকে স্বীকার করার আবশ্যকতা নেই। কিন্তু বুড়ো ছেলেমেয়েকে যদি গল্পচ্ছলে এই নীতিকথা শেখানোর ভার সাহিত্যকে নিতে হয়, তা আমি বলি, সাহিত্য না থাকই ভালো। সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্বেও ছিল না, পরেও হয়ত এক দিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, এ কথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায়, ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?

সাহিত্যের সুশিক্ষা, নীতি ও লাভালাভের অংশটাই এতক্ষণ ব্যক্ত করে এলাম। যেটা তার চেয়েও বড়ো, এর আনন্দ, এর সৌন্দর্য, নানা কারণে তার আলোচনা করবার সময় পেলাম না। শুধু একটা কথা বলে রাখতে চাই যে, আনন্দ ও সৌন্দর্য কেবল বাহিরের বস্তুই নয়। শুধু সৃষ্টি করবার ত্রুটিই আছে, তাকে গ্রহণ করবার অক্ষমতা নাই, এ কথা কোনো মতেই সত্য নয়। আজ একে হয়ত অসুন্দর আনন্দহীন মনে হতে পারে ; কিন্তু ইহাই যে এর শেষ কথা নয়, আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে এ সত্য মনে রাখা প্রয়োজন।

আর একটি মাত্র কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। ইংরেজিতে Idealistic ও Realistic বলে দুটো বাক্য আছে। সম্প্রতি কেউ কেউ এই অভিযোগ উত্থাপিত করেছেন যে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্য অতিমাত্রায় realistic হয়ে চলেছে। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা হয় না। অন্তত উপন্যাস যাকে বলে, সে'হয় না। তবে কে কতটা কোন্ ধার ঘেঁষে চলবে, সে নির্ভর করে সাহিত্যিকের শক্তি ও রুচির উপরে। তবে একটা নালিশ এই করা যেতে পারে যে, পূর্বের মতো রাজারাজড়া, জমিদারের দুঃখ-দৈন্যদ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্যসেবীর মন আর ভরে না। তারা নীচের স্তরে নেমে গেছে। এটা আপশোসের কথা নয়। বরঞ্চ এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুষ-সাহিত্যের মতো যে দিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সে দিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল

স্বদেশে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।

কিন্তু আর না। আপনাদের অনেক সময় নিয়েছি, আর নিতে পারব না। কিন্তু বসবার আগে আর একটা কথা জানাবার আছে। বাংলার ইতিহাসে এই বিক্রমপুর বিরাট গৌরবের অধিকারী। বিক্রমপুর পণ্ডিতের স্থান, বীরের লীলাক্ষেত্র, সজ্জনের জন্মভূমি। আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ চিত্তরঞ্জন এই দেশেরই মানুষ। মুন্সিগঞ্জে যে মর্যাদা আপনারা আমাকে দিয়েছেন, সে আমি কোনোদিন বিস্মৃত হব না। আপনারা আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার গ্রহণ করুন।*

১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে মুন্সিগঞ্জে সাহিত্য-সভায় সভাপতির অভিভাষণ।

ক্ষিতিমোহন সেন

সভাপতির ভাষণ

নমস্কার

বৈদিক ঋষি অঙ্গিরার মতো আমরাও প্রার্থনা করি : 'আ নো যজ্ঞং ভারতী তূয়মেতু।।' 'এই উৎসবভূমিতে ভারতীয় ত্বরায় আগমন করুন।' আথবর্ণ ঋষির সঙ্গে এক হইয়া বলি, 'পুনরেহি বাচস্পতে দেবেন মনসা সহ।' 'হে বাণীর অধিপতি, দীপ্যমান মন লইয়া আজ আবার আমাদের মধ্যে এস।'

'সীদতা বর্হিরুরু বঃ সদস্কৃতম্।' (আমাদের ভক্তিপ্রণত চিত্তে) 'তোমার জন প্রশস্ত উদার উপবেশনস্থান রচিত হইয়াছে, সেই-আসনে উপবেশন করো।'

'ইমা ব্রহ্ম ব্রহ্মবাহঃ ক্রিয়ন্ত আ বর্হি সীদ।' 'হে ব্রহ্মবাহ, এই সব ব্রহ্মবাণী এখন উচ্চারিত হইবে, এই আসনে উপবেশন করো।'

'পশ্যদ্ অক্ষণ্বান্ ন রিচেতদ্ অন্ধঃ।' 'যাহার চক্ষু আছে, সে-ই তোমাকে দেখিতে পায়। যে অন্ধ সে তোমাকে চিনিতে পারে না।'

'নমঃ সভাভ্যঃ সভাপতিভ্যশ্চ বঃ নমঃ' (শুক্ল যজু, বাজ-সংহিতা) এই সভায় (পুরাতন ও নূতন) সকল অধিবেশনকে নমস্কার, (পূর্ব) সকল সভাপতিগণকে নমস্কার।

'নমো জ্যেষ্ঠায় চ কনিষ্ঠায় চ।' (বাজ-সংহিতা ; তৈ, সং) আপনাদের মধ্যে যাঁহারা জ্যেষ্ঠ তাঁহাদিগকে নমস্কার, যাঁহারা কনিষ্ঠ তাঁহাদিগকে নমস্কার।

সভা চ মা সমিতিশ্চাবতাং
প্রজাপতের্দুহিতরৌ সংবিদানে।
যে না সংগচ্ছা উপমা স শিক্ষাদ্
অন্তর্ বদামি হৃদয়ে জনানাম্।।

'প্রজাপতির দুই দুহিতা সভা ও সমিতি, একমত হইয়া আমাকে আজ রক্ষা করুন। আজ

যাঁহাদের সহিত মিলিত হইব, তাঁহারা যেন আমাকে উপশিক্ষিত করিয়া লন। আমার বক্তব্য যেন আজ সবার অন্তরে প্রবেশ করে।'

বেদ বৈ সভে তে নাম সুভদ্রাসি সরস্বতি।
যে তে কে চ সভাসদস্তে মে সন্তু সবাচসঃ।।

'হে সভে, তোমার পরিচয় আমি জানি, তুমি সুকল্যাণী, তুমি আনন্দরসস্বরূপা। এই সভাতে যে কেহ সভাসদ আছেন তাঁহারা আমার সহিত আজ একমত একবাক্য হউন।'

সাংমনস্য

এই সাধনার ক্ষেত্রে চাই সকলের একব্রত ও একপ্রাণতা, অথচ এখানেই আসিয়া জোটে যত ঈর্ষা বিদ্বেষ। তাই দেখি ঋষিরা উচ্চারণ করিয়াছেন সাংমনস্য অর্থাৎ একমন একপ্রাণ করিবার মন্ত্র।

'সং বঃ পৃচ্যন্তাং তন্ব সংমনাংসি সমুব্রতা।' 'তোমাদের কায়া মন ও ব্রত যোগযুক্ত হইয়া এক হউক।'

'সংজ্ঞপনং ব মনসোথো সংজ্ঞপনং হৃদঃ।' 'তোমাদের মন ও হৃদয় জ্ঞানের ঐক্যে যোগযুক্ত হউক।'

সমানীব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু ব মনো যতা বো সুসহাসতি।।

'তোমাদের আকুতি এক হউক, হৃদয় এক হউক, মন এক হউক। তোমাদের সকল উদ্যম শোভন ঐক্য প্রাপ্ত হউক।'

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং ব্রতং সহ চিত্তমেষাম্।
সমানেন ব হবিষা জুহোমি
সমানাং চেতো অভিসংবিশধ্বম্।

এইখানে সমবেত 'সকলের মন্ত্র এক হউক, সমিতি এক হউক, ব্রত এক হউক, চিত্ত এক হউক। তোমাদের জন্য আমি একই আহুতি প্রদান করিতেছি। তোমরা সকলে একই ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যোগযুক্ত হও।'

'সহৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ।' 'আমি তোমাদিগকে পরস্পরে সহৃদয় একমন

ও অবিদ্বেষ করিতে চাই।'

সধ্রীচীনান্ বঃ সংমনসস্কৃণোমি
একশ্নুষ্টীন্‌ৎসংবনেন সর্বান্।
দেবা ইবামৃতং রক্ষমাণাঃ
সায়ংপ্রাতঃ সৌমনসো বো অস্তু।।

'মধুর বিনয়বচনে আমি তোমাদের সকলকে সমান উৎসাহে একব্রতে অনুপ্রাণিত করিতে চাই। চিত্তে মনে আনন্দে ও ভোগে এক করিতে চাই। দিনরাত্রি যেমন পরস্পরে প্রীতিযুক্ত দেবতারা স্বর্গের অমৃত রক্ষা করেন, তোমরাও তেমনি সদা প্রীতিযুক্ত হও।'

জ্যায়স্বন্তশ্চিত্তিনো মা বি যৌষ্ট
সংরাধয়ন্তঃ মধুরাশ্চরন্তঃ।।

'পরস্পরে শ্রদ্ধাবান হও, চিত্তবান হও, চলিতে চলিতে পরস্পরে বিযুক্ত হইও না, পরস্পরে সমান সিদ্ধিযুক্ত হও, সাধনার ভার যুক্তভাবে সবাই বহন করো।'

মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্ মা স্বসারমুত স্বসা।
সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদত ভদ্রয়া।।

'ভাই যেন আর ভাইকে দ্বেষ না করে, ভগ্নী যেন আর ভগ্নীকে দ্বেষ না করে। এক সত্যে ও আনন্দে একগতি ও সব্রত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে কল্যাণবাণী বল।'

শিবাস্তু একা অশিব্যস্তু একাঃ
সর্বা বিভর্ষি সুমনস্যমানঃ।।

'কত কত লোক হইবে অনুকূল, কত কত লোক বা হইবে প্রতিকূল, সবই বহন করিতে হইবে আনন্দে ও কল্যাণমনে।'

সংজ্ঞানামহৈ মনসা সংচিকিত্বা
মা যুষ্মহি মনসা দৈব্যেন।।

'সবার সঙ্গেই যেন মনে-মনে যোগযুক্ত হই, জ্ঞানে-জ্ঞানে যোগযুক্ত হই এবং দৈব্য মনের সহিত যেন কখনও বিযুক্ত না হই।'

'সংজ্ঞানং নঃ স্বেভিঃ সংজ্ঞানমরণোভিঃ।' 'আমাদের এই প্রীতিযোগ সকল আপনজনের সঙ্গে হউক, সকল পরজনের সঙ্গেও হউক।'

বাচস্পতে পৃথিবী নঃ স্যোনা
ইহৈব প্রাণঃ সখ্যে নো অস্তু।।

'হে বাণীর অধীশ্বর, পৃথিবী আমাদের আনন্দময় কল্যাণময় হউক, এই পৃথিবীতেই আমাদের প্রাণ সর্বপ্রাণের সঙ্গে প্রেমযোগে যুক্ত হউক।'

মেদিনীপুরের কথা

মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের জন্ম ১৩১৮ সালে। কাজেই ইহার পঁচিশ বছর হইয়া গেল ছাব্বিশ বছরে এই পরিষৎ পদক্ষেপ করিল। প্রথম পঁচিশ বৎসর কাল আমাদের শাস্ত্রমতে ব্রহ্মচর্যের কাল। তাহার পর সমাবর্তন ও গৃহস্থজীবনের আরম্ভ।

পরিষৎ স্ত্রী-শব্দ হইলেও বেদে নারীর ব্রহ্মচর্য বিহিত আছে। 'ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানাং বিন্দতে পতিম্।' 'ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই কন্যা যুবাকে পতিভাবে প্রাপ্ত হয়।'

তাই এই পরিষদের পক্ষেও এখন গৃহস্থজীবন আসিল। পূর্বে ব্রহ্মচারিণীরূপে সে-ই অন্যের কাছে ভিক্ষা চাহিতে পারিত, এখন গৃহস্থরূপিণী তাহার কাছেই সবাকার দাবি উপস্থিত হইবে। এখন হইতে তাই ইহার তপস্যা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

যেখানে সভার স্থান তাহার যোগ্যতা ও মাহাত্ম্যের উল্লেখ করার রীতি আছে। মেদিনীপুরের মাহাত্ম্য আমার অপেক্ষা আপনারাই ভালো জানেন তবু তীর্থে নবাগত যাত্রীর বন্দনারূপে আমারও কিছু বলার প্রয়োজন আছে।

বাংলাদেশের লোক কেহই মেদিনীপুরের গুণ না গাহিয়া পারেন না, কারণ সবাই মেদিনীপুরের নুন খাইয়াছেন। একসময় সারা বাংলার নিমক জোগাইত মেদিনীপুর তাহা ছাড়া ধান্য ও রেশমের ভূমি এই মেদিনীপুর। কাজেই ইহা আমাদের অনেককেই অন্নবস্ত্র দিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় গুণ গাহিতে হইলেও মিথ্যা গাহিতে হইবে না। মেদিনীপুরের যথার্থ মহত্ত্ব আছে।

ধর্মের দিক দিয়া মেদিনীপুরে এখনও জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের বহু অবশেষ পাওয়া যায়। তাহার পর নিরঞ্জনপন্থ যোগমত ধর্মপূজা প্রভৃতিরও বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ছিল এইখানে, এখনও নানাভাবে তাহার অবশেষ এখানে রহিয়া গিয়াছে। এই পরিষদের কাজ সেই-সব তথ্য সন্ধান করিয়া বাহির করা।

গঙ্গা-যমুনা মিলিয়া যেমন পুণ্যতীর্থ প্রয়াগ, তেমনি আর্য ও দ্রাবিড় সভ্যতা মিলিয়া ভারতের মহাসভ্যতা। উত্তরের আর্য সভ্যতা ও দক্ষিণের দ্রাবিড় সভ্যতা যুক্তবেণী হইয়াছে

এই মেদিনীপুরের প্রয়াগধামে। কাজেই সাধকের পক্ষে ইহা মুক্তির ক্ষেত্র।

তাম্রলিপ্তিকে অনেকে মনে করেন দাম্র বা দ্রাবিড় ক্ষেত্র। অর্থাৎ ইহা তামিল সভ্যতার পুণ্যক্ষেত্র। এই পথ দিয়াই দক্ষিণ হইতে সেনরাজগণ আসিয়াছিলেন বঙ্গদেশে। পঞ্চগৌড় বলিতে বুঝায় সারস্বত, কান্যকুব্জ, মিথিলা, গৌড়, উৎকল। উৎকলের আরম্ভ এখান হইতে। এইখানে বসিয়া এই দেশের পূর্বতন মহাপুরুষেরা দুই সভ্যতারই মাহাত্ম্য ভালো করিয়া বুঝিতে পারিতেন। ভারতের প্রত্যন্ত সীমাতে থাকিতেন বলিয়া যেমন যাস্ক পাণিনি প্রভৃতি মহাপুরুষেরা ভারতীয় ভাষার যথার্থ স্বরূপটি ধরিতে পারিয়াছিলেন, সেইরূপ এখানে বসিয়া আর্য ও দ্রাবিড় উভয় সভ্যতার যথার্থ পরিচয় পাওয়া অধিকতর সম্ভব ছিল।

জগন্নাথের দ্বারপথ ছিল এই মেদিনীপুর দিয়া। কাজেই ভগবান শংকরাচার্য, রামানুজ, রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্য, মলুকদাস প্রমুখ মহাপুরুষের চরণস্পর্শে এই ভূমি পবিত্র। মহাপ্রভু চৈতন্যের পদধূলির কথা আপনারা জানেন, অন্যান্য মহাপুরুষদের পদধূলিও নিশ্চয় এখানে পড়িয়াছিল, কারণ পুরীতে ও উত্তরভারতে যাতায়াতের আর অন্য ভালো পথ ছিল না এবং ইঁহাদের সকলেরই মঠ পুরীতে ও উত্তরভারতে আছে। তাহা ছাড়া মধ্যযুগের বহু সাধু-সন্তের এই পথে যাতায়াতের সন্ধান আমরা সন্তদের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাই।

ভারতের সভ্যতা একসময় এই ভারতের সীমার মধ্যেই অবদ্ধ ছিল না। যাতায়াত, ধর্ম, সংস্কৃতি, বাণিজ্য প্রভৃতি নানা সূত্রে ভারতের সম্বন্ধ ছিল ব্রহ্ম, চিন, জাপান, কোরিয়া, শ্যাম, যবদ্বীপ, বালি, সুমাত্রা প্রভৃতি নানা প্রাচ্যদেশের ও নানা প্রতীচ্য ও উদীচ্য দেশের সঙ্গে। প্রাচ্যদেশের সঙ্গে ভারতের যোগের প্রধান ক্ষেত্র ছিল তাম্রলিপ্তি। তাই বহু চিন, পারসিক ও ইউরোপীয় প্রাচীন গ্রন্থে বাংলার কথা জানিতে পারি আমরা তাম্রলিপ্তির বর্ণনা দিয়া। সে-সব আপনাদের সুপরিচিত কথা। তাই তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি করাইতে চাই না। এই সাহিত্য পরিষদের পূর্ববর্তী দুইটি অভিভাষণ খুলিয়া আমি সেইরূপ বহু তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি। মুকুন্দরামের গুরু বলরাম কবিকঙ্কণকে আপনারা মেদিনীপুরের লোক বলিয়াই জানেন। ভাগবতের অনুবাদক সনাতন চক্রবর্তীকেও আপনারা এই দেশবাসী বলিয়াই জানেন। পদকর্তা কানুদাস, গোবর্ধন দাসও এখানকারই লোক। দামোদর পণ্ডিতের শিষ্য কানুরাম হইলেন শ্যামানন্দ-সম্প্রদায়ী, কাজেই তাঁহার উপরও মেদিনীপুরের দাবি আছে। বর্ধমানবাসী হইলেও ধর্মমঙ্গল প্রণেতা ঘনরামের উপরও আপনারা কিছু দাবি রাখেন। বাসুদেব ঘোষও শেষে আসিয়া তমলুকেই বাস করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু চৈতন্য অদ্বৈতপ্রভু ও প্রভু নিত্যানন্দ তিনজনে যেমন এক হইয়া কাজ করিতেন তেমনি পরে শ্রীনিবাস নরোত্তম ও শ্যামানন্দ, এই তিন মহাত্মা এক হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। এই শ্যামানন্দকে ভারতের সর্বত্র ভক্তগণ উৎকল শ্যামানন্দ বলিয়া

জানেন। তাঁহার রচনায় ও তাঁহার শিষ্য রসিকমুরারির পদাবলিতে ও গোপীজনবল্লভের রসিক মঙ্গলে আপনাদের দাবি আছে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে (১৩৩৪) একস্থানে দেখি রসিকানন্দ ও মুরারি দুইজন (পৃ. ৩২৮) এবং ৩৩৬ পৃষ্ঠায় দেখি শ্যামানন্দের শিষ্য রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্র রসিকমুরারি একজন। হিন্দিতে নাভাজির ভক্তমালে (৯৫ ছপ্‌পয়) ও প্রিয়াদাসের হিন্দি ভাষায় রচিত ভক্তিরসবোধিনীতে (৮৪-৯৩) এবং হরিবর রামানুজের হরিভক্তি প্রকাশিকায় (পৃ. ১৬১-১৬৫) রসিকমুরারি একজন। যাক, এই রসিকমুরারির কিছু পরিচয় হিন্দি ভক্তগণের লেখা হইতে পরে দেওয়া যাইতেছে। শ্যামানন্দও হিন্দুস্থান গুজরাত রাজপুতানা মহারাষ্ট্র কর্ণাট প্রভৃতি স্থানের ভক্তদের পরিচিত। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বৃন্দাবনের শ্যামসুন্দর সর্বভারতের বৈষ্ণবজনপূজিত।

মেদিনীপুর চিরদিনই মহৎ ভাব ও সাধনাকে সমাদর করিয়াছে। তাই ভাব ও সাধনার জন্য যাঁহারা অন্যত্র নির্যাতিত হইয়াছেন তাঁহারা চিরদিনই এই মেদিনীপুরের আতিথ্য ও আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। এইজন্য মেদিনীপুরকে যুগে যুগে বহু দুঃখ সহিতে হইয়াছে কিন্তু ভাবের পূজক ও আশ্রিতবৎসল মেদিনীপুর কখনও তাহার পুণ্যব্রত হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। শিবায়ন-কার রামেশ্বর ভট্টাচার্য ছিলেন কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহের আশ্রিত। তিনি স্বীয় বাসভূমি যদুপুর ছাড়িয়া কর্ণগড়ে আসিয়া বাস করেন। শীতলার পালা লেখক নিত্যানন্দ চক্রবর্তী ছিলেন কাশীজোড়ার রাজেন্দ্রনারায়ণের আশ্রিত। মহাভারত রচয়িতা বিখ্যাত কাশীরাম দাস ছিলেন আওসগড়ের রাজার আশ্রিত। দামুন্যার কবি মুকুন্দরাম অশেষ দুঃখপ্রপীড়িত হইয়া আসিয়া আশ্রয় পাইলেন ঘাটালের অন্তর্গত আরড়ার রাজার কাছে।

রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্র রসিকমুরারির আতিথেয়তা ও দাক্ষিণ্যের কিছু পরিচয় পাই আমরা নাভাদাসজি কৃত হিন্দি ভক্তমালে। তাঁহার ৯৫ তম ছপ্‌পয় কবিতায় দেখি :

তন মন ধন পরিবারসহিত সেবত সংতন কহঁ।
দিবাভোগ আরতী অধিক হরিহূতে হিয়মহঁ।।
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্যাম শ্যামা রংগ ভীনে।
মগ্ন প্রেম পীযুষ পয়ধি পরচৈ বহু দীনে।।
শ্রীহরিপ্রিয় শ্যামানংদবর, ভজনভূমি উদ্ধার কিয়।
শ্রীরসিকমুরারি উদার অতি, মত্তগজহিঁ উপদেশ দিয়।।

'শ্যামানন্দজির শিষ্য রসিকমুরারি ছিলেন ভগবানের পরমভক্ত। আপনার তনু মন ধন পরিবার সব দিয়া উত্তমরূপে তিনি করিতেন সাধুদের সেবা। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্যাম ও শ্যামপ্রিয়ার রসরঙ্গে সিক্ত হইয়া যে তিনি প্রেমামৃতপয়োধিতে থাকিতেন ডুবিয়া, তাহার বহু পরিচয় তিনি দিয়াছেন। কতজন তাঁহার কৃপায় সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন।

এমন কী মত্তজগকেও তিনি দিয়াছেন উপদেশ। শ্রীরসিকমুরারি ছিলেন এমনই অতি উদার ভক্ত!'

নাভাজির সময়, পণ্ডিতগণের মতে, ১৫৮৫ হইতে ১৬২৩-এর কাছাকাছি। তিনি রসিকের প্রায় সমসাময়িক, সামান্য বড়ো। রসিকের জন্ম ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে। কাজেই এই বিবরণটি রসিকানন্দের জীবৎকালেই লেখা, তাই ইহার বিশেষ মূল্য আছে।

ভক্তমালের হিন্দি টীকা ভক্তিরসবোধিনীর লেখক শ্রীপিয়াদাস এই কথাটা বুঝাইতে গিয়া রসিকমুরারির ভক্তি ও উদারতার কয়টি নিদর্শন দেখাইয়াছেন।

রসিক মুরারি সাধু সেবা বিসতার কিয়ো
পাবৈ কৌন পার রীতি ভাঁতি কছু ন্যারিয়ো।
সংতচরণামৃতকে মাঠ গৃহ ভরে রহে
তাহীকো প্রণাম পূজা করি উর ধারিয়ে।।
আবেঁ হরিদাস তিন্হেঁ দেত সুখ রাশি জীভ
এক ন প্রকাশ সকে থকে সো বিচারিয়ে।
করেঁ গুরু উৎসব লে দিন মান সবৈ কোউ
দ্বাদশ দিবস জন ঘটা লাগি প্যারিয়ে।। ৮৪
সপ্ত চরণামৃত কো ল্যাবো জাই নীকী ভাঁতি
জীকি ভাঁতি জানিবেকো দাস লে পঠায়ে হৈ।
আনি কৈ বখান কিয়ো লিয়ো সব সাধুনকো
পান করি বোলে সো সবাদ নহি আয়ো হৈ।।
জিতে সভাজন কহী চাঁখো দেবো মন কোউ
মহিমা ন জানে কন জানী ছোঁড়ী আয়ো হৈ।
পূঁছি কহ্যো কোঢ়ী এক রহ্যো আনো ল্যায়ো পিয়ো
দিয়ো সুখ পায় নৈন নীব ঢরকায়ো হৈ।। ৮৫

'রসিকমুরারি যেরূপ সাধুসেবার বিস্তার করিয়াছেন তাহার পার কে পাইবে। তাহার রকমই স্বতন্ত্র। তাঁহার ঘরে ভক্তচরণামৃতের পূর্ণ একটি মটকী থাকিত। তাহাকে পূজা প্রণাম করিয়া বুকে ধরিয়া তিনি থাকিতেন। যদি ভগবানের ভক্ত কেহ তাঁহার ঘরে আসিতেন তবে রসিকমুরারি তাঁহার ভোগ ও সেবার এমন বিপুল ব্যবস্থা করিতেন যে তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব। একবার তাঁহার গৃহে বহু সাধুর সমাগম হইল। দ্বাদশ দিন ধরিয়া পানভোজন সমারোহে মহোৎসব চলিল। তিনি ভগবানের সেবক একজনকে পাঠাইলেন ভক্তিভাবে সাধুদের চরণামৃত সংগ্রহ করিতে। আসিয়া সে কহিল সকল সাধুর চরণামৃতই আনা হইয়াছে। কিন্তু রসিকমুরারি তাহা পান করিয়া কহিলেন, 'কই? সাধুর চরণামৃতে যে স্বাদ হয় তাহা তো পাইতেছি না। কাঁহারও চরণামৃত কি ইহাতে বাদ পড়িয়াছে?' তাহাতে সে

বলিল, 'হাঁ একজন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত সাধু ছিলেন তাঁহার চরণামৃত লওয়া হয় নাই।' যখন তাঁহারও চরণামৃত আনীত হইল, তখন সেই চরণামৃত পান করিয়া রসিকমুরারির নয়নে প্রেমের নীর বহিল।'

নাভাজির এই ভক্তমাল ও প্রিয়াদাসের ভক্তিরসবোধিনী রসিকমুরারিকে আশ্রয় করিয়া মেদিনীপুরের ভক্তি দাক্ষিণ্য ও সেবার স্তবগান ভারতের সকল প্রদেশে ছড়াইয়াছে। এখনও এ-কাহিনী উত্তর-পশ্চিম, পঞ্চনদ, সিন্ধু, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, রাজপুতানাতে সমানভাবে গীত হয়।

সবটা মূল হিন্দি উদ্ধৃত করিলে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি হইতে পারে তাই প্রিয়াদাসের বর্ণিত আখ্যানগুলি বাংলাতেই বলিতেছি। একবার এক সাধু আসিয়া ভোজনে বসিয়া কহিলেন, 'এক পাত্র প্রসাদ আমার দণ্ডটিকেও দিতে হইবে।' সেবকেরা তাহা না দেওয়ায় সাধু ক্ষুব্ধ হইয়া সেই প্রসাদ লইয়া উপবিষ্ট রসিকের মাথায় ছুঁড়িয়া মারিলেন। রসিকমুরারি বিনীতভাবে সাধুকে কহিলেন, 'এমন শীত-প্রসাদ পাইবার সৌভাগ্য তো আমার কখনও হয় নাই।'

একবার তাঁহার উদ্যানে কয়েকজন সাধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন হুঁকায় তামাক খাইতেছিলেন। দূর হইতে সমাগত রসিকমুরারিকে দেখিয়া তিনি হুঁকা লজ্জায় পশ্চাতে লুকাইলেন। রসিক বুঝিলেন সাধুর একটু কষ্ট হইল। তাই তাঁহার লজ্জা দূর করিবার জন্য তিনি মাটিতে পড়িয়া কাতরে লুটাইয়া কহিলেন, 'আমার বড়ো অস্বস্তি বোধ হইতেছে, কেহ আমাকে একটু তামাকু আনিয়া দিতে পারো?' তামাকু আনিলে কষ্টেসৃষ্টে দুই-এক টান দিয়া তিনি সাধুকে লজ্জা হইতে মুক্ত করিলেন। এমনই ছিল রসিকমুরারির আতিথ্যভাব।

দেবসেবা ও সাধুসেবার জন্য তাঁহাদের যে তালুক জায়গীর ছিল এক দুষ্ট রাজা তাহা বাজেয়াপ্ত করেন। কেহ যদি মহৎভাবে সাধুজনকে আশ্রয় দেয় তবে ক্ষুদ্রাশয় হীনদৃষ্টি রাজা তাহা পছন্দ করিবেন কেন? যতভাবে হউক তিনি দুঃখ দিবেনই। গুরু শ্যামানন্দ রসিকমুরারিকে লিখিলেন, 'যেমনভাবে আছ তেমনি চলিয়া আইস।' রসিকমুরারি খাইতে বসিয়াছিলেন, তাই এঁটো হাতেই আসিয়া তিনি উপস্থিত। শ্যামানন্দ তাঁহার ভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে প্রগাঢ় স্নেহে আলিঙ্গন করিলেন।

দুষ্ট রাজা যখন শুনিলেন রসিকমুরারি আসিয়াছেন তখন কহিলেন, 'তিনি আসুন আমার কাছে, আমি তাঁহার মাহাত্ম্য স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে চাই।' এই বলিয়া তিনি তাঁহার জন্য শিবিকা পাঠাইয়া পথে মত্ত হস্তী ছাড়িয়া দিলেন। রসিকের শিবিকাবাহকেরা মত্ত হস্তী দেখিয়া শিবিকা ফেলিয়া পলায়ন করিল।

বাহকেরা কোথায় যে পলাইল তাহার ঠিকানাই নাই। তিনি হস্তীকে এই রসময় বাণী কহিলেন, 'হে গজ, এই তামসিক মত্ততা পরিহার করো, বলো হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ', এই কথা

শুনিতেই হস্তীর মনে ভাব-রসের সঞ্চার হইল, তাহার মত্ত তামসিকতা গেল ছুটিয়া। সে রসিকমুরারির চরণে আসিয়া মাথা নত করিল।

ছোড়ি কৈ কহার ভাজি গয়ে নহ নিহারি সকে
আপ রসসার বাণী বোলে জৈসী গাঈ হৈ।
বোলো হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ছাঁড়ো গজ তম তন।
সুনি গয়ো হিয়ে ভাব দেহ সো নবাই হৈ।।

হস্তীর নয়নে প্রেমাশ্রুধারা বহিতেছে দেখিয়া রসিকমুরারি নিজেই অধীর হইয়া তাহাকে ভক্তিভাব দিয়া শান্ত করিলেন। কানে তাহার ভগবানের নাম শুনাইলেন এবং তাহার নাম দিলেন গোপাল দাস। তাহার গলায় মালা পরাইয়া আপন প্রভাব প্রকটিত করিলেন।

বহে দৃগনীর দেখি হবৈ গয়ো অধীর আপ
কৃপা করি ধীর কিয়ো দিয়ো ভক্তিভাব হৈ।
কান মেঁ সুনায়ো নাম নাম দে গোপাল দাস
মাল পহিরাঈ গলে প্রগট্যৌ প্রভাব হৈ।।

তখন সেই দুষ্টশিরোমণি রাজা লজ্জিত হইয়া সেখানে আসিলেন এবং তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। রাজা পুরাতন জায়গীর তো ফিরাইয়া দিলেনই আরও বহু ভূমি সেই সঙ্গে তিনি দান করিলেন।

প্রিয়াদাসের ভক্তিরসবোধিনী ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে লেখা হয়। ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণাসপ্তমীর অন্তে গ্রন্থখানি লেখা হয়।

রাজস্থান ভক্তসমাজ অন্তর্গত খেতরীধামবাসী সাধু রামানুদাস হরিবর তাঁহার হরিভক্তি প্রকাশিকা মহাগ্রন্থে তৃতীয় নিষ্ঠায় সাধুসেবা প্রকরণে, সপ্তদস কথাতে, রসিকমুরারি যে ভক্তি সেবা ও দাক্ষিণ্যের জয়গান করিয়াছেন তাহা আজও মেদিনীপুরবাসীর গৌরবের কথা।

গ্রন্থসাহেবের মধ্যে এমন একটি গান আছে যাহা ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে খুব সম্ভব মেদিনীপুরের নিকটস্থ দেবনগর নামক স্থানে গীত হইয়াছিল।

তখন শিখগুরু ছিলেন হরগোবিন্দ। তিনি ষষ্ঠ গুরু। বাংলার সুন্দরবনের এক দ্বীপ হইতে গুরু হরগোবিন্দের কাছে নিমন্ত্রণ গেল। বহুদূর দেশ বলিয়া তিনি নিজে যাইতে পারিলেন না, কিন্তু শিষ্য বিধিচাঁদকে পাঠাইলেন। বিধিচাঁদ বঙ্গসাগরের পথে যাত্রা করিলেন। দেবনগর নামে একস্থানে পৌঁছাইয়া তিনি সুন্দর শাহ নামে এক ফকিরের দেখা পাইলেন। অলৌকিক ক্ষমতার জন্য এই ফকিরের খুব প্রতিষ্ঠা ছিল। বিধিচাঁদ দেবনগরের উপকণ্ঠে এক শুষ্ক বৃক্ষতলে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। তখন বসন্তকাল। তিনি মনের আনন্দে গুরু

অর্জুন রচিত একটি বসন্ত রাগের গান ধরিলেন।

বসংতু চড়িয়া ফূলী বনরাই।
এহি জীঅ জংত ফুলহি হরি চিতু লাই।।
ইন বিধি ইহু মনুহরিয়া হোই।
হরি হরি নামু জপৈ দিনু রাতি
গুরুমুখি হউ মৈ কঢ়ে ধোই।।
সতি গুরু বাণী সবদু সুণাএ
ইহু জুগু হরিয়া সতি গুর ভাএ
ফল ফুল লাগে জাঁ আপে লাএ
মূলি লগৈ তাঁ সতি গুরু পাএ
আপি বসংতু জগতু সভু বাড়ী।
নানক পূরৈ ভাগি ভগতি নিরালী।।

বসন্ত সমুপস্থিত, বনরাজি পুষ্পিত, এই সব জীবজন্তু প্রফুল্লিত, শ্রীহরিকে চিত্তে করো প্রতিষ্ঠিত। এই প্রকারেই এই মন হইয়া উঠে শ্যামশোভায় ভরপুর। দিনরাত্রি হরি হরি নাম জপ, গুরুর অনুগত হইয়া অহমিকা ফেল ধুইয়া। সত্যগুরুর বাণীতে ও সংগীতে এই জগৎ শ্যামশোভায় জীবন্ত, তাই সত্যগুরু প্রসন্ন।

যখন তিনি আহ্বান করেন তখনই ফল ফুল হয় বিরাজিত, মূলাধার সত্যগুরুর চরণে হও যুক্ত। স্বয়ং তিনিই বসন্ত, সর্বজগৎ কুসুমোদ্যান। হে নানক, পরিপূর্ণ ভাগ্যগুণেই উপজে শ্রদ্ধা ভক্তি।

এই গানটি করিতেই সেই শুষ্ক তরু শ্যামশোভায় জীবন্ত হইয়া উঠিল। সুন্দর শাহ বিধিচাঁদের এই ব্যাপার শুনিয়া বাঘে চড়িয়া দেখিতে আসিলেন। লোকেরা ভয় পাইয়া পলাইল। বিধিচাঁদের কটাক্ষে বাঘ শিলাস্তম্ভ হইয়া গেল। তখন সুন্দর শাহ বিধিচাঁদের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। সুন্দর শাহকে হার মানিতে হইল।

সুন্দর শাহ বিধিচাঁদকে অনুরোধ করিলেন দেবনগরে কিছুকাল অবস্থান করিতে। কিন্তু গুরুর আজ্ঞা অনুসারে বিধিচাঁদকে সুন্দরবনে সেই দ্বীপে যাইতে হইল। সেখানে তিনি কিছুকাল ধর্মপ্রচার করিয়া দেশে ফিরিলেন।

খুব সম্ভব এই দেবনগর মেদিনীপুরের কাছাকাছি কোথাও ছিল। কারণ শিখরা সাধারণত জগন্নাথের পথে যাইতে যাইতেই বাংলাদেশের সুন্দরবনের পরিচয় পাইতেন। এই ঘটনাটি গুরুমুখী প্রাচীন সব মূল গ্রন্থে যাঁহাদের দেখিবার সুবিধা নাই, তাঁহারা Max Arthur Macauliffe প্রণীত Sikh Religion গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের ২১৬-১৭ পৃষ্ঠা পড়িয়া দেখিবেন। তখনকার দিনের মেদিনীপুরের মাহাত্ম্য নানাদিক দিয়াই উপলব্ধি করা যায়। আজ তবে মেদিনীপুরের সেই গৌরব কোথায় গেল? সেই দেবনগর আজ তবে কোথায়?

মেদিনীপুরের উপর দিয়া বহু দুঃখ গিয়াছে। আর্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার বহু সংঘর্ষ মেদিনীপুরকে নিশ্চয়ই সহিতে হইয়াছে। বঙ্গ-কলিঙ্গ অভিযানের সকল দুর্গতি ইহারই বক্ষের উপর দিয়া গিয়াছে। সমুদ্রের তীরবর্তী ও প্রধান বন্দরভূমি হওয়ায় মগ ও ইউরোপীয় দস্যুদের অত্যাচারেও মেদিনীপুরকে বার বার বিব্রত হইতে হইয়াছে। বর্গীর হাঙ্গামা যখনই বাংলায় আসিয়াছে তখনই তাহা মেদিনীপুরকে বার বার ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে। আজও তাহার দুঃখের অন্ত নাই। মহদ্‌ভাবের প্রতি অনুরাগ, দয়া দাক্ষিণ্য আশ্রিতবাৎসল্য যাহার আছে তাহার কি আর দুঃখের অন্ত আছে? এখনও উড়িষ্যায় ও বাংলায় যত সংঘর্ষ, তাহার দুঃখ সহিতে হয় মেদিনীপুরকে। মেদিনীপুর যেন যুগে যুগে দুঃখ সহিতেই জন্মিয়াছে।

মেদিনীপুরের সর্বাপেক্ষা বড়ো ক্ষতি হইয়াছিল যখন সমুদ্রযাত্রা হিন্দুদের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়া গেল। পরলোকগত আচার্য সিলভাঁ লেভি বলেন, তাহার পরেই সমুদ্রবাণিজ্য আরবদের একচেটিয়া হইল এবং তাহারা আসিয়া ভারত আক্রমণ করিল। সমুদ্রযাত্রা পরিহার করার পরই ভারত পরাধীন হইল। সমুদ্রপথে যাহারা দেশ-বিদেশে ভারতীয় সভ্যতা সাহিত্য ধর্ম ও বাণিজ্য বহন করিয়া বেড়াইতেন, বাংলার বিশেষত মেদিনীপুরের সেইসব মহাসত্ত্ব সন্তান হয়তো অনেকটা এই কারণে এবং কতকটা ধর্মমতের জন্যও কৈবর্ত নামে লাঞ্ছিত হইলেন। এই দুঃখ-দুর্গতি সর্বাপেক্ষা আঘাত করিল মেদিনীপুরকে।

এত যে মেদিনীপুরের দুঃখ-দুর্গতি তবু এখনও তাহার কাছে আমরা আশা করি, এই মেদিনীপুরে বৌদ্ধমত, যোগপন্থ, নিরঞ্জনমতের বহু অবশেষ নানা আকারে আছে, তাহা ভালো করিয়া আলোচিত হইলে বাংলার ধর্মের ইতিহাসের বহু বিস্মৃত তথ্য ধরা পড়িবে। উৎকলের মুকুন্দদেবের কুম্ভীপটিয়ামত, মহিমাপন্থ, অনন্তকুলীমত, বিন্দুধারীসাধনা খোঁজ করিলে এখনও মেদিনীপুরে পাওয়া যায়। সহজিয়া আউল বাউল দরবেশ ও সাঁইদের অনেক পরিচয় এই মেদিনীপুরে মিলিতে পারে। আর্য দ্রাবিড় রীতিনীতি আচার ও পূজা প্রভৃতি অনেক রহস্যের সমাধান হয় মেদিনীপুরের মধ্যে ভালোভাবে সন্ধান করিলে।

বহু বৎসর আগে কলিকাতায় সাহিত্য পরিষদের ছাত্র-সভ্যদের কাছে রবীন্দ্রনাথ একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাহাতে দেখাইয়াছিলেন, কী করিয়া দেশের সব প্রাচীন বিস্মৃত সম্পদ খোঁজ করিয়া বাহির করিতে হয়। তাহাতে তিনি এমন করিয়া সবটা জিনিস বুঝাইয়া দিয়াছেন যে তাহার পরে নূতন কথা কাহারও পক্ষে বলা দুঃসাধ্য। আর তাহা দেখিলে সকলেরই মনে হয় এই ক্ষেত্রে কাজ করার মতো প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু শক্তি ও দাবি আছে।

নাই নাই করিয়াও সুন্দরবনে সাহস করিয়া এখনও চাষ-আবাদ করে এই মেদিনীপুর। এখনও মেদিনীপুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উনিশ মণ পুঁথি দান করিতে পারিয়াছে। খোঁজ করিলে আরও বহু পুঁথি পাওয়া যাইতে পারে। এখন হয়তো ঘরে ঘরে তাহা বৃথা পচিতেছে। এই যুগেও মৃত্যুঞ্জয় তর্কালংকার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি মেদিনীপুর।

মেদিনীপুরের কাছে কেন কম আশা করিব?

এইখানে প্রায় তেরো বৎসর পূর্বেকার একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সহিত নন্দলাল বসু, কালিদাস নাগ ও আমি তখন চিনের পুণ্যস্থানগুলির পরিক্রমা করিতেছি। একদিন শুনিলাম বাংলাদেশের একটি বৌদ্ধসাধুর মঠ পিকিনে আছে। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ১১ মে অর্থাৎ ২৯ বৈশাখ তারিখে গেলাম সেই মন্দিরটি দেখতে। মন্দিরটির পাঁচটি চূড়া। এইরূপ মন্দির চিনে দেখি নাই, ইহা বাংলাদেশের পঞ্চরত্ন মন্দিরের ধরনে। তাহার সারা গায়ে সংস্কৃত সব মন্ত্র লেখা। চিনেরা এই মন্দিরকে বলেন 'বূ তা স্‌সু' অর্থাৎ পঞ্চচূড়া মন্দির। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে 'বন্দিক' নামে একজন দক্ষিণবঙ্গের বৌদ্ধসাধক দেশ ত্যাগ করিয়া চিন দেশে যান। তিনি ধনীর সন্তান ছিলেন। কেন যে তাঁহাকে দেশত্যাগ করিতে হইল তাহা বলা কঠিন। তিনি পাঁচটি স্বর্ণময় বুদ্ধমূর্তি ও কয়টি বহুমূল্য বুদ্ধসিংহাসন লইয়া দেশত্যাগ করেন। নির্যাতন বা লুণ্ঠনের ভয় তাঁহার দেশত্যাগের কারণ ছিল কী না জানি না। সব দ্রব্য তিনি চিন সম্রাটকে উপহার দেন। সম্রাট সেগুলি এই মন্দিরে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন। চিন দেশেই সাধু বন্দিক তাঁহার শেষ জীবন কাটাইয়াছেন। চিনা ও তিব্বতি শিল্পীদের লইয়া তিনি এই মন্দিরটি সুসম্পন্ন করেন। চিন সম্রাট ছিলেন মিং বংশের। তিনি একটি সুন্দর বজ্ররত্নাসন প্রস্তুত করাইয়া ওই মন্দিরে স্থাপিত করেন। সেই মন্দিরের গাত্রে এখনও বাংলার পরিচিত বৌদ্ধাক্ষরে লেখা, নমঃ তথাগতস্‌স, নীলকণ্ঠ বজ্ররত্ন চক্র, নমঃ তথাগতস্‌স, ইত্যাদি বহু বহু মন্ত্র। এই মন্দিরের উপরতলায় পাঁচ কোণে পাঁচটি চূড়া, সম্মুখে একটি গম্বুজ। এই বন্দিক ছিলেন দক্ষিণবঙ্গের মানুষ। কোথায় তাঁহার জন্মস্থান? তবে তিনি নাকি বাংলাদেশ হইতে বাঙালির জাহাজে যান। তাহা হইলে খুব সম্ভব তাম্রলিপ্তি হইতেই গিয়াছেন। তখনও তাম্রলিপ্তির গৌরবের কিছু অবশেষ ছিল মনে হইতেছে।

একসময় যোগপন্থ ও নিরঞ্জনপন্থ সারা ভারত জুড়িয়া পসার করিয়া বসিয়াছিলেন। এই উভয় মতের মুখ্যস্থান ছিল গৌড় উৎকলে। এখনও নিরঞ্জন মঠ কয়েকটি যাহা টিকিয়া আছে তাহা প্রায়ই উৎকলে। তাই রাজপুতানা কচ্ছ সিন্ধুদেশ কাঠিয়াওয়াড় পঞ্চনদের নিরঞ্জনীরা যে-সব নিরঞ্জনী গুরুদের নাম করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বঙ্গ-উৎকলের খোঁজ করিলে দেখা যাইবে তাঁহাদের মধ্যে মেদিনীপুরের সাধকও আছেন। উৎকল হইতে একসময় এই মেদিনীপুরের পথেই নিরঞ্জনমত সাধক জগমোহন লইয়া যান শ্রীহট্টে। সেখানে বিথঙ্গল মঠে এখনও তাঁহাদের প্রখ্যাত সাধনস্থান। ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে জগমোহনের জন্ম।

যোগীদের প্রভাব এখন বাংলাতে কমিয়া আসিতেছে, যদিও একসময় বাংলাই তাহার মুখ্যস্থান ছিল। যোগীদের উত্তর-সন্ততিরা বাংলাতে সর্বপ্রকার চেষ্টাতে তাঁহাদের পূর্বপুরুষের গৌরবময় ইতিহাস মুছিয়া ফেলিতে বদ্ধপরিকর। যত হীন স্থান অধিকার করিয়াই হউক

না কেন তাঁহাদের প্রাণপণ চেষ্টা যদি কোনোপ্রকারে অন্যান্য হিন্দুদের দলে গিয়া মিশিতে পারেন। এখনও কচ্ছের দীনোধরে, রাজস্থান যোধপুরের সব মঠে, কাঠিয়াওয়াড় জনাগড় সমাজে বঙ্গ-উৎকলের বহু যোগী সাধক ও যোগস্থানের নাম মেলে। তাহার মধ্যে মেদিনীপুরেরও দাবি আছে।

সাহিত্যসাধনা

মেদিনীপুরের অন্তরে আজও অনেক মাহাত্ম্য থাকিতে পারে, কিন্তু সে তাহা প্রকাশ করিবে কোন্ ক্ষেত্রে? মানবমাহাত্ম্য প্রকাশের অনেক ক্ষেত্রই যে আজ তাহার পক্ষে রুদ্ধ। তবু জ্ঞান সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্র তো এখনও কতক পরিমাণে তাহার কাছে মুক্ত। এই ক্ষেত্রেই না হয় সে এখন আপনার মহিমাকে প্রকাশ করুক। আজিকার দুর্গতির যুগে মেদিনীপুরকে সেই মুক্তির পথ দেখাইয়াছেন এখানকার সাহিত্য পরিষৎ। কাজেই মুক্তিদাতা গুরু এই সাহিত্য পরিষদকে নমস্কার করি।

সাহিত্য পরিষৎ কথাটার মধ্যে পরিষৎ কথাটার অর্থ খুব স্পষ্ট। পরিষৎ—অর্থাৎ চারিদিকে যাঁহার ঘিরিয়া আছেন : কিন্তু 'সাহিত্য' কথাটার ভিতরের পরিচয় একটু নেওয়া যাউক। পণ্ডিতেরা বলেন 'সহিত' অর্থাৎ মিলন কথা হইতে তাহা নিষ্পন্ন। অর্থাৎ যেখানে নানা উপকরণের মিলন হইয়াছে তাহাই সাহিত্য। কিন্তু যাহার দ্বারা স্থান-কালাদির দ্বারা ব্যবহিত হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের মিলন ঘটে তাহাই বা সাহিত্য না হইবে কেন। এই কথা যে আমি নিজের গায়ের জোরে বলিতে চাই তাহা নহে। নয়শত বৎসর পূর্বে আলংকারিক শিরোমণি ভট্ট মম্মট এই সত্যটি ধরাইয়া দিয়া গিয়াছেন। অভিনয় নাট্যাদি দেখিয়া যে সুখদুঃখাদি ভাব আমাদের হয়, তাহা কি আমার সুখ দুঃখ না অন্যের সুখ দুঃখ? মম্মট ভট্ট বলেন :

> মমৈবৈতে, শত্রোরেবৈতে, তটস্থস্যৈবৈতে ;
> ন মমৈবৈতে, ন শত্রোরেবৈতে, ন তটস্থস্যৈবৈতে ইতি সম্বন্ধ-
> বিশেষ স্বীকার পরিহার নিয়মানধ্যবসায়াৎ সাধারণ্যেন
> প্রতীতৈর্ অভিব্যক্ত

কাব্যপ্রকাশ, ৪র্থ উল্লাস

'এই সব ভাব আমার, আমার শত্রুর, কী তটস্থ আর কাহারও, কী না আমার না শত্রুর, না-তটস্থ আর কাহারও, এই-সব সংকীর্ণ সম্বন্ধবিশেষ স্বীকার বা পরিহার এখানে চলে না। সাহিত্যরসের ক্ষেত্রে যে ভাব হয় তাহা সাধারণ, তাহা সকল সম্বন্ধে অতীত'

'সাধারণোপায়বলাৎ তৎকালবিগলিতপরিমিত প্রমাতৃভাববশোন্মিষিত বেদ্যান্তরসম্পর্কশূন্যাপরিমিতভাবেন প্রমাত্রা সকলসহৃদয়সংবাদভাজা...গোচরীকৃতঃ' (ওই)

'সাধারণ ভাবের বলে তখনকার মতো সব পরিমিত প্রমাতৃভাব যায় বিগলিত হইয়া, তাহাতে উন্মিষিত হয় এমন একটি অপরিমিত ভাব যে তাহাতে আর কিছু বেদ্যান্তের সম্পর্ক টিকিতে পারে না। সকল সহৃদয় জনের হৃদয়ে হৃদয়ে একটি ভাবের ঐক্যবশত রস জিনিসটা তখন হয় উপলব্ধ।'

এখানে কামনা 'বেদ্যান্তরসম্পর্কশূন্য' কথাটি প্রণিধানযোগ্য, অর্থাৎ রসলোকে 'সকলসহৃদয়সংবাদভাক্' রসভাব ছাড়া আর কিছু জ্ঞেয় কার্য কী উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না।

পুর ইব পরিস্ফুরন্ হৃদয়মিব প্রবিশন সর্বাঙ্গীণমিবা-
লিঙ্গন্ অন্যৎ সর্ব্বমিব তিরোদধৎ ব্রহ্মাস্বাদমিবানুভাবয়ন্
অলৌকিক চমৎকারকারী...রসঃ। (ওই)

'আমাদের সম্মুখে সুর অভিনয় বাক্য প্রভৃতির সমন্বয়ে এই রসটি যেন ফুটিয়া উঠে, তাহা যেন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, আমাদিগকে সকল দিক দিয়া যেন প্রেমালিঙ্গনে জড়াইয়া ধরে, সেই সময় আর সব বিচার-বিতর্ক-বিবেচনা-উদ্দেশ্য প্রভৃতি যায় তিরোহিত হইয়া, তখন যেন একপ্রকার মুক্তিস্বরূপ ব্রহ্মানন্দেরই হয় উপলব্ধি। অলৌকিক চমৎকারকারী হইল এই রস।'

এখন 'সাধারণণ্যেন', 'সকলসহৃদয়সংবাদভাজা', 'সম্বন্ধবিশেষ স্বীকার পরিহার নিয়মানধ্যবসায়াৎ' প্রভৃতি কথাতে বুঝি—সাহিত্যের আনন্দ সকল সহৃদয়জনের হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দরূপে দেয় একটি অপূর্ব যোগ-রস। হৃদয়ের সহিত রসানন্দে হৃদয়কে এক করে বলিয়াই তো যথার্থ সাহিত্য।

এখনকার দিনে পণ্ডিতদের মধ্যে যে সাহিত্যের দ্বারা কী কী কাজ করানো যায় প্রভৃতি প্রশ্ন উঠে—তাহার উত্তর নয়শত বৎসর পূর্বে মম্মট ভট্টই দিয়াছেন। তাহা 'বেদ্যান্তরসম্পর্কশূন্য' অর্থাৎ তাহাতে আর কোনো জ্ঞানবিচার-বিবেচনা-উদ্দেশ্যাদি চলে না। তাহা একটি 'অপরিমিত ভাব', তাহা 'সকলহৃদয়সংবাদ ভাক্' অর্থাৎ তাহা হৃদয়ে হৃদয়ে ঐক্যসম্বন্ধ বলে যোগানন্দ দ্বারা সকল ভেদ-বিভেদ করে দূর। 'অলৌকিকচমৎকারকারী' এই রস স্থান-কাল-পাত্র প্রভৃতি সমস্ত সীমা হইতে মুক্তি দিয়া যেন ব্রহ্মানন্দের আভাস দেয়—'ব্রহ্মাস্বাদমিবানুভাবয়ন্'। সাহিত্য সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা বড়ো কথা আজ পর্যন্ত কেই বা বলিতে পারিয়াছেন।

উদ্দেশ্য-বিচার-বিতর্ক-বিবেচনা-সম্বন্ধ প্রভৃতি সকল সীমা অতিক্রম করাইয়া রস আমাদিগকে আনন্দের অসীম লোকে মুক্তি দেয়, তাই তাহা আমাদের ব্রহ্মানন্দের আভাস দেয়। 'ব্রহ্মাস্বাদমিবানুভাবয়ন্'—এই রস এক হিসাবে আমাদের মুক্তিদাতা গুরু।

এই কথাগুলিও মম্মটের নিজের উদ্ভাবিত সত্য নহে। এগুলি তাঁহার গুরুর সার্বভৌম আচার্য অভিনবগুপ্তপাদের মতো। সেই হিসাবে এই-সব কথা প্রায় হাজার বছরের জিনিস।

রস ও সাহিত্যের এই নিগূঢ় শক্তিটি বৈদিক ঋষিরাও অনুভব করিয়াছিলেন। তাই অথর্বাঙ্গিরস ঋষি সকল চিত্তকে এক করিতে গিয়া সরস্বতীর শরণাপন্ন হইলেন। তিনি বলিলেন, 'ওতে মে দ্যাবা পৃথিবী ওতা দেবী সরস্বতী।' 'দ্যৌ এবং পৃথিবী আমার মধ্যে অন্তর্ব্যাপ্ত, দেবী সরস্বতী আমার মধ্যে অন্তর্ব্যাপ্ত।'

অর্থাৎ প্রতিজনের অন্তরে নিখিল জগৎ এবং সরস্বতী অন্তর্ব্যাপ্ত।—তাই অন্তরে অন্তরে বিশ্বের যোগ সরস্বতীই দিতে পারেন।

ঋষি শৌনক বলিতেছেন :

যস্তে স্তনঃ শশয়ু র্যো ময়োভূর্
যঃ সুম্নযুঃ সুহবো যঃ সুদত্রঃ।
যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্য্যাণি
সরস্বতী তমিহ ধাতবে বঃ।।

'হে সরস্বতী, তোমার যে নিগূঢ় স্তনরসধারায় তোমার সন্তানদের পোষণ করো, যাহা আহ্বান করিলেই সাড়া দেয় (সুহব), যাহা উদার দানশীল, যাহার দ্বারা বিশ্বের বরণীয় সব সম্পদ তুমি পোষণ করো, তাহার রসে আজ আমাদের অন্তরে জ্ঞান চেতনা ও জীবনের উপকরণ পূর্ণ করিয়া দাও।'

ঋষি শন্তাতি বলিতেছেন :

শিবা নঃ সংতমা ভব সমৃডীকা সরস্বতী
মা তে যুযোম সংদৃশঃ।।

'হে সরস্বতী, তুমি আমাদের জন্য কল্যাণতমা হও। শোভনসুখপ্রদা হও, তোমার সমীচীন দৃষ্টি হইতে আমরা যেন কখনও বহির্ভূত না হই।'

মানবের মহিমা বর্ণনা করিতে গিয়া নারায়ণ ঋষি বলিতেছেন, মানবের সকল ঐশ্বর্যের বড়ো ঐশ্বর্য তাহার জ্ঞান সংগীত ও নৃত্য। 'মেধাং কো অস্মিন্নধ্যৌহৎ কো বাণং কো নৃতো দধৌ।' 'কে তাহাতে সঞ্চার করিল মেধা? কে তাহাকে দিল সংগীত ও নৃত্য।' জগতের নিগূঢ় রস, হৃদয়ের গভীরতম সত্য উপলব্ধি করেন বলিয়াই তো কবিরা পূজ্য। তাই বৈদিক ঋষি বলিলেন :

অচিকিত্বাংশ্চিকিতুষশ্চিদত্র
কবীন্ পৃচ্ছামি বিদ্বনো ন বিদ্বান্।।

'বুঝি না বলিয়াই, যাঁহারা বুঝেন সেই কবিদের করি এখানে জিজ্ঞাসা ; জানি না বলিয়াই, জানেন যে-সব কবি, তাঁহাদের করি জিজ্ঞাসা।'

এই কবিরাই জগতের সারসত্য জানেন, সেই সত্যই বিরাজিত সকল মানবের অন্তরে রস-রূপে। তাঁহারাই বিশ্ব-চিত্তকে ডাক দিয়া সকল হৃদয়ে ঐক্য ও যোগ সঞ্চার করিতে সমর্থ। সেই ঋষি জমদগ্নি অগ্নি-আবাহনের উপলক্ষে কবির কথা বলিতেছেন।

আ চ বহ মিত্রমহশ্ চিকিত্বান্
ত্বং দূতঃ কবিরসি প্রচেতাঃ।।

'সকল মিত্রের অপেক্ষা তুমি মিত্র, তুমি কবি, তুমি জ্ঞানী, তোমার দৃষ্টি অগ্রবর্তী এবং সেই দৃষ্টি তুমি অন্যকেও দিতে সমর্থ অর্থাৎ তুমি প্রচেতা। তুমি বিশ্বচিত্তের দূত, সকলকে তুমি এখানে আবাহন করো।'

কবির একটি লক্ষণ চমৎকারভাবে দেওয়া হইয়াছে এই মন্ত্রটিতে, 'অমুত্র সন্নিহ বেত্থেতঃ সংস্তানি পশ্যসি।' 'এখানে থাকিয়া তুমি ওখানকার রহস্য জান, ওখানে থাকিয়া তুমি এখানকার মর্ম পাও দেখিতে।'

ত্রীণি ছন্দাংসি কবয়ো বিয়েতিরে
পুরুরূপং দর্শতং বিশ্বচক্ষণনম
আপোবাতা ওষধয়স্
তান্যেকস্মিন্ ভুবন আর্পিতানি।।

'বিচিত্ররূপ, দর্শনীয়রূপও ও বিশ্বদর্শন—এই তিনটি ছন্দের সাধনা কবিরা করিয়া গিয়াছেন। এই তিনটি ছন্দই হল জল, বায়ু ও ওষধি। এই ভুবনেই ছন্দের এই ত্রিবেণী স্থাপিত।'

কবিদের এই শক্তি ভগবানের দেওয়া। সাধনার দ্বারা ইহা জাগ্রত করিতে হয়। কবিত্বের মিথ্যা ভান করিলে চলিবে কেন?

কবীয়মানঃ ক ইহ প্রবোচদ্
দেবং মনঃ কুতো অধি প্রজাতম্।।

'কবিয়ানা মাত্র যাঁহারা করেন তাঁহারা কেমন করিয়া এই-সব রহস্য প্রকাশ করিবেন? কোথা হইতে সেই দিব্য মানস জন্মলাভ করে?'

কবিরা যে-সব ব্রহ্মবাণী বলেন তাহাই তো বিশ্বচরাচরের প্রাণবস্তু।

ইদং জনাসো বিদথ মহদ্বরহ্ম বদিষ্যতি
ন তৎ পৃথিব্যাং নো দিবি যেন প্রাণন্তি বীরুধঃ।।

'জনগণ শোন, কবি গভীর ব্রহ্মবাণী উচ্চারণ করিবেন। না পৃথিবীতে না দ্যুলোকে আছে সেই প্রাণরস যাহার বলে তরুলতা নিত্য নবজীবনে জীবন্ত।'

'অপূর্বেণেষিতা বাচস্তা বদন্তি যথাযথম।' 'অপূর্বের দ্বারা উচ্ছ্বসিত যে বাণী তাহাই এই রহস্যকে যথাযথ ব্যক্ত করে।'

এইরূপ সাধনায় সিদ্ধ যে-সব কবি, কাল ও মৃত্যুর তাঁহারা অতীত। চিন্ময় অমৃতরসে তাঁহারা অমর।

কালো অশ্বে বহতি সপ্তরশ্মিঃ
সহস্রাক্ষো অজরো ভূরিরেতাঃ।
তমারোহন্তি কবয়ো বিপশ্চিতস্
তস্য চক্রা ভুবনানি বিশ্বা।।

'সহস্রাক্ষ জরারহিত বহুপ্রাণবীজযুক্ত সপ্তরশ্মি কাল-অশ্ব সদাই বহিয়া চলিয়াছে। মনীষী কবিরাই তাহাতে আরোহণ করিতে পারেন, বিশ্ব-ভুবন তাহার চক্র।'

যাঁহারা সত্যকার কবি তাঁহারা অগণিতভুবনচক্রসমন্বিত বিশ্বরথে বসিয়া কাল-অশ্ব দ্বারা তাঁহাদের রথকে চালিত করিয়া অমৃতলোকে জয়যাত্রা করেন।

এখন কথা হইতেছে যে রস ও সৌন্দর্যের প্রয়োজন কী? এই সব বস্তু যে প্রয়োজনের ক্ষেত্রের অতীত তাহা আমাদিগকে বিশেষ করিয়া অন্তরে গ্রহণ করিতে হইবে। গ্রিক জ্ঞানীদের সময় হইতে আজ পর্যন্ত ইউরোপের মনীষীরা সৌন্দর্যের এই সাধারণ লক্ষণ দিয়াছেন যে তাহা সকল প্রয়োজনের অতীত। কাব্য, অভিনয়, চিত্র, সংগীত প্রভৃতিতে কি ক্ষুধা মেটে, না শীত নিবারিত হয়?

এই রহস্যটি বৈদিক ঋষিদেরও অজ্ঞাত ছিল না। তাই অথর্বের একাদশ কাণ্ডে নবম সূক্ত হইল 'উচ্ছিষ্ট' অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত। তাহাতে দেখি কলা সাহিত্য সংস্কৃতির যা কিছু সবই উচ্ছিষ্ট। এমনকী,

ঋক্ সাম যজুরুচ্ছিষ্ট উদ্গীথঃ প্রস্তুতং স্তুতম্।
হিঙ্কার উচ্ছিষ্টে স্বরঃ সাম্নো মেডিশ্চ তন্ময়ি।।

'ঋক্-সাম-যজু এই সব বেদও উচ্ছিষ্ট, উদ্গাতার ও প্রস্তোতার যে গান তাহাও উচ্ছিষ্ট, যত স্তববন্দনা সবই উচ্ছিষ্ট, সংগীতের হিঙ্কার, সংগীতের স্বরলহরী, সামগানের স্বর-মেলন, এই-সবই উচ্ছিষ্ট। এই উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ এই-সব ঐশ্বর্য আমাতে আহিত হউক।'

শুধু বেদ প্রভৃতিই উচ্ছিষ্ট নহে:

আনন্দা মোদাঃ প্রমুদোঽভীমোদমুদশ্চ যে।
উচ্ছিষ্টাজ্ জিজ্ঞবে সর্বে দিবি দেবা দিবিশ্রিতঃ।।

'আনন্দ, মোদ, প্রমোদ এবং অভিমোদের সহিত যুক্ত সবকিছুই উচ্ছিষ্ট হইতেই উৎপন্ন। যাহা কিছু দিবালোকে দীপ্যমান ও যাহা কিছু দ্যুলোকাশ্রিত সবই উচ্ছিষ্ট।'

কাজেই বুঝা যায় এই রহস্যটি ঋষিদেরও অগোচর ছিল না।

রস ও সৌন্দর্য যদি প্রয়োজনের অতীত, তবে তাহা আজও টিকিয়া আছে কেন? সেখানে সাধক বলেন, সৌন্দর্য হইল অনুনয়। অভ্যাসবশে আমাদের চিত্ত উদাসীন, তাই সৌন্দর্য অনুনয় করিয়া বলে, 'দেখ আমার দিকে চাহিয়া। আমি সকল সুষমা লইয়া এই অনুরোধ করি।' তাই বিশ্বপ্রকৃতির সকল সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া পুষ্পের বর্ণে, উষা-সন্ধ্যার অপূর্ব রাগে, গিরি-সাগরের গভীর সৌন্দর্যে বিধাতা আমাদিগকে অনুনয় করিয়া ডাক দিতেছেন, 'চাহিয়া দেখ, চাহিয়া দেখ।' তখন আমাদের উদাসীন মনও সচেতন হইয়া দেখে চাহিয়া। তাতেও চিত্ত সাড়া না দিলে শরৎ বসন্ত প্রভৃতি ঋতুর মহোৎসবে সৌন্দর্যের মহাসমারোহ আছে, যেন আমরা উদাসীনতা দূর করিয়া ভালো করিয়া দেখিতে পাই, চিত্ত যেন জাগ্রত হয়।

ভাষাতেও এই অনুনয় দেয় তাহার ছন্দ, সুর প্রভৃতি নানা মনোহর উপচার। রসের ছন্দের সুরের অনুনয়ে ডাক দিয়া যে হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের মিলনের চেষ্টা ইহাই সাহিত্য। নিজ সন্তানের সৌন্দর্য-নিত্য দেখিতে হয় বলিয়া সেই সৌন্দর্য পিতামাতার দৃষ্টি এড়ায়। বিবাহবাসরে যখন অলকা-তিলকায় পত্রলেখায় পুত্রকন্যার সুন্দর মুখখানি সাজাইয়া দেয় তখন পিতামাতাও দেখিয়া বুঝিতে পারেন, 'তাই তো! ইহার মুখে এত সুষমাও ছিল!'

সাহিত্যের এই রসের ডাকে যখন আমাদের চিত্ত সর্বচিত্তের সহিত মিলিয়া এক হয়, তখনই আমরা নব দৃষ্টি নব বল নব শক্তি লাভ করি। প্রতি বিন্দুই তো সাগরে যাইতে উন্মুখ। কিন্তু যদি একা একটি বিন্দু সিন্ধুযাত্রা করে তবে পথেই সে যায় শুকাইয়া। তাই সাধক রজ্জবজি বলিয়াছেন,

প্রীত অকেলী ব্যর্থ মহা সিন্ধ বিরহী দিল হোয়
বুংদ পুকারৈ বুংদকো গতি মিলৈ সংজোয়।।
অকেল বুংদ পহুঁচে নহী সুখৈ পংথ জীব জোর।
পংথ ভর ভরে এক হোয়ে দরস দয়া প্রভু তোর।।

'একলার প্রেম তো ব্যর্থ। যদি বিন্দুর হৃদয়ে সিন্ধুর বিরহ জাগিয়া থাকে তবে একটি

বিন্দু ডাক দেয় অপর সকল বিন্দুকে, কারণ সবাই এক হইলেই স্রোতরূপে চলিতে পারে বাহিয়া, অর্থাৎ মেলে গতি। একেলা একটি বিন্দু তো পৌঁছিতেই পারে না। পথের ব্যবধানই ফেলে শুকাইয়া তাহার সব শক্তি ও জীবন। আর সব বিন্দু এক হইলে সেই পথকেই পারে সে আপন প্রাচুর্যের বন্যায় ভাসাইয়া দিতে। হে প্রভু, তখন তোমার দয়াতেই মেলে তোমার দরশন।'

তাই তো আজ এই সাহিত্য-যজ্ঞে প্রত্যেকে আসিয়াছি একটি একটি বিন্দুর মতো পরস্পরকে শক্তি ও সহায়তা দান করিতে। এখানেই সাহিত্যের সাহিত্যত্ব।

বঙ্গভাষাতে সাধনা

যুগে যুগে কবিগণ তাঁহাদের সব উপলব্ধি যাহাতে রক্ষা করিয়াছেন তাহাই সাহিত্য, বিচ্ছিন্ন মানুষের মধ্যে তাহাই যোগ স্থাপন করিতে সমর্থ। ব্যাংকে যেমন সকলের সঞ্চয় আসিয়া একত্র হয় এবং তাহাতেই জাতীয় সম্পদ গড়িয়া ওঠে, তেমনি ভাষার আধারেই জাতীয় ভাবসম্পদ জমিতে থাকে ও রক্ষিত হয়। পশুপক্ষীর ভাষা নাই, তাহাদের উপলব্ধির সম্পদ বাড়িয়া চলিতে পারে না। ভাষা আছে বলিয়াই মানুষ নিত্য-উন্নতি পথের যাত্রী। সাহিত্যেই তাহার যথার্থ মনুষ্যত্ব।

এমন কথাও কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে আমাদের এই সাহিত্য হইবে কোন্ ভাষায়। এমন অদ্ভুত কথা আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশ ছাড়া আর কোথায় সম্ভব হইতে পারে? এই দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ চিরদিন যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধটি দেখিলে এই বিষয়টিকে সব দিক দিয়া দেখা হয়।

আমাদের কপালদোষে আমাদের শিক্ষা (?) হয় ইংরেজিতে, অন্তরের কথা প্রকাশও করি আমরা ইংরেজিতে। তবে আজ শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষাগুরুদের টনক নড়িয়াছে। এই বিদেশি ভাষাকে শিক্ষার বাহন করাতে এতকাল যেন আমরা ব্যর্থতারই সাধনা করিয়া আসিয়াছি। আমরা কামধেনুকে দোহাইয়াছি তলায় ঝুড়ি রাখিয়া, কাজেই কিছুই সঞ্চিত হয় নাই।

পাঁচশত বৎসর পূর্বে কাশীর মতো স্থানে সাধকশ্রেষ্ঠ কবীর যখন ভাষাতে তাঁহার সত্য প্রচার করিলেন, তখন কাশীর পণ্ডিতের দল জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাষাতে কেন? সংস্কৃতে কেন প্রচার করো না?'

কবীর নিরক্ষর মূর্খ। তিনি উত্তর দিলেন, 'সংস্কৃত হইল কূপজল, ভাষা হইল বহমানা জলধারা। যখন ইচ্ছা তপ্ত শরীর লইয়া তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়ো, শরীর মন যায় জুড়াইয়া।'

সংস্কৃত কূপজল কবীরা ভাষা বহ্‌তা নীর
জব চাহৌ তবহী ডুবৌ শাংত হোয়‍ শরীর।।

ভাষার মধ্যে বহমান ধারার সংগীত আছে। বহমানা ধারাকে আশ্রয় করিয়া দেশ-দেশান্তরের সঙ্গে যাতায়াত ও যোগ সম্ভব হয়। কূপে তাহা ঘটে কেমনে?

ইংরেজির সাধনা করিতে গিয়া আমরা সম্পূর্ণরূপে কূপও যে খুঁড়িতে পারি না! যতটা গেলে নিত্যজলধারা মেলে ততটা দূর পর্যন্ত কয়জন বা যাইতে পারেন? দেশ ভরা তাই অসমাপ্ত কূপের গর্ত বিরাজিত, তাহাতে জল পাই না, শুধু পড়িয়া আমরা প্রাণ হারাই।

বাংলা ভাষাকে যদি আজ আমরা সম্পন্ন করিতে চাই তবে আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা রচনা সবই বাংলাতে করা প্রয়োজন। দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সাধনা ও চিন্ময় সম্পদে এই ভাষা দিন দিন তবে সমৃদ্ধ হইবে।

তবে মৌলিক দৃষ্টি ও মনীষা সকলের না থাকিতেও পারে। তাঁহারা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য হইতে ও বৈদেশিক নানাদেশীয় সাহিত্য হইতে সব ভালো ভালো গ্রন্থ বাংলাতে অনুবাদ করিতে পারেন। হিন্দি গুজরাতি মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি ভাষায় এই কাজ হু হু শব্দে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। আর কোথায় আছি আমরা? আমরা অতিশয় বুদ্ধিমান কিনা! তাই সবাই বিচ্ছিন্ন, সবাই স্ব স্ব প্রধান। কাজেই আমরা সংহতিহীন, শক্তিহীন। এই পরিষৎ যদি দেখাইয়া দেন কেমন করিয়া সকলে সংহত হইয়া দর্শন ইতিহাসে সমাজনীতি অর্থনীতি রাজনীতি কাব্য নাটক উপন্যাস গল্প প্রভৃতি দেশ-বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে হয়, কেমন করিয়া বিজ্ঞান চিকিৎসা স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্র বাংলাতে পরিভাষা সমেত প্রকাশ করিয়া লিখিতে হয়, তবে দেশের একটা মহদুপকার সাধিত হয়। জীবনের একটা পথ খুলিয়া যায়। মূল বাংলা সাহিত্য পরিষদেরও ইহাই লক্ষ্য ছিল, তবে তাহা সিদ্ধ হয় নাই। মাতা যাহা তাঁহার জীবনে ভালো করিয়া সিদ্ধ করিতে না পারেন কন্যা যদি তাহা সিদ্ধ করেন, মায়ের অপ্রাপ্ত কোনো সৌভাগ্য যদি সন্তান লাভ করিতে সমর্থ হন, তবে তাহাতে মাতারই অশেষ তৃপ্তি ও আনন্দ।

এই সাধনাতে ঝুটা খামখেয়ালি চলিবে না, ধীরভাবে বহুজনে একত্র হইয়া এক সংহত শক্তির সহায়তায় আপন আপন সামর্থ্য অনুসারে দীর্ঘকাল সাধনা করিয়া চলিতে হইবে, তবেই যথার্থ কাজ হইবে। নচেৎ বৎসরে বৎসরে এক একটা সভা-সমিতি করিয়া যদি কর্তব্য শেষ করি, তবে কাজ সহজ হয় বটে কিন্তু যথার্থ কাজ কিছুই হয় না। অনেকসময় মাকে আমরা নিত্য অন্ন-বস্ত্র দিই না, সেবা করি না, মরিলে পর একদিন দানসাগর করিয়া লোকের কাছে সস্তা বাহবা কিনি। মাতৃভাষার সেবাতেও কি সেইরূপ চালাকি চলিবে?

মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষৎ এখন পঁচিশ বৎসর অতিক্রম করিল—ইহার কাছে আমরা এখন দাবি করিব। ইহার এখন সৃষ্টির দিন আসিয়াছে। বয়স হইলেও যদি মেয়ে বন্ধ্যা

থাকে তবে যেমন মাতা ও শাশুড়ির দল অস্থির হইয়া দেবস্থানে দরগায় সর্বত্রই মাদুলি তাগা তাবিজের জন্য ছুটোছুটি করেন, দেবতার ও সাধু ফকিরের কাছে ধন্না দেন, তেমনি ব্যাকুলভাবে আমাদের সাধনা করিতে হইবে। সকলের কাছেই আশীর্বাদ সংগ্রহ করিতে হইবে যেন এই পরিষৎ সফল হয়।

স্বাগতবাণী

সাহিত্য একটি মহাযজ্ঞ। এখানে আপন-পর সবার নিয়ন্ত্রণ। এমন যজ্ঞের নামে সকলকে আহ্বান করিয়া কি অলস অচেতন হইলে চলে? জাতীয় এই নিমন্ত্রণশালায় এই ভাবযজ্ঞে যদি সকলকে আহ্বান করি তবে আর এক মুহূর্ত তামসিকতায় নষ্ট করিতে পারিব না। এই যজ্ঞে আমাদের লোভ বা লাভের জন্য কাড়াকাড়ি নাই, এখানে সকলকেই হইবে সর্বস্ব উৎসর্গ করিতে। কাজেই লোভ ক্ষোভ ও বিরোধের এখানে তো স্থান নাই। এখানে আসিয়াও যশ মান কুড়াইতে চাই বলিয়াই তো যত অনর্থ। প্রভূতাপ্রয়াসী অহংকারী সংকীর্ণচেতার দল এই যজ্ঞ ত্যাগ করুন, বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য অন্য ক্ষেত্র খুঁজিয়া বাহির করুন।

নানা দুঃখে দুঃখী মেদিনীপুর এই মহাযজ্ঞে কেমন করিয়া সহায়তা করিতে পারে? কেন না পারিবে? তাহারই তো এই যজ্ঞে সর্বপ্রধান কৃত্য।

তাহার দুঃখের ঘর্ষণে আগুন যদি জ্বলে, এই মহাযজ্ঞে সেই অগ্নিকেই করিতে হইবে স্থাপনা ও আহুতি। এই আগুনই সকলকে আলোক দিবে, তমোরাশি দূর করিবে। ভক্তকবি জ্ঞানদাস বলিয়াছেন, 'অন্তরের ব্যথা যখন সুরে বাজে তখনই তো গান হয় পরিপূর্ণ।' 'মলাল জবহী সুর সে বাঁজে তবহী পুরা গানা।'

মেদিনীপুরের নীচে অসীম সমুদ্র, উপরে অপরূপ শ্যামল প্রকৃতি, তাহার প্রাচীন সম্পদ অতুলনীয়। সে যদি ইহা প্রকাশ না করিল তবে তাহার জগতে আসাই বৃথা। সাধকশ্রেষ্ঠ রজ্জবজি বলিয়াছেন, 'তখনই বলিতে পারি এই জগতে আসিয়া রূপ শোভা ও সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যদি কিছু করিতে পারিয়া থাকি প্রকাশ বা রচনা। লক্ষ করি না, শুনিতে পাই না, এমন করিয়াই তো বৃথা বইয়া যায় সব দুর্লভ মুহূর্ত। কেহ বা রচে বাণীতে, কেহ বা রচে সুরে, কেহ বা রচে বর্ণ দ্বারা, কেহ বা রচে রেখাঙ্কনে। নানা রীতিতেই হইতে পারে রচনা, রীতি ভিন্ন হইলেও বস্তু এক। ধ্যানে পূর্ণ হইয়া কোনো সাধকজন হয়তো রচেন আপন জীবনেরই মধ্যে, কিন্তু কোনো রীতিতে যে কিছুই রচিল না সে তো এই জগতে জন্মেই নাই।'

রূপ লখ্যা তৌ জানিয়ে জৈ কছু রচি সকায়।
লখৈ নহীঁ সুনৈ নহী ঐসহী মজ্জরত জায়।।

কোই রচৈ বাণী ধুনী সোঁ লই বরণ অরু রেখ।
রীত বীত মেঁ রচিসকে রীত ভিন্ন বস্তু এক।।
ধ্যান ভরি কোই সংত জন রচৈ জীবন মাহিঁ।
কোই রীত কছু না রচ্যা সো তো জন্মৌ নাহিঁ।।

সকল দিক হইতে তাগিদ আসিতেছে, 'অরূপকে দাও রূপ, মৌনকে দাও ভাষা। বাণী দাও, দাও দাও দাও প্রকাশ দাও।'

গৈব কুঁ রূপ দে মৌন কুঁ ভাস দে
বাণী দে বাণী দে দে দে পরকাশ দে।। (রজ্জবজি)

এই প্রকাশ দিবার মধ্যে ধনী-দরিদ্র ভেদ নাই, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ভেদ নাই, হিন্দু-মুসলমান ভেদ নাই, যুবা-বৃদ্ধ ভেদ নাই. যিনি প্রকাশ দিতে পারিবেন তিনিই এখানে সাধক, তিনি আমাদের সকলেরই বন্দনীয়।

এই জগতের সৌন্দর্যের মধ্যেও তো যুবা-বৃদ্ধ বিরোধ নাই। সৌন্দর্যমাত্রই চিরন্তন, পুরাতন। অথচ তাহাই নিত্য নূতন। কুৎস ঋষির ভাষায় 'সনাতনমেনমাহুরাতাদ্য স্যাৎপুনর্ণবঃ।' 'ইহাকেই বলা হয় সনাতন, অথচ ইহাই নিত্য নবীন, অদ্য ইহাই নব জীবনে হউক জীবন্ত।'

জগতের গভীর মর্মগত সত্য ও সৌন্দর্যকে আমরাও যেন ঋষির ভাষায় বলিতে পারি :

নরো নরো ভবসি জায়মানো
হ্নাং কেতুরুষসামেষ্যগ্রম্।।

'দিনে দিনে নব নব রূপে তুমি জায়মান, তুমি নিত্য নবীন, দিনের পর দিনের প্রকাশক তুমিই, উষার অগ্রে অগ্রে চলুক তোমার জয়যাত্রা।'

ঋগ্বেদে বিশ্বামিত্র ঋষি উষাকে বলিয়াছেন 'পুরাণী দেবী যুবতিঃ পুরংধিঃ।' 'হে বহুধীশালিনি দেবি, তুমি পুরাতনী অথচ যুবতী।' তাই আথবর্ণ ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন, 'অবচীনং সু তে মনঃ উত চক্ষুঃ।' 'তোমার মন এবং চক্ষু উত্তমরূপে তরুণ হউক।'

কাজেই এই মহাযজ্ঞে তরুণের কোথাও নিষেধ নাই। পূর্বেই তো আমরা প্রণাম করিয়াছি, 'জ্যেষ্ঠায় চ নমঃ কনিষ্ঠায় চ নমঃ।' 'তোমাদের মধ্যে যাঁহারা জ্যেষ্ঠ তাঁহাদের প্রতি যেমন নমস্কার, কনিষ্ঠ যাঁহারা তাঁহাদের প্রতিও তেমনি নমস্কার।'

আমরা শুধু চাই যুবা বা বৃদ্ধ যিনিই এই পুণ্যক্ষেত্রে আসিবেন তিনি তপস্যার জন্যই আসিবেন, স্বার্থসিদ্ধির জন্য আসিবেন না। সাধকমাত্রকেই এখানে বরণ করিতে হইবে।

'জাতি-বর্ণ-কুল-বয়স' প্রভৃতি বিচার এই সাধনার পীঠে চলিবে না।

যুবা হইয়া যদি কেহ বিশ্বসৌন্দর্যকে রূপ দিতে পারেন তবে বেদের ঋষির মতো আমরাও তাঁহাকে বলিব, 'বিশ্বা রূপাণি জনয়ন্ যুবা কবিঃ।' 'হে যুবা, বিশ্বসৌন্দর্যকে তুমি রূপ দান করিয়াছ, তুমি কবি।' তুমি যুবা, শক্তিহীন জীর্ণ ও অবসন্নকে তুমি নব জীবনে জীবন্ত করিয়া তোলো।

উখা-পয় সীদতো বুধ্ন এনান্
অদ্ভিবাত্মানম্ অভিসংস্পৃশন্তাম্।

'যাহারা অবসন্ন হইয়া তলায় পড়িয়া আছে, তাহাদিগকে অমৃতরসে জীবন্ত করিয়া উঠাইয়া তোলো। সেই প্রাণরসে ইহারা আপনাদিগকে অভিষিক্ত করুক।'

ঋগ্বেদের শুনঃশেফ ঋষির মতো সকল কবির প্রতি আমাদেরও বাণী হউক :

নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যো
নমো যুবাভ্যো নমো আশিনেভ্যঃ।।

তোমাদের মধ্যে মহদ্‌গণকে নমস্কার, তরুণগণকে নমস্কার। নবীনদিগকে নমস্কার, প্রবীণদিগকে নমস্কার।

ভবিষ্যৎ যুগের তরুণ সাধকদের প্রতি আমাদের নমস্কার নিবেদন করিয়া আমরা বিদায় লইব :

উদ্যতে নমঃ উদায়তে নমঃ উদিতায় নমঃ।
বিরাজে নমঃ স্বরাজে নমঃ সম্রাজে নমঃ।।

উদিত হইবে যে তুমি তোমাকে নমস্কার, উদীয়মান তোমাকে নমস্কার, উদিত তোমাকে নমস্কার। বিরাজিত তোমাকে নমস্কার, স্বাধীন-প্রকাশ স্বরাট্ তোমাকে নমস্কার, সম্রাট তোমাকে নমস্কার।

দেশ, ২৭ মার্চ ও ৩ এপ্রিল ১৯৩৭। মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষৎ-এ ১৩৪৩ সালে প্রদত্ত।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রঙ্গপুর সারস্বত সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ

সমবেত শ্রদ্ধেয় ভদ্রবৃন্দ ও বন্ধুগণ,

আমার যোগ্যতার কথা বিচার না করেই আমার উপর আপনারা যে সম্মান অর্পণ করেছেন, তার মূল্য সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট সচেতন। এজন্য প্রথমেই আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সাহিত্য-সভায় সভাপতির আসন থেকে অভিভাষণরূপে কী কথা বলা যেতে পারে, ভাবছি। আপনারা জানেন, রাজনীতি বা সমাজ-সংস্কারাদির জন্য সঙ্ঘ-সমিতির বৈঠক করা এবং সাহিত্য-সভার মধ্যে ভেতরের পার্থক্য অনেকখানি। পূর্বোক্ত ব্যাপারগুলিতে সঙ্ঘগঠন, অধিবেশন ইত্যাদি অপরিহার্য। জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রাথমিক প্রয়োজনাবলির সঙ্গেই প্রথমত এই কর্মবিভাগগুলি সংশ্লিষ্ট, বস্তুর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মিলিত না হয়ে এখানে প্রচেষ্টা সফল হয় না। অন্যদিকে, সাহিত্য যদিও সর্বসাধারণের মধ্যে আন্তরিকতম মিলনের যোগসূত্রস্বরূপ এবং যদিও চারপাশের মানুষকে বাদ দিয়ে এখানে কোনো সৃষ্টি সার্থক হওয়া দূরে থাক, প্রায় সম্ভবই নয়, তবুও সাহিত্য-সৃষ্টি লোকালয়ের হাটের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে করবার নয়। আপনারা জানেন, কবি সাহিত্যিক আর্টিস্টদের মধ্যে এক ধরনের সহজাত নিঃসঙ্গতা থাকে। সার্থক রসসৃষ্টি, সাধারণ দৈনন্দিন-জীবনোত্তীর্ণ বৃহৎ আনন্দলোকের আবাহন, যার জন্য প্রতি শক্তিশালী কবি-মানসেই আত্মপ্রকাশের প্রেরণাময় এক ধরনের অনির্দেশ্য ভাবাবেগ তাঁর শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলিতে সঞ্চারিত হয়, ইহার জন্য আর্টিস্টের প্রয়োজন আপন 'আইডিয়া'র আবহাওয়ায় যত বেশিক্ষণ সম্ভব এবং যত গভীরতমরূপে সম্ভব, বাস করা। দুঃখবেদনা, হাসি-অশ্রু, সমস্যাবিজড়িত অপরূপ মানুষের জীবন এবং জগৎ তাঁর লেখার মালমশলা, কিন্তু নিরাসক্ত আনন্দে তিনি সৃষ্টি করে চলেন। কবি সাহিত্যিক আপনার জন্য লেখেন, সে হচ্ছে তাঁর আত্মপ্রকাশ অস্তিত্বের সেই একমাত্র রূপের মধ্য দিয়ে তিনি আপনাকে উপলব্ধি করেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি সকলেরই জন্য লেখেন। কারণ তিনি জানেন, ভালোবাসার আলোকক্ষেপ ব্যতীত সৃষ্টিতে

সত্যিকারের বর্ণ ফোটে না, প্রেম ও এক ধরনের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি ব্যতীত বাস্তব জগৎ এবং মানবহৃদয়ের গহনতম রহস্য উদঘাটিত হওয়ার নয়। আপনাকে প্রতি মুহূর্তে পূর্ণ করে ও প্রতি মুহূর্তে তিনি আপনাকে অতিক্রম করে যান; চারিপাশের মানবসমাজ সম্বন্ধে তিনি শুধু চিন্তা করেন এই নয়, এর অন্তরতম হৃদয়স্পন্দনকে তিনি একান্তভাবে অনুভবের চেষ্টা পান, তাই তো তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রেরণার ক্ষণে যখন কথা বলেন, তখন তাতে সব দেশ সব কালের বিশ্বমানবের কণ্ঠ বাজে, জীবনের মূলতম রহস্যের আবেগ সেখানে একান্তভাবে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং সকলেরই সঙ্গে আপনাকে নিরন্তর যুক্ত রেখে তাঁর সাধনা। তবুও, মনের দিক দিয়ে তাঁর পক্ষে চরম একাকিত্ব একটি প্রকাণ্ড সত্য, অপরিহার্য এবং প্রয়োজনীয়ও। 'রিয়্যালিটি'-কে তলিয়ে বুঝতে হলে, বা বুঝে তাকে যথাযথ আঁকতে হলে, তাতে জড়িয়ে গিয়ে আমরা তা পারি না, কর্মকোলাহলের ঠিক মাঝখানে অথবা লোকলোচনের অত্যন্ত স্পষ্ট পাদপ্রদীপের সামনে অনুক্ষণ থেকে আমরা তা পারি না।

অতএব দেখা যাচ্ছে, কোনো সাহিত্য-সভা যখন আহ্বান করা হয়, তখন তার উদ্দেশ্য কোনো কবি সাহিত্যিককে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি বিষয়ে সহায়তা করা নয়, কারণ তা হতেই পারে না। যেমন ধর্মের তেমনি সাহিত্যের সাধনা দল বেঁধে করার নয়। তা হলে এই জাতীয় বৈঠকে কী ফল লাভ হতে পারে? প্রথমত, এখানে সাহিত্যকরা, সাহিত্যিরসিক ব্যক্তিরা এবং অন্যান্য অনুরাগী জনসাধারণ সামাজিক মানুষ হিসেবে একসঙ্গে মেলবার সুযোগ পান। কারণ, এ কথা ভুললে চলবে না যে এমনকি শ্রেষ্ঠ কবি বা লেখকদেরও রসবিভোর আত্মস্থ শিল্পী-সত্তা, যার মধ্য দিয়েই শুধু তাঁরা আপনাকে নিবিড় পূর্ণভাবে অনুভব করেন, এ ব্যতীত অন্য একটি সামাজিক সত্তা আছে। এই সব জায়গায় যখন তাঁরা যোগদান করতে আসেন, তখন প্রধানত তা সামাজিক মানুষ হিসেবেই করতে আসেন, দ্বিতীয়ত, জনগণের মধ্যে সাহিত্য প্রচার, তাঁদের যথার্থ সৎসাহিত্যের সংস্কৃতিগত ও আনন্দগত মূল্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা, এ উদ্দেশ্য সাধিত হয়। তৃতীয়ত, সাহিত্য, বিশেষ করে সমসাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে এখানে সমবেত গুণীজন, সমালোচক ও রসজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে মুখোমুখি বসে যে বৈঠকি আলাপ-আলোচনা হয়, তা একদিকে যেমন চিত্তাকর্ষক, অন্যদিকে তার তেমনই যথেষ্ট সমালোচনাগত মূল্য রয়েছে। এখানে সভাপতির অভিভাষণে এবং সুযোগ্য ব্যক্তিদের বক্তৃতা দিতে সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কীয় এমন সব প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যেতে পারে ও হয়ে থাকে, যার সম্বন্ধে প্রশ্ন হয়তো অনেক সময়ে অনেকেরই মনে জাগে, কিন্তু অনুকূল আলোচনার ক্ষেত্র মেলে না। এই সব ছাড়া আরো অনেক দিক আছে, যার মূল্যে সাহিত্য-সভার মূল্য।

সাহিত্যের কী মূল্য? ঘন এক টুকরো কবিতা, অনবদ্য একটি ছোটো গল্প, নিবিড়রেশময়

একটি 'লিরিক্', ঠাসবুনোট একখানি উপন্যাস, বিপুলতম যার ব্যঞ্জনা, যেখানে বাস্তব জীবন নাট্যের বিচিত্র কলকোলাহল, উত্তেজনা ধ্বনিত হয়েছে, আমাদের জীবনে এ সবের জন্যে বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করে রাখা কি এতই দরকার? উত্তর হচ্ছে, দরকার, অত্যন্ত বেশি দরকার আরো এই জন্যে যে, এই সব প্রশ্ন এখনো আদৌ ওঠে। তেল-নুন-লক্ড়ির কারবার করতে করতে আমাদের অনেকেরই দিন আসে মিলিয়ে। বাঁধা রাস্তায় আমরা জন্মাই এবং মরি, দু-পাশের এই দুই চরম পরিচ্ছেদের মাঝখানের রাস্তাটা আমরা অনেকেই যে ভাবে চলি, তাতে যেন আমাদের স্রষ্টাকেই ব্যঙ্গ করা হয়। সাহিত্য তাই আমাদের এই অতি-অভ্যাসে বদ্ধ ঝিমিয়ে-আসা মনের পক্ষে আকাশস্বরূপ, দিগন্ত এখানে অত্যন্ত বিস্তৃত, আবহাওয়া সর্বদাই উজ্জ্বল, অজস্র খোলা জানলা দিয়ে অদৃশ্য কেন্দ্র থেকে প্রতিক্ষণে দিব্য যৌবনময় আলো আর চেতনা এসে ঝরে ঝরে পড়ে। এখানে জীবন অহ্রহ আপনাকে অত্যন্ত ঘন সুরে বিকীরিত করে। জীবনের এই অতি বিরাট পটভূমিকার জগতে এতে পাঠক এক মুহূর্তে আপনাকে বড়ো করে পায়। দৈনন্দিন জীবনের পারিপার্শ্বিকতার সহস্র ক্ষুদ্রতা ক্লেদ গ্লানি পেছনে পড়ে থাকে, মানুষ খানিকক্ষণের জন্য অন্তত খণ্ড কাল ও দেশের অতীত এক জ্যোতির্ময় চেতনান্তরের মধ্য দিয়ে অববাহিত হয়ে আসে। প্রত্যেকের আত্মসত্তার এই যে বিস্তারের সম্ভাবনা, কাব্য ও সাহিত্য, তথা আর্টের অন্যান্য বিভাগ, এতে প্রত্যেকে অত্যন্ত প্রত্যক্ষরূপে সহায়তা করে।

সাহিত্য আরো অনেক কিছু করে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কম-বেশি পরিমাণে একটি মানুষ আছে, যে নাকি স্বপ্ন দেখে, যে নাকি অন্তত কোনো কোনো ক্ষণের জন্যও আদর্শবাদের তীব্র প্রেরণা অনুভব করে, যে অতীত স্মৃতির অনুধ্যানে সহসা উন্মনা হয়, ভবিষ্যতের কল্পনায় নেশার মতোন হয় আসক্ত, রস-সাহিত্যের একটি প্রধানতম কাজ হচ্ছে, প্রত্যেকের ভেতরকার এই স্বপ্নালু লোকটির তৃপ্তিবিধান করা। তা ছাড়া, কথা-সাহিত্যিক সমসাময়িক সমাজ বা রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিকে দেশকালান্তরিত জীবনের ছবি আঁকেন। তাতে করে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে মানুষটি তার নিজ যুগের মানুষ আর ঘটনাবলি সম্বন্ধে খুব উৎসুক, তার কৌতূহল মেটে। সাহিত্য আমাদের কল্পনা অনুভব-বৃত্তিকে উজ্জীবিত করে। এর মননশীল প্রধানতম সংগ্রামে ও সভ্যতার সংগঠনে আমাদের শক্তি যোগায়, এবং রস-সাহিত্যের .. হচ্ছে .. সে আনন্দের রূপীকরণ ও পরিবেশনে, যে মূল লীলার আনন্দের প্রেরণায় জীবনের হ্ল উৎপত্তি,-সুখদুঃখ হর্ষবেদনা প্রেমকীর্তি ক্ষয়মৃত্যু সব ব্যেপে এবং সব ছাড়িয়ে যে নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ-সত্তা জীবনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রতিক্ষণে আপনাকে প্রবাহিত করে চলেছেন, একটু একটু করে মেলে ধরছেন। কবি সাহিত্যিক ও শিল্পী যত কথা বলেন, তার মর্ম এই যে আমাদের ধরণী ভারী সুন্দর, একে বিচিত্র বললেই কতটুকু

বোঝান হল, আমাদের এই দৃষ্টিটি বারে বারে ঝাপসা হয়ে আসে, প্রকৃতির বাইরেকার কাঠামোটিকে দেখে আমরা বারে বারে তাকে 'রিয়্যালিটি' বলে ভুল করি, জীবন নদীতে অন্ধ গতানুগতিকতার শেওলাদাম জমে, তখন আর স্রোত চলে না; তাই তো কবিকে, রস স্রষ্টাকে আমাদের বার বার দরকার, শুকনো মিথ্যা বাস্তবের পাঁক থেকে আমাদের উদ্ধার করতে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা যেতে পারে যে, সাহিত্য ও শিল্পকে সর্বসাধারণের উপযুক্ত করে দাও, এই একটি আধুনিক ধুয়ার কোনো মানে হয় না। এ কথার অর্থ তো এই যে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রস অত্যন্ত ঘন, একে খানিকটা জোলো করে দাও, এর শিল্পের বুননিতে অত সূক্ষ্ম তন্তুর বদলে মোটা দড়ির ব্যবহার প্রচলিত করো। কারণ, তা হলে তখন শিক্ষা ও শক্তি নির্বিশেষে এ সাহিত্য যাবতীয় জনেরই হয়ে উঠবে; রসের মন্দিরে ভিড়ের আর কম্‌তি থাকবে না। আমাদের বক্তব্য এই যে, এ রকম কোনো আদর্শের উপর যদি জোর দেওয়া হয়, তবে সাহিত্যের সর্বনাশ করা হবে, এবং যাদের দিকে চেয়ে সাহিত্যে এই ভুয়ো গণতন্ত্রের সুর আমদানির জন্য আমরা এ করতে যাব, তাদেরও শেষ পর্যন্ত উপকার কিছু হবে না। রস-সাহিত্যের উপভোগ-সামর্থ্যের দিক দিয়ে যারা 'হরিজন', সাহিত্যকেও জোর করে 'হরিজন'-মার্কা করে তাদের স্তরে না নামিয়ে উক্তরূপ তথাকথিত 'হরিজন'দের আর্ট ও সংস্কৃতিগত শিক্ষার এমন সুযোগ ও সাহায্য দিতে হবে, যাতে করে তারা মনের দিক দিয়ে ক্রমশ উঠে আসতে পারে, সূক্ষ্মতম রসের স্বাদগ্রহণে পারগ হয়। যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে, তেমনি এ ক্ষেত্রেও অধিকারীভেদ মানতে হয়। বাস্তবিকপক্ষেও আমরা দেখতে পাই যে চিন্তামূলক বা সৌন্দর্যমূলক সত্য, ইন্দ্রিয়জ বা অতীন্দ্রিয় রসের আবেদন, অথবা একই শ্রেষ্ঠ কাব্য উপন্যাস বা নাটক, জন্মগত ক্ষমতা তথা অনুশীলনবৃত্তির চর্চাভেদে বিভিন্ন পাঠকের মনে, প্রধানত 'ইন্‌টেন্‌সিটি'র দিক দিয়ে—বিভিন্ন রকমের সাড়া জাগায়। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, সাহিত্যের যে একটি স্বাভাবিক আভিজাত্য আছে, এমন কিছু না করা যাতে তা এতটুকু ক্ষুণ্ন হয়, পরন্তু আমাদের সবাইকে তার উপযুক্ত হতে শিক্ষিত করা।

দুদিন বা দশদিন পরে কেউ আমার বই পড়বে না, এ ভয় কোনো সত্যিকার কথা-সাহিত্যিক করেন না। করেন তাঁরা, যাঁরা একটি মিথ্যা ভবিষ্যতের ধূম্রলোকে নিজেদের চিরপ্রতিষ্ঠিত দেখতে গিয়ে বর্তমানের দাবিকে অস্বীকার করেন। কেউ বাঁচেনি, বড়ো বড়ো নামওয়ালা কথা-সাহিত্যিক তলিয়ে গিয়েছেন কালের ঘূর্ণীপাকের তলায়, সেই যুগের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে পরবর্তী যুগের লোকেরা ধুলো ঝেড়ে ছেঁড়াপাতাগুলো উদ্ধার করবার কষ্টও স্বীকার করে না। দু'দশজন সাহিত্য-রসিক, দু'পাঁচজন পণ্ডিত, দু'একজন বৈদগ্ধ্যগর্বী মানুষ ছাড়া আজকালকার যুগে কথাসরিৎসাগর কে পড়ে, গোটা

অখণ্ড আরব্য উপন্যাস কে পড়ে, ডন্ কুইকসোট্ কে পড়ে? চসার, দান্তে, মিল্টন, এঁদের কথা বাদ দিই, ছাত্র বা অধ্যাপক ছাড়া কেউ এঁদের পাতা উল্টায় না, সকলে তো কাব্যপ্রিয় নয়, কিন্তু অত বড়ো যে নামজাদা ঔপন্যাসিক বাল্‌জাক তাঁর উপন্যাস রাশির মধ্যে ক-খানা আজকাল লোকে সখ করে পড়ে? স্কট, হেন্‌রি, জেম্‌স, থ্যাকারে, ডিকেন্স সম্বন্ধেও অবিকল এই কথা খাটে। ফিল্মে না উঠলে অনেকের অনেক উপন্যাস কি নিয়ে লেখা তাই লোকে জানত না। নামটাই থেকে যায় লেখকের, তাঁর রচনা আধমরা অবস্থায় থাকে, অনেক ক্ষেত্রেই মরে ভূত হয়ে যায়।

জানি, একথা আমাদের স্বীকার করতে মনে বড়ো বাধে। খোলাখুলিভাবে বললে আমরা এতে ঘোর আপত্তি করি, 'বিশ্ব', 'অমর', 'শাশ্বত', প্রভৃতি বড়ো বড়ো গালভরা কথা জুড়ে দীর্ঘ ছাঁদে সেন্টেন্স রচনা করে তার প্রতিবাদ করি। কিন্তু আমরা মনে মনে আসল কথাটি সকলেই জানি। পার্ক স্ট্রিটে ওয়েল্‌ডন লাইব্রেরি একটা খুব বড়ো বিলিতি ও আমেরিকান উপন্যাস আমদানিকারক লাইব্রেরি, অনেকে সাহেব-মেম, আমাদের দেশের লোক নভেল পড়বার জন্যে তার সভ্য হয়ে থাকেন। কিন্তু তিন বছর অন্তর বইয়ের আলম্যারি থেকে সমস্ত পুরাতন বই নিষ্কাশিত করে দিতে হয়, সস্তায় সেগুলো পুরোনো বইয়ের দোকানদারেরা নীলামে ডেকে নিয়ে যায়। লোকের হুজুগ নতুন বই চাই, এ মাসের যদি হয় তবে আর ও মাসের চাইবে না, প্রায় সেই অবস্থা। ভাল-মন্দের বিচার একেবারে যে নেই তা নয়, কিন্তু খুব বেশি নেই।

ওপরের সব কথা স্বীকার করে নিলেও একটা কথা থেকে যায়। যে সাহিত্য টবের ফুল, দেশের সত্যিকার মাটিতে শিকড় চালিয়ে বা রসসঞ্চয় করছে না, দেশের লক্ষ লক্ষ মূক নরনারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখবেদনা যাতে বাণী খুঁজে পেলে না, তা হয় রক্তহীন, পাণ্ডুর, থাইসিসের রোগীর মতো জীবনের বরে বঞ্চিত, নয়তো সংসার-বিরাগী, ঊর্ধ্ববাহু, মৌনী যোগীর মতো সাধারণ সাংসারিক জীবনের বাইরে অবস্থিত। মানুষের মনের বা সমাজের চিত্র হিসেবে তা নিতান্তই মূল্যহীন।

পূর্বেই বলেছি মিথ্যাকে আশ্রয় করেও কথা-সাহিত্যিক রসসৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু সে হয় মানুষকে ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়ে রাখবার সাহিত্য, সমাজের ও জীবনের সত্য চিত্র হিসেবে তার মূল্য কিছুই থাকে না।

গভীর রহস্যময় এই মানব-জীবন। এর সকল বাস্তবতাকে, এর বহুবিচিত্র সম্ভাব্যতাকে রূপ দেওয়ার ভার নিতে হবে কথাশিল্পীকে। তাঁকে বাস করতে হবে সেখানে, মানুষের হট্টগোল, কলকোলাহল যেখানে বেশি, মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের সুখদুঃখকে বুঝতে হবে, যে বাড়ির পাশের প্রতিবেশীর সত্যিকার জীবনচিত্র লিখেছে, সে সকল যুগের সকল মানুষের চিত্রই এঁকেছে, চাই কেবল মানুষের প্রতি সহানুভূতি, তাকে বুঝবার ধৈর্য। ফ্লবেয়ার বলেছেন, মানুষে যা করে, যা কিছু ভাবে, সবই সাহিত্যের

উপাদান। কথাশিল্পী যা নিজের চোখে দেখছেন, তাই তাঁকে লিখতে হবে, শোভনতার খাতিরে তিনি যদি জীবনের কোনো ঘটনাকে বাদ দেন, চরিত্রের কোনো দিক ঢেকে রেখে অঙ্কিত চরিত্রকে মাধুর্যমণ্ডিত বা সুষ্ঠু করবার চেষ্টা করেন, ছবি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

'এমা বোভারি'-র স্রষ্টার উপযুক্ত কথা বটে!

কিন্তু এই বাস্তবতার কি একটা সীমা নেই? জীবনের নগ্ন চিত্র, দিগ্বসনা ভীমা ভয়ংকরী ভৈরবীর মতো করাল, সে চিত্র মানুষের মনে ভয়সঞ্চার করে, অবসাদ আনে, জুগুপ্সার উদ্রেক করে, সাধারণ রসবিলাসী পাঠকের সাধ্য নয় সে কঠিন নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুখীন হওয়া। সূর্যের অনাবৃত তাপ পৃথিবীর মানুষে সহ্য করতে পারে না, তাই বহুমাইলব্যাপী বায়ুমণ্ডলের আবরণের মধ্য দিয়ে তা পরিস্রুত হয়ে, মোলায়েম হয়ে, অনেক পরিমাণে সহনীয় হয়ে তবে আমাদের গৃহ-অঙ্গনে পতিত হয় বলে রৌদ্র আমাদের উপভোগ্য, প্রাণীকুলের উপজীব্য।

সে আবরণ দেবেন শিল্পী তাঁর রচনায়। নির্বাচনের স্বাধীনতা তিনি ব্যবহার করবেন শিল্পীর সংযম ও দৃষ্টি নিয়ে।

সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট আর দু'একটি মাত্র কথা বলে আমি শেষ করব। সাহিত্যে প্রোপাগাণ্ডার স্থান সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। আমাদের বক্তব্য এই যে, সমাজ-সংস্কারই হোক, দেশপ্রেমই হোক, অথবা অন্য কোনো সমস্যাদি সম্বন্ধে মতবাদই হোক, সব কিছুরই প্রোপাগাণ্ডা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে, একটা বিশেষ সীমার ভেতরে থাকে, করা যেতে পারে, যদি তা তারপরও সাহিত্যই থাকে, কোনো প্রচার-বিভাগের বিশদ চিত্তাকর্ষক প্যাম্পলেটের মতো না হয়ে ওঠে। সাহিত্য ও আর্টের জাত নষ্ট হয়নি তখনি, যখন এ অপরতর কোনো উদ্দেশ্য সাধতে গিয়ে আপনার মূল সাধনা, অর্থাৎ সমসাময়িক সমস্যারও অতীত শাশ্বত সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রেরণা থেকে বিচ্যুত হয়। মনে রাখতে হবে 'স্বধর্ম ত্যাগ করা ভয়াবহ'—অনেক কিছুর মতো এ ক্ষেত্রেও। তারপর আমরা আনতে পারি, সাহিত্যের সঙ্গে নীতি ও কল্যাণবুদ্ধির সম্পর্কের কথা। সাহিত্যের সুনীতি দুর্নীতি ও শ্লীলতা অশ্লীলতা ইত্যাদি নিয়ে প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেই অনেক ঝড় বয়ে গিয়েছে। শ্লীলতা, অশ্লীলতা ইত্যাদি নিয়ে প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেই অনেক ঝড় বয়ে গিয়েছে। শ্লীলতা অশ্লীলতা সম্বন্ধে আমরা এই বলতে পারি যে, বাইরের পৃথিবী এবং মানুষের জটিল জীবনকাহিনি তাদের অন্তর্নিহিত রসরূপে তখনই আমাদের অভিভূত করতে পারে, যখন আমরা এদের একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে এবং ইন্দ্রিয়াতীতরূপে আমাদের মানস চেতনায় পাই। ... আদি... মধুর রসে পরিণত হয়, তখনই তা হয় আর্ট। কামজ প্রেমের কথা বলতে গিয়ে কবি যখন নিরাসক্ত কৌতূহলে অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে চলেন, তখনই শুধু তা হয় আর্ট। তখন তা আর শ্লীলও থাকে না, অশ্লীলও নয়। সংকীর্ণ অর্থে নৈতিকতার

মানদণ্ড সাহিত্যের প্রতি প্রয়োগ করা যায় না অবশ্য, কিন্তু যে বৃহৎ কল্যাণবুদ্ধি আমাদের সকলের স্রষ্টার মনে তাঁর জগৎসৃষ্টির বেলায় ছিল বলে আমরা কল্পনা করি, রস-স্রষ্টাকে ধ্যাননেত্রে তাকে পেতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। কারণ, কী জীবনে, কী সাহিত্যে, শক্তি প্রতিভার সম্বন্ধে প্রেম ও সত্যবুদ্ধি যুক্ত না হলে স্থায়ী কিছুর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। সমাজের প্রচলিত নীতি প্রথাকে সাহিত্যিক নির্মম আঘাত করতে পারেন, কিন্তু শুধু সত্যের জন্যই পারেন, ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য নয়। সাহিত্যিক বাস্তব জগতের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তার চিত্র আঁকবেন। কিন্তু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যথেষ্ট পরিষ্কার হলে তিনি দেখবেন যে বাইরের জগতে যা ঘটে, তার চেয়ে লেখকের মনের জগতে আর এক মহত্তর ব্যঞ্জনাময় বাস্তব আছে; এবং যদিও মানুষের জীবন এত বিচিত্র ও মোহনীর রূপে জটিল, কারণ পাপ দুর্বলতা পদস্খলনের কাহিনি তার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, তবুও সে যেখানে বড়ো; সেখানে তার রূপ কেবল এইই নয়। তা ছাড়া, বৃহত্তর অর্থে নীতিবোধ, জীবন ও সমাজের মূল সত্তার সঙ্গে জড়িত; সাহিত্য থেকে তাকে কি আমরা বিচ্ছিন্ন করতে পারি?

মাঝে মাঝে একটা কথা শোনা যায় যে আমাদের মতো পরাধীন দরিদ্র দেশের সংকীর্ণ সমাজের মধ্যে কথা-সাহিত্যিকের উপাদান তেমন মেলে না। 'আমাদের দেশে কি আছে মশাই, যে এ নিয়ে নতুন কিছু লেখা যাবে, সেই খাড়া বড়ি থোড়', একথা অনেক বিজ্ঞ পরামর্শদাতার মুখে শোনা যায়।

এই ধরনের উক্তির সত্যতার বিচার করতে বসলে দেখা যায়, এসব কথা মাত্র আংশিকভাবে সত্য। বাংলা দেশের সাহিত্যের উপাদান বাংলার নরনারী, তাদের দুঃখদারিদ্র্যময় জীবন, তাদের আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না-পুলক, বহির্জগতের সঙ্গে তাদের রচিত ক্ষুদ্র জগৎগুলির ঘাত-প্রতিঘাত, বাংলা ঋতুচক্র, বাংলার সন্ধ্যা-সকাল, আকাশ-বাতাস, ফলফুল, বাঁশবনের, আমবাগানের নিভৃত ছায়ায় ঝরা সজনেফুল বিছানো পথের ধারে যে সব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে, তাদের কথাই বলতে হবে, তাদের সে গোপন সুখ-দুঃখকে রূপ দিতে হবে।

উপরে সাহিত্য সম্বন্ধে মাত্র দু-চার কথার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল। বাংলা-সাহিত্যে বর্তমানে নব নব সৃজনী প্রতিভা বহু ভাবে আপনাকে বিকাশ করবার সাধনায় লিপ্ত। এখানে সমবেত বন্ধুগণ যদি সাধারণভাবে যাবতীয় সাহিত্যের ও বিশেষ করে বঙ্গসাহিত্যের মূল স্রোতোধারাটির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রাখা নিজেদেরই জন্য কেন এত অত্যাবশ্যক, সেইটি মনে মনে স্থায়ীভাবে আলোচনা করেন, তবেই এই বৈঠক সফল হয়েছে বলা যাবে। পরিশেষে, যাঁরা অনুগ্রহ করে আমায় এখানে ডেকে এনেছেন, তাঁদের আর এক বার ঐকান্তিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

২৮ শে ফাল্গুন, ১৩৪৪

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গ-সাহিত্যে ব্যক্তিবোধ ও রাষ্ট্রচেতনার উন্মেষ

বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো সুসংবাদ এ সাহিত্য ক্রমশ সমাজচেতনায় মুখর হয়ে উঠছে। গত মন্বন্তরের পর থেকে বাংলা সাহিত্যে এই লক্ষণটি অতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে আরও বেশি করে। তারাশঙ্কর, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ লেখকগণ এ সম্বন্ধে পথপ্রদর্শক। তাঁদের বৈশিষ্ট্য একদিন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পৃথক অধ্যায় সৃষ্টি করবে। এই সমাজচেতনা ব্যক্তিবোধের সঙ্গে বিরোধিতা করেনি, বরং তাকে আরও বাস্তব ও আরও সক্রিয় ক'রে তুলতে চেয়েছে। সেই সমাজবোধ অনিষ্টকর যা কিনা মানুষের দলবদ্ধ জীবনযাপনের দাবি নিয়ে ব্যক্তিবোধকে ক্ষুণ্ণ করে। সাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো কথা এই ব্যক্তিবোধ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন।

মানুষ নিয়ে ইতিহাস, মানুষ নিয়েই সাহিত্য। আশা ও নিরাশার অনুভূতিতে সদাচঞ্চল কতকগুলি মানুষ নিয়েই যেমন সমাজ তাদের প্রত্যেক্যের অনুভূতির চরিতার্থতা দিয়েই সমাজবোধের সার্থকতা। চরিতার্থ ব্যক্তিবোধের সমষ্টিতেই সার্থক সমাজ গড়ে ওঠে। অতএব ব্যক্তিবোধ সাহিত্যে অবাস্তর নয়, মূল উপাদান। মানুষ আকাশে বাস করে না, সমাজে বাস করে; তাই নভোচারী সাহিত্য তাকে স্বপ্নালু করে তুলতে পারে, জীবনযাপনের সমস্যাসমূহের সমাধানে সাহায্য করতে পারে না।

বাংলাদেশ যখন এত বড়ো মন্বন্তরের সম্মুখীন হল, তখন বাংলার রসস্রষ্টা সাহিত্যিকদের মনে তা যথেষ্ট বেদনা ও আবেগের সৃষ্টি করে গেল। তাঁরা প্রথম চোখ মেলে চেয়ে দেখবার সুযোগ পেলেন। কল্পনার রসবিলাস নিয়ে সাহিত্য রচনা করলে তা আজ নিতান্ত অসার বলে পরিগণিত হবে জাতির উগ্র বেদনাবোধের সম্মুখে। জাতিকে তা সাহায্য করবে না। পথ দেখিয়ে দিতে পারবে না। দেশকে জাগাতে হবে। মন্বন্তরের করাল ধ্বংসলীলার মধ্যেও বহু নরনারীকে দিব্য আরামে সোনার পালঙ্কে শুয়ে রাজভোগ খেয়ে মোটরচারী বিলাসব্যসনের পঙ্কে নিমজ্জিত থাকতে দেখে তাঁরা বুঝলেন, দেশ সজাগ

হয়নি। তাঁরা ঘুম ভাঙানোর ভার নিয়েছিলেন। প্রবোধের 'অঙ্কুর' মনোজ বসুর 'দ্বীপের মানুষ' প্রভৃতি সেই ঘুম ভাঙানোর গান। ঘুম ভাঙলো কিনা জানি না, কিন্তু লজ্জিত হল অনেকে।

আজও অনেকে অভিযোগ করেন, বাংলা সাহিত্যে এখনো সমাজবোধ, রাষ্ট্রীয় চেতনা প্রভৃতি অঙ্কুর অবস্থায় মাটি থেকে উঁকি মারছে মাত্র। এত বড়ো আগস্ট আন্দোলন, জাতীয় আন্দোলন এতটুকু দোলা দেয়নি কথা-সাহিত্যিকদের মনে। কোথায় এই বিপ্লবের সাহিত্য, যা দেশকে বল দেবে দেশবাসীর মনে আশা ও উৎসাহ আনবে, পথ দেখিবে দেবে। দু-একজন উন্নাসিক সমালোচক এ নিয়ে সাময়িক পত্রে শুধু অভিযোগ করেই ক্ষান্ত হননি, বাংলা সাহিত্যিকদের অক্ষমতার ইঙ্গিত করেছেন।

বাংলার সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে কোনো প্রত্যুত্তর দেওয়ার আবশ্যক নেই। লেখা আসে কবি-মানসের অন্তর্নিহিত তাগিদ থেকে। কবি-মানসের বিভিন্নমুখী গতি থেকে বিভিন্ন ধরনের লেখার সৃষ্টি। যেদিন বাংলার লেখকরা দেশের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অবহিত হবেন, সেই প্রসারিত চেতনাই তাঁদের বাধ্য করবে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় সমস্যা ও সমাজ সমস্যাকে আশ্রয় করে গল্প ও উপন্যাস লিখতে। এই ব্যাপক চেতনার লক্ষণ সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে বহু শক্তিশালী লেখকের সাম্প্রতিক রচনায়। আমরা পেয়েছি দুর্ভিক্ষ, পেয়েছি আগস্ট আন্দোলন। একটি জীবন্ত সাহিত্য বিভিন্ন আঙ্গিক ও মাধ্যমে দেশের রাষ্ট্রীয় সমস্যাগুলি ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় করে রেখে দিচ্ছে। বহু লেখার আবশ্যক কী? একখানি সার্থক রচনায় এক এক যুগকে অমর করে রাখে। যেমন সোভিয়েত রাশিয়ার দুঃখ-দুর্দশার চিত্র ফুটে উঠেছে ওয়েলেস্কির *দি রেনবো* নামক উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে ভারতব্যাপী বিরাট রাষ্ট্র আন্দোলনের চিত্রকে অমর করে রেখে গেলেন। এঁদের প্রতিভা ওই সব রচনাকে অপূর্ব আঙ্গিকের মধ্যে দিয়ে যুগ প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে উন্নীত করে দিয়েছে। গণ-চেতনা যে কিভাবে অমর সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে, তার খোঁজ নিজে গেলে ওগুলির সঙ্গে সম্যক পরিচয় হওয়া প্রয়োজন।

সাহিত্যের মাপকাঠি হচ্ছে তার রসোত্তীর্ণতা। যুগের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে জীর্ণ পুঁথির পাতার মতো অবহেলিত হয় যে রচনা, মানব-মনের প্রয়োজন-সাম্য যা বজায় রাখতে পারে না, তার দুর্গতির কারণই হচ্ছে রসোত্তীর্ণতার অভাব। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে সেই বিষয়টি রসোত্তীর্ণ করা বড়ো কঠিন হয়ে পড়ে অনেক ক্ষেত্রেই। নিজের ব্যথাবোধ ও নিপীড়িত চেতনা কবিমানসকে যে রচনায় উদ্বুদ্ধ করে তার প্রতি ছত্রে ফুটে ওঠে অনুভূতির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। আজ যে ব্ল্যাকমার্কেট, যে অসংযত অর্থলোলুপতা যে বস্ত্রদৈন্য, অন্নকষ্ট দেশব্যাপী হয়ে উঠেছে তাতে নিছক কল্পনাবিলাসের সাহিত্য এখন অসার বলে পরিগণিত হবেই, সঙ্গে সঙ্গে লেখকদের মধ্যে ফুটে উঠেছে নবচেতনা, দৃষ্টিভঙ্গীর নবীনতা, দৃঢ় ও ব্যাপক সমাজচেতনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সুনির্দিষ্ট আদর্শ। এসব

যে এখনও দানা বাঁধেনি, এ খুব সত্য কথা। নূতন পরিপাক করতে সময় লাগে। সাহিত্য সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভের রচনা নয় বা রাজনৈতিক প্রচারপত্র নয়, মনের দিক থেকে সত্য ও বাস্তব হয়ে উঠলে লেখকের হাত দিয়ে যে রচনা বেরোয়, তার রসোত্তীর্ণতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় না, সুতরাং লোকের হাততালি, বাহবা বা পরামর্শদাতা সমালোচকদের বিজ্ঞ পরামর্শের প্রভাবে বা অতি আধুনিক যুগস্রষ্টা আখ্যায় ভূষিত হবার লোভে বা দুরাশায় যাঁরা এ পথে অগ্রসর হবেন, তাঁরা ঠকবেন। সাংবাদিকদের ধর্ম সাহিত্যিকের পক্ষে পরধর্ম, এটা তাঁরা জানেন এবং জানেন বলেই আজও আমরা বাংলা সাহিত্যে আশানুরূপ সন্ধান পাচ্ছি না আধুনিক দিনের উগ্র সমস্যাগুলির। কিন্তু দিক্‌চক্রবালে নব-বাহিনীর অশ্বখুরোত্থিত ধূলি দেখা দিয়েছে, ওদের শঙ্খধ্বনি দূর থেকে আমাদের কর্ণে এসে ধ্বনিত হচ্ছে, ওরা আসছে, হতাশার কারণ নেই। বিজ্ঞ সমালোচকদের দীর্ঘশ্বাস এবং 'কিছু হচ্ছে না, কিছু হচ্ছে না' ধ্বনির উত্তর এরা দেবে।

আর একটা বড়ো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাহিত্যে। আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের গণ্ডী বাংলার শ্যাম গ্রামাঞ্চল ছাড়িয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে, বাংলার বাইরের বহু গ্রামদেশের পটভূমিকে আশ্রয় করে। বাংলার বেণুকুঞ্জ ও বৃহত্তর বাংলার অরণ্য-পর্বত, মরুদেশ, কঙ্করময় রুক্ষ মালভূমি সবই তার সমান আদরের বস্তু। মানুষের মধ্যে যে লেখক, যে শিল্পী বাস করে, তার কাছে দেশ বা জাতের কোনো সীমানা নেই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো লক্ষণ এই যে, আজ সে উদার মুক্তির ব্যাপ্ত নীলাকাশতলে এসে দাঁড়িয়েছে কী গল্পে, কী উপন্যাসে, কী কবিতায়। এ পথের খনিত্র ধরে আগুয়ান হবেন যাঁরা, তাঁদের কত দল মরুপ্রান্তরে বেঘোরে মারা যাবে জানি, কত লোকের পাত্তা খুঁজে পাওয়া যাবে না, তবু তাঁদেরই কপালের ঘামে পথের ধুলো দেবে ভিজিয়ে, একটা সুনির্দিষ্ট পথরেখা ফুটে উঠবে ওঁদের গীতিপ্রাণ চারণক্ষেত্রের ধ্বনির তালে তালে।

এই খনিত্রবাহিনী নতুন সাহিত্য রচনা করছে, যে-কোনো মাসিকপত্র খুঁজে দেখলে এদের গল্প পাওয়া যাবে, কবিতা পাওয়া যাবে, উপন্যাস পাওয়া যাবে। বহু তিরস্কারের মধ্য দিয়ে এদের সার্থকতা আসবে একদিন। বহু ব্যর্থতা এদের প্রাণশক্তিকে আরও দৃঢ়, আরও সংহত করে তুলবে। কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস হয়তো এদের সম্বন্ধে নীরব থাকবে, জয়-পরাজয়ের ইতিহাসে নাম থাকে সম্রাটদের, সেনাপতিদের, খনিত্রবাহিনীর লোকেদের নাম তাতে লেখা থাকে না। তাতে কী? আমরা আজ এদের অভিনন্দন জানাই। এদের ক্রম-বিকাশের পারম্পর্য আজ আমাদের কাছে পরিস্ফুট নয়, কারণ আমরা এ যুগেরই অধিবাসী, এত নিকটে থেকে দেখতে গেলে অনেক সময় অনেক দুঃসাহসিক এক্সপেরিমেন্টকে নিছক বাজে আধুনিকতা বলে ভুল করার বিপদ আমাদের পদে পদে।

বাংলার উপন্যাসসাহিত্য সত্যিই পেছনে পড়ে আছে অন্য দেশের উপন্যাসের তুলনায়। মননশীল উপন্যাসের কথা বাদই দিলাম, কিন্তু শুধু ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের ক্ষেত্রেই, যে

ঘটনাপ্রধান উপন্যাস বহু আধুনিক সমালোচকের চক্ষুশূল এবং যে পর্যায়ে তাঁরা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি ফেলতেও দ্বিধা করেন না, সেই ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের ক্ষেত্রেই বা টলস্টয়ের *War and Peace* বা ডস্টয়ভস্কির *Brothers Karamazov*-এর মতো উপন্যাস কোথায়?

অবশ্য একটা আশার কথা এখানে বলে রাখি। বৈদেশিক সাহিত্যেও আদর্শস্থানীয় মননপ্রধান উপন্যাসের সংখ্যা হাতে গুনে ঠিক করা যায়। গত মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপীয় সাহিত্যক্ষেত্রে ফরাসি লেখক ও সমালোচক জুলিয়ান বেন্দা এই মননপ্রধান কথাশিল্পের ক্ষেত্র তৈরি করেন, তাঁর আন্দোলনকে তখন অনেকে সাময়িক হুজুগ বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আজ এই শ্রেণির উপন্যাস ইউরোপীয় সাহিত্যে ক্রমশ দেখা দিতে শুরু করেছে। যদিও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, নামজাদা ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে প্রায় সকলেই সাবেকপন্থী। ওদেশের পাঠক মনেরও গ্রহীষ্ণুতার প্রসারতা যে আমাদের দেশের চেয়ে বেশি নয়, ব্রিটিশ সাহিত্যের দরবারে জেমস জয়েসের মতো খাঁটি মননপ্রধান লেখকের অভ্যর্থনা লক্ষ করলেই সেটি অনুমিত হয়।

শরৎচন্দ্রের কিছু পূর্ব থেকে আমাদের সাহিত্যে একটা অস্পষ্ট ব্যক্তিকেন্দ্রিক সুর ধ্বনিত হচ্ছিল। ব্যষ্টি সমষ্টির মুখ চেয়ে কেন নিজের সুখ-সুবিধা বিসর্জন দেবে এই একটি কঠিন সমস্যামূলক প্রশ্ন ক্রমশ ঠেলে উঠছিল সাহিত্যে, শরৎ-সাহিত্যে সেই ব্যষ্টিকেন্দ্রের সুর অতি স্পষ্ট হয়ে উঠল। এইটিই আসলে শরৎ-সাহিত্যের মূল সুর। সহৃদয়তা ও মানবতা শরৎ সাহিত্যের আর একটি সুর।

শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ বইগুলির রচনা যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন বাংলা সাহিত্যে একটি আন্দোলন শুরু হল, এই আন্দোলনটি অতি উগ্রভাবের ব্যষ্টিকেন্দ্রিক। 'কালি-কলম' ছিল এই আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দিগের অন্যতম মুখপত্র। ব্যক্তিত্বের উদ্দাম সাধনাই এই সময়ের বহু গল্প ও কবিতার মুলতত্ত্ব। ওই একই মূলতত্ত্বের অঙ্গ হিসেবে নানা যৌন সমস্যা বাস্তব বা কাল্পনিক, বিভিন্ন রঙে প্রতিফলিত হয়ে দেখা দিতে লাগলো পাঠকদের সামনে। এই আন্দোলনে যথেষ্ট তিরস্কৃত হয়েছিল সে সময়, সেকথা সে যুগের পাঠকের অজ্ঞাত নয়, কিন্তু সেই নব আলোড়নের সংহত শক্তি বাংলায় একজন নতুন শ্রেণির পাঠক-পাঠিকা তৈরি করেছিল। লেখকদের নব দৃষ্টিভঙ্গী অলক্ষ্যে আশ্রয় করেছিল পাঠকদের। সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বড়ো সুলক্ষণ এই যে নব আন্দোলনের লেখকেরা গ্রহীষ্ণু পাঠকদল সৃষ্টি করেন যাদের রসবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ব যুগের পাঠক সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক অগ্রসর।

শরৎপূর্ব বা রবীন্দ্রপূর্ব যুগের উপন্যাস বর্তমানের অতি তরুণ পাঠক-পাঠিকার কাছেও জোলো এবং ফিকে ঠেকবে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অবিশ্যি এ পর্যায়ে পড়ে না, তিনি ছিলেন যুগপ্রবর্তক আচার্য, তাঁর অসামান্য প্রতিভা সাধারণ লেখকদিগের দুরধিগম্য, তাঁর

দুঃসাহসিকতা এখনও পর্যন্ত বাংলার লেখকদের নিকট আদর্শস্থানীয় হয়ে আছে এবং চিরকাল থাকবে।

কবি বা শিল্পী মানসের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ থেকে রসসৃষ্টি সম্ভব হয়। এ বিষয়ে শিল্পীর স্বাধীনতা অনস্বীকার্য। অন্তর্নিহিত প্রেরণা ভিন্ন শিল্পী কখনও অগ্রসর হবেন না। বাইরের লোকের তাগিদে বা বিরুদ্ধ সমালোচকের ভয়ে বা সস্তা হাততালি পাওয়ার লোভে অতি আধুনিক হওয়ার যে চেষ্টা লেখকের পক্ষে তা মৃত্যুর পথ। এই কথাটি আমাদের সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। এটি একটি বড়ো সত্য সাহিত্য ক্ষেত্রে এবং এই সত্যটি না মানার দরুন বহু তরুণ আশাবাদী লেখকের ও লেখিকার ক্ষমতাকে বিপথে গিয়ে পড়ে নষ্ট হতে দেখেছি। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শক্তিকে ও অভিজ্ঞতাকে অর্জন করতে হয় সাধনা দ্বারা ও তপস্যা দ্বারা। তখন অন্তর্দৃষ্টি আপনিই খুলে যায়, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী অপরের বই পড়ে লাভ করতে হয় না, আপনি এসে আশ্রয় করে শিল্পীকে। এ যেন যোগীর তৃতীয় নেত্র খুলবার মতো ব্যাপার। কিন্তু যতক্ষণ সেই দুলর্ভ ঘটনা না ঘটবে ততক্ষণ শিল্পী যেন কারও প্রশংসার লোভে বা ধমকের ভয়ে স্বধর্ম ত্যাগ না করেন। এতে যদি তাঁর অদৃষ্টে হাততালি না জোটে নাই জুটবে। ন্যায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ; আত্মসংজ্ঞাহীন ভীরুচিত্ত শিল্পী নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনেন।

লেখক ও কবির মধ্যে একটি সহজাত নিঃসঙ্গতা আছে। দৈনন্দিন জীবনোত্তীর্ণ বৃহৎ আনন্দলোকের আবাহন তাঁদের লক্ষ্য যার জন্যে লেখকের প্রয়োজন আপনার ভাবজগতের মধ্যে যত বেশিক্ষণ সম্ভব এবং যত গভীরতমরূপে সম্ভব বাস করা। নিরাসক্ত আনন্দের বা দুঃখের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি। আপনাকে প্রতি মুহূর্তে পূর্ণ করে ও প্রতি মুহূর্তে অতিক্রম করে তিনি অগ্রসর হন। চারিপাশের মানবহৃদয়ের অন্তরতম স্পন্দনটিকে তিনি একান্তভাবে অনুভবের চেষ্টা করেন বলেই তো তাঁদের শ্রেষ্ঠ প্রেরণার ক্ষণে যখন কথা বলেন, তখন তাঁর মধ্যে বিশ্বমানবের কণ্ঠ বেজে ওঠে, জীবনের মূলতম রহস্যের আবেগ একান্তভাবে সঞ্চারিত হয়। বাস্তবকে বুঝতে হলেও দূর থেকে তাকে দেখতে হয়, লোকলোচনের অতি স্পষ্ট পাদপ্রদীপের সামনে অণুক্ষণ থেকে তা সব সময় সম্ভব হয় না, এর জন্যে চাই নির্জনতা, খ্রিস্টের চল্লিশ দিনের নিঃসঙ্গ অবকাশ, বুঝবার ও বোঝাবার প্রয়াস তপস্যা। সৃষ্টির আনন্দ আসে যে বিরাট অনুভূতি থেকে, যাকে বলেছেন 'আনন্দ', 'আনন্দাদ্ধ্যেব খলু ইমানি সর্বানি ভূতানি জায়ন্তে'—সে আনন্দ সহজপ্রাপ্য নয়, সে আনন্দ আপন রস আহরণ করে বিশ্বের তাবৎ সৌন্দর্যরাজির মধ্য থেকে, পুরাতন সৃষ্টির নব উদ্বোধনের দ্বারপথে তপস্যা ভিন্ন সে জগৎ সে পথ চির অপরিচিতই থেকে যায়। এক শীতের নির্জন অপরাহ্নে ছন্নছাড়া দরিদ্র সরাইখানা ও সরাইওয়ালির দুঃখময় জীবন আলফাঁস তাদের মনে যে করুণ অনুভূতি, যে ব্যথা ও বেদনাবোধ জাগিয়েছিল, আমাদের মনেও সেই জীবনের ছবিটি রেখাপাত করে গেল, কারণ লেখকের অনুভূতি তাঁর তপস্যাভূমি

সেই সরাইখানার প্রাঙ্গণে একটি শীতের সন্ধ্যায় জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। এ যুগেই হোক বা সে যুগেই হোক, নিজের রচনা সম্বন্ধে প্রত্যেক লোক সচেতন থাকেন। কবিমানসের রসবোধ থেকে এ চেতনার উৎপত্তি। সর্বপ্রথমে তাঁর নিজের তৃপ্তির জন্যে লেখেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কমবেশি পরিমাণে একটি মানুষ আছে, যে নাকি স্বপ্ন দেখে, কোনো ক্ষণে আদর্শবাদের বা অভিজ্ঞতার অভিঘাতে তীব্র প্রেরণা অনুভব করে, জীবনের ধ্যানে সহসা হয় উন্মনা। রসসাহিত্যের প্রধান কথা হচ্ছে এই স্বপ্নালু লোকটির তৃপ্তিবিধান করা। পাঠকের কথা ওঠে তার পরে। সাংসারিক বা সামাজিক প্রশ্ন ওঠে তার পরে।

কিন্তু সহানুভূতিসম্পন্ন শিল্পী মানস যুগের স্পর্শ এড়িয়ে চলতে পারেন না। যে সময় যে যুগে তিনি জন্মেছেন তার সার্বিক অভিজ্ঞতা তাঁর নিজেরও; লোকান্তরিত দেশান্তরিত ছবি আঁকবার সাধ্য তাঁর নেই। রাষ্ট্রনীতিক বা সামাজিক অভাববোধ বা অভিজ্ঞতা তাঁকে সুদৃঢ়ভাবে আত্মপ্রত্যয়ী হতে দেয়।

আধুনিক বঙ্গসাহিত্য এক শ্রেণির শ্রেণিচেতনাকে আশ্রয় করে স্থির পথে অগ্রসর হচ্ছে, যে শ্রেণির স্বার্থের সঙ্গে এই শ্রেণিচেতনা জড়িত তাদের মধ্যে লেখনী ধরবার যদি কেউ না থাকে তবে ভিন্ন শ্রেণিস্বার্থের মধ্যে যাদের জন্ম তাদের রচনায় পূর্বোক্ত শ্রেণির বক্তব্য ফুটে উঠবে কিনা তা সার্থক বা পরিপূর্ণ কিনা এসব মূল্যবিচার বর্তমানে করে কোনো লাভ নেই। সময়ের কষ্টিপাথরে এ সবের মূল্য নির্ধারিত হবে একদিন। তবে একটা কথা দলের হুজুগে বা মতবাদের হুজুগে কেউ যেন এ শ্রেণির সাহিত্য রচনা করতে না যান, তিনি ঠকবেন।

আত্মসমাহিত শিল্পী মানসের অন্তর্নিহিত প্রেরণা থেকে যে সাহিত্য রচিত হয় না, তার মূল্য বড়ো কম। দুদিনের হাততালির পরে তা নিঃশব্দে যায় মিলিয়ে। এ দায়িত্ব তাঁর নিজের কাছে নিজের পাঠকগোষ্ঠীকে সচেতন করবার পূর্বে তাঁকে বিচার করে দেখতে হবে তিনি নিজে এ সম্বন্ধে কতদূর সচেতন। তাঁর কবিমানস তৃপ্ত হয়েছে কিনা। আমার নিজের কাছে এই কথাটাই সবচেয়ে বড়ো মনে হয়, যিনি যাই নিয়েই লিখুন না কেন প্রত্যেক রস-সাহিত্যিকের একটা নিজস্ব ধর্ম আছে। তাঁর নিজের কাছে যা পরিস্ফুট নয়, যা তাঁর কবিমানসকে তৃপ্ত করে না, জনসাধারণের কাছে প্রশংসা পাওয়ার লোভেই হোক বা সমালোচকের ভয়েই হোক, তেমন সৃষ্টিতে তিনি কখনও হাত দেবেন না। তাঁর মন তখনই সক্রিয় হয়ে উঠবে, যখন তিনি বুঝবেন তাঁর সমগ্র ব্যক্তিসত্তাকে আশ্রয় করে এ লেখা তৈরি। এই কঠিন আত্মস্বাতন্ত্র্যের জন্যে চাই সাহস, যা প্রত্যেক সত্যিকার সাহিত্যিকেরই আছে। সাহিত্য ও আর্টের মস্ত বড়ো কাজ সমসাময়িক সমস্যার উল্লেখ করা বা সমাধান করা, সমাজ-সচেতন হওয়া, জনগণের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়া নব্যদৃষ্টিভঙ্গীর আবাহন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে, তাঁদের অপর উদ্দেশ্য হচ্ছে সৌন্দর্য সৃষ্টি, যা সমসাময়িক সমস্যারও অতীত। স্বধর্ম ত্যাগ করা অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের ন্যায় আর্টের ক্ষেত্রেও

ভয়াবহ।

গভীর রহস্যময় এই মানবজীবন। এর সকল বাস্তবতাকে, এর বহু বিচিত্র সম্ভাব্যতাকে রূপ দেওয়ার ভার নিয়েছেন কথাশিল্পী। তাঁকে বাস করতে হবে সেখানে মানুষের হট্টকোলাহল যেখানে বেশি, মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের সুখদুঃখকে বুঝতে হবে। যে লেখক পাশের বাড়ির প্রতিবেশীর সত্য চিত্র এঁকেছেন, তিনি সকল যুগের সকল মানুষের চিত্রই এঁকেছেন। চাই মানুষকে বুঝবার সহানুভূতি ও ধৈর্য। এত বড়ো মন্বন্তর ঘটে গেল বাংলাদেশে অথচ চিত্রে ও রঙ্গমঞ্চে আমরা তার কি ছবি পেলাম? আমরা পেলাম নায়িকার নাকেকান্না প্যানপ্যানানি গান, মিষ্টি মিষ্টি কথায় নায়কের প্রেমনিবেদন আর মান্ধাতার আমলের যাত্রার পালার ট্র্যাডিশনে কতকগুলি পৌরাণিক নাটক। অথচ যাঁরা পুরাণ রচয়িতা, জনগণকে বাদ দিয়ে তাঁরা চলেননি। পুরোনো দিনের গণমনের কত ব্যথা-বেদনার ইতিহাস ব্যস-বাল্মকির অমর মহাকাব্যগুলির মধ্যে অক্ষয় হয়ে আছে, কত গাথা, কত কাহিনি, কত কথা। সে যুগের পটভূমিকায় রচিত কথাশিল্প হচ্ছে ওগুলি, সে কথা ভুলে গেলে চলবে না। সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল কত গাথা, কত কাব্য, রাজসভায় মহাকবি সেগুলি আবৃত্তি করে যেতেন শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে।

এইজন্যে পুনরায় বলি সমাজ-সচেতনতা লেখকের মস্তবড়ো গুণ। যিনি দেশের অভাব- অভিযোগের প্রতি উদাসীন থেকে সাহিত্য রচনা করেন, তিনি নিজের কবিমানসের প্রতি অবিচার করেন। জীবনবোধের দায়িত্ব তিনি কিছুতেই এড়াতে পারেন না, জনসাধারণের প্রতিঘাতমুখর জীবনধারা হতে বহুদূরে একটি কল্পলোক সৃষ্টি করে তিনি কল্পনাবিলাস চরিতার্থ করতে পারেন, কিন্তু সামাজিক জীবনের ওপর তার কোনো স্থায়ী ফল ফল না।

গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের হতাশার কারণ নেই, নবতর অশ্ববাহিনীর অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলি দিকচক্রবালে দেখা দিয়েছে, আগেই বলেছি। আর একবার সেই আশার বাণীটি উচ্চারণ করে আমি বক্তব্য শেষ করব। এই তরুণ লেখকদের অভ্যুদয়কে আমি অভিনন্দন জানাই। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করছি বঙ্গবাণীর বেদীমূলে কয়েকজন শক্তিধর নবীন পূজারির আবির্ভাব। এতে এই প্রমাণ হল যে, বাংলার প্রাণশক্তির উৎস আজও তেমনি সজীব, যেমন তা ছিল মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের যুগে, যেমন ছিল ভারতচন্দ্রের যুগে, যেমন ছিল নব বাবুবিলাস-এর ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগে, যেমন ছিল বঙ্কিম-শরৎ-রবীন্দ্রনাথের যুগে। কলালক্ষ্মীর অর্ঘ্য এঁরা নিপুণহস্তে রচনা করেছেন, এঁরা নব্যবাংলার প্রাণস্পন্দন শুনতে পেয়েছেন, এঁদের লেখার মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে সে প্রাণস্পন্দনের সুর। যে মাটিতে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন, সে মাটি অজর, অমর। ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাব্যতাকে তা নিজের মধ্যে বহন করছে।

আর একটি কথা। সাহিত্য আমাদের পরিচিত করবে নিগূঢ় বিশ্বরহস্যের সঙ্গে, জীবনের চরমতম প্রশ্নগুলির সঙ্গে দেবে আমাদের উপর মৃত্যুঞ্জয় দৃষ্টি, সকল সুখ-দুঃখের উর্ধ্বে যে

অসীম অবকাশ ও তৃপ্তি আমাদিগকে পরিচিত করবে সেই অবকাশের সঙ্গে, এও সাহিত্যের একটা মস্ত বড়ো দিক।

'তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।'

যে জ্যোতির মধ্যে বিশ্বদেবের কল্যাণতম মূর্তি অধিষ্ঠিত, আমরা যেন দেবতার সেই জ্যোতিকে, দৈনন্দিন জীবনোত্তীর্ণ বৃহত্তর ভাবকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে দর্শন করি। জীবনের দুঃখের দিনে যে সাহিত্যরসিক অচঞ্চল থাকেন, শোকের মধ্যেও যিনি নিজেকে শান্ত রাখতে পারেন, দারিদ্র্যের মধ্যে যিনি নিজেকে হেয় জ্ঞান করেন না, মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস রাখেন, সাহিত্য পাঠ তাঁরই সার্থক। সাহিত্য শুধু রসবিলাস নয় জীবন সমস্যার সমাধানের গূঢ় ইঙ্গিত থাকবে যে সাহিত্যের মধ্যে, তারই মধ্যে আমরা পাবো কলালক্ষ্মীর কল্যাণতম মূর্তিটির সন্ধান।

জাত লেখক যিনি, তিনি কখনও নিজের আদর্শ ত্যাগ করে পরধর্মকে আশ্রয় করেন না, একটা ঠিকই। তাঁর শিল্পীমানস যে রচনা দ্বারা তৃপ্তিলাভ করবে না, সে লেখা তিনি কখনো লিখতেই পারেন না। সাহিত্যের বিশাল ও উদারক্ষেত্রে সব শ্রেণির লেখার স্থান আছে, সব রকম মতবাদের স্থান আছে। অমুক লেবেল আঁটা সাহিত্যই আসল সাহিত্য আর সব অপাঙ্‌ক্তেয়, এমন গোঁড়ামি সাহিত্যের ক্ষেত্রে মারাত্মক। সাহিত্যিকের চাই সেই সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি, সেই উদার সহানুভূতি, যার ফলে জীবনকে অখণ্ডরূপে তিনি বুঝতে ও জানতে পারেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গী ও সেই সহানুভূতিই তাঁর স্থাপন ক্ষমতার মোড় ফিরিয়ে দেবে। সমাজ, দেশ, রাজনীতি সব কিছুরই রূপ সাহিত্যে ফুটে উঠবার অধিকার রাখে, যদি তা রসোত্তীর্ণ হয়। রসোত্তীর্ণতা সাহিত্যের একমাত্র মাপকাঠি, একথা যে-কোনো সাহিত্যিক জানেন, যে-কোনো শিল্পী মানেন।'

দেশ ৫ জানুয়ারি ১৯৪৬

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের মীরাট অধিবেশনে (১৯৪৫) সাহিত্য শাখার সভাপতির অভিভাষণ। বিভূতিভূষণ অনুপস্থিত ছিলেন। লেখাটি তিনি ডাকযোগে পাঠিয়ে দেন। সভায় তা পঠিত হয়।

প্রমথ চৌধুরী

অভিভাষণ

উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত, ১৩২১

আজ বাইশ বৎসর পূর্বে এই রাজশাহি শহরে আমি সর্বজনসমক্ষে সসংকোচে দু-চারটি কথা বলি। আমার জীবনে সেই সর্বপ্রথম বক্তৃতা। কোনো দূরভবিষ্যতে আমি যে এই সভার মুখপাত্রস্বরূপ আবার আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হব, সেদিন এ কথা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

আজিকার ব্যাপারে যাঁহারা কর্মকর্তা সেদিনও তাঁহারাই কর্মকর্তা ছিলেন। মহারাজ নাটোর এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের উদ্যোগেই সে সভা আহূত হয়। এবং তাঁহাদের অনুরোধেই আমি সে সভার প্রধান বক্তা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদানুসরণ করি। এ সভারও পতির আসন রবীন্দ্রনাথের জন্যই চরিত হইয়াছিল ; তাঁহার অনুপস্থিতিতে পূর্বোক্ত বন্ধুদ্বয়ের অনুরোধে এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়মতো আমি তাঁহার ত্যক্ত এই রিক্ত আসন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। যাঁহারা আমাকে প্রথমে আসরে নামান, তাঁহারাই আজ আমাকে এ আসরের প্রধান নায়ক সাজাইয়া খাড়া করিয়াছেন। এ পদ অধিকার করিবার আমার কোনোরূপ যোগ্যতা আছে কি না, সে বিচার তাঁহারাও করেন নাই, আমাকেও করিতে দেন নাই।

এ আসন গ্রহণ করিবার অধিকার যে আমার নাই, তাহা আমার নিকট অবিদিত নয়। আমি অবসরমত সাহিত্যচর্চা করি, কিন্তু সে গৃহকোণে এবং নির্জনে। বক্তা ও লেখক একজাতীয় জীব নন ; ইঁহাদের পরস্পরের প্রকৃতিও ভিন্ন, রীতিও ভিন্ন। বক্তা চাহেন, তিনি শ্রোতার মন জবরদখল করেন ; অপর পক্ষে লেখক পাঠকের মনের ভিতর অলক্ষিতে এবং ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে চাহেন। বক্তা শ্রোতার মনকে বিশ্রাম দেন না ; লেখক পাঠকের অবসরের সাথি। অক্ষরের নীরব ভাষায় একটি অদৃশ্য শ্রোতার কানে কানে আমরা নানা ছলে নানা কথা বলিতে পারি ; কিন্তু জনসমাজে আমাদের সহজেই বাক্‌রোধ

হয়। যে বাণী সবুজ পত্রের আবডালে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে তাহা সূর্যের নগ্ন কিরণের স্পর্শে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। অথচ গুণীসমাজে সুপরিচিত হইবার লোভও আমাদের পুরোমাত্রায় আছে। সাহিত্যের রঙ্গভূমিতে দর্শকের নয়ন-মন আকর্ষণ করিবার জন্য আমরা নিত্য লালায়িত, অথচ লেখকের ভাগ্যে পাঠকের সাক্ষাৎকারলাভ ক্বচিৎ ঘটে। প্রশংসার পুষ্পবৃষ্টি এবং নিন্দার শিলাবৃষ্টি উভয়ই আমাদের শিরোধার্য, একমাত্র উপেক্ষাই আমাদের নিকট চির অসহ্য। সুতরাং সাহিত্যসমাজে যথাযোগ্য আসন লাভ করাতেই আমরা কৃতার্থতা লাভ করি। দণ্ডী বলিয়াছেন যে :

কৃশে কবিত্বেঽপি জনাঃ কৃতশ্রমা
বিদগ্ধগোষ্ঠীষু বিহর্তুমীশতে।

আমাদের ন্যায় প্রতিভাবঞ্চিত লেখকদিগের সকল শ্রম বিদগ্ধগোষ্ঠীতে স্থানলাভ করাতেই সার্থক হয়।

অতএব অন্য কারণাভাবেও অন্তত দুদিনের জন্যও উত্তরবঙ্গের বিদগ্ধগোষ্ঠীর গোষ্ঠীপতি হইবার লোভ সম্ভবত আমি সংবরণ করিতে পারিতাম না।

২

কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার বিশেষ করিয়া একটি নিজস্ব কারণ আছে, যাহার দরুন আমি স্বেচ্ছায় এবং স্বচ্ছন্দচিত্তে এ আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি। এ স্থলে কোনোরূপ বিনয়ের অভিনয় করা আমার অভিপ্রায় নয়। অযোগ্য ব্যক্তিকে উচ্চপদস্থ করা যে তাহাকে অপদস্থ করিবার অতি সহজ উপায় এ জ্ঞান আমার আছে। এ সত্ত্বেও আমি যে আপনাদের সম্মুখে সশরীরে উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি তাহার কারণ উত্তরবঙ্গের আহ্বান আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। আমার দেশ বলিতে আমি প্রথমত এই প্রদেশই বুঝি। বারেন্দ্র সমাজের সহিত আমার নাড়ির যোগ আছে, বরেন্দ্রভূমির প্রতি আমার রক্তের টান আছে। উত্তরবঙ্গের প্রতি আমার অনুরাগকে এক হিসাবে মৌলিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; কেননা এই দেশের মাটিতেই এ দেহ গঠিত। আমার বিশ্বাস, বাস্তুভিটার প্রতি মানুষমাত্রেরই যে স্বাভাবিক টান আছে, সেই আদিম মনোভাবের অটল ভিত্তির উপরেই সভ্য মানবের স্বদেশবাৎসল্য প্রতিষ্ঠিত। অতীত-অনাগতের এই মিলনক্ষেত্রেই আমরা আমাদের আত্মার সহিত আমাদের পূর্বপুরুষদিগের আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচয় পাই। এই বাস্তুপ্রীতিই ক্রমে প্রসারলাভ করিয়া স্বদেশপ্রীতিতে পরিণত হয়। সুতরাং যে দেশের যে ভূভাগ আমাদের পূর্বপুরুষদিগের স্মৃতির সহিত একান্ত জড়িত, সে প্রদেশের প্রতি অন্তরের টান থাকা মানুষের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। আমার পারিবারিক পূর্বকাহিনি এই বরেন্দ্রমণ্ডলের

চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ। সে সীমা লঙ্ঘন করিয়া আমার জাতীয় পূর্বজন্মের স্মৃতি, আর্যাবত দূরে থাক, কান্যকুব্জেও গিয়া পৌছায় না। সুতরাং বরেন্দ্রভূমির প্রতি আমার যে প্রগাঢ় অনুরাগ আছে সে কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্তুত। এবং সেই মজ্জাগত প্রীতিবশতই উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য পরিষৎ যে গুরুভার আমার মস্তকে ন্যস্ত করিয়াছেন, আমি তাহা বিনা আপত্তিতে নতশিরে গ্রহণ করিয়াছি।

৩

এই প্রসঙ্গে আমি এইরূপ প্রাদেশিক সাহিত্যসভার সার্থকতা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি ; কাহারো কাহারো মতে এইরূপ পৃথক পৃথক পরিষদের প্রতিষ্ঠায় সাহিত্য সমাজেও প্রাদেশিকতার সৃষ্টি করা হয়। এ অভিযোগের অর্থ আমি অদ্যাবধি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের এই জাতীয় সভাসমিতির সংখ্যা যত বৃদ্ধিলাভ করিবে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। এবং আমার মতে এই সকল প্রাদেশিক সাহিত্য সমিতির পক্ষে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। আমি শিক্ষা এবং সাহিত্য সম্বন্ধে ডিসেন্ট্রালাইজেশনের পক্ষপাতী। কোনো একটি আঢ্যপরিষদের শাসনাধীন থাকিলে প্রাদেশিক পরিষৎগুলি সম্যক স্ফূর্তি লাভ করিতে পারিবে না। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রধান ত্রুটি তাহার বৈচিত্র্যের অভাব। বঙ্গদেশের সহিত বঙ্গসাহিত্যের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিলে এ অভাব দূর হইতে পারে। বঙ্গসাহিত্যে আমি দক্ষিণবঙ্গের প্রাধান্য অস্বীকার করি না। আমার বিশ্বাস, এক ভাষার গুণে দক্ষিণবঙ্গ চিরকাল সে প্রাধান্য রক্ষা করিবে ; সুতরাং উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের সাহিত্য পরিষদের প্রতি কোনোরূপ কটাক্ষপাত করা কলিকাতার পক্ষে সংগতও নহে, শোভনও নহে। বস্তুত সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের উপর নবনাগরিক সাহিত্যের প্রভাব এত বেশি যে, আমাদের প্রাদেশিক সাহিত্যে প্রাদেশিকতার নামগন্ধও থাকে না। এমনকী, কোনো হতভাগ্য লেখকের রচনা যদি নাগরিক মতে নাগরিকতা-দোষে দুষ্ট বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে সকল প্রদেশেই সে রচনা প্রাদেশিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়।

৪

উত্তরবঙ্গের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ এই যে, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক আবিষ্কৃত বরেন্দ্রমণ্ডলের পূর্বগৌরবের নিদর্শন সকলের বলে উত্তরবঙ্গের মনে ঈষৎ অহংজ্ঞান জন্মলাভ করিয়াছে। এ কথা সত্য কী না তাহা আমি জানি না। যদিই বা উত্তরবঙ্গ তাহার অতীত গৌরবে গৌরবান্বিত মনে করে তাহাতেই বা ক্ষতি কী। সমগ্র বঙ্গের আত্মসম্মান রক্ষা করিতে হইলে প্রদেশমাত্রেরই অহংকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য।

কেহ কেহ বলেন যে, কোনোরূপ প্রদেশবাৎসল্যের প্রশ্রয় দেওয়া কর্তব্য নহে, কেননা ওইরূপ সংকীর্ণ মনোভাব উদার স্বদেশবাৎসল্যের প্রতিবন্ধক। আমি পূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতেই আপনারা অনুমান করিতে পারেন যে, ইঁহারা যে মনোভাবকে সংকীর্ণ বলেন আমি তাহাকেই প্রকৃত উদার মনোভাবের ভিত্তিস্বরূপ জ্ঞান করি। যে স্থলে কোনো অংশের প্রতি প্রীতি নাই, সে স্থলে সমগ্রের প্রতি ভক্তির মূল কোথায় তাহা আমি খুঁজিয়া পাই না।

অনেক সময় দেখা যায় যে, যে মনোভাবকে অতি উদার বলা হয় তাহার কোনোরূপ ভিত্তি নাই। বাংলাদেশের সহিত, বাংলার ইতিহাসের সহিত, বঙ্গসাহিত্যের সহিত কিছুমাত্র পরিচয় নাই অথচ বঙ্গমাতার নামে মুগ্ধ, এইরূপ লোক আমাদের শিক্ষিত সমাজে বিরল নহে। রাজনীতির ক্ষেত্রে ইঁহাদের প্রতাপ দুর্দান্ত এবং প্রতিপত্তি অসীম। এইরূপ উদার মনোভাবের অবলম্বন কোনো বস্তুবিশেষ নয়, কিন্তু একটি নাম মাত্র। এইরূপ স্বদেশপ্রীতির মূল হৃদয়ে নয়, মস্তিষ্কে। এইরূপ স্বদেশি মনোভাব বিদেশি পুস্তক হইতে সংগৃহীত। এইরূপ পুঁথিজাত এবং পুঁথিগত পেট্রিয়টিজমের সাহায্যে রাষ্ট্রগঠন করা যায় কি যায় না তাহা আমার অবিদিত, কিন্তু সাহিত্য যে সৃষ্টি করা যায় না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। নামের মাহাত্ম্য আমি অস্বীকার করি না। সদলবলে উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্তন করিতে করিতে মানুষে দশাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ঐরূপ ক্ষণিক উত্তেজনার প্রসাদে পৃথিবীর কোনো কার্য সুসিদ্ধ হয় না। সিদ্ধি সাধনার অপেক্ষা রাখে এবং সাধনা স্থিরবুদ্ধির অপেক্ষা রাখে। সুতরাং তথাকথিত সংকীর্ণ প্রদেশবাৎসল্য যদি এইজাতীয় উদার মনোভাবের বিরোধী হয়, তাহা হইলে এইরূপ সংকীর্ণ মনোভাবের চর্চা করা আমি একান্ত শ্রেয়ঃ মনে করি। কিন্তু আসলে এ সকল অভিযোগের মূলে কোনো সত্য নাই। কেননা একমাত্র সাহিত্যই এ পৃথিবীতে মানবমনের সকলপ্রকার সংকীর্ণতার জাতশত্রু। জ্ঞানের প্রদীপ যেখানেই জ্বালো না কেন, তাহার আলোক চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে ; ভাবের ফুল যেখানেই ফুটুক না কেন, তাহার গন্ধ দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। মনোজগতে বাতি জ্বালানো এবং ফুল ফোটানোই সাহিত্যের একমাত্র ধর্ম এবং একমাত্র কর্ম। কোনো জাতির মনের ঐক্যসাধনের প্রধান উপায় সাহিত্য ; কেননা ভাষার ঐক্যই জাতীয় ঐক্যের মূল। ভারতবর্ষ একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র হইতে পারে কিন্তু বাঙালি যে একটি বিশিষ্ট জাতি তাহার কারণ, এক ভাষার বন্ধনে এ দেশের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম, ব্রাহ্মণ শূদ্র হিন্দু মুসলমান সকলেই আবদ্ধ। সকল প্রকার স্বার্থের বন্ধনের অপেক্ষা ভাষার বন্ধন দৃঢ়। এ বন্ধন ছিন্ন করিবার শক্তি কাহারো নাই, কেননা ভাষা অশরীরী। শব্দ বহির্জগতে ক্ষণস্থায়ী কিন্তু মনোজগতে চিরস্থায়ী। এই চিরস্থায়ী ভিত্তির উপরই আমরা সরস্বতীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করি।

৫

যে সভার বিষয় পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি সেই সভাতে এই রাজশাহি শহরে রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেন যে, আমাদের স্কুল-কলেজে বঙ্গভাষার সম্যক চর্চা হওয়া একান্ত কর্তব্য এবং আমি সে প্রস্তাবের সমর্থন করি। বঙ্গসন্তানের শিক্ষা যতদূর সম্ভব বঙ্গভাষাতেই হওয়া সঙ্গত, এরূপ প্রস্তাব সে যুগের শিক্ষিত লোকদের মনঃপুত হয় নাই। এ প্রস্তাব শুনিয়া অনেকে হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই, অনেকে আবার অসম্ভবরূপে বিরক্তও হইয়াছিলেন। এ প্রস্তাবের প্রতি যে সেকালে কতদূর অবজ্ঞা দেখানো হইয়াছিল তাহার প্রমাণ, প্রকাশ্যে কেহ এ কথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাও আবশ্যক মনে করেন নাই। কবির কবিত্ব এবং বিদূষকের ভাঁড়ামি সুবুদ্ধি চিরকালই হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। আজ মাতৃভাষার চর্চা করিতে বলিলে কাহারো ধৈর্যচ্যুতি হয় না, কেননা ইতিমধ্যে সে ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কোণে একটুখানি স্থান লাভ করিয়াছে। এমনকী, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পাষাণমূর্তির পাদপীঠে এই শিলালিপি উৎকীর্ণ করা হইয়াছে তাঁহার যত্নে এবং তাঁহার চেষ্টায়—The mother's tongue has been put in the step-mother's hall, অর্থাৎ বিমাতার আলয়ে মাতার রসনা স্থাপিত হইয়াছে। দেশসুদ্ধ লোক ইহা গৌরবের কথা মনে করিতেছেন। কিন্তু বিমাতার মন্দিরে মাতৃভাষা যে অদ্যাপি যথাযোগ্য স্থান লাভ করেন নাই, ওই বিমাতৃভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপিই তাহার পরিচয়। এবং উক্ত লিপি ইহাও প্রমাণ করিতেছে যে, ভাষাসম্বন্ধেও আত্মবশ হওয়াই সুখের এবং পরবশ হওয়াই দুঃখের কারণ। সত্য কথা এই যে, মাতৃভাষার সাহায্যেই আমরা যথার্থ ভাষাজ্ঞান লাভ করি এবং সে জ্ঞানের অভাবে আমরা পরভাষাও যথার্থরূপে আয়ত্ত করিতে পারি না। যেদিন আমাদের সকল বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা প্রাধান্য লাভ করিবে এবং ইংরেজি ভাষা দ্বিতীয় আসন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে সেইদিন বঙ্গসন্তান যথার্থ শিক্ষালাভের অধিকারী হইবে।

একদিন যেমন বাংলা পড়িতে বলিলে অনেকে মনে প্রমাদ গনিতেন, আজ তেমনি বাংলা লিখিতে বলিলে অনেকে মনে প্রমাদ গনেন। সেকালে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, আমরা নবশিক্ষার আভিজাত্য নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছি ; একালে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, আমরা নবসাহিত্যের আভিজাত্য নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমাদের জাতীয় ভাষা এত হেয় যে, তাহার স্পর্শে আমাদের শিক্ষাদীক্ষা সব মলিন হইয়া যায়, এ কথা বলায় বাঙালি অবশ্য তাঁহার আভিজাত্যের পরিচয় দেন না, পরিচয় দেন শুধু তাঁহার বিজাতীয় নবশিক্ষার। যে কারণেই হউক, অনেকে যে, মাতৃভাষার পক্ষপাতী নহেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমি এই উপলক্ষ্যেই পাইয়াছি। যেদিন আমি এই সভার সভাপতি নির্বাচিত হই সেদিন আমার কোনো শুভার্থী বন্ধু আমাকে সতর্ক করিয়া

দেন যে, এ সভাস্থলে 'বীরবলি ঢং চলবে না।' যে-কোনো সভাতেই হউক না কেন, বিদূষকের আসন যে সভাপতির আসনের বহু নিম্নে সে জ্ঞান যে আমার আছে তাহা অবশ্য আমার বন্ধুর অবিদিত ছিল না। অপর পক্ষে আমার উপর তাঁহার এ ভরসাটুকুও ছিল যে, এই সুযোগে আমি এই উচ্চ আসন হইতে সভার গাত্রে বীরবলিক অ্যাসিড নিক্ষেপ করিব না। আসলে তিনি এক্ষেত্রে আমাকে বীরবলের ভাষা ত্যাগ করিতেই পরামর্শ দিয়াছিলেন, কেননা সে ভাষা আটপহুরে, পোশাকি নয়। সভ্যসমাজে উপস্থিত হইতে হইলে সমাজসম্মত ভদ্রবেশ ধারণ করাই সঙ্গত, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সে বেশ যতই অনভ্যস্ত হউক না কেন। আমি তাঁহার পরামর্শ অনুসারে 'পররুচি পরনা', এই বাক্য শিরোধার্য করিয়া এ যাত্রা সাধুভাষাই অঙ্গীকার করিয়াছি। কেননা সাধুভাষা যে ধোপদুরস্ত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ইহাতে একটুও রং নাই এবং অনেকখানি মাড় আছে, ফলে ইহা স্বতঃই ফুলিয়াও উঠে এবং খড়খড়ও করে। আশাকরি, এ সন্দেহ কেহ করিবেন না যে, এই বেশপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার মতেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সময়োচিত বেশ ধারণ করা আমাদের সমাজের সনাতন প্রথা। আমরা কৈশোরের প্রারম্ভে অন্তত তিন দিনের জন্যও কর্ণে সুবর্ণকুণ্ডল এবং দেহে গৈরিক বসন ধারণ করিয়া মুণ্ডিতমস্তকে ঝুলি-স্কন্ধে দণ্ডহস্তে নগ্নপদে ভিক্ষা মাগি। এই আমাদের প্রথম সংস্কার। তাহার পর যৌবনের প্রারম্ভে অন্তত এক দিনের জন্যও আমরা রাজবেশ ধারণ করিয়া তক্ত-রাঙায় চড়িয়া ঢাকঢোল বাজাইয়া পাত্রমিত্র-সমভিব্যাহারে কনে নামক একটি অবলা প্রাণীর গৃহাভিমুখে রণযাত্রা করি। ইহাই আমাদের দ্বিতীয় সংস্কার। আমরা যখন রাজাও সাজিতে জানি, ব্রহ্মচারীও সাজিতে জানি, তখন সভ্য সাজা তো আমাদের পক্ষে অতি সহজ। জীবনে সভ্যতার সাজ খোলাই কঠিন, পরা সহজ।

৬

ভাষা সাহিত্যের মূল উপাদান, সুতরাং সাহিত্য পরিষদে ভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। লেখকেরা ভাষার সৌন্দর্যের দ্বারাই পাঠকের মনোরঞ্জন করেন এবং ভাষার শক্তির দ্বারাই পাঠকের মন হরণ করেন। কাজেই কোনো লেখক আর সাধ করিয়া শ্রীহীন এবং শক্তিহীন ভাষা ব্যবহার করেন না। আমরা যে লেখায় মৌখিক ভাষার পক্ষপাতী তাহার কারণ, আমাদের বিশ্বাস, আমাদের মাতৃভাষা রূপে-যৌবনে তথাকথিত সাধুভাষা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য কথা আমি নানা সময়ে নানা স্থানে নানা ভাবে প্রকাশ করিয়াছি। আত্মমত সমর্থনের জন্য কখনো-বা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, বিরুদ্ধমত খণ্ডনের জন্য কখনো-বা তাহার উপর বিদ্রুপবাণ বর্ষণ করিয়াছি। এ স্থলে সেসকল কথার পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কেননা, পুনরুক্তি ওকালতিতে যে

পরিমাণে সার্থক, সাহিত্যে সেই পরিমাণে নিরর্থক।

আপাতত আমি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে এই সাধুভাষার জন্মবৃত্তান্তের পরিচয় দিতেছি, তাহা হইতেই আপনারা অনুমান করিতে পারিবেন যে ইহার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার চেষ্টা কেবলমাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা না কী আর কিছু।

বাংলার প্রাচীন সাহিত্য আছে কিন্তু সে সাহিত্য পদ্যে রচিত, গদ্যে নয়। আজ প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে আমাদের গদ্যসাহিত্য জন্মলাভ করে, এবং সাধুতা এই সাহিত্যেরই ধর্ম। শতবর্ষ পরমায়ু, বিধির এই নিয়মানুসারে এ সাহিত্যের এখন পরিণত দেহ ত্যাগ করিয়া নবকলেবর ধারণ করা উচিত।

সে যাহা হউক, এ সাহিত্য জাতীয় মন হইতে গড়িয়া উঠে নাই। ইংরেজ রাজপুরুষদের ফরমায়েশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কর্তৃক নিতান্ত অযত্নে ইহা গঠিত হইয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার কালের হিসাব এবং ক্ষমতার হিসাব, দুই হিসাবেই এই শ্রেণির লেখকদিগের অগ্রগণ্য। তাঁহার রচিত প্রবোধ চন্দ্রিকা ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'প্রবোধচন্দ্রিকায়াং প্রথমস্তবকে মুখবন্ধে ভাষাপ্রশংসানাম্ প্রথম কুসুমং'-এর শেষাংশে লিখিত আছে যে :

> গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে কোনো পণ্ডিত প্রবোধ চন্দ্রিকা নামে গ্রন্থ রচিতেছেন।...

বঙ্গভাষা সম্বন্ধে বিদ্যালংকার মহাশয়ের ধারণা কীরূপ ছিল তাহার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়াছেন :

অস্মদাদির ভাষার যুগপৎ বৈখরীরূপতামাত্র প্রতীতি সে উচ্চারণক্রিয়ার অতিশীঘ্রতা প্রযুক্ত উপর্যধোভাবাবস্থিত কোমলতর-বহুল-কমলদল সূচিবেধন ক্রিয়ার মতো। এতদ্রূপে প্রবর্তমান সকল ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষা উত্তমা, বহুবর্ণময়ত্বপ্রযুক্ত একদ্ব্যক্ষর পশুপক্ষী ভাষা হইতে বহুতরাক্ষর মনুষ্যভাষার মতো ইত্যনুমানে সংস্কৃত ভাষা সর্বোত্তমা ইহা নিশ্চয়।

উক্ত ভাষা যে অস্মদাদির ভাষা নহে, বলা বাহুল্য। এবং এই ভাষায় অভিনব যুবক সাহেবজাতেরা যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে কোনোই দুঃখ নাই ; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, অভিনব যুবক বঙ্গজাতেরাও যুগে যুগে এইরূপ ভাষা উত্তমা ভাষা হিসাবে শিক্ষা করিয়াছেন। কেননা এই রচনাই সাধুভাষার প্রথম সংস্করণ, এবং বিলাতি ছাপাখানার ছাপমারা এই ভাষাই কালক্রমে অল্পবিস্তর রূপান্তরিত হইয়া আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত হইয়াছে। ইহার জন্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলীকে আমি দোষী করি না। তাঁহাদের বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা করিবার কোনোরূপ অভিপ্রায় ছিল না ; কেননা দেশি ভাষায় যে-কোনো রূপ শাস্ত্র রচিত হইতে পারে, ইহা তাঁহাদের ধারণার বহির্ভূত ছিল।

ফলত, এ সকল বিদ্যালংকার মহাশয়ের নিজের রচনা নহে। দণ্ডীর কাব্যাদর্শ প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত পদ্যকে ছন্দোমুক্ত এবং বিভক্তিচ্যুত করিয়া বিদ্যালংকার মহাশয় এই কিম্ভূতকিমাকার গদ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইরূপ রচনায় কোনোরূপ যত্ন কোনোরূপ পরিশ্রমের লেশমাত্রও নিদর্শন নাই। বিদ্যালংকার মহাশয় নিজে কখনোই এরূপ রচনাকে গদ্যের আদর্শ মনে করেন নাই। সংস্কৃত পদ্যের ছন্দঃপাত করিলে তাহা যে বাংলা গদ্যে পরিণত হয়, এরূপ ধারণা যে তাঁহার মনে ছিল, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। কেননা তিনি এক দিকে যেমন সাধুভাষার আদি লেখক, অপর দিকেও তিনি তেমনি চলতি ভাষারও আদর্শ লেখক। নিম্নে তাঁহার চলতি ভাষার নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:

> মোরা চাস্ করিব ফসল পাবো রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো ছেলেপিলাগুণি পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয় সে বছর বড়ো দুঃখে দিন কাটি কেবল উড়িধানের মুড়ি ও মটর মসুর শাক পাত শামুক গুগুলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি খড়কুটা কাটা শুকনা পাতা কঞ্চি তুঁষ ও বিলঘুঁটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি। কাপাস তুলি তুলা করি ফুড়ি পিঁড়ি পাঁইজ করি চরকাতে সুতা কাটি কাপড় বুনাইয়া পরি। আপনি মাটে ঘাটে বেড়াইয়া ফলফুলারিটা যা পাই তাহা হাটে বাজারে মাতায় মোট করিয়া লইয়া গিয়া বেচিয়া পোণেক দশ গণ্ডা যা পাই। ও মিন্‌সা পাড়াপড়সিদের ঘরে মুনিস্ খাটিয়া দুই চারি পোণ যাহা পায় তাহাতে তাঁতির বাণী দি ও তেল লুণ করি কাটনা কাটি ভাড়া ভানি ধান কুড়াই ও সিজাই শুকাই ভানি খুদ কুঁড়া ফেণ আমানি খাই। শাক ভাত পেট ভরিয়া যেদিন খাই সে দিন তো জন্মতিথি।... শীতের দিনে কাঁথা খানি ছালিয়া গুলিকের গায় দি আপনারা দুই প্রাণী বিচালি বিছাইয়া পোয়ালের বিঁড়ায় মাতা দিয়া মেলের মাদুর গায় দিয়া শুই। বাসন গহনা কখন চক্ষেও দেখিতে পাই না যদি কখন পাথরায় খাইতে পাই ও রাঙ্গা তালের পাতা কানে পরিতে ও পুঁতির মালা গলায় পরিতে ও রাঙ সিসা পিতলের বালা তাড় মল খাড়ু গায় পরিতে পাই তবেতো রাজরানি হই। এ দুঃখেও দুরন্ত রাজা হাজা শুকা হইলেও আপন রাজস্বের কড়া গণ্ডা ক্রান্তি বট ধূল ছাড়ে না এক আদ দিন আগে পাছে সহে না। যদ্যপিস্যাৎ কখন হয় তবে তার সুদ দাম দুই বুঝিয়া লয় কড়া কপর্দকও ছাড়ে না। যদি দিবার যোত্র না হয় তবে সানা মোড়ল পাটোয়ারি ইজারদার তালুকদার জমিদারেরা পাইক পেয়াদা পাঠাইয়া হাল যোয়াল ফাল হালিয়া বলদ দামড়া গোরু বাছুর বক্‌না কাঁথা পাতরা চুপড়ি কুলা ধুচনি পর্যন্ত বেচিয়া গোবাড়িয়া করিয়া পিটিয়া সর্বস্ব লয়। মহাজনের দশগুণ সুদ দিয়াও মূল আদায় করিতে পারি না কতো বা সাধ্য সাধনা করি হাতে ধরি পায় পড়ি হাত জুড়ি দাঁতে কুটা করি। হে ঈশ্বর দুঃখির উপরেই দুঃখ, ওরে পোড়া বিধাতা আমাদের কপালে এত দুঃখ লেখিস তোর কি ভাতের পাতে আমরাই ছাই দিয়াছি?

এ ভাষা অস্মদীয় ভাষা হউক আর না হউক, ইহা যে খাঁটি বাংলা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ ভাষা সজীব সতেজ সরল স্বচ্ছন্দ ও সরল। ইহার গতি মুক্ত, ইহার শরীরে

লেশমাত্রও জড়তা নাই। এবং এ ভাষা যে সাহিত্যরচনার উপযোগী, উপরোক্ত নমুনাই তাহার প্রমাণ। এই ভাষার গুণেই বিদ্যালংকার মহাশয়ের রচিত পল্লিচিত্র পাঠকের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। এ বর্ণনাটি সাধুভাষায় অনুবাদ কর, ছবিটি অস্পষ্ট হইয়া যাইবে। অপর পক্ষে বিদ্যালংকার মহাশয়ের ভাষা সম্বন্ধে পূর্বোদ্ধৃত উক্তিটি ভাষার অনুবাদ করো, তাঁহার বক্তব্য কথা সুস্পষ্ট হইয়া আসিবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের পূর্ববর্তী লেখকেরা যদি বিদ্যালংকার মহাশয়ের রচনার এই বঙ্গীয় রীতি অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে কালক্রমে এই ভাষা সুসংস্কৃত এবং পুষ্ট হইয়া আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিত। কিন্তু তাঁহারা বিদ্যালংকার মহাশয়ের গৌড়ীয় রীতিকেই গ্রাহ্য করিয়া তাহাকে সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পণ্ডিতগণের ত্যক্ত দায় আমরা উত্তরাধিকারস্বত্বে লাভ করিয়া অদ্যাপি তাহাই ভোগদখল করিয়া আসিতেছি। প্রবোধ চন্দ্রিকার তৃতীয় স্তবকের কুসুমগুলি মেঠো হইলেও স্বদেশি ফুল। আর প্রথম স্তবকের কুসুমগুলি শুধু কাগজের নয়, তুলোট কাগজের ফুল। আবাদ করিতে জানিলে কাঠগোলাপ বসরাই গোলাপে পরিণত হয়। কিন্তু কালের কবলে ছিন্নভিন্ন বিবর্ণ হওয়া ব্যতীত কাগজের ফুলের গত্যন্তর নাই।

৭

কাহারো কাহারো বিশ্বাস যে, এই দুই ভাষার মিলনসূত্রেই বর্তমান সাধুভাষা জন্মলাভ করিয়াছে। কিন্তু আমার ধারণা অন্যরূপ। বর্ণে ও গঠনে এই দুই ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক জাতীয়, সুতরাং ইহাদের যোগাযোগে কোনোরূপ নূতন পদার্থের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। বহুকাল যাবত এ দুই পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই চর্চা করা হইয়াছিল। একের পরিণতি কালী সিংহ মহাশয়ের মহাভারতে, অপরের পরিণতি তাঁহার হুতোম প্যাঁচার নকশায়। ইহার কারণও স্পষ্ট। হুতোমি ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করা মূর্খতা এবং মহাভারতের ভাষায় সামাজিক নকশা রচনা করা ছন্নতা মাত্র।

যে ভাষা আসলে এক, জোর করিয়া তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এই দুই ভাষা রচিত হয়। সে ভাঙা জোড়া লাগাইবার চেষ্টা বৃথা। আমাদের মৌখিক ভাষা নিছক চাষার ভাষাও নহে, নিটোল সংস্কৃতও নহে। আমাদের মুখের ভাষায় বহু তৎসম শব্দ এবং বহু তদ্ভব শব্দ আছে। দেশীয় শব্দও যে নাই তাহা নহে তবে তাহাদের সংখ্যা এত অল্প যে নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হয় তৎসম নয় তদ্ভব শব্দ বর্জন করিয়া বাংলা লেখার অর্থ ভাষার উপর অত্যাচার করা ; অকারণে অযথারূপে তাহাকে হয় স্ফীত করিয়া তোলা, নয় শীর্ণ করিয়া ফেলা। সুতরাং এ দুই পথের ভিতর কোনো মধ্যপথ রচনা করিবার কোনো আবশ্যকতা ছিল না ; কেননা সে মধ্যপথ তো চিরকালই আমাদের মুখস্থ ছিল। বঙ্গভাষা সংস্কৃতের ভার কতদূর সয়, মৌখিক ভাষার প্রতি কর্ণপাত করিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এ জ্ঞান আর কাহারো থাক আর নাই থাক, রামমোহন রায়ের ছিল।

৮

তিনি তাঁহার বেদান্তগ্রন্থের (খ্রি. ১৮১৫) 'অনুষ্ঠানে' লিখিয়াছেন যে :

প্রথমত, বাংলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্বাহের যোগ্য কেবল কতকগুলি শব্দ আছে। এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা হইতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত, এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিংবা কাব্য বর্ণনে আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের (sentence) অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তর্জমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয়। অতএব বেদান্তশাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এই নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। যাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিৎও থাকিবেক আর যাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধুভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক....

সকল দেশেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথোপকথনের ভাষার যে ঐশ্বর্য আছে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাষায় তাহা নাই। সমাজের নিম্নশ্রেণিস্থ লোকেরা ধনে ও মনে সমান দরিদ্র। তাহাদের জ্ঞান নিতান্ত সীমাবদ্ধ এবং ভাষাও সংকীর্ণ। যদি ভদ্রসমাজের মৌখিক ভাষা সাধুভাষা হয়, তাহা হইলে সাধুভাষাই সাহিত্যের একমাত্র উপযোগী ভাষা। এ স্থলে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, লৌকিক ভাষা এই সাধুভাষার অন্তর্ভুক্ত, বহির্ভূত নয়। রামমোহন রায় যাহাকে 'গৃহব্যাপার নির্বাহের যোগ্য' শব্দ বলেন সেই শব্দসমূহই সকল ভাষার মূলধন।

রামমোহন রায় বলিয়াছেন যে, এ ভাষা সংস্কৃতের অধীন। এ কথাও আমরা মানিতে বাধ্য। কিন্তু সে অধীনতা অভিধানের অধীনতা, ব্যাকরণের নয় ; এই সত্যটি মনে রাখিলে ব্যাকরণ আমাদের নিকট বিভীষিকা হইয়া দাঁড়ায় না। ভাষার স্বাতন্ত্র্য যে তাহার গঠনের উপর নির্ভর করে এ সত্য রামমোহন রায়ের নিকট অবিদিত ছিল না। তাঁহার মতে—

ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় শব্দের বর্ণগত নিয়ম ও বৈলক্ষণ্যের প্রণালী ও অন্বয়ের রীতি যে গ্রন্থের অভিধেয় হয়, তাহাকে সেই সেই দেশীয় ভাষার ব্যাকরণ বলা হয়।

অতএব এক ভাষা অপর ভাষার ব্যাকরণের অধীন হইতে পারে না।

আমরা যখন দৈনিক জীবনের অন্নবস্ত্রের সুখদুঃখের অতিরিক্ত কোনো বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তখন সংস্কৃত অভিধানের আশ্রয় লওয়া ব্যতীত আমাদের উপায়ান্তর নাই। নানা ভাষার মধ্যে শব্দের পরস্পর আদানপ্রদান আবহমানকাল সভ্যসমাজে চলিয়া আসিতেছে। আবশ্যকমতো ওইরূপ শব্দ আত্মসাৎ করায় ভাষার কান্তি পুষ্ট হয়, স্বরূপ নষ্ট হয় না। নিতান্ত বাধ্য না হইলে একাজ করা উচিত নয়, কেননা পরভাষার শব্দ আহরণ

কিংবা হরণ করা সর্বত্র নিরাপদ নহে। শব্দের আভিধানিক অর্থ তাহার সম্পূর্ণ অর্থ নয়, আভিধানিক অর্থে ভাবের আকার থাকিলেও তাহার ইঙ্গিত থাকে না। লৌকিক শব্দের আদ্যোপান্ত বর্জন এবং অপর ভাষার অন্বয়ের অনুকরণেই ভাষার জাতি নষ্ট হয়। মৌখিক ভাষার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিবার জো নাই। সুতরাং শিক্ষিত লোকের সকল অত্যাচার লিখিত ভাষাকেই নীরবে সহ্য করিতে হয়।

রামমোহন রায় যে মৌখিক ভাষার উপরেই তাঁহার রচনার ভাষা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার ব্যবহৃত পদসকল অবৈধসন্ধিবদ্ধ কিংবা সমাসবিড়ম্বিত নহে। তিনি জানিতেন যে—

সংস্কৃত সন্ধিপ্রকরণ ভাষায় উপস্থিতি করিলে, তাবৎ গুণদায়ক না হইয়া বরঞ্চ আক্ষেপের কারণ হয়।

সমাস সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে,

এইরূপ পদ গৌড়ীয় ভাষাতে বাহুল্যমতে ব্যবহারে আইসে না।

তাঁহার মতে 'হাতভাঙা' 'গাছপাকা' প্রভৃতি পদই বাংলা সমাজের উদাহরণ। তাঁহার পরবর্তী লেখকেরা যদি এই সত্যটি বিস্মৃত না হইতেন তবে তাঁহারা বাংলা সাহিত্যকে সংস্কৃতের জাগ দিয়া পাকাইতে চাহিতেন না এবং হাতভাঙা পরিশ্রম করিয়া দাঁতভাঙা সমাসের সৃষ্টি করিতেন না। তিনি মৌখিক ভাষার সহজ সাধুত্ব গ্রাহ্য করিয়াছিলেন বলিয়া বানান-সমস্যারও অতি সহজ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে খাঁটি সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত রীতি অনুসারেই লিখিত হওয়া কর্তব্য এবং তদ্ভব ও দেশীয় শব্দের বানান তাহার উচ্চারণের অনুরূপ হওয়া কর্তব্য। অর্থাৎ যে স্থলে শ্রুতিতে-স্মৃতিতে বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে সংস্কৃত শব্দ সম্বন্ধে স্মৃতি মান্য এবং বাংলা শব্দ সম্বন্ধে শ্রুতি মান্য। রামমোহন রায় বঙ্গসাহিত্যের যে সহজ পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন সকলে যদি সেই পথের পথিক হইতেন তাহা হইলে আমাদের কোনোরূপ আক্ষেপের কারণ থাকিত না।

কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত রীতি যে বঙ্গসাহিত্যে গ্রাহ্য হয় নাই তাহার প্রধান কারণ তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদিগের রচনাপদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। এ গদ্য, আমরা যাহাকে modern prose বলি, তাহা নয়। পদে পদে পূর্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়। সুতরাং আমাদের দেশে ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যে পণ্ডিতি যুগের অবসান হইল এবং ইংরেজি যুগের সূত্রপাত হইল। ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শেই আমরা বঙ্গসাহিত্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মিল্টন না পড়িলে বাঙালি *মেঘনাদবধ* লিখিত না, স্কট না পড়িলে *দুর্গেশনন্দিনী* লিখিত না এবং বায়রন না পড়িলে *পলাশীর যুদ্ধ* লিখিত না। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্য ইংরেজি সাহিত্যের একান্ত অধীন হইয়া পড়িল। ফলে বঙ্গসাহিত্য তাহার স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ আবার হারাইয়া বসিল। এই ইংরেজিনবিশ লেখকদিগের

হস্তে বঙ্গভাষা এক নূতন মূর্তি ধারণ করিল। সংস্কৃতের অনুবাদ যেমন পণ্ডিতদিগের মতে সাধুভাষা বলিয়া গণ্য হইত, ইংরেজির কথায় কথায় অনুবাদ তেমনি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট সাধুভাষা বলিয়া গণ্য হইল। এই অনুবাদের ফলে এমন বহু শব্দের সৃষ্টি করা হইল যাহা বাঙালির মুখেও নাই এবং সংস্কৃত অভিধানেও নাই। এবং এইসকল কষ্টকল্পিত পদই এখন বঙ্গসাহিত্যের প্রধান সম্বল। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এইসকল নব শব্দ গড়িবার কোনোই আবশ্যকতা ছিল না। সংস্কৃত দর্শনে বিজ্ঞানে কাব্যে অলংকারে যথেষ্ট শব্দ আছে, যাহার সাহায্যে আমরা আমাদিগের নবশিক্ষালব্ধ সকল মনোভাব বঙ্গভাষার জাতি ও প্রকৃতি রক্ষা করিয়া অনায়াসে ব্যক্ত করিতে পারি। আমরা তথাকথিত সাধুভাষার বিরোধী, কেননা আমাদের বিশ্বাস বঙ্গভাষা ব্রাত্য-সংস্কৃতও নহে, শাপভ্রষ্ট ইংরেজিও নহে। এই কারণে আমরা মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, কারণ সে ভাষা সহজ সরল সুঠাম এবং সুস্পষ্ট।

সুতরাং আমাদের এ চেষ্টা যে মাতৃভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক, এ অভিযোগের কোনোরূপ বৈধ কারণ নাই। যদি কেহ বলেন যে, 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ', সুতরাং সে পথ অনুসরণ না করা ধৃষ্টতামাত্র, তাহার উত্তরে আমরা বলিব, বঙ্গসাহিত্যের মহাজনেরা যুগভেদ এবং শিক্ষাভেদ অনুসারে নানা বিভিন্ন পথের পথিক। দর্শনের ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রেও মার্গভেদ আছে; আমাদের পূর্ববর্তী মহাজনেরা এই ভাষা লইয়া এক্সপেরিমেন্ট করিয়াছেন; সুতরাং নূতন এক্সপেরিমেন্ট করিবার অধিকার আমাদের আছে। গদ্যসাহিত্যের বয়স এখন সবে একশো বৎসর, কাজেই তাহার পরীক্ষার বয়স আজও পার হয় নাই। টোলের ও কলেজের বাহিরে যে ভাষা মুখে মুখে চলিতেছে, সে ভাষার অন্তরে কতটা শক্তি আছে সে পরীক্ষা আজ পর্যন্ত করা হয় নাই। আমরা সেই পরীক্ষা করিতে চাই। লোকে বলে, যখন প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে গদ্য ছিল না তখন গত শতাব্দীর গদ্যই আমাদের একমাত্র আদর্শ ছিল। আমরা নিত্য যে ভাষায় কথাবার্তা কহি তাহারই নাম যে গদ্য, এ সত্য মোলিয়েরের নাটকের নিরক্ষর ধনী বণিকের জানা ছিল না, কিন্তু আমাদের আছে। সাহিত্যে সেই সনাতন আদর্শই আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

আমি ভাষা সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম তাহার কারণ, এইরূপ সভাসমিতিতে সাহিত্যের যাহা সাধারণ সম্পত্তি তাহার আলোচনা এবং তাহার বিচার হওয়াই সংগত।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে ভাষার নাম 'কাব্যশরীর'। কিন্তু এ শরীর ধরাছোঁয়ার মতো পদার্থ নয় বলিয়া যাঁহারা এই পৃথিবীতে শুধু স্থূলের চর্চা করেন, সাহিত্যের প্রতি তাঁহাদের চিরদিনই একটি আন্তরিক অবজ্ঞা থাকে, এবং ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট অর্বাচীন

বঙ্গসাহিত্যই বিশেষ করিয়া অবজ্ঞার সামগ্রী হইয়াছিল। এই বিরাট কুসংস্কারের সহিত সম্মুখসমরে প্রবৃত্ত হইবার শক্তি ও সাহস পূর্বে ছিল কেবলমাত্র দু-চারিজন ক্ষণজন্মা পুরুষের। কিন্তু সাহিত্যচর্চা যে জীবনের একটি মহৎ কাজ, এ ধারণা যে আজ বাঙালির মনে বদ্ধমূল হইয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই সম্মিলনী। আমাদের নবশিক্ষার প্রসাদে আমরা জানি যে, সাহিত্য জাতীয় জীবন গঠনের সর্বপ্রধান উপায়, কেননা সে জীবন মানবসমাজ মনের ভিতর হইতে গড়িয়া ওঠে। মানুষের মন সতেজ ও সজীব না হইলে মানবসমাজের ঐশ্বর্যশালী হইতে পারে না। যে মনের ভিতর জীবনীশক্তি আছে তাহার স্পর্শেই অপরের মন প্রাণলাভ করে এবং মানুষে একমাত্র শব্দের গুণেই অপরের মন স্পর্শ করিতে পারে। অতএব সাহিত্যই একমাত্র সঞ্জীবনী মন্ত্র। আমাদের সামাজিক জীবনের দৈন্য জগৎবিখ্যাত এবং সে দৈন্য দূর করিবার জন্য আমরা সকলেই ব্যগ্র। এই কারণেই শিক্ষিত লোকমাত্রেরই দৃষ্টি আজ সাহিত্যের উপর বদ্ধ। সাহিত্যই আমাদের প্রধান ভরসাস্থল বলিয়াই বর্তমান সাহিত্যের প্রতি আমাদের অসন্তোষও নানা আকারে প্রকাশ পাইতেছে। এ অসন্তোষের কারণ এই যে, লোকে সাহিত্যের নিকট যতটা আশা করে, প্রচলিত সাহিত্য সে আশা পূর্ণ করিতে পারিতেছে না। কাজেই নানা দিক হইতে নানাভাবে নানা ভঙ্গিতে নানা লোকে এই শিশু সাহিত্যের উপর আক্রমণ করিতেছেন। এইসকল সমালোচনার মোটামুটি পরিচয় নেওয়াটা আবশ্যক।

১৫.

আজ আমরা সকলে মিলিয়া এ সাহিত্যের জাতিবিচার করিতে বসিয়াছি। এ নবপণ্ডিতের বিচার, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বিচার নহে। কেননা বঙ্গসাহিত্য স্বজাতীয় কি বিজাতীয়, সে বিচার ইউরোপীয় শাস্ত্রের অধীন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ইউরোপীয় সাহিত্যের পুষ্পচয়ন করি আর না করি, ইউরোপীয় শাস্ত্রের পল্লব যে গ্রহণ করি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের নব সমালোচকেরা প্রধানত দুই শাখায় বিভক্ত। এক দলের অভিযোগ এই যে, নবসাহিত্য জাতীয় নয়, কেননা তাহা প্রাচীন নয়। অপর দলের অভিযোগ এই যে, বর্তমান সাহিত্য জাতীয় নয়, কেননা তাহা লৌকিক নহে।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় গত দুই বৎসর ধরিয়া লোকারণ্যে এই বলিয়া রোদন করিতেছেন যে, দেশের সর্বনাশ হইল, সুকুমার সাহিত্য মারা গেল। তাঁহার আক্ষেপ এই যে, তাঁহার কথায় কেহ কান দেয় না, কেননা বাঙালি আজ তাঁহার মতে :

মস্তিষ্কের তীব্র চালনাগুণে পাইতেছে জ্ঞানবিজ্ঞান বিদ্যাদর্শন পুরাবৃত্ত ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব জীবতত্ত্ব ; হারাইতে বসিয়াছে দয়ামায়া শ্রদ্ধাভক্তি স্নেহমমতা কারুণ্যআতিথ্য আনুগত্য শিষ্যত্ব। আমরা কোমলপ্রাণ বাঙালি, আমাদের আশঙ্কা হয়, আমরা কোমলতা হারাইয়া

বুঝি-বা সর্বস্ব হারাইয়া ফেলি।

বাঙালির হৃদয়ের রক্ত সব যে মাথায় চড়িয়া গিয়াছে, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অবশ্য বাঙালির জীবনসংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তবে মস্তিষ্কের চালনা ব্যতীত এ যুগে যে সাহিত্য রচনা করা যাইতে পারে না, এ কথা নিশ্চিত। সরকারমহাশয় প্রাচীন সাহিত্যের পক্ষপাতী, কেননা তাঁহার বিশ্বাস, অতিনিকট অতীতে।

বাঙালি গ্রামে গ্রামে পালোয়ান বাগদি গোপ চণ্ডাল প্রহরী রাখিয়া আপনাদের বিত্তস্বত্ব রক্ষা করিত এবং তাহার প্রধান কাজ ছিল আহারান্তে খড়ের চণ্ডীমণ্ডপে খুঁটি হেলান দিয়া মুটকলমে ইতিহাস পুরাণ অবলম্বনে পুঁথি লেখা।

এভাবে অবশ্য আমরা পুঁথি লিখিতে পারি না, কেননা আমাদের বিত্ত উপার্জন করিতে হয় বলিয়া আমরা আহারান্তে আপিসে যাই এবং পেন-কলমে ইংরেজি ভাষাতে ছাইপাঁশ কত কী লিখি। কিন্তু সরকারমহাশয় কোথা হইতে এ সত্য সংগ্রহ করিলেন যে পলাশীযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে বাংলা আলস্যের স্বর্গ ছিল ? যাঁহারা পুরাতত্ত্বের সন্ধানে ফেরেন, তাঁহারা তো অদ্যাবধি এ বাংলার সাক্ষাৎ লাভ করেন নাই। বোধ হয় সেই কারণেই ইতিহাস সরকারমহাশয়ের কোমল বাঙালিপ্রাণে এত ব্যথা দেয়। 'বাংলা-সাহিত্যে যে ইতিহাসের পর দর-ইতিহাস, তাহার পর ছে-ইতিহাস দাখিল হইতেছে, আবার ইদানীং সওয়ালজবাবও যে আরম্ভ হইয়াছে' ইহা অক্ষয়বাবুর নিকট, অর্থাৎ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের নিকট, একেবারেই অসহ্য। কেননা এ শ্রেণির ইতিহাসরচনার জন্য মস্তিষ্কচালনার প্রয়োজন আছে। অপর পক্ষে সরকারমহাশয়ের রচিত পুরাবৃত্ত কেবলমাত্র কল্পনা-চালনার দ্বারাই সৃষ্ট হয় এবং তাহার গঠনে কিংবা পঠনে বাঙালির কোমলতা হারাইবার কোনো আশঙ্কা নাই। আমি সরকারমহাশয়ের মতামত এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, কেননা নানা দিক হইতে ইহার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এ মত সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এ সকল কথার মূল্য যে কত, তাহা নির্ধারণ করিতে কোনোরূপ মস্তিষ্কচালনার আবশ্যকতা নাই। বঙ্গসাহিত্য যতই শিশু হউক না কেন আমার বিশ্বাস, এরূপ আক্রমণে তাহা মারা যাইবে না।

১১

অপর শ্রেণির সমালোচকেরা আধুনিক কাব্যসাহিত্যের বিরোধী। ইঁহাদের মতে সে সাহিত্য নেহাৎ বাজে, কেননা তাহা সমাজের কোনো কাজে লাগে না। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্য কাব্যসকল যদি সরকারমহাশয়ের বর্ণিত আলস্যজাত সুকুমার সাহিত্য হয়, তাহা হইলে সে কাব্য যে সম্পূর্ণ নিরর্থক এবং সর্বথা উপেক্ষণীয় সে বিষয়ে আর দ্বিমত নাই। সরকারমহাশয়ের অভিযোগ এই যে, বর্তমান সাহিত্য জাতীয় চরিত্রের অবনতি ঘটাইতেছে ; ইঁহাদের অভিযোগ এই যে, সে সাহিত্য জাতীয় চরিত্রের উন্নতিসাধন করিতেছে

না। এ সাহিত্য লোকশিক্ষার সহায় নয়, কেননা ইহা লৌকিক নয়, অতএব ইহা জাতীয় জীবন গঠনের উপযোগী নয়।

এ যুগের সাহিত্য যে লৌকিক নহে তাহা সকলেই জানেন, কেননা এ সাহিত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে-গড়া সাহিত্য। আমাদের সাহিত্য যদি এই কারণে নিরর্থক হয়, তাহা হইলে তাহার এই সমালোচনা আরও বেশি নিরর্থক। শিক্ষিত লোক এবং অশিক্ষিত লোকের মনের প্রভেদ বিস্তর। এই পার্থক্য যদি দোষের হয়, তাহা হইলে এ দেশে শিক্ষার পাট উঠাইয়া দেওয়া উচিত। শিক্ষিত লোকের রচিত সাহিত্যে শিক্ষিত মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইবে। পৃথিবীর সকল দেশের সকল যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য এই শ্রেণিরই সাহিত্য। *শকুন্তলা, হ্যামলেট, ডিভাইন কমেডি* প্রভৃতি সাহিত্য স্বল্পবুদ্ধি এবং অল্পজ্ঞানের যোগাযোগে রচিত হয় নাই। মনেরও উপর্যুপরি নানা লোক আছে এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মানসিক উর্ধ্বলোকেরই বস্তু। জাতির মনকে লোক হইতে লোকান্তরে লইয়া যাওয়াই সাহিত্যের ধর্ম। কামলোক হইতে রূপলোকে উঠিবার জন্য জনসাধারণের পক্ষে শিক্ষার আবশ্যক, সাধনার আবশ্যক। কবি যাহা দান করেন, তাহা গ্রহণ করিবার জন্য অপরের উপযুক্ত শক্তি থাকা আবশ্যক। মনোজগতে অমনি-পাওয়া বলিয়া কোনো পদার্থ নাই, সবই দেওয়া-নেওয়ার জিনিস। এ যুগে এ দেশে যদি এমন কাব্য রচিত হইয়া থাকে যাহা সকল দেশের শ্রেষ্ঠ মনের পূজার সামগ্রী, তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্যের যে-কোনো সার্থকতা নাই, এরূপ কথার কোনো অর্থ থাকে না। বিশ্বমানবের কাছে আমাদের কাব্যসাহিত্য যে সে মর্যাদালাভ করিয়াছে তাহা তো সর্বজনবিদিত। ইউটিলিটে- রিয়ানিজমের সাহায্যে সাহিত্যের মূল্য নির্ণয় করা যায় না। সাহিত্যের অবনতির দ্বারা জাতীয় উন্নতি সাধন করা যায় না। *ফাউস্টের* প্রথমভাগ *শিশুশিক্ষা* জাতীয় ভাগ নহে বলিয়া জার্মান পেট্রিয়টিজম্ সে কাব্যের বিরুদ্ধে কখনো খড়্গহস্ত হয় নাই। প্রতিভাশালী লেখকেরা যে লোকশিক্ষক নহেন তাহার কারণ, তাঁহারা দুনিয়ার শিক্ষকদিগের শিক্ষক।

১২

লোকরচিত কিংবা লোকপ্রিয়, এ দুই অর্থেই লৌকিক সাহিত্য গান ও গল্পের সাহিত্য। সে গানের বিষয় দৈনিক জীবনের সুখ ও দুঃখ, এবং সে গল্পের বিষয় দৈনিক জীবনের বহির্ভূত আশ্চর্যকর ঘটনাবলি। গল্প ও গুজবে মিলিয়া যে আজগুবি ব্যাপারের সৃষ্টি হয় তাহাই জনসাধারণের চিরপ্রিয়। গীতিকবিতা এবং রূপকথাই লোকসাহিত্যের চিরসম্বল। এ সাহিত্য আমাদের নিকট তুচ্ছ নয়, কেননা আমরাও মানুষ এবং এইরূপ সুখদুঃখের আমরাও সমান অধীন। গল্প শুনিতে আমরাও ভালোবাসি এবং রূপকথার মায়া আমরাও কাটাইতে পারি না। আমাদের রচিত উপন্যাস-নবন্যাসাদিতেও যদি রূপ না থাকে তাহা হইলে তাহা কথা বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র যতই বিস্তৃত হউক,

আমাদের কল্পনা তাহার সীমা লঙঘন করিতে সদাই উৎসুক। আমাদের দর্শন-বিজ্ঞানের কথাও কতক অংশে স্বরূপকথা, কতক অংশে রূপকথা ; এবং এই কারণেই তাহা মানুষের শুধু মন নয় হৃদয়ও আকর্ষণ করে। ইভলিউশনের ইতিহাসের ন্যায় বিচিত্র কথা কোনো রাজারানীর উপাখ্যানেও নাই। আমাদের বিজ্ঞানের আলয় আমাদের নিকটেও এক হিসাবে জাদুঘর। জনসাধারণের সহিত কৃতবিদ্য লোকের প্রভেদ এই যে, তাহাদের নিকট তাহা জাদুঘর ব্যতীত আর কিছুই নয়। বৈজ্ঞানিক কৌতূহল এবং অবৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ভিতর ব্রাহ্মণশূদ্র-প্রভেদ। শূদ্র-সাহিত্যে দ্বিজের সম্পূর্ণ অধিকার আছে কিন্তু দ্বিজ-সাহিত্যে শূদ্রের অধিকার আংশিক মাত্র। শূদ্রের শাস্ত্রে অধিকার নাই, অধিকার আছে শুধু পুরাণ-ইতিহাসে। কারণ এ সাহিত্য গীত হয় এবং ইহা অপূর্ব জল্পনা এবং অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। সাহিত্যচর্চায় যে অধিকারীভেদ আছে তাহা অস্বীকার করায় সত্যের অপলাপ করা হয়। আধুনিক বঙ্গসাহিত্য লৌকিক না হইলেও যে লোকায়ত্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান এবং বঙ্কিমের গল্প জনসাধারণের আদরের সামগ্রী হইতে পারে, কিন্তু সমালোচকদের আলোচনা-গবেষণা-প্রবন্ধ-নিবন্ধাদিই তাহাদের বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য।

১৩

পূর্বোক্ত সমালোচকেরা বঙ্গসাহিত্যের যথার্থ কীর্তিগুলির প্রতিই বিমুখ। যদি বঙ্গসাহিত্যের গৌরব করিবার মতো কোনো বস্তু থাকে, তাহা হইলে তাহা বঙ্কিমের উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের নব্য ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ের আবিষ্কৃত বঙ্গদেশের পুরাতত্ত্ব। কিন্তু এই জাতীয় সাহিত্যই তাঁহাদের নিকট অগ্রাহ্য, কেননা তাহা জাতীয় নয়। কিন্তু যাহা, জাতীয় হউক বা বিজাতীয় হউক, সাহিত্যই নয় তাহার বিরুদ্ধে তাঁহারা কোনোরূপ উচ্চবাচ্য করেন না। সর্বাঙ্গসুন্দর সাহিত্য রচনা করিবার রহস্য ও কৌশল যদি সমালোচকদিগের জানা থাকে, তবে তাঁহারা স্বয়ং যে সে-সাহিত্য রচনা করেন না ইহা বড়োই দুঃখের বিষয়। কেননা বঙ্গসাহিত্যের দৈন্যই এই যে, দু-একটি প্রথম শ্রেণির লেখক বাদ দিলে বাদবাকি তৃতীয়-চতুর্থ-শ্রেণিভুক্তও নন। ইউরোপের যে-কোনো দেশের হউক, বর্তমান সাহিত্যের সহিত তুলনা করিলে এ সত্য সকলের নিকটই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে। এ দৈন্য ইচ্ছা করিলেই আমরা ঘুচাইতে পারি। সাহিত্যের দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণি অধিকার করিবার জন্য অসাধারণ প্রতিভা চাই না, চাই শুধু যত্ন এবং পরিশ্রম। দণ্ডী বলিয়াছেন :

> ন বিদ্যতে যদ্যপি পূর্ববাসনা
> গুণানুবন্ধি প্রতিভানমদ্ভুতম্।
> শ্রুতেন যত্নেন চ বাগুপাসিতা
> ধ্রুবং করোত্যেব কমপ্যনুগ্রহম্।।

অর্থাৎ অদ্ভুত প্রতিভা এবং প্রাক্তন সংস্কারের অভাব সত্ত্বেও আমরা যদি সযত্নে সরস্বতীর উপাসনা করি, তাহা হইলে আমরা তাঁহার কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইব না।

বাঙালি জাতির হৃদয়ে রস আছে মস্তিষ্কে তেজ আছে, তবে যে আমাদের সাধারণ সাহিত্য যথোচিত রস ও শক্তি-বঞ্চিত তাহার জন্য দোষী আমাদের নবশিক্ষা। আমাদের ত্রুটি কোথায় এবং কীসের জন্য, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

মানুষের সকল চিন্তার, সকল ভাবের, একটি না একটি অবলম্বন আছে। বস্তুজ্ঞানের উপরেই সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত, সে বস্তু মনোজগতের হউক আর বহির্জগতেরই হউক। বিদ্যালয়ে আমরা কোনো বিশেষ বস্তুর পরিচয় লাভ করি না, কিন্তু অনেক নাম শিখি। আমরা ইংরেজি ভাষায়, ইংরেজি সাহিত্যে শিক্ষিত হই, অথচ ইংরেজি জীবনের সহিত আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়া দূরে থাকুক, তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ-পরিচয়ও নাই, কাজেই সে শিক্ষার প্রসারে আমরা সঞ্চয় করি শুধু কথা। আমরা কংক্রিটের জ্ঞান হারাই এবং তাহার পরিবর্তে পাই শুধু অ্যাব্‌সট্রাক্‌শনস্। ফুল বলিয়া কোনো পদার্থ জগতে নাই, আছে শুধু ভাষায়। পৃথিবীতে আছে শুধু যূথী জাতী মল্লিকা মালতী প্রভৃতি। বর্ণে গন্ধে আকারে একটি অপরটি হইতে বিশিষ্ট। যতক্ষণ পর্যন্ত ইহারা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ইহারা আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না। হথর্ন লাইলাক জ্যাসমিন ভায়োলেট আমাদের নিকট নামমাত্র। এ নাম আমাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে না, আমাদের মনে কোনোরূপ পূর্বস্মৃতি জাগরূক করে না, কাজেই ফুলমাত্রেই আমাদের নিকট flower হইয়া উঠে। অর্থাৎ অদৃষ্ট বর্ণ, অজ্ঞাত আকার এবং অননুভূত গন্ধের একটি নামাশ্রিত সমষ্টিমাত্র হইয়া দাঁড়ায়। ফলে, ইংরেজি সাহিত্য হইতে আমরা অধিকাংশ স্থলে কতকগুলি জাতিবাচক সম্বন্ধবাচক এবং ভাববাচক শব্দ সংগ্রহ করি। অথচ সে জাতি সে সম্বন্ধ সে ভাব যে কাহার, তাহার কোনো খোঁজ নাই। কাজেই আমরা মানুষের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া মনুষ্যত্বের বিচার করিতে বসি। অথচ পৃথিবীতে মানুষ আছে কিন্তু মনুষ্যত্ব নামক জাতিবাচক শব্দের পশ্চাতে কোনো পদার্থ নাই। সকল বিশেষ্যের সকল বিশেষণ বাদ দিয়াই আমরা সর্বনাম লাভ করি। এই সর্বনামেরও অবশ্য সকল ভাষাতেই স্থান আছে। কিন্তু এরূপ পদের ব্যবহারের সার্থকর্তা সেই স্থলেই আছে যে স্থলে মুহূর্তের মধ্যে আমরা সর্বনামকে ভাঙাইয়া বিশেষ্যে পরিণত করিতে পারি। যে সর্বনাম নামমাত্র, তাহা কেবল অদৃষ্টার্থ ধ্বনিমাত্র। আমরা আমাদের শিক্ষালব্ধ অ্যাব্‌সট্রাক্‌শন্ লইয়া সাহিত্যে কারবার করি বলিয়াই আমাদের লেখায় না আছে দেহ, না আছে প্রাণ। ইউরোপীয় সাহিত্যও আমরা ত্যাগ করিতে পারিব না, আমরা সদলবলে ইউরোপে গিয়া উপনিবেশও স্থাপন করিতে পারিব না। তবে এ রোগের ঔষধ কি? আমার বিশ্বাস, আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ রিয়ালিটির প্রতি মনোযোগ দিলে আমরা এই অ্যাব্‌সট্রাক্‌শনের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইব। অনুভূতিই যে

সকল জ্ঞানের মূল এই সত্যের সম্যক্ উপলব্ধি না হইলে আমাদের রচিত সাহিত্য অর্থহীন শব্দাড়ম্বরসার হইতে বাধ্য। আমাদের দেশেও ফুলফল গাছপালা আছে, নরনারী ধনীদরিদ্র আছে। এইসকল বস্তুবিশেষ এবং ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞানের উপরেই যথার্থ বঙ্গসাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই কারণেই আমি সাহিত্যে প্রাদেশিকতার পক্ষপাতী। যাঁহারা চিরজীবন প্রকৃতির সহিত মুখোমুখি করিয়া বাস করেন, আশা করা যায়, তাঁহাদের রচনায় এই বিয়ালিটির রূপ ফুটিয়া উঠিবে। আমি খাঁটি বাংলা ভাষার পক্ষপাতী, কারণ সে ভাষা কংক্রিট (বিশেষ সংজ্ঞক) শব্দবহুল। প্রবোধ চন্দ্রিকা হইতে আমি খাঁটি বাংলার যে নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি তাহাতে দেখিতে পাইবেন যে, প্রায় প্রতিটি শব্দই কংক্রিট। এই বিশেষ জ্ঞানের অভাববশতঃ আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে সংগৃহীত সামান্য ভাবগুলিও যথাযোগ্য প্রয়োগ করিতে পারি না। যে ভাব জীবনসংগ্রামে আমাদের হাতে অস্ত্র হওয়া উচিত, তাহাকে হয়তো আমরা ভূষণস্বরূপে দেহে ধারণ করি। এবং যাহা ভূষণমাত্র, তাহারও আমরা অযথা ব্যবহার করি। ইউরোপের পায়ের মল গলার হারস্বরূপে বঙ্গসরস্বতীকে কণ্ঠস্থ করিতে দেখা গিয়াছে।

পরীক্ষা ব্যতীত কোনো বস্তুরই সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু কোনো বস্তুকেই পরীক্ষা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই। ইহাও আমাদের শিক্ষার দোষে। দিব্যাবদানে দেখিতে পাই যে, বৌদ্ধযুগে জম্বুদ্বীপে কুলপুত্রদিগকে অষ্টবিধ বস্তু পরীক্ষা করিবার শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু এ যুগে স্কুল-কলেজে আমরাই পরীক্ষিত হই, কিছুই পরীক্ষা করিতে শিখি না। আমরা যদি রত্ন পরীক্ষা করিতে শিখিতাম তাহা হইলে আমরা সাহিত্যে কাচকে মণি এবং মণিকে কাচ বলিতে ইতস্তত করিতাম। আমাদের পক্ষে পরীক্ষা-বিদ্যা শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা নানা দেশের নানা যুগের নানা শাস্ত্র পড়ি অথচ দেশি-বিদেশি নানা মুনির নানা মতের মধ্যে কোন্‌টি গ্রাহ্য এবং কোন্‌টি অগ্রাহ্য, তাহা স্থির করিতে পারি না। আমরা বর্তমান ইউরোপে এবং প্রাচীন ভারতবর্ষ উভয়কেই সম্বোধন করিয়া বলি, 'ব্যামিশ্রেণ বাক্যেন মোহয়সি মাম্'। এ অবস্থায় সকল বিষয়েরই যে দুটি দিক আছে, এইমাত্র আমরা জানি ; কিন্তু কোন্‌টি যে তার দক্ষিণ আর কোন্‌টি যে বাম, সে জ্ঞান আমাদের নাই। মাসেরও যে দুটি পক্ষ আছে, এই জ্ঞান আমরা পঞ্জিকা হইতেও সংগ্রহ করিতে পারি, কিন্তু তাহার কোন্‌টি কৃষ্ণ এবং কোন্‌টি শুক্ল তাহা জানিবার জন্য চোখ খুলিয়া দেখা আবশ্যক।

বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে মহা আশার কথা এই যে, অন্তত ইহার একটি শাখায় এই পরীক্ষার কার্য আরম্ভ হইয়াছে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির নিকট ইহার জন্য আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। সুহৃদ্‌বর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ বরেন্দ্রমণ্ডলের ভূগর্ভে লুক্কায়িত দেবদেবীগণকে টানিয়া বাহির করিয়া তাঁহাদিগকে ইতিহাসের কাঠগড়ায় খাড়া করিয়া আজ প্রশ্ন করিতেছেন, জেরা করিতেছেন। কেবলমাত্র জবানবন্দি লইয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন

না, আবশ্যকমত সওয়ালজবাব করিতেও তাহারা প্রস্তুত। এরূপ পরীক্ষাকার্যে বাঙালির কোমল প্রাণে ব্যথা দিতেও যে নব ঐতিহাসিকেরা কুণ্ঠিত নন, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমি তাঁহাদের কৃতকার্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চাই :

মালদহ জেলার অন্তর্গত খালিমপুর গ্রামের উত্তরাংশে হলকর্ষণ করিতে গিয়া এক কৃষক একটি তাম্রপট্টলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে তাহাকে সিন্দুরলিপ্ত করিয়া আমরণ পূজা করিয়াছিল।

এই তাম্রশাসনখানি ঐতিহাসিকদের হাতে পড়িয়া সিন্দুরচর্চিত এবং পূজিত হইতেছে না, পরীক্ষিত হইতেছে।

বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমাদেরও ইঁহাদের প্রদর্শিত পদ্ধতিই অবলম্বন করিতে হইবে। তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ, ভূর্জপত্রে লিখিত এবং বিলাতি কাগজে মুদ্রিত লিপিকে সিন্দুরলিপ্ত করিয়া পূজা করিবার যুগ চলিয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে লিপিমাত্রই, সে প্রাচীনই হউক আর অর্বাচীনই হউক, বাঙালির হাতে পরীক্ষিত হইবে। কেবলমাত্র লিপি পরীক্ষা করিয়াই আমরা নিরস্ত হইব না। ধর্ম, রীতিনীতি, আচারব্যবহার, সমাজের মন, নিজের মন, এইসকল বিষয়ই সাহিত্যের বিচারালয়ে পরীক্ষা দিতে বাধ্য হইবে। এ বিচার কেবল দর্শনে-বিজ্ঞানে নয়, নাটকে-নভেলেও হইবে। কেননা বিদ্যার সহিত সম্পর্কহীন সাহিত্য সভ্যসমাজে আদৃত হইতে পারে না। সমাজের সকল জ্ঞান সাহিত্যে কেন্দ্রীভূত এবং প্রতিফলিত হইতে বাধ্য। যে কথা বিনা পরীক্ষায় ডবলপ্রমোশন পায়, সে কথা ভবিষ্যতের সাহিত্যে স্থান লাভ করিবে না। সত্যের স্পর্শ সহ্য করিবার অক্ষমতার নাম যদি কোমলতা হয়, তাহা হইলে জাতীয় মন হইতে সে কোমলতা দূর করিতে হইবে। কেননা ও কোমলতা দুর্বলতারই নামান্তর, এবং যুক্তিতর্কের উপর্যুপরি আঘাতে সে মনকে কঠিন করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের সাহিত্যের সৌকুমার্য নষ্ট হইবার কোনো আশঙ্কা নাই।

ভবভূতি বলিয়াছেন, মহাপুরুষের মন যুগপৎ বজ্রকঠিন এবং কুসুমসুকুমার। জাতীয় মহাপুরুষত্বলাভই সাহিত্যসাধনার ধ্রুবলক্ষ্য হওয়া কর্তব্য।

এই প্রসঙ্গে আমি বঙ্গসাহিত্যের আর একটি ত্রুটির বিষয় উল্লেখ করিতে চাহি। আমাদের গদ্যের ভাষা ও ভাব দুইই শিথিলবন্ধ। আমাদের রচনায় পদ, বাক্য কিছুই সুবিন্যস্ত নয় এবং আমাদের বক্তব্য কথাও সুসম্বদ্ধ নয়। ইহা যে শক্তিহীনতার লক্ষণ তাহা বলা বাহুল্য। যে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকলের পরস্পরসম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ নয়, সে দেহের শক্তিও নাই, সৌন্দর্যও নাই। প্রতি জীবন্ত ভাষারই একটি নিজস্ব গঠন আছে, নিজস্ব ছন্দ আছে। সেই গঠন রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের রচনা সুগঠিত হয় না, সেই ছন্দ রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের গদ্য স্বচ্ছন্দ হয় না।

ভাষার ন্যায় ভাবও রচনা করিতে হয়। আমাদের চিত্তবৃত্তি স্বতঃই বিক্ষিপ্ত যাহা বিক্ষিপ্ত তাহাকেই সংক্ষিপ্ত করা সাহিত্যের কাজ। মনের ভিতর যাহা অস্পষ্ট তাহাকে স্পষ্ট করা,

যাহা নিরাকার তাহাকে সাকার করাই আর্টের ধর্ম।

যে সকল মনোভাব গ্রন্থিবদ্ধ নয়, তাহাদের বিশৃঙ্খল সমষ্টি সমগ্রতা নয়। চিন্তাগঠনের প্রণালীকেই আমরা লজিক বলি। লজিক এবং আর্টের সম্পর্ক যে অতি ঘনিষ্ঠ, গ্রিক সভ্যতাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেননা আর্ট এবং লজিক, এই দুই-ই সভ্যতার সর্বপ্রধান কীর্তি। প্রকরণভঙ্গ সংস্কৃত সাহিত্যে মহাদোষ বলিয়া গণ্য। আমাদের গদ্যরচনা যে এ দোষে অল্পবিস্তর দুষ্ট, এ কথা অস্বীকার করিবার জো নাই। এ দোষ বর্জন করিবার জন্য প্রতিভার প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন আছে শুধু মনোযোগের। সাহিত্যের সাধনাও একরূপ যোগাভ্যাস। ধ্যানধারণা ব্যতীত এ ক্ষেত্রেও সিদ্ধিলাভ করা যায় না। ধ্যানধারণা করা আর না করা আমাদের ইচ্ছাধীন। সুতরাং ইচ্ছা করিলেই আমরা আমাদের রচনা দৃঢ়বদ্ধ করিতে পারি।

আমার বিশ্বাস, বাঙালি জাতির হৃদয়মনের ভিতর অপূর্ব শক্তি আছে। যে শক্তি আজ আংশিকভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, সেই প্রচ্ছন্ন শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তিই আমাদের সকল সাধনার বিষয় হওয়া কর্তব্য। এই কারণেই আমি যে ভাষা ও যে ভাব সাহিত্যের সেই শক্তির পূর্ণবিকাশের বাধাস্বরূপ মনে করি, তাহার দূরীকরণের প্রস্তাব করিতে সাহসী হইয়াছি।

এ যুগে নিজের মতকে ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। অথচ নিজের মনে যাহা সত্য বলিয়া ধারণা, তাহা প্রকাশ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। সুতরাং যাঁহারা আমার মত গ্রাহ্য করিতে অক্ষম, তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন বিনা বিচারে এ মতের প্রতি সাহিত্যরাজ্য হইতে নির্বাসনদণ্ড প্রচার না করেন। আমি একটিমাত্র সত্যকে ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, সে সত্য এই যে, বাঙালি জাতির দেহে প্রাণ আছে। প্রাণের অস্তিত্বের প্রধান লক্ষণ বাহ্যবস্তুর স্পর্শে তাহা সাড়া দেয়। আজ এক শত বৎসর ধরিয়া বাঙালির মনের সকল অঙ্গ ইউরোপীয় সভ্যতার স্পর্শে যথোচিত সাড়া দিয়াছে। এই ধ্রুবসত্যের উপরেই সাহিত্য সম্বন্ধে আমার সকল মতামত প্রতিষ্ঠিত।

ফাল্গুন, ১৩২১

জগদিন্দ্রনাথ রায়

অভিভাষণ

যে বিজয়-বল্লাল-লক্ষ্মণাদির কীর্তিকলিত বরেন্দ্রভূমিতে আজ সমাগত সাহিত্যিকবৃন্দকে আমি স্বাগত জিজ্ঞাসা করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছি, সে সিদ্ধস্থানের প্রসিদ্ধি আজ আর নাই, তাহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি অন্তর্হিত, চিরদিনের জন্য সে তীর্থসদৃশ পুণ্যভূমির পূতমহিমা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! রাজধানী বিজয়পুরীর সৌধশিখর আজ চীনাংশুক-পতাকায় পরিশোভিত নহে ; দেবপাড়ার প্রসিদ্ধ মন্দিরচূড়া আজ আর দিন-দেবতার বিশ্রামার্থ উচ্চশির ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরে না। চিরপ্রোষিত অগস্ত্যকে দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য উমাপতির উদ্দাম কল্পনা আজ আর উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ঊর্ধ্বে উধাও হয় না। হরিহর প্রদ্যুম্নেশ্বরের প্রাহ্ন-মধ্যাহ্ন-সায়াহ্নের পূজারতির শঙ্খঘণ্টারব ভক্তজনের শ্রবণে মাধুর্যময় সঙ্গীতের মতো আজ আর বাজিয়া উঠে না, মন্দিরসন্নিহিত সরোবরে সহস্রাংশের আনন্দবর্ধনার্থ সহস্রারবিন্দ তাহার বিভূম মকরন্দ লইয়া দিনারম্ভে আজ আর নয়ন উন্মীলন করে না, 'গন্ধর্বমরসিদ্ধকিন্নর বধূর' অঙ্গস্খলিত কুঙ্কমপঙ্কে সরোবরের স্বচ্ছ সলিল আজ আর পীত শোভায় প্রতিভাত নহে। কমলকুঙ্কুমের সংমিশ্রিত সৌরভ আজ দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইয়া দূরদূরান্তর হইতে নলিনী-বন-বল্লভ অলিকুলকে আদরামন্ত্রণে আহ্বান করিবার কোনো উদ্যমই আজ আর করিতেছে না। ভক্তমুখোচ্চারিত স্তুতিগীতমুখরিত দেবধানী আর নাই, তোয়-তরঙ্গ-ভঙ্গচপলা লক্ষ্মী বিজয়পুরী

চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, বিজয়সেনের বিজয়োদ্ধত সেনানীর গর্বিত পাদক্ষেপ প্রপীড়িত বরেন্দ্রভূমি আজ শ্মশান অপেক্ষাও নীরব, নিস্তব্ধ; বিগত ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুর আকুল অন্বেষণ ভূগর্ভ পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াও অক্লান্ত শ্রমের কিঞ্চিন্মাত্রও সার্থকতা সম্পাদন করে কী না সন্দেহ। বিক্রমসভার প্রতিদ্বন্দ্বী লক্ষ্মণের স্বারস্বত সভার পঞ্চ মহারত্ন আজ আর নাই, রাজপ্রেমার্থিনী অপ্সরীর প্রেমাকুল বিলাপগীতি উৎস-মুখনিঃসৃত নির্মল বারিধারার ন্যায় ধোয়ীর লেখনীমুখে আজ আর অজস্র ধারায় প্রবাহিত হয় না, বিলাসকলা-কুতূহলী হরিস্মরণে সরস মনকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য পদ্মাবতীরমণের রসভার

মন্থর গোবিন্দগীতাবলি আজ চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। মোগলের দিল্লিসিংহাসন ছায়ায় যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ 'রাজসাহি' নামে অভিহিত ছিল, যার অতুল সম্পদ, অসীম ক্ষমতা এবং অপার মহিমার কথা পারাবারের পরপার পর্যন্ত একদিন বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, আজ সে রাজশাহিও নাই এবং রাজশাহিবাসী জন-গণ-নায়ক বলিয়া যাঁহারা একদিন সর্বপ্রকারের খ্যাতি প্রতিপত্তির আশ্রয়স্বরূপ ছিলেন, তাঁহারাও আজ পূর্বভাবে বিদ্যমান নহেন। আজ যাহার উপরে এই সমবেত সজ্জনমণ্ডলী ও মনীষিবৃন্দের অভ্যর্থনার ভার অর্পিত হইয়াছে, সে সর্বতোভাবে ইহার অনুপযুক্ত। বৎসরের সকল দিনগুলিই যাহার নিকট শ্রীপঞ্চমীর অনধ্যায়ের দিন ছিল, সে কেমন করিয়া বাগ্দেবতার সেবকবৃন্দকে স্বাগত প্রশ্ন করিবে, ভাবিয়া পাইতেছে না।

এ বৎসর যে দুর্বৎসর, একথা সকলেই জানেন, বিশেষত উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের পক্ষে মহা মন্বন্তরের বৎসর বলিলেও অতিশয়োক্তি বা অতিরঞ্জনের দোষে দোষী হইতে হয় না। এই সংকট সময়ে রাজশাহি এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছে।

সারস্বত-কুঞ্জের কলবিহঙ্গ-সমাগমে রাজশাহি আজ মুখরিত। হৃতবৈভবা রাজশাহির হৃদয়ে আনন্দ নিরানন্দ উভয়েরই আজ একত্র সমাবেশ হইয়াছে। বীণাবাদিনী বাগ্দেবতার পাদপীঠ-কমলের বিমল মধুস্বাদী মনীষিসমাগমে তাহার আনন্দের সীমা নাই; আবার কেমন করিয়া দীন আয়োজন তাঁহাদের সম্মুখে ধরিয়া আতিথ্যের মর্যাদা রক্ষা করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না; দীন দেশের দীন আয়োজনের অপূর্ণতা যদি হৃদয়ের অভ্যর্থনায় পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে, তবে রাজশাহিবাসীর ভয় করিবার কোনো কারণই আজ নাই। 'কাঞ্চন থালি নাহি আমাদের'। কিন্তু কদলীপত্রের শ্রদ্ধাদত্ত শাকান্ন হৃদয়বানের পরিত্যজ্য নহে ; সেই সাহসে সাহিত্য-যজ্ঞের দীন অনুষ্ঠান করিয়া রাজশাহি আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছে ; বাহ্যপূজা অপেক্ষা মানসপূজার মাহাত্ম্য শুনিয়াছি সমধিক, আজ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইব আশায় দীন আয়োজনের লজ্জা আমাদিগকে ক্ষুব্ধ করিতে পারিতেছে না।

পূর্বাপর নিয়মানুসারে যে স্থানে সাহিত্য-সভা আহূত হয়, তাহার যৎকিঞ্চিৎ পূর্ব পরিচয় অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতির দেয়। মুখের কথায় সে পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা পূর্বগৌরবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইতে পারিলে, তাহা অধিকতর আহ্লাদের কারণ হয়। আজ আনন্দের সহিত বলিতে পারিতেছি, এই সভাস্থানের অনতিদূরে যে সংগ্রহালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পূর্ববৈভবের স্মৃতিস্বরূপ শ্রীমূর্তি, তাম্রশাসন, প্রস্তরফলক, যাহা সংগৃহীত হইয়া সেখানে সংরক্ষিত আছে, তাহা দেখিলে অতীতগৌরবের আভাস পাইতেই হইবে সন্দেহ নাই।

যে রাজ্য কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, যে রাজধানী কালের হস্তাবলেপে বিলুপ্ত হইয়াছে, যে দেউলের দেবতার সঙ্গে সঙ্গে মন্দির পর্যন্ত কালসাগরের জলে নিমজ্জিত হইয়াছে, সে প্রাচীনকালের ভ্রমপ্রমাদশূন্য ইতিহাস বিদেশীলিখিত মুদ্রিত পুস্তকে এবং

ইতস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই পাওয়া যায় না। অসীম ধৈর্যসহকারে, অপরিমেয় অধ্যবসায়ের সহিত, অরণ্যকান্তারে ভূধরে ভূগর্ভে সফল নিষ্ফল নানা প্রকার অনুসন্ধানে তাহার অস্তিত্বের ক্ষীণসূত্র বাহির করিতে হয়। এ চেষ্টা আজ বাঙলার অনেক স্থানেই দেখা যাইতেছে। তাহার মধ্যে বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য, কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি, হেতমপুরের মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন প্রতিষ্ঠিত বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি এবং মহারাজাধিরাজ বর্ধমানাধিপতির পৃষ্ঠপোষিত এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্ত-বারিধি নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নেতৃত্বাধীন রাঢ় অনুসন্ধান সমিতি। কিঞ্চিৎ গর্বমিশ্রিত আনন্দের সহিত আজ উল্লেখ করিতে পারি যে, এই রাজশাহিতে রাজশাহির সুসন্তান সোদরপ্রতিম কুমার শরৎকুমারের জ্ঞান, বিদ্যা, অনুসন্ধানস্পৃহা ও অর্থানুকূল্যে বরেন্দ্রের বিগত-বিস্মৃত বৈভবের ইতিহাস অন্বেষণ আরম্ভ হয়; এবং সেই অক্ষয়রমার রম্য নিকেতন বরেন্দ্রের বিলুপ্ত গরিমার ভগ্নাবশেষ অক্ষয়রমার সাহায্যেই শ্রীমান্ শরৎ ধীমানের কলাবিদ্যার সহিত সংগ্রহালয়ে সযত্নে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।

আজ ফাল্গুন পূর্ণিমা। মেঘলেশহীন কুজ্ঝটিবিহীন সুনির্মল নভঃ আজ দিক্‌চক্রবাল পর্যন্ত অনন্ত নীলিমায় পরিপূর্ণ, দক্ষিণের মৃদুমন্দানিল চূতমুকুল ও মাধবী-মঞ্জরীর মনোমুগ্ধকর আকুল গন্ধ বহিয়া দিগদিগন্ত আমোদিত করিয়াছে, অশোক, চম্পক, কিংশুক, কাঞ্চনের বর্ণবিভায় বসুন্ধরার আজ বাসর সজ্জা সমুপস্থিত। কত সহস্র বৎসর পূর্বে জানি না বসন্তের এই মনোমোহন আয়োজনের দিনের বৃন্দাবিপিনচারী রাধাহৃদ্‌বিহারী নব নটবর শ্রীশ্যামসুন্দরের ফল্গুলীলার মহামহোৎসব হইয়াছিল। আবার প্রায় পঞ্চশত বর্ষ পূর্বে এই দিনে শচীমাতার অঞ্চলের নিধি, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রিয়তম ধন, প্রেমের তুফান তুলিবার জন্য, প্রেমময় নবদ্বীপচন্দ্র—শ্রীচৈতন্যদেবের নদীয়ায় আবির্ভাব হয়। আজ কয় শতাব্দী পূর্বে এই রাজশাহির অনতিদূরে বরেন্দ্রভূমির খেতুরীগ্রামে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর কর্তৃক সোনার গৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতিষ্ঠা হয়। বরেন্দ্রভূমিতে শ্রীগৌরাঙ্গের বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা ব্যাপার ধর্মানুষ্ঠানের ইতিহাসে চিরন্তন স্মরণীয় ঘটনা। এই উৎসবকে উপলক্ষ্য করিয়া তদানীন্তন পরমভাগবৎ বৈষ্ণব মহাজনগণের মহামিলন এই খেতুরীগ্রামে সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীবৃন্দাবনধাম, নীলাচল, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, খড়দহ প্রভৃতি যাবতীয় বৈষ্ণব নিবাসের তীর্থভূমি হইতে সাধুসজ্জনগণের সমাবেশ হয়।

বৃন্দাবনধাম হইতে সমাগত শ্রীনিবাস আচার্য বিগ্রহের অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করেন। অবধূতাচার্য নিত্যানন্দ প্রভুর তখন তিরোভাব হইয়াছে; তাঁহার অবর্তমানে তদীয় সহধর্মিণী ঈশ্বরী জাহ্নবীদেবী খড়দহ হইতে খেতুরিগ্রামে শুভাগমন করিয়া এই বৈষ্ণব মহাসম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই নির্দেশানুসারে দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও তদঙ্গীয় যাবতীয় কার্য নির্বাহ হইয়াছিল ; বৈষ্ণব গ্রন্থপাঠে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা হইতে তৎকালে যোগ্যতানুসারে ধর্মজগতে এবং বিদ্বজ্জনসমাজে স্ত্রীলোকগণ নিজ

নিজ স্থান অধিকার করিতে পারিতেন, ইহা অনুমান করিলে অসঙ্গত অনুমান না হইতেও পারে। নরোত্তম কর্তৃক সোনার গৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠা দ্বারা এতদ্দেশে শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্বের প্রচার হয় এবং সেই জন্য খেতুরির এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ব্যাপার বৈষ্ণবদিগের ধর্মজগতে চিরস্মরণীয় ঘটনা এবং সেই ঘটনা এই রাজশাহির কয় মাইল মাত্র দূরেই ঘটিয়াছিল। সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত নির্ধারিত দিবসে বৎসর বৎসর সেই বৈষ্ণব মহাসম্মিলনী এই খেতুরিগ্রামে হইয়া থাকে। সেই মিলনক্ষেত্রে হরিভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণব নরনারীর ভক্তিপরিপ্লুত সম্মিলিত সমস্বরের নামসংকীর্তন, বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীহরির মহিমালয় সিংহাসনতলে সমুপস্থিত হয় কি না জানি না, তবে কীর্তনানন্দের উন্মাদ পুলকে আত্মহারা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পরাভক্তি এবং প্রেমসাগরের উচ্ছ্বসিত রসতরঙ্গ যে দেখিয়াছে, তাহার নয়ন সার্থক, জন্ম ধন্য, জীবন সফল এবং দেহমন পবিত্র। ঋষিকোপানলে ভস্মীভূত ষষ্ঠিসহস্র সগরসন্তান উদ্ধারের জন্য তপঃসিদ্ধ ভগীরথ যেমন মন্দাকিনীর পাবনী ধারায় ধরণী পবিত্র করিয়াছিলেন, প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গের বিগ্রহের অর্চনা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তপ্রবর নরোত্তম তেমনই বরেন্দ্রভূমি পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, সন্দেহ নাই। নরোত্তম ঠাকুরের জীবনবৃত্তান্ত এবং সোনার গৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠার আনুসঙ্গিক কাহিনি অতি অপূর্ব। রাজৈশ্বর্যসম্পন্ন ব্যক্তির সন্তান নরোত্তম শিশুকাল হইতেই ধর্মপিপাসু ; যৌবনে সুযোগ পাইয়া গৃহত্যাগী হইয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে জীব গোস্বমীর নিকট বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যান এবং লোকনাথের মন্ত্রশিষ্য হইয়া বালকব্রহ্মচারী নরোত্তম, সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শাস্ত্রানুশীলন শেষ করিয়া পরমভাগবত সন্ন্যাসী নরোত্তম প্রেমভক্তি বিতরণমানসে দেশে প্রত্যাগমন করেন এবং স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সোনার বিগ্রহ সর্পসঙ্কুল ধান্যাগারে প্রাপ্ত হইয়া, পরম সমারোহে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। শাস্ত্রদর্শী ভক্ত নরোত্তম, শাস্ত্রানুশীলন ও হরিগুণানুকীর্তনে জীবনাতিপাত করিয়া যান এবং জীবিতকালে হরিভক্তিবিষয়ক গ্রন্থাদি যাহা বাংলা ভাষায় রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা এবং সারবত্তা কম নহে, সুতরাং নরোত্তম বরেন্দ্রভূমে প্রেমভক্তিই কেবল বিলাইয়া গিয়াছেন তাহাই নহে, তাঁহার দ্বারা মাতৃভাষাও যথেষ্ট পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। রাজশাহিবাসী বাগ্দেবতার চরণনিষ্যন্দী মধু স্বাদের জন্য চিরদিনই লোলুপ। অতি অল্পকাল পূর্বেও এই জেলায় অসংখ্য চতুষ্পাঠী ছিল। প্রতি গ্রামে একাধিক চতুষ্পাঠী ছিলই, কোনো কোনো স্থানে একই গৃহে এক সময়ে কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রের অনুশীলন হইতে পারিত। গৃহস্থ সকলেই পণ্ডিত, এমন গৃহ এই রাজশাহিতে বিরল ছিল না। জীনেন্দ্রবুদ্ধিকৃত 'কাশিকা বিবরণ পঞ্জিকা' বা 'ন্যাস' মৈত্রেয়রক্ষিতকৃত 'তন্ত্রপ্রদীপ', পুরুষোত্তমকৃত 'ভাষাবৃত্তি' প্রভৃতি এই রাজশাহিতে আজও পাওয়া যায়। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-অঙ্কিত শ্রীহরির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আভীর রমণীর চিরপ্রার্থিত দয়িতরূপী ভগবদন্বেষণ-কাহিনী, যাহা 'পদাঙ্কদূত' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে, সেই ললিতকান্ত শ্লোকাবলি এই রাজশাহির রাজকবি শ্রীকৃষ্ণশর্মাকৃত।

অতি প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত এখানে দেশকালোপযোগী বিদ্যার অনুশীলন অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিতেছে। বেন্টিঙ্ক এবং মেকলে প্রবর্তিত নবশিক্ষানীতির প্রথম ফলস্বরূপ জেলায় জেলায় যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, বোয়ালিয়া জেলা স্কুল সেই সমস্ত প্রাচীন বিদ্যালয়ের একতম। দুবলহাটির সৎকর্মশীল রাজা হরনাথ রায় অর্থসাহায্যের দ্বারা সেই স্কুলকে হাইস্কুল করিয়া দেন; তৎপর দিঘাপতিয়ার সুপণ্ডিত বিদ্যোৎসাহী দেশহিতৈষী পুণ্যশীল রাজা প্রমথনাথ সেকেণ্ড গ্রেডে কলেজে বি এ ক্লাস স্থাপনের সহায়তা করিয়া উত্তরবঙ্গে আধুনিক উচ্চশিক্ষার পরম সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। তৎকালে সমগ্র উত্তরবঙ্গে আর কলেজ ছিল না। এই রাজশাহি কলেজই সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান। কলেজ এবং এই বিদ্যালয় সেই প্রাচীন খ্যাতি আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। যে বিদ্যালয় সমগ্র উত্তরেবঙ্গবাসী বিদ্যার্থীদিগের শিক্ষার একমাত্র স্থান, এক সময়ে তাহার অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছিল ; বর্তমান সুযোগ্য অধ্যক্ষ রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, দিঘাপতিয়ার সর্ববিষয়ে সুযোগ্য আমার পরম বান্ধব বিদ্যোৎসাহী রাজা প্রমদানাথ রায়বাহাদুরের সহায়তায় অপরিসীম ধৈর্য ও অক্লান্ত শ্রমের ফলে তাহাকে কেবল রক্ষামাত্র করিয়াছেন, তাহাই নহে, সে বিদ্যালয়ের সর্বপ্রকার গৌরব এমন করিয়া বর্ধিত করিয়া দিয়াছেন যে, ইহার সমকক্ষ কলেজ আজ নাই বলিলে কৈতববাদের দোষ কেহ দিতে পারিবেন না। আমার সোদরপ্রতিম রাজা প্রমদানাথ এবং আমার অধ্যাপক রায়বাহাদুর কুমুদিনীকান্ত সমগ্র রাজশাহিবাসীর একান্ত কৃতজ্ঞতাভাজন। প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরীর উপযুক্ত উত্তরাধিকারিণী দানশীলা পুণ্যবতী শ্রীযুক্তা রানি হেমন্তকুমারী দেবী একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত করতঃ বরেন্দ্রে মৃতকল্প সংস্কৃতানুশীলনে নবজীবন সঞ্চার করিয়া, জনসাধারণের চিরকৃতজ্ঞতার পাত্রী হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণশর্মার পদাঙ্কদূত এবং নরোত্তমের কোমলকান্ত বৈষ্ণবপদাবলির মধুর ঝঙ্কারের পর বাগ্দেবতার বীণার তন্ত্রী স্তব্ধ হইয়া যায় নাই, আরও অনেক কবি, অনেক লেখক এই রাজশাহি ভূমিতে জন্মলাভ করিয়া তাঁহাদের কৃতিত্বের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন এবং বর্তমানেও মাতৃভাষার ভাণ্ডারে মূল্যবান রত্নরাজি উপঢৌকন দিয়া সমৃদ্ধ করিতে নিরলস যত্নের যাহাদের ত্রুটি নাই, এমন লোকও বিরল নহে। কান্তকবি রজনীকান্ত আপনাদের সকলেরই সুপরিচিত ছিলেন, তাঁহার জীবন সূর্য মধ্যগগনে না আসিতেই অস্তশিখরীর পরপারে চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়া গেল ; বঙ্গবাসীর দুর্ভাগ্যের কথা, কিন্তু অল্পদিনেই প্রকৃতির এই কলবিহঙ্গ মধুর-কাকলির স্বরলহরীতে বঙ্গের কাব্যকানন ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছিল। সে মধুর ঝঙ্কার বঙ্গবাসী শীঘ্র ভুলিতে পারিবে না। তাঁহার কূজনে শিষ্টজনামোদিত শুভ্র কলহাস্য ছিল। কন্যাদায়গ্রস্তের হৃদয়বেদনা তাঁহার মতো করিয়া কেহ প্রকাশ করিয়াছে কি না জানি না ; আবার 'কেন বঞ্চিত হব চরণে' যখন শুনিয়াছি, মনে করিয়াছি যে, এমন করিয়া যে চাহিতে জানে, সে চির প্রার্থিতের চরণকমলের রত্নরেণুকায় কখনোই বঞ্চিত

হয় না। রজনীকান্তের বিমলশুভ্র কাব্যকৌমুদী আজ আর নাই ; রাজশাহি আজ সত্যসত্যই রজনীর অন্ধকারে আবৃত হইয়া আছে। কান্তকবির স্বাগত-সঙ্গীতের স্বরে ও শব্দে আজ সমাগত সাহিত্যিকবৃন্দকে তৃপ্ত করিতে পারিতেছি না, রাজশাহিবাসীর ইহা পরম দুর্ভাগ্যের কথা।

আজ যাহাকে আপনারা পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া বীণাবাদিনী বাগ্‌দেবতার অর্চনা আরম্ভ করিতেছেন, ইনি আপনাদের সকলের নিকট সুপরিচিত ; কুলমর্যাদায় তিনি রামদেব দেওয়ান চৌধুরীর বংশধর, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজের কাপকুলচূড়ামণি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের এম্ এ পরীক্ষায় সর্ব প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; লবণাম্বুরাশির পরপার হইতে নানা রত্নরাজি আহরণ করিয়া আনিয়াছেন ; বর্তমানে বাংলা দেশের একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক, অর্ধশত 'সনেটের' শিল্পচতুর কবি. বঙ্গসরস্বতীর সর্বাঙ্গ দিব্যাভরণে ভূষিত করিয়াও তাঁহার কর্ণে 'বীরবৌলী'টি পর্যন্ত দিতে তিনি বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডারে অমূল্য রত্নরাজি হইতে আরম্ভ করিয়া সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় *তেল নুন লকড়ী* পর্যন্ত যাহার যাহা প্রয়োজন, সবই পাওয়া যায়। এই সারস্বত সম্মিলন আজ তাঁহাকে সভাপতিস্বরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছেন।

কোন্ নবীন প্রভাতের মাহেন্দ্র মুহূর্তে তরুণেন্দু-কান্তিমতী সিতাব্জে সন্নিষণ্ণা বীণাবাদিনী বাগ্‌দেবতার মানসী মূর্তি মানবের মনে প্রথম উদ্ভাসিত হইয়া দুঃখভারপ্রপীড়িত জরাজীর্ণ জীবনে নন্দনের হরিচন্দন-শোভার সৃষ্টি করিয়াছিল জানি না, তারপর যুগযুগান্ত ধরিয়া সেই অমৃতচ্ছবি বিশ্বের মানসস্বর্গে চিরন্তনী হইয়া রহিয়াছে ; তাঁহারই সিন্দূরচন্দনাঙ্কিত পাদপীঠের অনুধ্যানে ভারতের নব্য কবিসম্প্রদায়ের চিরবরেণ্য অদ্বিতীয় মনীষাসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ জগতের কাব্যসভায় বঙ্গ-সরস্বতীর রত্নময় সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন। আমরা সিদ্ধিসবিতার প্রথমারুণদীপ্তি দেখিতে পাইয়াছি মাত্র, তপোলভ্য সম্পূর্ণফল আজও আমাদের হস্তগত হয় নাই। বিধিনির্দিষ্ট এই সাহিত্যের পথেই আমাদিগকে সর্বপ্রকার সিদ্ধির অন্বেষণ করিতে হইবে। বাগ্‌দেবতার চরণারুণ-কিরণোদ্ভাসিত এইপথেই আমাদের সর্বপ্রকার সার্থকতার সন্দর্শন আমরা লাভ করিতে পারিব। এই সাহিত্যের উদার উন্মুক্ত পথেই বিগতবৈভবা বঙ্গজননীর ষড়ৈশ্বর্যের বিকাশ সম্ভব হইবে।

সমাগত সাহিত্যিক সুধীসজ্জনগণকে আমি বারংবার অভিবাদন জানাইতেছি।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের রাজশাহি অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে পঠিত।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

মা বঙ্গভারতি!

তুমিই মনের তৃপ্তি,
তুমি নয়নের দীপ্তি,
তোমা-হারা হ'লে আমি প্রাণ-হারা হই:
করুণা-কটাক্ষে তব
পাই প্রাণ অভিনব,
অভিনব শান্তি-রসে মগ্ন হ'য়ে রই।
যে ক'দিন আছে প্রাণ,
করিব তোমায় ধ্যান,
আনন্দে ত্যজিব তনু ও রাঙ্গা চরণতলে।

বিহারীলাল

এস মা, এক বার দশভুজার রূপে আসিয়া বাংলার সাহিত্য-মন্দিরে দাঁড়াও এবং আশার স্নিগ্ধ অঞ্জনে বাঙালির চক্ষু মাজিয়া দাও; তোমার বরাভয়দায়ী করস্পর্শে তাহাদের মোহ কাটিয়া যাক, হৃদয়ে বল আসুক, অন্তরের অন্তস্তলে উৎসাহের সঞ্জীবনী ধারা প্রবাহিত হোক; বাঙালি দ্বেষ-হিংসা ভুলিয়া, আত্মপর ভুলিয়া, একপ্রাণে, একতানে সঙ্গীত ধরুক, সে সঙ্গীতে বিরাট ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া যাক, বাংলার সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের আসন অধিকার করুক।

একদিন সেই অতি প্রাচীনকালে—যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষীণ রশ্মিও জগতে ফোটে নাই, বিশ্ব যখন একপ্রকার প্রগাঢ় অন্ধতমসে আচ্ছন্ন, সেই আদিকালে ভারতের আর্যাবর্তে যে বেদগান গীত হইয়াছিল, সেই গানে তখনকার ভারতের সর্বত্র, 'পর্বত-পাথার, সমুদ্র-

কান্তার' সমস্ত ভরিয়া গিয়াছিল, সেই এক সংগীতের মধুর আকর্ষণে ভারতবর্ষ যেন একপ্রাণ হইয়া গিয়াছিল, শ্রৌতযুগের সেই সাহিত্যিক একতা, সেই সঙ্ঘবদ্ধ ভাব, সেই চিরনবীন প্রেম, সেই বড়ো স্পৃহণীয় মিলন, আর কি হইতে পারে না? সে বৈদিক যুগ নাই, সেই বিরাট বৈদিক সাহিত্য আজ অলঙ্ঘ্য হিমাচলের ন্যায় ওই পড়িয়া আছে, ভারতে আবার সেই সাহিত্যিক একতা, মনীষার সম্মেলন একপ্রকার অসম্ভব, একথা বলিলে চলিবে না। সেই হারানো ধন আবার ফিরিয়া পাইতে হইবে; বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সেই লুপ্তরত্নের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। কালের বশে চলিয়া আমাদিগকে কালজয়ী হইতে হইবে। বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধকগণকে উদাত্তকণ্ঠে গাহিতে হইবে :

কে বলিল পুনঃ পাবে না তায়?
হারানো মাণিক পাওয়া কি না যায়?
হয়, যায়, আসে মায়ার ভবে,
রাহুগ্রস্ত ছায়া ক'দিন রবে?
এ জগৎ-মাঝে করো না ভয়,
সাহস যাহার তাহারি জয় :
দেখো না, দেখো না, দেখো না পাছে,
আগে দেখ আর কত দূর আছে :
ওই দেখ দূরে ভারতী-মন্দিরে
উড়িছে নিশান ভারত-তিমিরে,—
করহ সাধনা,—পাইবে ফিরে।।

হেমচন্দ্র

একদিন যেমন বৈদিক সাহিত্য শিক্ষিত ভারতবাসীর আত্ম-সাহিত্য ছিল, আজ বঙ্গসাহিত্যকে সমগ্র ভারতের সেইরূপ আত্ম-সাহিত্য করিতে হইবে। জানি, এ কথায় হঠাৎ আস্থা স্থাপন করা বড়োই দুষ্কর ; স্বীকার করি, কথায় যাহা বলা যায়, কার্যে তাহা পরিণত করা সর্বদা সম্ভবপর নহে, কিন্তু চেষ্টায় ত দোষ নাই। মানুষের সামর্থ্য যে কত, এক দল মানুষ অথবা একটা মানুষ যে কত কাজ করিতে পারে, তাহা যদি মানুষ নিজে বুঝিতে পারিত, আত্মসত্তায় যদি মানুষ বিশ্বাস করিতে জানিত, তবে নবজাতির অবস্থা হয়ত আরও বিস্ময়করী হইত, জগৎ মধুময় হইত।

আজ একবার ক্ষণকালের জন্য আমাদিগকে বঙ্গের মানচিত্র গুটাইয়া রাখিয়া, ভারতের মানচিত্রে দৃষ্টি সংযোগ করিতে হইবে। কলবাহিনী ভাগীরথীর তীরে দাঁড়াইয়া এক বার নর্মদা-সিন্ধু-কাবেরীর স্রোতে মানস স্নান করিতে হইবে। শ্যামা বঙ্গভূমির কোলে বসিয়া শৌর্যবীর্যের সমাধিক্ষেত্র রাজপুতানার গম্ভীর মূর্তি দেখিতে হইবে। কী করিলে, কোন্

পথে চলিলে, আমার বঙ্গভারতীকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাজসজ্জায় মনের মতো করিয়া বিভূষিত করিতে পারিব, কী করিলে আমার বঙ্গসাহিত্যকে কালে ভারত-সাহিত্যে পরিণত করিতে পারিব, সকল প্রদেশের মনীষাফলে বঙ্গভূমিকে ফলবতী করিতে পারিব, এই চিন্তা আমাদিগকে করিতে হইবে। আমি বাঙালি যেমন মহারাষ্ট্রীয় জ্ঞান-গরিমায় আমার মাকে সাজাইতে চাই, তেমনই আবার বাংলার মনীষা-সম্পদে তৎ তৎ প্রদেশ কী উপায়ে সম্পন্ন হইতে পারে, সে কথাও আমাকে ভাবিতে হইবে। একাকী দীর্ঘপথ চলা বড়ো দায় ও বিরক্তিজনক, দশজনকে লইয়া আমার দেশি-বিদেশি সকল ভাইকে লইয়া যাহাতে সেই বিরাট সারস্বত মন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে পারি, সেই চেষ্টা আমাকে করিতে হইবে। ক্ষুদ্র আপনাকে ভুলিয়া বৃহৎকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। অল্পে সুখ নাই, যাহা ভূমা, বিরাট্-তাহাতে আত্মবিসর্জন করিতে হইবে। তবে ত মুক্তি। যত সঙ্কোচ, বন্ধন তত কঠোর; যত প্রসার, মুক্তি তত সম্মুখে। বাহু প্রসারণ করিয়া সমগ্র ভারতকে আলিঙ্গন করিতে হইবে, আপনার বুকের মধ্যে টানিয়া আনিতে হইবে, বাংলায় রামপ্রাসাদের 'মিঠের লোভে তেতোমুখে সারাদিনটা গেল'—ক্রন্দনের করুণস্বরে নিদ্রিত গুর্জরের চৈতন্য সম্পাদন করিতে হইবে, আবার রাজপুতানার ভট্টকবির উৎসাহপূর্ণ সঙ্গীতের সঞ্জীবনমন্ত্রে বঙ্গসাহিত্যের কোমল প্রাণে নবীন আশার আলোক ফুটাইতে হইবে।

অন্যের যাহা ভাল, তাহা আমাকে লইতে হইবে; আমার যদি কিছু ভাল থাকে, তাহা অন্যকে অঞ্জলি পুরিয়া দিতে হইবে। এইরূপ আদান-প্রদান ছাড়া আমাদের সাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয়ের আশা নাই, পূর্ণত্ব-লাভের সম্ভাবনা নাই। এমন একটি সাধারণ উপায় নির্ধারণ করিতে হইবে, যাহার আশ্রয়ে বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, গুর্জর, রাজপুতানা, গান্ধার, পাঞ্জাব—সব এক সূত্রে গ্রথিত ও সাহিত্যের এক সমতটে সমবেত হইতে পারে। বাংলার শ্যামা-দোয়েলের কূজনে রাজপুতানার ময়ূর কেকামৃত বর্ষণ করিবে, আবার গান্ধারের দ্রাক্ষারসে বাংলার সাহিত্যকুঞ্জ সরস হইবে। এক কথায়, এমন একটি সুখকর যান আবিষ্কার করিতে হইবে, এমন একখানি মনোহর বজ্‌রা গড়িতে হইবে, যাহার সাহায্যে ভারতের যে প্রদেশে যাহা কিছু উত্তম, মনোজ্ঞ, তাহা অন্য প্রদেশে অবাধে আমদানি করা যাইবে। যাহার যাহা ভাল, সকলেই তাহার আস্বাদ-গ্রহণে সমর্থ হইবে। এইরূপ করিতে পারিলে কালে, অনন্ত কালের তুলনায় অতি অল্প কালের মধ্যে—ভারতবর্ষে এক অদ্বিতীয় ও অবিচ্ছিন্ন প্রকৃত একাতপত্র সাহিত্য-সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন হইবে। সে যে কি সুখের সাম্রাজ্য, সে যে কী মোহের সাম্রাজ্য, তাহা ভাবিতেও কতই না আনন্দ! এক চিন্তা এক ধ্যান এক জ্ঞান যাহাদের, এক দেবতা এক মন্ত্র এক পূজা যাহাদের, এক গান এক সুর এক তান যাহাদের, তাহাদের আবার অভাব কীসের? যদি এমনই সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে পারি, সমগ্র ভারত যাহাকে নিজের বুকে তুলিয়া লইবে, যদি এমনই রত্ন উদ্ধার করিতে পারি, তবেই ত মায়ের প্রকৃত পূজা করিলাম, অন্যথা মায়ের অবমাননা মাত্র। এস সাহিত্যিক, এস

বঙ্গভারতীয় একনিষ্ঠ সাধক, এস ভাই বাঙালি, এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আমরা ভারতবর্ষের খণ্ড খণ্ড সাহিত্য-রাজ্যগুলি এক করিয়া, এক বিরাট সাহিত্য-সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। তুমি-আমি চলিয়া যাইব, আরও কত আসিবে, কত যাইবে, কিন্তু যদি এই ভারতব্যাপী একচ্ছত্র সাম্রাজ্য-স্থাপন করিয়া যাইতে পারি, অথবা ইহার বিন্দুমাত্র আনুকূল্যও করিয়া যাইতে পারি, আমাদের মরজীবন সার্থক হইবে। এ জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। আমি একা, আমি দুর্বল, আমি অসহায়, এই সকল মনুষ্যত্বঘাতী চিন্তা পরিহার করিয়া সিংহবিক্রমে কার্যে প্রবৃত্ত হও, সিদ্ধি নিশ্চিত। মনে রাখিও যদি তোমার সঙ্কল্প-শুদ্ধি থাকে, তবে তোমার সঙ্কল্পের সিদ্ধিও নিশ্চিত। সুতরাং শুদ্ধ-সঙ্কল্পে হৃদয় সবল করিয়া সাহিত্যের সাধনায় প্রবৃত্ত হও। দেখিবে, আজ যাহা ভাবিতেছ স্বপ্ন, কাল তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে,—অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। দেখা যাউক, বাঙালি আমরা এই সাহিত্য-সাম্রাজ্য-স্থাপনে কতটুকু সাহায্য করিতে পারি।

বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে একটা জিনিস দেখিতে পাই যে, কী মাদ্রাজ বোম্বাই, কী গুজরাট বাংলা—সকল দেশের শিক্ষিত লোকেই ইংরাজির দ্বারা পরস্পর কথাবার্তা বা ভাবের আদান-প্রদান চালাইয়া থাকেন। বরোদার এক ব্যক্তি, যিনি বাংলার কিছুই জানেন না, তিনিও অবাধে ত্রিপুরার এক ব্যক্তির সহিত সুন্দর আলাপ করিতেছেন; পরস্পরের দেশীয় ভাষায় অজ্ঞতা নিবন্ধন, তাঁহাদের কাহারই কোনো অসুবিধা হইতেছে না। বিদেশি ইংরেজি ভাষাই তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ঘটকতা করিতেছে। এক হিসাবে ইংরাজি আমাদের বহুল উপকার করিতেছে। আজ যে ভারতে জগদীশচন্দ্র বা প্রফুল্লচন্দ্রকে পাইয়াছি, তাহা ইংরাজির প্রসাদে। রাজভাষা ভারতের অনেক উপকার করিয়াছে, করিবেও। সত্য বটে, পাশ্চাত্য ভাবের অনেক স্তর এ দেশের মাটির সহিত খাপ খায় না, কিন্তু এমন অনেক জিনিস পশ্চিম দেশের ভাষা আমাদিগকে আনিয়া দিয়াছে, যাহাতে আমাদের পরম উপকার হইয়াছে। অদৃষ্টবাদী আমরা কর্ম করিতে শিখিতেছি। পাশ্চাত্য ভাষায় আমরা কতদূর উপকৃত বা আমাদের দেশীয় ভাষা পাশ্চাত্য ভাষার সম্পর্কে কতটা সম্পন্ন, তাহা অদ্যকার বক্তব্য নহে ; অন্য এক উপলক্ষ্যে আমি তাহা বলিয়াছি, সুতরাং আজ সে কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ভারতবর্ষ ভাবের রাজ্য—প্রাণের রাজ্য। ভারতের কোনো প্রদেশেই ভাবের অভাব নাই। মনস্বী মহাজনের অভাব নাই। উদ্ধবদাস-সুরদাস, রামপ্রসাদ-চণ্ডীদাস, মীরা-তুলসীদাসের ভারতে অভাব নাই। কেহ লোকলোচনের সম্মুখে আসিয়াছেন, কেহ-বা পল্লিকুঞ্জের স্নিগ্ধছায়ায় জীবন কাটাইয়াছেন,—দেশান্তরের লোকে তাঁহাকে চিনিবার অবসর পায় নাই। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেরই এক একটি নিজস্ব ভাষা আছে এবং তাহা অতি প্রাচীন। সেই সমস্ত প্রদেশের অনেক অমর কবির, অনেক নিপুণ লেখক সেই সেই ভাষায় কত সুমধুর কাব্য, কত সুমধুর কথাগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, এখনও লিখিতেছেন, তাহার

ইয়ত্তা নাই। সেই সেই দেশের অধিবাসীরা তৎ তৎ মহাকবির কাব্যামৃত-পানে কৃতার্থ হইয়াছে। ধরুন, যেমন কৃত্তিবাস বা চণ্ডীদাস, মাইকেল মধুসূদন বা হেমচন্দ্র, বঙ্কিম বা দীনবন্ধু। কে এমন বাঙালি আছেন, যিনি ওই সকল মহাকবির কাব্য পাঠ করিয়া, নিজে ওই সকল কবির স্বজাতি বলিয়া শ্লাঘা অনুভব না করেন? বাংলার এমন কোন্ শিক্ষিত ব্যক্তির গৃহ আছে, যেখানে ওই সকল কবির কোনো না কোনো গ্রন্থ গৃহের শোভাবর্ধন না করিতেছে? ওই প্রকার ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কথাও ভাবুন। প্রত্যেক প্রদেশেই তাহার 'নিজস্ব' বলিয়া কিছু না কিছু আছেই। ইংরাজি ভাষা আমাদের দেশে এখনও নূতন, এখনও ত্রিশকোটি ভারতবাসীর মধ্যে অতি অল্প কয়েকজন মাত্র ইংরাজি ভাষার অনুশীলন করেন। যাহাদিগকে লইয়া ভারতবর্ষ, যাহাদিগকে বাদ দিলে ভারতবর্ষের অস্তিস্ব খুঁজিয়া পাওয়া দুর্ঘট, সেই সাধারণ জনসমাজ এখনও ইংরাজির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয় নাই। আমার মনে হয়, তাহাদিগকে, সেই বিপুল জনসঙঘকে—সাহিত্যের ভিতর দিয়া যদি এক করিতে পারা যায়, তবেই ভারতে প্রকৃত জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে, অন্যথা নহে। এখন এমন একটি সাধারণ সেতু নির্মাণ করিতে হইবে, যাহার ওপর দিয়া ভারতের সকল দেশের অধিবাসীরা তাহাদের সর্ববিধ বাধা-বিপত্তি পার হইয়া এক মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া পৌঁছিতে পারে। সকলে সাহিত্যের অঙ্গনে এক হইবে, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই থাকিবে না। অবশ্য কথা বড়োই কঠিন। দেখা যাক, ইহার সমাধান হয় কী না।

ভারতবর্ষে এখন সাধারণত শিক্ষার কেন্দ্র দেখিতে পাই প্রকৃতপক্ষে একটি; তাহা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাচীন যত কিছু শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, ক্রমে তাহা লোপ পাইতেছে, যাহা আছে, তাহাও যায়-যায়। নবীনের সঙ্ঘর্ষে সে প্রাচীন পদ্ধতি ক্রমেই হটিয়া যাইতেছে। আর তাহার পুনরুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। এখন আর সে তেঁতুলের পাতার ঝোলে চতুষ্পাঠীর ছাত্র নির্ভর করিতে চায় না, বা অধ্যাপকও নির্ভর করাইতে পারে না। সে রাম নাই, সে অযোধ্যাও নাই। সব ওলট্-পালট্ হইয়া গিয়াছে। এখন শিক্ষা বলিতে সাধারণত লোকে বোঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, উচ্চশিক্ষিত বলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। অভিভাবক এখন স্ব স্ব বালকদিগকে স্কুলকলেজে পাঠাইতে পারিলেই তাহাদের শিক্ষার সম্বন্ধে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পন্ন হইল মনে করিয়া থাকেন। দেশের সে চৌপাড়ি পাঠশালা ক্রমেই লোপ পাইতেছে, গ্রামে গ্রামে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখা যাইতেছে। শিক্ষা-সমাপ্তির পর যে কী হইবে, কোন্ পথে যাইতে হইবে, সে সব চিন্তা না করিয়া ছেলেদিগকে স্কুলকলেজে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইহার ফল ভাল কী মন্দ, এই ভাবে দেশের শিক্ষাপদ্ধতি চলিলে কোথায় যাইয়া যে ইহার কী পরিণাম দাঁড়াইবে, তাহা গুরুতর চিন্তার কথা। সমাজের সর্ববিধ কল্যাণ যে শিক্ষার ওপর নির্ভর করে, সেই শিক্ষা এই বর্তমান প্রণালীতেই হওয়া উচিত, না অন্য কোনো সমীচীন পথে শিক্ষার ধারা প্রবাহিত হওয়া বিধেয়, সে বিষয় অদ্য আলোচ্য নহে। স্থানান্তরে সে কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

যাহা বলিতেছিলাম, শিক্ষার প্রকৃত কেন্দ্র দেশে এখন বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমান সময়ে ভারতে সবে সাত-আটটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে মাত্র। কিন্তু সে দিন আর দূরে নহে, মনে হয়, যখন ভারতের এক এক প্রদেশে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে পাইব। যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া দেশে আর অন্য কোনো শিক্ষার কেন্দ্র নাই বা থাকিলেও তাহা গণনার মধ্যেই নহে, তখন যদি দেশের শিক্ষার সম্বন্ধে কোনোরূপ কিছু অদল-বদল করিতে হয়, বা নূতন কিছু করা দরকার হয়, তবে তাহা ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়াই করিতে হইবে। অন্যথা, একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত ব্যবস্থা থাকিতে, এখন আবার নূতন করিয়া আর একটা পথ খুলিতে যাওয়া সঙ্গত নহে। সুতরাং ভারতের সাহিত্যিক একতার সমাধান যদি করিতেই হয়, তবে তাহা যতদূর সম্ভব ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যেই করিতে হইবে। চাই আমরা কাজ, যে ভাবে যত সহজে সেই কাজ সুসম্পন্ন করিতে পারি, তাহাই আমাদিগকে করিতে হইবে। সংজ্ঞা লইয়া বিতণ্ডা করিলে চলিবে না, সংজ্ঞিত পদার্থ প্রাপ্তির সম্বন্ধে সাবধান থাকিবে হইবে। নৈরাশ্যের কোনো কারণ নাই। ভগবানের নাম করিয়া, দেশমাতৃকার চরণ স্মরণ করিয়া, বঙ্গভারতীর পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া, আমরা কার্যে প্রবৃত্ত হইব, মায়ের ছেলে আমরা—'মা মা' রবে অগ্রসর হইব, সকল বাধা-বিপত্তি কাটিয়া যাইবে। সভ্য মহোদয়গণ, আজ আমরা সকলেই এক সঙ্কল্পে, এক উদ্দেশ্যে এই পবিত্র সারস্বত সম্মেলনে সমবেত হইয়াছি ; আজ গৈরিকস্রাবের ন্যায় আমার হৃদয়ের ভাবপ্রবাহ আপনাদের সম্মুখে ছুটিতে চাহিতেছে, আত্মগোপন করিতে আমি জানি না, কোনো দিন করিতও নাই। বিশেষত আজ এমন পবিত্র দিনে, মাহেন্দ্রক্ষণে মনের কবাট খুলিয়া দেখাইতে ইচ্ছা করিতেছে যে, ওই দেখুন, আমার হৃদয়ে আমি ভারতের কি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেছি! এক ভাব, এক ধ্যান, এক জ্ঞানে একতাবদ্ধ হইয়া, এক পরিবারের মতো ভারতবাসীরা, হিন্দুমুসলমান, পার্শি-খ্রিস্টান—সকলে সর্ববিধ মনোমালিন্য ভুলিয়া, জাতিভেদ ভুলিয়া, বীণাপাণির মন্দিরে সমবেত হইয়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়া মায়ের পদে,

সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ
বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করিতেছে! বাঙলার
হৃদিবৃন্দাবনে বাস যদি করো কমলাপতি,
ওহে ভক্তপ্রিয়! আমার ভক্তি হবে রাধা সতী।

সংগীত আমি যেন শুনিতে পাইতেছি,—ওই শুনুন, ভারতের অপর প্রান্তে, সুদূর মহারাষ্ট্রদেশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে ; বাংলার শ্যামার ঔদাস্যপূর্ণ সংগীত ওই যেন রামেশ্বরের সিন্ধুতীরে মূর্ছিত হইতেছে! আবার ওই শুনুন, মহারাষ্ট্রের মধুর গীতলহরী বাংলাভাষার মধ্য দিয়া আসিয়া বঙ্গের প্রতিপল্লি মাতাইয়া তুলিতেছে। আমি যেন দেখিতে পাইতেছি, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণের মধ্যে স্ব স্ব দেশের ভাষার যে ব্যবধান বা প্রাচীর

ছিল, যাহার জন্য বাঙালি কৃষক বা পল্লিবাসী—উৎকলের বা দ্রাবিড়ের পল্লি-সংগীত বুঝিতে পারিত না, পরস্পরের ভাবের বিনিময়, সুতরাং প্রাণের বিনিময়—করিতে পারিত না, সেই ব্যবধান প্রাচীর যেন ধূলিসাৎ হইয়াছে। এখন আর 'পর পর' ভাব নাই, সব এক হইয়া গিয়াছে। বাঙালির কণ্ঠে গুর্জরের কণ্ঠ মিশিয়া এক অভূতপূর্ব , স্বপ্নময় সংগীতের প্রস্রবণ ছুটাইতেছে।

আমি অনেক দূরে ভাসিয়া আসিয়াছি। এখন প্রস্তুতের অনুসরণ করি। বলিতেছিলাম, আমরা চেষ্টা করিব ভারতে যে ক'টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাহাদের সাহায্যে একটা ভাবগত একতা স্থাপন করিতে পারি কি না। আমি এ বিষয়ে খুব আশ্বস্ত। ভারতবাসীর একাগ্রতা, অধ্যবসায় ও আত্মসমর্পণের কথা যখন মনে করি, তখন আমি বিশ্বাস করিতে পারি না যে, ভারতবাসীরা কোনো কাজে অসমর্থ, তা সে কাজ যতই দুষ্কর বা আয়াসসাধ্য হউক না কেন! পারাঞ্জপে-গোখ্‌লে-রানাডে, রামমোহন-রবীন্দ্র-ঈশ্বরচন্দ্র, প্রফুল্ল-জগদীশ-রাসবিহারী, বিবেকানন্দ-সুরেন্দ্রনাথ-সুব্রহ্মণ্য প্রমুখের দিকে যখন তাকাই, তখন আশায় আমি উৎফুল্ল হই। এ পর্যন্ত এমন কোনো কাজ ত দেখিলাম না, যাহা কঠোর বা অসাধ্য বলিয়া ভারতবাসী ছাড়িয়া দিয়াছে। সুতরাং আমাদের নিরাশ বা ভগ্নোদ্যম হইবার কোনো কারণ নাই। কাজ করিতে আসিয়াছি, করিয়া যাইব। সঙ্কল্পে যদি দোষ না থাকে, মনে যদি কলঙ্ক না থাকে, শত সহস্র মত্ত ঐরাবতেও আমাদিগকে প্রতিহত করিতে পারিবে না, মানুষ ত কোন্ ছার। এ সংসারে কেহ কাহাকেও কিছু করিয়া দেয় না, প্রকৃতপক্ষে দিতে পারে না। 'Friends and patrons cannot do what man himself should do'—কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'—সত্য কথা। শুধু দৈহিক বল নহে, দৈহিক বলের সামর্থ্য অতি অল্প, মানসিক বল চাই। মনের বলে বলীয়ান্ হও, দেখিবে বিশ্ব তোমার সমক্ষে অবনত। একবার মস্তক উত্তোলন করিয়া সিংহের ন্যায় দাঁড়াও, দেখিবে জগৎ তোমার বশংবদ। কৈ, বনের পশু সিংহকে ত কেহ রাজপদে অভিষিক্ত করে না, সে কিন্তু নিজের মনের বিক্রমে সমগ্র পশুজাতির ওপর রাজত্ব করিয়া থাকে।

নাভিষেকো ন সংস্কারঃ সিংহস্য ক্রিয়তে বনে।
বিক্রমৈর্জিতসত্ত্বস্য স্বয়মেব মৃগেন্দ্রতা।।
একোঽহমসহায়োঽহং ক্ষীণোঽহমপরিচ্ছদঃ।
স্বপ্নেঽপ্যেবংবিধা চিন্তা মৃগেন্দ্রস্য ন জায়তে।।

সুতরাং

কীসের দৈন্য, কীসের দুঃখ, কীসের লজ্জা,
কীসের ক্লেশ?

একবার ঐক্যবদ্ধ হইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হও, দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের ন্যায় এক দিকে লক্ষ রাখিয়া ব্রতানুষ্ঠান করো, সাফল্য নিশ্চিত। এই আশায় বিমুগ্ধ হইয়া যৌবনের প্রারম্ভে হইতে এই অপরাহ্ণকাল পর্যন্ত আমি কত কী-না ভাবিতেছি! আমি রাজনীতির কথা বলিতেছি না, কেন না, যাহাদের প্রকৃত শিক্ষা নাই, যাহাদের প্রকৃত একতা নাই, যাহাদের জাতীয় ভাবগত ঐক্য নাই, যাহাদের চিন্তার ধারা একই খাতে প্রবাহিত নহে, তাহাদের পক্ষে রাজনীতি-চর্চা আপাতত উত্তেজনাজনক হইলেও পরিণতিতে চিত্তে অবসাদেরই সৃষ্টি করিয়া থাকে। আমি বলিতেছি, শিক্ষার কথা, দীক্ষার কথা, ভাবগত একতার কথা। স্ব স্ব ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য না হারাইয়া, যাহার যাহা আছে তাহা বজায় রাখিয়া, কী করিয়া ভারতে এক ভাব, এক চিন্তা, এক সাহিত্যের সৃষ্টি করা যাইতে পারে, কী করিয়া সমগ্র ভারতে এক জাতীয় সাহিত্যের নির্মাণ করা যাইতে পারে, তাহাই আমার বক্তব্য। বাঙালি বাঙালিই থাকিবে, পাঞ্জাবি পাঞ্জাবিই থাকিবে, অথচ তাহারা পরস্পরে পরস্পরের যাহা কিছু উত্তম, যাহা কিছু সুন্দর, নির্মল, মনোহর, তাহা নিজের নিজের ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়া ক্রমে, ধীরে ধীরে এক হইতে শিখিবে, ইহাই আমার বক্তব্য। তাই বলিতেছিলাম, আমাদিগকে নিপুণভাবে দেখিতে হইবে যে, কি উপায়ে এই ভাবগত, জাতীয় সাহিত্যগত একতার সমাধান করিতে পারি।

যদি এই মহৎ কার্যের, এই দুঃসাধ্য কার্যের, সু-সম্পাদনের কোনও উপায় থাকে, তবে তাহা আমাদের বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি আমরা এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি যাহাতে বিদ্যার্থীরা, প্রথমত ইংরাজি ও দেশীয় ভাষায় কৃতিত্ব লাভের পর, ভারতীয় কতিপয় ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইবে; বাঙালি বি.এ., এম.এ. উপাধিমণ্ডিত যুবক দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া, বাংলা ভাষার সঙ্গে আরও দুই-একটা ভারতীয় ভাষা—হিন্দি বা মারাঠি, উর্দু বা তৈলঙ্গি ভাষা শিক্ষা করিবে, তাহা হইলে শিক্ষা-সমাপ্তির পর, সেই সকল যুবক পরকীয় ভাষার অর্থাৎ ওই হিন্দি বা মারাঠি ভাষার সম্পদ-সৌষ্ঠব ক্রমে বঙ্গভাষায় অনুক্রমিত করিয়া বঙ্গভাষার সম্পদ বর্ধিত করিতে পারিবে। যে কবিতায় বা যে লেখার উন্মাদনায় মহারাষ্ট্র উন্মত্ত, যে কবিতায় বা যে লেখার উন্মাদনায় মহারাষ্ট্র উন্মত্ত, যে কবিতায় বা যে লেখার উন্মাদনায় হিন্দুস্থান আপনার ভাবে আজও আপনি নৃত্য করে, তাহারা সেই উন্মাদনা বঙ্গভাষার শিরায় শিরায় বহাইতে পারিবে। বঙ্গের ধোয়ী, উমাপতি, জয়দেব, শরণ, গোবর্ধন আর বাংলা ভাষাতেই 'অন্তরীণ' থাকিবেন না, ভারতের বিভিন্ন দেশের ভাষাতেও তাঁহাদের মধুর বংশীরব শ্রুত হইবে।

শুধু এক প্রদেশের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই রীতির প্রবর্তন করিলে চলিবে না। ক্রমে ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই এই ভাবে দেশীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বোম্বাই-মাদ্রাজ, পাঞ্জাব-এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দেশীয় ভাষায় এম. এ. পরীক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে, নতুবা মাত্র বঙ্গে করিলে এই পারস্পরিক

'রেসিপ্রোক্যাল' ফলের সম্ভাবনা অতি অল্প। যদি এই ভাবে সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই দেশীয় ভাষায় এম.এ. পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা যায়, তবে প্রতিবর্ষে আমরা এমন দুই-চারি জন শিক্ষিত ব্যক্তি পাইব, যাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব মাতৃভাষা ছাড়া ভারতের অপর দুই-চারিটি ভাষাতেও সুপণ্ডিত। এইরূপে কিছুকাল পরে, বিশ পঁচিশ কী পঞ্চাশ বৎসর পরে, আজ যেমন ইংরাজিতে বি. এ., এম. এ.-র অনেক লোক পাইতেছি, সেই প্রকার স্বীয় মাতৃভাষা ত আছেই, তাহা ছাড়া, দেশীয় অপরাপর ভাষাতেও সুপণ্ডিত লোকের অভাব থাকিবে না। ফলে দাঁড়াইবে এই, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শিক্ষাদীক্ষা, মতিগতি সমস্ত ক্রমে এক হইতে আরম্ভ করিবে। এক দেশের যে সাহিত্য উত্তম, এক দেশের যে কবিতা উত্তম, এক দেশের যে লেখায় দেশবাসী ধন্য তাহা অন্য দেশের ভাষায় প্রবিষ্ট হইবে।

সুগম, সরল পথ প্রস্তুত করিতেই যত পরিশ্রম, একবার পথ প্রস্তুত হইলে, যদি সে পথে আপদবিপদ না থাকে, তবে চলাচল করার লোকের অভাব কোনোদিনই হয় না। এখন ভারতবর্ষে এই ভাবে জাতীয় শিক্ষার কোনো বিশিষ্ট পথ নাই। যাহা আছে তাহা সমস্তই লুপ লাইনের মতো বাঁকা পথ। এখন আর বসিয়া থাকিলে চলিবে না, আমাদিগকে কর্ড্, ক্রমে গ্রাণ্ড-কর্ড্, ও পরে গ্রেট্ কর্ড্ নির্মাণ করিতে হইবে। জানি, এ পথ তৈরি করিতে অনেক ডিনামাইটের প্রয়োজন, অনেক উত্তুঙ্গ পাহাড় উড়াইয়া দিতে হইবে, অনেক টানেল নির্মাণ করিতে হইবে, কাজ বড়োই আয়াস-সাধ্য। কিন্তু তা বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে কেন? তপস্যায় কী না হয়? অর্জুনের পাশুপত অস্ত্রলাভ যে দেশের সাহিত্যের চিত্র, প্রহলাদের সমক্ষে স্ফটিক-স্তম্ভে নরসিংহমূর্তির আবির্ভাব যে দেশের চিত্র, মৎস্যচক্র-ভেদ যে দেশের চিত্র, সে দেশে অসাধ্য কী? সে দেশে অবসাদ কীসের? প্রারম্ভের পূর্বেই যত হিসাব-নিকাশ, যত ইতস্ততঃ ; একবার কাজ আরম্ভ করিয়া দিলে, যদি মনের বল থাকে, তবে স্টিম রোলারের মতো, সমস্ত উচ্চনীচ সমান করিয়া চলিয়া যাওয়া বেশি কথা নহে। তোমার পিতৃপিতামহের নিত্য জপের মন্ত্র একবার স্মরণ করো :

একো বলবান্ শতং বিজ্ঞানবতামাকম্পয়তে,
বলেন বৈ পৃথিবী জিতা বলং বাবতিষ্ঠস্ব।

এই উদ্দেশ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এত দিন পরে ভারতীয় ভাষায় এম. এ. পরীক্ষার সৃষ্টি হইয়াছে। এই এম. এ. পরীক্ষার্থিগণকে প্রধানত এক মূল ভাষায় ও তাহার সহিত অন্তত একটি ভিন্নপ্রদেশের ভাষার পরীক্ষা দিতে হইবে ; অর্থাৎ যিনি প্রধানত বাংলা ভাষা লইবেন তাঁহাকে সেই সঙ্গে হিন্দি বা মারাঠি বা তেলেগু বা গুজরাটি লইতে হইবে, এইরূপ যিনি মারাঠি ভাষা লইবেন তাঁহাকে সেই সঙ্গে আর একটি ভাষা লইতে হইবে। যদি যথার্থ অধ্যবসায়শীল উদ্যম-সম্পন্ন কর্মঠ যুবক পাওয়া যায়, অন্তত বছরে একটিও মিলে, তবে দশ বছর পরে বাংলায় এমন দশ জন শিক্ষিত ব্যক্তিও পাইব, যাঁহারা

অবাধে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষায় যে সমস্ত অমূল্য রত্ন আছে, তাহা আনিয়া প্রতিভার সাহায্যে বঙ্গভাষা খচিত করিতে পারিবেন, বাংলার সম্পদ অনেক বাড়িয়া যাইবে। এইরূপে যদি ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও দেশীয় ভাষায় এম. এ. পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়, তবে বাংলার সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিলাম, তাহা সেই সেই দেশের পক্ষেও খাটিবে। ফলে, সমগ্র ভারতবর্ষে একটা ভাবগত একতার সাড়া পড়িবে। পরস্পরের আদান-প্রদানের সুবিধা হইবে। অদূর ভবিষ্যতে, যাহারা ইংরাজি জানে না, ইংরাজি শিক্ষার সুবিধা পায় নাই, কিন্তু দেশীয় ভাষা জানে, তাহারাও ভিন্ন দেশের মনোহর ভাবসম্পদ উপভোগ করিতে পারিবে। জনসাধারণের মধ্যে একটা ঐক্য-বন্ধনের সূত্রপাত হইবে। তখন আর দ্রাবিড়বাসীকে ইংরাজির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির মাধুর্য উপলব্ধি করিতে হইবে না। নিজের মাতৃভাষায় অপর প্রদেশের কবিত্বসৌন্দর্য অনুভব করিয়া তাহারা কৃতার্থ হইবে।

বঙ্গের সুলেখক হারানচন্দ্র বঙ্গভাষায় সংক্ষেপে মহাকবি সেক্সপীয়রের কাব্যাবলির কতকটা ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন, ইংরাজি ভাষায় অনভিজ্ঞ অনেক ব্যক্তি তাহা পাঠ করিয়া কি উক্ত কবিবরের কাব্যসৌন্দর্যের কতকটা উপভোগ করেন নাই? নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের ম্যাক্‌বেথের নাটকাকারে অনূদিত গ্রন্থ পড়িয়া ও অভিনয় দেখিয়া কে না শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিল? বিদেশীয় কবির বিদেশীয় ভাষায় লিখিত বিদেশীয় ভাবে পরিপূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র পাঠেই যদি এতটা তৃপ্তি হয়, তবে স্বদেশীয় ভাষায় লিখিত স্বদেশীয় কবির গ্রন্থের তাৎপর্য নিজ মাতৃভাষায় পাঠ করিলে কতটা আনন্দ জন্মিতে পারে, তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য। অবশ্য আমার এই মতই যে অবিসংবাদী, ভ্রমপ্রমাদশূন্য, তাহা আমি বলিতে চাহি না, কিন্তু কার্য আরম্ভ করিতে হইলে এইরূপই একটা প্রণালীতে প্রথম সূত্রপাত করিতে হইবে। আমি জানি, আমার এই প্রস্তাব কর্কশ সমালোচনার হাত এড়াইতে পারিবে না; আমি জানি, এই প্রস্তাবের উপর নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা উঠিতে পারে, আবার এই সঙ্গে আমি ইহাও জানি যে, কে কী বলিবে ভাবিয়া কোনো কাজ করিতে গেলে আর কাজ করা হয় না।

সুদুর্লভাঃ সর্বমনোরমা গিরঃ।

এই কবি-বাক্য আমি বিস্মৃত হই নাই। আমার জীবনের চিরদিনের মতো :

ধিয়াত্মনস্তাবদচারু নাচরং
জনস্তু তদ্বেদ স যদ্বদিষ্যতি।

আমাকে সর্বদাই সবল করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং যাহা ভাল বুঝিলাম, বলিলাম। যদি

কোনো মনস্বী এই প্রস্তাবের উৎকর্ষ-বিধানের অনুকূল কোনো প্রস্তাব করেন, সাদরে গ্রহণ করিব। নূতন পথে অনেক আবর্জনা থাকিয়া যায়, অনেক কণ্টক প্রথমে চোখ এড়াইয়া যায়, ক্রমে চলাচল করিতে করিতে তাহার উদ্ধার হয়। সুতরাং সাঁতার না শিখিয়া সাঁতরাইব না, এই বুদ্ধি ভাল নহে। ওপারের ওই সুন্দর নন্দন-বনে যাইতে হইলে বাহুতে ভয় করিয়া সাঁতার শিখিতে হইবে। দু'চার বার হয়ত হাবুডুবু খাইবে, তাহাতে নিরাশ হইও না, ভরসায় বুক বাঁধিয়া সাঁতরাইয়া যাও, পারে পৌঁছিতে পারিবে। তখন তোমার সকল ক্লান্তি, সকল শ্রান্তি দূর হইবে। শ্যামল বনানীর স্নিগ্ধ অঞ্চলে তুমি আনন্দে ঘুমাইয়া পড়িবে।

এ স্থলে একটা তর্কের মীমাংসা আবশ্যক মনে করি। তাহা এই, এ দেশে আজকাল ইংরাজির বহু প্রচার হইয়াছে। জ্ঞানের জন্যই হউক, আর উদরের জন্যই হউক, অথবা আর কিছু করিবার নাই বলিয়াই হউক, সকলেই অল্পবিস্তর ইংরাজি লেখাপড়া শিখিয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে আবার নূতন করিয়া এই ভারতীয় ভাষার প্রচলনের প্রয়াস কেন? যে কার্যসাধনের জন্য এই প্রয়াস, সেই কার্য বা সেই উদ্দেশ্য ত অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে ইংরাজিতেই হইতে পারে, তবে এ শিরোবেষ্টন পূর্বক মালিকা স্পর্শ কেন? ইহার উত্তরে আমার মাত্র দুইটি কথা বলিবার আছে।

প্রথম কথা, জাতীয় ভাব বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় ভাষার সেবা আবশ্যক। বিজাতীয় ভাষার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্য-গঠনের চেষ্টা করা বাতুলতার কার্য। দশভুজার পাদপদ্মে রক্ত-জবার অর্ঘ্যই মানায়, গোলাপ শত সুন্দর হইলেও মাতৃপদের অযোগ্য। ইহার অধিক আর কিছু বলিতে চাহি না।

দ্বিতীয় কথা, ইংরাজি ভাষা অর্থকরী হইলেও ভারতের অধিকাংশ লোক ইতরসাধারণ, তাহা জানে না, বা এখনও জানিবার জন্য তাহাদের প্রাণে তেমন আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় নাই। সুতরাং ইংরাজির সাহায্যে তাহাদিগকে বুঝাইতে প্রয়াস করা বৃথা। যদি তেলেগু ভাষায় বা উৎকলীয় ভাষায় বাংলার রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্রের ভাবজ সম্পদ্ ফুটাইতে পারা যায়, তবে ইংরাজিতে যতটা ফললাভের আশা করা যায়, তদপেক্ষা ফল যে লক্ষগুণ অধিক হইবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তুলসীদাসের রামায়ণ ইংরাজিতে তরজমা করিয়া আমরা কয়জনে পড়িয়া থাকি বা পড়িয়া প্রকৃত রসাস্বাদন করিতে পারি? তাই আমার মনে হয়, জাতীয় ভাব ফুটাইতে হইলে, সকলকে এক, অদ্বিতীয় জাতীয়তার সূত্রে গাঁথিতে হইলে, জাতীয় সাহিত্যে একতা-বন্ধনের চেষ্টা করিতে হইবে। বিভিন্ন জাতির ভাবের আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা স্ব স্ব জাতীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া করিতে হইবে। উচ্চশিক্ষিত হইতে নিরক্ষর কৃষককুল পর্যন্ত এক ঊর্ণনাভের জালে বেড়িয়া ফেলিতে হইবে, অন্যথা একীকরণ অসম্ভব। এইরূপ করিতে করিতে ক্রমে, এখন যে খণ্ড খণ্ড সাহিত্য-রাজ্য আছে তাহা এক বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত হইবে। সমস্ত ভেদ মিটিয়া গিয়া এক অনির্বচনীয় সুখময়, স্বপ্নময় সঙ্ঘের গঠন হইবে। তবে এই মহৎ কার্যে মহা ত্যাগ চাই। বড়ো জিনিস

পাইতে হইলে খুব বড়ো রকমের ত্যাগ আবশ্যক। যদি আমাদের সেই ত্যাগের সময় আসিয়া থাকে, তবে বলিতে হইবে যে, সে দিন আর দূরে নহে, যখন ভারতের এক প্রান্তের একটি সঙ্গীতে অপর প্রান্তের প্রতিপল্লি সাড়া দিবে। আহা, সে অবস্থার কল্পনাতেও আমার কত-না সুখ, কত-না আনন্দ!

অবশ্য যে প্রণালীতে আমি ভারতীয় ভাষার আলোচনা করিতে বলিলাম, তাহাতে ঠিক ভাষাগত একত্ব সংঘটিত হইবে না বটে, কিন্তু ভাবগত একত্ব সাধিত হইবে। ক্রমে সমগ্র ভারতে একই ভাবের বন্যা বহিবে। যদি একবার সেই ভারত-প্লাবিনী বন্যার আবির্ভাব হয়, তখন সকল অবসাদ, সকল অভাব ঘুচিয়া যাইবে। পরস্পরের সুখদুঃখের অংশীদারের অভাব থাকিবে না। একের কান্নায় অপরে কাঁদিবে, একের অভ্যুদয়ে অপরে আনন্দিত হইবে। Unification of language না হউক, unification of thought and culture নিশ্চয়ই জন্মিবে। সুতরাং সমগ্র ভারতের সকল কেন্দ্রে, সকল পল্লিতে এক স্রোত প্রবাহিত হইবে। মরুভূমিও তখন সরস হইয়া উঠিবে! ইহা আমার স্বপ্ন নহে।

কেহ কেহ বলেন, সমগ্র ভারতে এক ভাষার প্রচলন আবশ্যক, কেন-না ভাষাভেদে মনোভেদ, সুতরাং মতভেদ অনিবার্য। তাই তাঁহাদের মতে অন্তত হিন্দি ভাষা সমগ্র ভারতের জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত।

আমি কিন্তু এ মতের সমর্থন করিতে পারি না। যে কারণে ইংরাজি ভাষা আমাদের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না, সেই কারণেই হিন্দি বা অন্য কোনো একটা নির্দিষ্ট ভাষাও ভারতের একমাত্র সর্বজনীন ভাষা হইতে পারে না। ইংরাজি ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষারূপে গৃহীত হইলে যেমন প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ ক্রমে তাহার নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া অশ্বত্থপাদপজাত উপবৃক্ষের মতো হইয়া পড়িবে, সেইরূপ হিন্দিকে সমগ্র ভারতের ভাষা করিতে গেলেও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশসমূহ তাহাদের নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিবে। যে মধুরতার জন্য, যে প্রসাদগুণের জন্য, যে মনোহারিতার জন্য বাংলা ভাষা এত স্পর্ধার বস্তু, তাহা ক্রমে সিকতারাশিতে বারিবিন্দুর ন্যায় কোথায় লুপ্ত হইয়া যাইবে!

অন্য প্রদেশের সম্বন্ধেও এই একই কথা। সুতরাং আমার মতে, যে প্রদেশে যে ভাষা চিরদিন প্রচলিত, তথায় তাহা সেইরূপই থাকুক, সেই ভাষায় সেই প্রদেশের জাতীয় সাহিত্য ক্রমে বর্ধিত হউক, শ্রীসম্পন্ন হউক। সে পক্ষে কোনো বাধার প্রয়োজন নাই। কেন না না যে জাতির জাতীয় সাহিত্য নাই, তাহারা বড়োই দুর্ভাগ্য। জগতে তাহাদের স্থান অতি অল্প; কালের অক্ষয় শিলাফলকে তাহাদের কথা খোদিত থাকে না। তাহারা প্রাতঃকুজ্ঝটিকার ন্যায় অচিরকাল-মধ্যেই কোথায় মিলাইয়া যায়! সুতরাং তাহাদের জাতীয় ভাষার বিলোপ না ঘটাইয়া অন্য প্রদেশবাসীদিগকেও সেই ভাষা শিখিবার পথ সুগম করিয়া দেওয়া হউক। প্রত্যেক প্রদেশ স্ব স্ব জাতীয় ভাষায় সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-সম্পন্ন হইয়াও

অন্য প্রদেশের ভাষার যাহা গ্রহণযোগ্য, তাহা স্ব স্ব ভাষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লউক। এইরূপ করিতে পারিলে কিছুকাল পরে ভারতের সকল প্রদেশের মধ্যে একটা ভাবের একতা, চিন্তার একতা, এবং ক্রমে মনের একতা জন্মিবে। নানা ভাষা থাকা সত্ত্বেও একভাবে ভাবিত হইয়া ভারত একই লক্ষ্যের দিকে সমবেতভাবে অগ্রসর হইবে। ভারতের ভিন্ন প্রদেশের জাতীয় সাহিত্যের ধারা যাহাতে প্রতিহত হয়, দেশ-হিতৈষী কোনো ব্যক্তিরই তাহা করা উচিত নহে। আপনার ধর্মে আপনিই যাহা ধীরে ধীরে বাড়িতেছে, তাহাকে ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি বাড়াইবার জন্য বিরূপ করা কোনো মতেই যুক্তিসঙ্গত বা নীতিসঙ্গত নহে।

আমার বক্তব্য ক্রমেই দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে ; আমার মনে এত ভাব আসিতেছে, কল্পনা আমাকে এত দূর-দূরান্তরের মনোহর দৃশ্য দেখাইতেছে যে, আমি আত্মসংযম বা আত্মগোপন করিতে পারিতেছি না, আর আমি আত্মগোপন করিতে শিখিও নাই। তথাপি অদ্যকার এই সাহিত্যের 'মহা-সম্মিলনে' আমি আর আপনাদিগকে বিরক্ত করা সঙ্গত মনে করি না। আমি সাহিত্যসেবী নহি ; বঙ্গসাহিত্যের সেবক বলিয়া স্পর্ধা করিবার আমি অধিকারীও নহি, তথাপি ভালবাসিয়া আপনারা আমাকে যে অদ্যকার এই গৌরবের আসন প্রদান করিয়াছেন, সে জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

উপসংহারে বক্তব্য, বঙ্গের সাহিত্যসেবিগণ! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ, দলাদলি, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ভুলিয়া আপনারা এক মনে, এক প্রাণে একই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হউন! আর কেন? যথেষ্ট হইয়াছে। এখনও মনে মন মিশাইয়া, প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, দুর্বলকে কোলে তুলিয়া, সকলকে আপন করিয়া লইয়া এক পথে, একযোগে যাত্রা করুন, মায়ের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিবার সময়ে মনে মালিন্য রাখিতে নাই। ব্রতানুষ্ঠানের পূর্বে সংযম করিতে হয়, ইহা আপনাদেরই শাস্ত্রের আদেশ। বহিঃসংযম অনাবশ্যক, হৃদয়ের সংযম করিয়া বাগ্‌দেবতার মন্দিরের সম্মুখীন হউন, এই আমার প্রার্থনা। মন্দির-প্রবেশের পূর্বে কেবল হস্তপদাদি নহে, হৃদয়ও প্রক্ষালিত করুন, এই আমার সবিনয় নিবেদন। মনে রাখিবেন, এই বিংশ শতাব্দীতে জগতের গতি যে দিকে আপনাদিগকেও সেই দিকে যাইতে হইবে। কেন-না আপনারা জগৎ-ছাড়া নন। যাহা আজ স্বেচ্ছায় করিতে অনিচ্ছুক, কাল বাধ্য হইয়া তাহা করিতে হইবে। ভগবানের

কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ।

বাক্য বিস্মৃত হইবেন না; আর সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিবেন যে :

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।।

সভ্যগণ! ভারতবর্ষের স্মরণাতীত কাল হইতে জগতে যে প্রাধান্য, বাহুবল তাহার কারণ নহে, জ্ঞানবল তাহার কারণ। দুঃখিনী ভারতভূমির সে শিক্ষা-দীক্ষা ক্রমে মন্দীভূত হইতেছে, মায়ের আমার অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। এখনও রোগের প্রতিকারের সময় আছে, বদ্ধপরিকর হইয়া আবার ভারতভূমিকে সেই বিশ্ববরেণ্য জ্ঞানলাভে বিভূষিত করুন। ত্রিশ কোটি কণ্ঠে একবার তারস্বরে 'মা' বলিয়া ডাকুন, মায়ের আসন টলিবে, মা মুখ তুলিয়া চাহিবেন। তখন্ আবার নবীন উষার বর্ণচ্ছটায় ভারত রঞ্জিত হইবে, অজ্ঞান-অবিদ্যার অবসাদ কাটিয়া যাইবে। হৃদয়ে বল করিয়া স্মরণ করুন :

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

কীসের অবসাদ? কীসের সংশয়? কীসের সঙ্কোচ?

কবি-রঙ্গভূমি এই না সে দেশ?
ঋষিবাক্যরূপ লহরী অশেষ
বহিছে যেখানে,—যেখানে দিনেশ
অতুল উষাতে উদয় হয়?
যেখানে সরসী-সলিলে নলিনী,
যামিনী ভুলায় যেথা কুমুদিনী,
যেখানে শরৎ-চাঁদের চাঁদিনী
গগন-ললাট ভাসায়ে রয়?
তবে মিছে ভয়, কেন রে সংশয়?
গাও রে আনন্দে পুরায়ে আশয়,—
যেরূপে মায়েরে কমল আসনে,
দিয়া শতদল রাতুল চরণে,
অমর পূজিলা নন্দনবনে।

হেমচন্দ্র

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রগতি সাহিত্য

১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে সংঘের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন হয়। দীর্ঘ চার বছর পরে বর্তমান চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। দুটি সম্মেলনের মধ্যে এই দীর্ঘ ব্যবধান ঘটার প্রধান কারণ আমাদের অর্থাৎ সংঘের পরিচালকদের দুর্বলতা। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পক্ষে এরূপ সম্মেলনের গুরুত্ব আমরা সঠিক অনুভব করতে পারিনি, এবং এই অক্ষমতা এসেছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির আদর্শগত অনচ্ছতা থেকে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বাস্তব অবস্থা সম্মেলন আহ্বান করার অতিশয় প্রতিকূল ছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রচণ্ড আঘাতে ও বঙ্গবিভাগের ফলে আমাদের সংগঠন একরকম ভেঙে যায়। শাখাগুলির সঙ্গে কেন্দ্রের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। বহু শাখার অস্তিত্ব লোপ পায়। কেন্দ্রের কার্যকলাপও বহুদিন বন্ধ রাখতে হয়। এ আঘাত সামলে উঠতে না উঠতে শুরু হয়ে যায় প্রতিক্রিয়ার হিংস্র আক্রমণ।

বাস্তব বাধা ও অসুবিধাগুলির গুরুত্ব কিছুমাত্র অস্বীকার না করেও বলা যায়, এই সব বাধা ও অসুবিধা অতিক্রম করে অনেক আগেই আন্দোলনের আয়োজন করা অসম্ভব ছিল না। দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য কেবল ১৯৪৬ সালে সম্মেলন সম্ভব ছিল না, পরের বছর সম্মেলন আহ্বান করা যেত। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৭ সালে সম্মেলন ডাকা সম্পর্কে আলোচনা ও প্রাথমিক পরিকল্পনা স্থির হয়, সংঘের সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বুলেটিনে বাংলা শাখার রিপোর্টে এই পরিকল্পনার উল্লেখ আছে। প্রতিক্রিয়ার সরকারি ও বেসরকারি আক্রমণও এতদিন সম্মেলন না ডাকার অনিবার্য কারণ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। প্রতিক্রিয়ার বেসরকারি আর্তনাদ এখন তীক্ষ্ণতর, এবং সরকারি দমননীতি তীব্রতর হয়েছে এবং আমরা এই সম্মেলনের আয়োজনও করেছি।

সুতরাং সম্মেলন এই ১৯৪৯-এ পিছিয়ে আনার প্রধান দায়িত্ব সংঘের পরিচালকমণ্ডলীর। বলা বাহুল্য, যুগ্মসম্পাদক দুজন এ বিষয়ে সকলের চেয়ে বেশি দায়ী।

আজ এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আমাদের অন্যান্য ভুলভ্রান্তির মতো এই

নিষ্ক্রিয়তার মূল উৎস হচ্ছে, বর্তমান জগতের বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রগতিশীল শিল্পী ও সাহিত্যিকদের ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের দ্বিধা-সংশয়হীন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। আদর্শগত দ্বিধা-সংশয় দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতিশীল শক্তির বিরাট অভ্যুত্থান সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে আমরা প্রগতির ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে এনেছি সত্য, কিন্তু এগিয়েছি আমরা দ্বিধাগ্রস্তভাবে, বাস্তবতার দ্রুত রূপান্তরের অনেকখানি পিছনে পিছনে। আদর্শ ও বাস্তবের সমন্বয় করতে, সত্যোপলব্ধির আলোতে আজকের দিনে প্রগতিশীল শিল্পী ও সাহিত্যিকদের লক্ষ্য কী, কর্তব্য কী, এ বিষয়ে দ্বিধাহীন, আপোষহীন শাণিত তীক্ষ্ণ আহ্বান, সংঘ দিতে পারেনি।

সংঘের গত কয়েক বছরের ইতিহাস সমগ্র দৃষ্টিতে বিচার করলে এই দুর্বলতার সুস্পষ্ট চেহারা এবং এই দুর্বলতা সত্ত্বেও, প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও আন্দোলনের অভূতপূর্ব প্রসার আমাদের কাছে ধরা পড়ে।

যুদ্ধের সময় সংঘের ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনের প্রসার লাভ ও শক্তিশালী বৃহৎ সংগঠন গড়ে ওঠা, বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে সংঘটিত হয়। এই সাফল্যের একটি বিশেষ তাৎপর্য আজ আমাদের লক্ষ করা প্রয়োজন। ১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে সংঘের কেন্দ্রীয় শাখার সভ্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৭৫ জন—এক বছরের মধ্যে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৪২ জন; সংঘের শাখা ছিল মাত্র ২টি, বাংলার বিভিন্ন জেলায় সক্রিয় ১৪টি শাখা গড়ে ওঠে।

কেন্দ্র ও শাখাগুলির মোট সভ্যসংখ্যা হাজারের উপরে উঠে যায়। কলিকাতা ও মফঃস্বলে বহু সাংস্কৃতিক সভা, শিল্প-সাহিত্য ও সমাজ-জীবনের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা, পুস্তক প্রকাশ, লাইব্রেরি পরিচালনা প্রভৃতি নানা কাজের মধ্যে আন্দোলন অসাধারণ শক্তি সঞ্চয় করে।

কেবল বাংলায় নয়, সারা ভারতে ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে সংঘের সর্বভারতীয় বিরাট সংগঠন গড়ে ওঠে।

এই অসাধারণ সাফল্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই, আদর্শ ও আন্দোলন সম্পর্কিত একটি সহজ সত্যই আরেকবার প্রমাণিত হয়েছিল এই সাফল্যের মধ্যে যে, আদর্শ ও সংগঠন পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। আদর্শে খুঁত থাকবে, অথচ সংগঠন নিখুঁত হবে, বা সংগঠনে খুঁত রেখেও নিখুঁত আদর্শ সার্থক হবে, এটা অসম্ভব। আদর্শ ও সংগঠন বা আন্দোলন পরস্পরের পরিপোষক ও পরিপূরক; অবিচ্ছিন্ন, অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সমাজ-জীবন ও শিল্প-সাহিত্যের সম্পর্কে মার্কসিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি কি তখন আমাদের নিখুঁত ছিল? আজকের চেয়ে পরিষ্কার ধারণা ছিল শিল্পী ও সাহিত্যিকের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে? তা নয়, দৃষ্টি তখন আমাদের অনেকখানি ঝাপ্‌সাই ছিল, আদর্শগত সমগ্রতার দিক থেকে।

কিন্তু তখনকার পরিস্থিতিতে, পৃথিবীব্যাপী সংকটের সীমাবদ্ধ বাস্তবতায় আমাদের

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মূল আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল নির্ভুল। সোভিয়েতের নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী সংগ্রাম চলার সময় প্রগতিবাদী শিল্পী ও সাহিত্যিকের একমাত্র কর্তব্য সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তার সবটুকু সৃজনীশক্তি দ্বিধাহীন চিত্তে ফ্যাসিবাদের উচ্ছেদ সাধনে প্রয়োগ করা।

অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় ১৯৪৫ সালে তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে, ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ নাম পরিবর্তন করে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ নাম রাখা হয়। পরিবর্তিত অবস্থায় আমাদের আদর্শগত সামগ্রিক ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন ক্রমে ক্রমে জরুরি হয়ে ওঠে। শিল্প ও সাহিত্যের ফর্ম কন্টেন্ট থেকে শুরু করে সামাজিক ভূমিকা পর্যন্ত নানা বিষয়ে, এত প্রশ্ন ও সংশয়ের সম্মুখীন আমাদের হতে হয় যে, মার্কসবাদের বিজ্ঞানসম্মত বিচারের ভিত্তিতে প্রগতি আন্দোলনের নির্ভুল ও সর্বাঙ্গীণ আদর্শ স্থির করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

এই চেতনার তাগিদে, সংঘের বিভিন্ন সভার ও সাপ্তাহিক বুধবারের বৈঠকে এবং 'পরিচয়' ও অন্যান্য প্রগতিবাদী পত্রিকায়, বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রবন্ধের মাধ্যমে সঠিক মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। শিল্পী সাহিত্যিক ও সংঘের অন্যান্য সভ্যদের বড়ো একটি অংশের মধ্যে আদর্শের দিকটা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা গড়ে তোলার জন্য বিশেষ আগ্রহ এবং উৎসাহ দেখা যায়। দৃষ্টিভঙ্গির ক্রমবিকাশের সঙ্গে এই আগ্রহ ও উৎসাহ। অন্যদিকে, দৃষ্টিভঙ্গিকে সাফ করার এই আন্তরিক প্রচেষ্টার মধ্যে বুর্জোয়া মনোবৃত্তি সম্পন্ন সুবিধাবাদী কিছু কিছু শিল্পী সাহিত্যিকের মানসিক দৈন্য প্রকট হয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে সংঘ থেকে সরে গিয়ে এরা প্রগতি-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

শিল্প ও সাহিত্যের থিয়োরির দিকটা সম্পর্কে আমাদের এই ঝোঁক, অপ্রয়োজনীয় বুদ্ধিবিলাস ছিল না, এদিকে আরও বেশি সক্রিয়তা ও উৎসাহেরই বরং প্রয়োজন ছিল। আর্ট ও সমাজ সম্পর্কে সঠিক মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার এই অভিযানের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এক নিষ্ঠুর সত্য, বিদেশি শাসক কত যত্ন আর অধ্যবসায়ের সঙ্গে তার পদানত দেশের মানুষগুলির চিন্তাজগতে পুরোনো মৃত যুগের কত বিভ্রান্তির জঞ্জালকে, কত অন্ধ সংস্কারকে জিইয়ে রাখে, স্বাধীন দেশে কালের গতির সঙ্গে আপনা থেকে যা ধুয়ে মুছে যায়।

আমাদের মানবজগতের ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণে সযত্নে রক্ষা করা বহু সংস্কার ও বিশ্বাসের মূলগুলি উপড়ে ফেলার জন্য, থিয়োরি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার অফুরন্ত প্রয়োজন আছে। আমাদের ত্রুটি এদিকে ঘটেনি, আমাদের ভুল হয়েছে অন্যদিকে। দেশে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থার দ্রুত রূপান্তর সম্পর্কে একেবারে উদাসীন না থাকলেও, এদিকে যতখানি মনোযোগ দেওয়া, এই বাস্তবতাকে যতখানি গুরুত্ব দেওয়া একান্তভাবে জরুরি ছিল, আমরা তা দিইনি। আমাদের গলদ থেকে গিয়েছিল, প্রতি পদক্ষেপে বাস্তবের

সঙ্গে মিলিয়ে না দিলে আদর্শগত বিভ্রান্তি বা মোহ থেকে যে মুক্ত থাকা যায় না, এই সহজ সত্যের উপলব্ধিতে।

শ্রেণিসংগ্রাম, শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী ভূমিকা এবং সোভিয়েতের নেতৃত্বে জগতে ধনতন্ত্রের অবসান ও নূতন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, এদেশে বুর্জোয়া শ্রেণির, প্রগতিশীল ভূমিকা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার শিবিরে যোগদান, এই সব সত্যকে সচেতনভাবে গ্রহণ করেও, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই সব সত্যের বাস্তব অভিব্যক্তি যে এক হওয়া উচিত, সে বিষয়ে আমাদের বিভ্রান্তি থেকে গিয়েছিল। সমস্ত জগৎ দুটি বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও যে তার প্রতিফলন ঘটবে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার একইরূপ আপোষহীন সংঘাতের মধ্যে, প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে চেপে মারার বহুরূপী প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন অভিযান প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকবে, এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন হতে পারিনি।

আমরা তাই সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পুরোনো ধারার জের টেনে এসেছি। শ্রমিক ও বিপ্লবী জনসাধারণের নূতন সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজে এগোতে এগোতেও বজায় রাখতে চেয়েছি বুর্জোয়া জগতের সঙ্গে ভাবগত আত্মীয়তা। আমরা যে সচেতনভাবে, সক্রিয়ভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণি ও বিপ্লবী. জনসাধারণের পক্ষে, সোভিয়েতের পক্ষে, দৃঢ় কণ্ঠে একথা ঘোষণা করতে আমরা ইতস্তত করেছি।

সংঘ এদিকে যেমন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মধ্যে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বজায় রেখে অগ্রসর হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি এই দ্বিধাগ্রস্ততার পরিচয়ও দিয়ে এসেছে।

দাঙ্গাহাঙ্গামা যখন প্রচণ্ডতম হয়ে দাঁড়ায়, তখন কিছুদিন ছাড়া সংঘ কোনোদিনই নিষ্ক্রিয় থাকেনি। সংঘের সাধারণ নিয়মিত কাজের মধ্যে সোমেন চন্দ লাইব্রেরি ও পাঠাগার পরিচালনা, এবং বুধবারের বৈঠক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী বক্তা পাঠাবার ব্যবস্থাও সংঘ বরাবর করে এসেছে। দাঙ্গার সময়, সংঘের উদ্যোগে ও পরিচালনায় শিল্পী ও সাহিত্যিকদের বিরাট দাঙ্গা-বিরোধী অভিযান গঠন এবং শ্রমিকশ্রেণির দাঙ্গা-বিরোধী চেতনাকে শিল্পে সাহিত্যে, চিত্র ও রচনার মধ্যে রূপায়ণ, এবং শিল্পী সাহিত্যিকদের ঐক্যবদ্ধ সভা ও শোভাযাত্রায় সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি দেওয়া, আমাদের সংঘের পক্ষেই সম্ভব ছিল। এই সময় (১৯৪৬) বঙ্গীয় সংস্কৃতি পরিষদ স্থাপনের প্রচেষ্টা করা হয়। অপর দিকে ১৯৪৭-এর পনেরোই আগস্ট ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে, সর্বদলীয় শিল্পী সাহিত্যিকদের সাংস্কৃতিক ঐক্যমূল্য দিতে বিরাট সভার অনুষ্ঠান করে, শ্রেণিস্বার্থে বিভক্ত জগতে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবাস্তব ও অসম্ভব সর্বদলীয় ঐক্যের প্রতি মোহের পরিচয়ও সংঘ দিয়েছিল। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দুটি বিরোধী ধারাও স্পষ্ট থেকে

স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে রাজনীতির ক্ষেত্রে তথাকথিত স্বাধীনতা পাওয়া সম্পর্কে শ্রমিক ও জনসাধারণের মোহভঙ্গের প্রতিক্রিয়া শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই দুটি ধারায় বিরোধীরূপ—প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল রূপ প্রকট হয়ে ওঠে। 'আর্ট ফর আর্টস সেক'-এর পন্থী শিল্পী ও সাহিত্যিকের নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী কয়েকজন নামকরা ব্যক্তির সঙ্গে, সংঘের প্রগতিবাদী সভ্যদের মতের সংঘাত তীব্র হয়ে ওঠে। সংঘ দৃঢ়তার সঙ্গে এই ভ্রান্তমতের বিরোধিতা করে। প্রগতিবিরোধী এই সাহিত্যিকেরা সংঘ থেকে সরে গিয়ে সংঘকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে নিন্দা ও মিথ্যাপ্রচারের অভিযান শুরু করেন।

প্রকৃতপক্ষে, প্রগতিবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বিভিন্ন 'সাংস্কৃতিক' পত্রিকা এবং প্রতিক্রিয়াশীল লেখকদের সংগঠন এই সময় আমাদের সংঘের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করে।

আমাদের সংঘের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে স্থাপিত 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ' সক্রিয় হতে চেষ্টা করে। কিন্তু মৃত সংস্কৃতির জের টেনে প্রগতিশীল নূতন ও জীবন্ত সংস্কৃতির বিরোধিতায় নামার অর্থই, ভাব ও প্রেরণার অসীম দৈন্য এই দৈন্য নিয়ে কোনো সংঘ প্রাণবান ও সক্রিয় হতে পারে না। 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ' তাই বারবার মাথা তুলতে চেয়ে ঝিমিয়ে গিয়েছে।

আমাদের সংঘ সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এই আক্রমণের প্রতিরোধ করেছে, 'পরিচয়' এবং অন্যান্য প্রগতিবাদী পত্রিকার সাহায্যে এবং সাংস্কৃতির অনুষ্ঠান প্রভৃতির আয়োজন করে। প্রগতিশীল মতবাদের প্রচারে 'পরিচয়'-এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতি-বিরোধী ধারা প্রবল হবার পর 'পরিচয়'-এর সম্পাদকীয় নীতির যে পরিবর্তন করা হয়, এবং যে দৃঢ়তার সঙ্গে এ নীতি অনুসরণ করা হয় তা বিশেষ অভিনন্দনের যোগ্য।

বিরোধীপক্ষের প্রবল আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের সংঘ প্রশংসনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে, কিন্তু প্রতিরোধ গড়ে তুলবার সক্রিয় প্রচেষ্টা সম্পর্কে সংঘ সম্পূর্ণ সচেতন হতে পারেনি। বুর্জোয়া ভাবধারার মোহ সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে না পারায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতির ধারা আজ কতদূর শক্তিশালী, সংঘের পুরোপুরি সে ধারণা জন্মায়নি, এবং এই শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ রূপ দেবার দায়িত্ব পালনে উদাসীনতা থেকে গিয়েছে। বর্তমান যুগে শ্রমিকশ্রেণি ও জনসাধারণের বিপ্লবী চেতনা যতদূর অগ্রসর হয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ধারার ততখানি শক্তিশালী করার সম্ভাবনাও সেই সঙ্গে সৃষ্টি হয়ে যায়। বাংলার শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নূতন সংস্কৃতির দুর্বার জোয়ার আনার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়ে আছে বহুমুখী বিক্ষিপ্ত প্রগতিশীল ধারাগুলির মধ্যে। আমরাই গাফিলতি করে এতদিন ধারাগুলিকে একত্র করে জোয়ার সৃষ্টি করতে পারিনি।

গত এক বছর প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ, নিন্দা ও অপপ্রচারের স্তর অতিক্রম করে, প্রগতিশীল

লেখক, শিল্পী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারি নির্যাতনের স্তরে পৌঁচেছে। সংঘের বিশিষ্ট সভ্য শ্রীগোপাল হালদার, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় আজ বহুদিন বিনা বিচারে আটক হয়ে আছেন। সংঘের কেন্দ্রীয় আপিসে একাধিকবার পুলিশের পদার্পণ ঘটেছে, কয়েকটি শাখায় সার্চ করে উৎসাহী কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান গণনাট্য সংঘ এবং সোভিয়েত সুহৃদ সংঘও পুলিশের কৃপালাভ থেকে বঞ্চিত হয়নি।

এই আক্রমণের প্রতিরোধে সংঘের উদ্যোগে 'সংস্কৃতি স্বাধীনতা পরিষদ' স্থাপিত হয়। বুদ্ধিজীবীদের সামনে সংস্কৃতির এই নূতন সংকটের স্বরূপ তুলে ধরা ও জোরালো প্রতিবাদ সৃষ্টি করার কাজে 'সংস্কৃতি স্বাধীনতা পরিষদের' ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যুদ্ধাবসানের পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবস্থার দ্রুত রূপান্তর হয়েছে। আজ সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আমেরিকার নেতৃত্বাধীনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সংঘবদ্ধ হয়ে নূতন বিশ্বযুদ্ধের প্রকাশ্য প্রচারের রূপ নিয়েছে। এই সোভিয়েত বিরোধিতা রাজনীতির ক্ষেত্র অতিক্রম করে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ফ্যাসিস্ট দমননীতিতে পরিণত হতে আরম্ভ করেছে। তাই, যেটুকু মোহ ও জড়তা অবশিষ্ট ছিল আজ তা ঝেড়ে ফেলবার জরুরি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

সন্দেহ নেই আমরা তা পারবো। প্রগতির অভিযান সকল বাধা ঠেলে সরিয়ে এগিয়ে যাবে।

বাংলায় ভারতীয় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের একটি হিন্দী ও একটি উর্দু শাখা আছে। এই শাখা দুটির সঙ্গে এতদিন আমাদের প্রায় কোনো যোগাযোগই ছিল না। অল্পদিন হয় এঁদের সঙ্গে আমাদের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। তাই এই প্রতিষ্ঠান দুটির নাম উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হতে হচ্ছে।

বহু প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান, পত্রিকা ও ব্যক্তির কাছ থেকে প্রগতি লেখক ও শিল্পীসংঘ নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেছে। আমরা সহযাত্রী, আমাদের মধ্যে ঋণ স্বীকার ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যবধানটুকুও আমরা রাখতে চাই না।

২২ এপ্রিল ১৯৪৯

১৯৪৯ সালে অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে প্রদত্ত ভাষণ

দীনেশচন্দ্র সেন

অভিভাষণ

প্রিয় বন্ধুগণ,

আপনাদের সদয় আমন্ত্রণ পাইবার অব্যবহিত পূর্বে দিল্লিতে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অধিনায়কত্ব করিবার জন্য রায় বাহাদুর অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। আমার বয়স ৬৯ বছর এবং বয়স হিসেবেও আমি একটু বেশি ভাঙিয়া পড়িয়াছি, সুতরাং দিল্লির আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কিন্তু রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র মহাশয়ের নিমন্ত্রণ দূরাগত বংশী রবের মতো আমাকে আকর্ষণ করিয়াছিল। বহুদিন আমি ঢাকায় আসি নাই। যে স্থানে আমার সুখ-কৈশোর ও যৌবনের বহু বছর কাটাইয়াছি, যে স্থানে আমার তরুণ বয়সের স্মৃতির শত প্রিয় কাহিনি ও পিতামাতার পদরজঃপূত, সেই পুণ্য মাতৃভূমি, ঢাকা জেলা মৃত্যুর পূর্বে একবার দেখিবার এই সুযোগ। এ সুযোগ ছাড়িয়া দিলে হয়ত এভূমি দর্শন ভাগ্যে আর ঘটিবে না। আপনারা অযোগ্য ব্যক্তিকে সম্মানিত করিয়া 'অমানিনা মানদেন' শ্লোকের সার্থকতা করিয়াছেন। এই সম্মান আমার পক্ষে একান্ত শ্লাঘার বিষয়, কিন্তু এখানে সভাপতিত্ব করিবার গৌরব ছাপাইয়া উঠিয়াছে, আমার মাতৃভূমি শেষ দর্শনের ঐকান্তিক লালসা। কতদিন জাগ্রতে ও স্বপ্নে, মনের নিভৃতে বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরীর কলনিনাদ শুনিয়াছি, কতদিন জেন্দাবাহারের গলির অপ্রশস্ত পথ ঘাট, বাবুর বাজারের সাঁকো ও মাদারজাণ্ডার কালীবাড়ি—সুয়াপুর, নায়ার ও সাভারের প্রিয়দর্শন পুষ্পিত লতা, ফলভারাবনত তরুরাজি ও 'পদ্মোৎপলঝধাকুলা' পুষ্করিণীগুলি আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি। পৃথিবীর অন্য কোথাও সেরূপ স্বর্ণমণ্ডিত সৌরকিরণ এবং স্নিগ্ধ চাঁদের আলো দেখি নাই! কত স্থানই দেখিয়াছি, কিন্তু আমাদের আমবাগের প্রান্তে বৃহৎ তিন্তিড়ী বৃক্ষটির ছায়া চাঁদের আলো আড়াল করিয়া যেরূপ আলো ও আঁধারের স্বপ্ন-খচিত দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করিত, তেমন প্রিয়-চিত্র আমি আর কোথাও দেখি নাই। কোনো স্থানে হিজলগাছ দেখিলে আমার বাড়ির পার্শ্বের লাল ফুলের সেই দোদুল্যমান কুণ্ডলটির ন্যায় বৃক্ষলগ্ন মালার লহর মনে পড়িয়াছে। আজ ভাগ্যবশত আবার সেই শৈশবের

নীলাকাশের নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। পিতামাতা ও পরলোকগত স্বগণ ও সুহৃদবৃন্দের নিশ্বাসের সুরভি লইয়া যেন এই দেশের বাতাস আমার কর্ণে কত প্রিয় কথা শুনাইতেছে। 'নিশ্বাসইব বন্ধুনাং বাতি বায়ুর্মনোহরঃ'। বন্ধুগণ, আমার এই উচ্ছ্বাস অসম্বন্ধ ও অসংলগ্ন, আপনারা আমাকে ক্ষমা করিয়া লইবেন। আমি গঙ্গাতীরে বাস করি; কিন্তু আমার মনে হয়, যে স্থানে আমার পিতামহ, পিতামহী এবং মাতাপিতা অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন, সেই পুত স্বগ্রামের শ্মশানে যদি আমি অন্তিমকালে এই আকাশ দেখিতে দেখিতে নয়ন মুদিত করিতে পারি, তবে গঙ্গাতীরে মৃত্যুর পুণ্য আমি চাহিব না।

আমি যখন ঢাকা কলেজে প্রথম ভর্তি হই, তখনকার কথা আমি একটুও ভুলি নাই। ১৮৮২ সন—তখন আমার বয়স ১৪ কি ১৫, কিন্তু আমাকে ১২।১৩ বয়সের মতো দেখাইত। বুড়িগঙ্গার ঘাটে যখন সন্ধ্যায় বেড়াইতাম তখন মাঝে মাঝে লোকে আমাকে দেখাইয়া বলিত 'এই ছোট্ট ছেলেটি এন্ট্রান্স পাশ করিয়াছে।' কিন্তু আমার শিক্ষাজীবনে গৌরব করিবার কিছুই নাই। আমি মাইনর, এন্ট্রান্স ও এফ-এ—প্রত্যেক পরীক্ষাই তৃতীয় শ্রেণিতে পাশ করিয়াছিলাম। বি.এ. পরীক্ষায় ইংরেজিতে অনার্স পাই, কিন্তু অতি নিম্নের কোঠায়। এই যে তৃতীয় শ্রেণিতে অতি অগৌরবে পরীক্ষা পাশ করিয়া কোনোরূপে ত্রাণ পাইতাম, তাহার ওপরও হিংসার তীব্র বাণ সহিতে হইত। আমার সহাধ্যায়ী বেহারী চক্রবর্তী সাতবার এন্ট্রান্স ফেল করেন, তিনি এবং তাঁহার মতো কয়েকজন দুর্ভাগ্য ছাত্র পরীক্ষার ফল বাহির হইলে শিক্ষকদের নিকট বলিতেন 'আমরা ফেল হইয়াছি, তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু দীনেশও পাশ করিল।' তাহাদের এই ক্ষোভ সঙ্গত ছিল, কারণ সেকেণ্ড ক্লাস হইতে গণিতে এক শতের মধ্যে ৬ পাইয়া আমি সুপারিশের জোরে প্রমোশন পাইয়াছিলাম এবং সারা বৎসর স্কুল-কলেজে পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখিতাম না। পরীক্ষার পূর্বরাত্রেও গল্পগুজব করিয়া কিংবা সেতার বাজাইয়া কাটাইতাম। এই সকল ব্যক্তিগত কথা কতকটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে, কিন্তু এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার কারণ এই যে, যাঁহারা প্রাথমিক জীবনে অকৃতকার্য হইয়া থাকেন, তাঁহারা জানিবেন যে একাগ্র চেষ্টার ফলে পরিমাণে অন্তত আমার ন্যায় সামান্য প্রতিষ্ঠালাভও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। আমাদের সময়ে পূর্ণ রাউৎ, দীনবন্ধু দে, হরিশ, মনোমোহন ভট্টাচার্য প্রভৃতি 'ভাল ছেলে' ছিলেন—ইঁহারা পরীক্ষায় বৃত্তি পাইতেন। বৎসর কয়েক হইল, গৌরীপুর স্টেটের প্রধান কর্মকর্তা মনমোহন ভট্টাচার্য আমাকে বলিয়াছিলেন 'আমরা সর্বদা পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছি, তুই সকলের পেছনে ছিলি, তুই কেমন করিয়া জীবনে আমাদিগকে ডিঙাইয়া গেলি।' আমি বলিয়াছিলাম 'আমি ডিঙাইয়া যাই নাই, চিরদিনই, ভাই তোমাদের পেছনে আছি।'

এই অবজ্ঞাত শীর্ণ-দেহ, ক্ষুদ্র বালক কলেজে প্রবেশ করিয়া আর কি গৌরব লাভ করিবে? কলেজিয়েট স্কুলে পড়িবার সময় প্রসন্ন পণ্ডিত মহাশয় প্রায়ই আমাকে বেত্রাঘাত

করিতেন। আমি যেবার প্রথম বার্ষিক শ্রেণিতে ভর্তি হই, সেবার ভাবিলাম 'যা হৌক্, প্রসন্ন পণ্ডিতের হাত এবার এড়াইলাম' কিন্তু দৈব্যক্রমে সেই বছরই পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র ঢাকা কলেজে প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণিতে পড়াইবার ভার প্রাপ্ত হইলেন। একদিন আমি ক্লাসে গোলমাল করিতেছিলাম, তিনি তাঁহার চিরভীতিদায়ক অগ্নিমূর্তিতে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া দুইটি কর্ণ কঠোর হস্তে নিষ্পেষণ করিয়া বলিলেন, 'গর্দভ, টুলের ওপর দাঁড়া হ, ভেবেছিস বুঝি, তুই কলেজে ঢুকিয়া খুব একটা বড়ো কিছু হয়ে গেছিস্।' আমার বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার শক্তি রহিল না, প্রথম বার্ষিক শ্রেণিতে পড়িয়াও কিছু কালের জন্য টুলের ওপর দাঁড় হইতে হইল। এখনকার দিনে কোনো প্রথম বার্ষিক শ্রেণির ছাত্রের ওপর অধ্যাপক এই ভাবের জুলুম চালাইলে বঙ্গের পূর্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ছাত্র সমাজে একটা মস্তবড়ো হৈ চৈ পড়িয়া যাইত। পিতামাতা তখনকার দিনে সন্তানদের উপর যে সকল দৈহিক নির্যাতন করিতেন, তাহা তাহাদিগকে এখন আর সহিতে হয় না। আমি যখন বি. এ. ক্লাসে পড়ি, তখনও আমি আমার মাতৃদেবীর হাতের সন্দেশের ন্যায় তাঁহার হাতের চড় থাপড়ও খাইয়াছি। আমার মাসতুতো ভ্রাতা জগদীশচন্দ্র সেন, এম. এ. পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রথম স্থান অধিকার করার পরেও আমার মাসীমাতার হাতে মার খাইয়াছেন। এখন কি সন্তান ও ছাত্রেরা এইরূপ ব্যবহার সহ্য করিবে? ১০।১২ বছরের ছেলেকে চোখ রাঙাইলে সে গলায় দড়ি দিয়া মরিতে যায়। তখনকার দিনে পিতামাতা ও গুরু ভগবানের আসনে আসীন ছিলেন। তাঁহাদের সেই আসন টলিয়াছে। কিন্তু যিনি আমাদের পিতার পিতা, উপনিষদে যাঁহাকে 'বিশ্বের পিতা, মাতা ও পিতামহ' বলিয়াছেন, তিনি তো প্রতিদিনই তাঁহার প্রিয় সন্তানদিগকে প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করিতেছেন, সে দণ্ডের বিরাম নাই।

আমার অনাগত যৌবনের ইতিহাস এইরূপ প্রহার ও দৈহিক দণ্ডের কথায় পূর্ণ। ঢাকা জগন্নাথ স্কুলের পণ্ডিত বৈকুণ্ঠনাথ নাথ মহাশয়ের হস্তে যে আমরা কত প্রহার প্রসাদ লাভ করিয়াছি, তাহার অবধি নাই। তাঁহার বেত্রের ছিল অবাধ গতি, নির্বিচারে তাহা ক্লাসে ভোঁ ভোঁ শব্দে ছাত্রদের পিঠের উপর ঘূর্ণিত হইত।

ঢাকা কলেজে আমাদের সময়ে (১৮৮২-১৮৮৭ খ্রি.) হিল সাহেব ছিলেন ইংরেজির অধ্যাপক। গণিত পড়াইতেন বুথ ও অধ্যাপক রাজকুমার সেন। বুথ গণিতে অতি বড়ো কৃতী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মেজাজ ও ব্যবহার ছিল খাঁটি ভট্টাচার্যের মতো। একদিন কলেজে এফ. এ. পরীক্ষা চলিতেছে; তিনি পরীক্ষার্থীদের পঙ্‌ক্তির ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া হঠাৎ একটি ছাত্রের কাছে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, সে কি লিখিতেছে। তারপর বলিয়া উঠিলেন 'না না, না—সব ভুল করে ফেলছ যে' এই বলিয়া পকেট হইতে পেন্সিলটি লইয়া ছাত্রের খাতার এক প্রান্তে অঙ্কটি শুদ্ধ করিয়া কষিয়া ফেলিলেন, এবং শিস্ দিতে দিতে পরীক্ষা-গৃহ হইয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ছাত্রগণ অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

হিল সাহেব ছিলেন খুব রগড়ে লোক। ক্লাসে আমাকে সর্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক ও খর্বাকৃতি

দেখিয়া প্রায়ই ঠাট্টা করিতেন। তাঁহার রহস্যের আর একটি পাত্র ছিল ওহিদুদ্দিন। একদিন খুব বৃষ্টি হইতেছিল, ওহিদুদ্দিনের ক্লাসে আসিতে একটু দেরি হইয়াছিল। ক্লাস বসিবার প্রায় পনেরো মিনিট পরে সে ভিজিতে ভিজিতে ঢুকিয়া পড়িল। হিল সাহেব বলিলেন Ohiduddin, did you melt in the way? (ওহিদুদ্দিন, তুমি কি রাস্তায় বৃষ্টিতে গলিয়া গিয়াছিলে?)। অধ্যাপক S.C. Hill কয়েক বছর পরে বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারি হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহিত আমি দেখা করিয়াছিলাম। তিনি কতই না আনন্দের সহিত বহুক্ষণ আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়াছিলেন। আমাদের সময়ে গণিতের আর একজন অধ্যাপক ছিলেন সারদারঞ্জন রায়। তিনি যেমন গণিতে অভিজ্ঞ ছিলেন তেমনই সংস্কৃতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার কৃতিত্বের কথা অনেকেই জানেন। খেলার মাঠে তাঁহার সঙ্গে ঢাকা কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ পোপ সাহেবের একটা বাক্ যুদ্ধ হইয়া যায়। রায় মহাশয় অতি তেজস্বী ছিলেন, তিনি অপমানিত মনে করিয়া সরকারি চাকুরিতে এস্তফা দিয়াছিলেন এবং শেষে কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। খেলাধুলা, গণিত ও অঙ্কশাস্ত্র ছাড়া তাঁহার আর একটি বিষয়েও খেয়ালের অন্ত ছিল না। তিনি বড়শি দ্বারা মাছ ধরিতে ভালবাসিতেন। কলিকাতার নিকটবর্তী গ্রামগুলির এমন একটি দিঘি বা বড়ো পুষ্করিণী ছিল না, যেখানে সারদারঞ্জন ও তাঁহার বন্ধু অধ্যাপক সতীশচন্দ্র বসু মাছ ধরিতে না গিয়াছেন। যে একাগ্রতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সহিত শীতাতপ, ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টি সহ্য করিয়া ইহারা মৎস্য ধরিবার চেষ্টায় নিরত থাকিতেন, তাহা পঞ্চতপা সন্ন্যাসীদের উপযুক্ত। আমার বেহালার বাগান বাড়ির নাতিবৃহৎ পুষ্করিণীটির সন্ধান পাইয়া ইহারা ২।৪ বার মাছ ধরিতে আসিয়াছিলেন। এক একবার ৫। ৭ টাকার 'চার' নষ্ট করিয়া হয়ত কিছুই পাইতেন না। একদিন প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাদিন পাঁচ ছয় টাকার 'চার' খরচ করিয়াও আমার পুকুরে ইহারা কোনো মাছ পান নাই। সন্ধ্যার সময় ৪ সের ওজনের একটি রোহিত মৎস্য শিকার করিয়া তাহাও আমাকে উপহার দিয়া চলিয়া গেলেন।

আমাদের সময় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। বুথ সাহেব যখন অঙ্ক ও গ্যানোর Physics পড়াইতেন, তখন আমি ও ইয়াসিন্ আলি গ্যালারির ঊর্ধ্বতন মঞ্চে বসিয়া পরস্পরের নিকট কবিতায় প্রশ্ন ও উত্তর লিখিতাম, কিংবা পলাইয়া জজ আদালতে যাইয়া আনন্দ রায়ের বক্তৃতা শুনিতাম। তখন লজিক পড়াইতেন ডাক্তার পি. কে. রায়—এবং অধ্যাপক শশিভূষণ দত্ত। উভয়েরই সৌম্য শিষ্ট প্রশান্ত মূর্তি স্থির প্রস্তর বিগ্রহের ন্যায়। ইঁহারা ঠিক পাঠ্য পুস্তক পড়াইয়া যাইতেন, কোনোদিন ইঁহাদিগকে গল্পগুজব করিতে বা রাগিয়া যাইতে দেখি নাই। প্রথম বার্ষিক শ্রেণিতে পড়িবার সময় আমি সুপ্রসিদ্ধ *নবজীবন* কাগজে 'পূজার কুসুম' শীর্ষক একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাই। এই পত্রিকা বঙ্কিম বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সঞ্জীব বাবু সম্পাদন করিতেন, এবং ইহাতে আমাদের

ঢাকা কলেজের ইংরেজির প্রধান অধ্যাপক নীলকণ্ঠ মজুমদার এবং অপরাপর গণ্যমান্য লেখকেরা প্রবন্ধ লিখিতেন। হেমবাবুর দশমহাবিদ্যার যে বিস্তৃত সমালোচনা নীলকণ্ঠ বাবু লিখিয়াছিলেন এবং যাহা হেমবাবুর গ্রন্থাবলির আধুনিক সংস্করণ সমূহের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা যত দূর মনে হয় সর্বপ্রথম *নবজীবন*-এই প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি ক্ষুদ্রাকৃতি পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক, আমার কবিতা *নবজীবন*-এই বাহির হওয়াতে নীলকণ্ঠ বাবু অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। হয়ত আমার চেহারা ও বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইলে এরূপ সুবিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদক তাহা প্রকাশিত করিতেন না। নীলকণ্ঠ বাবুর সহোদর রামদয়াল মজুমদার আমার দুই ক্লাস উপরে পড়িতেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আমার যে সৌহার্দ, জন্মিয়াছিল— তাহা এত ঘনিষ্ট ও অন্তরঙ্গতাপূর্ণ যে আমরা সমস্তদিন, এমন কি কোনো সময় রাত্রি ১১টা ১২টা পর্যন্ত একত্র থাকিতাম। সে যে কি আলাপ ও তর্কবিতর্ক চলিত, তাহার অবধি ছিল না, ইউজুনসুর মাদার বাঞ্চের চরিত্র হইতে ভিক্‌টোর হিউগোর হাঞ্চ ব্যাক ও গেটের ফাউস্ট পর্যন্ত বহু চরিত্রের বিশ্লেষণ হইত, তখন আমরা জীবনে মরণে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব পাশে আবদ্ধ থাকার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু কলেজের জীবন শেষ করিয়া রামদয়ালের ঘোর পরিবর্তন হইল, সে এখন চর্মপাদুকাত্যাগী, স্বল্পাহারী, বহু শিষ্যপূজিত জটাজুটধারী সাধু, আমাদিগের প্রতি সে 'সংসারী' বলিয়া সময়ে সময়ে কৃপা কটাক্ষপাত করিয়া থাকে। ঢাকা কলেজের লাইব্রেরিতে আমাদের অবাধ গতিবিধি ছিল। অবসরের ঘণ্টায় আমার সহাধ্যায়ী পূর্ণ রাউত বাহিরের পুস্তক হিসাবে লগারেথম্‌ ও অন্যান্য দুর্বোধ বিষয় সহজ আনন্দের সহিত পড়িত। অপরাপর ছাত্রেরা উপন্যাস বা কাব্য পড়িত। আমি, হরেন্দ্র ঘোষ ও অক্ষয় কলেজের বারান্দায় দাঁড়াইয়া পূর্বদিককার ঝাউগাছগুলির চামরসদৃশ ও নিবিড় সন্নিবিষ্ট পত্রের সঙ্গে বায়ুর সংস্পর্শজনিত অবিরাম গুঞ্জন শুনিতাম। সেই ঝাউগাছগুলি এখনও আছে কিনা জানি না। রৌদ্র বৃষ্টি ও ঋতুভেদে আলো ও ছায়ার নিত্য পরিবর্তনশীল দৃশ্যের সঙ্গে তাহাদের মুখর রব আমার কাছে যেন কত রূপকথা কহিয়া যাইত। সেই কলেজের কথা মনে পড়িলে কত সুখ দুঃখ, কত ব্যথা বেদনা ও স্বর্গীয় সৌহার্দ্যের কথা মনে জাগ্রত হয় তাহা আর কী বলিব। আমাদের মণ্ডলীর সমুজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ বিপিন চক্রবর্তী আজ কোথায়? সমস্ত পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া, রুর্‌কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সফলতার সার্টিফিকেট লইয়া বিপিন অল্পবয়সে সরকারি স্থপতি বিভাগের উচ্চপদ ও 'রায় বাহাদুর' উপাধি পাইয়াছিল। কাশী তাঁহার কর্মস্থান ছিল, অকালে কাশীপ্রাপ্তি হইয়া সে সংসারের মায়া কাটাইয়া গিয়াছে। সম্যক-অধীত বিদ্যা, মনস্বী, সংযত, অল্পভাষী, সহানুভূতিতে ভরপুর, বিশুদ্ধ চরিত্র, প্রিয়দর্শন, মেধাবী বিপিনের তুলনা ছিল না। সে কৈশোর অতিক্রম করিয়া ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের হেড মাস্টার কৈলাস ঘোষ মহাশয়ের বাড়িতে প্রতি বেলায় ১২। ১৪টি লোকের রান্না রাঁধিয়া কোনোরূপে স্কুলের পড়া চালাইয়াছিল। যখন সে নিবিষ্টমনে কাহারও কোনো

কথায় কর্ণপাত না করিয়া অধ্যয়নে নিরত থাকিত, তখন আমি তাহার পিঠে কত চিম্‌টি কাটিতাম। 'এটা রাম চিম্‌টি', 'এটা শ্যাম চিম্‌টি' এইরূপ নামে সেগুলিকে অভিহিত করিয়া তাহাকে নখাঘাতে কতই না কষ্ট দিয়াছি, কিন্তু নির্বাক তপস্বীকে তপোভ্রষ্ট করিতে পারি নাই, কখনো কখনো ' কি দুষ্টামি কচ্ছিস্' এইরূপ দুই একটি বাক্যে সেই স্বল্পভাষী প্রিয় সহাধ্যায়ী নিষেধ জানাইত। আজ সে কোথায়? আর একজন পড়িবার সাথী, সে সন্ধ্যার শুকতারার মতো ভবিষ্যতের আশা দিয়া জগন্নাথ স্কুল হইতে বৃত্তি পাইয়া কলেজে ঢুকিয়াছিল, সেই পূর্ণ রাউত কত লাঞ্ছনা ও কষ্ট পাইয়া দুঃখের জীবন শেষ করিয়াছে, তাহা ভাবিলে হৃদয় ব্যথিত হয়।

যখন কলেজিয়েট স্কুলে পড়িতাম, তখন তৃতীয় শ্রেণি হইতে ললিতমোহন দে অবলীলাক্রমে সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষায় প্রথম হইত। তাহার ছিপ্‌ছিপে চেহারা, উজ্জ্বল দুটি চোখ এবং শ্যামাভ গৌরবর্ণ দেখিলেই মনে হইত সে একজন মনস্বী বালক। কিন্তু অল্প বয়সেই এই তরুণটিকে ঘুণে ধরিল। সে আশা দিয়াছিল, এন্ট্রান্স পরীক্ষায় সে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে, সে প্রথম শ্রেণিতে উঠিয়াই স্কুল পলাইতে লাগিল। তারপর যেমন বীণাটি ভাঙিয়া গেলে লাউ বাহির হইয়া পড়ে, তাহার দশাও তেমনই হইল। কোনোরূপে ১০ টাকার একটা বৃত্তি পাইয়া সে কলেজে ঢুকিল। তাহার পরিতপ্ত জীবনের গতি কোন্ অলিগলির ভিতর দিয়া ছুটিল তাহার ইতিহাস আমি জানি না। এইটুকু জানি সে কোনোরূপে বি. এ. পাশ করিয়াছিল। ইহার বহু বছর সে যখন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলের একটি মাস্টারের পদের জন্য আমার নিকট উপস্থিত হইল, তখন তাহার প্রতিভার শিখা নিবিয়া গিয়াছে, সেই নির্বাণপ্রাপ্ত শিখার ধূম্রাবশেষ দেখিয়া আমার খুব কষ্ট হইয়াছিল।

আমাদের সময় ঢাকায় কলেরা একরূপ লাগিয়াই ছিল, কলেরার ভয়ে ছাত্রদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া যাইত। আমাদের বাড়ির নিম্নতলে এক চাকরের কলেরা হইয়াছিল, আমাদের সমস্ত পরিবার দ্বিতলের একটা প্রকোষ্ঠে ভয়ে জড়সড় হইয়াছিল। শেষ রাত্রে যখন একজন শ্রীহট্টবাসী চাকর আসিয়া বলিল 'উনি তো যাত্রা করছুন' তখন যে আমাদের অবস্থা কী হইয়াছিল তাহা বর্ণনীয় নহে। ১৮৮১ সনের শ্রাবণ মাসে এই রোগ মহামারীতে পরিণত হইয়াছিল। শাঁখারি বাজার, নবাবপুর, ইস্‌লামপুর প্রভৃতি স্থান যমরাজার নিজ এলাকাভুক্ত হইয়া পড়ে। স্কুল-কলেজ একরূপ বন্ধ হইয়া যায়। জনশূন্য রাজপথে গেলে ঘন ঘন 'হরি বল হরি' শব্দে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত। মধুর হরি নাম যাহা কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়া ভক্ত ও প্রেমিককে আবিষ্ট করিয়া ফেলে সেই নাম যমদূতের ডঙ্কার মতো ভীতিদায়ক হইয়াছিল। আমার সহাধ্যায়ী আত্মীয় উমাপ্রসন্ন রায় ৪। ৫ ঘণ্টার মধ্যে কলেরা রোগে প্রাণ ত্যাগ করিল। তাহার মৃত্যুকালীন বিরল গুম্ফ, মুণ্ডিত মস্তক, কটিবাস পরিহিত অঙ্গারবর্ণত্ব প্রাপ্ত দীর্ঘ দেহ দেখিয়া আমি যে কি ভয় পাইয়াছিলাম তাহা আর কী লিখিব! গণি মিঞা সাহেবের আত্মীয় নবাব বাড়ির হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আজগর মিঞা তাহার মৃত্যুকালে

উপস্থিত ছিলেন। উমার মৃত্যু হইলে তাহার মাতা একটা বৃহৎ বরফখণ্ড হাতে লইয়া উন্মত্তের ন্যায় আজগর মিঞাকে ছুঁড়িয়া মারিতে গিয়াছিলেন; মাতার তদবস্থা দর্শনে সজল-চক্ষু, দৈবের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত প্রবীণ চিকিৎসক মৃদুস্বরে বলিয়াছেন 'মা আমাকে মারিলে যদি আপনার শান্তি হয়, তবে মারুন।' পরদিন প্রাতে সুয়াপুর যাইবার জন্য বুড়িগঙ্গার তীরে নৌকা খুঁজিতে গেলাম। পলায়নোদ্যত লোকের এত ভিড় হইয়াছিল যে নৌকা ভাড়া ১ ।। ০ টাকা ২ টাকার স্থলে ৩৫।। ৪০ টাকা হইয়াছিল। সে দিন আর যাওয়া হইল না। রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম অর্ধ্বদগ্ধ গাত্র, বীভৎসদর্শন, ওষ্ঠাধর শূন্য উৎকট রূপ দৃশ্যমান দন্ত পঙ্‌ক্তি দ্বারা কথা চিবাইয়া চিবাইয়া উমাপ্রসন্ন আমাকে ডাকিয়া বলিতেছে 'আমার কাছে আয়।' আমি তন্দ্রালোপের পর ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম।

সেই সময় কালীপ্রসন্ন ঘোষ সাহিত্যজগতে বাঙলার সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথম যেদিন জগন্নাথ স্কুলের সুবিস্তৃত গৃহে লর্ড রিপনের বিদায় সংবর্ধনার উপলক্ষ্যে আহুত সভায় তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছিলাম, তখন আমার মনোবীণার সমস্তগুলি তার যেন একত্র বাজিয়া উঠিয়াছিল। একখানি সরষে ফুলের বর্ণের গরম বস্ত্রে আবৃত দেহে তাঁহার যে মূর্তি দেখিয়াছিলাম তাহা এ্যাপোলো বা এ্যাডোনিশকে স্মৃতিপথে জাগাইয়া দিয়াছিল। দ্যুতিমান দুটি বড়ো চক্ষু, বীণাপাণির নিজ আসনের ন্যায় কোমল রক্তিম ওষ্ঠাধর, প্রতিভা-মহিমায় উজ্জ্বল মুখমণ্ডল! সেই বজ্র-বিদ্যুৎ নির্ঘোষের ন্যায় সুগম্ভীর ওজস্বী শব্দ-যন্ত্র বাংলা ভাষায় তেমন আর শুনি নাই। যখন একদিকে ব্রাহ্মগুরু শিবনাথ শাস্ত্রী, অন্যদিকে হিন্দু নেতা কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ ঢাকায় পরস্পরের প্রতিপক্ষতা করিয়া ধর্মযুদ্ধ চালাইতেছিলেন, তখন সেই বক্তৃতা ও তর্কযুক্তির কুরুক্ষেত্রে কালীপ্রসন্ন ঘোষ উপস্থিত হন নাই। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তিনি এই সকল সভায় যোগদান করেন না কেন, তিনি স্বল্পাক্ষরা সমালোচনা করিয়া এই সকল বক্তৃতা সম্পর্কে বলিয়াছিলেন 'কাক-কোলাহল।' ইহার বহু পরে ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুর কিছু পূর্বে কলিকাতাবাসীরা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস ও অপরাপর বৈষ্ণব কবির ললিত লবঙ্গ লতার ন্যায় মৃদুগুঞ্জনশীল বাংলা ভাষার যে এরূপ অসামান্য শক্তি ও ভৈরব নির্ঘোষের উপাদান থাকিতে পারে তাহা মাইকেল মধুসূদন তাঁহার কাব্যে ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁহার বক্তৃতায় প্রমাণ করিয়াছেন। কোথায় আজ বঙ্গভাষার সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী গাণ্ডিবী——সেই পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার মহারথ কালীপ্রসন্ন ঘোষ!

এই ঢাকা এখন সাহিত্য-বাসরে নীরব, সেই পদ্ম-পলাশ চক্ষু, ক্ষুদ্রকায়, শান্তধী, বাক্য-কোবিদ দীনেশচরণ বসু অকালে চলিয়া গিয়াছেন, তিনি কয়েক মাসের জন্য 'ঢাকা প্রকাশের' সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'মানস-বিকাশে'র ন্যায় কবিতার ক্ষুদ্র প্রথম উদ্যম প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরে বঙ্কিম বাবু বঙ্গদর্শনে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া ঘোষণা করেন, 'ঢাকা অঞ্চলে একজন প্রকৃত স্বভাব কবির উদয় হইল'। তাহার পর পণ্ডিত রজনীকান্ত

গুপ্তের ঐতিহাসিক পুস্তকগুলি বঙ্গসাহিত্যে উচ্চাসন অধিকার করিয়াছিল। স্বভাবের এক নগণ্য কোণে অতিশয় গণ্য ও প্রকৃত কবিত্ব-সম্পদসম্পন্ন গোবিন্দদাস কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের ন্যায় এই আকাশের নীচে দিশেহারা হইয়া ক্ষিপ্ত গতিতে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পরেও আধুনিক সাহিত্যে কয়েকজন ঢাকাবাসী—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যতীন্দ্রমোহন রায়, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেন প্রমুখ লেখক এখনও বাণী মন্দিরের দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু ঢাকা বিদ্যাপীঠগুলিতে বঙ্গ সাহিত্য চর্চার বিশেষ কোনো পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। কোনো নীরব কবি কিংবা তরুণ সাহিত্যিক তাপস নির্জনে সাধনা করিতেছেন কী না, তাহা আপনারাই বলিতে পারেন। স্বর্গীয় নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং বর্তমানে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সাহিত্যিক যশ ভারত ছাড়িয়া সুদূর পশ্চিমেও কতকটা প্রসার লাভ করিয়াছিল।

আমাদের এই ঢাকা কলেজের ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে কতইনা ফুল চোখের সামনে ফুটিয়াছে এবং কোরক অবস্থায় ঝরিয়া পড়িয়াছে তাহাদের নীরব ইতিহাস সেই সকল ঝাউ গাছ জানে—যাহাদের শাখা তখনকার দিনে, কলেজ প্রাঙ্গণ হইতে ঊর্ধ্ব স্বর্গ নির্দেশ করিত, আর জানে কলেজের চিরপ্রিয় প্রকোষ্ঠগুলি, উহার দেয়ালে, প্রাচীরে, বারান্দায় ও পাঠাগারে অলিখিত কত কথা উৎকীর্ণ আছে, তাহা ক্ষণে ক্ষণে আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে।

আমাদের সময়ে বাংলা ভাষার আদর ছিল না। রামমোহন রায় এবং ম্যাকলের চেষ্টায় বাংলার চর্চা বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়গুলি হইতে উঠিয়া গিয়াছিল, ১৮৩৫ সনে বাংলা ভাষা এদেশের শিক্ষা-শালা হইতে বিতাড়িত হয়; তাহার ফলে প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে বাংলার বড়ো বড়ো শিক্ষাভিমানীরাও একেবারে অনবহিত হইয়াছিল। আমাদের সময়ে শিক্ষিত যুবকেরা বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস কিছু কিছু পড়িতেন, দয়া করিয়া কখনো কখনো হেম বাবুর 'রে সতী, রে সতী কাঁদিল পশুপতি, পাগল শিব প্রমথেশ' অথবা নবীন বাবুর 'এমন করিয়া কেন বহিয়া না যায়রে মানব জীবনে' অবসরে আবৃত্তি করিতেন; রবীন্দ্র বাবুর অভ্যুদয়ে কেহ কেহ তাঁহার প্রভাত-সংগীত, সন্ধ্যা-সংগীত প্রভৃতি লইয়াও নাড়াচাড়া করিতেন। যে কাশীদাস ৩৫০ বছরের অধিককাল যাবৎ বাঙালিকে আনন্দ দিয়াছে, এখনও যাঁহার মহাভারতের একলক্ষ কপি বৎসর বৎসর বিক্রীত হয়, যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, পূর্ব-বঙ্গ গীতিকা ও সর্বোপরি বৈষ্ণব কবিতা বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক তথ্য ও ঐতিহ্যের খনি, শেষোক্ত কবিতার গূঢ় মর্ম-কথা সংসার ছাড়িয়া অতীন্দ্রিয় লোকের বার্তা বহন করে, যে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের বীণা জীবনের সার কথা অমৃতাক্ষরে, নির্ঝরের অবিরাম বেগে ও স্বর্গীয় সুমিষ্ট স্বরে ঘোষণা করিয়া ধরাধামকে স্বর্ণসূত্রে অমরার সহিত গাঁথিয়া স্বরূপের আভাষ দেয়, সেই সকল খাঁটি বাঙলার গ্রন্থ এক হয় মুদিখানায় কেরাসিনের ল্যাম্পের দুর্গন্ধ সাহচর্য ভোগ করিয়া কিংবা শতচ্ছিন্ন মলিন বৈষ্ণবের ঝুলিতে, অথবা নিরক্ষর হলবাহক কৃষকের স্মৃতিতে অবজ্ঞান অবস্থায় বিরাজ

করিতেছিল। শিক্ষিত যুবকেরা তাহা স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ করিতেন। কোন্ সুপ্রসন্ন গ্রহের দৃষ্টিপাতে, কোন্ জন্মজন্মান্তর লব্ধ সুকৃতির ফলে যেন আমি অতি শিশুকাল হইতে এই সকল পুঁথি নাড়াচাড়া করিতেছিলাম। কলেজে পড়িবার সময় যখন শেলি, কিট্‌স, বাইরন্, টেনিসন কিংবা সেক্সপিয়ার, মার্‌লো, জন ওয়েবস্টার, ফোর্ড, বোমেন্ট ফ্লেচার বা সার্‌লির কবিতা পাঠে নিযুক্ত ছিলাম, তখনও আমি আমার কণ্ঠহার সদৃশ চণ্ডীদাসকে ভুলিতে পারি নাই। সহাধ্যায়ীদের সঙ্গে ইংরেজি ও ফরাসি উপন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণে ব্যাপৃত থাকিতাম, কিন্তু ঘরে যাইয়া দিদির কাছে সুর করিয়া গাহিতাম

> কিবা রজনী শাওন ঘন ঘন দেওয়া গরজন—রিমি ঝিমি শবদে বরিষে, পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে—নিদ যাই মনের হরিষে। শিখরে শিখণ্ডী রোল, মত্তদাদুরি বোল—কোকিলা ডাকিছে কুতূহলে, ঝিঁঝি ঝি ঝিন্ কি ঝাঁজে, ডাহুকী সে গরজে, আমি স্বপন দেখিলাম হেন কালে।

বৈষ্ণব কবির এই উন্মাদকর সুর, ভক্তি ও মর্মের গূঢ় রহস্য, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অতীন্দ্রিয়ের অপূর্ব সংস্পর্শ ও পার্থিব এবং অপার্থিবের একসূত্রে গাঁথা পারিজাত হার আমার হৃদয় অলঙ্কৃত করিয়াছিল। আমি যে সময় এই গীতগুলি প্রাণ দিয়া পড়িতাম ও বুঝিতাম, আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি আধুনিক শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে ততখানি প্রাণ দিয়া উহা তখন কেহ পড়িত না, অধিকাংশ স্থলেই উহা একান্ত নিগৃহীত ও উপেক্ষিত হইত। সেই সময় একজন খ্যাতিমান ব্যারিস্টার নিজকে বাংলা ভাষার একজন প্রধান পাণ্ডা বলিয়া ঠাকুর বাড়িতে পরিচয় দিতেন, কিন্তু বাড়িতে নিজের ছেলেমেয়েদিগকে আয়া রাখিয়া হিন্দি শিখাইতেন, যেন তাহারা বাংলায় কথা না বলে। দেশের এই অবস্থা না হইলে চন্দ্র সূর্যের যে স্থল আলোকিত করিবার কথা, কত মনস্বী যুবক যে পথ প্রশস্ত করিবেন, তাঁহারা বিদ্যমান থাকিতে আমার মতো জোনাকির সে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা হয় কেন? দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙালি তখন স্বীয় সাহিত্য একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল এবং একান্ত উপেক্ষা করিয়াছিল, এজন্য আমার মতো এড়ণ্ড এই তরু-বিরল দেশে দ্রুম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সৌভাগ্যবশত প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের দিকে এখন লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে, এই খনিতে যে এখনও বহু অনাবিষ্কৃত রত্ন আছে, তৎসম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই। এইস্থানে আমি আপনাদের অনুমতি লইয়া আর একটি বিষয়ের অবতারণ করিব।

এই পূর্ব-বঙ্গ বঙ্গ সাহিত্যের আদি তীর্থ, আপনারা একথাটা ভুলিবেন না। আপনারা সকলেই জানেন সিংহল-বিজয়ী বিজয়া বাংলার লোক, খ্রিস্ট জন্মিবার ৬০০ বছর পূর্বে তিনি সিংহলে বাঙালির এক বড়ো উপনিবেশ স্থাপন করেন; বহু বছর পর্যন্ত বাঙালির সঙ্গে সিংহলের সম্বন্ধ ছিল, প্রাচীন বাংলা কাব্যগুলি পড়িলে জানা যায় যে বঙ্গীয় বণিকেরা কয়েক শতাব্দী পূর্বেও সিংহলে যাইতেন, বাঙালি তাহাদের দূরাগত প্রবাসী ভ্রাতাদিগকে

বহু শত বছর পর্যন্ত ভোলে নাই। তাহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিয়া আসিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় বাংলা ভাষার সঙ্গে সিংহলি ভাষার অদ্ভুতরকমের ঐক্য দৃষ্ট হয়, এবং এই ভাষাগত একত্ব পূর্ব-বঙ্গের ভাষার সঙ্গেই বিশেষরূপে প্রতীয়মান হয়। আমাদের অতি নিকট প্রতিবেশী উড়িয়া ও বেহারিরা যে বাংলা কহে, তাহাতে বিদেশি টান স্পষ্টই বুঝা যায়। কিন্তু সিংহলি বৌদ্ধগণ যখন বাংলা কহে তখন তাহারা বাঙালি কী সিংহলি তাহা বুঝিবার উপায় থাকে না। দ্বিসহস্র বর্ষের অধিক সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাহাদের মুখাবয়ব ও আকৃতি ঠিক বাঙালির মতোই আছে। তাহাদের আকৃতিতে তাহারা যেমন বাঙালি ভাষায়ও তাহারা তেমন বাঙালি। পূর্ববঙ্গের বাঙালিরাই যে বিজয়ের সময় ও পরবর্তী যুগে সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল—বিশেষ করিয়া ভাষার মানদণ্ডদ্বারা বিচার করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয়। ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস লিখিয়াছেন, বালী দ্বীপের গৃহ নির্মাণ পদ্ধতি ঠিক বাংলার অনুরূপ, এত দূর দূরান্তরে যাইয়া তিনি ভারত সমুদ্রের দ্বীপবাসীদের সঙ্গে নানা বিষয়ে বাঙালির ঐক্য আবিষ্কার করিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। যবদ্বীপের বড়বদর মন্দিরের নির্মাণ-প্রণালী ভারতবর্ষের অন্যত্র কোনো স্থানেই পাওয়া যায় নাই, সুতরাং ওই দ্বীপবাসীরা সেই স্থাপত্য কোথা হইতে গ্রহণ করিয়াছে, তাহা একটা সমস্যার বিষয় ছিল; সম্প্রতি পাহাড়পুরের সোমবিহারের স্থাপত্য-রীতি ঠিক বড়বদরের অনুরূপ প্রমাণিত হইয়াছে, অথচ পাহাড়পুরের মন্দির কয়েক শতাব্দী পূর্বে রচিত হইয়াছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা স্বীকার করিয়াছেন যে বড়বদরের আদর্শ পাহাড়পুর। বদর শব্দ বজ্র বা বজর শব্দের অপভ্রংশ। এই বদর শব্দ পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ছিল. আপনারা সুপ্রসিদ্ধ বদরযোগিনী নামটিকে আধুনিক কালে বজ্রযোগিনী নাম দিয়া তাহা স্বীকার করিয়াছেন, এই বদর বা বজ্র বুদ্ধকে বুঝাইত। উড়িষ্যা দেশ প্রায় পাঁচশত বছরকাল বাঙালি গঙ্গাবংশের শাসনাধীন ছিল, সুতরাং বাংলার অক্ষর ও বাংলার শিল্প তথায় অবাধে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। হান্টার সাহেব লিখিয়াছেন, উড়িষ্যার সর্বপ্রধান কীর্তি কোণারক মন্দির বাঙালি শিল্পীর অত্যদ্ভুত গৌরব ঘোষণা করিতেছে। যবদ্বীপের দশম, একাদশ শতাব্দীর অক্ষর, শিল্প ও স্থাপত্য বাংলার আদর্শ অনুসরণ করিয়াছে। বাংলা রামায়ণগুলির বাল্মীকি বর্ণনা বহির্ভূত বহু কাহিনি যবদ্বীপ ও কাম্বোডিয়ার রামায়ণে দৃষ্ট হয় এবং বাংলার রূপকথা কাম্বোডিয়া, শ্যাম প্রভৃতি দেশে বহুল পরিমাণে অনুকৃত হইয়া সেই সেই দেশে শিশু সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে। বস্তুত, পালদের সময়ে এই গৌড় মণ্ডল সমস্ত বৌদ্ধ জগতে তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই সময়ে দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞান প্রমুখ বহু পূর্ব-বঙ্গবাসী পণ্ডিত শিরোমণি বৌদ্ধ পতাকা হস্তে তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশে বিজয় অভিযান করিয়াছিলেন, এবং উত্তর-বঙ্গবাসী ধীমান ও বীতপাল প্রমুখ শিল্পগুরু অর্ধেক বৌদ্ধ জগতকে কলাশাস্ত্রে নূতন পাঠ ও শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই গৌড় দেশ হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বাংলার অক্ষর জাপানের প্রসিদ্ধ হরিউজি প্রভৃতি মন্দিরে চালাইয়াছিলেন এবং এখন পর্যন্ত সেই সকল মন্দির-গুরু

পুরোহিতের বংশধরেরা সেই প্রাচীন বাংলা অক্ষরে তাঁহাদের ধর্ম-শাস্ত্র লিখিয়া থাকেন। বাংলার পূর্ব গৌরব-গাথা এখন বিস্মৃতি সাগরে নিমজ্জিত রহিয়াছে। কে এই দৈবশাপে নির্বাসিতা ইতিহাস লক্ষ্মীকে সেই অতলের নিভৃত স্থান হইতে উদ্ধার করিবে? আমাদের এই দেশে শত শত দিঘি সরোবরে শত্রুর হস্তে পরাস্ত রাজারা তাহাদের ধনৈশ্বর্য ও প্রিয়তম গৃহ দেবতাদিগকে বিসর্জন দিয়াছেন, ইতিহাস লক্ষ্মী সেই দিঘি সরোবরের নিম্নতলে তাহাদিগকে অঞ্চলে ঢাকিয়া অশ্রু মোচন করিতেছেন, কে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে? এই পূর্ব ও উত্তর-বঙ্গে শত শত ঢিপি ও উচ্চভূমি প্রাচীন ঐশ্বর্যের ভগ্নাবশেষ বহন করিয়া নীরবে কোনো অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের প্রতীক্ষা করিতেছে, সেরূপ ঐতিহাসিক কি আর জুটিবে না?

এক সময়ে পূর্ব-বঙ্গের মাঝিরাই সমুদ্র-গর্ভে জাহাজ পরিচালনায় সুদক্ষ ছিল। এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী মাঝিরাই অদ্ভুতকর্মা বাঙালি ঔপনিবেশিকদিগের সামরিক অভিযান সফল করিয়া দিত, পূর্ববঙ্গের প্রাচীন বহুগীতিকা ও মনসামঙ্গল কাব্যে ইহাদের কথা আছে; এই মাঝিদের লইয়া পশ্চিমবঙ্গের কবিগণ ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াও এই সত্য প্রমাণ করিয়াছেন, যে জাহাজ-পরিচালনায় পূর্ব-বঙ্গবাসীরাই কৃতী ছিলেন; এখনও চট্টগ্রামের মাঝি ও বহরদারগণ জাহাজের পরিচালক স্বরূপ দেশ-বিদেশে যাতায়াত করিয়া থাকে।

আমি আপনাদিগকে জানাইতে চাই, যে, বঙ্গসাহিত্যের উদয় এই পূর্ব-বঙ্গেই হইয়াছিল এবং এই দেশই বঙ্গসাহিত্যের আদিতীর্থ। কানা হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, বংশীদাস, নারায়ণ দেব, চন্দ্রাবতী, ষষ্ঠীবর, গঙ্গাদাস সেন—ইহারাই মনসামঙ্গল কাব্যের আদিকবি। ইহারা সকলেই পূর্ব-বঙ্গবাসী। মহাভারতের প্রাচীনতম লেখক সঞ্জয়, নসরৎ সাহেব অজ্ঞাতনামা সভাকবি, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরণ নন্দী, সকলেই পূর্ব-বঙ্গের লোক, কৃত্তিবাস নদিয়ার নিকটবর্তী ফুলিয়া গ্রামের অধিবাসী, ৫০০ বৎসর পূর্বে এই স্থান পূর্ব-বঙ্গের অন্তর্গত ছিল। কবির পূর্বপুরুষগণ বিক্রমপুর সোনার গাঁ হইতে পলাইয়া আসিয়া ফুলিয়াতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ব্রহ্মর্ষির ন্যায় অতি তেজস্বী গুরু পদ্মাতীরবাসী ছিলেন, ইহা কবি নিজেই জানাইয়াছেন। যে সকল স্বল্পাক্ষর বা একবারে নিরক্ষর কৃষক কবি অনাদিকাল হইতে বাংলার গীতিকথা রচনা করিয়া ধলেশ্বরী, ভৈরব, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও কংস নদের উত্তাল তরঙ্গে অপূর্ব কারুণ্য ঢালিয়া দিয়াছিল ও আকাশ বাতাস তম্বুরু ও নারদের বীণা ধ্বনিতে পরিপূরিত করিয়াছিল, তাঁহারা এই পূর্ব-বঙ্গেরই গৌরব। যে সকল রূপকথার মাধুর্য, অপূর্বত্ব ও গল্পের বাঁধুনি আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় লেখকদিগকে পর্যন্ত চমৎকৃত করিতেছে—যে অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে এক মুষ্টি রত্ন আহরণ করিয়া ইউরোপে গ্রীমভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাদের দেশের শিশুসাহিত্যের গৌরব বর্ধন করিয়াছেন, সেই স্বল্পভাণ্ডার প্রধানত পূর্ব-বঙ্গ হইতেই গৃহীত হইয়াছিল, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। যেরূপ তরুণ সূর্য ধীরে ধীরে পূর্বদিক্ সমুদ্ভাসিত করিয়া সুবিস্তৃত নীলাকাশ পর্যটনপূর্বক পশ্চিমে

বিশ্রামলাভ করেন, সেইরূপ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য পূর্ব-বঙ্গে উদ্ভূত হইয়া বৈষ্ণব মহাজনদিগের প্রসাদে পশ্চিমবঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মহাপ্রভুর মাতৃকুল ও পিতৃকুলের সকলেই পূর্ব-বঙ্গবাসী। কিন্তু তিনি যবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া পশ্চিমবঙ্গই তাঁহার প্রধান কর্মকেন্দ্র নির্দিষ্ট করিলেন। তাঁহার কৃপায় রূপকথার স্থলের পৌরাণিক উপাখ্যান, মঙ্গল গানগুলির স্থলে হরি-কীর্তন প্রাধান্য লাভ করিল। হিমালয়ের উদ্ভবে যেরূপ ভারতের সহিত চিন, মহাচিন প্রভৃতি ভূখণ্ডের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল, সেইরূপ মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ে গীতিকথা, রূপকথা, মঙ্গল ও পালাগান সাহিত্য-চোখের আড়াল হইল, বৃন্দাবন দাস স্পষ্ট ভাষায় ওই সকল বিষয়ের নিন্দাবাদ করিয়াছেন। তথাপি মহাপ্রভু স্বয়ং ও তাঁহার প্রধান পরিকরেরা যথা, অদ্বৈত, শ্রীবাস, মুরারি গুপ্ত, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রমুখেরা পূর্ব-বঙ্গেরই লোক।

আমি এস্থানে এই সকল প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা কেন করিতেছি? আমি শুনিয়াছি এরূপ সামাজিক উৎসব—গান, বাজনা ও গল্পের মজলিস স্বরূপ। ঢাকা কলেজের পূর্বতন ছাত্রেরা এখন সকলেই বয়োবৃদ্ধ। তাঁহারা এখানে পরস্পরের সহিত দেখাশুনা ও পরিচয়ের আনন্দ উপভোগ করিতে আসিয়াছেন। সুতরাং এখানে একটি ঐতিহাসিক মুষল হস্তে যদি কোনো মল্লবীর উপস্থিত হন, তবে তিনি আনন্দের স্থলে বিভীষিকা উৎপাদন করিবেন মাত্র। আমি জানিয়া শুনিয়া আপনাদের ধৈর্যের সেরূপ অগ্নি পরীক্ষা করিতেছি কেন?

এ বিষয়ে আমি নিরুত্তর, কারণ উত্তর দিবার আমার কিছুই নাই। আমার মনে হয় ঘরে আগুন লাগিলে বীণাটি হাতে থাকিলেও যেরূপ বাদক তাহা ভুলিয়া জলের বালতির জন্য ছুটিয়া যায়, আজ আমাদের দেশে তেমনই নানাদিক হইতে ভীষণ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, আমাদের সমাজ আজ ধ্বংসের পথে। এখন সমস্ত আমোদ প্রমোদ ছাপাইয়া উঠিয়াছে, এই জাতির ভবিষ্যৎ গঠনের চিন্তা। আমি এই চিন্তা কিছুতেই এড়াইতে পারিতেছি না। আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ পাইয়াছি এবং জিজ্ঞাসা করিতেছি যে বঙ্গদেশের বহু মর্মঘাতী সমস্যার উত্তরে আপনারা আপনাদের ভবিষ্যৎ বংশধর এবং এই সকল তরুণ বা সবুজদিগকে কী উপদেশ দিবেন? হয়ত, আমার পক্ষে এই জিজ্ঞাসার সুযোগ আর এমন করিয়া মিলিবে না?

আমরা ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া কতকটা বিশ্বাস করিতেছি যে মেথরেরা পূর্বে বৌদ্ধতান্ত্রিক শ্রমণ ছিল। ডোমদের মধ্যেও অনেক শ্রমণ ছিল, তাহারা ডোমাচার্য নামে খ্যাত ছিল। বৌদ্ধগণ যখন ধর্ম-যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া এদেশ ত্যাগ করিলেন, তখন বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ যাঁহারা অনেক জঘন্য দ্রব্য ঘাঁটিতেন, শবের মাংস চিতায় বসিয়া খাইতেন, তাঁহাদের বংশধরগণ বিজেতাদিগের দ্বারা এই সকল হীনকার্যে নিযুক্ত হইলেন। মহত্তর হইতে মেথর শব্দের উদ্ভব সহজেই পরিকল্পনা করা যায়। ডোমেরা এখনও শীতলা দেবীর ও কোনো কোনো স্থানে কালীমাতার পূজারি। 'হাড়ির মেয়ে চণ্ডী' এখনও একটা প্রচলিত কথা। 'বৃত্তি বেচে ডোম' প্রভৃতি প্রবাদ-বাক্যে জানা যায়, ডোমগণ এক সময়ে

তাহাদের ব্রহ্মত্র বা দেবত্র বেচিতে বাধ্য হইয়াছিল। হাড়ি সিদ্ধা গোপীচন্দ্র রাজার গুরু হইয়াছিলেন। শাস্ত্রচর্চা করিলে দেখা যায়, এখন এই সকল জাতি যে কাজ করে, প্রাচীনকালে চণ্ডালেরা তাহা করিত। মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারেরা মেথর প্রভৃতি জাতির কার্যের কথা উল্লেখ করেন নাই। বৌদ্ধ অদৃষ্টলক্ষ্মী যখন বিরূপ হইল, তখন হিন্দুস্থানে স্বশ্রেণি পরিত্যক্ত শ্রমণগণ এই দুর্গতি প্রাপ্ত হইলেন। মানবজাতি ও সমাজের উত্থান-পতন এইভাবেই ঘটিয়া থাকে। আজ যদি মেথর ও ডোমের অজ্ঞানতার অমানিশি পোহাইত এবং তাহারা পূর্ব ইতিহাসের উদ্ধার করিতে পারিত তবে কী আর বালতি মাথায় লইয়া কিংবা শ্মশানে শব পোড়াইয়া সমাজের অধস্তন স্তরে পড়িয়া থাকিতে চাহিত? এক সময়ে পূর্ব-বঙ্গবাসীরা চীন, জাপান, তুর্কীস্থানে—ও ভারতীয় সমুদ্রোপকূলের দ্বীপসমূহে জ্ঞানালোকের শলাকা লইয়া সভ্যতা বিস্তীর্ণ করিয়াছিল, ভারতসাগর মথিত করিয়া—ঘূর্ণাবর্ত ও উত্তাল তরঙ্গের বিভীষিকার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ইহারা এশিয়ার নানা প্রদেশে ক্ষমতাশালী উপনিবেশ স্থাপিত করিয়াছিল, এক সময়ে—মহাবীর অ্যালেকজেণ্ডারের জগজ্জয়ী সৈন্যেরাও পূর্বভারতের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী শুনিয়া এদেশে অগ্রসর হইতে সাহসী হয় নাই। পূর্ব-বঙ্গের নৌ-বহর এক সময়ে রঘুরাজার সঙ্গে দুর্ধর্ষ যুদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া পুরাণে উল্লিখিত আছে। পূর্ব-বঙ্গবাসীরা গুপ্তবংশ-কিরীট-রত্ন সমুদ্রগুপ্তের অগ্রগতি প্রতিরোধ করিয়া ভীষণ জলযুদ্ধ করিয়াছিল। একদা এই দেশ চারু-শিল্পের নিজ নিকেতন বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল। ফার্গুসন লিখিয়াছেন এই দেশ হইতে 'বাঙলা ঘর' নির্মাণে রীতি বহুদেশে অনুকৃত হইয়াছিল। ইতিহাসপূর্ব যুগ হইতে এদেশের মস্করীরা বৌদ্ধ-কাহিনি চিত্রে অঙ্কিত করিয়া সমস্ত জগৎ পরিভ্রমণপূর্বক ধর্মপ্রচার করিত। তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া রোমান ক্যাথলিকেরা পিপেরাস পত্রে খ্রিস্ট চিত্রাবলি অঙ্কিত করিয়া দেশ-বিদেশে দেখাইতেন, মানচিত্রের মতো জড়ানো খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর আঁকা সেইরূপ চিত্র এখনও ভ্যাটিকানে রক্ষিত আছে। মস্করীদের ধারা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। সেইরূপ ভাবের আঁকা হিন্দুচিত্র এখনও চিত্রব্যবসায়ীরা পূর্ব-বঙ্গে দেখাইয়া থাকে, বিক্রমপুরে ইহাকে 'পটনাচানো' বলে এশিয়ার নানা প্রদেশে ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও পূর্ব-বঙ্গবাসীরা কী করিয়াছেন, তাহা কি আমাদের জানা উচিত নহে? আমাদের ছেলেরা কথায় কথায় ইতিহাস শিখিতে বিলাতে যান, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অত্যন্ত ব্যয়ে তাঁহারা কী জাভা, সুমাত্রা, বালী দ্বীপ ও সিংহলে ইতিহাস চর্চার জন্য গতিবিধি করিতে পারেন না? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ের ভার গ্রহণ করিতে পারেন, নতুবা আপনারা এজন্য অর্থসংগ্রহ করিয়া কোনো সভাসমিতি গঠন করিতে পারেন। প্রাচীন ইতিহাস চর্চা করিয়া জার্মানি ও জাপান নববল সম্পন্ন হইয়াছে। মানব-ইতিহাসে আমাদের অনেক মহার্ঘ দান ছিল। অদূরে কাপাসিয়া গ্রাম থেকে জগৎবিখ্যাত কার্পাসবস্ত্র মসলিনের উদ্ভব হইয়াছিল, আমাদের 'ভাওয়ালিয়ার' মত বৃহৎ-কৃতি নৌকা লইয়াই বিজয় সিংহলে গিয়াছেন, এখনও সিংহলে এই ভাওয়ালিয়ার মত নৌকা গঠিত

হইয়া থাকে। এই ঢাকাই অতি প্রাচীনকালে বোধ হয় বাংলা নামে পরিচিত ছিল, কেহ কেহ বলেন ঢাকার বাংলাবাজার সেই প্রাচীন প্রসিদ্ধ নগরীর অংশ বিশেষ। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমি ভারতবর্ষের যে বিবরণ দিয়াছেন, তন্মধ্যে সাবার, দাসোরা, বানিয়াজুরম—এই তিন প্রসিদ্ধ নগরীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ইহাদের সংস্থান দৃষ্টে মনে হয় ইহারাই আধুনিক সাভার, দাসরা ও বানিয়াজুরি। বদরযোগিনী বা বজ্রযোগিনী, পালদিগের সময়ে এক অতি বিখ্যাত ধর্মকেন্দ্র ছিল। কলা বিদ্যা চর্চায় সামুদ্রিক অভিযানে দূর দূরান্তরে উপনিবেশ স্থাপনে এই দেশ সকল দেশের সেরা ছিল। ধর্মজগতে এই বঙ্গদেশের প্রাধান্য সর্বত্র স্বীকৃত, এই দেশ ২৩ জন জৈন তীর্থঙ্করের পদরজঃপূত, তাহাদের সমাধি অদূরে সমেৎ শেখরে, এখনও এদেশের বহুস্থানে জৈন দিগম্বরমূর্তি মৃত্তিকা নিম্ন হইতে পাওয়া যাইতেছে। এদেশ ত্যাগের দেশ, রাজর্ষি ও বহু ঐশ্বর্যবান লোক এখানে ভোগবিমুখ হইয়া ভিক্ষুধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন। রাজা গোপীচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র, মহেন্দ্র প্রমুখ রাজর্ষিগণ ও রূপ, সনাতন, জীব, নরোত্তম, উদ্ধারণ দত্ত, রঘুনাথ দাস প্রমুখ ব্যক্তিগণ রাজবৈভব ত্যাগ করিয়া কঠোর তপশ্চারণ করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে অর্থশালী লোকের এখনও একান্ত অভাব হয় নাই। অনাদিকাল হইতে এই সকল সাফল্যের চিহ্ন আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে, এই প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের জন্য কী আমরা চেষ্টিত হইব না? জীবনপণ করিয়া যদি আমরা আমাদের পূর্বগৌরব উদ্ধারের চেষ্টা পাই, তবে কেরানিগিরির জন্য সহস্র সহস্র বাহু প্রসারিত করিয়া অবশেষে ঘোর নিরাশার কূপে কখনো পতিত হইব না। পূর্বপুরুষদের পদ-চিহ্ন অনুসরণ করিয়া তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিতে আমাদিগকে দেশদেশান্তরে ছুটিয়া যাইতে হইবে। কোণঠেসা হইয়া বাড়িতে বসিয়া আবেদন নিবেদনের ঘুড়ি আকাশে উড়াইয়া দুশ্চিন্তা করিলে কোনো ফলই হইবে না। মনে করিতে হইবে আমরা ভগবানের Chosen Seed, এখানে স্বয়ং ভগবান প্রেমমূর্তি ধারণ করিয়া ধুতি চাদর পরিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম স্মরণপূর্বক আমরা অটল পণ করিয়া ঘরের বেড়া কাটিয়া বহির হইব। কে জানে জাপান ও জার্মানি যেরূপ তাহাদের পূর্ব ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্য হইতে নব প্রেরণা পাইয়া দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত স্বীয় স্বীয় জাতি নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে, আমরাও সেইরূপ আমাদের পূর্বপুরুষদের কীর্তি স্মরণ করিতে করিতে আবার শিক্ষাসংস্কৃতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে পারিব কিনা। প্রধান সমস্যা আমাদের অন্নসংস্থানের নহে, আমাদের দেবাদিদেব মহেশ্বর ভিক্ষুক ও দিগম্বর, বুদ্ধ হইতে জৈন ও হিন্দু শত শত সন্ন্যাসী আমাদের দেশে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে তুলিয়া লইয়াছেন, তাহাতে অগৌরবের বিষয় কিছুই নাই। আমাদের দেশের ঋষি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দারিদ্র্যের জীবনই আদর্শ করিয়া লইয়াছিলেন। দারিদ্র্য আমাদিগকে পীড়িত করিতে পারিবে না, যদি আমরা সংযত, ভোগবিমুখ ও কর্মশীল হইতে পারি। আমরা সেই অনবদ্য কর্মজীবন লাভ করিয়া নিবৃত্তি আশ্রয় করিলে হয়ত এই প্রিয় আকাশ ও নদনদী বেষ্টিত রাজ্যে নবজাগরণের ফলে নূতন

আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব। আমরা বৃদ্ধ, কিন্তু আমাদের অতীত ইতিহাসের চাবি আমাদের বংশধরদের হাতে দিতে পারিলে তাহারা স্বীয় সম্পদ বুঝিয়া লইতে পারিবে। হউন না কেন আকাশ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন, হউক না কেন রাজনৈতিক দুর্যোগ ও অমোঘ দারিদ্র্য কষ্ট, যদি আমরা সাধুব্রতে দৃঢ় সংকল্পিত হই এবং মঙ্গল ইচ্ছার প্রেরণা পাই, তবে কখনোই মঙ্গলময়ের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইব না। আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমির গৌরব এখন নিষ্প্রভ কিন্তু সে শিখা এখনও নিবিয়া যায় নাই, নতুবা পরমহংসদেব, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, আশু মুখোপাধ্যায়, জগদীশ বসু, প্রফুল্ল রায় এদেশে জন্মগ্রহণ করিলেন কীরূপে? এই নির্বাণোন্মুখ শিখা পুনরায় ফুৎকারে জ্বলিয়া উঠিতে পারে, যেমন করিয়া শত নিপীড়ণ সহ্য করিয়া রোম ও রাশিয়া তাহাদের দেশকে নূতন করিয়া গড়িয়াছে, আমরা সেই ভাবে এই দেশকে পুনরায় গড়িয়া তুলিতে পারি, কিন্তু আমরা জড় সভ্যতা, বিলাস সমৃদ্ধির লিপ্সা ও রাজসিক শক্তি দ্বারা প্রাধান্য লাভ করিতে পারিব না। ভারতবর্ষ চিরকাল নিবৃত্তির হোমানল জ্বালাইয়া রাখিয়াছে; যখন অপরাপর দেশ তাহাদের রাষ্ট্রশক্তি বাড়াইয়াছে, ভারতবর্ষ তখন অধ্যাত্মসাম্রাজ্যের প্রসারের জন্য তপস্যা করিয়াছে, তাই ইজিপ্ট, ব্যাবিলন, গ্রীস ও রোম নিবিয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষের আহিতাগ্নিকদের দীপ-শিখা এখনও নিবে নাই। জাতীয় আদর্শ কী, ইতিহাস চর্চা দ্বারা তাহা সম্যক অবহিত হইয়া আমাদের ভাবী সমাজ যেন জীবন পণ করিয়া তপস্যায় নিরত হয়, তবেই এই আকাশে আবার তরুণ সূর্যের কিরণ ও চাঁদের আলো ফুটিয়া উঠিবে।

হে আমার চির প্রিয় বিশালতোয়া, নির্মল বায়ুবাসিতা কুলুকুলুস্বনা পদ্মা, ধলেশ্বরী ও গঙ্গা, হে আমার চির পুরাতন ও নিত্য নবীন, নব নব পটপরিবর্তনশীল নিরবচ্ছিন্ন কর্মী যাদুঘর আকাশ, তোমাদের অদ্ভুত ও মহান্ পরিবেষ্টনীর মধ্যে স্থিত, অফুরন্ত সৌন্দর্যের খনি, টগর, পদ্ম, জবা ও নবমল্লিকার বাসভূমি মহাদেশ বঙ্গদেশ, তুমি অপূর্ব ও উদ্দাম বীর্যবত্তার দেশ, তোমার বনের বাঘের মাথায় সমস্ত ব্যাঘ্রজগৎ রাজটীকা আঁকিয়া দিয়া রাজব্যাঘ্র Royal Tiger উপাধি দিয়াছে। তোমার অরণ্যে ঐরাবতের বংশধর শ্বেতহস্তী সমস্ত হস্তীজগতের অর্চনা পাইয়া রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছে, তোমার ক্রোড় হইতে সিংহল বিজয়ী বিজয় ও বৌদ্ধজগৎ-জয়ী দ্বীপঙ্করের বিজয়-অভিযান, তোমার পুণ্য তীর্থোদক স্নাত তন্তুবায়গণ পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময় 'স্বপ্নের জাল' মসলিন প্রস্তুত করিয়াছে, তোমারই সৈকতে বসিয়া রঘুনাথ যে ন্যায় লিখিয়াছেন, তাহা মানুষের বুদ্ধিমত্তার চূড়ান্ত নিদর্শন। তোমার যুগযুগবাহী প্রবাহিনীগণের তরঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তাল রাখিয়া মাঝিরা যে বৈজয়ন্তী ভাটিয়াল গান গাহিয়াছে, দূর-দূরান্তরে জাভা ও বালীদ্বীপের মাঝিদের সুরে এখনও তাহার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তোমারই তটে স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার বৈকুণ্ঠের মনোহরসাই কীর্তন গাহিয়া তাঁহার বিশ্ববন্দ্য পদরজ রাখিয়া গিয়াছেন।

এই অতি ভৈরব ও অতিকায় জীব ও বিরাট প্রকৃতির দেশ, অতি প্রাকৃত নর ও

নরদেবগণের জন্মভূমি, তুমি আবার দেবপ্রসু ও বীরপ্রসু হইয়া শুদ্ধ সাত্ত্বিক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জগৎগুরুর বেদীর দাবি কর, যেমন করিয়া বজ্রযোগিনীর শ্রীজ্ঞান হইয়াছিলেন। তোমার সন্তানেরা জগতে আবার তাহাদের জগন্মান্য আসন গ্রহণ করুক, এবং কপাল হইতে হীনতার শেষ লাঞ্ছনা মুছিয়া ফেলিয়া, ভোগ-বিলাসের সমস্ত চিহ্ন পরিহার ও নিবৃত্তির যজ্ঞ-ভস্ম ধারণপূর্বক অক্ষয় কীর্তি অর্জন করুক, ভগবানের নিকট আমার এই প্রার্থনা।

পুরাতন ঢাকা কলেজ ও ঢাকা হলের বার্ষিক পুনর্মিলন সভার সভাপতির অভিভাষণ।—১৯৩৫।

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

সভাপতির অভিভাষণ

সমবেত সুধীমণ্ডলি

আজ সাহিত্য-সভার পঞ্চদশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সভার সভাপতিরূপে আপনাদিগকে সম্ভাষণ করিবার সুযোগ পাইয়া আমি আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি। আপনারা আমাদের জাতীয় সাহিত্যের রক্ষক ও পরিপোষক। যে বাংলা সাহিত্য প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্বে পল্লি-সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হইত, যাহার গতি পল্লিপ্রান্তবাহিনী ক্ষীণকায়া তটিনীর ন্যায় মন্থর ও তরঙ্গলীলাবিহীন ছিল, সেই সাহিত্য আজ বর্ষার উদ্দাম তরঙ্গিণীর ন্যায় কূল ছাপাইয়া ছুটিয়াছে; দরিদ্র পল্লিবাসী বঙ্গবাণীর পূজার জন্য যে ক্ষুদ্র দেউল নির্মাণ করিয়াছিলেন, আজ তাহা গগনচুম্বী বিরাট্ মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। আপনারা সেই বাংলা সাহিত্যের সেবক। বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধক, বঙ্গীয় সুধীবৃন্দ! সাহিত্য-সভার সভাপতিরূপে আজ আমি আপনাদের সাদর সংবর্ধনা করিতেছি।

জীবনের 'গণা' দিন অলক্ষ্যে নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছে—আমরা ভ্রূক্ষেপও করি না। কিন্তু যেমনই একটি বর্ষ অতীত হইয়া নূতন বর্ষের সূত্রপাত হয়, অমনই যেন আমাদের চেতনা হয়; আমরা জাগিয়া উঠি, আর গত বর্ষের লাভালাভের হিসাব করিতে বসি। আমাদের সভাসমিতির বার্ষিক উৎসব, জন্মতিথির উৎসব, এই চেতনা, এই জাগরণ। হায়, এই আয় ব্যয়ের সমাধান করিয়া কয়জনের ওষ্ঠাধরে হাস্যের রেখা পরিস্ফুট হয়? কয়জনের আয়ের অঙ্ক ব্যয়ের অঙ্ক ছাপাইয়া উঠে? লাভের আনন্দ অপেক্ষা ক্ষতির দুঃখ ও লজ্জাতেই অনেকের মস্তক অবনত ও চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসে, সাফল্যের উৎসাহ অপেক্ষা বিফলতার অবসাদেই অনেকের হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। আমরা বন্ধুবান্ধব লইয়া উৎসব করিয়া সেই দুঃখ ও অবসাদ ভুলিতে চাহি।

সাহিত্য-সভার ভাগ্যেও অনাবিল আনন্দ ভগবান্ লিখেন নাই। আলোচ্য বর্ষে আমরা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন, অধ্যাপক কালীপদ বসু, সাহিত্যসংহিতার ভূতপূর্ব সম্পাদক পণ্ডিত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, বাবু বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়,

রায় বাহাদুর নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, রায় হরিচরণ চৌধুরী বাহাদুর ও বাবু বটকৃষ্ণ পাল, এই কয় জন সভ্যকে হারাইয়াছি। ইঁহাদিগকে হারাইয়া সভা যে নিরতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও বটকৃষ্ণ পালের ন্যায় কর্মবীর আমাদের দেশে প্রকৃতই বিরল। ঢাকার সারস্বত-সমাজ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অক্ষয় কীর্ত্তি; আর বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের কর্ম জীবনের নিদর্শন বঙ্গের সর্বত্রই বিদ্যমান। কর্মের দিনে প্রকৃত কর্মীর সংখ্যা হ্রাস হইতে দেখিলে হৃদয়ে স্বতঃই নিরাশা ও আতঙ্কের উদয় হয়।

নববর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সভা তাহার চিরপোষিত আশাগুলি হৃদয়ে লইয়া কার্যে অগ্রসর হইয়াছিল। নূতন আবার পুরাতন হইয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিল; কিন্তু সেই আশার অধিকাংশই অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। অতীত আশার শেষ লইয়া নববর্ষে আবার নবীন উৎসাহে কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বৎসরান্তে আবার তাহার হিসাব নিকাশের দিন আসিবে। ভগবান্ করুন, তখন যেন আমরা লাভের কথা বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে পারি।

আমাদের বার্ষিক সাহিত্যক সম্মিলনীসমূহ বর্ষব্যাপী সাহিত্যিক লাভ ক্ষতির বিবরণী। ব্যাবসায়িগণ যেমন বৎসরান্তে লাভক্ষতির সমাধানের ফল দেখিয়া আগামী বর্ষের জন্য কার্যপ্রণালী নিরূপণ করেন, সেইরূপ এই সকল সম্মিলনীতে অতীত বর্ষের সাহিত্যের নিরপেক্ষ সমালোচনা দেখিয়া সাহিত্যিকগণ ভবিষ্যতের জন্য স্ব স্ব কর্তব্য নিরূপণ করিবেন, এইরূপ আশা স্বতঃই মনে উদিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ও এ পর্যন্ত কোনো সম্মিলনেই বাংলা সাহিত্যের লাভ লোকসানের আলোচনা হয় নাই। হইলে বোধ হয় বুঝিতে পারা যাইত যে, এই সকল সম্মিলন প্রকৃতই সাহিত্যের উন্নতির পরিচায়ক কি না। কিন্তু আমার সন্দেহ এই যে, বোধ হয় সম্মিলনের সাহিত্যরথী সভাপতিগণ ইচ্ছা করিয়াই বাংলা সাহিত্যের লাভ লোকসানের আলোচনা করিতে বিরত হইয়া থাকেন। লাভের অপেক্ষা ক্ষতির ভাগ অধিক আশঙ্কা করিয়াই কি তাঁহারা এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের আলোচনায় হস্তক্ষেপ করেন না?

কিন্তু অপ্রীতিকর হইলেও ইহার আলোচনা করিতে হইবে। যদি প্রকৃতই দোষ থাকে, তাহা ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে সংশোধনের সম্ভাবনা অল্প। এক জন তীক্ষ্ণদর্শী, সুবিজ্ঞ সাহিত্য-সমালোচক বলিয়াছেন, সাহিত্যে যাহা দেখিব, বিনা বিচারে তাহাই ভালো বলিয়া করতালি দিলে সাহিত্যের গৌরব-বৃদ্ধি ত হইবেই না, বরং তাহার অবনতি হইবে।

> তোমরা সবাই ভাল,
> কেউবা দিব্যি গৌর বরণ, কেউবা দিব্যি কাল—

এ কথা অন্য যেখানেই সুসঙ্গত হউক, সাহিত্যে শোভনীয় নহে।

কিন্তু আমার শক্তি ক্ষুদ্র। সাহিত্যরথিগণ যে গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত

হইয়াছেন, সে বিষয়ে কোনো কথা বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও আমি যে বাংলা সাহিত্যকে প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসি, তাহার অনিষ্টকর কোনো কার্য অনুষ্ঠিত হইতে দেখিলে বা তাহার উন্নতির পরিপন্থী কোনো চেষ্টা বা প্রভাবের প্রাবল্য দেখিলে, যথাজ্ঞান যথামতি তাহার প্রতিবাদ না করিয়া নীরব থাকিতে পারি না। সে বিষয়ে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলে, আমার আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হইলে, আমার অপেক্ষা কেহই অধিকতর আনন্দিত হইবেন না।

দুই দিক হইতে আমি আজ বাংলা সাহিত্যের আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। প্রথম, ভাষার দিক্; দ্বিতীয় ভাবের দিক্। আমার মনে হয়, বাংলা সাহিত্যে এমন একটি প্রভাবের সূত্রপাত হইয়াছে, যাহা অচিরে বিনষ্ট না হইলে, তদ্দ্বারা এই উভয় দিকেই সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে। বাংলা সাহিত্যের ভাষা কীরূপ হইবে, এই লইয়া নানা জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। কলিকাতার এক দল লেখক স্থির করিয়াছেন যে, বর্তমান বাংলা সাহিত্যের ভাষা বাঙালি জনসাধরণের বোধগম্য নহে; অতএব তাহাকে এমন ভাবে গড়িতে হইবে, যাহাতে তাহা আপামর সাধারণের পক্ষে সুগম হয়। ইহা কিরূপে সম্ভব, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। যে দেশে শতকরা নব্বই জনেরও অধিক লোক নিরক্ষর বলিলে অত্যুক্তি হয় না; যে দেশে প্রধানত হিন্দু-মুসলমান জাতি ভেদে দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির মৌখিক ভাষা প্রচলিত; আবার প্রদেশভেদে এই দুই শ্রেণির ভাষার প্রত্যেকের মধ্যে নানা প্রাদেশিক বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই দেশে শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্বসাধারণের সুগম বাংলা সাহিত্যের ভাষা কীরূপ হইবে, তাহা ভাবিয়া পাই না। এত দিন বাংলা সাহিত্যের ভাষাকে এক আদর্শের অনুযায়ী করিয়া গঠন করা হইতেছিল। শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই আদর্শ বাংলা দেশের সর্ব্বত্র নির্ব্বিবাদে গৃহীত হইয়া আসিতেছিল। তাহার ফলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষা সুদূর চট্টগ্রামের অধিবাসীদিগের যেরূপ বোধগম্য হইয়াছিল, সেইরূপ নবীনচন্দ্র সেনের ভাষাও কলিকাতায় আদৃত হইয়াছিল; এখন সাহিত্যের ভাষাকে সেই আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিয়া প্রাদেশিকতাদুষ্ট করা হইতেছে। আমার মনে হয়, ইহা হইতে উদ্দেশ্যের বিপরীত ফলই ফলিবে। সাহিত্যের সর্বজনিকতা বিনষ্ট হইয়া এক বিরাট্ সাহিত্যের স্থলে এতগুলি প্রাদেশিক সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে যে, এক প্রদেশের সাহিত্য অন্য প্রদেশের অধিবাসীদিগের পক্ষে আদৌ সুগম হইবে না।

যাহা কোনো দেশে কখনও হয় নাই, তাহা আমাদের দেশে হইবে, এরূপ মনে করা কত দূর সঙ্গত, তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন। কোনো দেশে কোনো কালে সাহিত্যের ভাষা আপামর সাধারণের সহজবোধ্য হয় নাই। Milton, Locke, Burke, Carlyle প্রভৃতির ভাষা ইংলন্ডের এই অপূর্ব শিক্ষা-বিস্তারের দিনেও কি কর্নওয়ালের শ্রমজীবীদিগের অনায়াসবোধ্য? কতকটা শিক্ষা না হইলে সাহিত্য আয়ত্ত করা যায় না। কেবল আমাদের

দৈনন্দিন জীবন ধারণের উপযোগী শিক্ষা দিবার জন্য সাহিত্যের সৃষ্টি নহে। তাহা হইলে, Milton, Shakespeare, Tennyson, কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের কোনোই প্রয়োজন ছিল না। সাধারণ কৃষককে আলু পটোলের চাষ শিক্ষা দিবার জন্য যদি গ্রন্থ লিখিতে হয়, তাহাতে প্রাদেশিক মৌখিক ভাষার ব্যবহার দূষণীয় নহে। কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্য আরও উচ্চ। স্থূলভাবে বলিতে গেলে হৃদয়ে উচ্চভাব উদ্বুদ্ধ করা, সৌন্দর্য-বুদ্ধির বিকাশ করা, রসের সৃষ্টি করা প্রভৃতি সাহিত্যের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিবিধ Style বা রচনা পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে; যাহা সাধারণ, তাহা কোথাও অসাধারণভাবে বর্ণিত হয়; যাহা এক কথায় বলা যায়, তাহা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয়। এই art বা লিপিকৌশল বহুকালব্যাপিনী একনিষ্ঠ শিক্ষা ও সাধনার ফল। শক্তিশালী লেখকদিগের প্রত্যেকেরই style বা রচনা-পদ্ধতি স্বতন্ত্র। তাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তিরাও সহজে আয়ত্ত করিতে পারেন না, ইতর লোকের ত কথাই নাই। আবার ভাষার অন্তরালে যে ভাব রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলেও শিক্ষার প্রয়োজন। সাধারণ লোকের শিক্ষাদৈন্য হেতু যে বিশেষ ভাবদৈন্যও আছে, এ কথা কি কেহ অস্বীকার করিবেন? তার পর ভাষার কথা। ভাষা ভাবেরই বাহ্য আকৃতি। মানবের আকৃতির যেমন একটি standard বা সাধারণ আদর্শ আছে, যাহার ন্যূন হইলে আকৃতি নিন্দনীয় বা উপহসনীয় হয়, সাহিত্যের ভাষারও সেইরূপ একটি আদর্শ আছে, যাহা হইতে হীন হইলে ভাষা নিন্দনীয় ও উপহসনীয় হইয়া থাকে। স্বাভাবিক নিয়মে বাংলা ভাষার সেই আদর্শ ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। স্বাভাবিক নিয়মে সেই আদর্শে অল্পবিস্তর পরিবর্তনও ঘটিয়াছে; কিন্তু তাহা প্রকৃতির নিয়মে এমনই নিঃশব্দে অনাড়ম্বরে হইয়াছে যে, তাহা গ্রহণ করিতে কেহ আপত্তি করেন নাই।

মোট কথা, উপযুক্ত শিক্ষা ভিন্ন কেহ উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের রস গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং মৌখিক ভাষা ব্যবহার করিলেই যে সে উদ্দশ্য সিদ্ধ হইবে, এরূপ মনে করা যায় না।

আমি দৃষ্টান্তের দ্বারা আমার বক্তব্য বিশদ করিবার চেষ্টা করিব:

> লাভ করবার স্বাভাবিক অধিকার আছে বলেই লোভ করা স্বাভাবিক। কোনো কারণেই কিছু থেকে বঞ্চিত হব প্রকৃতির মধ্যে এমন বাণী নেই। মনের দিক থেকে যেটা চাচ্চে, বাইরের দিক থেকে সেটা পেতেই হবে, প্রকৃতিতে ভিতরে বাইরে এই রফাটাই সত্য। এই সত্যকে যে শিক্ষা মানতে দেয় না তাকেই আমরা বলি নীতি, এই জন্যেই নীতিকে আজ পর্য্যন্ত কিছুতেই মানুষ মেনে উঠতে পারছে না।
>
> যারা কাড়তে জানে না, ধরতে পারে না, একটুতেই যাদের মুঠো আলগা হয়ে যায়, পৃথিবীতে সেই আধ-মরা একদল লোক আছে নীতি সেই বেচারাদের সান্ত্বনা দিক্। কিন্তু যারা সমস্ত মন দিয়ে চাইতে পারে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভোগ করতে জানে, যাদের দ্বিধা নেই সঙ্কোচ নেই, তারাই প্রকৃতির বরপুত্র। তাদের জন্যই প্রকৃতি যা কিছু সুন্দর যা-কিছু দামি

> সাজিয়ে রেখেচে। তারাই নদী সাঁৎরে আস্‌বে, পাঁচিল ডিঙিয়ে পড়বে, দরজা লাথিয়ে ভাঙবে, পাবার যোগ্য জিনিস ছিনিয়ে কেড়ে নিয়ে চলে যাবে। এতেই যথার্থ আনন্দ, এতেই দামি জিনিসের দাম। প্রকৃতি আত্মসমর্পণ কর্বে—কিন্তু সে দস্যুর কাছে। কেন না চাওয়ার জোর নেওয়ার জোর, পাওয়ার জোর সে ভোগ কর্‌তে ভালবাসে—তাই আধ মরা তপস্বীর হাড়-বের-করা গলায় সে আপনার বসন্ত-ফুলের স্বয়ম্বরের মালা পরাতে চায় না। নহবৎখানায় রসনচৌকি বাজচে—লগ্ন বয়ে যায় যে, মন উদাস হয়ে গেল। বর কে? আমিই বর—যে মশাল জ্বালিয়ে এসে পড়তে পারে, বরের আসন তারই। প্রকৃতির বর আসে অনাহূত।

উপরি-উদ্ধৃত অংশে লেখক তাঁহার যথাসাধ্য সহজ ভাষা প্রয়োগের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ওই ভাষার অন্তর্নিহিত ভাব চাষা মজুরেরা বুঝিতে পার কি? তাহা যদি না পারিল, তবে সাহিত্যকে, এরূপে প্রাদেশিকতাদুষ্ট করা কেন? ওই ভাষা ও ভাব লেখকের ভাষা ও ভাবদৈন্যের সূচক। অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা একটি ভানমাত্র।

ভাষা এত সহজ হইলে ও ভাব সাধারণের বোধগম্য হইল না। কিন্তু বাংলা দেশের জনসাধারণ আদরের সহিত কালীপ্রসন্ন সিংহের সাধুভাষায় অনূদিত মহাভারত পাঠ করিয়া থাকে। এখানে ভাষা সহজ নহে, কিন্তু ভাবের সহিত পাঠক বা শ্রোতার পূর্ব পরিচয় আছে। তাই ভাষার কঠিন আবরণে ভাব সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন করিতে পারে না।

নব্যসম্প্রদায় এই কথার উত্তরে বলেন :

> মৌখিক ভাষার অনুসরণ করিলে সাহিত্যে প্রাদেশিকতা এসে পড়বে—এ ভয় অনেকেই পান; এবং সাহিত্যকে এ দোষ হতে মুক্ত রাখবার অভিপ্রায়ে তাঁরা প্রস্তাব করেন যে, সমস্ত বঙ্গদেশের জন্য এমন একটি ভাষা রচনা করতে হবে, যা বাঙ্গালার কোন প্রদেশেরই ভাষা নয়। সাধুভাষার স্বপক্ষে এই হচ্ছে সর্বপ্রধান যুক্তি। সাহিত্যের রাজ্য অধিকার করবার জন্য নানা প্রাদেশিক ভাষার ভিতর প্রথমে লড়াই চলে। সে লড়াইয়ে যে প্রাদেশিক ভাষার রসনা বল সব চেয়ে বেশি, সেই ভাষা জয়লাভ করে—বাদবাকি সব উপভাষা হয়ে পড়ে। পৃথিবীর সকল দেশেই সাহিত্যের ভাষা তার কোন একটি বিশেষ প্রদেশের মৌখিক ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং সেই মৌখিক ভাষার সঙ্গে যোগ রক্ষা করেই সাহিত্যের ভাষা পুষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। যুগে যুগে মৌখিক ভাষার অল্প বিস্তর পরিবর্তন ঘটে, এবং সঙ্গে সঙ্গে লিখিত ভাষারও রূপান্তর ঘটে। বঙ্গদেশে সাহিত্যের ভাষা দক্ষিণ বঙ্গের মৌখিক ভাষা ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং কালক্রমে দক্ষিণ বঙ্গের মুখের কথার যে

বদল হয়েছে, আমাদের নব সাহিত্যের ভাষাকেও সেই বদল অল্পাধিক পরিমাণে অঙ্গীকার করতে হবে—নইলে আমাদের সাহিত্য রসরক্তহীন হয়ে পড়বে।

বেশ কথা। তাহা হইলে নব্যপন্থীরাও স্বীকার করিতেছেন যে, সাহিত্যের ভাষা প্রত্যেক প্রদেশের মৌখিক ভাষার অনুসরণ করে না। সেই সমস্ত উপভাষার মধ্যে যাহার রসনাবল বেশি, অর্থাৎ যাহা সর্বাপেক্ষা পরিপুষ্ট ও ভাবপ্রকাশের সমর্থ, সেই ভাষার উপরই সাহিত্যের ভাষা প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণবঙ্গের বা কলিকাতার ভাষার এ পরিপুষ্টি কোথা হইতে আসিল? একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে, কলিকাতাবাসীরা বঙ্গদেশের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষিত ও সভ্য বলিয়া তাঁহাদের ভাষাও সংস্কৃতশব্দবহুল ও বহুপরিমাণে গ্রাম্যশব্দবর্জিত। ভাবপ্রকাশে অধিকতর সমর্থ বলিয়া সাহিত্যের ভাষা স্বভাবত সেই ভাষাকেই আশ্রয় করিয়াছে, এবং স্বাভাবিক নিয়মে নিজের পরিপুষ্টির জন্য নানা স্থান হইতে, বিশেষত সংস্কৃতের অক্ষয় রত্নভাণ্ডার হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে। ইহাই বাংলা সাধুভাষা নামে পরিচিত। তার পর কথা হইতেছে যে, মৌখিক ভাষার পরিবর্তনের সহিত সাহিত্যের ভাষার পরিবর্তনের কত দূর সম্বন্ধ? আমরা সকল দেশেই দেখিতে পাই, সাহিত্যে উন্নতির স্রোতোবেগের সহিত মৌখিক ভাষা প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। গত পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বে কলিকাতার মৌখিক ভাষা যেমন ছিল, আজও তেমনই আছে; কিন্তু এই কালের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ভাষার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। সাহিত্যের সহিত জনসাধারণের পরিচয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মৌখিক ভাষারও উন্নতি হইবে; কিন্তু সাহিত্যের ভাষাকে ছোটো হইয়া মৌখিক ভাষার সঙ্গে মিশিতে হইবে, এবং তাহা না করিলে সাহিত্য 'রসরক্তহীন' হইয়া পড়িবে, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

যাহা হউক, প্রাদেশিক পক্ষপাতী লেখকগণ আমাদের দেশের জনসাধারণকে সাধু ভাষায় যতটা অনভিজ্ঞ মনে করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা তত দূর অনভিজ্ঞ নহে। ১৩২০ সালের মাঘ মাসের সাহিত্য-সংহিতার প্রকাশিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক যথার্থই বলিয়াছেন—

জীবনের উষাকাল হইতেই যে দেশের আপামর সাধারণের কর্ণে সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দ ধ্বনিত হইতে থাকে, যে দেশের পূজা ও উৎসবের ভাষা সংস্কৃত, যে দেশের গৃহে গৃহে ব্যাস বাল্মীকির সমাদর, যে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা যাত্রা ও কথকতায় সংস্কৃতশব্দবহুল ভাষায় পুরাণের আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করে, যে দেশে ভিখারিরা পর্যন্ত জয়দেব, বিদ্যাপতির সাধু ভাষায় রচিত পদাবলি গান করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়, যে দেশে গ্রাম্য পাঠশালায় পর্য্যন্ত চাণক্য শ্লোক পঠিত হইয়া থাকে, সে

> দেশের লোক হঠাৎ কিরূপে এমন মূর্খ হইয়া পড়িল যে, আর তাহারা সাধু ভাষা বুঝিতে পারে না?

আর এক কথা, প্রাদেশিক ভাষার দৈন্য সর্ববাদিসম্মত—সকল প্রকার ভাবপ্রকাশে ইহার শক্তি নাই। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, সাধারণের বোধগম্য ভাষায় গ্রন্থ লিখিব বলিয়া যাঁহারা লেখনী ধারণ করেন, তাঁহাদিগকেও বাধ্য হইয়া সাধু ভাষায় শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। কেবল 'হচ্ছে' 'যাচ্চে' 'হলুম' 'গেলুম' এইরূপ কয়টি ক্রিয়া পদের প্রয়োগ করিয়াই তাঁহারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহাদের নেতৃস্থানীয় কোনো লেখকের একটি রচনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :

> জগতে সৎ চিৎ ও সানন্দের প্রকাশকে আমরা জ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিতে পারি, কিন্তু তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া নাই। কাষ্ঠ বস্তু গাছ নয়, তার রস টানিবার ও প্রাণ ধরিবার শক্তিও গাছ নয়; বস্তু ও শক্তিকে একটি সমগ্রতার মধ্যে আবৃত করিয়া যে একটি অখণ্ড প্রকাশ তাহাই গাছ—তাহা একই কালে বস্তুময়, শক্তিময়, সৌন্দর্যময়। গাছ আমদিগকে যে আনন্দ দেয় সে এই জন্যই। এই জন্যই গাছ বিশ্ব পৃথিবীর ঐশ্বর্য। গাছের মধ্যে ছুটির সঙ্গে কাজের, কাজের সঙ্গে খেলার কোনো বিচ্ছেদ নাই। এই জন্যেই গাছ পালার মধ্যে চিত্ত এমন বিরাম পায়—ছুটির সত্য রূপটি দেখিতে পায়। সে রূপ কাজের বিরুদ্ধ রূপ নয়। বস্তুত তাহা কাজেরই সম্পূর্ণ রূপ। এই কাজের সম্পূর্ণ রূপটিই আনন্দরূপ সৌন্দর্যরূপ। তাহা কাজ বটে, কিন্তু তাহা লীলা, কারণ তাহার কাজ ও বিশ্রাম এক সঙ্গেই আছে।

ইহা হইতে কি বুঝা যায় না যে, বিষয়-ভেদে ভাষার তারতম্য হইয়া থাকে, এবং সমস্ত প্রকার ভাবপ্রকাশে প্রাদেশিক বা মৌখিক ভাষা অক্ষম?

যাহা হউক, নবীন সম্প্রদায় তাঁহাদের এই সাধুভাষাবিদ্বেষের দ্বারা এক ভীষণ রাক্ষসের সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন তাহাকে নিবারণ করিবেন কীরূপে? অথচ নিবারিত না হইলে সে ভীষণ অনর্থপাত করিবে। নবীন সম্প্রদায় প্রচলিত সাধুভাষাকে বাংলা ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতেছেন না; দক্ষিণবঙ্গের মৌখিক ভাষাকেই বাংলা সাহিত্যের ভাষা বলিতেছেন। কিন্তু অন্য প্রদেশের লোকেরা দক্ষিণ-বঙ্গের প্রাদেশিক ভাষাকে সে প্রাধান্য দিতে চাহিতেছেন না। তাহার উপায় কী? আসাম ত অনেক দিন আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছে। মুসলমানেরা বলিতেছেন,—এতদিন আমরা বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ভাষাকে স্বীকার করিয়া চলিতাম—সেই ভাষায় গ্রন্থ লিখিতাম—কোনো আপত্তি করিতাম না; কারণ, তাহাতে সকল প্রদেশের সমান অধিকার ছিল। কিন্তু এক্ষণে তোমরাই যখন সেই সর্ববাদিসম্মত ভাষাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া প্রাদেশিক মৌখিক ভাষাকে সেই সিংহাসনে বসাইতে চাহিতেছ, তখন আমাদের মৌখিক ভাষাকে উপেক্ষা করিবে কেন? তোমরা যতদিন 'হইতেছে'

লিখিতে, ততদিন আপত্তি করি নাই, কিন্তু একন যদি 'হচ্ছে' বা 'হচ্চে' লেখ, তবে আমরাই বা 'হবার লাগছে' লিখিব না কেন? ক্রমে প্রত্যেক প্রদেশের উপভাষাই এইরূপ এক একটি দাবি উপস্থিত করিবে। তখন তাহার কী উত্তর দিবে?

আমার নিবেদন এই যে, যে সকল লেখক এইরূপ নূতন করিয়া বাংলা সাহিত্যের ভাষা গড়িবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের লেখনী সংযত করুন। আমি প্রবীণ, সুতরাং সংশয়াকুল ও বিধিনিষেধের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত, সবুজের লেশমাত্রহীন, 'আধমরা', বিষম 'পাকা' হইতে পারি, কিন্তু হে নবীন, আমি যে অনেক নবীনের উচ্ছৃঙ্খলতার ফল মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছি। অতীতের অভিজ্ঞতা উন্নতির সোপানশুক্তি ; তোমরা তাহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ভাঙিয়া ফেলিতে চাহ।

তোমরা 'মনঃ' না লিখিয়া 'মন' লেখ, কোনও আপত্তি করি নাই— করিবও না; 'মনঃকষ্ট' না লিখিয়া 'মনকষ্ট' লেখ—সহ্য করিব; কিন্তু 'মনোকষ্ট' লিখিলে সহ্য করিব না। তখনই বিধিনিষেধের কথা তুলিব। সহজ সরল ভাষায় লেখ, আপত্তি নাই, যদি অযথা গ্রাম্য শব্দের ব্যবহার বা বিজাতীয় রচনা পদ্ধতি অবলম্বন না কর। যদি লেখ :

> মাগো, আজ মনে পড়চে তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, চওড়া সেই লাল পেড়ে শাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ—শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর। সে যে দেখেছি আমার চিত্তাকাশে বেলাকার অরুণরাগরেখার মতো। আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছিল। তার পরে? পথে কালের মেঘ কি মতো ছুটে এল? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখ্‌ল কিন্তু জীবনের ব্রাহ্ম মুহূর্তে সেই উষা সতীর দান, দুর্যোগে সে ঢাকা তবু সে কি নষ্ট হবার? আমাদের দেশে তাকেই বলে সুন্দর যার বর্ণ কিন্তু যে আকাশ আলো দেয় সে যে নীল। আমার মায়ের বর্ণ ছিল তাঁর দীপ্তি ছিল পুণ্যের।

—তবে এই রচনা-পদ্ধতির নিন্দা করিব। এক কথা, যেমন সম্মুখে অত্যুচ্চ আদর্শ না থাকিলে, মানুষ সর্বপ্রযত্নে আত্মোন্নতি করিতে পারে না, সেইরূপ লেখকের সম্মুখে ভাষারও একটি অত্যুচ্চ আদর্শ না থাকিলে ভাষা সর্বাঙ্গসুন্দর হইচেত পারে না। সকল লেখকেরই ভাষা সেই আদর্শে উপনীত হইতে পারিবে, এমন আশা করা যায় না; তবে সেই আদর্শে উপস্থিত হইবার জন্য যদি সকলেই চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ভাষার অধোগতি নিবারিত হইয়া অবিচ্ছিন্ন উর্ধ্বগতির টান আসিয়া পড়িবে। কিন্তু আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইলে অথবা এক আদর্শ ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড হইলে, সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত না হইয়া নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। হে নবীন, এই বিক্ষিপ্ত শক্তি লইয়া তুমি কি বঙ্গবাণীর বিরাট্ স্বর্ণমন্দির-নির্মাণে সমর্থ হইবে?

নবীন সম্প্রদায় আমাদের সাহিত্যে যে নূতন Idea বা ভাব আনিতেছেন, এবার আমি তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। তাঁহারা তাঁহাদিগের স্বদেশবাসীগণকে স্বতঃ

পরতঃ এই শিক্ষা দিতেছেন যে, শাস্ত্রোক্ত বিধান সকল তাঁহাদিগের মনুষ্যত্ব-বিকাশের প্রধান অন্তরায়। শাস্ত্র তাঁহাদিগকে চিরকাল অপরিণত শিশুর ন্যায় রাখিতে ভালোবাসে এবং 'পল্‌তেয় করে ফোঁটা ফোঁটা পুঁথির বিধান খাইয়ে তাকে বাঁচ্‌য়ে রাখ্‌তে' চায়। এই জন্য তাঁরা উপদেশ দেন—শাস্ত্রের বিধি নিষেধ ও সেই সঙ্গে সেই বিধি-নিষেধ-শাসিত সমাজের বিধি নিষেধ চরণে দলিত করিয়া তোমরা উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মত্তভাবে চল। 'যারা নীতির উপবাসে শুকিয়ে শুকিয়ে অনেক কালের পরিত্যক্ত খাটিয়ার ছারপোকার মতো একেবারে পাতলা সাদা হ'য়ে গেছে, তাদের চিঁ—চিঁ—গলার ভর্ৎসনা কানে করিও না।' সমাজ পুরুষদিগকেই যখন এত উৎপীড়ন করে, তখন নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকদিগের উপর তাহার অত্যাচারের সীমা নাই! তাই তাঁহারা বলেন—

> সমস্ত সমাজ চারিদিক থেকে আমাদের মেয়েদের মনকে যেন ছোট করে বাঁকিয়ে রেখে দিয়েছে। ভাগ্য ওদের জীবনটাকে নিয়ে জুয়ো খেল্‌ছে—দান পড়ার উপরই সমস্ত নির্ভর, নিজের কোন্ অধিকার ওদের আছে!

হায় সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী! শাস্ত্র ও সমাজের কি অযথা অত্যাচার ও উৎপীড়নই তোমরা সহ্য করিয়া বাঁকিয়া ছোটো হইয়া গিয়াছ! যে পতি তোমাকে নিষ্কলঙ্ক জানিয়াও বনে দিয়াছিলেন, জনকনন্দিনি, তুমি তাঁহার প্রতি ক্রোধের লেশমাত্র না করিয়া অনন্যমনে তাঁহারই চরণ ধ্যান করিয়াছ! যখন সভাস্থলে বিশাল জনতার সমক্ষে নিজ পবিত্রতার প্রমাণ দিবার জন্য আহূত হইয়াছিলে, তখন নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইয়াও বলিয়াছিলে :

> যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি না চিন্তয়ে।
> তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।।
> মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
> যথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।।

হা ধিক্! তুমি নিতান্ত নির্বুদ্ধির কার্য করিয়াছিলে! তুমি বৃদ্ধ বাল্মীকির রামায়ণের নায়িকা হইতে পার; কিন্তু সাহিত্যের নব্যপন্থী 'ঘরে বাইরে' তোমার নিন্দা করিবেন। তাঁহারা বলিবেন—'স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ।' সুতরাং স্ত্রী স্বামীকে পূজা করিবে কেন? 'তীর্থের অর্থপিশাচ পাণ্ডা পূজার জন্য কাড়াকাড়ি করে কেন না সে পূজনীয় নয়; পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজা দাবী করে থাকে। তাতে পূজারি ও পূজিত দুইয়েরই অপমানের এক শেষ।' সমাজ স্থিতির প্রধান সহায় দাম্পত্যপ্রেম ও পতিভক্তির অত্যুন্নত আদর্শকে সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া কোটি কোটি লোকের জীবনপথের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ হইয়া আসিতেছে, স্তনন্ধয়ী হিন্দুবালিকা প্রত্যহ মাতৃস্তন্যের সহিত যে আদর্শকে গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া

উঠিতেছে, সেই আদর্শকে এইরূপে নষ্ট করিবার অধিকার নবীন প্রবীণ কাহারও নাই। এই আদর্শ দূরীভূত বা ক্ষুণ্ণ হইলে সমাজ পিশিতপিণ্ড-প্রিয়তার তাণ্ডবনৃত্যে টলটলায়মান হইবে। তাহার পরিণাম চিন্তা করিয়াছ কি?

এই সকল মহান্ আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা আজই যে হইতেছে, তাহা নহে। জগতের ইতিহাসে কখনও কালাপাহাড়ের অভাব হয় নাই। কালাপাহাড়দিগের চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই বটে; কিন্তু তত্তৎ সমাজের অঙ্গে এমন কলঙ্কের রেখাপাত করিয়া গিয়াছে যে, তাহা পরবর্তী শত চেষ্টাতেও অপনীত হইতেছে না।

হে নবীন! বিধিনিষেধের উপর তোমার এত বিরাগ কেন? জগৎ একেবারেই প্রবীণ হইয়া উঠে নাই—সেও একদিন নবীন ছিল, সেও একদিন কোনো বিধি নিষেধ না মানিয়া উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ছুটাছুটি করিয়াছে; সংযমকে কাপুরুষতার নামান্তর ভাবিয়া পদদলিত করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে সুখ পায় নাই—শান্তি পায় নাই। তখন আপনি ইচ্ছা করিয়া নিষেধের লৌহশৃঙ্খল গঠন করিয়া পরিয়াছে। সেই দিনই তাহার উন্নতির ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা।

বলিতে পার, বিধিনিষেধের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু তোমাদের অযথা উচ্ছৃঙ্খলতাবৃদ্ধিই ইহার প্রধান কারণ নহে কি? হস্তিপক দুর্বিনীত হস্তীকে প্রয়োজনাতিরিক্ত শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া থাকে। হস্তী বিনীত হইলে বন্ধনেরও প্রয়োজনাভাব হয়। যতই চেষ্টা কর না কেন, সংসারে প্রবীণের অত্যন্তাভাব কখনও ঘটিবে না। এই অকালমৃত্যুর দেশেও তোমাদিগকে প্রবীণের উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইতেছে; কালে তোমরাই যে প্রবীণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে। তখন যে মুখে 'চেঙ্গমুড়ী-কাণী' বলিয়াছ, সেই মুখেই 'জয় বিষহরি' বলিবে।

আমি অতিরিক্ত বিধিনিষেধের পক্ষপাতী নহি। এস নবীন প্রবীণ মিলিয়া একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া, সমাজের মঙ্গলের পক্ষে কোন্‌টা প্রয়োজনীয়, কোন্‌টাই বা অপ্রয়োজনীয়, তাহার বিচার করি। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ব্যবস্থা প্রবীণই ত করিয়াছে। কিন্তু এ কার্যে পরস্পরের সহানুভূতি চাই—অসহিষ্ণুতা একেবারে বর্জন করিতে হইবে। তোমরা 'টিকি-মঙ্গল' কাব্য লিখিলে আমরা 'টেড়ি-মঙ্গল' লিখিব। তাহাতে কলহ বাড়িবে—কাজ হইবে না। আমরা প্রবীণ স্বভাবত কলহপ্রিয় নহি। যত দূর সম্ভব, মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারিলে আমরা অন্য পথ অবলম্বন করি না। শাস্ত্রে ইহাই দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। শাস্ত্র এক মহান্ উচ্চ আদর্শ সম্মুখে ধরিয়াছেন, বলিয়াছেন যদি প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য হইতে চাহ, এই আদর্শের প্রতি লক্ষ রাখিয়া উঠিতে থাক। কিন্তু সকলেই সে আদর্শের অনুসরণ করিতে পারিবে না, বা চাহিবে না; তাই শাস্ত্র অধিকারিভেদে উন্নতির অন্য বহু পথেরও নির্দেশ করিয়াছেন; কারণ, যে উঠিতে না চায়, তাহাকে নিশ্চয়ই পড়িতে হইবে, উন্নতি অবনতির মধ্যবর্তী কোনো পাই নাই। ভূয়োদর্শন ও গভীর চিন্তার ফলে শাস্ত্র

দেখিয়াছেন যে :

> ন জাতু কামঃ কামনামুপভোগেন শাম্যতি।
> হরিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।।

তাই শাস্ত্র ভোগের মধ্যেও সংযমের শিক্ষা দিয়াছেন। এই শিক্ষা ও নূতন শিক্ষার মধ্যে প্রভেদ আমি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

সন্দীপচন্দ্র ও বিমলা আধুনিক শিক্ষা প্রণালীতে সুশিক্ষিত। বিমলা প্রথমে প্রাচীন পদ্ধতিতেই শিক্ষিতা হইয়াছিল। তাই সে প্রথম প্রথম শ্বশুরবাড়িতে আসিয়া স্বামী নিখিলেশের পদধূলি লইয়া শয্যাত্যাগ করিত। স্বামী বলিলেন—ছি ছি ও কাজও করে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পূজ্য পূজকের সম্বন্ধ নাই, উভয়েরই যে সমান অধিকার। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন—তোমাকে বাহির হইতে হইবে কারণ 'তোমাকে বাইরের দরকার থাক্‌তে পারে। এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখ কান মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে,—তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়ে তাও জান না।' স্বামীর নিকট এইরূপ শিক্ষা পাইয়া বিমলার চরিত্র গঠিত হইতে লাগিল। এমন সময় স্বামীর বন্ধু সন্দীপচন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। সন্দীপচন্দ্রের শিক্ষাও আধুনিক—তাহা এইরূপ—'আমি যা চাই তা আমি খুবই চাই। তা আমি দুই হাতে করে চটকাব, দুই পায়ে করে দল্‌ব। সমস্ত গায়ে তা মাখ্‌ব, সমস্ত পেট ভরে তা খাব। চাইতে আমার লজ্জা নেই, পেতে আমার সঙ্কোচ নেই। যারা নীতির উপবাসে শুকিয়ে শুকিয়ে অনেক কালের পরিত্যক্ত খাটিয়ার ছারপোকার মত একেবারে পাতলা সাদা হয়ে গেছে তাদের চি চি গলার ভর্ৎসনা আমার কানে পৌঁছবে না।' কি উৎকট ভোগলালসা! নিখিলেশ স্ত্রীর চরিত্ররক্ষার প্রধান সহায় পতিভক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া তাহাকে নিতান্ত অবলম্বনহীন করিয়াছিলেন। সন্দীপচন্দ্রের নীতির বালাই একেবারেই ছিল না। তাই পরস্পরের সাক্ষাৎমাত্র উভয়েই মরিল। বন্ধুর স্ত্রীকে দেখিবামাত্র মাংসলোলুপ মার্জারের ন্যায় সন্দীপ লাফাইয়া উঠিল। সে বলিল:

> আমি যে স্পষ্ট দেখ্‌ছি ও আমাকে চায়—ওই ত আমার স্বকীয়া। গাছে ফল বোঁটায় ঝুলে আছে— সেই বোঁটার দাবীকেই চিরকালের বলে মান্‌তে হবে না কি? ওর যত রস, যত মাধুর্য্য সে যে আমার হাতে সম্পূর্ণ খসে পড়বার জন্যেই—সেই খানেই একেবারে আপনাকে ছেড়ে দেওয়াই ওর সার্থকতা,—সেই ওর ধর্ম, ওর নীতি। আমি সেইখানেই ওকে পেড়ে আনব, ওকে ব্যর্থ হতে দেব না।

এই চিত্রের সহিত ব্যাধ কালকেতুর চিত্রের তুলনা করুন। অশিক্ষিত ব্যাধ হাটে মাংস বেচিয়া খায়, বনে বাস করে। পুরাণ-পাঠ ও কথকতায় যে শিক্ষা সমাজের বাতাসে মিশিয়া আছে, নিশ্বাসের সহিত সেই শিক্ষাই তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহার চরিত্র

গঠন করিয়াছে। তাহার কুটিরে অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী আসিয়া অযাচিতভাবে তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতে চাহিল। মূর্খ ব্যাধ ত বলিল না—'ও আমাকে চায়—ওই ত আমার স্বকীয়া।' সে তাহার মজ্জাগত শিক্ষার প্রেরণায় বলিল :

ত্যজিয়া ব্যাধের বাস, চল বন্ধুজন পাশ,
থাকিতে থাকিতে দিননাথে।
যদি হয় পাপনিশা, লোকে ঘোষিবে দুর্ভাষা,
রজনী বঞ্চিলে কার সাথে।"

তাহাতেও যখন কোনো ফল ফলিল না, তখন যে মাতৃসম্বোধন করিয়া নিতান্ত বিরক্তভাবে বলিল :

বুঝিতে না পারি গো তোমার ব্যবহার।
যে হৌক যে হৌক, মোর আগে নমস্কার।।
ছাড় এই স্থান মাতা, ছাড় এই স্থান।
আপনি রাখিলে রহে আপনার মান।।

এখানে সন্দীপ ও কালকেতু—কাহাকে উচ্চ আসন দিব?
এক শ্রদ্ধাস্পদ লেখক লিখিয়াছেন—

আজ পর্য্যন্ত আমাদের সাহিত্যে যদি কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্ম্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসানের পুনরাবৃত্তি নিয়ত চল্‌তে থাক্‌ত তাহলে কি হত? পনেরো আনা লোক সাহিত্য পড়া ছেড়েই দিত।....বঙ্কিম আন্‌লেন সাত সমুদ্র পারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য রাজকন্যার পালঙ্কের শিয়রে। তিনি যেমন ঠেকালেন সোনার কাঠি, অমনি সেই বিজবসন্ত লয়লামজনুর হাতির দাঁতে বাঁধানো পালঙ্কের উপর রাজকন্যা নড়ে উঠ্‌লেন, চল্‌তি কালের সঙ্গে তাঁর মালা বদল হ'য়ে গেল, তার পর থেকে তাঁকে আজ আর ঠেকিয়ে রাখে কে?

বিদেশ হইতে সোনার কাঠি আনিয়া রাজকন্যার চেতনা-সঞ্চার করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ভালোই করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সেই সাত সমুদ্র পারের বিদেশি রাজপুত্রের সহিত রাজকন্যার যে বিবাহ দেওয়াইয়াছেন। স্ত্রী যে তাহার গোত্র হারাইয়া বিদেশির সগোত্রা হইয়া গেল। যত গোল যে এইখানে। প্রাচীন শিক্ষার যত দোষই থাকুক, সে শিক্ষায় নারীজাতিকে কেবলমাত্র ভোগের বস্তু বলিয়া জ্ঞান হয় না—সে শিক্ষায় নারীর মাতৃত্বকেই অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া তুলে। আধুনিক শিক্ষা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজকন্যা চিরদিনই বিলাসপর্যঙ্কশায়িতা ভোগসঙ্কুক্ষিত-হৃদয়া রাজকন্যাই রহিলেন—মাতৃত্বের স্বর্ণসিংহাসনে

ভুবনেশ্বরী মূর্তিতে সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া তাহার মুখে হৃদয়ক্ষীরোদের পীযূষধারা ঢালিয়া দিবার গৌরব অনুভব করিতে পারিলেন না!

আমি আর আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইব না। এই প্রীতিসম্মিলনে বন্ধুবর্গকে লাভ করিয়া হৃদয়ের আবেগে অনেক কথা বলিয়াছি, বিদ্বেষবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া নহে, কেবলমাত্র মাতৃভাষার মঙ্গলকামনায়। যদি অন্যায় বলিয়া থাকি, আপনারা ক্ষমা করিবেন। শক্তির দৈন্যে বিষয়গুরুত্বের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারি নাই। যদি উপযুক্ত সাহিত্য-সমালোচকগণ এ বিষয়ে অসঙ্কোচে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা হইলে আমার এ নীরস শক্তিহীন অভিভাষণের উৎপীড়ন বলিয়াই, নবীনকে ভালোবাসি—সে যে আমাদেরই পুত্র, কন্যা, জ্ঞাতি, বন্ধু। নবীনের উপরে কি আমার কোনো বিদ্বেষ থাকিতে পারে? বিদ্বেষ নাই— দুঃখ আছে। তাই উপসংহারে তাঁহাদেরই কথায় তাঁহাদিগকে বলি :

> গড়ে তোলবার কাজে তোমার সমস্ত শক্তি দাও, অনাবশ্যক ভেঙে ফেলবার উত্তেজনায় তার সিকি পয়সা বাজে খরচ করতে নেই।

১৯১৪ সালে অনুষ্ঠিত 'সাহিত্য সভা'য় প্রদত্ত ভাষণ।

সমাজ

দীনবন্ধু মিত্র

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিসভায় বক্তৃতা

সম্প্রতি এক দিন শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ি, শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র এই কয় মহাশয় সমবেত হইয়া মৃত মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কলিকাতা নগরীতে প্রারব্ধ অট্টালিকার সাহায্য করণের মন্ত্রণা করেন। দীনবন্ধু বাবুই প্রধান সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিয়া অকপট যত্ন সহকারে অত্রত্য মহারাজ বাহাদুরের আদেশানুসারে এক সভার অনুষ্ঠান করেন। ২৬ জুলাই শনিবার বেলা ৪ টার সময় পাবলিক লাইব্রেরিতে এই সভা সংস্থাপিত হয়। কৃষ্ণনগরস্থ বহুতর ভদ্র ব্যক্তি সমাগত হইয়া এই সভামণ্ডপ মণ্ডিত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ ঘোষ মহাশয় সভাপতি পদে ব্রতী হন। অনন্তর দীনবন্ধু বাবু যে বক্তৃতা দ্বারা সমাগত সভ্যগণকে আর্দ্র করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রকটিত করা গেল।

হরিশ বাবু যেরূপ দেশহিতৈষী ছিলেন, হরিশ বাবু যেরূপ পরোপকারী ছিলেন, হরিশ বাবু যেরূপ সুলেখক ছিলেন, হরিশ বাবু স্বদেশের উন্নতির জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন, হরিশ বাবু রাজপুরুষদিগের যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্মরণার্থ কোনো চিহ্ন স্থাপন করা না করা সমান, কারণ তিনি চিরস্মরণীয়, তিনি প্রাতঃস্মরণীয়, তিনি ভুলিবার যোগ্য নন, তাঁহাকে ভুলেও ভোলা যায় না। হরিশ বাবুর স্মরণার্থে কোনো অট্টালিকা প্রস্তুত হউক বা না হউক তিনি আমাদের অন্তঃকরণ-অট্টালিকায় সতত বিরাজ করিতেছেন, হরিশ বাবুর স্মরণার্থ কোনো মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক বা না হউক, তিনি আমাদের হৃদয়-মন্দিরের আরাধ্য দেবতা হইয়া আছেন, হরিশ বাবুর প্রতিমূর্তি কোনো রাজপথে স্থাপিত হউক বা না হউক, তিনি আমাদের স্মরণপথে দেদীপ্যমান দণ্ডায়মান আছেন। কিন্তু ভাবীকালে তাঁহার নাম বিলুপ্ত না হয় এবং সকল দেশেই এরূপ সৎ প্রথা আছে যে, দেশের হিতকারী অসাধারণ গুণসম্পন্ন মহোদয়ের পরলোক হইলে তাঁহার স্মরণার্থ তাঁহার দেশস্থ লোকে কোনো চিহ্ন স্থাপন করিয়া রাখে, এই জন্য 'হরিশ্চন্দ্র সমাজ' নামক অট্টালিকার অনুষ্ঠান হইয়াছে।

হরিশ্চন্দ্র শিশুকালে উপায়হীন ছিলেন। তাঁহার পিতা মাতার তাদৃশ সম্পত্তি ছিল না যে তাঁহাকে সুচারুরূপে শিক্ষা দেন, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ছিল, তিনি প্রথমত ইউনিয়ান স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। তারপরে আপনি আপনার শিক্ষক হইয়াছিলেন, আপনি আপনার উপদেষ্টা হইয়াছিলেন, তিনি প্রত্যহ কলিকাতার পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়া সকল সংবাদপত্র এবং নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া আসিতেন এবং তাহাতেই যে ভুবনবিখ্যাত বিদ্যা উপার্জন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ভুবনবিখ্যাত *হিন্দু পেট্রিয়ট* সংবাদপত্রেই প্রকাশ আছে। পিতা মাতা পরিজন প্রতিপালনের ভার তাঁহার কোমল স্কন্ধে পতিত হওয়ায় তিনি অতি অল্প বয়সে টালার নিলামে এক ক্ষুদ্র কেরানির কর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার অধিক দিন থাকিতে হয় নাই। মিলিটারি অডিটার জেনারেল আপিশে ২৫ টাকা বেতনের এক কর্মখালি হইলে তিনি পরীক্ষা দিয়া ওই কর্ম প্রাপ্ত হন। হরিশ্চন্দ্র শুভক্ষণে মিলিটারি অডিটার জেনারেলের আপিশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ওইখান হইতেই তাঁহার উন্নতির সোপান হইল। তাঁহার কর্মদক্ষতা দেখিয়া তাঁহার মনিব সাহেবেরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং যখন পন্থা পাইয়াছিলেন তখনই হরিশের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যে ওই আপিশে হরিশের চারি শত টাকা বেতন হইয়াছিল।

শিশুকাল হইতেই হরিশের সংবাদপত্রে অনুরাগ ছিল, কারণ তিনি জানিতেন সংবাদপত্রই দেশের উন্নতির মূল, সংবাদপত্রের দ্বারাই দেশের সভ্যতা সাধন হইতে পারে, সংবাদপত্রের দ্বারাই দেশের উপকারজনক রাজনিয়মের সৃষ্টি হইতে পারে। তিনি প্রথমত সংবাদপত্রে স্বদেশের মঙ্গলজনক পত্র প্রেরণ করিতেন কিন্তু সম্পাদকেরা তাঁহার সকল পত্র ছাপিতে সাহসী হইত না, এই জন্যে তিনি বিরক্ত হইয়া আপনি নিজে একখানি সংবাদপত্রের সৃষ্টি করিলেন, সেই সংবাদপত্রের নাম *হিন্দু পেট্রিয়ট*, হরিশ্চন্দ্র অর্থলাভ করিবার জন্য *হিন্দু পেট্রিয়ট* প্রচার করেন নাই, কেবল স্বদেশের উপকার করিবার জন্য *হিন্দু পেট্রিয়ট* প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি যখন ১০০ টাকা বেতন পান, তখনই *হিন্দু পেট্রিয়ট* প্রথম সৃষ্টি হয় কিন্তু তখন ওই পত্রে মাসে ৫০ টাকা করিয়া ঘর হইতে দিতে হইত, স্বদেশ অনুরাগী হরিশ্চন্দ্র তার জন্যে এক দিনের তরেও কাতর হয় নাই। কাতর হবেন কেন? তাঁহার অন্তঃকরণ অতি মহৎ, তাঁহার অন্তঃকরণ অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিত না, কেবল স্বদেশের উপকারই পরমার্থ বলিয়া জানিত। হরিশ্চন্দ্র যে কাগজে লেখনী সঞ্চালন করিতে লাগিলেন সে কাগজে লোকসান কদিন থাকিতে পারে? হরিশের লেখা যে একবার পড়ে সে-ই মোহিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার জগৎবিখ্যাত হিন্দু *পেট্রিয়ট*-এর গ্রাহক হয়। অতি অল্প দিনের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের *হিন্দু পেট্রিয়ট* হইতে ৩০০। ৪০০ টাকা লাভ হইতে লাগিল। *হিন্দু পেট্রিয়ট*, হিন্দুবন্ধু হরিশ্চন্দ্রের লেখার কৌশলে বঙ্গদেশে অতিশয় আদরণীয় হইয়াছে। কেবল বঙ্গদেশ কেন বলিতেছি,

ভারতবর্ষময় *হিন্দু পেট্রিয়ট*-এর গৌরব হইয়াছে। কী মাদ্রাজ, কী মুম্বাই, কী লাহোর, কি আগরা, সকল স্থানেই *হিন্দু পেট্রিয়ট*-কে অতি সাহসী সংবাদপত্র বলিয়া গণ্য করে। ইংলন্ডেও *হিন্দু পেট্রিয়ট*-এর অতিশয় আদর হইয়াছে। ইন্ডিয়া কাউন্সেলে আদর হইয়াছিল, মহাসভা পার্লামেন্টে আদর হইয়াছিল, প্রিবি কাউন্সেলে আদর হইয়াছিল। বিলাতে আবওরিজিনিস প্রোটেকশন নামক এক সভা আছে, বিলাতের রাজ্যাধীন যত দেশ আছে সেই সকল দেশের আদিম বাসেন্দা লোকদিগের উন্নতি সাধন করা সে সভার উদ্দেশ্য। হরিশের *হিন্দু পেট্রিয়ট* এই সভার চক্ষু হইয়াছিল। হরিশ যে সকল মত প্রচার করিতেন এই সভার সভ্যগণ সেই মত অতিবিধেয় বলিয়া গণ্য করিতেন। কলিকাতার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আসোসিয়েসানের এক্ষণে যে গৌরব দেখিতেছেন, সে গৌরব হরিশ্চন্দ্রের লেখনীর জোরে হইয়াছে, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আসোসিয়েসানের দ্বারা ভারতবর্ষের যে উপকার জন্মিতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই, লেপ্‌টেনেন্ট গভর্নরের নিকটে, গভর্নর জেনারেলের নিকটে, ইন্ডিয়া কাউন্সিলের সেক্রেটারির নিকটে, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আসোসিয়েসানের প্রস্তাবাদি অতি আদরণীয় হইয়াছে। তাঁহারা জানেন এই ভারতবর্ষীয় সভার যে অভিপ্রায় তাহা ভারতবর্ষের সমুদায় লোকের অভিপ্রায়, ভারতবর্ষীয় সভাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে ভারতবর্ষের সমুদায় লোক সন্তুষ্ট হইবে, তাঁহারা জানিয়াছেন এই ভারতবর্ষীয় সভা ভারতবর্ষের পার্লামেন্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য মহোদয়েরা হরিশের বিদ্যা বুদ্ধি কৌশল ও রাজকার্যে পারদর্শিতা বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা হরিশকে পুত্রের মতো স্নেহ করিতেন, কোনো মহৎ বিষয় সুসম্পন্ন করিতে হইলেই তাঁহারা হরিশকে ভার দিতেন, হরিশ সে বিষয় এমনি সমাধা করিতেন তাঁহারা সকলে চমৎকৃত হইতেন এবং হরিশ দীর্ঘজীবী হউক, জগদীশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যগণের কী দুরদৃষ্ট। তাঁহাদের কী পরিতাপ! তাঁহারা অতি অল্প দিবসের মধ্যেই হরিশের অসাধারণ সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইলেন।

গত ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের মিউটিনির সময়, যে সময় সেপাইগণ রাজবিদ্রোহিতা করিয়াছিল সে সময় হরিশবাবু যে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা কখনোই ভুলিতে পারিব না। সে কথা মনে করিতে গেলে আমার অন্তঃকরণ অদ্যকার সভার সমুদায় লোকের অন্তঃকরণ ও ভারতবর্ষের সমুদায় লোকের অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হয়। সেপাইদিগের অত্যাচারে ভারতবর্ষের প্রায় যাবতীয় ইংরাজলোকে রাগান্ধ হইয়া ভারতবর্ষের সমুদায় লোকের প্রাণ সংহার করিবার জন্য চীৎকার-ধ্বনি করিতে লাগিলেন, তখন কাহার সাধ্য তাহাদের এই অসংগত মতে বিমত করে, তখন তাঁহাদের মতকে অন্যায় মত বলিলে ফাঁসি হয়, তখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটা কথা কহিলে তদ্দণ্ডে কাটিয়া ফেলে। আমরা কোন্ কীটস্য কীট। গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং তাঁহাদের মতকে অন্যায় মত বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার কত চেষ্টা

হইয়াছিল। এই ভয়াবহ সময়ে আমাদের সাহসী হরিশ্চন্দ্র চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এক দিকে তিনি তাঁহার লেখনী দ্বারা স্বদেশের লোকদিগকে মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে সাহস দিতে লাগিলেন, আর অন্যদিকে রাগান্ধ ইংরাজদিগের মতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে লাগিলেন। এবং যে সদুপায় দ্বারা রাজবিদ্রোহিতা একেবারে নিরাকৃত হইবে এবং ইংরাজ রাজ্য ভারতবর্ষে সগৌরবে চিরস্থায়ী হইবে তাহার প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। আহা! হরিশ্চন্দ্র কিছুমাত্র প্রাণের শঙ্কা করিতেন না। তিনি কেবল দেখিতেন কিসে স্বদেশের উপকার হইবে, তিনি স্বদেশের উপকারের কাছে তাঁহার জীবন অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, সেই ভয়াবহ সময়ে একজন ইংরাজ যদি বলে এই ব্যক্তি আমাদের মন্দ কথা বলেছে তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ কোনো বিচার না করিয়া কোনো প্রমাণ না লইয়া ফাঁসি দেয়, তা বলে কি হরিশ্চন্দ্র পিছপা হবেন, তা বলে কি হরিশ্চন্দ্র যথার্থ কথা লিখিতে সঙ্কুচিত হবেন, তিনি জানিতেন তাঁহার জীবন দিয়া দেশের যদি কিঞ্চিৎমাত্র উপকার হয় সেই তাঁর যথেষ্ট। লর্ড ক্যানিং মহোদয়, এই সময়ে *হিন্দু পেট্রিয়ট* সংবাদপত্রকে অতিশয় আদর করিতেন, তিনি রাগান্ধ হন নাই, তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণ চঞ্চল হয় নাই। তিনি তাঁহার মহানুভব সুপ্রিম কাউনসেলের সভ্যগণের পরামর্শ যেরূপ শুনিতেন সেইরূপ *হিন্দু পেট্রিয়ট* সংবাদপত্রের পরামর্শও শুনিতেন, তিনি তাঁহার সভার সভ্যগণের দ্বারা যেরূপ উপকৃত হইয়াছিলেন, সেইরূপ হরিশ্চন্দ্রের *হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রদ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন। লর্ড ক্যানিং প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন হরিশ্চন্দ্র আগামী বারে কি লেখেন। এক দিবস *হিন্দু পেট্রিয়ট* পৌঁছিবার সময় অতীত হইয়া গেল, হিন্দু পেট্রিয়ট না আসাতে লর্ড ক্যানিং ব্যস্ত হইয়া তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে বলিলেন এখন পর্যন্ত *হিন্দু পেট্রিয়ট* পাইলাম না ইহার কারণ কী? প্রাইভেট সেক্রেটারি এই কথা তৎক্ষণাৎ *হিন্দু পেট্রিয়ট* যন্ত্রালয়ে লিখিলেন এবং অবিলম্বে *হিন্দু পেট্রিয়ট* ক্যানিং মহোদয়ের হস্তগত হইল। সেই মহাত্মা লর্ড ক্যানিং সাহেবের জন্যে এবং আমাদের হরিশের জন্যে আমরা অন্যায় অপমৃত্যু হইতে রক্ষিত হইয়াছি। হরিশ্চন্দ্র আমাদের দেশের জন্যে এত করিয়াছেন, আমরা কি তাঁহার স্মরণার্থ অকিঞ্চিৎকর কিঞ্চিৎ অর্থদান করিতে পারিব না। হে সভাস্থ লোক! অর্থদান করিতে পারিব কি না পারিব বলিয়া জিজ্ঞাসা করা আমার অন্যায়, যখন হরিশ্চন্দ্রের নাম মাত্রে আমাদের প্রাণ প্রফুল্ল হয়, যখন অদ্যকার সভার কথা শুনিবামাত্র এখনকার যাবতীয় লোকে আনন্দিত হইলেন এবং উৎসাহপ্রফুল্ল বদনে সভায় আগমন করিয়াছেন তখন যে উদ্দেশে সভা হইয়াছে তাহা সুসম্পন্ন হইবে তাহাতে সন্দেহ কী।

সোমপ্রকাশ, ১২ আগস্ট ১৮৬২

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

পাতিত্য-সমস্যা

বাঙালি বড়ো ভাবপ্রবণ। বক্তৃতায় তার গত অর্ধম শতাব্দী কেটেছে। এখন কাজে নামতে হবে।

আজ আমার মহা আনন্দের দিন। হাওয়া ফিরেছে। নবজাগরণের দিন এসেছে। এই মহাপ্রলয়ে তিনটি সাম্রাজ্য ফুৎকারে উড়ে গেল। সেই সময়ে যে-সব আইডিয়া ব্যক্ত হয়েছে তার ধাক্কা এখানে এসেছে। সেদিন বর্ধমানের মহারাজা একটা পাকা কথা বলেছেন, এখন চারিদিকে বড়ো অশান্তি দেখা দিয়েছে, তাকে বাধা দিলে চলবে না। একে বাধা দিলে কি হয় জানি না। এর আঘাত-প্রতিঘাতের কথা আজ আমি বলতে চাই। প্রথমে মনে পড়ে পতিত জাতিদের সঙ্গে তথাকথিত উচ্চজাতির লোকদের সম্পর্কের কথা।

আমি খুলনা জেলার লোক। এই খুলনার ৭ লক্ষ হিন্দুর মধ্যে ৪ লক্ষ অস্পৃশ্য। এরা কৃষিজীবী ; এরা ধনধান্যে সমৃদ্ধ। এই ৪ লক্ষ বলীয়ানের সঙ্গে ৩ লক্ষের সংঘর্ষ উপস্থিত হলে ব্যাপার কীরূপ দাঁড়ায় তা প্রণিধানযোগ্য। আমি দ্বেষজনক কোনো কথা বলব না। যাতে কোনো জাতিতে জাতিতে বিরোধ বাধে এখানে তেমন কোনো রাগের কথা নেই। এখন ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি সকল শ্রেণির লোকেরই বিসদৃশ অবস্থার দিকে নজর পড়েছে।

আমরা ছেলেবেলা গল্প পড়েছিলাম, উদর ও দেহের অবয়ব সম্বন্ধে হিন্দু-সমাজের তেমনি সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে। লর্ড ডাফ্‌রিন্‌ আমাদের বিদ্রূপ করেছিলেন, এরা মুষ্টিমেয় (microscopic minority)—এরা আন্দোলন করে, এদের কে চেনে? কায়স্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতির সংখ্যা ২৩ লক্ষ। আর তথাকথিত নিম্নশ্রেণি কত? একা নমঃশূদ্র ২৫ লক্ষ ; ব্রাত্যক্ষত্রিয় ৫$\frac{1}{2}$ লক্ষ। বাঙলার অধিবাসী ৪$\frac{1}{2}$ কোটি। এই ৪$\frac{1}{2}$ কোটির মধ্যে কায়স্থ ব্রাহ্মণ শতকরা ৬$\frac{1}{2}$ কি ৭ জন। কিন্তু আমরা অপর সবাইকে বাদ দিয়ে ঘরকন্না করতে চাই। এ একটা আত্মঘাতী ব্যাপার। সমাজের যাঁরা বলিষ্ঠ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যাঁরা শিক্ষা পেলে সমাজের নেতা মুখপাত্র হবেন, তাঁদের না টেনে তুলে তাঁদের বাদ দিয়ে ঘর করতে

চাই, এ ত বাতুলতা ; এ ত মহাপাপ। কোনো কারণে হয়ত আমাদের অবস্থা ভালো, আমাদের গোলায় ধান আছে। দেশে যদি দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় তাহলে কি আমরা ঘরের দরজা বন্ধ করে বিলাসিতা করব, আর আমাদের প্রতিবাসীরা মারা যাবে? আমাদের কর্তব্য, যারা পশ্চাৎপদ তাদের সকলকে টেনে তুলি। আমরা দেশকে মা বলি। যাঁরা লম্বা লম্বা বক্তৃতা করেন, আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করি তাঁরা যদি বাংলাকে মা বলেন, তবে কি সকলকে ভাই বলে আলিঙ্গন করবেন না, মায়ের সন্তানকে পদাঘাত করে দূরে ঠেলে কি তাঁরা অগ্রসর হবেন? তবে তাঁদের কীসের মা বলা?

ব্যাপার কী, একটা বিড়াল ঘরে ঢুকলে, হয়ত 'আস্তাকুড় ঘেঁটে, মরা ইঁদুর চটকে— দুধ খেলে ; আমরা কি তা ফেলে দিই? কিন্তু যদি একজন তথাকথিত ব্রাত্যক্ষত্রিয় বা নমঃশূদ্র ঘরের চৌকাঠের উপর আসে, আমরা জল ফেলে দিই। বরফ লেমনেড্ খাও না? তা কে তৈরি করে? সম্প্রতি আমার স্বগ্রামের নিকট এক শ্রাদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। কলিকাতা থেকে বরফ এসেছে—ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণের অভ্যর্থনার জন্য। যেই বরফ, সেই ত জল—H_2O—অর্থাৎ অম্লজান ও উদ্জানের যৌগিক। জল খাবে না, বরফ খাবে। কারণ,—ভণ্ডামি, প্রতারণা, ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞা। কেবল দেখানো—তুই নীচ জাতি, আমি উচ্চ জাতি। সবাই মায়ের সন্তান, সকলকে কোলে টেনে নিতে হবে। যে পেছনে আছে তাকে তুলতে হবে। যিনি শিক্ষিত তিনি অশিক্ষিতকে টেনে নেবেন। বিবেকানন্দ বলেছেন—'হিন্দুধর্ম দেশাচারে, লোকাচারে পরিণত। ধর্ম এখন আশ্রয় নিয়েছেন, জলের কলসি ও ভাতের হাঁড়ির ভিতর।'

এই কি হিন্দুধর্ম? হিন্দুধর্ম সার্বভৌমিক ছিল। জন্মগত গরিমা সর্বনাশের মূল হয়েছে। কুলীন ব্রাহ্মণের বিদ্যাশিক্ষার দরকার নেই। যিনি কুলীন, তিনি বিয়ে করে ৩-৪ হাজার টাকা রোজগার করেন। এতে অনেক স্থলে অবনতি হয়েছে। জগতের ইতিহাস দেখুন। যিশুখ্রিস্ট ছুতোর, কবীর জোলা। জগৎ নতমস্তকে তাঁদের ধর্ম গ্রহণ করেছে। মাদ্রাজেও পারিয়া পীর দেখা যায়। ভারতে এক সময়ে চরিত্র দেখে সাধুদের পূজা হত। এখন সম্মান জন্মগত হয়েছে। এ আর বেশি দিন টিকবে না। এখন হচ্ছে from log cabin to white house, অর্থাৎ পুরুষকার ও গুণের আদরের দিন। লয়েড্ জর্জ 'জুতোসেলাই'-এর পালিত পুত্র। উইলিয়ম কেরি, যিনি এক হিসাবে বাংলা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা, তিনিও জুতোসেলাই। এইখানে একটা কথা মনে পড়ল। একবার লর্ড ওয়েলেসলি অনেক গণ্যমান্য সাহেবকে নিমন্ত্রণ করেন। সে ভোজের সভায় কাউন্সিলের অনেক মেম্বারও উপস্থিত ছিলেন। কেরিকে দেখে একজন পাশের বন্ধুকে কানে কানে বললেন—'Hallo, Carey is here. Is he not a shoemaker? ওহে, কেরি এসেছে যে! ও জুতা গড়ে না?' কেরি তা শুনতে পেয়ে বলে উঠলেন, 'Beg your pardon, sir, I was not a shoemaker but a cobbler. মাপ করবেন মশাই, 'আমি জুতা গড়ি না, ছেঁড়া জুতা

মেরামত করি।' ইংল্যান্ডে জাতিভেদ আছে বটে, কিন্তু তা অন্য প্রকার। আজ যিনি log cabin-এ অর্থাৎ কুঁড়ে ঘরে থাকেন, কাল তিনি দেশনায়ক। আমাদের দেশে অন্যপ্রকার দেখতে পাই। মহেন্দ্রলাল সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, কৃষ্ণদাস পাল ; এঁদের মধ্যে একজন সদ্‌গোপ, একজন তন্তুবায়, একজন তিলি। এঁরা সমাজের গৌরবস্থল। কিন্তু একজন কুলীন ব্রাহ্মণ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পুত্রকে কন্যা দিতে রাজি হবেন না। বলবেন, ও যে তাঁতির ছেলে। এতে সমাজের কত অবনতি, কত লোকসান হয়েছে। চিকিৎসা শাস্ত্রকার বাগ্‌ভট্‌ বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি বলেছিলেন—'আমার গ্রন্থ হয় ত লোকে উপেক্ষা করবে। কারণ আমি চরক বা সুশ্রুতের ন্যায় ঋষি নই। কিন্তু ঔষধের যদি গুণ থাকে তাতে রোগ যাবেই, তা ব্রহ্মাই প্রয়োগ করুন বা আমিই করি।' এই ধরুন বিষ, ব্রাহ্মণ প্রয়োগ করুন বা ব্রাত্যক্ষত্রিয় প্রয়োগ করুন, তার ফল ভিন্ন হবে কি না আমি জিজ্ঞাসা করি। আমি বাড়ি গেলে চাষা-ভূষাদের নিয়ে থাকি। তারা বলে, 'বাবু, আপনারা কি জাত জাত করেন? এই মোটা ভেটেলের চাল, আমি রাঁধি আর আপনি রাঁধুন, একসঙ্গে মিশিয়ে দিলে কি বলতে পারেন কোন্‌টা কার ভাত? দুইজনের একই রকম ভাত হয়।' অথচ আমরা বড়ো বড়ো বই থেকে জাতিভেদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিই। হোটেলে সবাই একসঙ্গে খান, তাতে কারও বেশি উদর-পীড়া হয় বলে জানি না। সবাই রেলগাড়িতে চড়েন, সেখানে কি সকলে নৈকষ্য কুলীন? মেথর দিব্য বাবু হয়ে ট্রামগাড়িতে যাচ্ছে, আপনি তার পাশে বসেন ; স্টিমারে একদিন, দুদিন, তিনদিন চলেছেন—তাতেই থাকা, খাওয়া-দাওয়া ; জাত বাঁচে কি করে? তখন জাত থাকে কোথায়? ঢাকা অঞ্চলের একজন লোক কলিকাতা থেকে ফিরে গিয়ে বলেছিলেন, উইলসেন, ইস্টেসেন আর কেশব সেন, এই তিন সেনে মিলে জাতের সর্বনাশ করেছে। যদি পাকস্থলী কেটে বের করে রাসায়নিক বিশ্লেষণ (chemical analysis) করেন, তবে বোঝা যাবে কার কতটুকু জাতি আছে। তবে কেন আমরা জাত জাত করে মারা যাই।

আমি এখন যোগী, মাহিষ্য, ব্রাত্যক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমাজের মুখপত্রগুলি যতদূর সম্ভব পড়বার চেষ্টা করি। যেখানে দেখি, সেইখানে আর্তনাদ। তাঁরা প্রকাশ্যে বলেন না কে তাঁদের প্রপীড়িত করছেন, কিন্তু তাঁরা ভাবেন তাঁরা অত্যাচারিত। সেদিন যোগীসখায় লেখা দেখলাম, 'আমরাও কালের কুটিলাবর্তে পড়িয়া অধঃপতিত ও লাঞ্ছিত হইয়া আছি।' সকল পত্রিকাতেই এক কথা। কে করছে, তাঁরা কারো নাম করেন না। এ বড়ো দুঃখের কথা। তাঁরা নিজেরা নিজেদের হীন অধঃপতিত মনেই বা করেন কেন, আর সত্যই কেউ অত্যাচার করছে বুঝে তা সহ্যই বা করেন কেন? কাল এক জায়গায় পেলাম, লেখক লিখছেন, 'তথাকথিত উচ্চজাতির অবস্থা দেখি, তাঁহাদের নিকট যোগী প্রভৃতি জাতি অনাচরণীয়। কিন্তু পশ্চিমা-কুর্মি পরিচয় দিলেই তার জল আচরণীয়।' আমরা কি পশ্চিম দেশে C.I.D. পাঠিয়ে তার জাতের খবর নিই! আবার কলিকাতায়

ঝি নামক এক জাতীয় জীবের জলও চলে। যাঁরা ছুঁৎমার্গ অবলম্বন করে চলেন, তাঁরা কলিকাতায় গিয়ে অনেক সময়ে মেসে উঠেন। তাঁরা কি অনুসন্ধান করে দেখেন পাচক ব্রাহ্মণ প্রকৃতপক্ষে কী জাতি? প্রিন্সিপ্যাল গিরিশচন্দ্র বসু একদিন তাঁর ঝির সঙ্গে আলাপ করছিলেন। ঝি বললে, 'বাবু, লোক দেখলেই ধর্ম গেল, না দেখলে আর কিছু নয়। ছোঁয়াছুঁয়িটা কেবল লোক দেখাদেখি।' এই ঝি হিন্দুসমাজের প্রচলিত ধর্মের সার বুঝেছে।

আপনাদের আত্মমর্যাদা যে দিন দিন জেগে উঠছে এ বড়ো শুভচিহ্ন। আপনারা যদি বোঝেন, আমরা অধঃপতিত নই, আমরাও বিদ্যাবুদ্ধি বলে উচ্চস্থান পাব তবে উন্নতি নিশ্চয়। রাতদিন অভিযোগ করলে উন্নতি হবে না। আপনাদের শক্তি যথেষ্ট। আপনারা নিজের পায়ের উপর দাঁড়ান। আপনারা আজকালকার 'উচ্চ' শ্রেণিস্থ মধ্যবিত্তের অবস্থা জানেন, তাদের বাইরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কীর্তন। আপনারা কিন্তু কৃষিজীবী, আপনারা সেই 'পোদবৃত্তি' করেন। আমার এই খুলনার সন্নিকটস্থ আপনাদের হরিমোহন বাছাড় রাসে ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করেছিলেন। সে আজ ৪০ বছরের কথা। আপনাদের মধ্যে অনেকে মোকদ্দমায় হাজার হাজার টাকা ব্যয় করেন। অর্থের অভাব নাই, চেষ্টার অভাব। গ্রামে গ্রামে চাঁদা তুলুন। ক্রিয়া-কর্মে কম ব্যয় করুন। যিনি ক্রিয়া-কর্মে দশ হাজার টাকা ব্যয় করেন তিনি আড়াই হাজার ব্যয় করে বাকি ৭ কি সাড়ে সাত হাজার সমাজের কাজে ব্যয় করুন। চাই শিক্ষা। উন্নতির জন্য কি দরকার? আমি বলব—১ম শিক্ষা, ২য় শিক্ষা, ৩য় শিক্ষা। শিক্ষা ভিন্ন পশুত্বে ও মনুষ্যত্বে কোনো প্রভেদ নেই। আপনাদের সর্বনাশের কারণ বাড়ি বসে সকলে অন্নসংস্থান করেন। আপনারা শিক্ষালাভ করুন, শিক্ষার দিকে মতি ফেরান, আপনাদের শক্তির প্রতিরোধ করতে কেউ পারবে না। আপনারা যা ভাববেন তাই হবে। Nations by themselves are made, জাতি স্বতঃ গঠিত হয়। বর্ধমান প্রাদেশিক সমিতিতে জাস্টিস্ চৌধুরী বলেছেন, mendicant policy ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করলে চলবে না। আপনারাও mendicant policy ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করুন। ভিক্ষাবৃত্তিতে কিছু হবে না। মহাশয় অনুগ্রহ করে আমার জল ছোঁন, ও বললে চলবে না। আপনাদের উন্নতি আপনাদের উপর নির্ভর করে। আমি কোনো বিরোধের ভাব উপস্থিত করতে চাইনে। মান্দ্রাজে পারিয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে মহা বিবাদ উপস্থিত। বাংলা দেশে এসব বড়ো একটা নেই। কর্নেল উপেন্দ্র মুখুজ্জে মশাই জানেন বাংলাতে প্রায় ৯০০ ম্যাটিকিউলেশান বিদ্যালয়। আপনারা যদি হিসাব করে দেখেন গভর্নমেন্ট স্কুল প্রায় ৪৭টি হবে। বাকি ৮৫৩টির ভিতর ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যের চেষ্টাতে হয়েছে এমন স্কুল বাদ দিলে আর কয়টি থাকে? অধিকাংশ স্কুলই প্রধানত তাঁদের চেষ্টাতেই হয়েছে। কিন্তু এমন কোনো বিদ্যালয় আছে কি যেখানে তাঁরা তথাকথিত নিম্ন জাতিকে পাশে বসে বিদ্যাশিক্ষা করতে বারণ করেন? এই বাগেরহাট কলেজ হয়েছে। তাঁরা কি কোনো দিন বলেছেন যে বারুইজাতি কায়স্থ

ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাউকে পড়তে দেবেন না? এ কথা বলা যায় না যে তাঁরা সব নিজেদেরই সুবিধা করে নিয়েছেন। কেউ দিঘি কেটে বলেন না, একলা আমি এই দিঘির জল পান করব। সুতরাং এটাও ভাববেন, ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি স্কুল কলেজ করে সকলের উপকার করেছেন। যদি তাঁরা বলেন, আমরা এখানে আর কাউকে পড়তে দেব না, তা হলে তাতে ক্ষতি হবে তথাকথিত নিম্নশ্রেণিদের। মোটামুটি আমি বলতে চাই যে বাংলা দেশ মাদ্রাজ অপেক্ষা এইরূপ বিষয়ে অনেকটা উদার।

আমি কোনো সমাজভুক্ত নই। আমি হিন্দুর হিন্দুত্ব, মুসলমানের মুসলমানত্ব, ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্ব গ্রহণ করি। আমি রাসায়নিক, আমি নিক্তির ওজন করে সকলের ভালোমন্দ ওজন করে বিচার করতে চাই; আমাদের সামাজিক ব্যাধি দূর করতে হলে আগে diagnosis করে রোগ নির্ণয় করতে হবে। সার সৈয়দ আহ্‌মদ বলেছিলেন, হিন্দু ও মুসলমান, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা। যাঁরা জ্যেষ্ঠ তাঁদের উচিত হস্ত প্রসারণ করে টেনে নেওয়া। উচ্চশ্রেণি সুবিধা পেয়েছেন, তাঁদের সুবিধা আছে, তাঁদের উচিত নিম্নকে টেনে আনা এবং সুবিধার ও সুযোগের ভুক্তভোগী করা।

আর এক কথা। আপনাদের উন্নতির পথ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। Reform Scheme নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থায় আপনারা ভোটদাতা হবেন। অনেকে ভোট নিতে আপনাদের দ্বারে উপস্থিত হবেন। আপনারা তাঁদের প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেবেন তাঁরা আপনাদের জন্য কী করবেন। যিনি আপনাদের মঙ্গল করবেন, তাঁকে ভোট দেবেন। তাঁরা আপনাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, সর্ববিষয়ে উন্নতি করবেন, এমন অঙ্গীকার করিয়ে নেবেন। উদ্ধারের পথ আপনাদের নিজেদের হাতে।

আপনারা উন্নতির পথে অগ্রসর হোন। আপনারা কায়স্থ ব্রাহ্মণের সমান শিক্ষিত হোন। আপনাদের বলেই আমরা বলীয়ান। আজ ভাই ভাই বলে সকলকে আলিঙ্গন করতে হবে। জয়চাঁদ থেকে আরম্ভ করে ৮০০ বৎসর কেবল গৃহবিবাদে কেটেছে। আর বিবাদের দিন নেই। 'সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে'। কে বড়ো, কে ছোটো ঈশ্বরের রাজ্যে? যে আপনাকে বড়ো মনে করে সে বড়ো; যে ছোটো মনে করে সে ছোটো। এমার্সন বলেছেন, you cannot make a slave of Washington (ওয়াশিংটনকে দাস করবার শক্তি তোমার নেই)। যাতে শক্তি জাগে তার উপায় করুন। তার উপায় শিক্ষা করুন। আপনারা লক্ষ লক্ষ টাকা তুলতে পারেন। বরং আমাদের দুর্দশা বেশি। আপনারা শতাংশের একাংশ চেষ্টা করলেও অনেক বেশি কাজ করতে পারেন। যাঁরা India as a nation অথবা Bengalee as a nation ভাবতে চান তাঁরা কাউকে বাদ দিয়ে পারেন না। তাঁর কি দু-চার জনে জাতি গঠন করতে পারেন? যদি নৌকার এক জায়গায় একটু ফুটো থাকে তবে সবটা জলে ডুবে যায়। দুর্যোধনের উরুতে যেমন একটু দুর্বলতা ছিল বলে তার পরাজয় ঘটেছিল, তেমনি যতদিন শতকরা ৯৯ জন নিরক্ষর থাকবে ততদিন

আমরা বড়ো হব না।

বিদেশে আমাদের কী অবস্থা? যদি স্যর দোরাব তাতাও Cape-এ যান তাঁকে কুলি বলবে। ভারতবাসী হলেই কুলি নামে অভিহিত। তাকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেয় না, ট্রামে রেলে তার আলাদা বন্দোবস্ত। জগতের দরবারে এই তো আমাদের মান। কিন্তু আফিসে সাহেবের তাড়া খেয়ে যেমন বাড়িতে এসে নিরীহ সহধর্মিণীর উপর আমাদের চোটটা বেশি পড়ে, এখানেও আমাদের সেই ভাবটা বেশি। League of Nations হয়েছে; সেখানে লর্ড সিংহকে ভারতের পক্ষ থেকে ভোট দিতে খাড়া করবার কথা হয়। তাতে একজন American Senator কি বলেছেন শুনুন :

> I can give you a picture of India in a word. She has a population of 294,301,056.... Such a people mark and brand themselves at once as not only unfit for the Government of others, but as almost unfit for their own Government; yet I would not deny that right to the lowest of God's creatures if he lived off with others like himself and wanted a Government of his own.
> Amongst those 294,000,000 people there is no excess of superstition to which they have not gone; there is no shadow of intellectual right so black that they have not wrapped their souls in its sable folds; there is no species of caste by which men have sought to divide themselves and keep oppressed by power and priest-craft their fellowmen that has not been rife in India for centuries of time.

এই তো আমাদের মান! এই মানে মানী হয়ে আমরা বলি জল নষ্ট করিসনে। এখন আর পৃথক থাকলে চলবে না। আমি intermarriage সার্বজাতিক বিবাহের কথা বলছি না। আপনারা একটু এগোন, তাঁরাও আপনাদের দিকে একটু আসুন। কিন্তু আমি বলি যাঁরা কুলীন তাঁদেরই আগে এগুতে হবে। আপনারা জাত জাত করছেন। আমার ওসব আসে না। এখানে চেহারা দেখে কে বড়ো কে ছোটো তা ঠিক করতে পারেন?

আপনারা অবনত বললে কে? ও যেন ঠাকুরঘরে কে, না আমি তো কলা খাইনি। আপনারা ব্রাহ্মণ কায়স্থ অপেক্ষা কোনো অংশে ছোটো নন। আপনারা বড়ো বড়ো পদ লাভ করুন, কাউন্সিলে নিজেদের মধ্য থেকে মেম্বার পাঠান। আপনারা অনেকেই লক্ষ্মীমন্ত। আমি করজোড়ে প্রার্থনা করি, আপনারা প্রতিজ্ঞা করুন শিক্ষা-বিস্তারের জন্য প্রাণপণ করবেন। আপনাদের আয়ের অন্তত এক-দশমাংশ স্বজাতির শিক্ষার জন্য ব্যয় করুন। যেমন কালীপূজার বারোয়ারির জন্য এক পয়সা করে বৃত্তি রাখা হয়, তেমনি করে আপনারা যে ধান পান তার যদি দশমাংশ এমনকী শতাংশও আপনাদের উন্নতির জন্য রেখে দেন, আপনাদের উন্নতি আটকে রাখে কে? আপনারা নিজেরাই

নিজেদের উন্নতি আটকে রেখেছেন। শিক্ষার বিস্তার করুন। উন্নতি ধ্রুব নিশ্চয়।

আমি আজ বুঝতে পারলাম, জাতীয় জাগরণের প্রকৃত স্ফুরণ হয়েছে। প্রকৃত জাতীয় জাগরণের স্পন্দন দেশের সর্বত্র পৌঁছেছে।

কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রেণির সকল স্তরের সহৃদয় লোক বহু প্রকারের জ্ঞাপন করছেন যে সকলেরই আপনাদের সঙ্গে আন্তরিক সহানুভূতি আছে ও তাঁরা আপনাদের উন্নতি কামনা করেন। এখন যদি আপনারা পুরুষকারের দ্বারা বিদ্যা যশ মান লাভ করে প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রকাশ করতে পারেন, তবেই সব আয়োজন ও চেষ্টা সার্থক হবে।

২১ মার্চ, খুলনা পৌণ্ড্রক ক্ষত্রিয় সামাজিক সভার সভাপতির অভিভাষণ।

মেঘনাদ সাহা

জাতীয় উন্নতির উপায়

সমবেত বন্ধুগণ ; এই সভার সভাপতির গৌরবান্বিত আসন গ্রহণ করতে আহ্বান করে আপনারা আমাকে যে সম্মান দেখিয়েছেন তজ্জন্য আপনাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই সভায় এবং সভার বাহিরে আমা অপেক্ষা যোগ্যতর অনেক লোক আছেন। ডা. প্রফুল্ল ঘোষ এবং ডা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো, যাঁহারা আত্মোৎসর্গের মহান দৃষ্টান্তে দেশময় বরেণ্য হয়েছেন, অথবা আজকার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর মতো, যাঁহারা 'লয়েড জর্জের লোহার কঙ্কালের (steel frame) স্ক্রুপ বা পেরেক' হতে অস্বীকার করে নিজের আত্মাকে মুক্তির পথে প্রবর্তিত করেছেন ; আমি দুর্ভাগ্যক্রমে সেরূপ কোনো গৌরবের অধিকারী হতে পারি নাই, তথাপি আজ আমাকে আপনাদের আহ্বানকে আদেশের মতো শিরোধার্য করে সভায় অবতীর্ণ হতে হচ্ছে।

সভার প্রারম্ভে এই সভার উদ্যোক্তা আমাদের সর্বজনপূজ্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের উদ্দীপনাময়ী বাণী আপনাদিগকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি :

> আমার স্থির বিশ্বাস বাঙালির দ্বারাই ভারতের সর্বাঙ্গীণ সাধনার পথ উন্মুক্ত হবে। কিন্তু এই গৌরবের পদ অধিকার করতে হলে বাঙালির জীবনের আজ চাই সাধনা, তিল তিল করে আত্মদান। বাঙালি আজ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে ব্যক্তিগত সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের কাজে লেগে পড়ে থাকলে ভারতের নিদারুণ দুর্দশা ঘুচবেই, আজ বিধাতার ইঙ্গিতে বাঙালির সাধনা ভারতে সিদ্ধি আনয়ন করবে।

কোন্ পথে আমাদের সাধনা করতে হবে, তাহাই এখন বিবেচ্য। কিন্তু সে পথ যে নেহাৎ সুখ বা আরামের নয় তাহা আর কাহাকেও স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। এই প্রসঙ্গে একটা পৌরাণিক গল্প মনে পড়ছে। পুরাণে আছে কোনো এক সময়ে দুজন দেবদূত কোনো ঋষিকে অবমাননা করায় ঋষি রেগে তাদের শাপ দেন যে তাদের

স্বর্গচ্যুত হয়ে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করতে হবে। দেবদূত দুজন খুব কান্নাকাটি করলে ঋষি একটু নরম হয়ে বললেন যে 'তোমরা যদি পৃথিবীতে দেবতাদের সহিত মিত্রভাবে ব্যবহার কর তাহলে সাত জন্ম পরে তোমাদের উদ্ধার হবে, কিন্তু যদি শত্রুভাবে সাধন কর তাহলে তিন জন্ম পরে স্বর্গে ফিরে আসতে পারবে।'

বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে যাঁরা মাথা ঘামাচ্ছেন অতি সহজেই তাঁরা গল্পটির তাৎপর্য অনুভব করতে পারবেন। বহু শতাব্দীর পাপের ফলে আমাদের মনুষ্যত্ব ও মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠদান ও স্বাধীনতা হারিয়েছি। সেই মনুষ্যত্ব সেই স্বাধীনতা পুনর্বার লাভ করতে হলে আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত শক্তির বদান্যতার উপর নির্ভর করলে চলবে না,—সে প্রতিষ্ঠিত শক্তি রাজকীয়ই হউক বা সামাজিকই হউক, আমাদিগকে মনুষ্যত্ব লাভের জন্য সাধন করতে হবে ; সে সাধন আমেরিকা, গ্রিস, হাঙ্গেরি এবং আমাদের চোখের সামনে আয়ারল্যান্ড ও পোল্যান্ড করেছে ; প্রতিষ্ঠিত শক্তি যদি দয়া করে আমাদের হৃত অধিকার ফিরিয়ে দেন, সেটা পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন কিছু হবে।

যাহা হউক, আমি রাজনৈতিক দিকটা বিশেষ আলোচনা করব না, তাহা কবার বহু যোগ্যতর লোক আছেন। রাজনৈতিক সমস্যাই আমাদের একমাত্র সমাধানের বিষয় নহে বাংলার বর্তমান সমস্যা দারিদ্র্য, ম্যালেরিয়া, শিক্ষার অভাব, অস্পৃশ্যতা, হিন্দু-মুসলমানে মিলন। কী কী কারণে আমরা বর্তমান অবস্থায় এসে পড়েছি, তাহা ভেবে দেখতে হবে। বেঁচে থাকতে হলে, জাতি হিসাবে বেঁচে থাকতে হলে, আমাদিগকে যে বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়, তা নয়, প্রকৃতির সঙ্গেও সংগ্রাম করতে হয়। মানুষ ও জাতির চরিত্র বলে একটা জিনিস—এ বহু শতাব্দীর ক্রমবিকাশের ফল। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হতে পেরেছে, প্রথমত, পাশ্চাত্য জাতিসমূহ ; তার কতগুলি কারণও আছে। ভারতবর্ষ ও ইউরোপে, প্রকৃতি বিভিন্নভাবে মানবের নিকট প্রতীয়মান। ইউরোপে, বিশেষত উত্তর ইউরোপে দারুণ শীত, অনুর্বর ভূমি, তিনদিকেই দুর্লঙ্ঘ সমুদ্র, তাই বহু শতাব্দী পর্যন্ত মানবাত্মা সুপ্ত থাকার পর যখন আবার জেগে উঠল তখন প্রথমেই তারা সমুদ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। Anglo Saxon জাতি Scandinavia, উত্তর-পশ্চিম জার্মানি প্রভৃতি স্থান হতে সাগর পেরিয়ে ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড প্রভৃতি স্থানে বাসস্থান করল। তখন দক্ষিণ দিকস্থ ল্যাটিন জাতিদিগের সভ্যতার সংস্রবে এসে তারা ও অপরাপর উত্তর ইউরোপস্থ জাতিরা সুগঠিত সংঘবদ্ধ হয়ে আইন-কানুন বেঁধে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে শিখল। কিন্তু তাতেই তাদের শক্তি পর্যবসিত হল না, তাদের দেশে যতই লোক বাড়তে লাগল, দেশের উৎপন্ন দ্রব্যে আর তাদের অভাব সঙ্কুলান হল না। পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও আফ্রিকা তাদের পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য দুস্তর বাধা ছিল। শতাব্দীব্যাপী চেষ্টার পর তারাও

বিজিত হয়ে নিজেদের উপর দিয়ে বিজেতার জয়ের পথ তৈরি করে দিল। এই যে সমুদ্র ও প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে এদের একটা চরিত্র গঠিত হয়েছে, যে চরিত্রের মূল ভিত্তি হয়েছে আত্মনির্ভরতা, স্বাতন্ত্রপ্রিয়তা, অথচ সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার ক্ষমতা, এবং উদ্যম ও সাহস, সেই চরিত্রের বলেই আজ তারা পৃথিবী জয় করতে পেরেছে। এখন রেল স্টিমার ও তারের দিনেও অনেক বাঙালি পিতামাতা ছেলেকে বিলাতে পাঠাতে ভয় পান। কিন্তু যখন এ সব ছিল না, সমুদ্রের উপর দিয়ে বায়ুপ্রবাহের গতিবিধিও কিছুমাত্র জানা ছিল না তখন তারা পাল উড়িয়ে আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে পচা মাংসে দেহ রক্ষা করে এদেশে বাণিজ্য করতে আসত।

এদেশে এসে তারা দেখতে পেল যে, এদেশে তাদের দেশের মতো 'জাতি' বলে কিছু নেই, আছে একটি ইটের পাঁজা ; এই পাঁজার ইট একটি একটি করে সরিয়ে যদি নিজের কাজে লাগানো যায়, বাকিগুলি ভুলেও সাড়া দেবে না। আমাদের এই যে জাতীয় চরিত্র, ইহাও বহু শতাব্দীর ক্রমবিকাশের ফল ভারতবর্ষের 'প্রকৃতি' ইউরোপের তুলনায় অতি উদার ও মুক্তহস্ত। এক শতাব্দী পূর্বে এখানে উদরান্ন ও পরিধেয় বস্ত্রের জন্য কাউকে ভাবতে হত না। মানুষ অতি সামান্য আয়াস করিলেই প্রকৃতি মুক্তহস্তে তাকে শস্যসম্ভার ও অপরাপর প্রয়োজনীয় জিনিস যোগাতেন। দেশ এত বিস্তৃত ছিল যে লোকবাহুল্যজনিত অনটনের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। পাশ্চাত্য দেশে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে মানুষের একটা দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জন্মে গেছে যে প্রকৃতিকে নিজের বশে আনতে হবে, কিন্তু ভারতবর্ষে সেরূপ চিন্তা বা আকাঙ্ক্ষা কারও মস্তকে প্রবেশ করার কোনো রূপ অবকাশ ঘটে নাই। সত্য বটে, মাঝে মাঝে একটা প্রকাণ্ড দৈবদুর্বিপাক যেমন গৌড়ের মহামারী, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, দামোদরের বা ত্রিস্রোতার বন্যা বা বাখরগঞ্জের ঝড় এসে মাঝে মাঝে এই শান্তিময় জীবনকে উলটপালট করে দিত, কিন্তু মানুষ এসবকে ভগবানের শাস্তি বলেই গ্রহণ করত ; এসব যে-কোনো দিন দমন করা বা এড়ানো যেতে পারে সে চিন্তা বা সে আশা তাদের নিকট আকাশকুসুমবৎ অলীক মনে হত। যা হোক, এর ফল হল মানুষ কোমল প্রকৃতি ঘরমুখো এবং নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীতেই তাদের শক্তি সীমাবদ্ধ রইল। এমনকি মধ্য এশিয়া হইতে পাঠান, তুর্কি, মোগল প্রভৃতি যে সমস্ত কঠোর প্রকৃতির জাত ইসলামের পতাকা বহন করে ভারতে রাষ্ট্রীয়তা পরিচালনা করেছিলেন, কয়েক পুরুষ এদেশে থেকে তারাও অনুকূল প্রকৃতির স্নেহের দুলাল বনে গেলেন, নিজেদের শৌর্য, বীর্য ও মনুষ্যত্ব অনেকটা হারিয়ে ফেললেন।

এমন সময় বাণিজ্য উপলক্ষে এদেশে এল ইংরেজ ও অপরাপর ইউরোপীয় জাতি। তাদের সামনে ছিল বাণিজ্যের পশরা, পেছনে ছিল সংঘবদ্ধ বিরাট জাতীয় ঐক্য, এদেশে সাম্রাজ্য গঠনের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। এই সংঘর্ষের ফল যে কি হয়েছে তা সকলেই জানেন। তার আরম্ভ হয় পলাশীর যুদ্ধে যেটা সপ্তদশ অশ্বারোহীর বাংলা বিজয়ের

দ্বিতীয় সংস্করণ। আপনারা সতেরোজন ঘোড়সওয়ার তুর্কি যে লক্ষ্মণ সেনের নিকট নদীয়া জয় করেছিল তা হয়ত বিশ্বাস করেন না, কিন্তু পলাশীর যুদ্ধ তো আর উড়িয়ে দেবার নয়। যে যুদ্ধে বাংলা বিহারের চার কোটি লোকের স্বাধীনতা গেল সে যুদ্ধে কয়জন ইংরেজ ছিল?

সতেরোজন অশ্বারোহীর বাংলা জয়, এই অপবাদ বাঙালি হিন্দুকে দেওয়া হয়। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের কলঙ্কটা বাঙালি মুসলমানদেরই বেশি প্রাপ্য কারণ মুসলমানই ছিলেন তখন বাংলার রাষ্ট্রনিয়ন্তা। আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, সপ্তদশ অশ্বারোহীর বাংলা বিজয়ের অভিনয়টা শুধু রাজনৈতিক জীবনে নয় বাঙালির economic life-এ ও অতীতে ও বর্তমান সময়ে আমাদের চক্ষের সামনে বহুবার ঘটেছে। বাংলার কৃষিজাত দ্রব্য ধান ও পাট বাংলার অন্তঃ ও বহির্বাণিজ্য, কারণ সমগ্র উত্তর ভারতের বাণিজ্য বাংলা দেশ দিয়ে চলে বাংলা বিহার আসামের খনিজ সম্পদ এ সমস্ত ক্ষেত্রেই সপ্তদশ অশ্বারোহী ও মুষ্টিমেয় বিদেশি লোক এসে আমাদিগকে বিতাড়িত করে রেখেছে, আমাদিগকে ক্রীতদাস করে রেখেছে।

কী কী কারণে আমাদের এমন দুরবস্থা ঘটল, শুধু বিদেশি গভর্নমেন্টের ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে, একটু তলিয়ে দেখা দরকার। ইংরেজ যখন এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন তখন দেশে তাঁরা কয়লা ও লোহার সাহায্যে শক্তি উৎপাদন করে প্রকৃতিনিরপেক্ষ হতে শিখেছেন। কী করে ভারতের 'পতিত ক্ষেত্র' চাষ করতে পারেন সে দিকে পড়ল তাঁদের প্রথম নজর। তাঁদের নিজের দেশে যা উৎপন্ন হয় তাতে তাঁদের কুলোয় না। যে-কোনো প্রকারে বিদেশের দ্রব্য আত্মসাৎ করতে না পারলে তাঁদের বেঁচে থাকা অসম্ভব। এই হল প্রাচ্যের প্রতি পাশ্চাত্যের রাজনীতির মূলমন্ত্র। ভারতের খনিজ সম্ভার, ভারতের বাণিজ্য ও কৃষিসম্পদ অফুরন্ত। এ সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হবার জন্য তাঁরা কী কী বিষয় অবলম্বন করলেন, আপনারা একবার Chambers of commerce, Geographical Survey, Trigonometric survey, Agriculture and Botanical survey, Mining Federation, Planters' association প্রভৃতি সরকারি, বেসরকারি সঙ্ঘগুলির কার্য করবার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। এই সমস্ত সংঘটন করে ইংরেজ ভারতের শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য নিজেদের হস্তগত করে রেখেছেন। আমি এঁদের দূরদর্শিতার ও কার্য তৎপরতার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বোধ হয় ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে বা তার কিছু পূর্বে এদেশে Geological survey ও Trigonometrical Survey-র প্রতিষ্ঠা হয়, এই Geological survey-র কর্মচারীগণ ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতের কোথায় কোন্ খনিজ দ্রব্য আছে তা অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছেন, তাঁরাই রানিগঞ্জের কয়লা, মহীশূরের স্বর্ণখনি, ব্রহ্মপুত্রকে ও আসামের কেরোসিন, বরাকরের লোহা ইত্যাদি আবিষ্কার করেছেন। এই সমস্ত Geological survey-র কর্মচারীগণ কার্য হতে অবসর গ্রহণ করে বিলাতে যান এবং সেখানকার

(capitalist) ধনস্বামীদের পরামর্শদাতা হয়ে এদেশে বড়ো বড়ো কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করেন।

কলিকাতার বড়ো বড়ো সওদাগরী অফিসের ইতিহাস এই। এই বিশাল দেশ তন্ন তন্ন করে জরিপ করবার জন্য সৃষ্টি হল Trigonometrical survey, আর তার পেছনে এল লৌহপথের নাগপাশ, যাতে সমস্ত দেশ বাঁধা পড়েছে।

আমি আজ রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা না করে এই সব বিষয় আলোচনা করছি কারণ আজ অর্ধশতাব্দী ধরে রাজনৈতিকেরা শাসন ও রাষ্ট্রনীতির আলোচনা করেছেন, কিন্তু এই সমস্ত ছোটোখাটো জিনিস, যার ফল হল যে জীবিকান্নের জন্য বাংলার অধিকাংশ ভদ্রসন্তান, শুধু ইংরেজের নয়, মাড়োয়ারি, ভাটিয়া বা পার্শি, গ্রিক, জার্মান, ইহুদি প্রভৃতি ব্যবসাদার জাতির দাসত্ব করতে বাধ্য হচ্ছে, ইংরেজিতে যাকে বলে Economic tharldom যে ব্যাপারটা একা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ব্যতীত কেউ দেশবাসীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয় না। অদ্যকার বক্তা তাঁরই পদতলে বসে এই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছেন এবং তাঁরই উপদেশের পুনরুক্তি করছেন মাত্র। Economic tharldom কথাটার গুরুত্ব বুঝে দেখুন। এই যে বড়ো বড়ো বিলাতি ও বিদেশি সওদাগরি অফিস প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা বিলাতে চালান দিচ্ছে, কলিকাতা ও মফঃস্বলের ভদ্রসন্তানগণ বলতে গেলে, এদের ক্রীতদাস হয়ে পড়েছেন, আজ যদি এই সমস্ত অফিস তালাবন্ধ করে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায় তাহলে বাংলার অর্ধেক ভদ্রলোক না খেয়ে মারা যাবেন। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজরা যখন এই পতিত দেশকে চাষ করবার জন্য এইরূপে জাল বিস্তার করছিলেন তখন এ দেশের লোক সব কী করছিলেন? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এ কথার উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'কি কুক্ষণেই শিক্ষিত বাঙালির চাকুরির দিকে ঝোঁক পড়েছিল, সেই পুরাতন হিন্দু কলেজের ছাত্র হতে আরম্ভ করে সকলেই আজ চাকুরির উমেদার ; হিন্দু কলেজের ছেলেরা যাঁরা, মাইকেল, রাজনারায়ণের সমপাঠী, তাঁরা গ্রাজুয়েট হলেই প্রথম Lord Hardinge-এর গভর্নমেন্ট তাদের ডেকে বড়ো বড়ো চাকুরি দিতেন। সেই সময় থেকে মতিগতি যে চাকুরির দিকে গেল, আর সে ফিরল না। বাংলার ধনে ইংরেজ, মাড়োয়ারির সিন্দুক বোঝাই হল আর বাংলার গোপালেরা শান্তশিষ্টভাবে ডিগ্রিলাভের সাধনা করতে লাগলেন। সাধনা ডিগ্রি, তাই সিদ্ধি চাকুরি।

কোনো জাতির প্রতিভা একদিকে বিকশিত হওয়া সে জাতির পক্ষে মহা অমঙ্গলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেকালে, শিক্ষালাভ করে সমাজে যাঁরা প্রতিষ্ঠালাভ করতে পেরেছিলেন তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোক, তাঁদের উচ্চতম লক্ষ্য ছিল গভর্নমেন্টে চাকুরি। কিন্তু দেশের Aristocrat ব্যবসায়ীগণের আদর্শ কি ছিল? তখন কলিকাতার ও মফঃস্বলের অনেকেই ব্যবসা করে বেশ বড়োলোক হয়েছিলেন। সমস্ত উত্তর ও পূর্ব ভারতের বাণিজ্য কলিকাতা দিয়ে যাচ্ছে, বাঙালি জাতি তেমন উপযুক্ত

হলে বা কার্যকারিতা ও দূরদর্শিতা থাকলে, এই বাণিজ্যের অধিকাংশই বাঙালির হস্তগত হত ; কিন্তু সর্বনাশ করল এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ওই জমিদার নাম কেনার প্রবল প্রলোভন। কলিকাতার বড়ো বড়ো পরিবার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবার, হাটখোলার দত্তপরিবার, লাহা, মল্লিক ও শীলপরিবার, রাণাঘাটের পালচৌধুরী এঁরা অনেকেই ব্যাবসা করে বড়লোক হয়েছিলেন। কিন্তু তারপর জমিদারি কিনে, কোম্পানির কাগজ কিনে, এঁরা সকলেই ব্যাবসা থেকে আস্তে আস্তে সরে পড়লেন। বাণিজ্য আস্তে আস্তে একচেটিয়া হল মাড়োয়ারি ও বাংলার বাইরের অন্যান্য জাতির। বাঙালির যে স্বাধীনভাবে ব্যাবসা শিখবার সুযোগ ছিল তাও ঢের কমে গেল। এই যে আর্থিক পরবশতা, এর জন্য রাজনৈতিক অধীনতাকেই শুধু দায়ী করলে চলবে না, আমাদের প্রকৃত জাতীয় চরিত্রই এর জন্য দায়ী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে এইরূপ মতি বিপর্যয়ের কারণ বলে নির্দেশ করেন, কিন্তু আমার মনে হয় ব্যাপারটা আরও তলিয়ে দেখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাতে সকল দেশেতেই উকিল, ডাক্তার, কেরানি, স্কুলমাস্টার, গভর্নমেন্টের চাকুরে তৈরি করে, তজ্জন্য শুধু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দোষী সাব্যস্ত করা যুক্তিসঙ্গত নয়। বিলাতের Oxford, Cambridge ও এই সুকীর্তি বা কুকীর্তির ভাগী ; তফাৎ এই, সে দেশ স্বাধীন বলে সে দেশের প্রতিভাবান, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বড়ো বড়ো রাজনৈতিক হতে পারেন, সৈন্য বা নৌবিভাগে প্রবেশ করে নিজেদের প্রতিভা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন, কিন্তু এদেশে সে পথ বন্ধ : এ দেশে সকলকেই উকিল, ডাক্তার, কেরানি, স্কুল মাস্টারদের গাদায় পড়তে হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কাউকে জোর করে এই গাদায় ঠেলে দিচ্ছে না, গাদায় পড়া আমাদের জাতীয় চরিত্রের গুণ। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ শ্রেণির লোক পড়ে : মারহাট্টি, পার্শী, গুজরাটী, মুসলমান ও সিন্ধি। সকলেই একই প্রণালীতে শিক্ষিত। কিন্তু পার্শী ও গুজরাটীদের মধ্যে অধিকাংশই ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হয়, কিন্তু মারহাট্টিরা আমাদের মতো উকিল, ডাক্তার, কেরানি ও স্কুলমাস্টারের গাদায় পড়ে। একই প্রকার শিক্ষা সত্ত্বেও বিভিন্ন জীবন পথে যাওয়ার একমাত্র কারণ, জাতীয় প্রবৃত্তি।

আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের এই স্বাধীন বৃত্তিতে বিমুখতা, যার জন্য আমাদের দারিদ্র্য দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, তা বিশ্ববিদ্যালয় এদেশে আমদানি করে নাই ; এ দেশের আবহাওয়া, এ দেশের Tradition-এর গুণে তাহা আপনিই এ দেশের মাটিতে বেড়ে উঠেছে। বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ বরাবরই পরগাছার মতো, তার কারণ এখানে জীবিকা নির্বাহের জন্য কোনোরূপ আয়াস করতে হত না। বহু শতাব্দী পর্যন্ত জীবন-সংগ্রাম (struggle for existence)-এর অভাব হেতু বাঙালির বুদ্ধি ও প্রতিভা বরাবর যে পথে ধাবিত হচ্ছিল, বাঙালির চরিত্র যেদিকে বিকশিত হচ্ছিল, যখন সেই জীবন-সংগ্রাম উপস্থিত হল, তখন বাঙালি জাপানির মত আপনাকে সামলে বদলে নিতে পারল না, সেই সংগ্রামের

স্রোতে ভেসে তলিয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয় যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরা ছিলেন সকলেই বিদেশীয়, কাজেই যেরূপ শিক্ষাদীক্ষায় বর্তমান যুগের সংগ্রামের উপযোগী লোক তৈয়ার হতে পারে, সেরূপ শিক্ষাদীক্ষার বন্দোবস্ত করা স্বার্থহানিকর ছিল বলে তাঁরা যতদূর সম্ভব সে ব্যাপারটাকে চেপে গেছেন, প্রতিকার আর হয় নাই।

বন্ধুগণ, এই অতীতের বিবরণ আপনাদের প্রীতিকর হবে কি না জানি না, বাংলার সবচেয়ে বড়ো সমস্যা এখন দারিদ্র্য মোচন এবং বিদেশীয় কর্তৃক ধনলুণ্ঠন নিবারণ। এই রোগের সিদ্ধমকরধ্বজ যা রাজনৈতিক নেতারা তা নির্ধারণ করছেন, আমরা শুধু অনুপানের ব্যবস্থা করছি। একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এজন্য পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে চলবে না। পরমুখাপেক্ষিতা আমাদের জাতীয় চরিত্রের মস্ত বড়ো একটা দোষ। সেকেলে লোকে বিশ্বাস করতেন যে, কল্কি অবতার এসে আবার সত্যযুগের প্রতিষ্ঠা করবেন, এ যুগেও অনেকে কিছু দিন পূর্বে বিশ্বাস করতেন যে, জার্মানি জাপান বা রাশিয়া আমাদিগের উদ্ধার সাধন করবেন। এ সমস্ত বিশ্বাসই যে অতি ভ্রান্ত তা প্রতিপন্ন করবার জন্য বিশেষ কিছু বলবার দরকার নেই, কিন্তু এখনও ছাপার অক্ষরে ব্যক্তিবিশেষকে 'অবতার' বা সেরূপ একটা কিছু প্রতিপন্ন করার জন্য যে সব লেখা হয়, তাতে মনে হয় যে স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা সম্পূর্ণ অভ্যাস হতে আমাদের এখনও ঢের দেরি। আমরা নিজেরা মানুষ না হলে ভগবান বা তাঁর কোনো ভগ্নাংশ এসে কখনও সমাজের শিকল কেটে দেবে না। এই মুসলমান আমলেই অনেকে ধর্মপ্রবর্তক ও সমাজ-সংস্কারককেই অবতার করা হয়েছিল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি; ভগবানের এত অনুগ্রহ সত্ত্বেও আমরা তুর্কি, পাঠান, মোগল ও ইংরেজদের পায়ের নীচে হাজার বছর ধরে মাথা লুটোচ্ছি কেন? অনেক অবান্তর কথা বলতে হল, আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের জাতীয় চরিত্রে পরনির্ভরতা ও অলসতার জায়গায় কর্মশীলতা ও আত্মনির্ভরতাকে প্রতিষ্ঠিত না করলে আমাদের মুক্তির উপায় নেই।

শিক্ষা বিষয়টাকে একটু বিশেষ করে তলিয়ে দেখতে হবে। শিক্ষা না পেলে মানুষের কার্যকরী শক্তি জেগে উঠতে পারে না, মানুষ সমাজের সেবায় লাগবার উপযুক্ত হয় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যেরূপ শিক্ষা চাচ্ছি সেরূপ দিচ্ছে না বা দেবার তাদের সাধ নাই। কিন্তু শুধু কতগুলো ছেলে ভাঙিয়ে একটা জাতীয় বিদ্যালয় খাড়া করলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হল না। আশা করি আমার কথাটা কেউ ভুল বুঝবেন না ; জাতীয় বিদ্যালয় একটা মস্ত কাজ করছে, সেটা হচ্ছে একটা moral revolution বা আদর্শের বিপ্লব। যে সব ছেলে জাতীয় বিদ্যালয়ে ঢুকেছে তাদিগকে প্রথম হতেই গভর্নমেন্টের চাকুরির প্রলোভন ছাড়তে হচ্ছে, স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে, এই জেনে শুনে তাদের জীবন আরম্ভ করতে হচ্ছে। এমন লোক যদি স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করে, মাসে ১৫ টাকাও রোজগার করে, তাহলে সে, যে লোক এম.

এ. পাশ করে মুচিরামগুড়ের ন্যায় সেলাম করতে করতে গভর্নমেন্টে চাকুরির এক ধাপ হতে অন্য ধাপে উঠছে, তাদের চেয়ে ঢের বেশি দেশের কাজে লাগবে। এই নৈতিক আদর্শটা খুব বড়ো কিন্তু শুধু এই আদর্শেই চলবে না। শিক্ষার আদর্শের আর একটা দিক আছে, মানুষের প্রচ্ছন্ন শক্তিকে জাগিয়ে তোলা এবং দেশের সর্বপ্রকার কর্মকেন্দ্রকে পরিচালিত করার মতো শক্তি সংগ্রহ করা। যে শিক্ষাতে আমাদের বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ না ঘটে সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ। শুধু অতীতের জ্ঞানে কুলাবে না, অতীতে যা জ্ঞান বলে গণ্য হত এখন তা অসম্পূর্ণ। আমাদের যুবক কর্মীদের শুধু দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করলেই কর্তব্য শেষ হল না, তাদের কর্তব্য আরম্ভ হল মাত্র। তাদের বর্তমান সভ্যজীবনের সকল রকম কর্মকেন্দ্রে নেতৃত্ব করবার ও সকল কেন্দ্র চালাবার মতো শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। দুই হাজার বছর পূর্বে চিনবাসিগণ তাদের দেশের উত্তরে প্রকাণ্ড দেওয়াল তুলে মনে করেছিল যে, তারা বৈদেশিক আক্রমণ হতে চিরকালের জন্য নিরাপদ হল, কিন্তু তা সত্ত্বেও মোগল মাঞ্চু প্রভৃতি জাতি তাদের পুনঃ পুনঃ দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে। আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্মের সংরক্ষকগণ মনে করেছিলেন যে, আচার ধর্ম ও কুসংস্কারের একটা চীনা প্রাচীর তুলে ভারতের নিম্নবর্ণদের চিরকাল পদতলে রাখবেন, কিন্তু তার ফল হল যে হাজার বৎসর ধরে তাঁরা ফুটবলের মতো একবার তুর্কি, একবার আফগান, মোগল বা ইংরেজদের পদতলে নিক্ষিপ্ত হচ্ছেন। আমরা যদি মনে করি যে, বর্তমানে সরল অনাড়ম্বর জীবনের একটা আদর্শ তুলে আমাদের জাতিকে পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতার স্রোতের প্লাবন হতে রক্ষা করতে পারব, তাহলে একটা মস্ত ভুল হবে। মানবসভ্যতা যতই প্রাচীন হয় ততই সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বাড়ে, ততই বিজ্ঞানের সুসংবদ্ধ জ্ঞানকে মানবের কাজে লাগাবার প্রয়োজনীয়তা বাড়ে। এমন এক ভবিষ্যতের কথা কেউ ভাবতে পারে না, যখন রেল, স্টিমার, টেলিগ্রাফ, পোস্টঅফিস দেশ হতে উঠে যাবে, যখন কয়লা বা লোহার খনি আর মানুষের কাজে লাগবে না। সুতরাং আমাদের কর্তব্য, এই সমস্ত হতে দূরে না থেকে যাতে এই সমস্ত ব্যাপারে পারদর্শিতা লাভ করতে পারি, দেশের সকল রকম বাণিজ্য শিল্প ও কৃষিকে বিদেশির কবলমুক্ত করে নিজেদের হস্তগত করতে পারি। ত্যাগ খুবই বড়ো জিনিস, কিন্তু শক্তি ও কর্ম তার চেয়ে কম বড়ো জিনিস নয়, আমরা অনেক সময়ে আমাদের অযোগ্যতাকে ত্যাগ বলে প্রচার করি।

বর্তমান সভ্যতার মূলমন্ত্র হচ্ছে বিজ্ঞান। আমি পূর্বেই বলেছি যে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে এবং প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হতে হলে আমাদের বিজ্ঞানের সেবা করতে হবে। এ বিষয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বহু স্থলে বলেছেন, আজকাল Back to nature রব উঠেছে ; কলকারখানা সব তুলে দেও, দৌলত (Capital) ও মেহনৎ (Labour)-কে একই পর্যায়ে আন। অনেকেরই বিশ্বাস যে, বলশেভিক রাশিয়াতে সমস্ত কলকারখানা তুলে দেওয়া হয়েছে। একথা ঠিক নয়, রাশিয়াতে বরং

বেশি উৎসাহে দেশময় কলকারখানা স্থাপন করা হচ্ছে, দেশের লোককে কলকারখানার ব্যবহারে শিক্ষিত করা হচ্ছে।

রাশিয়ার প্রায় অধিকাংশ রেলপথ তড়িৎশক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে এবং লেনিনের জীবনের মস্ত একটা আকাঙ্ক্ষা যে, দেশের সমস্ত কাজ, কলকারখানা বা ঘানির কাজ এমনকি চাষবাস পর্যন্ত তড়িৎশক্তিতে চালান। বলশেভিকগণ শুধু যান্ত্রিক সভ্যতার অপব্যবহার, ধনী ও দরিদ্রের তারতম্য, উঠিয়ে দিয়েছেন। যান্ত্রিক সভ্যতার অপব্যবহারকে বিজ্ঞানচর্চার ফল বলে ধরে নেওয়া একটা মস্ত ভুল। আমরা যদি বর্তমানে Back to nature এই নীতি অবলম্বন করে বৈদিক ঋষিদের মতো জীবন চালাতে আরম্ভ করি এবং যদি ইংরেজ গভর্নমেন্ট দয়া করে আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে দেশে ফিরে যান এবং আমেরিকা জাপান যদি আমাদের দয়া করে আক্রমণ নাও করেন তথাপি আমরা আমাদের স্বাধীনতা রাখতে পারব না। দশ পনেরো বৎসর মধ্যে আফ্রিকার কাফ্রিগণ ক্রমে আমাদের প্রভু হয়ে বসবে।

কলকারখানার নাম শুনেই ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই ; শক্তিকে ঠিক ভাবে বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করার জন্য কারখানার দরকার। সভ্যতার আদিম স্তর হতেই কলকারখানা উদ্ভাবন করা মানবের প্রকৃতিগত স্বভাব। সে হিসাবে আমাদের চিরপরিচিত লাঙল ঢেঁকি বা কুলো চরকাও কল ; কারণ নাগা কুকি প্রভৃতি জাতি এখনও এ সমস্তের ব্যবহার জানে না। বর্তমান যুগের উন্নত প্রণালীর কলকারখানা দেখে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই। শিক্ষাপ্রণালী উন্নত হলে আমাদের দেশের শিল্প-জাতীয় লোকে সমস্ত রকম যন্ত্রপাতি তৈরি ও ব্যবহার করতে শিখবে। অনেকে বোধ হয় জানেন না, যে E. I. Railway, Jessop Co., KIng Co. প্রভৃতি বড়ো বড়ো কোম্পানির এঞ্জিন, ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি বেহালা, ব্যাটরা ও অন্যান্য জায়গার দেশি মিস্ত্রীদের হাতে তৈরি। সমগ্র কাজই এই সব দেশি মিস্ত্রীরা করে, উপরওয়ালা ইংরেজ তাদের পরিচালনা করেন মাত্র। যদি বাঙালি অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেরা ৫০ বৎসর পূর্বে জমিদারি ও কোম্পানির কাগজে সমস্ত অর্থ invest করে 'জড়ভরত' না সেজে বাঙালি শিল্পীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজেদের অর্থ ও বুদ্ধি এই সব দিকে পরিচালিত করতেন, তাহলে এই নিদারুণ দৈন্যদশা ঘটত না। দশটা 'সংঘ' অকৃতকার্য হত কিন্তু আর দশটা টিকে যেত।

বিজ্ঞানের প্রসাদে আমরা প্রকৃতিরানির রাজ্যের যতটুকু দখল করতে পাচ্ছি ইউরোপ আমেরিকার লোক তখনি তাকে কাজে লাগিয়ে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করছে। আমরা প্রতি বৎসর দামোদরের বন্যায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ছি, কিন্তু আমেরিকায় তারা Colorado নামক একটি পাগলা নদীকে এমন ভাবে বেঁধেছে যে সেই নদী এখন মানবের আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় ৭২ লক্ষ লোকের সমস্ত কাজ করে দিচ্ছে, মায় কারখানা চালানো, খনি

খোঁড়া, চাষবাস ইত্যাদি। বেশি দূর যেতে হবে কেন, এই ভারতবর্ষে মহীশূর রাজ্যে কাবেরী নদী এইরূপ বাঁধা পড়েছে। দামোদরের মতো কাবেরী নদীতেও মাঝে মাঝে বন্যা হয়ে লোকের বিষম ক্ষতি হত। কিন্তু দেওয়ান বাহাদুর বিশ্বেশ্বর রায়ের চেষ্টায় কাবেরী নদীতে বাঁধ দিয়ে একটি বিশাল হ্রদের সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই হ্রদের সঞ্চিত জলরাশিকে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়ে তড়িৎ শক্তিতে পরিণত করা হচ্ছে। এই তড়িৎ শক্তিতে মহীশূর রাজ্যের সমস্ত কাজ চলছে ; আর, কাবেরীর জল হঠাৎ হুড়মুড় করে সমস্ত দেশ ভাসিয়ে সমুদ্রে প্রবেশ না করে, সমস্ত বৎসর ধরে একটু একটু করে মহীশূরের কৃষিজীবী প্রজার ক্ষেত্রে জল যোগাচ্ছে।

গত বৎসর মাদ্রাজ শহরে নিখিল ভারতীয় বিজ্ঞানসভার অধিবেশন হয়েছিল। সভাপতি ডা. মিডলমিসের বক্তৃতা ছিল ভারতের এই water power সম্বন্ধে। তিনি বলেন যে হিমালয় পর্বতে কোনো খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু হিমালয়ের জলরাশিকে যদি তড়িৎ শক্তিতে পরিণত করা যায়, তাহলে ভারতবর্ষ তড়িৎ শক্তিতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে। মনে করবেন না যে বিলাতের ধনস্বামী (Capitalist)-দের শ্যেনদৃষ্টি এদিকে পতিত হয় নাই। অনেকে হয়ত জানতে না পারেন যে, কিছুকাল পূর্বে একদল সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার এই জলধারার জরিপকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু Reformed Council-এর মন্ত্রীগণ এই কার্যে ভারতের লোকের কোনোরূপ উপকার হবে না মনে করে, ওই বিভাগটি তুলে দিয়েছেন। বিলাতের ইঞ্জিনিয়ার ও ধনীদের পক্ষ হতে প্রায়ই লেখালেখি হচ্ছে যে ভারতবাসীরা নিজেদের ইষ্ট বোঝে না এবং আমরা বোঝাতে চাইলেও তারা বুঝবে না। আপনারা মনে করবেন না, এতেই আমাদের পরিত্রাণ হল। এই যে শক্তির বিশাল উৎস, একে যদি আমরা লাজে না লাগাই, নিশ্চয় কিছুদিন পরে কোনো বিদেশীয় কোম্পানি বা পার্শী কি ভাটিয়া কোম্পানি এসে তাদের নিজেদের কাজে লাগাবে ; তখন বাঙালির একটা শক্তির কেন্দ্র পরদেশির হস্তগত হবে, বাঙালির ধনাগমের একটা প্রবাহ অপর দেশের মুখে প্রবাহিত হবে, বাংলার জনসাধারণের দাসত্ব শৃঙ্খলের আর একটি গ্রন্থি বাড়বে। কিন্তু এই শক্তির উৎসকে আয়ত্ত করার জন্য দেশের কোনোরূপ চেষ্টা করা হচ্ছে না, এবং দেশের কোনো প্রতিভাবান ছাত্র এই বিষয়ে শিক্ষিত হবার কোনো চেষ্টা করছেন বলে মনে হয় না।

বন্ধুগণ, উপসংহারে আমি আবার আমার প্রথম কথারই পুনরুক্তি করছি। বাংলার প্রধান সমস্যা হল দারিদ্র্য। ভারতবর্ষের কোনো প্রদেশ কৃষি বাণিজ্য ও খনিজ সম্পদে বাংলার তুল্য নয়, তথাপি আমাদের অকর্মণ্যতা বশত এই সমগ্র সম্পদের অধিকাংশ অবাঙালির হস্তগত হচ্ছে। দারিদ্র্য ঘুচলেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেকটা কমবে। কারণ পীড়িত লোকে দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না, এবং স্বাস্থ্যরক্ষার অতি সাধারণ উপায়ও অবলম্বন করতে পারে না। সুতরাং রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করার ক্ষমতা তাদের ঢের কমে

যায়। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে গঙ্গার দুধারে পাটের কলের বস্তি ও ইংরেজ মার্চেন্টদের কুঠি ; ম্যালেরিয়া এদের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না, কিন্তু একটু ভেতরেই গ্রামে অর্ধেক লোক ম্যালেরিয়ায় অর্ধমৃত। ইংরেজ কলওয়ালাদের অর্থ আছে, তারা জঙ্গল কেটে, নর্দমা করে, ম্যালেরিয়া তাড়িয়েছে। বাঙালি অদৃষ্টের উপর দোষ চাপিয়ে উৎসন্নে যাচ্ছে।

দেশের দারিদ্র্যমোচন করতে হলে শুধু 'ত্যাগ' চলবে না। যে ব্যক্তি সমর্থ, ত্যাগ তাকেই সাজে, অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে ত্যাগ অযোগ্যতারই নামান্তর মাত্র। দেশের যুবকদের আদর্শ হবে যে, দেশের দারিদ্র্যমোচন করতে হবে, দেশের শিল্প বাণিজ্য ও সর্বপ্রকার স্বাধীন বৃত্তি যা এখন বিদেশীর হস্তগত, তাতে ক্রমে ক্রমে ঢুকতে হবে। এই দেশে প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের কাজে লাগাবার জন্য ভবিষ্যতে যে বিরাট আয়োজন হচ্ছে, তার জন্যও প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু এই সংগ্রামের উপযুক্ত হতে হলে নিয়তির উপর নির্ভরতা কমাতে হবে, জীবনব্যাপী সাধনা ও শিক্ষা করতে হবে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভাষাতেই শেষ করছি :

সাধনা বিনা সিদ্ধিলাভ হবে না।

বঙ্গীয় যুবক সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনে সভাপতির প্রদত্ত বক্তৃতা।

নব্যভারত ৩৪ খণ্ড পৃ. ৩৭৬, অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ : ইং ১৯২২।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

কৃষক ও শ্রমিক এবং শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়

বন্ধুগণ,

কৃষক ও শ্রমিকদের সম্বন্ধে দু-চার কথা বলিবার জন্য আপনারা আপনাদের লোক ভাবিয়া আমাকে যে এখানে ডাকিয়া আনিয়াছেন তাহাতে আমি নিজেকে খুবই গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। এই কৌলিন্য, আভিজাত্য ও বীর-পূজার ভারতবর্ষে শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়কে কৃষক ও শ্রমিকগণের প্রশ্ন অধ্যয়নে আগ্রহান্বিত দেখিতে পাইলে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাস্তবিকই প্রাণে অনেক আশার সঞ্চার হয়। ভারতের জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে আমাদের যুবকগণের উপরে কত বেশি দায়িত্ব যে চাপানো রহিয়াছে এবং এ সংগ্রামে দেশের শ্রমিক ও কৃষকগণের স্থান যে কত অধিক উচ্চে অবস্থিত তাহা আমরা যুবকেরা যে দিন সত্যকার ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব সে দিনই আমাদের জাতীয় সংগ্রাম সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করিবে। আজ আমি এখানে দাঁড়াইয়া এই কথাটিকে কেন্দ্র করিয়াই আমার বক্তব্যটুকু প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

কিছুকাল ধরিয়া বাংলা দেশের নানা স্থানে যুবক সম্মিলনের অধিবেশন হইতেছে। ভারতের অন্যত্রও এরূপ সম্মেলনের অধিবেশন যে হয় নাই তাহা নহে। কিন্তু, এ প্রকারের সম্মিলনের ফলে যে জিনিসটি মূর্ত হইয়া ওঠা উচিত ছিল তাহার এতটুকু লক্ষণও কোনো দিকে আজও প্রকাশ পায় নাই। আমি সমগ্র ভারতময় একটা যুব আন্দোলনের কথাই বলিতেছি। একটা আমূল সংস্কারের ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া কেবলমাত্র বাংলা দেশেও আজ পর্যন্ত যুব আন্দোলন মাথা তুলিতে পারে নাই। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে সকলের পশ্চাতে কোনো প্রকারের সুসংহত যুবক শক্তি বিদ্যমান নাই। ভারতের যুবক আন্দোলন শুধু যে নিতান্তই বিক্ষিপ্তভাবে চলিতেছে তাহা নহে, ইহাতে জীবন ও যৌবন এ উভয় জিনিসেরই একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। পৃথিবীর আর আর দেশে যুবকেরা যখন নূতনকে জয় করার জন্য অভিযান করিতেছে তখন আমরা ভারতের যুবকগণ পুরাতন গতানুগতিকতার ভিতরে কেবলই ঘুরপাক খাইয়া

মরিতেছি। আমরা কোনো বড়ো আদর্শকে আমাদের সম্মুখে খাড়া করিতে পারি নাই, স্বাধীনভাবে কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কারেও আমরা ব্রতী হই নাই। বীর-পূজার প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আমাদের স্বাধীন চিন্তাশক্তি একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পুরাতন পূতিগন্ধময় প্রচলিত প্রথার আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া এবং বর্তমান কালের অনুপযোগী হাজার হাজার বছরের জীর্ণ দর্শনকে অভ্রান্ত সত্য মনে করিয়া আমরা নূতনকে বরণ করিবার প্রবৃত্তি একেবারেই হারাইয়া বসিয়াছি। দাসত্বের উচ্ছেদ সাধন করিব মনে করিয়া আমরা দাসত্বকেই গলার হার করিয়া লইতেছি।

যুবকেরা দেশের সর্ববিধ কাজের অংশ গ্রহণ করিবার উপযুক্ত নহেন এরূপ একটা ধারণা এদেশের লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। আমরা বেশির ভাগ জায়গায় লক্ষ করিয়া দেখিয়াছি যে সেবা-ধর্ম পালন করাই যুবক সংগঠনের একমাত্র কাজ বলিয়া নির্ধারিত হইয়া থাকে। প্রয়োজন হইলে যুবক সংগঠনসমূহ সেবা-ধর্মের কাজ গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু, তাহাই সংগঠনসমূহের প্রধান ও একমাত্র কাজ কিছুতেই হইতে পারে না। তারপর, ধর্মের নামে এমন কতকগুলি ক্রিয়া-কর্ম আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যে সবের প্রতিপালনে সাহায্য করিয়া সেবা-ধর্মের পালন করা তো উচিতই নয়, পরন্তু, সে সবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করাই যুবক সম্প্রদায়ের পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য। দৃষ্টান্ত স্থলে স্নান-পর্বসমূহের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। পুণ্য সঞ্চয় করার উদ্দেশে হাজার হাজার নারী-পুরুষ নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর নদী, নালা ও পুকুরসমূহে স্নান করিতে যাইয়া থাকে। এ সকল কুসংস্কারের কাজে কোনো প্রকারের সহায়তা না করিয়া যাহাতে সে-সকল কাজ হইতে দেশের লোকগণ বিরত হয় সর্বতোভাবে সে চেষ্টা করাই আমাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। এমন আরো অনেক কুসংস্কার ব্রতের নাম করা যাইতে পারে। আমি এমন যুবক-সঙ্ঘ দেখিয়াছি যাহাতে এরূপ সব কাজে সহায়তা করাই বৃহত্তম কর্তব্য কর্ম বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। আমরা যুবকেরা বিপ্লবাত্মক মনোবৃত্তি লইয়াই সকল কাজ করিব এবং দেশের ছোটো বড়ো সকল কাজেই শুধু অংশ গ্রহণ করিলেই আমাদের চলিবে না। বিশিষ্ট অংশই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের জাতীয় মুক্তি-লাভের সংগ্রামে আমাদের দায়িত্ব যে বৃদ্ধদের চেয়ে ঢের বেশি একথা আমাদিগকে মনে-প্রাণে বুঝিয়া লইতে হইবে।

মুক্তির কথা, স্বাধীনতার কথা আমরা বলিতেছি, আর সকলকে বলিতে শুনিতেছি, কিন্তু আমাদের বন্ধন যে কোথায় তাহা আমরা অনুভব করিবার চেষ্টা আদৌ করিতেছি না। আমাদের মুক্তির স্বরূপই বা কি হইবে তাহারও কোনো পরিষ্কার মূর্তি আমাদের চোখের সম্মুখে নাই। একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে ভারতের যুবকগণ, বিশেষ করিয়া বাংলার যুবকগণ, দেশের মুক্তির জন্য জীবন পর্যন্ত মূল্য প্রদান করিয়াছেন, আর দুঃখ-কষ্ট যে কত সহিয়াছেন ও আজও সহিতেছেন তাহার তো ইয়ত্তাই নাই। কিন্তু,

তাঁহারা যে ঠিক পথে চলিয়াছিলেন কিংবা আজও চলিতেছেন তাহা তো আমার মনে হয় না। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের আন্দোলনকে বাদ দিয়াও বিদেশি শাসনের হাত হইতে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্যে দুইটি চরম আন্দোলন বিভিন্ন সময়ে মাথা তুলিয়াছিল। কর্ম-প্রণালী বিভিন্ন হইলেও দুইটি আন্দোলনের উদ্দেশ্য একই ধরনের ছিল এবং দুইটি আন্দোলনেরই অল্প-বিস্তর জের আজও পর্যন্ত চলিতেছে। বিগত শতাব্দীর শেষার্ধে ওহাবি আন্দোলন মাথা তুলিয়াছিল, আর এ শতাব্দীর প্রারম্ভে মাথা তুলিয়াছিল ত্রাস-নীতি-মূলক বিপ্লবান্দোলন এবং বাংলা দেশ গ্রহণ করিয়াছিল এ আন্দোলনের নেতৃত্ব। মুসলমানদের মধ্যে একটা শাখাকে ওহাবি বলা হয়। এই ওহাবিরা ইংরেজের বিরুদ্ধে ও পাঞ্জাবের শিখ নরপতি রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল শিখগণের অত্যাচার হইতে পাঞ্জাবের মুসলমানগণকে বিমুক্ত করা এবং ইংরেজের কবল হইতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করিয়া পুনরায় মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করা। ওহাবিদের মধ্যে বালক ও বৃদ্ধ এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল শ্রেণির লোকই এ বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে প্রথমে বাংলায় এবং পরে সমগ্র ভারতে যে ত্রাস-নীতি-মূলক বিপ্লব মাথা তুলিয়াছিল তাহাতে শিক্ষিত হিন্দু যুবকগণই যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে হিন্দু-রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। দুইটি বিপ্লবী দলই ধর্মের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ওহাবি মুসলমানগণ তাঁহাদের প্রেরণা পাইয়াছিলেন কোর-আন্ ও হাদিস্ হইতে আর হিন্দু যুবকগণ তাঁহাদের প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন গীতা ও উপনিষদ হইতে। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের দমন-নীতির ঝড় উভয় দলেরই মাথার উপর দিয়া অত্যন্ত প্রবল বেগে বহিয়া গিয়াছে। অবশ্য মুসলমানদিগকেই এ ঝড়ের বেগটা কিছু বেশি মাত্রায় সহিতে হইয়াছে। কেননা, তাঁহারা প্রকাশ্য উত্থানের পক্ষপাতী ছিলেন। দুইটি বিপ্লবেরই প্রদমনে একই চরম ঔষধ কাজ করিয়াছিল, আর সে ঔষধ ছিল বিপ্লবপন্থীদিগকে রাজবন্দি করিয়া রাখিয়া দেওয়া। ১৮০৮ সন ও তাহার পরবর্তী সময়ে ১৮১৮ সনের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে বহু মুসলমানকে রাজবন্দি করিয়া রাখা হইয়াছিল। গভর্নমেন্টের মতে ইহারই দ্বারা ওহাবি আন্দোলন মিহিয়া গিয়াছিল। ১৯০৯ সন হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯১৯ সন পর্যন্ত ১৮১৮ সনের ৩নং রেগুলেশন ও যুদ্ধের সময় প্রবর্তিত ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অনুযায়ী শত শত হিন্দু যুবককে বন্দি করিয়া ত্রাস-নীতি-মূলক আন্দোলনকে গভর্নমেন্ট প্রদমিত করিয়াছে। একথা বলা বাহুল্য হইবে যে নিতান্ত সংকীর্ণ মনোবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়াই উপরি-উক্ত দুইটি আন্দোলনের সৃষ্টি করা হইয়াছিল। এবং সংকীর্ণতারই জন্য দুইটি আন্দোলনই অকৃতকার্য হইয়াছে। সত্যকারের বিপ্লবের ভিত্তি কোনো প্রকারের সংকীর্ণ গণ্ডির ভিতরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তারপরে ধর্মের নামে বিপ্লব সাধন করার যুগ বহুকাল পূর্বেই অতীত হইয়া গিয়াছে। ধর্ম-সম্প্রদায় পৃথিবীতে অনেকই রহিয়াছে। কিন্তু, ইহার একটিও

আপনার সংকীর্ণ গণ্ডি লইয়া আজিকার দিনে আর কিছুতেই পরিতুষ্ট থাকিতে পারিতেছে না। বিশিষ্ট গণ্ডির ভিতরে সন্তুষ্ট থাকার জন্য ধর্ম বরাবরই উচ্চ প্রাচীর খাড়া করিয়াছে বটে, কিন্তু, অর্থনীতিক শক্তি সে-প্রাচীরকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান প্রভৃতি কোনো সম্প্রদায়ই শুধু আপন আপন সম্প্রদায়কে লইয়াই জীবনযাত্রা কিছুতেই আর নির্বাহ করিতে পারিতেছে না, অপর সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসিবার জন্য অর্থনীতিক শক্তি প্রত্যেক সম্প্রদায়কেই বাধ্য করিতেছে। কাজে কাজেই, কোনো একটা বিশিষ্ট ধর্ম-সম্প্রদায়কে লইয়া কোনো একটা বিশিষ্ট ধর্ম-সম্প্রদায়েরই জন্য স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার মতো বাতুলতা আজিকার দিনে আর কিছুই হইতে পারে না।

ভারতবর্ষকে আজ আমরা স্বাধীন ও মুক্ত করিতে চাই, কিন্তু, কাহার কবল হইতে? একথা সকলেই জানেন যে ব্রিটিশ শাসন ভারতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। গ্রেটব্রিটেনের যিনি রাজা তিনি ভারতের সম্রাটও বটেন এবং এই সম্রাটেরই নামে ভারতবর্ষ শাসিত হইয়া থাকে। সম্রাট নিজে যেমন ভারতবর্ষ শাসন করেন না, ঠিক তেমনি তাঁহার জন্যও ভারতবর্ষ শাসিত হয় না। ভারত শাসনের কলকাঠি যাহারা ঘুরাইয়া থাকে তাহারা হইতেছে গ্রেটব্রিটেনের ধনিক ও বণিক সম্প্রদায়। ইহারা ইহাদের অর্থনীতিক ও সামাজিক শক্তিকে অপ্রতিহত রাখিবার জন্য গ্রেট ব্রিটেনের রাষ্ট্রীয় শক্তিকেও আপনার সম্পূর্ণ করতলগত করিয়া রাখিয়াছে। এই ত্রিশক্তির জোরে ব্রিটিশ ধনিক-বণিকগণ বিশ্বজয়ী হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের এই বিশ্বজয়ী শক্তিই ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ধনিকবাদের উন্নততম আকারকেই ইম্পিরিয়েলিজম বলা হয়। আপন দেশের শ্রমিকগণের শোষণের ভিতর দিয়াই প্রথমে ধনিকবাদের কার্যারম্ভ হয়। কিন্তু, ইহার ব্যবসায়ের প্রসার যতই বিস্তৃত হইতে থাকে ততই ইহাকে নতুন বাজারের ও কাঁচামালের উৎপত্তিস্থলের সন্ধানে বাহির হইতে হয়। অর্থাৎ ধনিকদের কারখানা যখন বিস্তৃতি লাভ করে এবং নূতন নূতন কলকব্জা তাহাতে বসানো হয় তখন উহার মাল উৎপন্ন করিবার ক্ষমতাও বাড়িয়া যায়। এই অত্যধিক উৎপন্ন মাল ধনিকদের আপন দেশ ব্যবহার করিয়া কিছুতেই শেষ করিতে পারে না। কাজেই প্রয়োজন হইয়া পড়ে অন্য দেশে নূতন বাজারের। অত্যধিক উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে অত্যধিক কাঁচামালেরও দরকার হয়। তত বেশি কাঁচা মাল ধনিকগণের নিজেদের দেশে পাওয়া যায় না এবং কোথাও কোথাও মোটেই পাওয়া যায় না। এই কারণে, কাঁচামালের উৎপত্তিস্থলসমূহের সন্ধানও ধনিকদিগকে করিতে হয়। অনেক সময় কাঁচামাল উৎপত্তির দেশেই সস্তা কাঁচমাল ও সস্তা শ্রমিক পাওয়া যায় বলিয়া এবং রক্ষণ-শুল্ক ইত্যাদিকে এড়াইবার সুবিধা হয় বলিয়া ধনিকগণ কারখানাও স্থাপন করিয়া বসে। ধনিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারাই এ সকল কাজ সম্ভব হইয়া থাকে। অপর দেশসমূহকে এইরূপে শোষণ করিবার

জন্য ধনিকগণ সর্বদাই আপনাদের করতলগত রাষ্ট্রীয় শক্তিকে শুধু যে ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা নয়, যদৃচ্ছা ব্যবহারই করিয়া থাকে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহারা অপর দেশকে রাষ্ট্রনীতিক ও অর্থনীতিকভাবে কিংবা শুধু অর্থনীতিকভাবে পদানতকরিয়া থাকে। এই যে পদানত করণ, ইহারই নাম হইতেছে ইম্পিরিয়েলিজম।

আমরা ভারতবাসীগণ ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজম দ্বারা সকল দিক হইতেই পদানত হইয়া আছি। ইম্পিরিয়েলিজমের শাসন শোষণেরই জন্য হইয়া থাকে এবং ভারতের কৃষক ও শ্রমিকগণ যে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে শোষিত হইয়া থাকে একথা বোধহয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। শুধু কৃষক ও শ্রমিকগণ শোষিত হয়, একথা আমি এজন্য বলিয়াছি যে যাবতীয় ধন ও সম্পদ কেবলমাত্র তাহারাই হস্তের ও মস্তিষ্কের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন করিয়া থাকে।

ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজম ভারতবর্ষে দুই বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। পুরাতন ইম্পিরিয়েলিজম ভারতবর্ষের শৈল্পিক উন্নতির পরিপন্থী ছিল। উন্নত কলকব্জার সংযোগে ভারতে মাল তৈরি হয় এমন নীতির পক্ষপাতী দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজম ছিল না। এ কারণে, মেশিনের উপরে খুব চড়া আমদানি শুল্ক বসানো হইয়াছিল। এদেশে মেশিনে প্রস্তুত মালের উপরেও আবগারি শুল্ক বসিয়াছিল। কিন্তু, বিগত যুদ্ধের দ্বারা অবস্থার অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়া গিয়াছে। ভারতে ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের বর্তমান নীতি হইতেছে ভারতবর্ষকে শিল্পানুষ্ঠানময় করিয়া তোলা এবং ভারতের ধনিকগণকে আপনার অধীন অংশীদাররূপে গ্রহণ করা। ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজমকে উহার বর্তমান নীতি অবলম্বন করিতে জগতের অবস্থাই বাধ্য করিয়াছে। ভারতের ধনিক-বণিবগণ অত্যন্ত পরিতুষ্টির সহিত ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের অধীনে অংশীদার হইয়াছে। নন্-কোঅপারেশন আন্দোলনের প্রাথমিক দিকটা ব্যতীত আর সকল সময়েই ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ধনিক-বণিকগণের, জনগণের নয়, অবস্থার উন্নতি সাধন করা। নন্-কোঅপারেশন আন্দোলন ব্যতীত অন্য কোনো জাতীয় আন্দোলন জনগণের ভালোর জন্য কোনো দাবি কখনও পেশ করে নাই। নন্-কোঅপারেশন আন্দোলনও উহার দাবি পরে তুলিয়া লইয়া ছিল। ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজম বুঝিয়াছে ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকগণকে শোষণ ও লুণ্ঠন করার জন্য ভারতীয় ধনিক-বণিক ও অভিজাত শ্রেণির সহিত আপোস করা ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। কেননা, রাশিয়ার বিপ্লব জগতের ইম্পিরিয়েলিজমসমূহের জন্য অনেক সংকটের সৃষ্টি করিয়াছে। এদিকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিশন ও মন্টেগু চেমস্ ফোর্ড শাসন সংস্কারের দ্বারা যতটুকু অধিকার ভারতীয় ধনিক-বণিক ও উচ্চ-মধ্য শ্রেণির লোকেরা পাইয়াছে তাহাতে তাহারা এই ভাবিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছে যে তাহাদের এই অধীন অংশীদারত্ব ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভের দ্বারা একদিন সমান অংশীদারত্বে পরিণত

হইবে। সমগ্র জগতের শ্রমিক ও কৃষকগণ যখন ধনিক ও জমিদারের কবল হইতে মুক্ত হইয়া আপনাদের ক্ষমতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে তখন ভারতের ধনিক-বণিক ও ভূম্যধিকারিগণও আপনাদের ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা জানে যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভের দ্বারা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রিটিশ ধনিকগণের সহিত ভাগাভাগি করিয়া ভারতীয় জনগণকে, বিশেষ করিয়া ভারতের কৃষক ও শ্রমিকগণকে তাহারা মনের সুখে লুণ্ঠন করিতে পারিবে। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভের আন্দোলন হইতেছে ভারতের উৎপাদক শ্রেণির দাসত্বকে সুদৃঢ় করার আন্দোলন।

আজিকার দিনে স্বাধীনতা লাভের জন্য যে বিদ্রোহ ঘোষিত হইবে এবং যে বিপ্লব সংঘটিত হইবে তাহা কখনও ইংল্যান্ডের ক্রম্‌ওয়েলের বিপ্লব কিংবা ১৭৮৯ সনের ফরাসি বিপ্লবের মতো হইবে না। এই দুইটি বিপ্লবে ফিউডাল ও অভিজাত শ্রেণির সহিত ক্ষমতা-প্রয়াসী ধনিকগণের সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। জগতের সে-অবস্থা এখন আর নাই। জগতে এখন ধনিকগণেরই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শোষিত জনগণ এখন বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে ধনিকগণের প্রভুত্ব ও শোষণের বিরুদ্ধে। পুরাতন প্রথাকে ধ্বংস করিয়া তাহার জায়গায় নূতনের প্রবর্তন করার নামই হইতেছে বিপ্লব বা রিভোলিউশন। ধনিক-শোষণ-প্রণালীকে ধ্বংস করিয়া কৃষক ও শ্রমিকগণের অর্থাৎ শোষিত জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার কার্যকরী চেষ্টাই আজিকার দিনে বিপ্লব বা রিভোলিউশন নামে আখ্যাত হইতে পারে। এই হিসাবে ভারতের ত্রাস-নীতি-মূলক গুপ্ত ষড়যন্ত্র বা আন্দোলনকে বিপ্লব বলা যাইতে পারে কী না তাহাতে ঘোরতর সন্দেহ রহিয়াছে। কেননা, ত্রাস-নীতিবাদিগণ যে কখনও শোষিত জনগণের ক্ষমতার প্রতিষ্ঠাকেই আপনাদের আদর্শে পরিণত করিয়াছিলেন এ সংবাদ তাঁহাদের আত্ম-বিবৃতি হইতে আমরা কখনও জানিতে পারি নাই।

আমাদের রিভোলিউশন বা বিপ্লবের উদ্দেশ্য হইবে কৃষক ও শ্রমিকগণের অর্থাৎ জনগণের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা আর তাহার কার্য হইবে কৃষক ও শ্রমিকগণের উত্থান। এই একটি মাত্র পথ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। আমরা এই কাজ না করিয়া যদি আর কিছু করি তবে আমরা বিপ্লব-বিরোধী বলিয়া পরিগণিত হইব।

স্বাধীনতা যদি যুবকগণের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ধনাভিজাত্য, জ্ঞানাভিজাত্য, ভূম্যাভিজাত্য ও বর্ণাভিজাত্য প্রভৃতি পরিহার করিয়া কৃষক ও শ্রমিকগণের ভিতরে তাহাদেরই লোক হইয়া কাজে লাগিয়া যাইতে হইবে। কৃষকগণের নিরক্ষরতা তিরোহিত করিবার জন্য চিনে চল্লিশ হাজার যুবক আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা নিরক্ষরত্বকে বিদূরিত করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকগণকে তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতেছেন। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই চিনের ছাত্রগণ ও চিনের

যুবকগণ অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। গোটা চিনের আবহাওয়াই তাঁহারা পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছেন। পুরাতন প্রতিক্রিয়াশীল দর্শন ও ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া নূতন বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারার দ্বারা তাঁহারা সমস্ত চিনকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বহু সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, বহু পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। কোনোটিরই উদ্দেশ্য হাজার হাজার বছরের পুরাতন ভাবধারাকে আজিকার জীবনের সহিত খাপ খাওয়ানো নহে, সব কয়টিরই উদ্দেশ্য পূতিগন্ধময় পুরাতনের বহিষ্করণ এবং নূতনের বরণ। চিনের যুবকান্দোলন হইতে ভারতীয় যুবকগণের কিছুই কী শিখিবার নাই? চিনের যুবকগণ যখন নূতন আলোকরাশির দ্বারা তাহাদের দেশকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন তখন ভারতের যুবকগণ করিতেছেন কিনা পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ। জানি না, আমাদের শালীনতা বোধ কোথায় গিয়াছে!

হীন-সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকত্বকে ঘৃণাভরে পরিহার করিয়া মনুষ্যত্বকে বরণ করিয়া লইতে না পারিলে আমরা ভারতের যুবকগণ কোনো কাজেই আসিব না।

আমরা চেষ্টা করিলেই অসাধ্য সাধন করিতে পারিব। আমাদের কাজের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রতিবন্ধক হইতেছে আমাদের অভিজাত মনোবৃত্তি। এই মনোবৃত্তিকে দূর করিতে না পারিলে আমরা কোনো কাজই করিতে পারিব না। কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমাদের একটা বিশিষ্ট শিক্ষা পাওয়ার প্রয়োজন আছে। সেই শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহ আমাদিগকেই গড়িয়া লইতে হইবে। কৃষিক্ষেত্রে কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনের সহিত মিশিয়া আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে, কারখানায় প্রবেশ করিয়া মজুরের জীবনের সহিত আমাদিগকে মিশিয়া যাইতে হইবে। চাষি আর মজুরদিগের হৃদয়ে ভালো খাওয়ার জন্য, ভালো পোশাক পরার জন্য এবং সর্বোপরি ভালোভাবে ভালো জায়গায় বাস করার জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে না পাইয়াও মানুষের জীবনকে অভাবহীন করিয়া গড়ার ন্যায় অভিশাপ পৃথিবীতে আর কিছুই হইতে পারে না।

আমাদের কৃষকগণ, শ্রমিকগণ, এক কথায় জনগণ সামাজিক, অর্থনীতিক ও রাষ্ট্রনীতিকভাবে পরিপূর্ণ মুক্তিলাভ না করিলে ভারতবর্ষ কখনও স্বাধীন হইবে না, ইংরেজ চলিয়া গেলেও না। ভারতবর্ষ ভারতবর্ষের জনগণের দ্বারা এবং জনগণেরই জন্য পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করিবে।

যে মুক্তি-সংগ্রামে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি শ্রেণি-সংগ্রাম তাহার একটা রূপ। সমাজে যেদিন ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি হইয়াছে সেদিনই সম্পত্তির অধিকারীর সহিত সম্পত্তিহীনের সংঘাতও বাধিয়াছে। উৎপাদনের যাবতীয় উপায়সমূহের উপর যাহারা প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া বসিয়া আছে তাহাদের সহিত শোষিত উৎপাদকগণের সংঘাত ও সংগ্রাম অনিবার্য রূপেই চলিয়াছে এবং যতদিন না সম্পত্তিশীলের শোষণ প্রথা সম্পূর্ণরূপে

ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে ততদিন চলিতেও থাকিবে। আমাদের দেশের অনেক ধনিক নেতা ও ধনিকের প্রসাদ-প্রয়াসী নেতা শ্রেণি-সংগ্রামের নামে বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠেন। কেননা, তাহাতে তাঁহাদের স্বার্থের হানি হইবে। অবশ্য শ্রেণি-সংগ্রামের নামে আপত্তির বেলায় তাঁহারা স্বার্থহানির কথা উচ্চারণও করেন না। তাঁহারা বলেন, 'এসব পাশ্চাত্যের জিনিস, প্রাচ্যের আবহাওয়াতে কিছুতেই সহিবে না।' পাশ্চাত্যের নিকট হইতে প্রাচ্য কত কিছু গ্রহণ করিয়াছে, প্রতিনিয়ত করিতেছে, তাহাতে এসব নেতার আপত্তি কখনও হয় না। তাঁহারা নিজেরা যে রাতদিন পাশ্চাত্যের হীনতমচিন্তায় মশগুল হইয়া থাকেন তাহাতেও প্রাচ্যের কোনো ক্ষতি হয় না। প্রাচ্যের ক্ষতি হয় শুধু না কি শ্রেণি-সংগ্রামের বেলায় যাহা কোনো দেশের বিশিষ্ট বস্তু মোটেই নয়। ধন-বৈষম্য সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রেণি-সংগ্রামের সৃষ্টি সকল দেশেই হইয়াছে। শ্রেণি-সংগ্রামের দ্বারা সকল দেশেই সমাজের নানাবিধ বিবর্তন সাধিত হইয়াছে এবং এখনো হইতেছে। এক কথায় মানব-সমাজের ইতিহাসই হইতেছে শ্রেণি-সংগ্রামের ইতিহাস। আমাদের জাতীয় মুক্তির সংগ্রামও নিছক শ্রেণি-সংগ্রাম ব্যতীত আর কিছুই নহে। ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজম এবং উহার অংশীদার ভারতীয় ধনিকবাদ ও ভূম্যাভিজাত্য আমাদের দাসত্ব ও অধীনতার মূলীভূত কারণ। এই শক্তিগুলি আমাদের দেশের উৎপাদকগণকে অর্থাৎ কৃষক ও শ্রমিকগণকে দুই হাতে শোষণ করিতেছে। কৃষক ও শ্রমিকগণ উত্থান করিয়া যদি এই শোষণকারী শক্তিগুলিকে ধ্বংস করিতে পারে তবেই আমরা সত্যকার স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব, অন্য কোনো উপায়ে নহে। ভারতময় সংযত যুবক শক্তি ক�ৃষক ও শ্রমিক উত্থানের কাজে আপনাদিগকে মনে প্রাণে নিয়োজিত করুক।

গণবাণী ২৯ আগস্ট, ১৯২৭

ঢাকা জেলার বিশেষ যুব-সম্মিলনে শ্রমিক ও কৃষক বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ।

শিবনাথ শাস্ত্রী

নবযুগের নব আকাঙ্ক্ষা

ঊনবিংশ শতাব্দী আমাদিগকে যে যুগে উপস্থিত করিয়া দিয়া আমাদের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে, সেটা নবযুগ। বর্তমান সময়ের জ্ঞানিগণ এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহাকে নবযুগ বলিয়া অনুভব করিতেছেন। এই যুগ সম্বন্ধে এক্ষণে যিনি যাহা লিখিতেছেন বা বলিতেছেন,-সকলেই ইহাকে নবযুগ নামে অভিহিত করিতেছেন। বর্তমান সময়ে ইউরোপ প্রভৃতি স্থান হইতে যে-সকল নূতন নূতন পত্রিকা বাহির হইতেছে, তৎসমুদয়েরও এই যুগ অনুসারে নামকরণ হইতেছে। The New Age, Herald of the Golden Age প্রভৃতি পত্রিকা এই নবযুগকেই প্রকাশ করিতেছে।

কেন ইহাকে নবযুগ বলা হইতেছে? একটুকু চিন্তা করিলেই সকলে দেখিতে পাইবেন যে, ইহার বিশেষ কারণ আছে। কি বিষয়-বাণিজ্যে, কি মানবের সুখ-সৌভাগ্যে, কী মানবের সাহিত্যে, কী সামাজিক ইতিবৃত্তে, কী জ্ঞানরাজ্যে, কী মানবের ধর্মভাবে, সর্বত্রই দেখি বিগত শতাব্দীতে কতকগুলি মহা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। চিন্তা করিলে অতি আশ্চর্য বোধ হয় যে, এক শতাব্দীতে এত পরিবর্তন! বাস্তবিক বিগত শতাব্দী মানবের সকল ব্যাপারে এমন সকল ঘোর বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে যে, তৎপূর্বের দুই তিন শতাব্দী একত্র করিলেও তাহার সমান হয় না। বিগত শতাব্দীতে এবং তৎপূর্ব শতাব্দীর শেষ ভাগে যে সকল নব নব সত্য মানব-জ্ঞানে ফুটিয়াছে, বিজ্ঞানের যে সকল নব নব আবিষ্কার মানব চিন্তাতে উদ্ভূত হইয়াছে, সে সকলের বিবরণ একটি বক্তৃতাতে দেওয়া সম্ভব নয় এবং তাহা আমার শক্তিরও অতীত। এই কয়দিনের সুযোগ্য বক্তাদিগের মুখে শ্রোতৃমণ্ডলী তাহার কিছু কিছু শুনিয়াছেন এবং অনেকেই সংবাদপত্রে ও পুস্তকাদিতে পাঠ করিয়াছেন। তথাপি সংক্ষেপে তৎসমুদায়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না।

প্রথম, জীবনের বাহ্য ব্যাপারে যদি বাহিরের বিষয়ে (Matters Physical) আলোচনা করা যায়, তবে দেখা যায় যে, বিগত শতাব্দী মানুষের সুখ-সৌন্দর্যে, বিষয়-বাণিজ্যে,

আইন-আদালতে অতি আশ্চর্য পরিবর্তন করিয়াছে। আমি অতি সংক্ষেপে তাহার দুই-একটির উল্লেখ করিব। তাহাতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, বিগত শতাব্দী মানবের বাহ্যিক ব্যাপারে কত দিকে কত পরিবর্তন সাধন করিয়াছে।

প্রথম, রেলওয়ে। এই রেলওয়ে পূর্বে ছিল না। বিগত শতাব্দীতে এই রেলওয়ে জগতে আবিষ্কৃত হইয়া জগতের কি ঘোর পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে, নরনারীর কী সুমহৎ কল্যাণ সাধন করিয়াছে, তাহা সকলেই কল্পনাতে ধারণ করিতে পারেন। বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিয়া, যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিয়া, জাতিসকলকে পরস্পর এক সূত্রে বাঁধিয়া, ইহা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। এখন যে সকলে অনুভব করিতেছো জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন নরনারী দিন দিন এক অচ্ছেদ্য একতাসূত্রে গ্রথিত হইতেছে, ইহা প্রধানত এই রেলওয়ের কাজ।

অধিক কী, ভারতবর্ষে সে পরিবর্তনের আঘাত এমনই লাগিয়াছে যে, এখন ভারতের সকল লোক মনে করিতেছে তাহারা এক পরিবারভুক্ত। এখন আর স্বদেশ বলিতে আমরা কোনও এক ক্ষুদ্র পল্লিকে বুঝি না, স্বজাতি বলিতে কোনো এক ক্ষুদ্র সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ কোনো ক্ষুদ্র জাতিকে বুঝি না। এখন স্বদেশ বলিতে আমরা হরিদ্বার হইতে কুমারিকা পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভূভাগকে বুঝিয়া থাকি, স্বজাতি বলিতে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে যাহারা বাস করে তাহাদিগকেই বুঝিয়া থাকি।

এই যে একতার ভাব, যে ভাব প্রাণে আসাতে আজ আমরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন জাতিকে এক জাতি বলিয়া অনুভব করিতেছি, যে ভাব প্রাণে আসাতে আজ রাণাডে মহোদয়ের মৃত্যুর জন্য আমরা বোম্বাইবাসীর সহিত এক হইয়া চক্ষের জল ফেলিতেছি, তাহা সমগ্র জগতের পক্ষে এক নবযুগের সূচনা কি না? রেলওয়েতে যে কী এক ঘোর পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা আমি সমগ্র রূপে ব্যক্ত করিতে পারি না। আমার মনে হয়, ইহা এক মহা সমাজ সংস্কারক, ব্রাহ্ম প্রচারকের অপেক্ষা বড়ো। ব্রাহ্ম প্রচারকগণ দেশবিদেশে ঘুরিয়া বক্তৃতা করিয়া যাহা করিতে না পারেন, রেলওয়ে নিঃশব্দে নীরবে তাহা করিতেছে। আমার পিতা—তিনি হিন্দু, পরম হিন্দু ; নীচ জাতির সংস্পর্শে আসিলে তিনি গঙ্গাস্নান করা আবশ্যক মনে করেন, নতুবা তাঁহার জাতি যায়, তাঁহাকে নীচজাতীয় মেথরের পাশাপাশি বসাইয়া কাশীতে লইয়া যাইতেছে।

রেলওয়ের পরে ষ্টিমার, বাংলাতে বলা যায় বাষ্পীয় জলযান। বিগত শতাব্দীতে এই বাষ্পীয় জলযানের সৃষ্টি হইয়া কী এক অত্যদ্ভুত পরিবর্তন ঘটাইয়াছে তাহা কল্পনাতে আনয়ন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। যেমন রেলওয়ের সৃষ্টি হইয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের জাতি-সকলের মধ্যে একতা স্থাপন করিতেছে, এই সকল বাষ্পীয় জলযানও তেমনি জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে প্রণয়, মিত্রতা এবং বন্ধুত্বের ভাবকে বর্ধিত করিতেছে, সমুদয় মানব জাতিকে এক বিশাল মানব পরিবারের অন্তর্ভুক্ত কেরিতেছে, বাণিজ্য ও স্বার্থ-বন্ধনে সকলকে বাঁধিতেছে।

রেলওয়ে এবং ষ্টিমশিপ সৃষ্টি হইয়া যেমন মানব জাতির মধ্যে একত্ব স্থাপন করিয়াছে, তেমনই আবার বিগত শতাব্দীতে Electric Telegraph সৃষ্টি হইয়া কী এক অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটন করিয়াছে তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। ইহাতে কী ঘোর পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। এক স্থানের লোকের সহিত অপর স্থানের দেশের লোকের চিন্তার আদানপ্রদান চলিতেছে, ইহা কি সামান্য ব্যাপার? মানব জাতির একত্ব স্থাপনের পক্ষে ইহা কি কম সহায়?

বিগত শতাব্দীতে মানবের সুখের আরও অনেক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয় ক্ষুদ্র হইলেও উল্লেখযোগ্য। বিগত শতাব্দীতে বিলাতি দিয়াশলাই আবিষ্কৃত হইয়া মানবের কীরূপ সুবিধা করিয়া দিয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। ইহাতে সভ্যসমাজের শ্রীবৃদ্ধির কতটা সাহায্য করিয়াছে তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। যেমন দিয়াশলাই দ্বারা গৃহে আলো জ্বালিবার সুবিধা হইয়াছে, তেমনই আবার গ্যাসের আলো, বৈদ্যুতিক আলো প্রভৃতির সৃষ্টি হওয়াতে বাহিরের অন্ধকার নষ্ট হইতেছে। তৎপরে বিগত শতাব্দীতে আবার রন্টজেন-রে আবিষ্কৃত হইয়া মানুষের কী মহোপকার সাধন করিতেছে। এই আলোর সাহায্যে এক্ষণে অস্ত্রচিকিৎসার কীরূপ সুবিধা হইয়াছে, ভাবিলে অবাক হইতে হয়।

বিগত শতাব্দীর আর একটি আবিষ্কার ফটোগ্রাফি। ইহার সাহায্যে মানুষ মানুষের মুখকে চিরস্থায়ী করিতেছে। বন্ধুবান্ধবের মুখশ্রীকে চির নবীন করিয়া রাখিতেছে, দূরস্থিত প্রিয়জনের আকৃতিকে আপনার কাছে আনিতেছে। ইহার সাহায্যে দূরস্থ চন্দ্রাদির প্রতিকৃতিও পাওয়া যাইতেছে। তেমনই আবার ফনোগ্রাফের সাহায্যে মানুষের কণ্ঠের স্বরকে ধরিয়া মানুষ আপনার আনন্দবর্ধনের উপায় বিধান করিতেছে।

কেবল ইহাই নহে, আবার বিগত শতাব্দীতে আর এক প্রকার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার নাম বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ। ইটালি দেশীয় সুবিখ্যাত মার্কনি ও এ দেশের ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু ইহার আবিষ্কারকর্তা। এই যে বিনা তারে টেলিগ্রাফ, যাহার সাহায্যে ইংল্যান্ড আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে অনায়াসে অবলীলাক্রমে সংবাদ প্রেরণ করা যাইবে এরূপ আশা হইতেছে, তাহা কি আশ্চর্য নয়?

বিগত শতাব্দীতে বহির্জগতে যে সকল অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া সভ্যসমাজকে চমৎকৃত করিয়াছে, আমি স্থূলভাবে তাহার প্রধান প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করিলাম। অতি সংক্ষেপে যেগুলির উল্লেখ করিলাম, সেগুলিকে একত্রিত করিলে বড়ো সহজ বোধ হয় না। বিগত শতাব্দীর বাহ্য কীর্তিসমূহকে একতালিকাভুক্ত করিলে বলিতে হয়:

ক. Railways
খ. Steamships
গ. Electric Telegraph

ঘ. Telephone
ঙ. Lucifer matches
চ. Gas illuminations
ছ. Electric Lightening
জ. Rontgen Rays
ঝ. Photography
ঞ. Phonography
ট. Wireless Telegraphy.

এক শতাব্দীতে এমন সকল অভিনব আবিষ্কার বড়ো সহজ ব্যাপার নয়। ইহার একটি যদি ত্রিশ বৎসরে আবিষ্কৃত হইত তবে সেই ত্রিশ বৎসর ইতিহাসে স্মরণীয় কাল হইয়া থাকিত। এই যে দশটা বিষয় স্থূলভাবে উল্লেখ করিলাম, এতদ্ব্যতীত বিগত শতাব্দীতে আরও কত যে নূতন আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার তালিকা প্রস্তুত সুকঠিন। যে শতাব্দীর মধ্যে এতগুলি নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা জগতের সভ্যতার পক্ষে কি নবযুগ আনয়ন করে নাই?

যেমন বাহিরের বিষয়ে দেখা যাইতেছে যে, উনবিংশ শতাব্দী আমাদিগকে এক নবযুগের দ্বারে আনিয়া উপনীত করিয়াছে, সেইরূপ আবার চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, এই শতাব্দী জ্ঞানরাজ্যেও এমন কতকগুলি গুরুতর পরিবর্তন উপস্থিত করিয়াছে, যে কারণে বর্তমান যুগকে নবযুগ বলা যাইতে পারে। বিগত শতাব্দী মানব জীবনে যে সকল সুমহৎ পরিবর্তন সংঘটিত করিয়াছে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তৎসমুদয়ের আলোচনা করা সম্ভব নয় এবং তাহা আমার সাধ্যায়ত্তও নয়। তবে সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলা যায় যে, বিগত শতাব্দীতে জ্ঞানরাজ্যে দুইটি বিষয়ে অতি সুমহৎ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অতি স্থূলভাবে সেই দুইটির উল্লেখ করিব।

প্রথম, Evolution and Natural Selection-এর মতো। বাংলাতে বলা যায় বিবর্তন-প্রক্রিয়া ও স্বাভাবিক নির্বাচন প্রণালী। এই বিবর্তনবাদ যে কি তাহা বিজ্ঞানবিদ্ মাত্রেই জানেন। সকলেই জানেন, বিগত শতাব্দীতে মহাত্মা ডারউইন এই বিবর্তনবাদের আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমরা সকলেই জানি যে, জগতের সর্বত্রই জাতিভেদ বিদ্যমান আছে, কী জড়জগতে, কী উদ্ভিদ্‌রাজ্যে, কী প্রাণীজগতে, সর্বত্রই ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে, কোনো জাতির সহিত কোনো জাতির মিল নাই। নিম আম নয়, আম নিম নয়, এই দুই ভিন্ন জাতি! নিম কখনও আম হইতে পারে না, আম কখনও নিম হইতে পারে না। চিল ঘুঘু নয়, ঘুঘু চিল নয়, ইহারা বিভিন্ন জাতি, ইহারা পরস্পর মিলে না। এইরূপ দেখি, জগতের সর্বত্রই জাতিভেদ বিদ্যমান।

প্রাচীন কালের লোকের ধারণা ছিল যে, সৃষ্টির আদি হইতেই বিধাতা জাতিসকলকে পৃথক পৃথক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে পার্থক্য চিরদিন আছে, তাহা কিছুতেই ঘোচে না এবং সে পার্থক্য কোনওকালে ঘুচিবার নয়। কিন্তু বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে এবং তৎপূর্ব শতাব্দীর শেষ ভাগে জার্মানির ও ফ্রান্সের পণ্ডিতগণ জীবতত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া আর এই পুরাতন মতে সন্তোষলাভ করিতে পারিলেন না। বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর সৃষ্টির আদি কী এ বিষয়ে কেহ কেহ গবেষণা আরম্ভ করিলেন।

১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে রবার্ট চেম্বার্স নামে এক ব্যক্তি Vestiges of Creation নামে বহু চিন্তা ও গবেষণাপূর্ণ একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। তাহাতে তিনি এই আভাস দিলেন যে, এক অত্যাশ্চর্য বিবর্তন-প্রক্রিয়ার দ্বারা নানা জাতীয় জীব বিবর্তিত হইয়াছে। তিনি যে বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিলেন, সে বিষয়ে অগ্রসর হইয়া সুবিখ্যাত ডারউইন ও তাঁহার সমকালবর্তী মিস্টার ওয়ালেস বহু পরিশ্রম সহকারে প্রমাণ করিলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ এক মহা বিবর্তন প্রক্রিয়ার দ্বারা রূপান্তরিত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, এক জাতি হইতে নানা জাতীয় জীব বিবর্তিত হইয়াছে।

এই যে নিয়ম ইহাকে ক্রমবিকাশ বল, বিবর্তন প্রক্রিয়া বল, Evolution বল, সবই এক কথা। এই বিবর্তন প্রক্রিয়া যে কী তাহা কিছুদিন পূর্বে আমাদের একজন সুযোগ্য বক্তা একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা অতি সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আমিও সেই দৃষ্টান্তের পুনরুল্লেখ করিতে যাইতেছি।

সকলেই জানেন যে, শেয়ালকাঁটা নামে একপ্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার পাতায় কাঁটা আছে। এইরূপ পাতায় কাঁটা থাকার অর্থ এই যে, উদ্ভিদটি প্রাণীরা খাইতে পারিবে না। হয়ত আদিতে শেয়ালকাঁটার গায়ে কাঁটা ছিল না। শেয়ালকাঁটার বংশের যে সকল গাছ অদ্যাপি পাওয়া যায়, দেখা যায় যে, তাহাদের গায়ে কাঁটা নাই। তবে শেয়ালকাঁটার গায়ে কাঁটা জন্মিল কীরূপে? তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, এক সময়ে কোনো এক শেয়ালকাঁটা গাছের পাতার অগ্রভাগ সরু হইয়াছিল। উদ্ভিদাশী প্রাণীরা হয়ত সেই পাতা খাইতে আসিয়া দেখিল যে, পাতার ছুঁচলো অগ্রভাগ তাহাদের জিহ্বাতে ফুটিতে লাগিল। সুতরাং তাহারা আর তাহা খাইতে পারিল না। শেয়ালকাঁটা যেন ভাবিল, 'এত ভারি মজা! তবে তো পাতায় কাঁটা থাকা ভালো।' এই কাঁটা-সমন্বিত গাছ কাঁটার গুণে বাঁচিয়া গেল।

ফল কথা এই, কী জীব কী উদ্ভিদ আত্মরক্ষার্থে যেটা যার দরকার সেটা তাহার পক্ষে থাকিয়া যায়। অপর জীবের হস্ত হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য যে জীবের পক্ষে যেটা নিতান্ত প্রয়োজন হয় সেটা তাহাতে ফুটিয়া উঠে। কী রকম করিয়া প্রকাশ পায়, কী নিয়মে ফুটিয়া উঠে, তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা যায় না। কিন্তু দেখিতে পাই, বিধাতার অদ্ভুত বিধানে এই নির্বাচন-প্রক্রিয়া বিশ্বের সর্বত্র প্রতিনিয়ত চলিয়াছে। বিধাতা যেন

তাঁহার এই জগতে এই এক মহা নিয়ম করিয়া রাখিয়াছেন, 'যে যাহার আপনার যেরূপে পার সকলে আপনাকে রক্ষা করো।' তাই দেখি এ জগৎ যেন এক সুবিস্তীর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র। এখানে জীবের বাঁচিবার জন্য যেটি যার প্রয়োজন, সেটা আপনা আপনি তাহাতে প্রকাশ পায়, সেটা তাহাতে ফুটিয়া উঠে। সকলে ইহা হাসির কথা মনে করিতে পারেন যে, গাছ কি কখনও বুদ্ধি করিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে? কিন্তু সৃষ্টির সর্বত্র যেন এই নিয়ম দেখা যায় যে, কঠোর জীবন-সংগ্রামে যে আপনার বাঁচিবার উপায় করিয়া লইতে পারে, সেই এখানে বাঁচে, অন্যেরা মারা যায়। ইহার নাম Survival of the fit-test—অর্থাৎ এ ব্রহ্মাণ্ডে যোগ্যতমেরই স্থান হয়, সেই এখানে থাকিবে, অন্য সব নিধনপ্রাপ্ত হইবে, তাহাদের জন্য এ স্থান নয়।

এখন প্রশ্ন এই, বিধাতার এ কিরকম বিধান? এ জগতে যত প্রাণীর জন্ম হয় তাহার অধিকাংশই যদি এখানে থাকিবে না, তবে কেন তাহাদিগকে এখানে আনেন? তবে কেন তাহাদিগকে জন্ম দেন? কেন যে পাঠান, কেন যে দুই-চারিটি প্রাণীকে রাখিয়া বহুসংখ্যক প্রাণীকে মারিয়া ফেলেন, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মই এই দেখি যে, কতকগুলি জীব এ ব্রহ্মাণ্ডে বাঁচিয়া যাইবে, আর ওই অগণ্য প্রাণী আত্মরক্ষার্থে অসমর্থ হইয়া সবলের হাতে জীবন বিসর্জন করিবে। তবে কি তাহাদের জীবন বৃথা যায়?

একদিন এক উপদেশে আমি বলিয়াছিলাম যে, মানুষ যখন পাখিটিকে মারিবার জন্য বন্দুকে গুলি পোরে, তখন দেখি যে, একমুঠা গুলি তাহার মধ্যে দিল। কিন্তু পাখিটি যখন মরে, তখন একটি বা দুইটি গুলিতেই মরে। যদি সে বিংশতিটি গুলি বন্দুকের মধ্যে দিয়া থাকে, তবে তাহার একটি বা দুইটি গুলিতেই তাহার কাজ সম্পন্ন হইল, অপর অষ্টাদশটি বৃথা গেল। বন্দুকের ওই অবশিষ্ট আঠারোটি গুলি কি সম্পূর্ণ বৃথা যায়? কখনই না। সেই অষ্টাদশটি গুলি বন্দুকের মধ্যে থাকাতে সংঘর্ষণের প্রভাবে অপর দুইটির বলবৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা হইয়াছে। তাহারা ওই দুইটিকে বলশালী করিয়া দিবার জন্যই বন্দুকের ভিতরে থাকে। সেইরূপ ওই যে অগণ্য প্রাণী জগতে রহিয়াছে, উহারা সকলে যদি জগতে থাকিত, সকলে যদি বাঁচিয়া এখানে কাজ করিত, তবে অচিরকাল মধ্যে ভুবন ভরিয়া যাইত। অল্পসংখ্যক জীবকে বলশালী করিয়া দিবার জন্য এ ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য জীব জন্মিতেছে ও মরিতেছে। বিধাতার কী মহিমা, তাহা তিনিই জানেন। অজ্ঞ মানুষ তাঁহার উদ্দেশ্য কীরূপে বুঝিবে?

মিস্টার ওয়ালেস কিছুদিন পূর্বে Darwinism নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি এক অতি অদ্ভুত কথা বলিয়াছেন। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, এ জগতে যত প্রাণী জন্মে সব যদি বাঁচিয়া থাকিত তবে আর রক্ষা ছিল না। তিনি তাহাতে দেখাইয়াছেন যে, এ ব্রহ্মাণ্ডে এমন কত জীব আছে যাহারা লক্ষ লক্ষ ডিম পাড়ে, সেই

সকল ডিমের যদি ছানা হইত, আর সেই সব ছানা যদি বাঁচিয়া থাকিত, তবে একজাতীয় প্রাণীতেই পৃথিবী ভরিয়া যাইত। তিনি বলিয়াছেন যে, আমেরিকার অরণ্যে ঘুঘু জাতীয় এক প্রকার পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। সেই পক্ষীর এককালে একটির অধিক বাচ্চা হয় না, তাহাও আবার ছয় মাস অন্তর। সে অরণ্যে সর্বপ্রথমে হয়ত এক জোড়া পাখি আসিয়াছিল, কিন্তু কয়েক বৎসর পরে দেখা গেল যে, সেখানে এত পাখি জন্মিয়াছে যে এক মাইল দূর হইতে সেই পাখির ডাক শুনিতে পাওয়া যায় এবং তাহাদের আবাসবৃক্ষের তলে পাশাপাশি দুইজনে দাঁড়াইয়া কথা কহিলে পরস্পরের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না, তাহাদের সংখ্যা এত বাড়িয়াছে।

এইরূপ জগতে কত পাখি জন্মিতেছে, সব যদি বাঁচিয়া থাকিত তবে কি আর রক্ষা ছিল? সুতরাং অধিকাংশ প্রাণীই মরে। বর্ষাকালে অথবা রাস্তাঘাটে কত ভেকশিশু দেখিতে পাই, কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেক চারিদিকে লাফাইয়া বেড়াইতেছে, অন্যমনস্কভাবে পা বাড়াইতে গেলেই তাহাদিগকে মাড়াইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা। অথবা শ্রাবণ ভাদ্র মাসে গঙ্গার জলে চিতিকাঁকড়া নামে একজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুলীরক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সংখ্যা এত অধিক যে কলসি ডুবানো যায় না। কলসটি ডুবাইতে গেলেই তন্মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক কুলীরক প্রবেশ করে। কিন্তু এই সকল ভেকশিশু বা কুলীরক যায় কোথায়? ইহারা সকলে কি বাঁচিয়া থাকে? সকলগুলি জীবিত থাকিলে কি আমরা আর পা বাড়াইতে পারিতাম, অথবা গঙ্গাজলে অবগাহন করিতে পারিতাম? এই অগণ্য প্রাণীর মধ্যে অল্পসংখ্যক বাঁচে এবং বহুসংখ্যক বিধাতার ওই প্রাকৃতিক নিয়মে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। জীবনধারণের উপযোগী এমন সকল গুণ থাকা চাই যাহাতে জীব বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

এই বিবর্তনবাদ বিগত শতাব্দীর এক মহা আবিষ্কার। বিগত শতাব্দীতে এই মতটা সভ্যসমাজের মানবের চিন্তাতে প্রধান রূপে প্রবেশ করিয়াছে। এই নবাবিষ্কৃত সত্য এক্ষণে মানবীয় সর্ববিধ ব্যাপারে সর্ববিধ কার্যে প্রযুক্ত হইতেছে। এটি এক্ষণে মানবের বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, আইনে, ইতিহাসে, সমাজতত্ত্বে, ধর্মচিন্তায় সর্বত্র মহা বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে।

দ্বিতীয়, আর একটি বিষয় মানবের চিন্তাতে সুমহৎ পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। তাহারও কথা সকলে শুনিয়াছেন। তাহা Conservation of Energy। ইহাতে প্রমাণ করিতেছে যে, জগতে দুই চারি, দুই শত, পাঁচ শত শক্তি নাই। শক্তি এক এবং অবিনাশী, একই শক্তি ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দিকে, একই জ্ঞান সমস্ত পদার্থে। এই নিয়মে ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব স্থাপিত হইয়াছে। আগে যেখানে মানুষ পৃথক্ পৃথক্ শক্তি কল্পনা করিত, এখন দেখিতেছে, সেখানে এক ভিন্ন দুই শক্তি নাই। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে একই শক্তি, বিশ্বচরাচরে একই নিয়ম।

ওই তাপের আকারে যাহাকে দেখিতেছ, উহা বাস্তবিক তাপ নয়, উহা গতিরই আর

এক আকার মাত্র। ওই তাড়িৎ বলিয়া যাহাকে বলিতেছ, উহা আর কিছু নয় ; তাপই সেখানে আর-এক আকারে বাস করিতেছে। এইরূপে পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে, তাপ, গতি, শব্দ, আলোক, তাড়িৎ এ সকল একই শক্তির প্রকারান্তর মাত্র, এবং সে শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি নাই। যিনি যত ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বের গভীর হইতে গভীরতম প্রদেশে ডুবিয়াছেন, তিনি তত দেখিয়াছেন, সর্বত্র একই জ্ঞান এবং একই শক্তি। একটি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম পদার্থকে হাতে লইয়া তাহার বিষয়ে চিন্তা করো, দেখিবে তাহা ওই সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত বাঁধা। একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ধূলিকণার জ্ঞানকে যদি তুমি পূর্ণ করিতে চাও, তবে ওই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে তোমাকে জানিতে হইবে। এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড এক তারে বাঁধা রহিয়াছে, ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ পদার্থ এক শক্তি কর্তৃক বিধৃত হইয়া রহিয়াছে।

সমুদয় জ্ঞানের মধ্যে এই যে জগতে শক্তির একতা, ইহা বর্তমান সময়ে মানবের জ্ঞানে প্রবেশ করিয়া মহা পরিবর্তন সাধন করিতেছে।

বিগত শতাব্দীর বিবর্তনবাদের মতো বর্তমান সময়ে মানবের চিন্তাকে আশ্রয় করাতে পূর্বপ্রচলিত দুইটি মতে আঘাত পড়িয়াছে। প্রথম, আগেকার লোকের মত ছিল যে, বিধাতা সৃষ্টির প্রারম্ভে ভিন্ন ভিন্ন জীব এ জগতে সৃজন করিয়াছিলেন। ইহাকে ইংরেজিতে Special Creation বলে। এতক্ষণে লোকে বিশ্বাস করিতেছে যে, সমুদয় পদার্থ ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে বিবর্তিত হইয়া বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয়ত, ইহার দ্বারা আর একটি মতে গুরুতর আঘাত পড়িয়াছে। তাহাকে ইংরেজিতে বলা যায় Design argument, অর্থাৎ সৃষ্টিকৌশল দেখিয়া স্রষ্টার জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া। সেই সৃষ্টিকৌশলবাদ বলে যে, বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিশেষ বিশেষ পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। যথা, হরিণ দৌড়িবে বলিয়াই উহার পা সরু হইয়াছে। বিবর্তনবাদ এই প্রশ্ন তুলিয়াছে যে, জীবদেহ দেখিয়া যে মনে করিতেছ কোনো বিশেষ কার্য করিবার জন্য তাহার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই কি সত্য? না সেই কার্য করিয়া করিয়া তাহার দেহের গঠন ওইরূপ হইয়াছে, ইহাই সত্য? হরিণ দৌড়িবে বলিয়াই তাহার পা সরু হইয়াছে, না বহু পুরুষ ধরিয়া দৌড়িয়া দৌড়িয়া তাহার পদদ্বয় ওইরূপ হইয়াছে? বায়ু পাইবে বলিয়া হৃদ্‌যন্ত্র ওইভাবে নির্মিত হইয়াছে, ইহাই সত্য? না বায়ু পাইয়াছে বলিয়া হৃদ্‌যন্ত্র ওইরূপ হইয়াছে, ইহাই সত্য? এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টা সত্য?

আমরা এই নিয়ম দেখি যে, কোনো এক কার্য করিতে করিতে জীবের শক্তি বর্ধিত হইয়া থাকে। ক্রমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সেই ভাবে বর্ধিত হয়। আবার দেখি যে, ব্যবহারের অভাবে জীবের শক্তিহীন হইয়া যায়, বৃত্তিসকল নিস্তেজ হইয়া পড়ে। হাঁস, মুরগি প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষীর ডানা আছে, অথচ উড়িতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, বহুকাল পর্যন্ত না উড়িয়া উড়িয়া তাহাদের উড়িবার ক্ষমতা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ক্রমে হয়ত ওই সকল জাতি হইতে অপর কোনো জাতীয় পক্ষী হইবে যাহাদের ডানা থাকিবে না। মাডাগাস্কর

দ্বীপে একজাতীয় পতঙ্গ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণির ডানা আছে, অপর শ্রেণির ডানা নাই। তাহারা উভয়েই একবংশজাত, কিন্তু আকৃতি বিষয়ে বিভিন্ন। ইহার কারণ এই যে, এই জাতীয় পতঙ্গদের মধ্যে যাহারা সমুদ্রের উপকূলে বাস করিয়াছিল, তাহারা সাগর-তরঙ্গের শব্দে সর্বদা ইতস্তত উড়িয়া বেড়াইত; কিন্তু যাহারা সাগর হইতে দূরে অন্তঃপ্রদেশে বাস করিত, তাহারা প্রচুর শস্য পাইয়া নিরুপদ্রবে বসিয়া গিয়াছিল, উড়িবার প্রয়োজন ছিল না। ফলে ইহারা পক্ষহীন হইয়া গেল, অপরেরা পক্ষবান্ রহিয়া গেল।

প্রসঙ্গক্রমে একটি যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতেছে। এক্ষণে অনেকে একটি যুক্তি দেখান যে, মানুষ আমিষাশী। মানুষের intestine বা নাড়ীসকল এরূপভাবে নির্মিত যাহাতে সে মাংস ভক্ষণ করিতে পারে। তাহাতে আমি যদি বলি, মাংস খাইবার জন্য মানুষের নাড়ী ওরূপ হয় নাই, কিন্তু বংশপরম্পরাক্রমে মাংস খাইয়া মানুষের নাড়ীসকল ওইরূপ হইয়া গিয়াছে, তবে বোধ হয় কিছুই অন্যায় হয় না। ইহাতে আমি যদি বলি, আদিতে মানুষ মাংসভুক ছিল না, তবে অপর প্রাণীর মাংস খাইয়া খাইয়া মানুষ এক্ষণে সর্বভুক হইয়াছে, তবে কি কিছু অযৌক্তিক হয়?

সামাজিক বিষয়েও বিগত শতাব্দী সুমহৎ পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে, ঘোর বিপ্লবের সূচনা করিয়াছে।

প্রাচীনকালে সামাজিক জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল, স্বজাতি রক্ষা বা সামরিক প্রয়োজন। প্রাচীনকালে সমাজের ভিত্তি ছিল সমরকুশলতার উপরে। তখন জাতিতে জাতিতে সর্বদা বৈরনির্যাতন চলিত, জাতিতে জাতিতে সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহ হইত। সুতরাং সে কালের জাতিরা এক মুহূর্তের জন্যও সুস্থির থাকিতে পারিত না ; সর্বদা ভয়ে ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া থাকিতে হইত, কখন শত্রুরা আসিয়া আক্রমণ করে আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে বৈদিক সময়ে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। দেখা যায় যে, তখন ঘোর শত্রুতাগ্নি দেশের সর্বত্র প্রজ্বলিত ছিল। শত্রুকুলের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জাতি সকল সর্বদা এক স্থান হইতে অপর স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত।

এইরূপে দেখা যায়, প্রাচীন কালের অধিকাংশ জাতি যাযাবর অবস্থাতে বাস করিত। এই যাযাবর শব্দের অর্থ কী, তাহা সকলেই জানেন। শত্রুকুলের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এক-এক জাতি আপনাপন পশুযূথ লইয়া সর্বদা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহাদিগকে যাযাবর বলা হইত।

এই যাযাবর দল তখন সকল দেশেই ছিল। আরব-ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে, মহম্মদের সময় পর্যন্ত বহু বহু জাতি সেখানে যাযাবর অবস্থায় ছিল। মধ্য এশিয়াতে এখনও পর্যন্ত এই সকল যাযাবর দল বাস করিতেছে। তাহারা আপনাদের গো-মেষাদি লইয়া ভিন্ন ভিন্ন বাসস্থান নির্মাণ করিয়া সর্বদা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া

বেড়াইতেছে।

প্রত্যেক যাযাবর দলের উপরে একজন দলপতি বা নেতা থাকেন, যাঁহার আদেশের বশবর্তী হইয়া এই সকল যাযাবর দল কার্য করে। আদিমকালে এরূপ লোক নেতা হইত যাহারা সমরকুশলতায়, সাহসে, তেজস্বিতায় সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জাতিবিরোধ এবং সংগ্রামের সময় এই সকল নেতার উপদেশের অতিশয় প্রয়োজন হইত। সমাজমধ্যেও দেশ রক্ষার্থে সামর্থ্য ও সমরকুশলতা দেখিয়া মানুষের যোগ্যতার বিচার করা হইত।

প্রাচীন গ্রিস দেশে নিয়ম ছিল, যে-সকল বিকলাঙ্গ শিশু জন্মিবে তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে। যে-সকল শিশুর শারীরিক গঠন দেখিয়া মনে করা হইত যে, তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রধারণ করিতে সমর্থ হইবে না, দেশরক্ষার্থে সমর্থ হইবে না, অপর জাতির সহিত সংগ্রাম করিয়া স্বদেশ এবং স্বজাতির গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না, হয় তাহাদিগকে হত্যা করা হইত, অথবা নিকটবর্তী কোনো এক পর্বতের উপরে রাখিয়া দেওয়া হইত যেন তাহারা তথা হইতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যেমন আমাদের দেশে কোনো গৃহস্থের গৃহে একটি শিশু জন্মিলেই গৃহস্থ ভাবেন যে, সে বড়ো হইয়া কীরূপ চাকরি করিবে, কী পরিমাণে অর্থ উপার্জন করিবে, যেমন তিনি অপর সমুদয় গুণের কথা ভুলিয়া গিয়া পুত্রের সেই গুণের উপরেই অধিক দৃষ্টি রাখেন, তেমনই প্রাচীনকালের জাতিসকল সর্বাগ্রে দেখিত, শিশু সমরকুশল হইবে কী না, সে রণক্ষেত্রে অস্ত্র ধরিয়া দাঁড়াইতে পারিবে কী না। এই যে সামরিকভাব, ইহাই ছিল পুরাকালে সামাজিক জীবনের ভিত্তিভূমি। ইংরেজিতে বলিতে গেলে এই ভাবকে বলা যায় militarism, সামরিক প্রতিষ্ঠা।

সভ্যতার উন্নতি সহকারে এই সামরিক প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে আসিয়াছে ধনাগমের স্পৃহা। পূর্বে ছিল সমরকুশলতা, এক্ষণে আসিল ধনোপার্জনে দক্ষতা। এই যে বাষ্পযান, কলকারখানা, আইন-আদালত প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে, এ সকল কেবল ধনাগমের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য। এই যে ধন উপার্জনের প্রবৃত্তি, ইহাকে ইংরেজিতে বলা যায় industrialism অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠা। প্রথমে ছিল সামরিক প্রতিষ্ঠা, তৎপরে হইল আর্থিক প্রতিষ্ঠা।

যখন সমাজের প্রধান লক্ষ্যস্থলে সামরিক ভাব ছিল, যখন সমরকুশলতা সামাজিক জীবনের ভিত্তিস্থলে ছিল, তখন সমাজের শাসনের উপায় ছিল socialism বা সামাজিকতা। পূর্ণ বাধ্যতা না থাকিলে সামরিক শাসন থাকে না। সুতরাং যখন সামরিক ভাব সমাজের লক্ষ্যস্থলে তখন বাধ্যতা বা সামাজিকতা শাসনের প্রধান উপায়। পূর্বে সমগ্র জাতির মধ্যে একই আদর্শ, একই সামরিক ভাব বিদ্যমান ছিল, সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিকে একই নিয়মের অধীনে থাকিতে হইত। সেই জাতি, সেই দল বা সেই সকল অধিবাসীর মধ্যে যখনই কোনো বিষয়ে বিরোধ উৎপন্ন হইত, যখনই কোনও বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হইত, তখনই সমাজ বা পঞ্চায়েতের বা নেতৃস্বরূপ প্রধান পুরুষের

বাধ্যতা স্বীকার এবং উপদেশ গ্রহণ সামরিক ভাব-প্রধান সময়ের সমাজ মধ্যে শান্তিরক্ষার উপায়। সামরিক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সামাজিকতা, অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজের বাধ্য থাকিতে হইবে, কেহই স্ব-ইচ্ছাতে বর্ধিত হইতে পারিবে না, প্রত্যেকের গর্বকে খর্ব করিয়া একই ইচ্ছা এবং একই শাসনের অধীন হইতে হইবে, এই ভাব ছিল।

তৎপরে সামাজিক জীবনের লক্ষ্যস্থলে যখন আসিল আর্থিক প্রতিষ্ঠা বা ধনাগম, তখন সমাজ মধ্যে প্রধান ভাব হইল, ব্যক্তিত্বজ্ঞান বা ব্যক্তিগত অধিকারের প্রাধান্য। প্রত্যেকে আপনার প্রাপ্য অধিকার লাভ করিতে সমর্থ। মানুষ আপনার শক্তিকে নিয়োগ করিয়া, আপনার বুদ্ধিবৃত্তিকে খাটাইয়া যাহা উপার্জন করিবে এবং যাহা লাভ করিবে, তাহাতে তাহার পূর্ণ অধিকার; কাহারও সাধ্য নাই যে, মানুষকে তাহার প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করে। যে যুগে সামাজিক জীবনের ভিত্তিস্থলে আর্থিক প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতাই তখন তাহার প্রধান ভাব। কারণ এই যে, মানুষ যদি স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন করিয়া স্বাধীনভাবে তাহা ভোগ করিতে না পায়, তবে তার অর্থ উপার্জনের কোনো প্রয়াস থাকে না, তবে তার ধন উপার্জনের আর স্পৃহা থাকে না। সুতরাং ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই এ যুগের প্রধান ভাব। সমাজ-মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীন, প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় অধিকার লাভে সমর্থ। এই উৎকট ব্যক্তিত্ব ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই বাণী প্রচার হইয়াছে, 'যে যার আপনার সকলে আপনাকে সামলাইয়া লও।'

সমাজ-মধ্যে এই ঘোর পরিবর্তন আসাতে এই এক মহা অনিষ্ট ফল হইয়াছে যে, এখন সকলেই আপনাপন সুখসুবিধা লইয়া ব্যস্ত। এখন আর কেহই অপরের দিকে তাকাইতে চায় না। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। ইহাতে গরিবদের প্রাণ যাইবার উপক্রম হইতেছে। তাহাদের উপরে দিন দিন দুরন্ত অত্যাচার হইতেছে। তাহাদের এমন সাধ্য নাই যে, তাহারা বলপূর্বক আপনাদের স্বত্ব আদায় করিয়া লইবে, তাহাদের এমন ক্ষমতা নাই, জোর করিয়া আপনাদের প্রাপ্য অধিকারকে রক্ষা করিবে। সুতরাং ধনীদের প্রাপ্য অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া প্রকারান্তরে দিন দিন তাহাদিগকে ঘোরতর দাসত্বে পরিণত করা হইতেছে। তাহারা এমন শক্তিশালী নয় যে ধনীর গ্রাস হইতে আপনাদের অধিকারকে রক্ষা করিবে। সুতরাং ধনীর দ্বারে দাসখত লিখিয়া দিয়া তাহারা আপনাদের স্বাধীনতা বিক্রয় করিতেছে। তাহারা ১৮ ঘণ্টা খাটিয়াও সুখে দিনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিতেছে না। দিনরাত ধনীর দাসত্ব করিয়াও শ্রমের অন্ন সুখে আহার করিতে পারিতেছে না।

যদি বল, 'খাট কেন? তোমাদের তো কেউ জোর করিয়া খাটায় না ; তোমরা খাটিতে না আসিলেই পার', তাহার উত্তর এই যে, পেটের দায়ে, ক্ষুধার তাড়নায়, দারিদ্র্যের যাতনায় মানুষ বাধ্য হইয়া গুরুতর শ্রম করে। না খাটিলে পরিবার না খাইয়া মারা যায়, স্ত্রীপুত্র অসহনীয় ক্লেশ ভোগ করে, সেই কারণে তাহারা প্রাণভয় না রাখিয়া খাটিতে

আসে। আর ধনীরা তাহারই সুবিধা লইয়া তাহাদের গলায় পা দিয়া কাজ আদায় করে।

দরিদ্রেরা দিনরাত পরিশ্রম করিয়াও ধন রাখিতে পারিতেছে না। যাহা উপার্জন করিতেছে, তাহাতে তাহাদের ভরণপোষণ সুচারু রূপে নির্বাহ হইতেছে না। তাহার ফল বিষময় হইতেছে। এইজন্য ইহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ ওই পুরাতন socialism বা সামাজিকতা দেখা দিতেছে। ব্যক্তিগত প্রাধান্য অতিরিক্ত মাত্রাতে যাওয়াতে পুরাতন সামাজিকতা ও বাধ্যতা আবার মাথা তুলিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

সুতরাং বর্তমানে আমরা দেখিতেছি যে, পুরাতন সামরিক প্রতিষ্ঠা আবার imperialism বা সাম্রাজ্যস্পৃহা নাম ধরিয়া মাথা তুলিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। আগে যেমন বলিয়া আসিয়াছি যে, প্রাচীন সময়ে সামাজিক জীবনের কেন্দ্রস্থলে ছিল সমরকুশলতা, এখন আমরা দেখিতেছি সেই ভাবই আবার সমাজে প্রবেশ করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। কিন্তু তাহার দিন অবসান হইয়াছে।

পূর্বোক্ত উভয় ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে আজকাল দেখিতেছি আর একটা ভাব আসিয়া সামাজিক জীবনের ভিত্তিকে অধিকার করিয়াছে। তাহাকে সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলা যায় পূর্ণতা লাভ বা perfection। অতিরিক্ত ব্যক্তিত্ব দোষে দূষিত আর্থিক প্রতিষ্ঠাকে ঘৃণা করিয়া সভ্যজগতের লোক এখন আর এক নূতন পথ অবলম্বন করিবার উদ্যোগ করিতেছে। তাহা এই যে, মানবের সামাজিক জীবনের লক্ষ্য পূর্ণতা প্রাপ্তি বা Perfection। এইটিই নব সামাজিক আকাঙ্ক্ষা। ইহাকে বলে এই যে, মানুষ যতই সামান্য হউক না কেন, মানুষ যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, উন্নতির পথ সকলের জন্য প্রসারিত আছে। মানুষ ধনী হউক আর দরিদ্র হউক, পুরুষ হউক আর নারী হউক, তাহার প্রকৃতিতে যাহা আছে, তাহার পূর্ণতা লাভ, জ্ঞানে গুণে উন্নতি সাধন করা সকলেরই সাধ্যায়ত্ত ও সকলেরই অধিকার।

এই নব আকাঙ্ক্ষা সভ্য জাতিসকলের হৃদয়ে জাগিয়া দরিদ্রদিগের জন্য জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছে, মনুষ্যত্ব লাভের উপায় সকল শ্রেণির নরনারীর হাতের নিকট আনিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা এই নবযুগের এক প্রধান লক্ষণ। মানব জীবনের পূর্ণতার ভাব মনে আসাতে বর্তমান সময়ে ধনীর জন্য জ্ঞানের দ্বার যেমন উন্মুক্ত, গরিবের জন্যও তেমনি উন্মুক্ত হইতেছে। জ্ঞানের কাছে ধনী দরিদ্রের ভেদ নাই। অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য উন্নতির পথ দরিদ্রের অপেক্ষা হয়ত কিছু সুগম ; কিন্তু এ কথা সত্য যে, আমার উন্নতির পথ কেহ রোধ করিতে পারিবে না। মনুষ্যসাধারণের নিকট জ্ঞানসম্পত্তি এক। এই যে democratic ভাব যাহাতে গরিব এবং ধনীকে এক করিয়া দিতেছে, ইহা হইতে আমরা এক্ষণে দেখিতেছি যে, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি সভ্য দেশসমূহে গরিবদের জন্য বড়ো বড়ো পার্ক খুলিয়া দেওয়া হইতেছে, তাহাদের জন্য বড়ো বড়ো চিত্রশালিকার দ্বার উন্মুক্ত করা হইতেছে, জ্ঞানের দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত রাখা হইতেছে।

এই নূতন ভাব বর্তমান সময়ে সামাজিক জীবনের একটি প্রধান শক্তি হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং বোধ হইতেছে যে, ভবিষ্যতে এইটিই সর্বত্র প্রধান ভাব হইয়া দাঁড়াইবে। এতএব দেখিতেছি যে, নবযুগে মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে ছুটিতেছে।

বিগত শতাব্দীতে যেমন বাহ্যিক ব্যাপারে, জ্ঞান-রাজ্যে ও সামাজিক জীবনে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তেমনই আবার ধর্ম সম্বন্ধেও সুমহৎ পরিবর্তন দৃষ্ট হইয়াছে। ধর্ম সম্বন্ধে এক্ষণে পৃথিবীর জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মনের ভাবের অনেক পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। পূর্বে তাঁহারা ধর্মকে চিন্তা বা গবেষণার বিষয় বলিয়া মনে করিতেন না। তখন তাঁহারা ধর্মকে সম্পূর্ণ উপেক্ষার চক্ষেই দেখিতেন। কিন্তু কিছুকাল পূর্ব হইতে তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন যে, মানবের বিষয়-বাণিজ্য, আইন-আদালত প্রভৃতির ন্যায় ধর্মও একটি স্বাভাবিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফল।

বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে এবং তৎপূর্ব শতাব্দীর শেষ ভাগে পৃথিবীর জ্ঞানিগণ এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, ধর্ম সুবুদ্ধি রচনা বা প্রবঞ্চক পুরোহিতদিগের রচিত জাল মাত্র। তখন তাঁহারা ভাবিতেন যে, সাধারণ লোকদিগকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য প্রবঞ্চক পুরোহিতগণ ধর্ম নামে একটা মিথ্যা প্রবঞ্চনার জাল পাতিয়াছে। তৎপর এ ভাব পরিবর্তিত হইয়া গিয়া আর এক ভাব আসিল।

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে জগতের জ্ঞানিগণ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ অনুভব করিতে লাগিলেন যে, ধর্ম বাস্তবিক প্রবঞ্চক পুরোহিতগণের প্রবঞ্চনার জাল নয়, কিন্তু উহা বিকৃত মানব-কল্পনা-প্রসূত অথবা উত্তেজিত মস্তিষ্ক-প্রসূত। অর্থাৎ মানুষ যেমন ডাইনে বিশ্বাস করে, তেমনই ধর্মে বিশ্বাস করে। পৃথিবীর অজ্ঞ ও দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিরাই তাহাদের বিকৃত মস্তিষ্ক হইতে ধর্ম নামে একটা জিনিস উৎপন্ন করিয়াছে। এই ভাব যখন জ্ঞানিগণের মনে আসিল তখন তাঁহারা ভাবিলেন, ইহা সবলচিত্ত ব্যক্তিদিগের জন্য নয়, দুর্বল অজ্ঞ লোকদিগের জন্যই ধর্মের প্রয়োজন। তখন তাঁহারা মনে করিলেন যে, স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকাদিগের জন্যই ধর্মের প্রয়োজন, জ্ঞানীদের জন্য নয়।

এই ভাব যখন প্রাণে আসিল তখন ধার্মিকগণ অবজ্ঞার পাত্র হইলেন, এবং পণ্ডিতগণ ধর্মকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে চাহিলেন। পণ্ডিতেরা ভাবিলেন যে, ধর্ম হইল Superstition অর্থাৎ কুসংস্কার। এইজন্য একটা চলিত কথা আছে যে, Religion আর Superstition দুইই এক জিনিস, তবে Superstition is Religion out of fashion, and Religion is Superstition in fashion—দুইই কুসংস্কার।

তৎপর বিগত শতাব্দীতে এ ভাবও পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে মানুষ বিবেচনা করিতেছে যে, যেমন মানুষের অপরাপর বিষয়—রাজকার্য, বিষয়-বাণিজ্য, আইন-আদালত প্রভৃতি বিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে, সেইরূপ মানুষের ধর্মভাবও বিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে। ধর্মকে বিবর্তনের ফলস্বরূপ দেখা যাইতেছে বলিয়া ইহা এক্ষণে পণ্ডিতমণ্ডলীর গবেষণা ও আলোচনার বিষয় হইয়াছে। এক্ষণে দেখিতেছি যে, পৃথিবীতে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ যাঁহারা,

তাঁহারাও ধর্মের উন্নতির ক্রম ও বিকাশ প্রণালীর আলোচনাতে নিযুক্ত হইয়াছেন। মহাত্মা হার্বার্ট স্পেন্সার-এর ন্যায় ব্যক্তিও এক্ষণে ধর্মের উন্নতি ও বিকাশের ক্রম পর্যালোচনা করিতেছেন। দেখিতেছি, পৃথিবীর সমুদয় জ্ঞানী-মহাজনেরা আগ্রহ সহকারে ধর্মের ইতিবৃত্ত পাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এই তো গেল বাহিরের জ্ঞানীদিগের ভাব, জগতের ধর্মসকলের ভিতরকার লোকদিগের ভাবেরও সমূহ পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

প্রথম, ধর্মের সার্বভৌমিকতা।

আদিকালে এক এক জাতি আপন আপন ইষ্টদেবতাকে উচ্চ করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে। যেমন পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, সে কালে এক একটি যাযাবর জাতির উপরে এক একজন নেতা বা দলপতি থাকিতেন, সেইরূপ পূর্বকালে পৃথিবীর অধিকাংশ জাতি এক-এক ক্ষুদ্র ইষ্টদেবতার কল্পনা করিয়া তাহারই পূজা করিত ; এবং এরূপ বিশ্বাস করিত যে, সে ইষ্টদেবতা অপর সকল ইষ্টদেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ। যেমন পুরাতন ইহুদি জাতির ইষ্টদেবতা ছিলেন জাভে, পুরাতন হিন্দু জাতির ইষ্টদেবতা ছিলেন ইন্দ্র। ইহুদিরা ভাবিতেন, জাভে সকল দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ; আর্যগণ ভাবিতেন, ইন্দ্রের ন্যায় দেবতা নাই। যে জাতির যে ইষ্টদেবতা, তদ্‌ভিন্ন অপর সকলকে তাহারা বিদ্বেষের চক্ষে দেখিত ও উপহাস করিত। জাতিতে জাতিতে যেমন রাজ্য লইয়া বিরোধ ছিল, তেমনি স্বীয় স্বীয় অভীষ্ট দেবতা লইয়াও বিরোধ ছিল। জাতীয় শত্রু যাহারা তাহারা ইষ্টদেবতাগণেরও শত্রু ছিল। কেবল যে আর্যগণ অনার্যদিগকে দ্বেষ করিতেন তাহা নহে, ইন্দ্রও তাহাদিগকে দ্বেষ করিতেন। মানুষ বন্ধুতার সচরাচর এই নির্দশন দেখে যে, যিনি আমার বন্ধু তিনি আমার বন্ধুদিগকে প্রীতি করিবেন ও আমার শত্রুদিগকে দ্বেষ করিবেন, তাহা না হইলে আমার বন্ধু কী? প্রাচীন জাতিসকল স্বীয় স্বীয় ইষ্টদেবতার প্রতিও এই বন্ধুতার ভাব আরোপ করিয়াছিল। ইহা হইতেই সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি হইয়াছিল।

প্রাচীনকালের প্রত্যেক জাতি ভাবিয়াছে, ঈশ্বর যেন তাহাদের উপর বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন, আর অপর সকলকে বর্জন করিয়াছেন। এই ভাব হইতে তাহাদের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, যাহা কিছু ভালো তাহাই বিধাতা কৃপা করিয়া তাহাদিগের মধ্যে রাখিয়াছেন, আর সকলকে তিনি সে কৃপাতে বঞ্চিত করিয়াছেন। তাহারা ভাবিত যে, আমাদের স্বর্গ উত্তম, আমাদের ধর্ম উত্তম, এবং ধর্ম আমাদের একচেটিয়া। এই মত হইতে ভারতের হিন্দুরা ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহারা ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত, আর ম্লেচ্ছেরা তাঁহার বর্জিত। ইহুদিরা ভাবিয়াছিলেন যে, যত কিছু ভালো কথা, যাহা কিছু ভাল জিনিস, সে সকল ভগবান্ তাঁহাদিগের মধ্যে রাখিয়াছেন, আর জেন্টাইলদিগকে তৎসমুদয় হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বী যাঁহারা তাঁহারা ভাবিতেন, পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে বিশেষ কৃপা করিয়াছেন, আর কাফেরদিগকে তিনি দেখিতে পারেন না। প্রাচীন গ্রিকেরা

ভাবিতেন যে, ধর্মের সমুদয় সার কথা ভগবান্ তাঁহাদিগকে জানিতে দিয়াছেন, আর বার্বেরিয়ানদিগকে তৎসমুদয় হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন।

বিগত শতাব্দীতে উক্ত মত পরিবর্তিত হইয়া এই মত প্রচারিত হইয়াছে যে, ধর্মের বিকাশ ও উন্নতি সকল জাতি মধ্যেই ঘটিয়াছে। এখন আর মানুষ ভাবিতে পারে না যে, গুটিকতক বিশেষ কৃপালব্ধ মানুষের মধ্যে ভগবান সকল সার কথা নিহিত রাখিয়াছেন। এখন মানুষ অনিবার্যরূপে অনুভব করিতেছেন যে, বিধাতা সর্বজাতি মধ্যেই আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। ঈশ্বরের অভিব্যক্তি কোনো দেশ বা জাতিবিশেষের বিশেষ সম্পত্তি নহে। জগতের ধর্মসকল অহংকারে প্রত্যেকে যতই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠুক না কেন, সকলেই এক নিয়মের অধীন। মানব জাতি এক্ষণে অনুভব করিতেছে যে, ঈশ্বরের অভিব্যক্তি. যে ঈশ্বর সেই প্রাচীনকালে আর্য ঋষিগণের প্রাণে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহাদিগকে শুভবুদ্ধি বিধান করিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরই এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমাদের মধ্যে বাস করিয়া বর্তমান জ্ঞানবিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। মানুষ এখন ইতিহাসে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, জড়ে, চেতনে সর্বত্র একই সত্তার বিদ্যমানতা অনুভব করিতেছে।

বর্তমান যুগের আর একটি লক্ষণ ব্রহ্মাণ্ডের একতা জ্ঞান। এই একত্বের জ্ঞান এখন মানব চিন্তাতে ফুটিয়াছে, একই শক্তিকে এখন মানব জাতি বিভিন্ন আকারে দেখিতে শিখিয়াছে। এখন কি আর ঈশ্বরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখা সম্ভব? আর কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিতে মানবের মন সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? আর কি পরিমিত ক্ষুদ্র পদার্থ লইয়া মানব-চিত্ত পরিতৃপ্ত হইতে পারে? আর এ ব্রহ্মাণ্ডে দুই দশ বিশ বা ততোধিক শক্তি কল্পনা করিয়া মানবের মন তৃপ্ত হইতে পারে না। ওই শুন,এক অনন্ত অখণ্ড বস্তুকে লক্ষ করিয়া মানবের স্তুতি উঠিতেছে। ওই দেখ, সেই মহা একেরই অভিমুখে মানবের চিন্তা ছুটিতেছে। কেবল যে জড়জগতে মানুষ তাঁহাকে এক বলিয়া দেখিতেছে তাহা নয়। মানব ইতিবৃত্তে, আইন-আদালতে, বিষয়-বাণিজ্যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, মানবের চিন্তাজগতে, ভাবের আদানপ্রদানে, মানবের ধর্মভাবে সর্বত্রই মানুষ তাঁহাকে এক বলিয়া দেখিতেছে, সর্বত্রই মানুষ দেখিতেছে যে, মণিসকল যেমন সূত্রে বদ্ধ থাকে তেমনি একই সূত্রে সমুদয় বাঁধা রহিয়াছে।

বর্তমান যুগের আর-একটি ভাব মানব জাতির একত্ব-জ্ঞান। নরতত্ত্বের যতই আলোচনা হইতেছে, মানব-ইতিবৃত্তের যতই অনুশীলন হইতেছে, ততই মানব জাতি দেখিতেছে যে, মানব যেখানেই থাকুক, যে ভাবেই থাকুক, একপরিবারভুক্ত, একই বিবর্তন প্রক্রিয়ার অধীন। মানবের উন্নতির ক্রম সর্বত্রই এক। ওই নগ্নকায় আন্দামান দ্বীপবাসী বর্বর মানুষের উন্নতির ক্রমও যেরূপ, ওই জ্ঞানবিজ্ঞানে সমুন্নত সুসভ্য ইংরাজের উন্নতির ক্রমও ঠিক তদ্রূপ। ওই সুসভ্য ইংরাজ এক সময়ে ওই অসভ্য বর্বর মানুষের ন্যায় নগ্ন

দেহে ছিল।

সুতরাং প্রাচীনকালে ধর্মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল প্রাচীর ছিল, ধর্মের সংকীর্ণ যে সকল সীমা ছিল, তাহা জগৎ হইতে তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। যে ইন্দ্র একদিন আর্যদের দেবতা ছিলেন এবং অনার্যদের উপরে কোপ বর্ষণ করিতেন, সেই ইন্দ্র গগন হইতে অন্তর্হিত হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। যে জাভে একদিন ইহুদি জাতির উপাস্য ছিলেন আর সকলকে ঘৃণা করিতেন, সে জাভে মানবসমাজ হইতে জন্মের মতো বিদায় লইয়াছেন। যত কিছু সংকীর্ণতা জগতে ছিল, যত কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈশ্বর জগতে ছিলেন, মানবের একত্ব জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তৎসমুদয় কোথায় চলিয়া যাইতেছে। এখন আর ঈশ্বরকে ক্ষুদ্র করিয়া দেখা সম্ভব নয়। এখন ধর্মের সমুদয় সংকীর্ণতা জগৎ হইতে উঠিয়া যাইতেছে, সমুদয় ক্ষুদ্রতার প্রাচীর ভগ্ন হইয়া যাইতেছে। এ সকল ভাঙিয়া গিয়া এখন এক অনন্ত মহান পরমেশ্বর মানব জ্ঞানে উথলিয়া উঠিতেছেন।

মানবজাতি এক্ষণে অনুভব করিতেছে যে, সকলেই এক বিশাল মানবপরিবারের সন্তান, পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বর সমুদয় মানবজাতির সাধারণ পিতামাতা, এই মেদিনী তাহাদের সাধারণ বাসগৃহ, আর তাহাদের অগ্রজ ভাই জগতের সকল দেশের ও সকল কালের সাধু মহাজনগণ। এই সার্বভৌমিকতার ভাব, ধর্মের এই মহৎ ভাব, ইহা নবযুগের এক সুমহৎ পরিবর্তন রূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি।

দুই প্রকারে এই একত্ব প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে। প্রথম, Ethnological Studies - এ জগতের বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন সমাজের উত্থান এবং উন্নতির ক্রম মানুষ এখন পাঠ করিতেছে। তৎসমুদয়ের আলোচনা করিয়া মানুষ দেখিতেছে যে, মূলে মানব জাতি এক। তৎপরে দ্বিতীয় আর-এক কারণ এই একত্বের ভাবকে বর্ধিত করিতেছে। বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্রসকল এক্ষণে মনোযোগ সহকারে পঠিত হইয়াছে। Sacred Books of the East প্রকাশিত হইয়া মানুষের একত্বের জ্ঞানকে ফুটাইয়া তুলিতেছে। এ সকল মানুষ যতই পাঠ করিতেছে ততই দেখিতেছে যে, একই ধর্মভাব, একই ধর্মচিন্তা একই প্রণালী অনুসারে মানব মনে ফুটিয়াছে। ধর্মের এই সার্বভৌমিক ভাব, এই উদার মহৎ ভাব মানবের জ্ঞানে ফুটিয়া এক মহা পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে।

তৎপরে দ্বিতীয় ভাব দেখি ধর্মের স্বাধীনতা। এ বিষয়েও বিবর্তনের ক্রম আছে। বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে ও তৎপূর্ব শতাব্দীতে ধর্ম ছিল গুরুপুরোহিতের অধীন। ইউরোপের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, সেখানে ধর্ম ছিল পোপের অধীন। কেবল যে ইউরোপেই এইরূপ অধীনতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই নহে, আমাদের দেশেও পূর্বে ধর্ম ছিল ব্রাহ্মণদিগের অধীন। ইউরোপের ধর্মাচার্যগণের ন্যায় এখানেও তাঁহারা ছিলেন ধর্মের রক্ষক। সমুদয় সত্য ঈশ্বর যেন তাঁহাদের হাতে রাখিয়াছিলেন। ধর্ম পাইতে হইলে ওই ব্রাহ্মণদের শরণাপন্ন হইতে হইত।

তৎপরে এ ভাব পরিবর্তিত হইয়া আর এক ভাব এই আসিল যে, ধর্ম কতকগুলি মতের ও শাস্ত্রের অধীন। ইউরোপে দেখা যায় যে, মার্টিন লুথারের সংস্কারের প্রভাবে যখন পোপের অধীনতা হইতে ধর্মকে উদ্ধার করা হইল, তখন ধর্ম বিশেষ গ্রন্থ এবং বিশেষ মতের মধ্যে আবদ্ধ হইল। তৎসমুদয়কে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম থাকিতে পারে না। এককালে যেমন মানুষ মনে করিত যে, গুরু ও পুরোহিতগণকে ছাড়িয়া ধর্মের থাকা সম্ভব নয়, তেমনই আর এক সময়ে মানুষ মনে করিতে লাগিল যে, বিশেষ গ্রন্থ ও শাস্ত্রসংগত কতকগুলি মতই ধর্মের প্রধান অঙ্গ।

এই মতপ্রধান ধর্মভাব এখনও খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন মানুষ এখনও বিদ্যমান আছেন, যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, যীশু সশরীরে আবার অবতীর্ণ হইবেন, যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, স্বর্গ ও নরক এ-সকলকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম থাকিতে পারে না, বাইবেলকে অস্বীকার করিয়া মানুষের ধার্মিক হওয়া সম্ভব নয়।

তেমনি আমাদের দেশেও এক সময় লোকে ভাবিত, এখনও বহু বহুসংখ্যক লোকে ভাবে যে, বেদকে ও বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপকে ত্যাগ করিয়া ধর্ম থাকিতে পারে না। সুতরাং বর্ণাশ্রমকে পরিত্যাগ করিয়া, জাতিভেদ না মানিয়া ধর্ম যে আবার থাকিতে পারে, তাহা আমাদের দেশের লোক ধারণাই করিতে পারে না। মানুষ যে ভাবের মধ্যে বর্ধিত হয়, গুরুজনদিগের উপদেশে যেটা সর্বদা শুনিতে পায়, সেটাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে বড়ো কম লোকই পারে। আমাদের দেশে বহুকাল ধরিয়া স্ত্রীলোকদিগকে অবরোধের মধ্যে রাখাতে মানুষ বালককাল হইতে নারীজাতিকে অবরোধে দেখিয়া দেখিয়া এই বিশ্বাসে বর্ধিত হয়, যেন নারীগণ অবরোধে অবরুদ্ধ না থাকিলে সমাজ থাকিতে পারে না। মানবের বদ্ধমূল সংস্কারের এমনি শক্তি।

মহাত্মা রামমোহন রায় ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে বাইবেল হইতে কতকগুলি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া Percepts of Jesus নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি যীশুর অলৌকিক ক্রিয়ার অংশগুলি বাদ দিয়া তাঁহার উপদেশগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাতে মার্শম্যান প্রমুখ শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ তাঁহার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় বাইবেলের বিশুদ্ধ সত্যসকলকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এখন আমরা দেখিতেছি যে, খ্রিস্টীয় সমাজ হইতে দিনদিন পূর্বপ্রচারিত মতগুলি তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। এখন খ্রিস্টীয় মণ্ডলী যীশুর আধ্যাত্মিক ভাবের উপরেই অধিক মনোযোগ দিতেছেন। এখন আমরা দেখিতেছি যে, তাঁহারা বাইবেলের অনেক মত বর্জন করিয়া সার সত্য সকল জনসমাজে প্রচার করিতেছেন। কিছুদিন পূর্বে আমাদের দেশের ভূতপূর্ব গবর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহার নাম Teachings of Jesus in his own words। তাহাতে তিনি বাইবেল হইতে যীশুর

উপদেশসকল সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সেই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

আমরা দেখিতেছি, ধর্ম ক্রমে গুরু, পুরোহিত, আচার্য, গ্রন্থ, শাস্ত্র, মত এ সকলের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীনভাব ধারণ করিতেছে। অতএব ধর্মের স্বাধীনতা এ যুগের একটি প্রধান লক্ষণ।

তৃতীয়ত, ধর্মের আধ্যাত্মিকতা। ইহা নবযুগের তৃতীয় লক্ষণ।

এ বিষয়েও ধর্মের বিবর্তনের ক্রম আছে। সর্বাগ্রে ছিল ধর্ম ক্রিয়াকাণ্ডের অধীন। সেগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম থাকিতে পারে না। এখনও পর্যন্ত প্রাচীনেরা মনে করেন যে, ধার্মিক হইতে হইলে কতকগুলি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতে হয়, ধর্ম কতকগুলি বাহ্যিক নিয়মপালনের উপর নির্ভর করে। কিন্তু নবযুগে ক্রিয়াকলাপের ধর্ম হইতে চক্ষু তুলিয়া মানুষ আধ্যাত্মিক ধর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে।

আধ্যাত্মিক ধর্মের প্রধান ভাব এই, মানব জীবনের উপরে যে ধর্ম, নিয়ম নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে, যে মহা ধর্ম-নিয়মের দ্বারা মানব জীবন শাসিত হইতেছে, তাহার অধীন হওয়াই ধর্মের প্রধান সাধন। জগতের মহাপুরুষগণ চিরদিন যে কথা প্রচার করিয়া আসিতেছেন, এই নবযুগে আমরা সেই কথারই সাক্ষ্য পাইতেছি। মহাপুরুষদিগের উক্তিসকল মনোযোগপূর্বক পাঠ করিলে দেখি, তাহারও ভিতরকার কথা এই। মানব প্রকৃতির অন্তরালে যে শাসনশক্তি রহিয়াছে, যাহা জনসমাজকে ভাঙিয়া যাইতে দেয় না, সেই যে ধর্মশাসন, তাহাকে সত্য বলিয়া অনুভব করা, এবং তাহার হাতে আত্মসমর্পণ করার নামই ধর্ম! যীশু, বুদ্ধ, মহম্মদ প্রমুখ সকল মহাজনই এই এক কথা বলিয়াছেন। সকলেই দেখি দুইটি মাত্র সত্য মানব-সমাজে প্রচার করিয়াছেন। প্রথম তাঁহারা বলিলেন, 'হে মানুষ, তোমার জীবনের পশ্চাতে যে ধর্মশাসন বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তাহাকে সত্য বলিয়া দর্শন করো।' দ্বিতীয় কথা এই বলিলেন যে, 'আত্ম-বিলোপ করিয়া সেই শক্তির হস্তে তুমি আপনাকে সমর্পণ করো।' সকল সাধুই এই দুই কথা বলিয়াছেন।

ধর্মের এই যে মহান্ আদর্শ, এই আদর্শকে সকল সাধুই প্রাণে ধরিয়াছিলেন। যীশু ইহাকে বলিয়াছিলেন 'Kingdom of God' বুদ্ধ ইহাকে বলিয়াছিলেন 'ধর্ম', মহম্মদ বলিয়াছিলেন, 'আল্লা হো আকবর'। সকলেরই এক কথা, 'তোমরা আপনাকে ভুলিয়া যাও, বাসনাকে বিনাশ করো, আপনাকে সংযত করিয়া জগতের অন্তরালবর্তী ওই ধর্ম-নিয়মের অধীন হও।' কীরূপে অধীন হইবে? বুদ্ধ বলিলেন, 'যোগের দ্বারা তোমরা বাসনার বিনাশ করো, করিয়া জ্ঞানযোগে তাঁহার সহিত যুক্ত হও।' যীশু বলিলেন, 'প্রেমের দ্বারা; প্রেমেতে তোমরা তাঁহার অধীন হও।' এই প্রেমের ভাবে দেখিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। মহম্মদ বলিলেন, 'ভয়ের দ্বারা; ভয়েতে তোমরা তাঁহার অধীন হও, না যদি হও তবে ঘোর নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইবে, যাইবে কোথায়?'

এই আত্মসমর্পণমূলক আধ্যাত্মিক ভাব নবযুগে ধর্মের মধ্যে ফুটিতেছে। ক্রিয়াবহুল ধর্মের পরিবর্তে প্রীতিপ্রধান ও নীতিপ্রধান ধর্মের অভ্যুদয় হইতেছে।

নবযুগে ধর্মের চতুর্থ ভাব মানব-হিতৈষণা।

অগ্রে মানুষের ধারণা ছিল, মানব-প্রকৃতি ও মানব-সমাজ ধর্মের বিরোধী ; ধর্ম লাভ করিতে হইলে এতদুভয়কে ঘৃণা করিয়া ও বর্জন করিয়া অরণ্যে যাইতে হয়। এ ভাব যে কেবল আমাদের দেশেই ছিল তাহা নহে। খ্রিস্টীয় ধর্মের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেখানেও পূর্বে মানুষ মনে করিত যে, এই শরীর ধর্মলাভের পক্ষে এক মহা অন্তরায় ; ধর্মলাভ করিতে হইলে ইহাকে নিগ্রহ করা আবশ্যক, ইহাকে সাজা দেওয়া প্রয়োজন। আত্মা ঈশ্বরের কেল্লা, শরীর শয়তানের কেল্লা, শরীরকে সাজা না দিলে মানুষ প্রকৃত ধর্ম লাভ করিতে পারে না। অতএব এই শরীরকে সাজা দাও, মনকে ক্লেশ দাও, জনসমাজ হইতে ইহাকে দূরে লইয়া যাও ; সহজে যদি না যাইতে চায়, তবে বলপূর্বক ছিঁড়িয়া লইয়া যাও। এই যে মানব-প্রকৃতির প্রতি ঘৃণা, ইহা আমাদের দেশে এক আকারে ফুটিয়াছে, আর পশ্চিম দেশে আর এক আকারে ফুটিয়াছে।

আমাদের দেশে অদ্বৈতবাদ বহুলপরিমাণে প্রচার হওয়াতে এই ভাব অতিরিক্ত মাত্রায় এ দেশের লোকের মনে প্রবেশ করিয়াছে। অদ্বৈতবাদ মানব-প্রকৃতি ও মানব-জীবনকে কুৎসিত করিয়া দিয়াছে।

হায় রে, কে এ জাতির চক্ষে এমন বিষাদের চশমা পরাইয়া দিল! যাহারা শিশুর ন্যায় পবিত্রচিত্ত ছিল, যাহারা বালকের ন্যায় সরল চিত্তে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে দেখিত, যাহারা বর্ষাকালের ভেকের ধ্বনির মধ্যে একপ্রকার সুস্বর অনুভব করিত, কে তাহাদের চক্ষে এমন বিষাদের চশমা পরাইয়া দিল যে, আর তাহারা পূর্বের ন্যায় সরলভাবে

প্রকৃতিকে দেখিতে পারিল না। সকলই বদলাইয়া গেল। যেখানে আশা ছিল সেখানে নিরাশা দেখা দিল। যেখানে উৎসাহ ছিল সেখানে নিরুৎসাহ আসিল। যেখানে উদ্যম ছিল সেখানে মানুষ নিরুদ্যমে ডুবিল। অদৃষ্টের উপরে মানুষ নির্ভর করিতে শিখিল। মানুষ মনে করিতে লাগিল, কপালে যাহা আছে তাহা হইবেই। যেন কী এক ঘন নিগড়ে সকলেই বাঁধা রহিয়াছে, কাহারও সাধ্য নাই যে, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাকে খণ্ডন করিতে পারে।

এই অদৃষ্টবাদ সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া মানুষকে নিরুৎসাহ করিয়াছে। এখন মানুষ কোনো বিষয়ে অকৃতকার্য হইলে মনে করে যে, কপালে ছিল, দুঃখ করিলে কী হইবে? নারীজাতির মধ্যে ইহা ঘোর বিষাদের ভাব আনয়ন করিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন, কপালে যাহা আছে তাহা তো হইবেই, ভাবিয়া কী হইবে? দরিদ্র ব্যক্তি মনে করে, বিধাতা কপালে যাহা লিখিয়া দিয়াছেন তাহা সহ্য করিতে হইবেই।

আবার খ্রিস্টীয় ধর্মশাস্ত্রসকল পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ধর্মকে পূর্বে অতিনৈসর্গিক মনে করা হইত। তাঁহারা বলেন যে, ধর্ম মানবের পক্ষে এক অতিনৈসর্গিক বস্তু। এই

অতিনৈসর্গিক হইতে এক্ষণে অনৈসর্গিক হইয়াছে।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, পূর্বে ধর্মকে মানব সমাজ বিরোধী ও মানব প্রকৃতি বিরোধী মনে করা হইত। সকলেই মনে করিতেন, ধর্ম সংসারের উপযোগী নয়। তৎপরে এই ভাব আসিল যে, ধর্ম মানবের পারলৌকিক কল্যাণেরই জন্য। সুতরাং তখন মানুষের দ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষা এই আসিল যে, ইহজগতে থাকিয়া পারত্রিকতা অভ্যাস করিতে হইবে। Worldliness-এর মধ্যে বাস করিয়া Other-worldliness লাভ করিতে হইবে। ঐহিক জীবনে থাকিয়া পারলৌকিক সদ্‌গতির উপায় বিধান করিবার ভাব মধ্যযুগে প্রবল।

কিন্তু বর্তমানে এ ভাবও অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। এই নবযুগে আমরা আর এক ভাব প্রাপ্ত হইতেছি, তাহা এই যে, জনসমাজে থাকিয়াই মানুষ ধর্ম উপার্জন করিতে সক্ষম। এখন মানুষ ভাবে যে, ধর্ম লাভ করিতে হইলে যে জনসমাজ বর্জন করা আবশ্যক তাহা নয়। জনসমাজে বাস করিয়াই ধর্ম পাইতে হয় নতুবা হয় না। দেখ, কত পরিবর্তন। প্রাচীনেরা বলিয়াছিলেন যে, জনসমাজে থাকিয়া ধর্ম হয় না ; মধ্যযুগের লোকেরা বলিলেন যে, জনসমাজে থাকিয়াই ধর্ম হয়, নবযুগের লোকেরা বলিতেছেন যে, জনসমাজে থাকিলেই ধর্ম হয় জনসমাজ ত্যাগ করিলে হয় না। দেখ, এই তিনে কত প্রভেদ। প্রাচীনকালের লোকেরা বলিলেন, ধর্মসাধনের ক্ষেত্র জনসমাজের বাহিরে। মধ্যযুগের লোকেরা বলিলেন, জনসমাজ ও বাহির এ উভয়ই ধর্মসাধনের ক্ষেত্র। আর নবযুগের লোকেরা বলিতেছেন, জনসমাজই ধর্মসাধনের স্থান।

এই নবযুগের আদর্শ পুরুষ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় মূলসূত্র এই ছিল যে, The service of man is the service of God,—মানবের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। আমরা এখন সভ্যজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই যে, ধর্মের এই নবভাব, এই মহাভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা ইহার প্রধান প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারি। আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি যে, মানুষের প্রধান চেষ্টা , প্রধান সংগ্রাম এই দিকে। এখনকার ধর্মসকলেরই প্রধান উদ্দেশ্য নরসেবা। মানুষকে পাপ হইতে ফিরাইবার জন্য, মানুষকে শুভকার্যে রত করিবার জন্য সকলেই প্রয়াস পাইতেছেন। সকলেই যেন মনে করিতেছেন যে, ধর্মের প্রধান কার্য মানবের সেবা। নরদুঃখ-কাতরতা এক্ষণে জগতে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিতেছে। জগতের জাতিসকল এখন অনুভব করিতেছে যে, তাহারা সকলে এক। এখন আর কোনো এক জাতি আপনাদের স্বার্থ লইয়া ভুলিয়া থাকিতে পারিতেছে না। এই মানবহিতৈষণার ভাব এই নবযুগের ধর্মভাবে প্রাধান্য লাভ করিতেছে।

অতএব আমরা এক্ষণে দেখিতেছি যে চারিটি নবভাব মানবের ধর্মভাবকে অধিকার করিতেছে—সার্বভৌমিকতা, স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিকতা, নর-হিতৈষণা। নবযুগের মানবের জন্য যে ধর্মভাব আসিতেছে তাহাতে এই চারিটিই প্রাধান্য লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভিভাষণ

পল্লির উন্নতি হিতসাধনমণ্ডলীর সভায় কথিত

সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় বাষ্পের প্রভাব যখন বেশি তখন গ্রহনক্ষত্রে ল্যাজামুড়োর প্রভেদ থাকে না। আমাদের দেশে সেই দশা, তাই সকলকেই সব কাজে লাগতে হয়, কবিকেও কাজের কথায় টানে। অতএব আমি আজকের এই সভায় দাঁড়ানোর জন্যে যদি ছন্দোভঙ্গ হয়ে থাকে তবে ক্ষমা করতে হবে।

এখানকার আলোচ্য কথাটি সোজা। দেশের হিত করাটা যে দেশের লোকেরই কর্তব্য সেইটে এখানে স্বীকার করতে হবে। এ কথাটা দুর্বোধ্য নয়। কিন্তু নিতান্ত সোজা কথাও কপালদোষে কঠিন হয়ে ওঠে সেটা পূর্বে পূর্বে দেখেছি। খেতে বললে মানুষ যখন মারতে আসে তখন বুঝতে হবে সহজটা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেইটেই সবচেয়ে মুশকিলের কথা।

আমার মনে পড়ে এক সময়ে যখন আমার বয়স অল্প ছিল, সুতরাং সাহস বেশি ছিল, সে সময়ে বলেছিলুম যে বাঙালির ছেলের পক্ষে বাংলা ভাষার ভিতর দিয়ে শিক্ষা পাওয়ার দরকার আছে। শুনে সেদিন বাঙালির ছেলের বাপদাদার মধ্যে অনেকেই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

আর একদিন বলেছিলুম, দেশের কাজ করবার জন্য দেশের লোকের যে অধিকার আছে সেটা আমরা আত্ম-অবিশ্বাসের মোহে বা সুবিধার খাতিরে অন্যের হাতে তুলে দিলে যথার্থ পক্ষে নিজের দেশকে হারানো হয়। সামর্থ্যের স্বল্পতা-বশত যদি-বা আমদের কাজ অসম্পূর্ণও হয়, তবু সে ক্ষতির চেয়ে নিজশক্তি-চালনার গৌরব ও সার্থকতার লাভ অনেক পরিমাণে বেশি। এত বড়ো একটা সাদা কথা লোক ডেকে যে বলতে বসেছিলুম তাতে মনের মধ্যে কিছু লজ্জা বোধ করেছিলুম। কিন্তু বলা হয়ে গেলে পরে লাঠি হাতে দেশের লোকে আমার সেটুকু লজ্জা চূরমার করে দিয়েছিল।

দেশের লোককে দোষ দিইনে। সত্য কথাও খামকা শুনলে রাগ হতে পারে। অন্যমনস্ক মানুষ যখন গর্তের মধ্যে পড়তে যাচ্ছে তখন হঠাৎ তাকে টেনে ধরলে সে হঠাৎ মারতে আসে যেই, সময় পেলেই, দেখতে পায় সামনে গর্ত আছে, তখন রাগ কেটে যায়। আজ সময় এসেছে গর্ত চোখে পড়েছে, আজ আর সাবধান করবার দরকার নেই।

দেশের লোককে দেশের কাজে লাগতে হবে এ কথাটা আজ স্বাভাবিক হয়েছে তার প্রধান কারণ, দেশ যে দেশ এই উপলব্ধিটা আমাদের মনে আগেকার চেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং দেশকে সত্য বলে জানবামাত্রই তার সেবা করবার উদ্যমও আপনি সত্য হল, সেটা এখন আর নীতি-উপদেশ মাত্র নয়।

যৌবনের আরম্ভে যখন বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা অল্প অথচ আমাদের শক্তি উদ্যত, তখন আমরা নানা বৃথা অনুকরণ করি, নানা বাড়াবাড়িতে প্রবৃত্ত হই। তখন আমরা পথও চিনিনে, ক্ষেত্রও চিনিনে, অথচ ছুটে চলবার তেজ সামলাতে পারিনে। সেই সময়ে আমাদের যাঁরা চালক তাঁরা যদি আমাদের ঠিকমতো কাজের পথে লাগিয়ে দেন তা হলে অনেক বিপদ বাঁচে। কিন্তু তাঁরা এ পর্যন্ত এমন কথা বলেননি যে, 'এই আমাদের কাজ, 'এসো আমরা কোমর বেঁধে লেগে যাই'। তাঁরা বলেননি 'কাজ করো', তাঁরা বলেছেন 'প্রার্থনা করো'। অর্থাৎ ফলের জন্যে আপনার প্রতি নির্ভর না করে বাইরের প্রতি নির্ভর করো।

তাঁদের দোষ দিতে পারিনে। সত্যের পরিচয়ের আরম্ভে আমরা সত্যকে বাইরের দিকেই একান্ত করে দেখি, 'আত্মানং বিদ্ধি' এই উপদেশটা অনেক দেরিতে কানে পৌঁছয়। একবার বাইরেটা ঘুরে তবে আপনার দিকে আমরা ফিরে আসি। বাইরের থেকে চেয়ে পরে এই ইচ্ছা করার যেটুকু প্রয়োজন ছিল তার সীমা আমরা দেখতে পেয়েছি, অতএব তার কাজ হয়েছে। তার পরে প্রার্থনা করার উপলক্ষে আমাদের একত্রে জুটতে হয়েছিল, সেটাতেও উপকার হয়েছে। সুতরাং যে পথ দিয়ে এসেছি আজ সে পথটা এক জায়গায় এসে শেষ হয়েছে বলেই যে তার নিন্দা করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। সে পথ না চুকোলে এ পথের সন্ধান পাওয়া যেত না।

এতদিন দেশ আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবল হাঁক দিয়েছে 'আয় বৃষ্টি হেনে'। আজ বৃষ্টি এল। আজও যদি হাঁকতে থাকি তা হলে সময় চলে যাবে। অনেকটা বর্ষণ ব্যর্থ হবে, কেননা ইতিমধ্যে জলাশয় খুঁড়ে রাখিনি। একদিন সমস্ত বাংলা ব্যেপে স্বদেশপ্রেমের বান ডেকে এল। সেটাকে আমরা পুরোপুরি ব্যবহারে লাগাতে পারলুম না। মনে আছে দেশের নামে হঠাৎ একদিন ঘণ্টা কয়েক ধরে খুব এক পশলা টাকার বর্ষণ হয়ে গেল, কিন্তু সে টাকা আজ পর্যন্ত দেশ গ্রহণ করতে পারল না। কত বৎসর ধরে কেবলমাত্র চাইবার জন্যই প্রস্তুত হয়েছি, কিন্তু নেবার জন্যে প্রস্তুত হইনি। এমনতরো অদ্ভুত অসামর্থ্য কল্পনা করাও কঠিন।

আজ এই সভায় যাঁরা উপস্থিত তাঁরা অনেকেই যুবক ছাত্র, দেশের কাজ করবার জন্যে তাঁদের আগ্রহ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, অথচ এই আগ্রহকে কাজে লাগাবার কোনো ব্যবস্থাই কোথাও নেই। সমাজ যদি পরিবার প্রভৃতি নানা তন্ত্রের মধ্যে আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে চালনা করবার নিয়মিত পথ করে না দিত, তা হলে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ কিরকম বীভৎস হত, প্রবীণের সঙ্গে নবীনের, প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর সম্বন্ধ কীরকম উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠত। তা হলে মানুষের ভালো জিনিসও মন্দ হয়ে দাঁড়াত। তেমনি দেশের কাজ করবার জন্যে আমাদের বিভিন্ন প্রকৃতিতে যে বিভিন্ন রকমের শক্তি ও উদ্যম আছে তাদের যথাভাবে চালনা করবার যদি কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা দেশে না থাকে তবে আমাদের সেই সৃজনশক্তি প্রতিরুদ্ধ হয়ে প্রলয়শক্তি হয়ে উঠবে। তাকে সহজে পথ ছেড়ে না দিলে সে গোপন পথ আশ্রয় করবেই। গোপন পথে আলোক নেই, খোলা হাওয়া নেই, সেখানে শক্তির বিকার না হয়ে থাকতে পারে না। একে কেবলমাত্র নিন্দা করা, শাসন করা, এর প্রতি সদ্‌বিচার করা নয়। এই শক্তিকে চালনা করবার পথ করে দিতে হবে। এমন পথ যাতে শক্তির কেবলমাত্র অসদ্‌ব্যয় হবে না তা নয়, অপব্যয়ও যেন না হতে পারে। কারণ, আমাদের মূলধন অল্প। সুতরাং সেটা খাটাবার জন্যে আমাদের বিহিত রকমের শিক্ষা ও ধৈর্য চাই। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি চাই এই কথা যেমন বলা, অমনি তার পরদিনেই কারখানা খুলে বসে সর্বনাশ ছাড়া আমরা অন্য কোনোরকমের মাল তৈরি করতে পারিনে। এ যেমন, তেমনি যে করেই হোক মরিয়া হয়ে দেশের কাজ করলেই হল এমন কথা যদি আমরা বলি, তবে দেশের সর্বনাশেরই কাজ করা হবে। কারণ, সে অবস্থায় শক্তির কেবলই অপব্যয় হতে থাকবে। যতই অপব্যয় হয় মানুষের অন্ধতা ততই বেড়ে ওঠে। তখন পথের চেয়ে বিপথের প্রতিই মানুষের শ্রদ্ধা বেশি হয়। তাতে করে কেবল যে কাজের দিক থেকেই আমাদের লোকসান হয় তা নয়, যে ন্যায়ের শক্তি যে ধর্মের তেজ সমস্ত ক্ষতির উপরেও আমাদের অমোঘ আশ্রয় দান করে তাকে সুদ্ধ নষ্ট করি। কেবল যে গাছের ফলগুলোকেই নাস্তানাবুদ করে দিই তা নয়, তার শিকড়গুলোকে সুদ্ধ কেটে দিয়ে বসে থাকি। কেবল যে দেশের সম্পদকে ভেঙেচুরে দিই তা নয়, সেই ভগ্নাবশেষের উপরে শয়তানকে ডেকে এনে রাজা করে বসাই।

অতএব যে শুভ ইচ্ছা আপন সাধনার প্রশস্ত পথ থেকে প্রতিরুদ্ধ হয়েছে বলেই অপব্যয় ও অসদ্‌ব্যয়ের দ্বারা দেশের বক্ষে আপন শক্তিকে শক্তিশেলরূপে হানছে তাকে আজ ফিরিয়ে না দিয়ে সত্য পথে আহ্বান করতে হবে। আজ আকাশ কালো করে যে দুর্যোগের চেহারা দেখছি, আমাদের ফসলের খেতের উপরে তার ধারাকে গ্রহণ করতে পারলে তবেই এইটি শুভযোগ হয়ে উঠবে।

বস্তুত ফললাভের আয়োজনে দুটো ভাগ আছে। একটা ভাগ আকাশে, একটা ভাগ

মাটিতে। এক দিকে মেঘের আয়োজন, এক দিকে চাষের। আমাদের নব শিক্ষায়, বৃহৎ পৃথিবীর সঙ্গে নূতন সংস্পর্শে, চিত্তাকাশের বায়ুকোণে ভাবের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। এই উপরের হাওয়ায় আমাদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং কল্যাণসাধনার একটা রসগর্ভশক্তি জমে উঠছে। আমাদের বিশেষ করে দেখতে হবে শিক্ষার মধ্যে এই উচ্চভাবের বেগ সঞ্চার যাতে হয়। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিষয়শিক্ষা। আমরা নোট নিয়েছি, মুখস্থ করেছি, পাশ করেছি। বসন্তের দক্ষিণ হাওয়ার মতো আমাদের শিক্ষা মনুষ্যত্বের কুঞ্জে কুঞ্জে নতুন পাতা ধরিয়ে ফুল ফুটিয়ে তুলছে না। আমাদের শিক্ষার মধ্যে কেবল যে বস্তুপরিচয় এবং কর্মসাধনের যোগ নেই তা নয়, এর মধ্যে সংগীত নেই, চিত্র নেই, শিল্প নেই, আত্মপ্রকাশের আনন্দময় উপায়-উপকরণ নেই। এ যে কত বড়ো দৈন্য তার বোধশক্তি পর্যন্ত আমাদের লুপ্ত হয়ে গেছে। উপবাস করে করে ক্ষুধাটাকে পর্যন্ত আমরা হজম করে ফেলেছি। এইজন্যেই শিক্ষা সমাধা হলে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটা পরিণতির শক্তিপ্রাচুর্য জন্মে না। সেইজন্যেই আমাদের ইচ্ছাশক্তির মধ্যে দৈন্য থেকে যায়। কোনোরকম বড়ো ইচ্ছা করবার তেজ থাকে না। জীবনের কোনো সাধনা গ্রহণ করবার আনন্দ চিত্তের মধ্যে জন্মায় না। আমাদের তপস্যা দারোগাগিরি ডেপুটিগিরিকে লঙ্ঘন করে অগ্রসর হতে অক্ষম হয়ে পড়ে। মনে আছে একদা কোনো এক স্বাদেশিক সভায় এক পণ্ডিত বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের উত্তরে হিমগিরি, মাঝখানে বিন্ধ্যগিরি, দুইপাশে দুই ঘাটগিরি, এর থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে বিধাতা ভারতবাসীকে সমুদ্রযাত্রা করতে নিষেধ করছেন। বিধাতা যে ভারতবাসীর প্রতি কত বাম তা এই সমস্ত নূতন নূতন কেরানিগিরি ডেপুটিগিরিতে প্রমাণ করছে। এই গিরি উত্তীর্ণ হয়ে কল্যাণের সমুদ্রযাত্রায় আমাদের পদে পদে নিষেধ আসছে। আমাদের শিক্ষার মধ্যে এমন একটি সম্পদ থাকা চাই যা কেবল আমাদের তথ্য দেয় না, সত্য দেয় ; যা কেবল ইন্ধন দেয় না, অগ্নি দেয়। এই তো গেল উপরের দিকের কথা।

তার পরে মাটির কথা, যে মাটিতে আমরা জন্মেছি। এই হচ্ছে সেই গ্রামের মাটি, যে আমাদের মা, আমাদের ধাত্রী, প্রতিদিন যার কোলে আমাদের দেশ জন্মগ্রহণ করছে। আমাদের শিক্ষিত লোকদের মন মাটি থেকে দূরে দূরে ভাবের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে, বর্ষণের যোগের দ্বারা তবে এই মাটির সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক হবে। যদি কেবল হাওয়ায় এবং বাষ্পে সমস্ত আয়োজন ঘুরে বেড়ায় তবে নূতন যুগের নববর্ষা বৃথা এল। বর্ষণ যে হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু মাটিতে চাষ দেওয়া হয়নি। ভাবের রসধারা যেখানে গ্রহণ করতে পারলে ফসল ফলবে, সে দিকে এখনও কারও দৃষ্টি পড়ছে না। সমস্ত দেশের ধূসর মাটি, এই শুষ্ক তপ্ত দগ্ধ মাটি, তৃষ্ণায় চৌচির হয়ে ফেটে গিয়ে কেঁদে ঊর্ধ্বপানে তাকিয়ে বলছে, 'তোমাদের ওই যা-কিছু ভাবের সমারোহ, ওই যা-কিছু জ্ঞানের সঞ্চয়, ও তো আমারই জন্যে, আমাকে দাও, আমাকে দাও। সমস্ত নেবার জন্যে আমাকে প্রস্তুত করো। আমাকে যা দেবে তার শতগুণ ফল পাবে।' এই আমাদের মাটির উত্তপ্ত

দীর্ঘনিশ্বাস আজ আকাশে গিয়ে পৌঁচেছে, এবার সুবৃষ্টির দিন এল বলে, কিন্তু সেইসঙ্গে চাষের ব্যবস্থা চাই যে।

গ্রামের উন্নতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব আমার উপর এই ভার। অনেকে অন্তত মনে মনে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তুমি কে হে, শহরের পোষ্যপুত্র, গ্রামের খবর কী জান।' আমি কিন্তু এখানে বিনয় করতে পারব না। গ্রামের কোলে মানুষ হয়ে বাঁশবনের ছায়ায় কাউকে খুড়ো কাউকে দাদা বলে ডাকলেই যে গ্রামকে সম্পূর্ণ জানা যায় এ কথা সম্পূর্ণ মানতে পারিনে। কেবলমাত্র অলস নিশ্চেষ্ট জ্ঞান কোনো কাজের জিনিস নয়। কোনো উদ্দেশ্যের মধ্যে দিয়ে জ্ঞানকে উত্তীর্ণ করে নিয়ে গেলে তবেই সে জ্ঞান যথার্থ অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। আমি সেই রাস্তা দিয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। তার পরিমাণ অল্প হতে পারে, কিন্তু তবুও সেটা অভিজ্ঞতা, সুতরাং তার মূল্য বহুপরিমাণ অলস জ্ঞানের চেয়েও বেশি।

আমার দেশ আপন শক্তিতে আপন কল্যাণের বিধান করবে এই কথাটা যখন কিছুদিন উচ্চৈঃস্বরে আলোচনা করা গেল তখন বুঝলাম কথাটা যাঁরা মানছেন তাঁরা স্বীকার করার বেশি আর কিছু করবেন না, আর যারা মানছেন না তাঁরা উদ্যম-সহকারে যা-কিছু করবেন সেটা কেবল আমার সম্বন্ধে, দেশের সম্বন্ধে নয়। এইজন্য দায়ে পড়ে নিজের সকলপ্রকার অযোগ্যতা সত্ত্বেও কাজে নামতে হল। যাতে কয়েকটি গ্রাম নিজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য আর্থিক উন্নতি প্রভৃতির ভার সমবেত চেষ্টায় নিজেরা গ্রহণ করে আমি সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলুম। দুই-একটি শিক্ষিত ভদ্রলোককে ডেকে বললুম, 'তোমাদের কোনো দুঃসাহসিক কাজ করতে হবে না, একটি গ্রামকে বিনা যুদ্ধে দখল করো।' এজন্য আমি সকলপ্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলুম এবং সৎপরামর্শ দেবারও ত্রুটি করিনি। কিন্তু আমি কৃতকার্য হতে পারিনি।

তার প্রধান কারণ, শিক্ষিত লোকের মনে অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতি একটা অস্থিমজ্জাগত অবজ্ঞা আছে। যথার্থ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে নিম্নশ্রেণির গ্রামবাসীদের সংসর্গ করা তাদের পক্ষে কঠিন। আমরা ভদ্রলোক, সেই ভদ্রলোকদের সমস্ত দাবি আমরা নীচের লোকদের কাছ থেকে আদায় করব, এ কথা আমরা ভুলতে পারি নে। আমরা তাদের হিত করতে এসেছি, এটাকে তারা পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করে এক মুহূর্তে আমাদের পদানত হবে, আমরা যা বলব তাই মাথায় করে নেবে, এ আমরা প্রত্যাশা করি। কিন্তু ঘটে উল্টো। গ্রামের চাষিরা ভদ্রলোকদের বিশ্বাস করে না। তারা তাদের আবির্ভাবকে উৎপাত এবং তাদের মতলবকে মন্দ বলে গোড়াতেই ধরে নেয়। দোষ দেওয়া যায় না, কারণ, যারা উপরে থাকে তারা অকারণে উপকার করবার জন্যে নীচে নেমে আসে এমন ঘটনা তারা সর্বদা দেখে না, উল্টোটাই দেখতে পায়। তাই, যাদের বুদ্ধি কম তারা বুদ্ধিমানকে ভয় করে। গোড়াকার এই অবিশ্বাসকে এই বাধাকে নম্রভাবে

স্বীকার করে নিয়ে যারা কাজ করতে পারে, তারাই এ কাজের যোগ্য। নিম্নশ্রেণির অকৃতজ্ঞতা অশ্রদ্ধাকে বহন করেও আপনাকে তাদের কাজে উৎসর্গ করতে পারে, এমন লোক আমাদের দেশে অল্প আছে। কারণ নীচের কাছ থেকে সকলপ্রকারে সম্মান ও বাধ্যতা দাবি করা আমাদের চিরদিনের অভ্যাস।

আমি যাঁদের প্রতি নির্ভর করেছিলুম তাঁদের দ্বারা কিছু হয়নি, কখনো-কখনো বরঞ্চ উৎপাতই হয়েছে। আমি নিজে সশরীরে এ কাজের মধ্যে প্রবেশ করতে পরিনি, কারণ আমি আমার অযোগ্যতা জানি। আমার মনে এদের প্রতি অবজ্ঞা নেই, কিন্তু আমার আজন্মকালের শিক্ষা ও অভ্যাস আমার প্রতিকূল।

যাই হোক, আমি পারিনি তার কারণ আমাতেই বর্তমান, কিন্তু পারবার বাধা একান্ত নয়। এবং আমাদের পারতেই হবে। প্রথম ঝোঁকে আমাদের মনে হয় 'আমিই সব করব।' রোগীকে আমি সেবা করব, যার অন্ন নেই তাকে খাওয়াব, যার জল নেই তাকে জল দেব। একে বলে পুণ্যকর্ম, এতে লাভ আমারই। এতে অপর পক্ষের সম্পূর্ণ লাভ নেই, বরঞ্চ ক্ষতি আছে। তা ছাড়া, আমি ভালো কাজ করব এ দিকে লক্ষ না করে যদি ভালো করব এই দিকেই লক্ষ করতে হয় তা হলে স্বীকার করতেই হবে, বাইরে থেকে একটি একটি করে উপকার করে আমরা দুঃখের ভার লাঘব করতে পারি নে। এইজন্যে উপকার করব না, উপকার ঘটাব, এইটেই আমাদের লক্ষ্য হওয়া চাই। যার অভাব আছে তার অভাব মোচন করে শেষ করতে পারব না, বরঞ্চ বাড়িয়ে তুলব, কিন্তু তার অভাব মোচনের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

আমি যে গ্রামের কাজে হাত দিয়েছিলুম সেখানে জলের অভাবে গ্রামে অগ্নিকাণ্ড হলে গ্রাম রক্ষা করা কঠিন হয়। অথচ বার বার শিক্ষা পেয়েও তারা গ্রামে সামান্য একটা কুয়ো খুঁড়তেও চেষ্টা করেনি। আমি বলুলম, 'তোরা যদি কুয়ো খুঁড়িস তা হলে বাঁধিয়ে দেবার খরচ আমি দেব।' তারা বললে, 'এ কি মাছের তেলে মাছ ভাজা?'

এ কথা বলবার একটু মানে আছে। আমাদের দেশে পুণ্যের লোভ দেখিয়ে জলদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতএব যে লোক জলাশয় দেয় গরজ একমাত্র তারই। এইজন্যেই যখন গ্রামের লোক বললে 'মাছের তেলে মাছ ভাজা' তখন তারা এই কথাই জানত যে, এ ক্ষেত্রে যে মাছটা ভাজা হবার প্রস্তাব হচ্ছে সেটা আমারই পারত্রিক ভোজের, অতএব এটার তেল যদি তারা জোগায় তবে তাদের ঠকা হল। এই কারণেই বছরে বছরে তাদের ঘর জ্বলে যাচ্ছে, তাদের মেয়েরা প্রতিদিন তিন বেলা দু-তিন মাইল দূর থেকে জল বয়ে আনছে, কিন্তু তারা আজ পর্যন্ত বসে আছে যার পুণ্যের গরজ সে এসে তাদের জল দিয়ে যাবে।

যেমন ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য মোচনের দ্বারা অন্যের পারলৌকিক স্বার্থসাধন যদি হয়, তবে সমাজে ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যের মূল অনেক বেড়ে যায়। তেমনি সমাজে জল বলো,

অন্ন বলো, বিদ্যা বলো, স্বাস্থ্য বলো, যে-কোনো অভাব মোচনের দ্বারা ব্যক্তিগত পুণ্যসঞ্চয় হয়, সে অভাব নিজের দৈন্যে নিজে লজ্জিত হয় না, এমনকী, তার একপ্রকার অহংকার থাকে। সেই অহংকার ক্ষুব্ধ হওয়াতেই মানুষ বলে ওঠে, এ কি মাছের তেলে মাছ ভাজা!

এতদিন এমনি করে একরকম চলে এসেছিল। কিন্তু এখন আর চলবে না। তার দুটো কারণ দেখা যাচ্ছে। প্রথমত, বিষয়বুদ্ধিটা আজকাল ইহলোকেই আবদ্ধ হয়ে উঠছে, পারলৌকিক বিষয়বুদ্ধি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এখন অন্তঃপুরের দুই-একটা কোণে মেয়েমহলে স্থান নিয়েছে। পরকালের ভোগসুখের বিশেষ একটা উপায়রূপে পুণ্যকে এখন অল্প লোকেই বিশ্বাস করে। তার পরে দ্বিতীয় কারণ এই, যারা নিজেদের ইহকালের সুবিধা উপলক্ষ্যেও পল্লির শ্রীবৃদ্ধিসাধন করতে পারত তারা এখন শহরে শহরে দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ছে। কৃতী শহরে যায় কাজ করতে, ধনী শহরে যায় ভোগ করতে, জ্ঞানী শহরে যায় জ্ঞানের চর্চা করতে, রোগী শহরে যায় চিকিৎসা করাতে। এটা ভালো কী মন্দ সে তর্ক করা মিথ্যা, এতে ক্ষতিই হোক আর যাই হোক এ অনিবার্য। অতএব যারা নিজের পরকাল বা ইহকালের গরজে পল্লির হিত করতে পারত তারা অধিকাংশই পল্লি ছেড়ে অন্যত্র যাবেই।

এমন অবস্থায় সভা ডেকে নাম সই করে একটা কৃত্রিম হিতৈষিতা-বৃত্তির উপর বরাত দিয়ে আমরা যে পল্লির উপকার করব এমন আশা যেন না করি। আজ এই কথা পল্লিকে বুঝতেই হবে যে, তোমাদের অন্নদান জলদান বিদ্যাদান স্বাস্থ্যদান কেউ করবে না। ভিক্ষার উপরে তোমাদের কল্যাণ নির্ভর করবে এতবড়ো অভিশাপ তোমাদের উপর যেন না থাকে। আজ গ্রামে পথ নেই, জল শুকিয়েছে, মন্দির ভেঙে গেছে, যাত্রা গান সমস্ত বন্ধ, তার একমাত্র কারণ এতদিন যে লোক দেবে এবং যে লোক নেবে এই দুই ভাগে গ্রাম বিভক্ত ছিল। এক দল আশ্রয় দিয়ে খ্যাতি ও পুণ্য পেয়েছে, আর এক দল আশ্রয় নিয়ে অনায়াসে আরাম পেয়েছে। তাতে তারা অপমান বোধ করেনি, কারণ তারা জানত এতে অপর পক্ষেরই লাভ পরিমাণে অনেক বেশি। কারণ মর্ত্যে যে ওজনে দান করি স্বর্গে তার চেয়ে অনেক বড়ো ওজনে প্রতিদান প্রত্যাশা করি। এখন, যখন সেই অপর পক্ষের পারত্রিক লাভের খাতা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, এবং যখন তারা নিজে গ্রামে বাস করলে নিজের গরজে জল বিদ্যা স্বাস্থ্যের যে ব্যবস্থা করতে বাধ্য হত তাও উঠে গেছে, তখন আত্মহিতের জন্য গ্রামের আত্মশক্তির উদ্‌বোধন ছাড়া তাকে কোনোমতেই কোনো দয়ায় বা কোনো বাহ্যব্যবস্থায় বাঁচানো যেতেই পারে না। আজ আমাদের পল্লিগ্রামগুলি নিঃসহায় হয়েছে, এইজন্য আজই তাদের সত্য সহায় লাভ করবার দিন এসেছে। আমরা যেন পুনর্বার তাতে বাধা দিতে না বসি। আমরা যেন হঠাৎ সেবা করবার একটা সাময়িক উত্তেজনা নিয়ে সেবার দ্বারা আবার তাদের দুর্বলতা বাড়িয়ে তুলতে না থাকি।

দুর্বলতা যে কীরকম মজ্জাগত তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমি আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রম থেকে কিছু দূরে এক জায়গায় একলা বাস করছিলুম। হঠাৎ রাত্রে আমাদের বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছেলে লাঠি হাতে আমার কাছে এসে উপস্থিত। তাদের জিজ্ঞাসা করাতে বললে, একটা ডাকাতির গুজব শোনা গেছে, তাই তারা আমাকে রক্ষা করতে এসেছে। পরে শোনা গেল ব্যাপারখানা এই, কোনো ধনীর এক পেয়াদা তরলাবস্থায় রাত্রে পথ দিয়ে চলছিল, চৌকিদারের অবস্থাও সেইরূপ ছিল। সে অপর লোকটাকে চোর বলে ধরাতে একটা মারামারি বাধে। দু-চার জন লোক যোগ দেয় অথবা গোলমাল করে। অমনি বোলপুর শহরে রটে গেল যে, পাঁচশো ডাকাত বাজার লুঠ করতে আসছে। বোলপুরে কেউ-বা দরজায় স্ক্রু এঁটে দিলে, কেউ-বা টাকাকড়ি নিয়ে মাঠে গিয়ে লুকোলো, কেউ-বা শান্তিনিকেতনে সস্ত্রীক এসে আশ্রয় নিলে। অথচ শান্তিনিকেতনে ছাত্ররা সেই রাত্রে লাঠি হাতে করে বোলপুরে ছুটল। এর কারণ এই, বোলপুরের লোক নিজের অনুভব করে না। এইজন্য সামান্য দুই-চার জন মানুষ মিথ্যা ভয় দেখিয়ে সমস্ত বোলপুর ভণ্ড করে যেতে পারত। শান্তিনিকেতনের বালকদের শক্তি তাদের বাহুতে নয়, তাদের অন্তরে। বোলপুর বাজারে যখন আগুন লাগল তখন কেউ যে কারও সাহায্য করবে তার চেষ্টা পর্যন্ত করা গেল না। এক ক্রোশ দূর থেকে আশ্রমের ছেলেরা যখন তাদের আগুন নিবিয়ে দিলে, তখন জ্বর কলসিটা পর্যন্ত দিয়ে কেউ তাদের সাহায্য করেনি, সে কলসি তাদের জোর করে কেড়ে নিতে হয়েছিল। এর কারণ, পুণ্য আমরা বুঝি, এমনকী, গ্রাম্য আত্মীয়তার ভাবও আমাদের বেশি-কম থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণ হিত আমরা বুঝিনে এবং এইটে বুঝিনে যে সকলের ভক্তির মধ্যে আমার নিজের অজেয় শক্তি আছে।

আমার প্রস্তাব এই যে, বাংলা দেশের যেখানে হোক একটি গ্রাম আমরা হাতে নিয়ে তাকে আত্মশাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উদ্‌বোধিত করে তুলি। সে গ্রামের রাস্তাঘাট, তার ঘরবাড়ির পারিপাট্য, তার পাঠশালা, তার সাহিত্যচর্চা ও আমোদপ্রমোদ, তার রোগীপরিচর্যা ও চিকিৎসা, তার বিবাদনিষ্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত কার্যভার সুবিহিত নিয়মে গ্রামবাসীদের দ্বারা সাধন করাবার উদ্যোগ আমরা করি। যাঁরা এ কাজে প্রবৃত্ত হবেন তাঁদের প্রস্তুত করবার জন্যে আপাতত কলকাতায় একটা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক। এই বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষকদের দ্বারা প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধীয় আইন, জমি-জরিপ ও রাস্তাঘাট ড্রেনপুকুর ঘরবাড়ি তৈরি, হঠাৎ কোনো সাংঘাতিক আঘাত প্রভৃতির উপস্থিতমতো চিকিৎসা ও কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকা কর্তব্য। পাশ্চাত্য দেশে গ্রাম প্রভৃতির আর্থিক ও অন্যান্য উন্নতি সম্বন্ধে আজকাল যে-সব চেষ্টার উদয় হয়েছে সে সম্বন্ধে সকলপ্রকার সংবাদ এই বিদ্যালয়ে সংগ্রহ করা দরকার হবে। পল্লিগ্রামে নানা স্থানেই দাতব্য চিকিৎসালয় এবং মাইনর ও এন্‌ট্রেন্স্ স্কুল

আছে। যাঁরা পল্লিগঠনের ভার গ্রহণ করবেন তাঁরা যদি এইরকম একটা কাজ নিয়ে পল্লির চিত্ত ক্রমে উদ্‌বোধিত করার চেষ্টা করেন তবে তাঁরা সহজেই ফললাভ করতে পারবেন এই আমার বিশ্বাস। অকস্মাৎ অকারণে পল্লির হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশলাভ করা দুঃসাধ্য। ডাক্তার এবং শিক্ষকের পক্ষে গ্রামের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে ঘনিষ্ঠতা করা সহজ। তাঁরা যদি ব্যবসায়ের সঙ্গে লোকহিতকে মিলিত করতে পারেন, তবে পল্লি সম্বন্ধে যে-সমস্ত সমস্যা আছে তার সহজ মীমাংসা হয়ে যাবে। এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে একদল যুবক প্রস্তুত হতে থাকুন, তাঁদের প্রতি এই আমার অনুরোধ।

২২ মার্চ, ১৩২২

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

বাঙালির শক্তি ও তাহার অপচয়

বাঙালির শক্তি ও তাহার অপচয় বিষয়ে কিছু বলিব। গত ২০ বছর এই বিষয়টি আমার চিত্ত অধিকার করিয়া আছে। অন্নসমস্যায় বাঙালির জীবন আজ মৃত্যুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবন-সংগ্রামের এই ভীষণ প্রতিযোগিতায় শুধু মাড়োয়ারি নয়, সকল অবাঙালির নিকট বাঙালি পরাজিত হইতেছে।

৬০।৬৫ বৎসর পূর্বে সকল কার্যে রাজসরকারের দফতরখানায় ও ব্যবসায়ের হৌসে সর্বত্রই শ্রেষ্ঠ স্থান বাঙালি অধিকার করিয়া থাকিত। বাঙালি বুদ্ধিমান, বাঙালি চতুর, ইহাই শুনিতে পাই। কিন্তু যত চতুর, তত ফতুর। তাই ধনসম্পদে বাঙালি আজ ফতুর হইয়াছে।

সেদিন এক ভদ্রলোক, আমার নাকি তিনি ছাত্র, এই দাবিতে তাঁহার পুত্রের ভবিষ্যৎ গড়িবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ছেলেটি তিনবার বি.এস.সি. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়াছে। পরীক্ষকমণ্ডলীকে বলিয়া কহিয়া যাহাতে তাহার পাশের ব্যবস্থা করিতে পারি, এজন্যই তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইহাই নাকি তাহার ভবিষ্যৎ গড়িবার একমাত্র উপায়। ইহাই দেখা যায়, প্রত্যেক বাঙালি ছাত্রের জীবনোপায়ের আদর্শ। ছাত্রদের আশা I.C.S., B.C.S. উকিল, ডাক্তার হইবে, আশা এমনি ধাপে ধাপে নামে। কিন্তু কয়জনের পদ খালি হয়, কয়জনেরই বা প্রয়োজন? আলিপুরে ৮০০ উকিল। তবু বৎসর বৎসর সেখানে কত নূতন উকিল ভর্তি হয়। জেলা বা মহকুমার সর্বত্রই এইরূপ।

ছোটো ঘর ভাড়া লইয়া পশ্চিমা অশিক্ষিত লোক বিদ্যুতের যোগে গমপেষা কল চালায়। কলিকাতায় অলিতে গলিতে এই প্রকার কত আছে। ইহারা মাসে ৫০।৭৫ টাকা উপার্জন করে। চতুর ও তীক্ষ্মবুদ্ধি বিশিষ্ট বাঙালির সন্তান এই ব্যবসায় করে না। মূলধনের অভাবে নাকি ব্যবসায় বাঙালির পক্ষে সম্ভব হয় না। অথচ এই প্রকার ব্যবসায়ে অতি সামান্য মূলধনের প্রয়োজন হয়।

কলিকাতার কাঁসারিপাড়া, কাটোয়ার সন্নিহিত দাঁইহাট, লৌহজঙ্গ, খাগড়া, ী

কাগমারি প্রভৃতি স্থান কাঁসারির ব্যবসায়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। অধুনা অ্যালুমিনিয়ামের বাসন বাঙালির সংসারে রাজত্ব করিতেছে। কেবল পূজাপার্বণে উহা ব্যবহৃত হয় না। বিদেশীয় বস্তু বলিয়াও কেহ কেহ আপত্তি করেন। কিন্তু এই সকল আপত্তি ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছে। এই বাসন আমেরিকা ও সুইডেন হইতে আমদানি চাদর হইতে তৈয়ারি হয়। অতি সহজ এই কাজ।

অতি দুঃস্থ অবস্থা হইতে কত ভাটিয়া ব্যবসায়ে উন্নতি করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া সেই অর্থে অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা খুলিয়া বর্তমানে প্রকাণ্ড ব্যবসায়ী হইয়াছেন। ঢালাই করিতে হয় না, জোড়াতাড়া দিয়া ঝালাইতে হয় না ; প্রথমে চাক্‌তির আকারে কাটিয়া পেষণযন্ত্রে (stamping) ফেলিয়া যথাবিহিত আকার দান করা হয়। এই ভাটিয়াগণ ভারত ও রেঙ্গুনে অ্যালুমিনিয়ামের ব্যাবসা একচেটিয়া করিয়াছেন। ইহারা পরের দুঃখমোচনে বহু টাকা দান করিয়া থাকেন, স্বভাবেও নিতান্ত অনাড়ম্বর। এই সকল ভাটিয়াগণ বাংলার নানা ক্ষেত্রে ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেছেন। আর আমারই হাতে তৈয়ারি বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষিত এম.এস্‌সি, ডি.এস্‌সি-রা বেকার বসিয়া এক মহা অনর্থের সৃষ্টি করিতেছে। অথচ chemistry admits of the widest application in the practice of life. রসায়নের সাহায্যে কাঁচা মাল হইতে বাণিজ্য-দ্রব্য তৈয়ারি করিয়া এদেশ হইতে প্রভূত অর্থ লইয়া যাইতেছে ; কিন্তু এদেশে রসায়নের শিক্ষার বিফলতা দেখা যাইতেছে।

আমি চোখে যাহা দেখি তাই বলি। আমার পরীক্ষায় যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি হয়, তাহাই প্রকাশ করি। আমাদের দেশের নানা স্থানে তামাক জন্মে। রংপুরে যে খুব ভালো তামাক হয়, সে সংবাদ রংপুরের ছেলেরা রাখে না। অথচ সুদূর ব্রহ্মদেশ হইতে এই তামাকের সন্ধানে লোক আসে। সেদিন হাওড়ার ওপারে রামেশ্বর টোবাকো ওয়ার্কস (Rameswar Tubacco Works) নাম দিয়া এক যুবক সিগারেটের কারখানা খুলিয়াছেন। তামাকের রাসায়নিক পদার্থের বিষয় জানিতে তিনি আমাকে চিঠি লিখিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধের পূর্বে যত সিগারেট এদেশে খরচ হইতেছিল, বর্তমানে তাহার ছয় গুণ সিগারেট এদেশে বিক্রীত হইতেছে।

আমি সিগারেট খাওয়ার পক্ষপাতী নহি। বিড়ি আমাদের দেশেই তৈয়ারি হয়। সভ্য হইয়া বিড়ি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশজাত সিগারেট খাইয়া বহু অর্থ বিদেশিকে দিতেছি। এই কথাটা তামাক সেবনকারীদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। এই কথাটি বাংলার পক্ষেই বিশেষ করিয়া প্রযোজ্য।

নাগপুরের পথে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত গণ্ডিয়া নামক রেল স্টেশনে প্রকাণ্ড বিড়ির কারখানা দেখিয়াছি। অল্প বয়সের বালকগণ দৈনিক এক টাকা, পাঁচ সিকা এই বিড়ির কারখানায় উপার্জন করিয়া থাকে। এই সকল স্থানে কুটিরে কুটিরে গৃহকর্মের অবসরে বিড়ি তৈয়ারির কার্য চলিতেছে। এমন করিয়া আমাদের দেশে পূর্বে চরকা চলিত। এই

প্রকারে নাগপুর অঞ্চলে ৫০ হাজার দরিদ্র ও অনাথা বিধবার অন্ন সংস্থান হয়।

কলিকাতায়ও বিড়ির ব্যবসায় চলে। কিন্তু তাহা অবাঙালির হাতে। ভারতবর্ষে ১০।১২ লক্ষ টাকার মোহিনী বিড়ি বিক্রয় হয়। এই অতি সহজ ব্যবসায়টিকেও বাঙালি কোনো রূপেই গ্রহণ করিতে পারে নাই।

কলিকাতায় দুধ মিলে না। অল্প যাহা কিছু মিলে পশ্চিম দেশীয় গোয়ালার দয়ায়। কলিকাতা বিজ্ঞান-কলেজে অত বড়ো মাঠ ; মাঠে সবুজ, নধর ঘাস। সেখানে কয়জন পশ্চিমা গোয়ালাকে অনুনয়-বিনয় করিয়া আনিয়া রাখিয়াছি। বাঙালি গোয়ালা পাওয়া যায় নাই। ইহারা দেখি মাসে ২০০। ২৫০ টাকা উপার্জন করে।

খুলনার জেলা বোর্ড বাঙালির। সেখানকার পারঘাটগুলি এই বাঙালিরা পশ্চিমা মাঝিদের হাতে দিয়াছেন। বাঙালিদের হাতে দিয়া উপযুক্ত অর্থ পাওয়া যাই নাই, কার্যও অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে।

রাজাগোপালাচারী ও যমুনালাল বাজাজ সহ শ্রীহট্টে খদ্দর প্রচারার্থ গিয়াছিলাম। সেখানকার খেয়াঘাট দেখিলাম দেশিয়ানায় সজ্জিত। সংবাদ লইয়া জানিলাম, খেয়ার মালিকের নাম রায় বাহাদুর ছত্রপতি সিংহ। ইনি ক্ষুদ্র অবস্থায় খেয়াঘাটের কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। বর্তমানে শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহের প্রায় সকল খেয়াঘাটের ইজারাদার হইয়াছেন। ইনি বহু ধনের মালিক। শ্রীহট্টের বন্যায় অজস্র অর্থ দান করিয়াছেন।

বাঙালিকে ব্যবসায়ী হইতে বলিতেছি। কেহ কেহ আমাকে বলেন, তবে কি বিদ্যাবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া মাড়োয়ারি হইব?

কলিকাতা প্রিন্ট কোম্পানির (Print Co.) লর্ড কব (Lord Cobb) ১০০্ টাকা বেতনে কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। অ্যান্ডরু ইউল-এর (Andrew Yule) পরলোকগত স্যার ডেভিড ইয়ুল ভারত হইতে ৩০ কোটি টাকা লইয়া গিয়াছেন। ইঁহারা অশিক্ষিত ছিলেন না। এডিসন গ্রামোফোনের আবিষ্কার করিয়া প্রভূত ধন অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার অদৃষ্টে প্রাথমিক শিক্ষালাভও ঘটে নাই। তিনি আপন চেষ্টায় বিজ্ঞান শিখিয়াছেন। ফোর্ডের পিতা কৃষক ছিলেন। পিতার আহ্বান সত্ত্বেও সে ব্যবসায় তিনি গ্রহণ করেন নাই। সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াই নিজ অনুসন্ধিৎসার গুণে যন্ত্রের কৌশল অর্জন করিয়া নিজ ব্যবসায়ে অজস্র অর্থ উপার্জন করিয়া পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী হইয়াছেন।

সাবান ব্যবসায়ে শ্রেষ্ঠ ধনী লিভার ব্রাদার্সের (Lever Bros.) লিভার বালককালে মুদিখানায় কাজ করিতেন। জগতের আর একজন শ্রেষ্ঠ ধনী অ্যান্ডরু কার্নেগি (Andrene Carnegie) প্রথম জীবনে টেলিগ্রাফের পিয়ন, পরে কলের মজুররূপে জীবনসংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলেন। অদ্বিতীয় ধনী ইন্‌চকেপ (Inchcape) গ্রাজুয়েট ছিলেন না! যাঁহাদের নাম করিলাম, ইঁহাদের কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অর্জন করেন নাই। ডিগ্রির ছাপ নাই বলিয়াই কি ইঁহাদিগকে অশিক্ষিত বলিব?

জামশেদজি টাটা বিজ্ঞান জানিতেন না, মস্তিষ্ক ছিল। তাহারই প্রভাবে টাটার লৌহ-কারখানা উদ্ভব হইয়াছিল। একস্‌পার্ট (expert) বলিয়া একটি কথা চলিত আছে। আমরা ইহাদের বড়াই করি। ইহারা টাকায় বিকায়। কলিকাতার নিকটে হুকুমচাঁদ স্টিল ওয়ার্কস (Hookumchand Steel Works চলিতেছে। হুকুমচাঁদ বিজ্ঞানবিদ্‌ নহেন। একজন সাহেব ম্যানেজার ও বাঙালি ইনজিনিয়ার রাখিয়াছেন। স্যার হুকুমচাঁদ একজন মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী। ইঁহার তাঁবেদার এই এক্‌সপার্টগণ।

ডিগ্রির মোহ আমাদের পাইয়া বসিয়াছে। জ্ঞান-অর্জন হইতেছে না, ডিগ্রি অর্জিত হইতেছে। ইতিহাস ও ভূগোল অপ্‌শনাল (optional), যেন উহা জানা অতিরিক্ত মাত্র। ফাঁকি দিয়া পাশ করাই এখনকার ছেলেদের উদ্দেশ্য। এজন্যই ভারতবর্ষময় আমি বলিয়া থাকি, Degree is only a clock to hide one's ignorance, অর্থাৎ ডিগ্রি অজ্ঞতা ঢাকিবার আবরণ মাত্র।

কলিকাতায় কলেজের হোস্টেলে ছাত্র থাকে। মাসে ৪০। ৫০ টাকা অভিভাবকদের নিকট হইতে ইহারা আদায় করে। রেস্তোঁরায় খায়, সিনেমা দেখে, ডাইং ক্লিনিং-এ কাপড় কাচে, হেয়ার কাটার দ্বারা চুল কাটায়, অবকাশের সময় দিনের বেলা ঘুমায় ও আড্ডা দিয়া সময় নষ্ট করে। এইরূপে পরম আলস্যে ইহাদের দিন যাপিত হয়। অপরের গলগ্রহ হইয়া এইরূপ ভাবে কালাতিপাত লজ্জার বিষয়।

আমেরিকায় অনেক ছেলে নিজের খরচের কিয়দংশ নিজ উপার্জন হইতে বহন করে। এমনকি চিনেও তাই। ছুটির সময়টি আমাদের ছেলেরা নানা ব্যসনে কাটায়, আর চিনের ছেলেরা এই সময়ে স্বদেশের নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য বক্তৃতা দান, জিনিস ফেরি করিয়া অর্থোপার্জন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন করিয়া অধ্যাপনা কার্যে লিপ্ত থাকে। এইরূপে তাহারা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গভর্নমেন্টের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেরা দেশ হইতে নিরক্ষতা দূর করিতে মনন করিয়াছে, এবং বহু স্থানে সফলকাম হইয়াছে। শুধু বিদ্যাশিক্ষা করিয়া এবং তাহার প্রতিদান করিয়াই চিনেরা ক্ষান্ত হয় নাই। অর্থোপার্জনের নব নব পথ তাহারা উন্মুক্ত করিয়াছে।

বাংলাদেশে ৮৬টি পাটের কল ; একটিও বাঙালির নহে। সকলই ইংরাজের ছিল, সম্প্রতি ২। ৪টি মাড়োয়ারির হইয়াছে। এখনো বাঙালি নিশ্চল। বালি ব্রিজের মজুরদের ঠিকাদার অবাঙালি। ইহার নাম রায় বাহাদুর জগমল রাজা। ইনি কচ্ছ দেশীয়। কোথাকার লোক কোথায় আসিয়া অজস্র অর্থ উপার্জন করিতেছেন। এই প্রকার কচ্ছ দেশীয় মেননগণ মগরাহাট অঞ্চলে র‍্যালি ব্রাদার্স-এর (Ralli Brothers) সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া লক্ষ-লক্ষ টাকার চাউল বিদেশে রফতানি করে। আবার কলিকাতার জহুরিরা সিন্ধি।

পূর্বে কেরানিগিরি বাঙালির একচেটিয়া ছিল। এখন মাদ্রাজিরা তাহা দখল করিয়া

লইতেছে। কলিকাতার ইলেকট্রিক মিস্ত্রি প্রায় সকলেই শিখ। বাংলায় আসিয়া সকলেই সোনা পায়। শুধু বাঙালির হাতে উঠে ধূলি-মুঠি। তাহারা উপবাস করিয়া মরে।

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ অত বড়ো রাস্তা, দুই পার্শ্বে কত প্রাসাদোপম অট্টালিকা। ২।১টি ছাড়া সকলের মালিক অবাঙালি। উপাধিধারী বাঙালি উপরিউক্ত ইংরেজি অনভিজ্ঞ মাড়োয়ারি ইত্যাদির নিকট টাইপিস্ট ও কেরানি হইবার জন্য দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে।

বাংলার জমিদারের হাতে টাকা নাই। অপরিমিতব্যয়ী বলিয়া ইহারা ঋণগ্রস্ত। কোনো দুর্দিনে কোনো জমিদারের যদি টাকার দরকার হয়, তবে মাড়োয়ারি ছাড়া আর কে টাকা দিতে পারিবে? বাংলার জমিদারি মাড়োয়ারিদের হাতে যাইবে, আমি এই ভবিষ্যৎ দর্শন করিতেছি। কেবল চাকুরির আশায় তাহারই পথ পানে চাহিয়া হা-ভাতের মতো বাঙালির দিন যাইতেছে। তাহার কর্মে স্পৃহা নাই, শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা নাই। অন্নাভাবে তনু তাহার ক্ষীণ।

কলকাতার রামমোহন হলে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ। দ্র. *ভারতবর্ষ*, মাঘ ১৩৩৬।

স্বামী বিবেকানন্দ

কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তর

১৮৯৭ খ্রি. ২৬ ফেব্রুয়ারি শোভাবাজার রাজবাটিতে কলিকাতাবাসীগণের পক্ষ হইতে স্বামীজিকে এক অভিনন্দন-পত্র প্রদত্ত হয়। সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজি বলেন।

মানুষ নিজের মুক্তির চেষ্টায় জগৎপ্রপঞ্চের সম্বন্ধ একবারে ত্যাগ করিতে চায়, মানুষ নিজ আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধবের মায়া কাটাইয়া সংসার হইতে দূরে, অতি দূরে পালাইয়া যায়; চেষ্টা করে দেহগত সকল সম্বন্ধ, পুরাতন সকল সংস্কার ত্যাগ করিতে, এমনকী সে নিজে যে সার্ধ-ত্রিহস্তপরিমিত দেহধারী মানুষ, ইহাও ভুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে ; কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরে সর্বদাই সে একটি মৃদু অস্ফুট ধ্বনি শুনিতে পায়, তাহার কর্ণে একটি সুর সর্বদা বাজিতে থাকে, কে যেন দিবারাত্র তাহার কানে কানে মৃদু স্বরে বলিতে থাকে, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। হে ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানীর[১] অধিবাসীগণ! তোমাদের নিকট আমি সন্ন্যাসীভাবে উপস্থিত হই নাই, ধর্মপ্রচারকরূপেও নহে, কিন্তু পূর্বের মতো সেই কলিকাতার বালকরূপে তোমাদের সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছি। হে ভ্রাতৃগণ! আমার ইচ্ছা হয়, এই নগরীর রাজপথের ধূলির উপর বসিয়া বালকের মতো সরলপ্রাণে তোমাদিগকে আমার মনের কথা সব খুলিয়া বলি। অতএব তোমরা যে আমাকে 'ভাই' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ, সেজন্য তোমাদিগকে আন্তরিক ধন্যবান জানাইতেছি। হ্যাঁ, আমি তোমাদের ভাই, তোমরাও আমার ভাই। পাশ্চাত্যদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে একজন ইংরেজ বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'স্বামীজি, চার বছর বিলাসের লীলাভূমি, গৌরবের মুকুটধারী মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণের পর মাতৃভূমি আপনার কেমন লাগিবে?' আমি বলিলাম, পাশ্চাত্যভূমিতে আসিবার পূর্বে ভারতকে আমি ভালবাসিতাম, এখন ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার নিকট পবিত্র, ভারতের বায়ু আমার নিকট এখন পবিত্রতা-মাখা, ভারত

আমার নিকট এখন তীর্থস্বরূপ। ইহা ব্যতীত আর কোনো উত্তর আমার মনে আসিল না।

হে কলিকাতাবাসী আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছ, সেজন্য তোমাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার পক্ষে সাধ্যাতীত। অথবা তোমাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়াই বাহুল্যমাত্র, কেন না তোমরা আমার ভাই, যথার্থ ভ্রাতার কাজই করিয়াছ, অহো! হিন্দুভ্রাতারই কাজ। কারণ এরূপ পারিবারিক বন্ধন, এরূপ সম্পর্ক, এরূপ ভালোবাসা আমাদের মাতৃভূমির চতুঃসীমার বাহিরে আর কোথাও নাই।

এই চিকাগো ধর্মমহাসভা একটি বিরাট ব্যাপার হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে বহু নগর হইতে আমরা এই সভার উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ দিয়াছি। তাহারা আমাদের প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশ করার জন্য ধন্যবাদার্হও বটে। কিন্তু এই ধর্ম-মহাসভার যথার্থ ইতিহাস যদি জানিতে চাও, যথার্থ উদ্দেশ্য যদি জানিতে চাও, আমার নিকট শোন। তাহাদের ইচ্ছা ছিল, নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা। সেখানকার অধিকাংশ লোকের ইচ্ছা ছিল, খ্রিস্টধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য ধর্মগুলিকে হাস্যাস্পদ করা। কার্যত ফল তাহাদের ইচ্ছানুরূপ না হইয়া অনুরূপ হইয়াছিল। বিধির বিধানে অন্য কিছু হইবার উপায়ই ছিল না। অনেকেই সদয় ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাদিগকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে। আসল কথা এই, আমার আমেরিকা-যাত্রা ধর্ম-মহাসভার জন্য নয়। এই সভার দ্বারা আমাদের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে, কাজেরও সুবিধা হইয়াছে বটে। সেইজন্য আমরাও উক্ত মহাসভার সভ্যগণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের ধন্যবাদ যুক্তরাষ্ট্রনিবাসী সহৃদয় অতিথিবৎসল উন্নত মার্কিনজাতির প্রাপ্য, যাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব অপর জাতি অপেক্ষা বিশেষভাবে বিকশিত হইয়াছে। কোনো মার্কিনের সহিত ট্রেনে পাঁচ মিনিটের জন্য আলাপ হইলেই তিনি তোমার বন্ধু হইবেন এবং অতিথিরূপে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া প্রাণের কথা খুলিয়া বলিবেন। ইহাই মার্কিন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, ইহাই তাঁহাদের পরিচয়। তাহাদের ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের কর্ম নয়। আমার প্রতি তাঁহাদের সহৃদয়তা বর্ণনাতীত, আমার প্রতি তাঁহারা যে অপূর্ব সদয় ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিতে আমার বহু বৎসর লাগিবে।

কিন্তু শুধু মার্কিনগণকে ধন্যবাদ দিলেই চলিবে না ; তাঁহারা যতদূর ধন্যবাদার্হ, আটলান্টিকের অপরপারে সেই ইংরেজ জাতিকেও আমাদের সেরূপ বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। ইংরেজ জাতির প্রতি আমা অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণা পোষণ করিয়া কেহই কখনও ইংল্যান্ডে পদার্পণ করে নাই ; এই সভামঞ্চে যে-সকল ইংরেজ বন্ধু রহিয়াছেন, তাঁহারাই সে-বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। কিন্তু যত আমি তাঁহাদের সহিত একত্র বাস করিতে লাগিলাম, যতই তাঁহাদের সহিত মিশিতে লাগিলাম, যতই দেখিতে লাগিলাম, ব্রিটিশজাতির জীবনযন্ত্র কীরূপে পরিচালিত হইতেছে, যতই বুঝিতে লাগিলাম, ওই জাতির হৃৎস্পন্দন কোথায়, ততই তাঁহাদিগকে ভালোবাসিতে লাগিলাম। আর হে ভ্রাতৃগণ, এখানে এমন

কেহই উপস্থিত নাই, যিনি ইংরেজ জাতিকে এখন আমা অপেক্ষা বেশি ভালোবাসেন। তাঁহাদের বিষয় ঠিক ঠিক জানিতে হইলে সেখানে কী কী ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহা দেখিতে হইবে এবং তাঁহাদের সহিত মিশিতে হইবে। আমাদের জাতীয় দর্শনশাস্ত্র বেদান্ত যেমন সমুদয় দুঃখই অজ্ঞানপ্রসূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেইরূপ ইংরেজ ও আমাদের মধ্যে বিরোধভাবও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজ্ঞানজনিত বলিয়া জানিতে হইবে। আমরা তাঁহাদের জানি না, তাঁহারাও আমাদের জানেন না।

দুর্ভাগ্যক্রমে পাশ্চাত্যদেশবাসিগণের ধারণা এই যে, আধ্যাত্মিকতা, এমনকি চরিত্র-নীতি পর্বত সাংসারিক উন্নতির সঙ্গে চিরসংশ্লিষ্ট। আর যখনই কোনো ইংরেজ বা অপর কোনো পাশ্চাত্যদেশবাসী ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন এবং দেখিতে পান, এখানে দুঃখ-দারিদ্র্য অপ্রতিহতভাবে রাজত্ব করিতেছে, অমনি তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন, এ দেশে কোনো ধর্ম থাকিতে পারে না, নীতিও থাকিতে পারে না ; তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতাই সত্য। ইউরোপের শীতপ্রধান জলবায়ুর জন্য এবং অন্যান্য নানা কারণে সেখানে দারিদ্র্য ও পাপ একত্র অবস্থান করে ; দেখা যায় ভারতবর্ষে কিন্তু তাহা নহে। আমার অভিজ্ঞতা এই, ভারতবর্ষে যে যত দরিদ্র, সে তত বেশি সৎপ্রকৃতি ; কিন্তু ইহা ঠিক ঠিক উপলব্ধি করা সময়সাপেক্ষ। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের এই গুপ্ত রহস্য বুঝিবার জন্য দীর্ঘকাল ভারতে বাস করিয়া সময় নষ্ট করিতে কয়জন বিদেশি প্রস্তুত আছেন? এই জাতির চরিত্র ধৈর্যসহকারে অধ্যয়ন ও উপলব্ধি করিবার লোক অল্পই আছেন। এখানে, কেবল এখানেই এমন এক জাতির বাস, যাহাদের নিকট 'দারিদ্র' বলিলে 'পাপ' বুঝায় না ; কেবল তাহাই নহে, দারিদ্র্যকে এখানে অতি উচ্চাসন দেওয়া হয়। এখানে দরিদ্র সন্ন্যাসীর বেশই শ্রেষ্ঠ সম্মান পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আমাদিগকেও পাশ্চাত্য সমাজের রীতিনীতি অতি ধৈর্যসহকারে পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে। তাঁহাদের সম্বন্ধে হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলে চলিবে না। তাঁহাদের স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা এবং অন্যান্য আচার-ব্যবহার সবগুলিরই অর্থ আছে, সবগুলিরই ভাল দিক আছে, কেবল তোমাদিগকে যত্নপূর্বব ধৈর্যসহকারে ওইগুলি আলোচনা করিতে হইবে। আমার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, আমরা তাঁহাদের আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করিব বা তাঁহারা আমাদের অনুকরণ করিবেন ; সকল দেশেরই আচারব্যবহার বহু শতাব্দীর অতি মৃদুগতি ক্রমবিকাশের ফলস্বরূপ এবং সবগুলির গভীর অর্থ আছে। সুতরাং আমরাও যেন তাঁহাদের আচার-ব্যবহারগুলি দেখিয়া উপহাস না করি, তাঁহারাও যেন আমাদের আচারগুলিকে বিদ্রূপ না করেন।

আমি এই সভায় আর একটি কথা বলিতে চাই। আমার মতে আমেরিকা অপেক্ষা ইংল্যান্ডে আমার প্রচারকার্য অধিকতর সন্তোষজনক হইয়াছে। অকুতোভয় দৃঢ় অধ্যবসায়শীল ইংরেজ জাতির মস্তিষ্কে কোনো ভাব যদি একবার প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়, তাঁহার

মস্তিষ্কের খুলি যদিও অন্য জাতি অপেক্ষা স্থূলতর, সহজে কোনো ভাব ঢুকিতে চায় না, কিন্তু যদি অধ্যবসায় সহকারে তাঁহাদের মস্তিষ্কে কোনো ভাব প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়, উহা তাঁহাদের মস্তিষ্কে থাকিয়াই যায়, কখনও বাহির হয় না, আর ওই জাতির অসীম কার্যকরী শক্তিবলে বীজভূত সেই ভাব হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইয়া অবিলম্বে ফল প্রসব করে ; অন্য কোনো দেশে সেরূপ নহে। এই জাতির যেমন অপরিসীম কার্যকরী শক্তি, এই জাতির যেমন অনন্ত জীবনীশক্তি, অপর কোনো জাতির মধ্যে সেরূপ দেখিতে পাইবে না। এই জাতির কল্পনাশক্তি অল্প, কার্যকরী শক্তি বেশি। আর এই ইংরেজ-হৃদয়ের মূল উৎস কোথায়, তাহা কে জানে? তাহার হৃদয়ের গভীরে যে কত কল্পনা ও ভাবোচ্ছ্বাস লুক্কায়িত, তাহা কে বুঝিতে পারে? ইংরেজ বীরের জাতি, প্রকৃত ক্ষত্রিয়, তাঁহাদের শিক্ষাই ভাব গোপন করা ; ভাব কখনও না দেখানো, বাল্যকাল হইতেই তাঁহারা এই শিক্ষা পাইয়াছেন। দেখিবেন, খুব কম ইংরেজ কখন নিজ হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন ; পুরুষের কথা কেন, ইংরেজ নারীও কখন হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করেন না। আমি ইংরেজ নারীকে এমন কাজ করিতে দেখিয়াছি, যাহা করিতে অতি সাহসী বাঙালিও পশ্চাৎপদ হইবে। কিন্তু এই বীরত্বের পিছনে, এই ক্ষত্রসুলভ কঠিনতার অন্তরালে ইংরেজ হৃদয়ের ভাবধারার গভীর উৎস লুক্কায়িত। যদি আপনি একবার সেখানে পৌঁছিতে পারেন, যদি ইংরেজদের সহিত আপনার একবার ঘনিষ্ঠতা হয়, যদি তাহার সহিত মেশেন, যদি একবার আপনার নিকট তাহাকে তাহার হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করাইতে পারেন, তবে ইংরেজ আপনার চিরবন্ধু, আপনার চিরদাস। এই জন্য আমার মতে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ইংল্যাণ্ডে আমার প্রচারকার্য অধিকতর সন্তোষজনক হইয়াছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কাল যদি আমার দেহত্যাগ হয়, ইংল্যান্ডে আমার প্রচারকার্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং ক্রমশ বিস্তার লাভ করিতে থাকিবে।

ভ্রাতৃগণ! তোমরা আমার হৃদয়ের আর একটি তন্ত্রীতে, গভীরতম সুরের তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছ, আমার গুরুদেব, আমার আচার্য, আমার জীবনের আদর্শ, আমার ইষ্ট, আমার প্রাণের দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম উল্লেখ করিয়া। যদি কায়মনোবাক্যে আমি কোনো সৎকার্য করিয়া থাকি, যদি আমার মুখ হইতে এমন কোনো কথা বাহির হইয়া থাকে, যাহা দ্বারা জগতে কোনো ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার কোনো গৌরব নাই, তাহা তাঁহারই কিন্তু যদি আমার জিহ্বা কখনও অভিশাপ বর্ষণ করিয়া থাকে, যদি আমার মুখ হইতে কখনও কাহারও প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহা আমার, তাঁহার নহে। যাহা কিছু দুর্বল, যাহা কিছু দোষযুক্ত, সবই আমার। যাহা কিছু জীবনপ্রদ, যাহা কিছু বলপ্রদ, যাহা কিছু পবিত্র, সকলই তাঁহার প্রেরণা, তাঁহারই বাণী এবং তিনি স্বয়ং। সত্যই বন্ধুগণ, জগৎ এখনও সেই মহামানবকে জানিতে পারে নাই। আমরা জগতের ইতিহাসে শত শত মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিয়া থাকি ;

এখন আমরা যে আকারে সেই-সকল জীবনী পাই, সেগুলিতে বহু শতাব্দী যাবৎ শিষ্য-প্রশিষ্যগণের পরিবর্তন-পরিবর্ধনরূপ লেখনীচালনার পরিচয় পাওয়া যায়। সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ প্রাচীন মহাপুরুষগণের জীবন-চরিতগুলি ঘষিয়া-মাজিয়া কাটিয়া-ছাঁটিয়া মসৃণ করা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি যে-জীবন আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যাঁহার ছায়ায় আমি বাস করিয়াছি, যাঁহার পদতলে বসিয়া আমি সব শিখিয়াছি, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন যেমন উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত, আমার মতে আর কোনো মহাপুরুষের জীবন তেমন নহে।

বন্ধুগণ! তোমাদের সকলেরই ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত গীতার সেই প্রসিদ্ধ বাণী জানা আছে:

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি শরীর ধারণ করি। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টের দমন ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।

এই সঙ্গে আর একটি কথা তোমাদিগকে বুঝিতে হইবে, বিষয়টি এখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। এইরূপ একটি ধর্মের প্রবল বন্যা আসিবার পূর্বে সমাজের সর্বত্র ওইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ-পরম্পরার আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একটি তরঙ্গ, প্রথমে যাহার অস্তিত্বই হয়তো কাহারও চোখে পড়ে নাই, যাহা কেহ ভাল করিয়া দেখে নাই, যাহার গুঢ় শক্তিসম্বন্ধে কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই, সেটিই ক্রমশ প্রবল হইতে থাকে এবং অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিকে যেন গ্রাস করিয়া নিজ অঙ্গে মিলাইয়া লয়। এইরূপে বিপুল ও প্রবল হইয়া উহা মহাবন্যায় পরিণত হয় এবং সমাজের উপর এরূপ বেগে পতিত হয় যে, কেহ উহার গতিরোধ করিতে পারে না। এরূপ ব্যাপারই এক্ষণে ঘটিতেছে। যদি তোমাদের চক্ষু থাকে, তবেই দেখিবে ; যদি তোমাদের হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত থাকে, তবেই উহা গ্রহণ করিবে ; যদি সত্যানুসন্ধিৎসু হও, তবেই উহার সন্ধান পাইবে।

অন্ধ—সে অতি অন্ধ, যে সময়ের সংকেত দেখিতেছে না, বুঝিতেছে না। দেখিতেছ না, সুদুর গ্রামে জাত দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতামাতার এই সন্তান এখন সেই-সকল দেশে সত্য-সত্যই পুজিত হইতেছেন। যে-সকল দেশের লোকেরা বহু শতাব্দী যাবৎ পৌত্তলিক উপাসনার বিরুদ্ধে চিৎকার করিয়া আসিতেছে। ইহা কাহার শক্তি? ইহা কী তোমাদের শক্তি, না আমার? না, ইহা আর কাহারও শক্তি নহে ; যে-শক্তি এখানে রামকৃষ্ণ

পরমহংসরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, এ সেই শক্তি। কারণ তুমি আমি, সাধু মহাপুরুষ, এমন কী অবতারগণ সকলেই, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই শক্তির বিকাশমাত্র ; সেই শক্তি কোথাও বা কম, কোথাও বা বেশি ঘনীভূত, পুঞ্জীকৃত। এখন আমরা সেই মহাশক্তির খেলার আরম্ভমাত্র দেখিতেছি। আর বর্তমান যুগের অবসান হইবার পূর্বেই তোমরা ইহার আশ্চর্য, অতি আশ্চর্য খেলা প্রত্যক্ষ করিবে। ভারতবর্ষের পুনরুত্থানের জন্য এই শক্তির বিকাশ ঠিক সময়েই হইয়াছে। যে প্রাণশক্তি ভারতকে সর্বদা সঞ্জীবিত রাখিবে, তাহার কথা সময়ে সময়ে আমরা ভুলিয়া যাই।

প্রত্যেক জাতিরই উদ্দেশ্য সাধনের কার্যপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন। কেহ রাজনীতি, কেহ সমাজ-সংস্কার, কেহ বা অপর কিছুকে প্রধান উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া কাজ করিতেছে। আমাদের পক্ষে ধর্মের মধ্য দিয়া ছাড়া কাজ করিবার অন্য উপায় নাই। ইংরেজ রাজনীতির মাধ্যমে ধর্ম বোঝে ; বোধ হয় সমাজ-সংস্কারের সাহায্যে মার্কিন সহজে ধর্ম বুঝিতে পারে ; কিন্তু হিন্দু রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার ও অন্যান্য যাহা কিছু, সবই ধর্মের ভিতর দিয়া ছাড়া বুঝিতে পারে না। জাতীয় জীবন-সংগীতের এইটিই যেন প্রধান সুর, অন্যগুলি যেন তাহারই একটু বৈচিত্র্য মাত্র। আর ওইটিই নষ্ট হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল। আমরা যেন আমাদের জাতীয় জীবনের এই মূল ভাবটিকে সরাইয়া উহার স্থানে অন্য একটি ভাব স্থাপন করিতে যাইতেছিলাম, যে মেরুদণ্ডের বলে আমরা দণ্ডায়মান, আমরা যেন তাহার পরিবর্তে অপর একটি মেরুদণ্ড স্থাপন করিতে যাইতেছিলাম, আমাদের জাতীয় জীবনের ধর্মরূপ মেরুদণ্ডের স্থানে আমরা রাজনীতিরূপ মেরুদণ্ড স্থাপন করিতে যাইতেছিলাম ; যদি আমরা কৃতকার্য হইতাম, তবে আমাদের সমূলে বিনাশ হইত। কিন্তু তাহা তো হইবার নয়, তাই এই মহাশক্তির প্রকাশ হইয়াছিল। এই মহাপুরুষকে যেভাবেই লও, তাহা আমি গ্রাহ্য করি না! তাঁহাকে কতটা ভক্তিশ্রদ্ধা করো, তাহাতেও কিছু আসে যায় না, কিন্তু আমি জোর করিয়া বলিতেছি, গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ ভারতে যত মহাশক্তির বিকাশ হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। আর তোমরা যখন হিন্দু, তখন এই শক্তির দ্বারা শুধু ভারতবর্ষ হয়, সমগ্র মানবজাতির উন্নতি ও মঙ্গল কীরূপে সাধিত হইতেছে, তাহা জানিবার জন্য এই শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ইহাকে বুঝিবার চেষ্টা করা তোমাদের কর্তব্য। অহো, জগতের কোনো দেশে সার্বভৌম ধর্ম এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের প্রসঙ্গ আলোচিত হইবার অনেক পূর্বেই এই নগরীর সন্নিকটে এমন এক ব্যক্তি বাস করিতেন, যাঁহার সমগ্র জীবনই একটি ধর্মমহাসভা-স্বরূপ ছিল।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের শাস্ত্র নির্গুণ ব্রহ্মকেই আমাদের চরম লক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আর ঈশ্বরেচ্ছায় সকলেই যদি সেই নির্গুণ ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন, তবে বড়োই ভালো হইত ; কিন্তু তাহা যখন হইবার নয়, তখন আমাদের মনুষ্যজাতির

অনেকেরই পক্ষে একটি সগুণ আদর্শ না থাকিলে একেবারেই চলিবে না। এরূপ কোনো মহান্ আদর্শ পুরুষের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়া তাঁহার পতাকাতলে দণ্ডায়মান না হইয়া কোনো জাতিই উঠিতে পারে না, কোনো জাতিই বড়ো হইতে পারে না, এমনকী কোনো কাজই করিতে পারে না। রাজনীতিক, এমনকী সামাজিক বা বাণিজ্য জগতের কোনো আদর্শ পুরুষ কখনও ভারতে সর্ব সাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না। আমরা চাই আধ্যাত্মিক আদর্শ। উচ্চ অধ্যাত্মসম্পদের অধিকারী মহাপুরুষগণের নামে আমরা সম্মিলিত হইতে চাই, সকলে মাতিতে চাই। ধর্মবীর না হইলে আমরা তাঁহাকে আদর্শ করিতে পারি না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মধ্যে আমরা এমন এক ধর্মবীর, এমন একটি আদর্শ পাইয়াছি। যদি এই জাতি উঠিতে চায়, তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি— এই নামে সকলকে মাতিতে হইবে। রামকৃষ্ণ পরমহংসকে আমি বা অপর যে-কেহ প্রচার করুক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমি তোমাদের নিকট এই মহান্ আদর্শ পুরুষকে স্থাপন করিলাম। এখন বিচারের ভার তোমাদের ওপর। এই মহান্ আদর্শ পুরুষকে লইয়া কী করিবে, আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য তাহা তোমাদের এখনই স্থির করা উচিত। একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক, তোমরা যত মহাপুরুষ দেখিয়াছ অথবা স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি, যত মহাপুরুষের জীবনচরিত পাঠ করিয়াছ, তন্মধ্যে ইহার জীবন শুদ্ধতম। আর ইহা তো স্পষ্টই দেখিতেছি যে, এরূপ অত্যদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের কথা তোমরা তো কখনও পাঠও করো নাই, দেখিবার আশা তো দূরের কথা। তাঁহার তিরোভাবের পর দশ বৎসর যাইতে না যাইতে এই শক্তি জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, তাহা তো তোমরা প্রত্যক্ষই দেখিতেছ।

এই কারণে আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য, আমাদের ধর্মের উন্নতির জন্য কর্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া আমি এই মহান্ আধ্যাত্মিক আদর্শ তোমাদের সম্মুখে স্থাপন করিতেছি। আমাদের দেখিয়া তাঁহার বিচার করিও না। আমি অতি ক্ষুদ্র যন্ত্রমাত্র, আমাকে দেখিয়া তাঁহার চরিত্রের বিচার করিও না। তাঁহার চরিত্র এত উন্নত ছিল যে, আমি অথবা তাঁহার অপর কোনো শিষ্য যদি শত শত জীবন ধরিয়া চেষ্টা করি, তথাপি তিনি যথার্থ যাহা ছিলেন, তাহার কোটি ভাগের এক ভাগেরও তুল্য হইতে পারিব না। তোমরাই বিচার করো, তোমাদের অন্তরের অন্তস্তলে যিনি সনাতন সাক্ষিস্বরূপ বর্তমান আছেন, আমি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করিতেছি, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাদের জাতির কল্যাণের জন্য, আমাদের দেশের উন্নতির জন্য, সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্য তোমাদের হৃদয় খুলিয়া দিন ; আমরা কিছু করি বা না করি, তথাপি যে মহাযুগান্তর অবশ্যম্ভাবী, তাহার সহায়তার জন্য তিনি তোমাদিগকে অকপট ও দৃঢ়ব্রত করুন। তোমার আমার ভাল লাগুক বা নাই লাগুক, সে-জন্য প্রভুর কাজ আটকাইয়া থাকে না। তিনি সামান্য ধূলি হইতেও তাঁহার কাজের জন্য শত সহস্র কর্মী সৃষ্টি করিতে পারেন। তাঁহার অধীনে

থাকিয়া কাজ করা তো আমাদের পক্ষে সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয়।

এইরূপে চারিদিকে ভাব ছড়াইতে থাকে। তোমরা বলিয়াছ, আমাদিগকে সমগ্র জগৎ জয় করিতে হইবে। হাঁ, আমাদিগকে তাহা করিতেই হইবে ; ভারতকে অবশ্যই পৃথিবী জয় করিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা নিম্নতর আদর্শে আমি কখনোই সন্তুষ্ট হইতে পারি না। আদর্শটি হয়তো খুব বড়ো হইতে পারে, তোমাদের অনেকে এ-কথা শুনিয়া আশ্চর্য বোধ করিতে পারো, তথাপি ইহাই আমাদের আদর্শ হইবে। আমাদিগকে হয় সমগ্র জগৎ জয় করিতে হইবে, নতুবা মরিতে হইবে ; ইহা ছাড়া আর কোনো পথ নাই। বিস্তৃতিই জীবনের চিহ্ন। আমাদিগকে ক্ষুদ্র গণ্ডির বাহিরে যাইতে হইবে, হৃদয়ের বিস্তার করিতে হইবে ; আমাদের যে জীবন আছে, তাহা দেখাইতে হইবে ; নতুবা আমরা অতি হীন অবস্থায় পচিয়া মরিব, আর অন্য উপায় নাই। দুয়ের মধ্যে একটা করো, হয় বাঁচো, না হয় মর।

সামান্য বিষয় লইয়া আমাদের দেশে কলহের কথা কাহারও অবিদিত নাই ; কিন্তু আমার কথা শোন, ইহা সব দেশেই আছে। রাজনীতি যে-সকল জাতীর জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, সেই-সকল জাতি আত্মরক্ষার জন্য বৈদেশিক নীতি (Foreign Policy) অবলম্বন করিয়া থাকে। যখন তাহাদের নিজ দেশে পরস্পরের মধ্যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হয়, তখন তাহারা কোনো বৈদেশিক জাতির সহিত বিবাহের সূচনা করে, অমনি গৃহবিবাহ থামিয়া যায়। আমাদের গৃহবিবাদ আছে, কিন্তু উহা থামাইবার কোনো বৈদেশিক নীতি নাই। জগতের সবজাতির মধ্যে আমাদের শাস্ত্রে নিবদ্ধ সত্যসমূহের প্রচারই আমাদের সনাতন বৈদেশিক নীতি হউক। ইহা যে আমাদিগকে একটি অখণ্ড জাতিরূপে মিলিত করিবে, তাহার কি অন্য কোনো প্রমাণ চাও ? তোমাদের মধ্যে যাহারা রাজনীতি-ঘেঁষা তাহাদিগকেই আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। অদ্যকার সভাই যে এ-বিষয়ের চূড়ান্ত প্রমাণ।

দ্বিতীয়ত, এই-সব স্বার্থের বিচার ছাড়িয়া দিলেও আমাদের পিছনে নিঃস্বার্থ মহান্ জীবন্ত দৃষ্টান্তসকল রহিয়াছে। ভারতের পতন ও দুঃখ-দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, ভারত নিজ কার্যক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিয়াছিল, শামুকের মতো খোলার ভিতর ঢুকিয়া বসিয়াছিল, আর্যেতর অন্যান্য সত্যপিপাসু জাতির নিকট নিজ রত্নভাণ্ডার, জীবনপ্রদ সত্যরত্নের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে নাই। আমাদের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, আমরা বাহিরে যাইয়া অপর জাতির সহিত নিজেদের তুলনা করি নাই ; আপনারা সকলেই জানেন, যে-দিন হইতে রাজা রামমোহন রায় এই সংকীর্ণতার বেড়া ভাঙিলেন, সেই দিন হইতেই ভারতের সর্বত্র আজ যে-একটু স্পন্দন, একটু জীবন অনুভূত হইতেছে, তাহা আরম্ভ হইয়াছে। সেইদিন হইতেই ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছে এবং ভারত এখন ক্রমবর্ধমান গতিতে উন্নতির পথে চলিয়াছে। অতীত কালে যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী দেখা গিয়া থাকে, তবে জানিবেন, এখন মহা বন্যা আসিতেছে, আর

কেহই উহার গতিরোধ করিতে পারিবে না।

অতএব আমাদিগকে বিদেশে যাইতেই হইবে, কারণ আদান-প্রদানই অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র। আমরা কি চিরকালই পাশ্চাত্যের পদতলে বসিয়া সব জিনিস, এমনকী ধর্ম পর্যন্ত শিখিব? অবশ্য তাহাদের নিকট আমরা কলকব্জা শিখিতে পারি, আরও অন্যান্য অনেক বিষয় শিখিতে পারি, কিন্তু আমাদেরও তাহাদিগকে কিছু শিখাইতে হইবে; অথবা তাহাদিগকে আমাদের ধর্ম, আমাদের গভীর আধ্যাত্মিকতা শিখাইব। পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার জন্য জগৎ অপেক্ষা করিতেছে। পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে ভারত যে ধর্মরূপ অমূল্য রত্ন পাইয়াছে, তাহার দিকে জগৎ সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে। হিন্দুজাতি বহু শতাব্দীর অবনতি ও দুঃখ-দুর্বিপাকের মধ্যেও যে আধ্যাত্মিকতা সযত্নে হৃদয়ে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, জগৎ সেই রত্নের আশায় সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিয়াছে।

তোমাদের পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকাররূপে লব্ধ সেই অপূর্ব রত্নরাজির জন্য ভারতের বাহিরে যে কতখানি আগ্রহ, তাহা তোমরা কিছুই জান না। আমরা এখানে অনর্গল বাক্যব্যয় করিতেছি, পরস্পর বিবাদ করিতেছি, যাহা কিছু গভীর শ্রদ্ধার বস্তু সব হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছি, এখন এই হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া একটা জাতীয় দোষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষগণ এই ভারতে যে অমৃত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার এক বিন্দু পান করিবার জন্য ভারতের বাহিরে লক্ষ লক্ষ নরনারী কত আগ্রহের সহিত হাত বাড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা আমরা কিছুই বুঝি না। অতএব আমাদিগকে ভারতের বাহিরে যাইতেই হইবে। আমাদের আধ্যাত্মিকতার বিনিময়ে তাহারা যাহা কিছু দিতে পারে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। অধ্যাত্মজগতের অপূর্ব তত্ত্বসমূহের বিনিময়ে আমরা জড়রাজ্যের অদ্ভুত বিষয়গুলি শিক্ষা করিব। চিরকাল শিষ্য হইয়া থাকিলে চলিবে না, আমাদিগকে গুরুও হইতে হইবে। সমভাবাপন্ন না হইলে কখনও বন্ধুত্ব হয় না ; আর যখন একদল লোক সর্বদাই আচার্যের আসন গ্রহণ করে এবং অপর দল সর্বদাই তাহাদের পদতলে বসিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়, তখন উভয়ের মধ্যে কখনও সমভাব আসিতে পারে না। যদি ইংরেজ বা মার্কিনদের সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে তোমাদিগকে উহাদের নিকট যেমন শিখিতে হইবে, তেমনি তাহাদিগকে শিখাইতেও হইবে। আর এখনও বহু শতাব্দী যাবৎ জগৎকে শিখাইবার বিষয় তোমাদের যথেষ্ট আছে। এখন এই কাজ করিতেই হইবে।

হৃদয়ে উৎসাহাগ্নি জ্বালিতে হইবে। লোকে বলিয়া থাকে, বাঙালি জাতির কল্পনাশক্তি অতি প্রখর, আমি উহা বিশ্বাস করি। আমাদিগকে লোকে কল্পনাপ্রিয় ভাবুক জাতি বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। কিন্তু বন্ধুগণ! আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ইহা উপহাসের বিষয় নয়, কারণ প্রবল উচ্ছ্বাসেই হৃদয়ে তত্ত্বালোকের স্ফুরণ হয়। বুদ্ধিবৃত্তি, বিচারশক্তি খুব ভালো জিনিস, কিন্তু এগুলি বেশিদূর যাইতে পারে না। ভাবের মধ্য দিয়াই গভীরতর

রহস্যসমূহ উদ্‌ঘাটিত হয়। অতএব বাঙালির দ্বারা, ভাবুক বাঙালির দ্বারাই ওই কার্য সাধিত হইবে। 'উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত', উঠ, জাগো, যতদিন না অভীপ্সিত বস্তু লাভ করিতেছ, ততদিন ক্রমাগত সেই উদ্দেশে চলিতে থাকো, ক্ষান্ত হইও না।

কলিকাতাবাসী যুবকগণ, উঠ, জাগো, কারণ শুভমুহূর্ত আসিয়াছে। এখন আমাদের সকল বিষয়ে সুবিধা হইয়া আসিতেছে। সাহস অবলম্বন করো, ভয় পাইও না, কেবল আমাদের শাস্ত্রেই ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া 'অভীঃ'; এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদিগকে 'অভীঃ', নির্ভীক হইতে হইবে, তবেই আমরা কার্যে সিদ্ধিলাভ করিব ; উঠ, জাগো, কারণ তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলি প্রার্থনা করিতেছেন। যুবকগণের দ্বারা এই কার্য সাধিত হইবে। 'আশিষ্ট দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী' যুবকদের দ্বারাই এই কার্য সাধিত হইবে। আর কলিকাতায় এইরূপ শত সহস্র যুবক রহিয়াছে। তোমরা বলিয়াছ, আমি কিছু কাজ করিয়াছি। যদি তাহাই হয়, তবে ইহাও স্মরণ রাখিও যে, আমি এক সময় অতি নগণ্য বালকমাত্র ছিলাম, আমিও এক সময় এই কলিকাতার রাস্তায় তোমাদের মতো খেলিয়া বেড়াইতাম। যদি আমি এতখানি করিয়া থাকি, তবে তোমরা আমা-অপেক্ষা কত অধিক কাজ করিতে পারো। উঠ, জাগো, জগৎ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। ভারতের অন্যান্য স্থানে বুদ্ধিবল আছে, ধনবল আছে, কিন্তু কেবল আমার মাতৃভূমিতেই উৎসাহাগ্নি বিদ্যমান। এই উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে ; অতএব হে কলিকাতাবাসী যুবকগণ! হৃদয়ে এই উৎসাহের আগুন জ্বালিয়া জাগরিত হও।

ভাবিও না তোমরা দরিদ্র, ভাবিও না তোমরা বন্ধুহীন ; কে কোথায় দেখিয়াছে, টাকায় মানুষ করে? মানুষই চিরকাল টাকা করিয়া থাকে। জগতের যা কিছু উন্নতি, সব মানুষের শক্তিতে হইয়াছে, উৎসাহের শক্তিতে হইয়াছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হইয়াছে। তোমাদের মধ্যে যাহারা উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে অতি মনোরম কঠোপনিষৎ পাঠ করিয়াছ, তাহাদের অবশ্যই স্মরণ আছে ; এক রাজর্ষি এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ভালো ভালো জিনিস দক্ষিণা না দিয়া অতি বৃদ্ধ, কার্যের অনুপযুক্ত কতকগুলি গাভী দক্ষিণা দিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার পুত্র নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধা প্রবেশ করিল। এই 'শ্রদ্ধা' শব্দটি আমি তোমাদের নিকটে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া বলিব না; অনুবাদ করিলে ভুল হইবে। এই অপূর্ব শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা কঠিন ; এই শব্দের প্রভাব ও কার্যকারিতা অতি বিস্ময়কর। নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধা জাগিবামাত্র কী ফল হইল, দেখ। শ্রদ্ধা জাগিবামাত্রই নচিকেতার মনে হইল, আমি অনেকের মধ্যে প্রথম, অনেকের মধ্যে মধ্যম, অধম আমি কখনো নহি ; আমিও কিছু কার্য করিতে পারি। তাঁহার এইরূপ আত্মবিশ্বাস ও সাহস বাড়িতে লাগিল, তখন যে সমস্যার চিন্তায় তাঁহার মন আলোড়িত হইতেছিল, তিনি সেই মৃত্যুতত্ত্বের মীমাংসা করিতে উদ্যত হইলেন ; যমগৃহে গমন ব্যতীত এই সমস্যার মীমাংসা হইবার অন্য উপায় ছিল না, সুতরাং তিনি যম-সদনে গমন করিলেন।

সেই নির্ভীক বালক নচিকেতা যমগৃহে তিনদিন অপেক্ষা করিলেন। তোমরা জানো, কীরূপে তিনি যমের নিকট হইতে সমুদয় তত্ত্ব অবগত হইলেন। আমাদের চাই এই শ্রদ্ধা। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত হইতে এই শ্রদ্ধা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। সেজন্যই আমাদের এই বর্তমান দুর্দশা। মানুষে মানুষে প্রভেদ এই শ্রদ্ধার তারতম্য লইয়া, আর কিছুতেই নহে। এই শ্রদ্ধার তারতম্যেই কেহ বড়ো হয়, কেহ ছোটো হয়। আমার গুরুদেব বলিতেন, যে আপনাকে দুর্বল ভাবে, সে দুর্বলই হইবে, ইহা অতি সত্য কথা। এই শ্রদ্ধা তোমাদের ভিতর প্রবেশ করুক। পাশ্চাত্যজাতি জড়জগতে যে আধিপত্য লাভ করিয়াছে, তাহা এই শ্রদ্ধারই ফলে ; তাহারা শারীরিক বলে বিশ্বাসী। তোমরা যদি আত্মাতে বিশ্বাসী হও, তাহা হইলে তাহার ফল আরও অদ্ভুত হইবে। তোমাদের শাস্ত্র, তোমাদের ঋষিগণ একবাক্যে যাহা প্রচার করিতেছেন, সেই অনন্ত শক্তির আধার আত্মায় বিশ্বাসী হও, যে আত্মাকে কেহ নাশ করিতে পারে না, যাঁহাতে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে। কেবল আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। এখানেই অন্যান্য দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ। দ্বৈতবাদীই হউন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীই হউন, আর অদ্বৈতবাদীই হউন, সকলেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, আত্মার মধ্যেই সব শক্তি রহিয়াছে ; কেবল উহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। অতএব আমি চাই, এই শ্রদ্ধা। আমাদের সকলেরই আবশ্যক, এই আত্মবিশ্বাস ; আর এই বিশ্বাস-অর্জনরূপ মহৎকার্য তোমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের জাতীয় শোণিতে এক ভয়ানক রোগের বীজ প্রবেশ করিতেছে, সকল বিষয় হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া, গাম্ভীর্যের অভাব। এই দোষটি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। বীর হও, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও, আর যাহা কিছু সব আসিবেই আসিবে।

আমি তো এখনও কিছুই করিতে পারি নাই, তোমাদিগকেই সব করিতে হইবে। যদি কাল আমার দেহত্যাগ হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই কার্য লোপ পাইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জনসাধারণের মধ্য হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি আসিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিবে এবং কার্যের এতদূর উন্নতি ও বিস্তার হইবে যে, যাহা আমি কখনও কল্পনাও করি নাই। আমার দেশের উপর আমি বিশ্বাস রাখি, বিশেষত আমার দেশের যুবকদলের উপর। বঙ্গীয় যুবকগণের স্কন্ধে অতি গুরুভার সমর্পিত। আর কখনও কোনো দেশের যুবকদলের উপর এত গুরুভার পড়ে নাই। আমি প্রায় গত দশ বছর যাবৎ সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি, তাহাতে আমরা দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর দিয়াই সেই শক্তি প্রকাশিত হইবে, যাহা ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে। নিশ্চয় বলিতেছি, এই হৃদয়বান্ উৎসাহী বঙ্গীয় যুবকগণের মধ্য হইতেই শত শত বীর উঠিবে। যাহারা আমাদের পূর্বপুরুষগণের প্রচারিত সনাতন আধ্যাত্মিক সত্য প্রচার করিয়া ও শিক্ষা দিয়া জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত, এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্যন্ত ভ্রমণ করিবে। তোমাদের সম্মুখে এই মহান্ কর্তব্য রহিয়াছে।

অতএব আর একবার তোমাদিগকে সেই মহতী বাণী, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' স্মরণ করাইয়া দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

ভয় পাইও না, কারণ মনুষ্যজাতির ইতিহাসে দেখা যায়, সাধারণ লোকের ভিতরেই যত কিছু মহাশক্তির প্রকাশ হইয়াছে, জগতে যত বড়ো বড়ো প্রতিভাশালী পুরুষ জন্মিয়াছেন, সবই সাধারণ লোকের মধ্য হইতে ; আর ইতিহাসে একবার যাহা ঘটিয়াছে, পুনরায় তাহা ঘটিবে। কিছুতেই ভয় পাইও না। তোমরা বিস্ময়কর কার্য করিবে। যে মুহূর্তে তোমাদের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে, সেই মুহূর্তে তোমরা শক্তিহীন। ভয়ই জগতের সমুদয় দুঃখের মুল কারণ, ভয়ই সর্বাপেক্ষা বড়ো কুসংস্কার ; নির্ভীচ্ছুক হইলে মুহূর্ত মধ্যেই স্বর্গ আমাদের করতলগত হয়। অতএব 'উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, সেজন্য আপনাদিগকে পুনরায় ধন্যবাদ দিতেছি। আমি আপনাদিগকে কেবল বলিতে পারি, আমার ইচ্ছা, আমার প্রবল আন্তরিক ইচ্ছা আমি যেন জগতের, সর্বোপরি আমার স্বদেশের ও স্বদেশবাসিগণের যৎসামান্য সেবায় লাগিতে পারি।

' কলকাতা তখন ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল।

রাজনীতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সভাপতির অভিভাষণ

পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনি

অদ্যকার এই মহাসভায় সভাপতির আসনের আহ্বান করিয়া আপনারা আমাকে যে সম্মান দান করিয়াছেন আমি তাহার অযোগ্য, এ কথার উল্লেখমাত্রও বাহুল্য। বস্তুত এরূপ সম্মান গ্রহণ করা সহজ, বহন করাই কঠিন। অযোগ্য লোককে উচ্চপদে বসানো তাহাকে অপদস্থ করিবারই উপায়।

অন্য সময় হইলে এতবড়ো দুঃসাধ্য দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতিলাভের চেষ্টা করিতাম। কিন্তু বর্তমানে আমাদের আত্মবিচ্ছেদের সংকটকালে যখন ডাঙায় বাঘ ও জলে কুমির, যখন রাজপুরুষ কালপুরুষের মূর্তি ধরিয়াছেন এবং আত্মীয়সমাজেও পরস্পরের প্রতি কেহ ধৈর্য অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না, যখন নিশ্চয় জানি অদ্যকার দিনে সভাপতির আসন সুখের আসন নহে এবং হয়তো ইহা সম্মানের আসনও না হইতে পারে, অপমানের আশঙ্কা চতুর্দিকেই পুঞ্জীভূত, তখন আপনাদের এই আমন্ত্রণে বিনয়ের উপলক্ষ্য করিয়া আজ আর কাপুরুষের মতো ফিরিয়া যাইতে পারিলাম না, এবং বিশ্বজগতের সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধের মাঝখানে 'য একঃ' যিনি এক, 'অবর্ণঃ' মানবসমাজের বিবিধ জাতির মাঝখানে জাতিহীন যিনি বিরাজমান, যিনি 'বহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি' বহুধা শক্তির দ্বারা নানা জাতির নানা প্রয়োজন বিচিত্ররূপে সম্পাদন করিতেছেন, 'বিচৈতিচান্তে বিশ্বমাদৌ' বিশ্বের সমস্ত আরম্ভেও যিনি সমস্ত পরিণামেও যিনি, 'স দেবঃ, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু' সেই দেবতা তিনি আমাদের এই মহাসভায় শুভবুদ্ধিস্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়া আমাদের হৃদয় হইতে সমস্ত ক্ষুদ্রতা অপসারিত করিয়া দিন, আমাদের চিত্তকে পরিপূর্ণ প্রেমে সম্মিলিত এবং আমাদের চেষ্টাকে সুমহৎ লক্ষ্যে নিবিষ্ট করুন, একান্তমনে এই প্রার্থনা করিয়া, অযোগ্যতার বাধা সত্ত্বেও এই মহাসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেছি।

বিশেষত জানি, এমন সময় আসে যখন অযোগ্যতাই বিশেষ যোগ্যতার স্বরূপ হইয়া উঠে।

এতদিন আমি দেশের রাষ্ট্রসভায় স্থান পাইবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করি নাই। ইহাতে আমার ক্ষমতার অভাব এবং স্বভাবেরও ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে।

সেই ত্রুটিবশতই আমি সকল দলের বাহিরে পড়িয়া থাকাতে, আমাকেই সকলের চেয়ে নিরীহ জ্ঞান করিয়া, সভাপতির উচ্চ আসনটিকে নিরাপদ করিবার জন্যই, আমাকে আপনারা এইখানে বসাইয়া দিয়াছেন। আপনাদের সেই ইচ্ছা যদি সফল হয় তবেই আমি ধন্য হইব। কিন্তু রামচন্দ্র সত্যপালনের জন্য নির্বাসনে গেলে পর ভরত যেভাবে রাজ্যরক্ষার ভার লইয়াছিলেন আমিও তেমনি আমার নমস্য জ্যেষ্ঠগণের খড়মজোড়াকেই মনের সম্মুখে রাখিয়া নিজেকে উপলক্ষ্যস্বরূপ এখানে স্থাপিত করিলাম।

রাষ্ট্রসভার কোনো দলের সহিত আমার যোগ ঘনিষ্ঠ নহে বলিয়াই, সম্প্রতি কংগ্রেসে যে আত্মবিপ্লব ঘটিয়াছে তাহাকে আমি দূর হইতে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। যাঁহারা ইহার ভিতরে ছিলেন তাঁহারা স্বভাবতই এই ব্যাপারটাকে এতই উৎকৃষ্ট করিয়া দেখিয়াছেন ও ইহা হইতে এতই গুরুতর অহিতের আশঙ্কা করিতেছেন যে, এখনও তাঁহাদের মনের ক্ষোভ দূর হইতে পারিতেছে না।

কিন্তু ঘটনায় যাহা নিঃশেষ হইয়াছে বেদনায় তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করা বলিষ্ঠ প্রকৃতির লক্ষণ নহে। কবি বলিয়াছেন, যথার্থ প্রেমের স্রোত অব্যাহতভাবে চলে না। যথার্থ জীবনের স্রোতও সেইরূপ, যথার্থ কর্মের স্রোতেরও সেই দশা। দেশের নাড়ীর মধ্যে প্রাণের বেগ চঞ্চল হইয়া উঠাতেই কর্মে যদি মাঝে মাঝে এরূপ ব্যাঘাত ঘটিয়া পড়ে তবে ইহাতে হতাশ না হইয়া এই কথাই মনে রাখিতে হইবে যে, যে জীবনধর্মের অতিচাঞ্চল্যে কন্‌গ্রেসকে একবার আঘাত করিয়াছে সেই জীবনধর্মই এই আঘাতকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া কন্‌গ্রেসের মধ্যে নূতন স্বাস্থ্যের সঞ্চার করিবে। মৃত পদার্থই আপনার কোনো ক্ষতিকে ভুলিতে পারে না। শুষ্ক কাষ্ঠ যেমন ভাঙে তেমনি ভাঙাই থাকে, কিন্তু সজীব গাছ নূতন পাতায় নূতন শাখায় সর্বদাই আপনার ক্ষতি পূরণ করিয়া বাড়িয়া উঠিতে থাকে।

অতএব সুস্থ দেহ যেমন নিজের ক্ষতকে শীঘ্রই শোধন করিতে পারে তেমনি আমরা অতিসত্বর কন্‌গ্রেসের আঘাতক্ষতকে আরোগ্যে লইয়া যাইব এবং সেইসঙ্গে এই ঘটনার শিক্ষাটুকুও নম্রভাবে গ্রহণ করিব।

সে শিক্ষাটুকু এই যে, যখন কোনো প্রবল আঘাতে মানুষের মন হইতে ঔদাসীন্য ঘুচিয়া যায় এবং সে উত্তেজিত অবস্থায় জাগিয়া উঠে তখন তাহাকে লইয়া যে কাজ করিতে হইবে সে কাজে মতের বৈচিত্র্য এবং মতের বিরোধ সহিষ্ণুভাবে স্বীকার করিতেই হইবে। যখন দেশের চিত্ত নির্জীব ও উদাসীন থাকে তখনকার কাজের প্রণালী যেরূপ,

বিপরীত অবস্থায় সেরূপ হইতেই পারে না।

এই সময়ে যাহা অপ্রিয় তাহাকে বলপূর্বক বিধ্বস্ত এবং যাহা বিরুদ্ধ তাহাকে আঘাতের দ্বারা নিরস্ত করিবার চেষ্টা করা কোনোমতেই চলে না। এমনকি, এইরূপ সময়ে হার মানিয়াও জয়লাভ করিতে হইবে ; জিতিবই পণ করিয়া বসিলে সে জিতের দ্বারা যাহাকে পাইতে ইচ্ছা করি তাহাকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব।

সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধকে একটা বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে বাঁধিয়া তোলাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো শিক্ষা। এই শিক্ষা যদি আমাদের অসম্পূর্ণ থাকে তবে স্বায়ত্তশাসন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। যথার্থ স্বায়ত্তশাসনের অধীনে মতবৈচিত্র্য দলিত হয় না, সকল মতই আপনার যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া লয় এবং বিরোধের বেগেই পরস্পরের শক্তিকে পরিপূর্ণরূপে সচেতন করিয়া রাখে।

য়ুরোপের রাষ্ট্রকার্যে সর্বত্রই বহুতর বিরোধী দলের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। প্রত্যেক দলই প্রাধান্যলাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। লেবার পার্টি, সোশ্যালিস্ট প্রভৃতি এমন সকল দলও রাষ্ট্রসভায় স্থান পাইয়াছে যাহারা বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে নানা দিকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে চায়।

এত অনৈক্য কীসের বলে এক হইয়া আছে, এবং এত বিরোধ মিলনকে চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে না কেন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, এই সকল জাতির চরিত্রে এমন একটি শিক্ষা সুদৃঢ় হইয়াছে যাহাতে সকল পক্ষই নিয়মের শাসনকে মান্য করিয়া চলিতে পারে। নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া তাহারা প্রার্থিত ফলকে ছিন্ন করিয়া লইতে চায় না নিয়মকে পালন করিয়াই জয়লাভ করিবার জন্য ধৈর্য অবলম্বন করিতে জানে। এই সংযম তাহাদের বলেরই পরিচয়। এই কারণেই এত বিচিত্র ও বিরুদ্ধ মতিগতির লোককে একত্রে লইয়া, শুধু তর্ক ও আলোচনা নহে, বড়ো বড়ো রাজ্য ও সাম্রাজ্য-চালনার কার্য সম্ভবপর হইয়াছে।

আমাদের কন্‌গ্রেসের পশ্চাতে রাজ্য-সাম্রাজ্যের কোনো দায়িত্বই নাই, কেবলমাত্র একত্র হইয়া দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় দেশের ইচ্ছাকে প্রকাশ করিবার জন্যই এই সভাকে বহন করিতেছেন। এই উপায়ে দেশের ইচ্ছা ক্রমশ পরিস্ফুট আকার ধারণ করিয়া বল লাভ করিবে এবং সেই ইচ্ছাশক্তি ক্রমে কর্মশক্তিতে পরিণত হইয়া দেশের আত্মোপলব্ধিকে সত্য করিয়া তুলিবে, এই আমাদের লক্ষ্য। সমস্ত দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মিলিত চেষ্টা যে মহাসভায় আমাদের ইচ্ছাশক্তির বোধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে এমন ঔদার্য যদি না থাকে যাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণি ও সকল মতের লোকই সেখানে স্থান পাইতে পারেন তবে তাহাতে আমাদের ক্ষমতার অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায়।

এই মিলনকে সম্ভবপর করিবার জন্য মতের বিরোধকে বিলুপ্ত করিতে হইবে এরূপ ইচ্ছা করিলেও তাহা সফল হইবে না, এবং সফল হইলেও তাহাতে কল্যাণ নাই। বিশ্বসৃষ্টি

ব্যাপারে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তি পরস্পর প্রতিঘাতী অথচ এক নিয়মের শাসনাধীন বলিয়াই বিচিত্র সৃষ্টি বিকশিত হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। রাষ্ট্রসভাতেও নিয়মের দ্বারা সংযত হইয়াও প্রত্যেক মতকেই প্রাধান্যলাভের চেষ্টা করিতে না দিলে এরূপ সভার স্বাস্থ্য নষ্ট, শিক্ষা অসম্পূর্ণ, ও ভবিষ্যৎ পরিণতি সংকীর্ণ হইতে থাকিবে। এতএব মতবিরোধ যখন কেবলমাত্র অবশ্যম্ভাবী নহে, তাহা মঙ্গলকর, তখন মিলিতে গেলে নিয়মের শাসন অমোঘ হওয়া চাই। নতুবা বরযাত্রী ও কন্যাপক্ষে উচ্ছৃঙ্খলভাবে বিবাদ করিয়া শেষকালে বিবাহটাই পণ্ড হইতে থাকে। যেমন বাষ্পসংঘাতকে লোহার বয়লারের মধ্যে বাঁধিতে পারিলে তবেই কল চলিতে পারে, তেমনি আমাদের মতসংঘাতের আশঙ্কা যতই প্রবল হইবে আমাদের নিয়ম-বয়লারও ততই বজ্রের ন্যায় কঠিন হইলে তবেই কর্ম অগ্রসর হইবে, নতুবা অনর্থপাত ঘটিতে বিলম্ব হইবে না।

আমরা এ-পর্যন্ত কন্‌গ্রেসের ও কন্‌ফারেন্সের জন্য প্রতিনিধিনির্বাচনের যথারীতি নিয়ম স্থির করি নাই। যতদিন পর্যন্ত দেশের লোক উদাসীন থাকাতে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কোনো মতের দ্বৈধ ছিল না ততদিন এরূপ নিয়মের শৈথিল্যে কোনো ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু যখন দেশের মনটা জাগিয়া উঠিয়াছে তখন দেশের কর্মে সেই মনটা পাইতে হইবে, তখন প্রতিনিধি নির্বাচনকালে সত্যভাবে দেশের সম্মতি লইতে হইবে। এইরূপ, শুধু নির্বাচনের নহে, কন্‌গ্রেসের ও কন্‌ফারেন্সের কার্যপ্রণালীরও বিধি সুনির্দিষ্ট হওয়ার সময় আসিয়াছে।

এমন না করিয়া কেবল বিবাদ বাঁচাইয়া চলিবার জন্য দেশের এক-এক দল যদি এক-একটি সাম্প্রদায়িক কন্‌গ্রেসের সৃষ্টি করেন তবে কন্‌গ্রেসের কোনো অর্থই থাকিবে না। কন্‌গ্রেস সমগ্র দেশের অখণ্ড সভা, বিঘ্ন ঘটিবামাত্রই সেই সমগ্রতাকেই যদি বিসর্জন দিতে উদ্যত হই তবে কেবলমাত্র সভার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আমাদের এমন কী লাভ হইবে।

এপর্যন্ত আমরা কোনো কাজ বা ব্যবসায় এমনকি আমোদের জন্য দল বাঁধিয়া, যখনই অনৈক্য ঘটিয়াছে তখনই ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছি। বিরোধ ঘটিবামাত্র আমরা মূল জিনিসটাকে হয় নষ্ট নয় পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বৈচিত্র্যকে ঐক্যের মধ্যে বাঁধিয়া তাহাকে নানাঅঙ্গ-বিশিষ্ট কলেবরে পরিণত করিবার জীবনীশক্তি আমরা দেখাইতে পারিতেছি না। আমাদের সমস্ত দুর্গতির কারণই তাই। কন্‌গ্রেসের মধ্যেও যদি সেই রোগটা ফুটিয়া পড়ে, সেখানেও যদি উপরিতলে বিরোধের আঘাতমাত্রেই ঐক্যের মূল ভিত্তিটা পর্যন্ত বিদীর্ণ হইতে থাকে, তবে আমরা কোনো পক্ষই দাঁড়াইব কীসের উপরে। যে সরষের দ্বারা ভূত ঝাড়াইব সেই সরষেকেই ভূতে পাইয়া বসিলে কী উপায়।

বঙ্গবিভাগকে রহিত করিবার জন্য আমরা যেরূপ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি, এই

আসন্ন আত্মবিভাগকে নিরস্ত করিবার জন্য আমাদিগকে তাহা অপেক্ষাও আরও বেশি চেষ্টা করিতে হইবে। পরের নিকট যে দুর্বল, আত্মীয়ের নিকট সে প্রচণ্ড হইয়া যেন নিজেকে প্রবল বলিয়া সান্ত্বনা না পায়। পরে যে বিচ্ছেদ সাধন করে তাহাতে অনিষ্টমাত্র ঘটে, নিজে যে বিচ্ছেদ ঘটাই তাহাতে পার হয় ; এই পাপের অনিষ্ট অন্তরের গভীরতম স্থানে নিদারুণ প্রায়শ্চিত্তের অপেক্ষায় সঞ্চিত হইয়া থাকে।

আমাদের যে সময় উপস্থিত হইয়াছে এখন আত্মবিস্মৃত হইলে কোনোমতেই চলিবে না; কারণ, এখন আমরা মুক্তির তপস্যা করিতেছি ; ইন্দ্রদেব আমাদের পরীক্ষার জন্য এই যে তপোভঙ্গের উপলক্ষকে পাঠাইয়াছেন ইহার কাছে হার মানিলে আমাদের সমস্ত সাধনা নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব ভ্রাতৃগণ, যে ক্রোধে ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই হাত তুলিতে চায় সে ক্রোধ দমন করিতেই হইবে, আত্মীয়কৃত সমস্ত বিরোধকে বারংবার ক্ষমা করিতে হইবে, পরস্পরের অবিবেচনার দ্বারা যে সংঘাত ঘটিয়াছে তাহার সংশোধন করিতে ও তাহাকে ভুলিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলে চলিবে না। আগুন যখন আমাদের নিজের ঘরেই লাগিয়াছে তখন দুই পক্ষ দুই দিক হইতে এই অগ্নিকে উষ্ণবাক্যের বায়ুবীজন করিয়া ইহাকে প্রতিকারের অতীত করিয়া তুলিলে, তাহার চেয়ে মূঢ়তা আমাদের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারিবে না। পরের কৃত বিভাগ লইয়া দেশে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে শেষে আত্মকৃত বিভাগই যদি তাহার পরিণাম হয়, ভারতের শনিগ্রহ যদি এবার লর্ড কার্জন-মূর্তি পরিহার করিয়া আত্মীয়মূর্তি ধরিয়াই দেখা দেয়, তবে বাহিরের তাড়নায় অস্থির হইয়া ঘরের মধ্যেও আশ্রয় লইবার স্থান পাইব না।

এ দিকে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদের খড়্গ দেশের মাথার উপর ঝুলিতেছে। কত শত বৎসর হইয়া গেল, আমরা হিন্দু ও মুসলমান একই দেশমাতার দুই জানুর উপরে বসিয়া একই স্নেহ উপভোগ করিয়াছি, তথাপি আজও আমাদের মিলনে বিঘ্ন ঘটিতেছে।

এই দুর্বলতার কারণ যতদিন আছে ততদিন আমাদের দেশের কোনো মহৎ আশাকে সম্পূর্ণ সফল করা সম্ভবপর হইবে না ; আমাদের সমস্ত রাষ্ট্রীয় কর্তব্যপালনই পদে পদে দুরূহ হইতে থাকিবে।

বাহির হইতে এই হিন্দুমুসলমানের প্রভেদকে যদি বিরোধে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয় তবে তাহাতে আমরা ভীত হইব না, আমাদের নিজের ভিতরে যে ভেদবুদ্ধির পাপ আছে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেই আমরা পরের কৃত উত্তেজনাকে অতিক্রম করিতে নিশ্চয়ই পারিব। এই উত্তেজনা কালক্রমে আপনিই মরিতে বাধ্য। কারণ, এই আগুনে নিয়ত কয়লা জোগাইবার সাধ্য গবর্মেন্টের নাই। এ আগুনকে প্রশ্রয় দিতে গেলে শীঘ্রই ইহা এমন সীমায় গিয়া পৌঁছিবে যখন দমকলের জন্য ডাক পাড়িতেই হইবে। প্রজার ঘরে আগুন ধরিলে কোনোদিন কোনো দিক হইতে তাহা রাজবাড়িরও অত্যন্ত কাছে গিয়া পৌঁছিবে। যদি এ কথা সত্য হয় যে, হিন্দুদিগকে দমাইয়া দিবার জন্য

মুসলমানদিগকে অসংগত প্রশ্রয় দিবার চেষ্টা হইতেছে, অন্তত ভাবগতিক দেখিয়া মুসলমানদের মনে যদি সেইরূপ ধারণা দৃঢ় হইতে থাকে, তবে এই শনি, এই কলি, এই ভেদনীতি রাজাকেও ক্ষমা করিবে না। কারণ, প্রশ্রয়ের দ্বারা আশাকে বাড়াইয়া তুলিলে তাহাকে পূরণ করা কঠিন হয়। যে ক্ষুধা স্বাভাবিক তাহাকে একদিন মেটানো যায়, যোগ্যতার স্বাভাবিক দাবিরও সীমা আছে, কিন্তু প্রশ্রয়ের দাবির তো অন্ত নাই। তাহা ফুটা কলসিতে জল ভরার মতো। আমাদের পুরাণে কলঙ্কভঞ্জনের যে ইতিহাস আছে তাহারই দৃষ্টান্তে গবর্মেন্টি, প্রেয়সীর প্রতি প্রেমবশতই হউক অথবা তাহার বিপরীত পক্ষের প্রতি রাগ করিয়াই হউক, অযোগ্যতার ছিদ্রঘট ভরিয়া তুলিতে পারিবেন না। অসন্তোষকে চিরবুভুক্ষু করিয়া রাখিবার উপায় প্রশ্রয়। এ সমস্ত শাঁখের করাতের নীতি, ইহাতে শুধু একা প্রজা কাটে না, ইহা ফিরিবার পথে রাজাকেও আঘাত দেয়।

এই ব্যাপারের মধ্যে যেটুকু ভালো তাহাও আমাদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। আমরা গোড়া হইতে ইংরেজের ইস্কুলে বেশি মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখস্থ করিয়াছি বলিয়া গভর্নমেন্টের চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশি পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। এইরূপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। এইটুকু কোনোমতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না, আমাদের মাঝখানে একটা অসূয়ার অন্তরাল থাকিয়া যাইবে। মুসলমানেরা যদি যথেষ্টপরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন তবে অবস্থার অসাম্যবশত জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তাহা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে। যে রাজপ্রাসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক, ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্নমনে প্রার্থনা করি। কিন্তু এই প্রাসাদের যেখানে সীমা সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহারা যেদিন দেখিবেন বাহিরের ক্ষুদ্র দানে অন্তরের গভীর দৈন্য কিছুতেই ভরিয়া উঠে না, যখন বুঝিবেন শক্তিলাভ ব্যতীত লাভ নাই এবং ঐক্য ব্যতীত সে লাভ অসম্ভব, যখন জানিবেন যে এক দেশে আমরা জন্মিয়াছি সেই দেশের ঐক্যকে খণ্ডিত করিতে থাকিলে ধর্মহানি হয় এবং ধর্মহানি হইলে কখনোই স্বার্থরক্ষা হইতে পারে না, তখনই আমরা উভয় ভ্রাতায় একই সমচেষ্টার মিলনক্ষেত্রে আসিয়া হাত ধরিয়া দাঁড়াইব।

যাই হউক, হিন্দু ও মুসলমান, ভারতবর্ষের এই দুই প্রধান ভাগকে এক রাষ্ট্রসম্মিলনের মধ্যে বাঁধিবার জন্য যে ত্যাগ, যে সহিষ্ণুতা, যে সতর্কতা ও আত্মদমন আবশ্যক তাহা আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। এই প্রকাণ্ড কর্মঋণই যখন আমাদের পক্ষে যথেষ্ট তখন, দোহাই সুবুদ্ধির, দোহাই ধর্মের, প্রাণধর্মের নিয়মে দেশে যে নূতন দল উঠিবে তাহারা প্রত্যেকেই এক-একটি বিরোধরূপে উঠিয়া যেন দেশকে বহু ভাগে বিদীর্ণ করিতে না থাকে, তাহারা যেন একই তরুকাণ্ডের উপর নব নব সতেজ শাখার মতো উঠিয়া

দেশের রাষ্ট্রীয় চিত্তকে পরিণতিদান করিতে থাকে।

পুরাতন দলের ভিতর দিয়া দেশে যখন একটা নূতন দলের উদ্ভব হয় তখন তাহাকে প্রথমটা অনাহূত বলিয়া ভ্রম হয়। কার্যকারণপরম্পরার মধ্যে তাহার যে একটা অনিবার্য স্থান আছে, অপরিচয়ের বিরক্তিতে তাহা আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না। এই কারণে নিজের স্বত্বপ্রমাণের চেষ্টায় নূতন দলের প্রথম অবস্থায় স্বাভাবিকতার শান্তি থাকে না, সেই অবস্থায় আত্মীয় হইলেও তাহাকে বিরুদ্ধ মনে হয়।

কিন্তু এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, দেশে নূতন দল, বীজ বিদীর্ণ করিয়া অঙ্কুরের মতো, বাধা ভেদ করিয়া স্বভাবের নিয়মেই দেখা দেয়। পুরাতনের সঙ্গেই এবং চতুর্দিকের সঙ্গে তাহার অন্তরের সম্বন্ধ আছে। এই তো আমাদের নূতন দল ; এ তো আমাদের আপনার লোক। ইহাদিগকে লইয়া কখনও ঝগড়াও করিব, আবার পরক্ষণেই সুখেদুঃখে ক্রিয়াকর্মে ইহাদিগকেই কাছে টানিয়া একসঙ্গে কাঁধ মিলাইয়া কাজের ক্ষেত্রে পাশাপাশি দাঁড়াইতে হইবে।

কিন্তু ভ্রাতৃগণ, এক্স্ট্রিমিস্ট্ বা চরমপন্থী বা বাড়াবাড়ির দল বলিয়া দেশে একটি দল উঠিয়াছে, এইরূপ যে একটা রটনা শুনা যায়, সে দলটা কোথায়? জিজ্ঞাসা করি, এ দেশে সকলের চেয়ে বড়ো এবং মূল এক্স্ট্রিমিস্ট্ কে? চরমপন্থিত্বের ধর্মই এই যে, এক দিক চরমে উঠিলে অন্য দিক সেই টানেই আপনি চরমে চড়িয়া যায়। বঙ্গবিভাগের জন্য সমস্ত বাংলাদেশ যেমন বেদনা অনুভব করিয়াছে এবং যেমন দারুণ দুঃখভোগের দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছে ভারতবর্ষে এমন বোধ হয় আর কখনও হয় নাই। কিন্তু প্রজাদের সেই সত্য-বেদনায় রাজপুরুষ যে কেবল উদাসীন তাহা নহে, তিনি ক্রুদ্ধ খড়্গহস্ত। তাহার পরে ভারতশাসনের বর্তমান ভাগ্যবিধাতা, যাঁহার অভ্যুদয়ের সংবাদমাত্রেই ভারতবর্ষের চিত্তচকোর তাহার সমস্ত তৃষিতচঞ্চু ব্যাদান করিয়া একেবারে আকাশে উড়িয়াছিল, তিনি তাঁহার সুদূর স্বর্গলোক হইতে সংবাদ পাঠাইলেন, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা একেবারেই চূড়ান্ত, তাহার আর অন্যথা হইতে পারে না।

এতই বধিরভাবে সমস্ত বাংলাদেশের চিত্তবেদনাকে একেবারে চূড়ান্ত করিয়া দেওয়া, ইহাই কি রাজ্যশাসনের চরম পন্থা নহে। ইহার কি একটা প্রতিঘাত নাই। এবং সে প্রতিঘাত কি নিতান্ত নির্জীবভাবে হইতে পারে।

এই স্বাভাবিক প্রতিঘাত শান্ত করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ তো কোনো শান্তনীতি অবলম্বন করিলেন না, তিনি চরমের দিকেই চলিতে লাগিলেন। আঘাত করিয়া যে ঢেউ তুলিয়াছিলেন সেই ঢেউকে নিরস্ত করিবার জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে কেবলই দণ্ডের উপর দণ্ড চালনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহারা যে বলিষ্ঠ এ প্রমাণ হইতে পারে, কিন্তু স্বভাব তো এই প্রবল রাজাদের প্রজা নহে। আমরা দুর্বল হই আর অক্ষম নই, বিধাতা আমাদের যে একটা হৃৎপিণ্ড গড়িয়াছিলেন সেটা তো নিতান্তই একটা মৃৎপিণ্ড নহে, আমরাও সহসা আঘাত

পাইলে চকিত হইয়া উঠি। সেটা একটা স্বাভাবিক প্রতিবৃত্তিক্রিয়া, যাহাকে ইংরেজিতে বলে রিফ্লেক্স্ অ্যাক্শন। এটাকে রাজসভায় যদি অভিনয় বলিয়া জ্ঞান করেন তবে আঘাতটা সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতে হয়। যাহার শক্তি আছে সে অনায়াসেই দুইয়ের পশ্চাতে আরও একটা দুই যোগ করিতে পারে, কিন্তু তাহার পরে ফলের ঘরে চার দেখিলেই উন্মত্ত হইয়া উঠা বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

স্বভাবের নিয়ম যখন কাজ করে তখন কিছু অসুবিধা ঘটিলেও সেটাকে দেখিয়া বিমর্ষ হইতে পারি না। বৈদ্যুতিক বেগ লাগাইলে যদি দেখি দুর্বল স্নায়ুতেও প্রবলভাবে সাড়া পাওয়া যাইতেছে তবে বড়ো কষ্টের মধ্যে সেটা আশার কথা।

অতএব এ দিকে যখন লর্ড কার্জন, মর্লি, ইবেট্সন ; গুর্খা, প্যুনিটিভ পুলিস ও পুলিস-রাজকতা ; নির্বাসন জেল ও বেত্রদণ্ড ; দলন, দমন ও আইনের আত্মবিস্মৃতি, তখন অপর পক্ষে প্রজাদের মধ্যেও যে ক্রমশই উত্তেজনাবৃদ্ধি হইতেছে, যে উত্তাপটুকু অল্পকাল পূর্বে কেবলমাত্র তাহাদের রসনার প্রান্তভাগে দেখা দিয়াছিল তাহা যে ক্রমশই ব্যাপ্ত ও গভীর হইয়া তাহাদের অস্থিমজ্জার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে, তাহারা যে বিভীষিকার সম্মুখে অভিভূত না হইয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে, ইহাতে আমাদের যথেষ্ট অসুবিধা ও আশঙ্কা আছে তাহা মানিতেই হইবে, কিন্তু সেইসঙ্গে এইটুকু আশার কথা না মনে করিয়া থাকিতে পারি না যে, বহুকালের অবসাদের পরেও স্বভাব বলিয়া একটা পদার্থ এখনো আমাদের মধ্যে রহিয়া গেছে, প্রবলভাবে কষ্ট পাইবার ক্ষমতা এখনও আমাদের যায় নাই, এবং জীবনধর্মে যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার নিয়ম বর্তমান এখনো আমাদের মধ্যে তাহা কাজ করিতেছে।

চরমনীতি বলিতেই বুঝায় হালছাড়া নীতি, সুতরাং ইহার গতিটা যে কখন কাহাকে কোথায় লইয়া গিয়া উত্তীর্ণ করিয়া দিবে তাহা পূর্ব হইতে কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারে না। ইহার বেগকে সর্বত্র নিয়মিত করিয়া চলা এই পন্থার পথিকদের পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। তাহাকে প্রবর্তন করা সহজ, সংবরণ করাই কঠিন।

এই কারণেই আমাদের কর্তৃপক্ষ যখন চরমনীতিতে দম লাগাইলেন তখন তাঁহারা যে এতদূর পর্যন্ত পৌঁছিবেন তাহা মনেও করেন নাই। আজ ভারতশাসনকার্যে পুলিসের সামান্য পাহারাওয়ালা হইতে ন্যায়দণ্ডধারী বিচারক পর্যন্ত সকলেরই মধ্যে স্থানে স্থানে যে অসংযম ফুটিয়া বাহির হইতেছে, নিশ্চয়ই তাহা ভারতশাসনের কর্ণধারগণের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু গবর্মেন্ট তো একটা অলৌকিক ব্যাপার নহে, শাসনকার্য যাহাদিগকে দিয়া চলে তাহারা তো রক্তমাংসের মানুষ এবং ক্ষমতামত্ততাও সেই মানুষগুলির প্রকৃতিতে অল্পাধিক পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। যে সময়ে প্রবীণ সারথির প্রবল রাশ ইহাদের সকলকে শক্ত করিয়া টানিয়া রাখে তখনও যদিচ ইহাদের উচ্চ গ্রীবা যথেষ্ট বক্র হইয়া থাকে তথাপি সেটা রাজবাহনের পক্ষে অশোভন হয় না ; কিন্তু তখন ইহারা মোটের

উপরে সকলেই এক সমান চালে পা ফেলে ; তখন পদাতিকের দল একটু যদি পাশ কাটাইয়া চলিতে পারে তবে তাহাদের আর অপঘাতের আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু চরমনীতি যখন রাশ ছাড়িয়া দেয় তখনই এই বিরাট শাসনতন্ত্রের মধ্যে অবারিত জীবপ্রকৃতি দেখিতে দেখিতে বিচিত্র হইয়া উঠে। তখন কোন্ পাহারাওয়ালার যষ্টি যে কোন্ ভালোমানুষের কপাল ভাঙিবে এবং কোন্ বিচারকের হাতে আইন যে কিরূপ ভয়ংকর বক্রগতি অবলম্বন করিবে তাহা কিছুই বুঝিবার উপায় থাকে না। তখন প্রজাদের মধ্যে যে বিশেষ অংশ প্রশ্রয় পায় তাহারাও বুঝিতে পারে না তাহাদের প্রশ্রয়ের সীমা কোথায়। চতুর্দিকে শাসননীতির এইরূপ অদ্ভুত দুর্বলতা প্রকাশ হইতে থাকিলে গবর্মেন্ট নিজের চালে নিজেই কিছু কিছু লজ্জাবোধ করিতে থাকেন। তখন লজ্জানিবারণের কমিশন, রিপোর্টের তালি দিয়া শাসনের ছিন্নতা ঢাকিতে চায়, যাহারা আর্ত তাহাদিগকে মিথ্যুক বলিয়া অপমানিত করে এবং যাহারা উচ্ছৃঙ্খল তাহাদিগকেই উৎপীড়িত বলিয়া মার্জনা করে। কিন্তু এমন করিয়া লজ্জা কি ঢাকা পড়ে। অথচ এই সমস্ত উদ্দাম উৎপাত সংবরণ করাকেও ত্রুটিস্বীকার বলিয়া মনে হয় এবং দুর্বলতাকে প্রবলভাবে সমর্থন করাকেই রাজপুরুষ শক্তির পরিচয় বলিয়া ভ্রম করেন।

অন্য পক্ষে আমাদের মধ্যেও চরমনীতিকে সর্বদা ঠিকমতো সংবরণ করিয়া চলা দুঃসাধ্য। আমাদের মধ্যেও নিজের দলের দুর্বারতা দলপতিকেও টলাইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় কাহার আচরণের জন্য যে কাহাকে দায়ী করা যাইবে এবং কোন্ মতটা যে কতটা পরিমাণে কাহার, তাহা নিশ্চয় করিয়া নির্ণয় করে এমন কে আছে।

এইখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। এক্‌স্ট্রিমিস্ট্ নাম দিয়া আমাদের মাঝখানে যে একটা সীমানার চিহ্ন টানিয়া দেওয়া হইয়াছে সেটা আমাদের নিজের দত্ত নহে। সেটা ইংরেজের কালো কালির দাগ। সুতরাং এই জরিপের চিহ্নটা কখন কতদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে বলা যায় না। দলের গঠন অনুসারে নহে, সময়ের গতি ও কর্তৃজাতির মর্জি অনুসারে এই রেখার পরিবর্তন হইতে থাকিবে।

অতএব ইংরেজ তাহার নিজের প্রতি আমাদের মনের ভাব বিচার করিয়া যাহাকে এক্‌স্ট্রিমিস্ট্ দল বলিয়া নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে সেটা কি একটা দল, না দলের চেয়ে বেশি, তাহা দেশের একটা লক্ষণ? কোনো একটা দলকে চাপিয়া মারিলে এই লক্ষণ আর-কোনো আকারে দেখা দিবে অথবা ইহা বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবে?

কোনো স্বাভাবিক প্রকাশকে যখন আমরা পছন্দ না করি তখন আমরা বলিতে চেষ্টা করি যে, ইহা কেবল সম্প্রদায়বিশেষের চক্রান্ত মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে য়ুরোপে একটা ধুয়া উঠিয়াছিল যে, ধর্ম-জিনিসটা কেবল স্বার্থপর ধর্মযাজকদের কৃত্রিম সৃষ্টি ; পাদ্রিদিগকে উচ্ছিন্ন করিলেই ধর্মের আপদটাকেই একেবারে দূর করিয়া দেওয়া যায়। হিন্দুধর্মের প্রতি যাহারা অসহিষ্ণু তাহারা অনেক বলিয়া থাকে, এটা যেন ব্রাহ্মণের দল পরামর্শ করিয়া

নিজেদের জীবিকার উপায়স্বরূপে তৈরি করিয়া তুলিয়াছে, অতএব ভারতবর্ষের বাহিরে কোনো গতিকে ব্রাহ্মণের ডিপোর্টেশন ঘটাইতে পারিলেই হিন্দুধর্মের উপদ্রব সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত থাকা যাইবে। আমাদের রাজারাও সেইরূপ মনে করিতেছেন, একস্ট্রিমিজম্ বলিয়া একটা উৎক্ষেপক পদার্থ দুষ্টের দল তাহাদের ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করিয়া তুলিতেছে, অতএব কয়েকটা দলপতি ধরিয়া পুলিস ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে সমর্পণ করিয়া দিলেই উৎপাত শান্তি হইতে পারিবে।

কিন্তু আসল কথাটা ভিতরের কথা। সেটা চোখে দেখার জিনিস নহে, সেটা তলাইয়া বুঝিতে হইবে।

যে সত্য অব্যক্ত ছিল সেটা হঠাৎ প্রথম ব্যক্ত হইবার সময় নিতান্ত মৃদুমন্দ মধুরভাবে হয় না। তাহা একটা ঝড়ের মতো আসিয়া পড়ে, কারণ অসামঞ্জস্যের সংঘাতই তাহাকে জাগাইয়া তোলে।

আমাদের দেশে কিছুকাল হইতেই ইতিহাসের শিক্ষায়, যাতায়াত ও আদানপ্রদানের সুযোগে, এক রাজশাসনের ঐক্যে, সাহিত্যের অভ্যুদয়ে এবং কন্‌গ্রেসের চেষ্টায় আমরা ভিতরে ভিতরে বুঝিতেছিলাম যে, আমাদের দেশটা এক, আমরা একই জাতি, সুখেদুঃখে আমাদের এক দশা, এবং পরস্পরকে পরমাত্মীয় বলিয়া না জানিলে ও অত্যন্ত কাছে না টানিলে আমাদের কিছুতে মঙ্গল নাই।

বুঝিতেছিলাম বটে, কিন্তু এই অখণ্ড ঐক্যের মূর্তিটি প্রত্যক্ষ সত্যের মতো দেখিতে পাইতেছিলাম না ; তাহা যেন কেবলই আমাদের চিন্তার বিষয় হইয়াই ছিল। সেইজন্য সমস্ত দেশকে এক বলিয়া নিশ্চয় জানিলে মানুষ দেশের জন্য যতটা দিতে পারে, যতটা সহিতে পারে, যতটা করিতে পারে, আমরা তাহার কিছুই পারি নাই।

এইভাবেই আরও অনেক দিন চলিত। এমন সময় লর্ড কার্জন যবনিকার উপর এমন একটা প্রবল টান মারিলেন যে, যাহা নেপথ্যে ছিল তাহার আর কোনো আচ্ছাদন রহিল না।

বাংলাকে যেমনি দুইখানা করিবার হুকুম হইল অমনি পূর্ব হইতে পশ্চিমে একটিমাত্র ধ্বনি জাগিয়া উঠিল, আমরা যে বাঙালি, আমরা যে এক! বাঙালি কখন যে বাঙালির এতই কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, রক্তের নাড়ী কখন বাংলার সকল অঙ্গকেই এমন করিয়া এক চেতনার বন্ধনে বাঁধিয়া তুলিয়াছে, তাহা তো পূর্বে আমরা এমন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি নাই।

আমাদের এই আত্মীয়তার সজীব শরীরে বিভাগের বেদনা যখন এত অসহ্য হইয়া বাজিল তখন ভাবিয়াছিলাম, সকলে মিলিয়া রাজার দ্বারে নালিশ জানাইলেই দয়া পাওয়া যাইবে। কেবলমাত্র নালিশের দ্বারা দয়া আকর্ষণ ছাড়া আর যে আমাদের কোনো গতিই আছে তাহাও আমরা জানিতাম না।

কিন্তু নিরুপায়ের ভরসাস্থল এই পরের অনুগ্রহ যখন চূড়ান্তভাবেই বিমুখ হইল তখন যে ব্যক্তি নিজেকে পঙ্গু জানিয়া বহুকাল অচল হইয়া ছিল, ঘরে আগুন লাগিতেই নিতান্ত অগত্যা দেখিতে পাইল, তাহারও চলৎশক্তি আছে। আমরাও একদিন অন্তঃকরণের অত্যন্ত একটা তাড়নায় দেখিতে পাইলাম, এই কথাটা আমাদের জোর করিয়া বলিবার শক্তি আছে যে, আমরা বিলাতি পণ্যদ্রব্য ব্যবহার করিব না।

আমাদের এই আবিষ্কারটি অন্যান্য সমস্ত সত্য-আবিষ্কারেরই ন্যায় প্রথমে একটা সংকীর্ণ উপলক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া আমাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে দেখিতে দেখিতে আমরা বুঝিতে পারিলাম, উপলক্ষ্যটুকুর অপেক্ষা ইহা অনেক বৃহৎ। এ যে শক্তি। এ যে সম্পদ। ইহা অন্যকে জব্দ করিবার নহে, ইহা নিজেকে শক্ত করিবার। ইহার আর কোনো প্রয়োজন থাক বা না থাক, ইহাকে বক্ষের মধ্যে সত্য বলিয়া অনুভব করাই সকলের চেয়ে বড়ো প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।

শক্তির এই অকস্মাৎ অনুভূতিতে আমরা যে একটা মস্ত ভরসার আনন্দ পাইয়াছি সেই আনন্দটুকু না থাকিলে এই বিদেশিবর্জন ব্যাপারে আমরা এত অবিরাম দুঃখ কখনোই সহিতে পারিতাম না। কেবলমাত্র ক্রোধের এত সহিষ্ণুতা নাই। বিশেষত প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের ক্রোধ কখনোই এত জোরের সঙ্গে দাঁড়াইতে পারে না।

এদিকে দুঃখ যতই পাইতেছি সত্যের পরিচয়ও ততই নিবিড়তর সত্য হইয়া উঠিতেছে। যতই দুঃখ পাইতেছি আমাদের শক্তি গভীরতায় ও ব্যাপ্তিতে ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। আমাদের এই বড়ো দুঃখের ধন ক্রমেই আমাদের হৃদয়ের চিরন্তন সামগ্রী হইয়া উঠিতেছে। অগ্নিতে দেশের চিত্তকে বার বার গলাইয়া এই যে ছাপ দেওয়া হইতেছে, ইহা তো কোনোদিন আর মুছিবে না। এই রাজমোহরের ছাপ আমাদের দুঃখ সহার দলিল হইয়া থাকিবে। দুঃখের জোরে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইহার জোরেই দুঃখ সহিতে পারিব।

এইরূপে সত্য জিনিস পাইলে তাহার আনন্দ যে কত জোরে কাজ করে এবার তাহা স্পষ্ট দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গিয়াছি। কতদিন হইতে জ্ঞানী লোকেরা উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন যে, হাতের কাজ করিতে ঘৃণা করিয়া চাকরি করাকেই জীবনের সার বলিয়া জানিলে কখনোই আমরা মানুষ হইতে পারিব না। যে শুনিয়াছে সেই বলিয়াছে, হাঁ কথাটা সত্য বটে। অমনি সেইসঙ্গেই চাকরির দরখাস্ত লিখিতে হাত পাকাইতে বসিয়াছে। এতবড়ো চাকরিপিপাসু বাংলাদেশেও এমন একটা দিন আসিল যেদিন কিছু না বলিতেই ধনীর ছেলে নিজের হাতে তাঁত চালাইবার জন্য তাঁতির কাছে শিষ্যবৃত্তি অবলম্বন করিল, ভদ্রঘরের ছেলে নিজের মাথায় কাপড়ের মোট তুলিয়া দ্বারে দ্বারে বিক্রয় করিতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণের ছেলে নিজের হাতে লাঙল বহা গৌরবের কাজ বলিয়া স্পর্ধা প্রকাশ করিল। আমাদের সমাজে ইহা যে সম্ভবপর হইতে পারে আমরা স্বপ্নেও মনে করি নাই। তর্কের দ্বারা তর্ক মেটে না ; উপদেশের দ্বারা সংস্কার ঘোচে না ; সত্য যখন ঘরের একটি

কোণে একটু শিখার মতো দেখা দেন তখনই ঘনভরা অন্ধকার আপনি কাটিয়া যায়।

পূর্বে দেশের বড়ো প্রয়োজনের সময়েও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাহিয়া অর্থের অপেক্ষা ব্যর্থতাই বেশি করিয়া পাইতাম, কিন্তু সম্প্রতি একদিন যেদিন একটা ডাক পড়িল অমনি দেশের লোক কোনো অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের কথা চিন্তা না করিয়া কেবলমাত্র নির্বিচারে ত্যাগ করিবার জন্যই নিজে ছুটিয়া গিয়া দান করিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছি।

তাহার পরে জাতীয় বিদ্যালয় যে কোনোদিন দেশের মধ্যে স্থাপন করিতে পারিব সে কেবল দুটি-একটি অত্যুৎসাহিকের ধ্যানের মধ্যেই ছিল। কিন্তু দেশে শক্তির অনুভূতি একটুও সত্য হইবামাত্রই সেই দুর্লভ ধ্যানের সামগ্রী দেখিতে দেখিতে আকার পরিগ্রহ করিয়া দেশকে বরদান করিবার জন্য উদ্যত দক্ষিণহস্তে আজ আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

একত্রে মিলিয়া বড়ো কারখানা স্থাপন করিব, বাঙালির এমন না ছিল শিক্ষা, না ছিল অভিজ্ঞতা, না ছিল অভিরুচি। তাহা সত্ত্বেও বাঙালি একটা বড়ো মিল খুলিয়াছে, তাহা ভালো করিয়াই চালাইতেছে, এবং আরও এইরূপ অনেকগুলি ছোটোবড়ো উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

দেশের ইচ্ছা একটিমাত্র উপলক্ষ্যে যেই আপনাকে সফল করিয়াছে, যেই আপনার শক্তিকে দুঃখ ও ক্ষতির উপরেও জয়ী করিয়া দেখাইয়াছে, অমনি তাহা নানা ধারায় জাতীয় জীবনযাত্রার সমস্ত বিচিত্র ব্যাপারেই যে নিজেকে উপলব্ধি করিবার জন্য সহজে ধাবিত হইবে ইহা অনিবার্য।

কিন্তু যেমন এক দিকে সহসা দেশের এই শক্তির উপলব্ধি আমাদের কাছে সত্য হইল তেমনি সেই কারণেই আমরা নিজেদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড অভাব অনুভব করিলাম। দেখিলাম, এতবড়ো শক্তিকে বাঁধিয়া তুলিবার কোনো ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে নাই। স্টীম নানা দিকে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহাকে এইবেলা আবদ্ধ করিয়া যথার্থপথে খাটাইবার উপায় করিতে পারিলে তাহা আমাদের চিরকালের সম্বল হইয়া উঠিত, এই ব্যাকুলতায় আমরা কষ্ট পাইতেছি।

ভিতরে একটা গভীর অভাব বা পীড়া থাকিলে যখন তাহাকে ভালো করিয়া ধরিতে বা তাহার ভালোরূপ প্রতিকার করিতে না পারি তখন তাহা নানা অকারণ বিরক্তির আকার ধারণ করিতে থাকে। শিশু অনেক সময় বিনা হেতুতেই রাগ করিয়া তাহার মাকে মারে ; তখন বুঝিতে হইবে, সে রাগ বাহ্যত তাহার মাতার প্রতি কিন্তু বস্তুত তাহা শিশুর একটা কোনো অনির্দেশ্য অস্বাস্থ্য। সুস্থ শিশু যখন আনন্দে থাকে তখন বিরক্তির কারণ ঘটিলেও সেটাকে সে অনায়াসে ভুলিয়া যায়। সেইরূপ দেশের আন্তরিক যে আক্ষেপ আমাদিগকে আত্মকলহে লইয়া যাইতেছে তাহা আর কিছুই নহে, তাহা ব্যবস্থাবন্ধনের অভাবজনিত ব্যর্থ উদ্যমের অসন্তোষ। শক্তিকে অনুভব করিতেছি অথচ তাহাকে সম্পূর্ণ

খাটাইতে পারিতেছি না বলিয়াই সেই অস্বাস্থ্যে ও আত্মগ্লানিতে আমরা আত্মীয়দিগকেও সহ্য করিতে পারিতেছি না।

যখন এক দিনের চেষ্টাতেই আমরা দেখিয়াছি যে জাতীয় ভাণ্ডারে টাকা আসিয়া পড়া এই বহুপরিবারভারগ্রস্ত দরিদ্র দেশেও দুঃসাধ্য নহে তখন এই আক্ষেপ কেমন করিয়া ভুলিব যে, কেবলমাত্র ব্যবস্থা করিতে না পারাতেই এই এক দিনের উদ্‌যোগকে আমরা চিরদিনের ব্যাপার করিয়া তুলিতে পারিলাম না। এমনকি, যে টাকা আমাদের হাতে আসিয়া জমিয়াছে তাহা লইয়া কী-যে করিব তাহাই আজ পর্যন্ত ঠিক করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই জমা টাকা মাতৃস্তনের নিরুদ্ধ দুগ্ধের মতো আমাদের পক্ষে একটা বিষম বেদনার বিষয় হইয়া রহিল। দেশের লোক যখন ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে, আমরা দিতে চাই, আমরা কাজ করিতে চাই, কোথায় দিব, কী করিব তাহার একটা কিনারা হইয়া উঠিলে বাঁচিয়া যাই, তখনো যদি দেশের এই উদ্যত ইচ্ছাকে সার্থক করিবার জন্য কোনো একটা যজ্ঞক্ষেত্র নির্মিত না হয়, তখনও যদি সমস্ত কাজ বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবেই হইতে থাকে, তবে এমন অবস্থায় এমন খেদে মানুষ আর কিছু না পারিলে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করিয়া আপনার কর্মভ্রষ্ট উদ্যম ক্ষয় করে।

তখন ঝগড়ার উপলক্ষ্যও তেমনি অসংগত হয়। আমাদের মধ্যে কেহ বা বলি, আমি ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত স্বায়ত্তশাসন চাহি; কেহ বা বলি, আমি সাম্রাজ্যনিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যই চাহি। অথচ এ সমস্ত কেবল মুখের কথা এবং এতই দূরের কথা যে, ইহার সঙ্গে আমাদের উপস্থিত দায়িত্বের কোনো যোগ নাই।

দেবতা যখন কলোনিয়াল সেল্‌ফ্ গবর্মেন্ট এবং অটনমি এই দুই বর দুই হাতে লইয়া আমাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইবেন এবং যখন তাঁহার মুহূর্তমাত্র বিলম্ব সহিবে না তখন কোন্ বরটা তুলিয়া লইতে হইবে হাতে হাতে তাহার নিষ্পত্তি করিতে পরস্পর হাতাহাতি করাই যদি অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে তবে অগত্যা তাহা করিতে হইবে। কিন্তু যখন মাঠে চাষ দেওয়াও হয় নাই তখন কি ফসল ভাগের মামলা তুলিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে?

ব্যক্তিই বল জাতিই বল, মুক্তিই সকলের চরম সিদ্ধি। কিন্তু শাস্ত্রে বলে, নিজের মধ্যেই মুক্তির নিগূঢ় বাধা আছে, সেইগুলা আগে কর্মের দ্বারা ক্ষয় না করিলে কোনো মতেই মুক্তি নাই। আমাদের জাতীয় মুক্তিরও প্রধান বিঘ্নসকল আমাদের অভ্যন্তরেই নানা আকারে বিদ্যমান। কর্মের দ্বারা সেগুলোর যদি ধ্বংস না হয় তবে তর্কের দ্বারা হইবে না, এবং বিবাদের দ্বারা তাহা বাড়িতেই থাকিবে। অতএব মুক্তি কয় প্রকারের আছে, সাযুজ্যমুক্তিই ভালো না স্বাতন্ত্র্যমুক্তিই শ্রেয়, শান্তিরক্ষা করিয়া তাহার আলোচনা অনায়াসেই চলিতে পারে। কিন্তু সাযুজ্যই বল আর স্বাতন্ত্র্যই বল, গোড়াকার কথা একই, অর্থাৎ তাহা কর্ম। সেখানে উভয় দলকে একই পথ দিয়া যাত্রা করিতে হইবে। যে-সকল

প্রকৃতিগত কারণে আমরা দরিদ্র ও দুর্বল, আমরা বিভক্ত বিরুদ্ধ ও পরতন্ত্র; সেই কারণ ঘোচাইবার জন্য আমরা যদি সত্যসত্যই মন দিই তবে আমাদের সকল মতের লোককে একত্রে মিলিতেই হইবে।

এই কর্মক্ষেত্রেই যখন আমাদের সকলের একত্রে মিলন নিতান্তই চাই তখন সেই মিলনের জন্য একটি বিশেষ গুণের প্রয়োজন, তাহা অমত্ততা। আমরা যদি যথার্থ বলিষ্ঠমনা ব্যক্তির ন্যায় কথায় ও ব্যবহারে, চিন্তায় ও প্রকাশে পরিমাণরক্ষা করিয়া না চলিতে পারি তবে মিলনই আমাদের পক্ষে বিরোধের হেতু হইবে, এবং কর্মের চেষ্টায় লাভ না হইয়া বারংবার ক্ষতি ঘটাইতে থাকিবে।

এই বিষয় আজকালকার ভারতীয় রাজপুরুষদের সমান চালে চলিবার চেষ্টা করিলে আমাদের অনিষ্টই হইবে। বর্তমান ভারত-শাসন ব্যাপারে একটা উৎকট হিস্টিরিয়ার আক্ষেপ হঠাৎ থাকিয়া থাকিয়া কখনও পাঞ্জাবে, কখনও মাদ্রাজে, কখনও বাংলায় যেরূপ অসংযমের সহিত প্রকাশ পাইয়া উঠিতেছে সেটা কি আমাদের পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত।

যাহার হাতে বিরাট শক্তি আছে সে যদি অসহিষ্ণু হইয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করাকেই পৌরুষের পরিচয় বলিয়া কল্পনা করে এবং নিজের রচনাকে নিজে বিপর্যস্ত করিয়া সান্ত্বনা পায় তবে তাহার সেই চিত্তবিকার আমাদের মতো দুর্বলতর পক্ষকে যেন অনুকরণে উত্তেজিত না করে। বস্তুত, প্রবলই হউক আর দুর্বলই হউক, যে ব্যক্তি বাক্যে ও আচরণে অন্তরের ভাবাবেগকে যথেষ্ট পরিমাণে সংযত করিতে না পারিয়াছে সেই ব্যক্তি সকল কর্মের অন্তরায়, এ কথাটা ক্ষোভবশত আমরা যখনই ভুলি ইহার সত্যতাও তখনই সবেগে সপ্রমাণ হইয়া উঠে।

সম্প্রতি দেশের কর্ম বলিতে কী বুঝায় এবং তাহার যথার্থ গতিটা কোন্ দিকে সে সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে সত্যকার কোনো মতোভেদ আছে এ কথা আমি মনে করিতেই পারি না।

কর্মের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র উপস্থিত একটা কেনো ফললাভ নহে। শক্তিকে খাটাইবার জন্যও কর্মের প্রয়োজন। কর্মের উপযুক্ত সুযোগ পাইলেই এই শক্তি নানা আশ্চর্য ও অভাবনীয় রূপে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। এমন যদি উপায় থাকিত যাহাতে ফলটা পাওয়া যায় অথচ শক্তিটার কোনো প্রয়োজনই হয় না তবে তাহাকে আমরা সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করিতে পারিতাম না।

তেমন উপায় পৃথিবীতে নাইও। আমরা কোনো শ্রেয় পদার্থকেই পরের কৃপার দ্বারা পাই না, নিজের শক্তির দ্বারাই লই। ইহার অন্যথা হইতেই পারে না। কারণ, বিধাতা বরঞ্চ আমাদিগকে হনন করিতে পারেন, কিন্তু মনুষ্যত্বকে অপমানিত হইবার পথে কোনো প্রশ্রয় দেন না।

সেইজন্যই দেখিতে পাই, গবর্মেন্টের দানের সঙ্গে যেখানেই আমাদের শক্তির কোনো সহযোগিতা নাই সেখানে সেই দানই বক্র হইয়া উঠিয়া আমাদের কত-না বিপদ ঘটাইতে পারে। প্রশ্রয়প্রাপ্ত পুলিস যখন দস্যুবৃত্তি করে তখন প্রতিকার অসম্ভব হইয়া উঠে ; গবর্মেন্টের প্রসাদভোগী পঞ্চায়েত যখন গুপ্তচরের কাজ আরম্ভ করে তখন গ্রামের পক্ষে তাহা যে কতবড়ো উপদ্রবের কারণ হইতে পারে তাহা কিছুই বলা যায় না ; গবর্মেন্টের চাকরি যখন শ্রেণিবিশেষকেই অনুগ্রহভাজন করিয়া তোলে তখন ঘরের লোকের মধ্যেই বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠে এবং রাজমন্ত্রিসভায় যখন সম্প্রদায়বিশেষের জন্যই আসন প্রশস্ত হইতে থাকে তখন বলিতে হয়, আমার উপকারে কাজ নাই, তোমার অনুগ্রহ ফিরাইয়া লও। আমাদের নিজের মধ্যে সতেজ শক্তি থাকিলে এই সমস্ত বিকৃতি কিছুতেই ঘটিতে পারিত না, আমরা দান গ্রহণ করিবার ও তাহাকে রক্ষা করিবার অধিকারী হইতাম, দান আমাদের পক্ষে কোনো অবস্থাতেই বলিদান হইয়া উঠিত না।

অতএব আমি যাহা বলিতেছি তাহাতে এ বোঝায় না যে, আমাদের কর্মের কোনো উপকরণ আমরা গবর্মেন্টের নিকট হইতে লইব না, কিন্তু ইহাই বুঝায় যে, নিজের সম্পূর্ণ সাধ্যমত যদি কর্মে প্রবৃত্ত হই তবেই তাহার উপকরণ আমরা সকল স্থান হইতেই অসংকোচে সংগ্রহ করিবার অধিকারী হইব। নতুবা আমাদের সেই গল্পের দশা ঘটিবে ; আমরা মা-কালীর কাছে মহিষ মানত করিবার বেলা চিন্তা করিব না বটে, কিন্তু পরে তিনি যখন অনেক ক্ষমা করিয়াও একটিমাত্র পতঙ্গ দাবি করিবেন তখন বলিব, মা, ওটা তুমি নিজে ক্ষেত্রে গিয়া ধরিয়া লও গে। আমরাও কথার বেলায় বড়ো বড়ো করিয়াই বলিব, কিন্তু অবশেষে দেশের একটি সামান্য হিতসাধনের বেলাতেও অন্যের উপরে বরাত দিয়া দায় সারিবার ইচ্ছা করিব।

কাজে প্রবৃত্ত হইতে গেলে, রাগ করিয়া, গর্ব করিয়া, বা অন্য কারণে, যে জিনিসটা নিশ্চিত আছে তাহাকে নাই বলিয়া হিসাব হইতে বাদ দিয়া বসিলে চলিবে না। ভারতে ইংরেজ গবর্মেন্ট যেন একেবারেই নাই এমনভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকা শয়নাগারেই চলে, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সেরূপভাবে চলিলেই নিশ্চয়ই ঠকিতে হইবে।

অবশ্য এ কথাও সত্য, ইংরেজও যতদূর সম্ভব এমনভাবে চলিতেছে যেন আমরা কোথাও নাই। আমাদের ত্রিশ কোটি লোকের মাঝখানে থাকিয়াও তাহারা বহুদূরে। সেইজন্যই আমাদের সম্বন্ধে তাহাদের পরিমাণবোধ একেবারেই চলিয়া গেছে। সেইজন্যই পনেরো বছরের একটি ইস্কুলের ছেলেরও একটু তেজ দেখিলে তাহারা জেলের মধ্যে তাহাকে বেত মারিতে পারে ; মানুষ সামান্য একটু নড়িলে-চড়িলেই প্যুনিটিভ পুলিসের চাপে তাহাকে সম্পূর্ণ নিশ্চল করিয়া ফেলিতে মনে তাহাদের ধিক্‌কার বোধ হয় না এবং দুর্ভিক্ষে মরিবার মুখে লোকে যখন বিলাপ করিতে থাকে সেটাকে অত্যুক্তি বলিয়া অগ্রাহ্য করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয়। সেইজন্যই বাংলার বিভাগব্যাপারে সমস্ত

বাঙালিকেই বাদ দিয়া মর্লি সেটাকে 'সেটল্ড ফ্যাক্ট' বলিয়া গণ্য করিতে পারিয়াছেন। এইরূপে আচার বিচারে এবং রাষ্ট্রবিধানে যখন দেখিতে পাই, ইংরেজের খাতায় হিসাবের অঙ্কে আমরা কতবড়ো একটা শূন্য, তখন ইহার পাল্টাই দিবার জন্যই আমরাও উহাদিগকে যতদূর পারি অস্বীকার করিবার ভঙ্গি করিতে ইচ্ছা করি।

কিন্তু খাতায় আমাদিগকে একেবারে শূন্যের ঘরে বসাইয়া গেলেও আমরা তো সত্যই একেবারে শূন্য নহি। ইংরেজের শুমারনবিশ ভুল হিসাবে যে অঙ্কটা ক্রমাগতই হরণ করিয়া চলিতেছে তাহাতে তাহার সমস্ত খাতা দূষিত হইয়া উঠিতেছে। গায়ের জোরে 'হাঁ'কে' 'না' করিলে গণিতশাস্ত্র ক্ষমা করিবার লোক নয়।

এক পক্ষে এই ভুল করিতেছে বলিয়া রাগ করিয়া আমরাও কি সেই ভুলটাই করিব ; পরের উপর বিরক্ত হইয়া নিজের উপরেই তাহার প্রতিশোধ তুলিব? ইহা তো কাজের প্রণালী নহে।

বিরোধমাত্রই একটা শক্তির ব্যয় ; অনাবশ্যক বিরোধ অপব্যয়। দেশের হিতব্রতে যাঁহারা কর্মযোগী, অত্যাবশ্যক কণ্টকক্ষত তাঁহাদিগকে পদে পদে সহ্য করিতেই হইবে ; কিন্তু শক্তির ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিবার জন্য স্বদেশের যাত্রাপথে নিজের চেষ্টায় কাঁটার চাষ করা কি দেশহিতৈষিতা!

আমরা এই যে বিদেশিবর্জনব্রত গ্রহণ করিয়াছি, ইহারই দুঃখ তো আমাদের পক্ষে সামান্য নহে। স্বয়ং য়ুরোপেই ধনী আপন ধনবৃদ্ধির পথ অব্যাহত রাখিবার জন্য শ্রমিককে কিরূপে নাগপাশে বেষ্টন করিয়া ফেলিতেছে এবং তাহা লইয়া সেখানে কতই কঠিন আঘাতপ্রতিঘাত চলিতেছে। আমাদের দেশে সেই ধনী শুধু ধনী নন, জেলের দারোগা ; লিভারপুলের নিমক খাইয়া থাকে।

অতএব এ দেশের যে ধন লইয়া পৃথিবীতে তাঁহারা ঐশ্বর্যের চূড়ায় উঠিয়াছেন সেই ধনের রাস্তায় আমরা একটা সামান্য বাধা দিলেও তাঁহারা তো আমাদিগকে সহজে ছাড়িবেন না। এমন অবস্থায় যে সংঘাত আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে তাহা খেলা নহে ; তাহাতে আরাম বিশ্রামের অবকাশ নাই, তাহাতে আমাদের সমস্ত শক্তি ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন আছে। ইহার উপরেও যাঁহারা অনাহূত ঔদ্ধত্য ও অনাবশ্যক উগ্রবাক্য প্রয়োগ করিয়া আমাদের কর্মের দুরূহতাকে কেবলই বাড়াইয়া তুলিয়াছেন তাঁহারা কি দেশের কাছে অপরাধী নহেন। কাজের কঠোরতাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিব, কিছুতেই পরাভব স্বীকার করিব না, দেশের শিল্পবাণিজ্যকে স্বাধীন করিয়া নিজের শক্তি অনুভব করিব, দেশের বিদ্যাশিক্ষাকে স্বায়ত্ত করিব, সমাজকে দেশের কর্তব্যসাধনের উপযোগী বলিষ্ঠ করিয়া তুলিব, ইহা করিতে গেলে ঘরে ঘরে দুঃখ ও বাধার অবধি থাকিবে না, সেজন্য অপরাজিতচিত্তে প্রস্তুত হইব ; কিন্তু বিরোধকে বিলাসের সামগ্রী করিয়া তুলিব না। দেশের কাজ নেশার কাজ নহে; তাহা সংযমীর দ্বারা, যোগীর দ্বারাই সাধ্য।

মনে করিবেন না, ভয় বা সংকোচবশত আমি এ কথা বলিতেছি। দুঃখকে আমি জানি, দুঃখকে আমি মানি, দুঃখ দেবতারই প্রকাশ। সেইজন্যই ইহার সম্বন্ধে কোনো চাপল্য শোভা পায় না। দুঃখ দুর্বলকেই হয় স্পর্ধায় নয় অভিভূতিতে লইয়া যায়। প্রচণ্ডতাকেই যদি প্রবলতা বলিয়া জানি, কলহকেই যদি পৌরুষ বলিয়া গণ্য করি, এবং নিজেকে সর্বত্র ও সর্বদাই অতিমাত্র প্রকাশ করাকেই যদি আত্মোপলব্ধির স্বরূপ বলিয়া স্থির করি, তবে দুঃখের নিকট হইতে আমরা কোনো মহৎ শিক্ষা প্রত্যাশা করিতে পারিব না।

দেশে আমাদের যে বৃহৎ কর্মস্থানকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে কেমন করিয়া তাহা আরম্ভ করিব। উচ্চ চূড়াকে আকাশে তুলিতে গেলে তাহার ভিত্তিকে প্রশস্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। আমাদের কর্মশক্তির চূড়াকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে যদি অভ্রভেদী করিতে চাই তবে প্রত্যেক জেলা হইতে তাহার ভিত গাঁথার কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। প্রভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্সের ইহাই সার্থকতা।

প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া প্রাদেশিক প্রতিনিধিসভা স্থাপিত হইবে। এই সভা যথাসম্ভব গ্রামে গ্রামে আপনার শাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত জেলাকে আচ্ছন্ন করিবে। প্রথমে সমস্ত প্রদেশের সর্বাংশের সকলপ্রকার তথ্য সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিবে ; কারণ, কর্মের ভূমিকাই জ্ঞান। যেখানে কাজ করিতে হইবে, সর্বাগ্রে তাহার সমস্ত অবস্থা জানা চাই।

দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লি লইয়া এক একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের এবং অভাবমোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে। নিজের পাঠশালা, শিল্প- শিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডলীর একটি করিয়া সাধারণ মণ্ডপ থাকিবে, সেখানে কর্মে ও আমোদে সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেইখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিশের দ্বারা গ্রামের বিবাদ ও মামলা মিটাইয়া দিবে।

জোতদার ও চাষা রায়ত যতদিন প্রত্যেকে স্বতন্ত্র থাকিয়া চাষবাস করিবে ততদিন তাহাদের অসচ্ছল অবস্থা কিছুতেই ঘুচিবে না। পৃথিবীতে চারিদিকে সকলেই জোট বাঁধিয়া প্রবল হইয়া উঠিতেছে ; এমন অবস্থায় যাহারাই বিচ্ছিন্ন এককভাবে থাকিবে তাহাদিগকে চিরদিনই অন্যের গোলামি ও মজুরি করিয়া মরিতেই হইবে।

অদ্যকার দিনে যাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে সমস্ত একত্র মিলাইয়া বাঁধ বাধিবার সময় আসিয়াছে। এ না হইলে ঢালু পথ দিয়া আমাদের ছোটো ছোটো সামর্থ্য ও সম্বলের ধারা বাহির হইয়া গিয়া অন্যের জলাশয় পূর্ণ করিবে। অন্ন থাকিতেও আমরা অন্ন পাইব

না এবং আমরা কী কারণে কেমন করিয়া যে মরিতেছি তা জানিতেও পারিব না। আজ যাহাদিগকে বাঁচাইতে চাই তাহাদিগকে মিলাইতে হইবে।

য়ুরোপে আমেরিকায় কৃষির নানাপ্রকার মিতশ্রমিক যন্ত্র বাহির হইয়াছে, নিতান্ত দারিদ্র্যবশত সে-সমস্ত আমাদের কোনো কাজেই লাগিতেছে না, অল্প জমি ও অল্প শক্তি লইয়া সে-সমস্ত যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব নহে। যদি এক-একটি মণ্ডলী অথবা এক-একটি গ্রামের সকলে সমবেত হইয়া নিজেদের সমস্ত জমি একত্র মিলাইয়া দিয়া কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হয় তবে আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে অনেক খরচ বাঁচিয়া ও কাজের সুবিধা হইয়া তাহারা লাভবান হইতে পারে। যদি গ্রামের উৎপন্ন সমস্ত ইক্ষু তাহারা এক কলে মাড়াই করিয়া লয় তবে দামি কল কিনিয়া লইলে তাহাদের লাভ বৈ লোকসান হয় না। পাটের খেত সমস্ত এক করিয়া লইলে প্রেসের সাহায্যে তাহারা নিজেরাই পাট বাঁধাই করিয়া লইতে পারে। গোয়ালারা একত্র হইয়া জোট করিলে গো-পালন ও মাখন ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুত করা সস্তায় ও ভালোমতে সম্পন্ন হয়। তাঁতিরা জোট বাঁধিয়া নিজের পল্লিতে যদি কল আনে এবং প্রত্যেকে তাহাতে আপনার খাটুনি দেয় তবে কাপড় বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হওয়াতে তাহাদের প্রত্যেকেরই সুবিধা ঘটে।

শহরে ধনী মহাজনের কারখানায় মজুরি করিতে গেলে শ্রমিকদিগের মনুষ্যত্ব কিরূপ নষ্ট হয় সকলেই জানেন। বিশেষত আমাদের যে দেশের সমাজ গৃহের উপরে প্রতিষ্ঠিত যেখানে গৃহনীতি বিচলিত হইলে ধর্মের প্রধান অবলম্বন জীর্ণ হইয়া পড়ে ও সমাজের মর্মস্থানে বিষসঞ্চার হইতে থাকে সে দেশে বড়ো বড়ো কারখানা যদি শহরের মধ্যে আবর্ত রচনা করিয়া চারিদিকের গ্রামপল্লি হইতে দরিদ্র গৃহস্থদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনে তবে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচ্যুত, বাসস্থান হইতে বিশ্লিষ্ট স্ত্রীপুরুষগণ নিরানন্দকর কলের কাজে ক্রমশই কীরূপ দুর্গতির মধ্যে নিমজ্জিত হইতে পারে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। কলের দ্বারা কেবল জিনিসপত্রের উপচয় করিতে গিয়া মানুষের অপচয় করিয়া বসিলে সমাজের অধিকদিন তাহা সহিবে না। অতএব পল্লিবাসীরাই একত্রে মিলিলে যে-সকল যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভবপর হয় তাহারই সাহায্যে স্বস্থানেই কর্মের উন্নতি করিতে পারিলে সকল দিক রক্ষা হইতে পারে। শুধু তাই নয়, দেশের জনসাধারণকে ঐক্যনীতিতে দীক্ষিত করিবার এই একটি উপায়। প্রাদেশিক সভা উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা একটি মণ্ডলীকেও যদি এইরূপে গড়িয়া তুলিতে পারেন তবে এই দৃষ্টান্তের সফলতা দেখিতে চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

এমনি করিয়া ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হইয়া উঠিলে ভারতবর্ষের দেশগুলির মধ্যে তাহার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়া উঠিবে এবং সেই দৈশিক কেন্দ্রগুলি একটি মহাদেশিক কেন্দ্রচূড়ায় পরিণত হইবে। তখনই সেই কেন্দ্রটি ভারতবর্ষের সত্যকার কেন্দ্র হইবে। নতুবা পরিধি যাহার প্রস্তুতই হয় নাই সেই কেন্দ্রের

প্রামাণিকতা কোথায়। এবং যাহার মধ্যে দেশের কর্মের কোনো উদ্‌যোগ নাই, কেবলমাত্র দুর্বল জাতির দাবি এবং দায়িত্বহীন পরামর্শ, সে সভা দেশের রাজকর্মসভার সহযোগী হইবার আশা করিবে কোন্ সত্যের এবং কোন্ শক্তির বলে।

কল আসিয়া যেমন তাঁতকে মারিয়াছে তেমনি ব্রিটিশ শাসনও সর্বগ্রহ ও সর্বব্যাপী হইয়া আমাদের গ্রামসমাজের সহজ ব্যবস্থাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। কালক্রমে প্রয়োজনের বিস্তার-বশত ছোটো ব্যবস্থা যখন বড়ো ব্যবস্থায় পরিণত হয় তখন তাহাতে ভালো বৈ মন্দ হয় না, কিন্তু তাহা স্বাভাবিক পরিণতি হওয়া চাই। আমাদের যে গ্রাম্যব্যবস্থা ছিল, ছোটো হইলেও তাহা আমাদেরই ছিল। ব্রিটিশ ব্যবস্থা যত বড়োই হউক, তাহা আমাদের নহে। সুতরাং তাহাতে যে কেবল আমাদের শক্তির জড়তা ঘটিয়াছে তাহা নহে, তাহা আমাদের সমস্ত প্রয়োজন ঠিকমতো করিয়া পূরণ করিতে পারিতেছে না। নিজের চক্ষুকে অন্ধ করিয়া পরের চক্ষু দিয়া কাজ চালানো কখনোই ঠিকমত হইতে পারে না।

এখন তাই দেখা যাইতেছে, গ্রামের মধ্যে চেষ্টার কোনো লক্ষণ নাই। জলাশয় পূর্বে ছিল, আজ তাহা বুজিয়া আসিতেছে ; কেননা দেশের স্বাভাবিক কাজ বন্ধ। যে গোচারণের মাঠ ছিল তাহা রক্ষণের কোনো উপায় নাই ; যে দেবালয় ছিল তাহা সংস্কারের কোনো শক্তি নাই ; যেসকল পণ্ডিত সমাজের বন্ধন ছিলেন তাঁহাদের গণ্ডমূর্খ ছেলেরা আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যের ব্যবসায় ধরিয়াছে ; যে-সকল ধনীগৃহে ক্রিয়াকর্মে যাত্রায় গানে সাহিত্যরস ও ধর্মের চর্চা হইত তাঁহারা সকলেই শহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন ; যাঁহারা দুর্বলের সহায়, শরণাগতের আশ্রয় ও দুষ্কৃতকারীর দণ্ডদাতা ছিলেন তাঁহাদের স্থান পুলিসের দারোগা আজ কিরূপভাবে পূরণ করিতেছে তাহা কাহারও অগোচর নাই। লোকহিতের কোনো উচ্চ আদর্শ পরার্থে আত্মত্যাগের কোনো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গ্রামের মাঝখানে আর নাই ; কোনো বিধিনিষেধের শক্তি ভিতর হইতে কাজ করিতেছে না, আইনে যে কৃত্রিম বাঁধ দিতে পারে তাহাই আছে মাত্র। পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যা মকদ্দমায় গ্রাম উন্মাদের মতো নিজের নখে নিজেকে ছিন্ন করিতেছে, তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার কেহ নাই। জঙ্গল বাড়িয়া উঠিতেছে, ম্যালেরিয়া নিদারুণ হইতেছে, দুর্ভিক্ষ ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে ; আকাল পড়িলে পরবর্তী ফসল পর্যন্ত ক্ষুধা মিটাইয়া বাঁচিবে এমন সঞ্চয় নাই ; ডাকাত অথবা পুলিস চুরি অথবা চুরি-তদন্ত জন্য ঘরে ঢুকিলে ক্ষতি ও অপমান হইতে আপনার গৃহকে বাঁচাইবে এমন পরস্পর ঐক্য-মূলক সাহস নাই। তাহার পর যা খাইয়া শরীর বল পায় ও ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে তাহার কী অবস্থা! ঘি দূষিত, দুধ দুর্মূল্য, মৎস্য দুর্লভ, তৈল বিষাক্ত। যে কয়টা স্বদেশি ব্যধি ছিল তাহারা আমাদের যকৃৎ-প্লীহার উপর সিংহাসন পাতিয়া বসিয়াছে ; তাহার উপর বিদেশি ব্যাধিগুলি অতিথির মতো আসে এবং কুটুম্বের মতো রহিয়া যায়। ডিপ্‌থিরিয়া রাজযক্ষ্মা টাইফয়েড সকলেই এই রক্তহীনদের প্রতি একস্‌প্লয়টেশন-নীতি অবলম্বন করিয়াছে। অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, আনন্দ নাই, ভরসা

নাই ; পরস্পরের সহযোগিতা নাই; আঘাত উপস্থিত হইলে মাথা পাতিয়া লই, মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিশ্চেষ্ট হইয়া মরি, অবিচার উপস্থিত হইলে নিজের অদৃষ্টকেই দোষী করি এবং আত্মীয়ের বিপদ উপস্থিত হইলে দৈবের উপর তাহার ভার সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকি। ইহার কারণ কী ? ইহার কারণ এই, সমস্ত দেশ যে শিকড় দিয়া রস আকর্ষণ করিবে সেই শিকড়ে পোকা ধরিয়াছে, যে মাটি হইতে বাঁচিবার খাদ্য পাইবে সেই মাটি পাথরের মতো কঠিন হইয়া গিয়াছে, যে গ্রামসমাজ জাতির জন্মভূমি ও আশ্রয়স্থান তাহার সমস্ত ব্যবস্থাবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এখন সে ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো নবীন কালের নির্দয় বন্যার মুখে ভাসিয়া যাইতেছে।

দেশের মধ্যে পরিবর্তন বাহির হইতে আসিলে পুরাতন আশ্রয়টা যখন অব্যবহারে ভাঙিয়া পড়ে এবং নূতন কালের উপযোগী কোনো নূতন ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠে না তখন সেইরূপ যুগান্তকালে বহুতর পুরাতন জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরাও কি দিনে দিনে উদাস দৃষ্টির সম্মুখে স্বজাতিকে লুপ্ত হইতে দেখিব। ম্যালেরিয়া, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, এগুলি কি আকস্মিক। এগুলি কি আমাদের সান্নিপাতিকের মজ্জাগত দুর্লক্ষণ নহে। সকলের চেয়ে ভয়ংকর দুর্লক্ষণ সমগ্র দেশের হৃদয়নিহিত হতাশ নিশ্চেষ্টতা। কিছুরই যে প্রতিকার আমাদের নিজের হাতে আছে, কোনো ব্যবস্থাই যে আমরা নিজে করিতে পারি, সেই বিশ্বাস যখন চলিয়া যায়, যখন কোনো জাতি কেবল করুণভাবে ললাটে করস্পর্শ করে ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আকাশের দিকে তাকায়, তখন কোনো সামান্য আক্রমণও সে আর সহিতে পারে না, ক্ষুদ্র ক্ষত দেখিতে দেখিতে তাহার পক্ষে বিষক্ষত হইয়া উঠে। তখন সে মরিলাম মনে করিয়াই মরিতে থাকে।

কিন্তু কালরাত্রি বুঝি পোহাইল, রোগীর বাতায়নপথে প্রভাতের আলোক আশা বহন করিয়া আসিয়াছে। আজ আমরা দেশের শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী, যাহারা একদিন সুখে দুঃখে সমস্ত জনসাধারণের সঙ্গী ও সহায় ছিলাম এবং আজ যাহারা ভদ্রতা ও শিক্ষার বিলাসবশতই চিন্তায় ভাষায় ভাবে আচারে কর্মে সর্ব বিষয়েই সাধারণ হইতেই কেবলই দূরে চলিয়া যাইতেছি, আমাদিগকে আর-একবার উচ্চনীচ সকলের সঙ্গে মঙ্গল-সম্বন্ধে একত্র মিলিত হইয়া সামাজিক অসামঞ্জস্যের ভয়ংকর বিপদ হইতে দেশের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের শক্তিকে দেশের কল্যাণকর ও দেশের শক্তিকে আমাদের কর্মের সহযোগী করিয়া তুলিবার সময় প্রত্যহ বহিয়া যাইতেছে। যাহারা স্বভাবতই এক-অঙ্গ তাহাদের মাঝখানে বাধা পড়িয়া যদি এক রক্ত এক প্রাণ অবাধে সঞ্চারিত হইতে না পারে তবে যে-একটা সাংঘাতিক ব্যাধি জন্মে সেই ব্যাধিতেই আজ আমরা মরিতে বসিয়াছি। পৃথিবীতে সকলেই আজ ঐক্যবদ্ধ হইতেছে, আমরাই কেবল সকল দিকে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছি ; আমরা টিকিতে পারিব কেমন করিয়া।

আমাদের চেতনা জাতীয় অঙ্গের সর্বত্রই যে প্রসারিত হইতেছে না, আমাদের

বেদনাবোধ যে অতিশয়পরিমাণে কেবল শহরে, কেবল বিশিষ্ট সমাজেই বদ্ধ, তাহার একটা প্রমাণ দেখুন। স্বদেশি উদ্‌যোগটা তো শহরের শিক্ষিতমণ্ডলীই প্রবর্তন করিয়াছেন; কিন্তু মোটের উপরে তাঁহার বেশ নিরাপদেই আছেন। যাহারা বিপদে পড়িয়াছে তাহারা কাহারা।

জগদ্দল পাথর বুকের উপরে চাপাইয়া দেওয়া যে একটা দণ্ডবিধি তাহা রূপকথায় শুনিয়াছিলাম। বর্তমান রাজশাসনে রূপকথার সেই জগদ্দল পাথরটা প্যুনিটিভ পুলিসের বাস্তব মূর্তি ধরিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু এই পাথরটা অসহায় গ্রামের উপরে চাপিয়াছে বলিয়াই ইহার চাপ আমাদের সকলের বুকে পড়িতেছে না কেন। বাংলা দেশের এই বক্ষের ভারকে আমরা সকলে মিলিয়া ভাগ করিয়া লইয়া বেদনাকে সমান করিয়া তুলিব না কেন। স্বদেশি-প্রচার যদি অপরাধ হয় তবে প্যুনিটিভ পুলিসের ব্যয়ভার আমরা সকল অপরাধীই বাঁটিয়া লইব। এই বেদনা যদি সকল বাঙালির সামগ্রী হইয়া উঠে তবে ইহা আর বেদনাই থাকিবে না, আনন্দই হইয়া উঠিবে।

এই উপলক্ষ্যে দেশের জমিদারের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, বাংলার পল্লির মধ্যে প্রাণসঞ্চারের জন্য তাঁহারা উদ্‌যোগী না হইলে এ কাজ কখনোই সুসম্পন্ন হইবে না। পল্লিসচেতন হইয়া নিজের শক্তি নিজে অনুভব করিতে থাকিলে জমিদারের কর্তৃত্ব ও স্বার্থ খর্ব হইবে বলিয়া আপাতত আশঙ্কা হইতে পারে, কিন্তু এক পক্ষকে দুর্বল করিয়া নিজের স্বেচ্ছারের শক্তিকে কেবলই বাধাহীন করিতে থাকা আর ডাইনামাইট বুকের পকেটে লইয়া বেড়ানো একই কথা, একদিন প্রলয়ের অস্ত্র বিমুখ হইয়া অস্ত্রীকেই বধ করে। রায়তদিগকে এমনভাবে সবল ও শিক্ষিত করিয়া রাখা উচিত যে, ইচ্ছা করিলেও তাহাদের প্রতি অন্যায় করিবার প্রলোভনমাত্র জমিদারের মনে না উঠিতে পারে। জমিদার কি বণিকের মতো কেবল দীনভাবে আদায় করিবার পথগুলিই সর্বপ্রকারে মুক্ত রাখিবেন। কিন্তু সেইসঙ্গে মহৎভাবে স্বার্থত্যাগ করিবার সম্বন্ধ যদি একান্ত যত্নে না রক্ষা করেন, উচিত ক্ষতি উদারভাবে স্বীকার করিবার শক্তি যদি তাঁহার না থাকে, তবে তাঁহার আত্মসম্মান কেমন করিয়া থাকিবে। রাজহাটে উপাধি কিনিবার বেলায় তিনি তো লোকসানকে লোকসান জ্ঞান করেন না? কিন্তু যথার্থ রাজা হইবার একমাত্র স্বাভাবিক অধিকার আছে তাঁহার রায়তদের কাছে। তিনি যে বহুতর লোকের প্রভু বন্ধু ও রক্ষক, বহুলোকের মঙ্গলবিধানকর্তা। পৃথিবীতে এতবড়ো উচ্চ পদ লাভ করিয়া এ পদের দায়িত্ব রক্ষা করিবেন না?

এ কথা যেন না মনে করি যে দূরে বসিয়া টাকা ঢালিতে পারিলেই রায়তের হিত করা যায়। এ সম্বন্ধে একটি শিক্ষা কোনোদিন ভুলিব না। এক সময়ে আমি মফস্বলে কোনো জমিদারি তত্ত্বাবধানকালে সংবাদ পাইলাম, পুলিসের কোনো উচ্চ কর্মচারী কেবল

যে একদল জেলের গুরুতর ক্ষতি করিয়াছে তাহা নহে, তদন্তের উপলক্ষ করিয়া তাহাদের গ্রামে গৃহস্থদের মধ্যে বিষম অশান্তি উপস্থিত করিয়াছে। আমি উৎপীড়িত জেলেদের ডাকিয়া বলিলাম, তোরা উৎপাতকারীর নামে দেওয়ানি ও ফৌজদারি যেমন ইচ্ছা নালিশ কর্, আমি কলিকাতা হইতে বড়ো কৌঁসুলি আনাইয়া মকদ্দমা চালাইব। তাহারা হাত জোড় করিয়া কহিল, কর্তা, মামলায় জিতিয়া লাভ কী? পুলিসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে আমরা ভিটায় টিঁকিতেই পারিব না।

আমি ভাবিয়া দেখিলাম, দুর্বল লোক জিতিয়াও হারে ; চমৎকার অস্ত্রচিকিৎসা হয়, কিন্তু ক্ষীণ রোগী চিকিৎসার দায়েই মারা পড়ে। তাহার পর হইতে এই কথা আমাকে বারংবার ভাবিতে হইয়াছে, আর-কোনো দান দানই নহে, শক্তিদানই একমাত্র দান।

একটা গল্প আছে। ছাগশিশু একবার ব্রহ্মার কাছে গিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিল, 'ভগবান্ তোমার পৃথিবীতে আমাকে সকলেই খাইতে চায় কেন।' তাহাতে ব্রহ্মা উত্তর করিয়াছিলেন, 'বাপু, অন্যকে দোষ দিব কী, তোমার চেহারা দেখিলে আমারই খাইতে ইচ্ছা করে।'

পৃথিবীতে অক্ষম বিচার পাইবে, রক্ষা পাইবে, এমন ব্যবস্থা দেবতাই করিতে পারেন না। ভারতমন্ত্রসভা হইতে আরম্ভ করিয়া পার্লামেন্ট পর্যন্ত মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও ইহার যথার্থ প্রতিবিধান হইতে পারে না। সাধু ইচ্ছা এখানে অশক্ত। দুর্বলতার সংস্রবে আইন আপনি দুর্বল হইয়া পড়ে, পুলিস আপনি বিভীষিকা হইয়া উঠে। এবং যাঁহাকে রক্ষকর্তা বলিয়া দোহাই পাড়ি স্বয়ং তিনিই পুলিসের ধর্মবাপ হইয়া দাঁড়ান।

এ দিকে প্রজার দুর্বলতা-সংশোধন আমাদের কর্তৃপক্ষদের বর্তমান রাজনীতির বিরুদ্ধ। যিনি পুলিস-কমিশনে বসিয়া একদিন ধর্মবুদ্ধির জোরে পুলিসকে অত্যাচারী বলিয়া কটুবাক্য বলেন তিনিই লাটের গদিতে বসিয়া কর্মবুদ্ধির ঝোঁকে সেই পুলিসের বিষদাঁতে সামান্য আঘাতটুকু লাগিলেই অসহ্য বেদনায় অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকেন। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কচি পাঁঠাটিকে অন্যের হাত হইতে রক্ষাযোগ্য করিতে গেলে পাছে সে তাঁহার নিজের চতুর্মুখের পক্ষেও কিছুমাত্র শক্ত হইয়া উঠে এ আশঙ্কা তিনি ছাড়িতে পারেন না। দেবা দুর্বলঘাতকাঃ।

তাই দেশের জমিদারদিগকে বলিতেছি, হতভাগ্য রায়তদিগকে পরের হাত এবং নিজের হাত হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত শিক্ষিত সুস্থ ও শক্তিশালী করিয়া না তুলিলে কোনো ভালো আইন বা অনুকূল রাজশক্তির দ্বারা ইহারা কদাচ রক্ষা পাইতে পারিবে না। ইহাদিগকে দেখিবামাত্র সকলেরই জিহ্বা লালায়িত হইবে। এমনি করিয়া দেশের অধিকাংশ লোককেই যদি জমিদার, মহাজন, পুলিস, কানুনগো, আদালতের আমলা, যে ইচ্ছা সে অনায়াসেই মারিয়া যায় ও মারিতে পারে তবে দেশের লোককে মানুষ হইতে না শিখাইয়াই রাজা হইতে শিখাইব কী করিয়া।

অবশেষে বর্তমান কালে আমাদের দেশের যে-সকল দৃঢ়নিষ্ঠ যুবক সমস্ত সংকট

উপেক্ষা করিয়াও স্বদেশহিতের জন্য স্বেচ্ছাব্রত ধারণ করিতেছেন অদ্য এই সভাস্থলে তাঁহারা সমস্ত বঙ্গদেশের আশীর্বাদ গ্রহণ করুন। রক্তবর্ণ প্রত্যুষে তোমরাই সর্বাগ্রে জাগিয়া উঠিয়া অনেক দ্বন্দ্বসংঘাত এবং অনেক দুঃখ সহ্য করিলে। তোমাদের সেই পৌরুষের উদ্‌বোধন কেবলমাত্র বজ্রঝংকারে ঘোষিত হইয়া উঠে নাই, আজ করুণাবর্ষণে তৃষ্ণাতুর দেশে প্রেমের বাদল আনিয়া দিয়াছে। সকলে যাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছে, অপমানে যাহারা অভ্যস্ত, যাহাদের সুবিধার জন্য কেহ কোনোদিন এতটুকু স্থান ছাড়িয়া দেয় নাই, গৃহের বাহিরে যাহারা কাহারও কাছে কোনো সহায়তা প্রত্যাশা করিতেও জানে না, তোমাদের কল্যাণে আজ তাহারা দেশের ছেলেদিগকে ভাই বলিতে শিখিল। তোমাদের শক্তি আজ যখন প্রীতিতে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তখন পাষাণ গলিয়া যাইবে, মরুভূমি উর্বরা হইয়া উঠিবে, তখন ভগবান আর আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন থাকিবেন না। তোমরা ভগীরথের ন্যায় তপস্যা করিয়া রুদ্রদেবের জটা হইতে এবার প্রেমের গঙ্গা আনিয়াছে; ইহার কেবল পুণ্যস্রোতকে ইন্দ্রের ঐরাবতও বাধা দিতে পারিবে না, এবং ইহার স্পর্শমাত্রেই পূর্বপুরুষের ভস্মরাশি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। হে তরুণতেজে উদ্দীপ্ত ভারতবিধাতার প্রেমের দূতগুলি, আমি আজ তোমাদের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া এই নিবেদন করিতেছি যে, দেশে অর্ধোদয়-যোগ কেবল একদিনের নহে। স্বদেশের অসহায় অনাথগণ যে বঞ্চিত পীড়িত ও ভীত হইতেছে সে কেবল কোনো বিশেষ স্থানে বা বিশেষ উপলক্ষ্যে নহে, এবং তাহাদিগকে যে কেবল তোমাদের নিজের শক্তিতেই রক্ষা করিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিবে সে দুরাশা করিয়ো না।

তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক-একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ করো। শিক্ষা দাও কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহার-সামগ্রী সম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্তিত করো ; গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার করো, এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত করো। এ কর্মে খ্যাতির আশা করিয়ো না ; এমনকী, গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে বাধা ও অবিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোনো উত্তেজনা নাই, কোনো বিরোধ নাই, কোনো ঘোষণা নাই ; কেবল ধৈর্য এবং প্রেম, নিভৃতে তপস্যা, মনের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র পণ যে, দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।

বাংলা দেশের প্রভিন্‌শ্যাল্ কন্‌ফারেন্স যদি বাংলার জেলায় জেলায় এইরূপ প্রাদেশিক সভা স্থাপন করিয়া তাহাকে পোষণ করিয়া তুলিবার ভার গ্রহণ করেন, এবং এই প্রাদেশিক সভাগুলি গ্রামে পল্লিতে আপন ফলবান ও ছায়াপ্রদ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দেন, তবেই স্বদেশের প্রতি আমাদের সত্য অধিকার জন্মিবে এবং স্বদেশের সর্বাঙ্গ হইতে নানা

ধমনীযোগে জীবন সঞ্চারের বলে কংগ্রেস দেশের স্পন্দমান-হৃৎপিণ্ড-স্বরূপ মর্মপদার্থ হইয়া ভারতবর্ষের বক্ষের মধ্যে বাস করিবে।

সভাপতির অভিভাষণে সভার কার্যতালিকা অবলম্বন করিয়া আমি কোনো আলোচনা করি নাই। দেশের সমস্ত কার্যই যে লক্ষ্য ধরিয়া চলিবে আমি তাহার মূলতত্ত্ব কয়টি নির্দেশ করিয়াছি মাত্র। সে-কয়টি এই ;

প্রথম, বর্তমান কালের প্রকৃতির সহিত আমাদের দেশের অবস্থার সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে আমাদিগকে বিলুপ্ত হইতে হইবে। বর্তমানের সেই প্রকৃতিটি, জোট বাঁধা, ব্যূহবদ্ধতা, অর্গ্যানিজেশান। সমস্ত মহৎগুণ থাকিলেও ব্যূহের নিকট কেবলমাত্র সমূহ আজ কিছুতেই টিকিতে পারিবে না। অতএব গ্রামে গ্রামে আমাদের মধ্যে যে বিশ্লিষ্টতা, যে মৃত্যুলক্ষণ দেখা দিয়াছে, গ্রামগুলিকে সত্বর ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া তাহা ঠেকাইতে হইবে।

দ্বিতীয়, আমাদের চেতনা জাতীয় কলেবরের সর্বত্র গিয়া পৌঁছিতেছে না। সেইজন্য স্বভাবতই আমাদের সমস্ত চেষ্টা এক জায়গায় পুষ্ট ও অন্য জায়গায় ক্ষীণ হইতেছে। জনসমাজের সহিত শিক্ষিত সমাজের নানা প্রকারেই বিচ্ছেদ ঘটাতে জাতির ঐক্যবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না।

তৃতীয়, এই ঐক্যবোধ কোনোমতেই কেবল উপদেশ বা আলোচনার দ্বারা সত্য হইতেই পারে না। শিক্ষিত সমাজ গণসমাজের মধ্যে তাঁহাদের কর্মচেষ্টাকে প্রসারিত করিলে তবেই আমাদের প্রাণের যোগ আপনিই সর্বত্র অবাধে সঞ্চারিত হইতে পারিবে।

সর্বসাধারণকে একত্র আকর্ষণ করিয়া একটি বৃহৎ কর্মব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষিত সমাজে নিজের মধ্যে বিরোধ করিয়া তাহা কখনো সম্ভবপর হইবে না। মতভেদ আমাদের আছেই, থাকিবেই এবং থাকাই শ্রেয়, কিন্তু দূরের কথাকে দূরে রাখিয়া এবং তর্কের বিষয়কে তর্কসভায় রাখিয়া সমস্ত দেশকে বিনাশ ও বিচ্ছেদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকল মতের লোককেই আজ এখনই একই কর্মের দুর্গম পথে একত্র যাত্রা করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতেই পারে না। যদি থাকে তবে বুঝিতে হইবে, দেশের যে সাংঘাতিক দশা ঘটিয়াছে তাহা আমরা চোখ মেলিয়া দেখিতেছি না, অথবা ওই সাংঘাতিক দশার যেটি সর্বাপেক্ষা দুর্লক্ষণ, নৈরাশ্যের ঔদাসীন্য, তাহা আমাদিগকেও দুরারোগ্যরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

ভ্রাতৃগণ জগতের যে-সমস্ত বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে মানবজাতি আপন মহত্তম স্বরূপকে পরম দুঃখ ও ত্যাগের মধ্যে প্রকাশ করিয়া তুলিয়াছে, সেই উদার উন্মুক্ত ভূমিতেই আজ আমাদের চিত্তকে স্থাপিত করিব ; যে-সমস্ত মহাপুরুষ দীর্ঘকালের কঠোরতম সাধনার দ্বারা স্বজাতিকে সিদ্ধির পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন তাঁহাদিগকেই আজ আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিব ; তাহা হইলেই অদ্য যে মহাসভায় সমগ্র বাংলা দেশের আকাঙ্ক্ষা আপন সফলতার জন্য দেশের লোকের মুখের দিকে চাহিয়াছে তাহার

কর্ম যথার্থভাবে সম্পন্ন হইতে পারিবে। নতুবা সামান্য কথাটুকুর কলহে আত্মবিস্মৃত হইতে কতক্ষণ। নহিলে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ হয়তো উদ্দেশ্যের পথে কাঁটা দিয়া উঠিবে, এবং দলের অভিমানকেই কোনোমতে জয়ী করাকে স্বদেশের জয় বলিয়া ভুল করিয়া বসিব।

আমরা এক-এক কালের লোক কালের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া চলিয়া যাইব। কোথায় থাকিবে আমাদের যত ক্ষুদ্রতা মান-অভিমান তর্ক-বিতর্ক বিরোধ! কিন্তু বিধাতার নিগূঢ় চালনায় আমাদের জীবনের কর্ম নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে আকৃতি দান করিয়া আমাদের দেশকে উপরের দিকে গড়িয়া তুলিবে। অদ্যকার দীনতার শ্রীহীনতার মধ্য দিয়া সেই মেঘবিমুক্ত সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের অভ্যুদয়কে এইখানেই আমাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করো যেদিন আমাদের পৌত্রগণ সগৌরবে বলিতে পারিবে, এ-সমস্তই আমাদের এ-সমস্তই আমরা গড়িয়াছি। আমাদের মাঠকে আমরা উর্বর করিয়াছি, জলাশয়কে নির্মল করিয়াছি, বায়ুকে নিরাময় করিয়াছি, বিদ্যাকে বিস্তৃত করিয়াছি ও চিত্তকে নির্ভীক করিয়াছি। বলিতে পারিবে, আমাদের এই পরম সুন্দর দেশ, এই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা মাতৃভূমি, এই জ্ঞানে-ধর্মে-কর্মে-প্রতিষ্ঠিত বীর্যে-বিধৃত জাতীয় সমাজ, এ আমাদেরই কীর্তি। যে দিকে চাহিয়া দেখি, সমস্তই আমাদের চিন্তা চেষ্টা ও প্রাণের দ্বারা পরিপূর্ণ, আনন্দগানে মুখরিত এবং নূতন নূতন আশাপথের যাত্রীদের অক্লান্তপদভারে কম্পমান।

১৩১৪

চিত্তরঞ্জন দাশ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ

ফরিদপুর ১৩৩২

যুগে যুগে ভারতবর্ষ এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে, 'মুক্তি কোন্ পথে?' ইহাই তার আত্মপ্রশ্ন। বেদের অতি প্রাচীনতম মন্ত্রে এই প্রশ্ন ধ্বনিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর চৈতন্য চরিতামৃতেও এই প্রশ্নের সমাধানের একটা চেষ্টা চলিয়াছে। এই প্রশ্নের উপর ভিত্তি করিয়া কেবল ধর্ম নহে, কেবল দর্শন নহে, কেবল কাব্য-মহাকাব্য বা সাহিত্যও নহে, পরন্তু কত বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য, কত বড়ো বড়ো রাজপ্রসাদ আমাদের জাতির ইতিহাস পথে গড়িয়া উঠিয়াছে, আবার কালক্রমে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ইতিহাসের পথ, গতি-মুক্তির পথ। ভারতবর্ষের যে ইতিহাস, তাহাও এক প্রচণ্ড গতি পথে—যুগে যুগে মুক্তি পাওয়ার ইতিহাস, অথবা এক চিরন্তন মুক্তি-পথে পুনঃপুনঃ অতি দুর্দম গতিবেগের ইতিহাস। ভারতবর্ষের ইতিহাস কেবল ধর্মের ইতিহাস নহে। শুধু দাসত্বের ইতিহাসও নহে।

যুগের অবসানে অথবা যুগের প্রারম্ভে, ভারতবর্ষ আবার আজ সেই সনাতন প্রাচীন প্রশ্নই, নূতন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, 'মুক্তি কোন্ পথে?' এই প্রশ্নের সমাধানে আবার কোন্ সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিবে, এবং কোন্ সাম্রাজ্যই বা ভাঙিয়া পড়িবে, তাহা ইতিহাসের ভাগ্য-বিধাতাই জানেন। আমরা জানি না। নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি না। তবে ভাঙা গড়া লইয়াই যদি ইতিহাস হয় এবং ভবিষ্যৎ ভারতের যদি ইতিহাস থাকে, তবে কোনো কিছু ভাঙিবেই, এবং কিছু না কিছু গড়িয়া উঠিবেই, ইহা নিশ্চিত। ইহা সৃষ্টির নিয়ম। ভারতবর্ষ সৃষ্টির বাহিরে নয়। অনিয়মে ভারতবর্ষ চলিবে না।

আলোক ও অন্ধকারে মেশামিশি, প্রাচীন ভারতের যে অতীত অস্পষ্ট যুগ, তাহার মধ্য হইতে জন্মলাভ করিয়াছে সে সুস্পষ্ট বাণী, যুগের পর যুগে যে বাণী রূপ গ্রহণ করিয়াছে, রূপ হইতে রূপান্তরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেই রূপ, সেই বিগ্রহ, সেই সুর, সেই আরব মুক্তির, বন্ধনের নহে। ভারতবর্ষ প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই এই জড় জগতের

পরিবর্তনশীল মায়া প্রপঞ্চ, প্রকৃতির দাসত্ব হইতে জীবের বা জীবাত্মার মুক্তি খুঁজিয়া আসিয়াছে। জন্ম ও মৃত্যু আলো ও আঁধারের মতো যেখানে আসিতেছে, যাইতেছে ; যাহা নশ্বর, যাহা দুদিনের , তাহাকে চিরদিনের বলিয়া আঁকড়িয়া ধরিতে ভারতবর্ষ কোনো দিন পরামর্শ দেয় নাই। যাহা দেখায় সত্য, অথচ মিথ্যা, তাহাকে ভারতবর্ষ মিথ্যা বলিয়াই জানিয়াছে। প্রকৃতির দাসত্ব হইতে আত্মার মুক্তির পথ যে দুর্গম, ক্ষুরধার-শাণিত, তাহা জানিয়াও মুক্তিকামী ভারত সেই কণ্টকময় সঙ্কট-পথে বীরদম্ভে চলিয়া গিয়াছে। ভয় পায় নাই, থামে নাই, পশ্চাতে তাকায় নাই।

আজ আবার বর্তমান ভারত মর্মে মর্মে নিপীড়িত হইয়া তাহার সমষ্টিভূত জাতীয় চৈতন্যকে জাগ্রত করিয়া পুনরায় আত্মপ্রশ্ন করিতেছে, 'মুক্তি কোন্ পথে?' ইহা প্রাচীন ভারতের ব্যষ্টি-মুক্তি নয়। ইহা বর্তমান ভারতের সমষ্টিমুক্তি। হে ভারতের অতুলনীয় জাতীয় সম্পদ, হে বাঙালি, আমি আপনাদের সকলের প্রতিনিধিস্বরূপ, আপনাদের সম্মুখে ভারতের এই সনাতন প্রশ্নই উত্থাপন করিতেছি, এ সঙ্কটে, এ দুর্দিনে, 'মুক্তি কোন্ পথে?' আমি অত্যন্ত সহজ ও সুস্পষ্ট করিয়া এই প্রশ্ন উত্থাপন করিলাম। কেন না, অতি সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিতরূপে আমাদের জানিতে হইবে যে, কী আমরা চাই, এবং তাহা পাইবার জন্য কী আমাদের করিতে হইবে।

প্রাচীন ভারতে প্রত্যেক ব্যক্তি যেরূপ ব্যক্তিগতভাবে আত্মার মুক্তি চাহিয়াছে, বর্তমান ভারতে সমগ্র ভারতের নরনারী, সমষ্টিগতভাবে সেইরূপ জাতীয় মুক্তি চাহিতেছে। ব্যক্তিই হউক বা জাতিই হউক, মুক্তির প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম বিচার করিতে হইবে, কি হইতে মুক্তি? সকলেই বলে যে, দাসত্ব হইতে মুক্তি। আমি তাহার সঙ্গে আরও বলিতে চাই, পাপ হইতেও মুক্তি। কে এই পাপ করে? আমি বলি. যে দাসত্বের লৌহশৃঙ্খল ক্রীতদাসের গলায় বলপূর্বক বন্ধন করিয়া দেয়, সেই পাপ করে। আমি আরও বলি, যে ক্লীব, ভীরু দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার সময় বাধা দেয় না, সে-ও পাপ করে। কবি যথার্থই বলিয়াছেন যে,

> অন্যায় যে করে—আর অন্যায় যে সহে
> তব দণ্ড যেন তারে বজ্র সম দহে।

চিন্তার ধারায়, বিকাশের পথে একের পর আর অথবা যুগপৎ, জাতীয় মুক্তি-প্রসঙ্গে অনেক রকম আদর্শ আপনাদের সম্মুখে আসিয়া দেখা দিয়েছে। Self Government–Home Rule Independence এবং Swaraj, ইহা এক একটি কথা মাত্র। ইহার কোন্ কথাটি কী বুঝায়, তাহা না বুঝিতে পারিলে এবং বুঝিয়া আয়ত্ত করিতে না পারিলে যেমন সর্বত্র তেমনি আমি মনে করি, বিশেষভাবে জাতীয় মুক্তির ক্ষেত্রে, নিরর্থক কথা নিতান্তই ব্যর্থ। আর যদি এই সমস্ত অল্পাধিক সমতুল্য, অথচ বিশ্লেষণ-মুখে বৈচিত্র্য-বহুল আদর্শগুলির

গূঢ় ইঙ্গিত স্পষ্ট বুঝা যায়। তবে ওই আদর্শ জাতীয় জীবনে আয়ত্ত করিতে হইলে কি বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা খুব বিবেচনার বিষয় হইয়া পড়ে।

উপায়-নির্ধারণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট দুই শ্রেণির মত এবং ওই ওই মতাবলম্বী ব্যক্তি আছেন, আমি জানি। এক শ্রেণি বলেন, বৈধ এবং নিতান্ত নির্ঝঞ্ঝাট ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে জাতীয় মুক্তি আয়ত্ত করিবার জন্য অধ্যবসায় করা হউক। আর এক শ্রেণি বলেন, যে বৈধ হউক আর অবৈধ হউক, বলপ্রকাশ ব্যতিরেকে স্বরাজ-লাভ অসম্ভব। অন্যান্য দু-এক শ্রেণির মতবাদও যে দেখা না দিয়াছে, তাহা নয়। তবে তাহা এতদূর স্পষ্ট নয় যে, উল্লেখ করিতে পারি এবং উল্লেখ করিলেও আশঙ্কাও আছে যে, উহা আমার বা আপনাদের বোধগম্য হইবে না।

জাতীয় মুক্তির আদর্শ সম্বন্ধে এবং তাহা আয়ত্ত করিবার উপায় সম্বন্ধে আমার যা অভিমত, তাহা আপনাদের নিকট সংক্ষেপে উপস্থিত করিতেছি। এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসাকল্পে আমার অভিমত আপনাদের বিচার্য হইতে পারে, আশা করি। আমার অভিপ্রায় এই যে, বাঙলার প্রাদেশিক সম্মিলন মুক্তকণ্ঠে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করুক যে, আমাদের জাতীয় মুক্তির আদর্শ কী? এবং ওই আদর্শ আয়ত্ত করিতে হইলে সমগ্র জাতিকে কী উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

মুক্তির আদর্শ লইয়া আলোচনা প্রসঙ্গে আমার মনে হল স্বরাজের আর্দশ অপেক্ষা, Indepenence-এর আদর্শ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। ইহা সত্য যে, Independence অর্থ dependence বা অধীনতার অভাব। সুতরাং এই আদর্শ মুলত অভাবাত্মক। কিন্তু অধীনতার অভাব হইলেই ভাবাত্ম (Poitive) কিঁছু স্বতঃই আমরা নাও পাইতে পারি। আমি অবশ্য ইহা বলি না যে, Independence ও স্বরাজ পরস্পর বিরোধী অথবা ইহার একের সঙ্গে অপরের সামঞ্জস্যবিধান হইতে পারে না, এমন কথা আমি বলি না। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন শুধু অধীনতার অভাব নয়, ভাবাত্মক বা বস্তুগত এক অখণ্ড স্বরাজের প্রতিষ্ঠা। কল্য প্রভাতেই ভারতবর্ষ Independent অর্থাৎ অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে, যদি যে-কোনো উপায়েই হউক, ইংরেজরাজ এদেশ হইতে চলিয়া যায়। কিন্তু ইংরেজ চলিয়া গেলে আমরা অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইতেও বা পারি, তথাপি কেবল তাহাতেই আমি স্বরাজ অর্থে যাহা বুঝি, তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না। ইংরেজ চলিয়া যাওয়া একটা অভাবাত্মক ব্যাপার। স্বরাজ অভাবাত্মক কিছু নয়। সুতরাং ইংরেজ চলিয়া যাওয়া আর স্বরাজলাভ এক বস্তু নহে। স্বরাজলাভ একটা বিশেষ রকমের ভাবাত্মক বস্তুর উদ্ভব বা প্রতিষ্ঠা। কী বস্তুর এই উদ্ভব? কী উপায়ে ইহার প্রতিষ্ঠা? ইহাই প্রশ্ন এবং সত্যই ইহা সুস্পষ্ট উত্তরের দাবি আমাদের নিকট করিতে পারে।

এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে আমি আমার গয়া কংগ্রেসের অভিভাষণের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতে পারি। আমি ওই অভিভাষণে বলিয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষে একটা জাতীয়তার

প্রতিষ্ঠা বড়ো বিস্ময়কর ঘটনা। কেন না, এখানে কালক্রমে একের পর আর এক কবির ভাষায়, "শক-হূন-দল-পাঠান-মোগল" প্রভৃতি আসিয়া একত্র হইয়াছে। এখানে বৈচিত্র্য যে শুধু বেশি, তাহা নয়। বড়ো অদ্ভুত রকমের। সুতরাং জীবন-ধর্মের নিয়মে যেখানে বৈচিত্র্য খুব বেশি, সেখানে ঐক্যও তেমনি গভীর ও সুদৃঢ় হইতে হইবে। এই ঐক্যই ত জাতীয়তা। ভারতবর্ষে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা-কল্পে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা জাতীয় একতা অনেক গুণে বেশি হওয়া দরকার, কেন না, অন্যান্য দেশে ভারতবর্ষের মতো বৈচিত্র্য নাই। যেখানে বৈচিত্র্য অল্প, বা সহজ বা সাধারণ রকমের, সেখানে অল্প একতাতেই জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা হয় ; কিন্তু ভারতবর্ষে তাহা সম্ভব হইবে না। বিধাতার ইচ্ছায় যাহা কঠিন, ভারতবর্ষকে এ যুগে তাহাই সম্ভব করিতে হইবে এবং ইহা ভারতবর্ষকে সম্ভব করিতেই হইবে, কেন না, বর্তমান ভারতের জাতীয়তার প্রতিষ্ঠার উপর মানবজাতির বিভিন্ন শাখা-জাতিগুলির পরস্পর মিলন একান্ত নির্ভর করিতেছে। আমার মনে হয়, ভারতবর্ষে যদি এক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা না হয়, তবে League of Nations প্রভৃতি যাহার পূর্বাভাস বা সূচনা মাত্র, সেই মানবজাতির বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী খণ্ডজাতিগুলির ভবিষ্যৎ মিলন, নিতান্তই আকাশকুসুম।

আমি আবার বলি, ভারতবর্ষে একজাতীয়তা কঠিন হইলেও সম্ভবপর। বৈচিত্র্য বাধা নহে। বৈচিত্র্য যত বেশি, ঐক্যও তত দৃঢ় হইবে। আমরা ইহা করিব। বিধাতা দায়স্বরূপ এই গুরুভার আমাদের ওপর ন্যস্ত করিয়াছেন। ভারতবর্ষে এক-জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা প্রত্যেক ভারতবাসীর ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া পালন করা কর্তব্য। ভারতের এই বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা, ব্যবহার এই বৃহৎ ভৌগোলিক আয়তন, ইহার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান, সমন্বয়সংঘটন করা হইতে পারে, কিঞ্চিৎ সময়সাপেক্ষ, কিঞ্চিৎ কন্টকাকীর্ণ পথে ক্লেশকর ভ্রমণ, তথাপি আমার নিশ্চয় মনে হয় যে, ইহা ব্যতীত স্বরাজলাভ সম্ভব হইবে না। এইখানেই এবং এই প্রসঙ্গে এ যুগে মহাত্মা গান্ধির নাম ও তাঁহার বাণীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব এত অধিক বলিয়া তাঁহার অতুলনীয় মনীষা, তাঁহার অনুপম দেব-চরিত্র, তাঁহার অমানুষিক কার্য করিবার ক্ষমতার নিকট আমরা মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়াও একটা গৌরব ও গর্ব অনুভব করি। তবে মহাত্মা গান্ধির নামে কেবলমাত্র গৌরব ও গর্ব করিয়া কালকর্তন সুবিবেচনার কার্য হইবে না। ভারতবর্ষে জাতীয়তা-প্রতিষ্ঠা কল্পে তিনি যে সৃষ্টি বা গঠনমূলক কার্যপদ্ধতি আমাদিগকে পালন করিতে বলিয়াছেন, তাহা না করিতে পারিলে আশঙ্কা হয়, আমাদের এবারকার আয়োজন উদ্যোগে বুঝিবা ভারতে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হইবে না। মহাত্মা গান্ধির গঠনমূলক কার্যপ্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ আমি আর আপনাদিগকে শুনাইতে চাহি না। কেন না, আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, মহাত্মা স্বয়ং এখানে উপস্থিত এবং তাঁহার মুখ হইতেই তাঁহার বাণী আমরা শুনিতে পাইব। তাঁহার গঠনমূলক পদ্ধতির সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত ; এবং আমি সর্বান্তঃকরণে আমার সমস্ত

দেশবাসীকে মহাত্মা-নির্দিষ্ট গঠনকার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য করযোড়ে অনুরোধ করিতেছি। শুধু মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ যথেষ্ট নহে।

যাহা হউক, জাতীয় মুক্তির আদর্শ আলোচনা প্রসঙ্গে Independence-এর আদর্শের মধ্যে একটা শৃঙ্খলার (Order) বড়ো অভাব বলিয়া বোধ হয়। যেন নাই বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এই বিবিধ উপকরণ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে, এক সুমহান ঐক্যস্থাপনের জন্য শৃঙ্খলা রক্ষা করা বা শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। ইহা স্পষ্ট আমাদের বুঝা উচিত যে, যাহা আমরা প্রতিষ্ঠা করিতে যাইতেছি, তাহার সহিত যেন আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির যে বৈশিষ্ট্য, যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক আবেষ্টন, তাহার মিল থাকে। আমার মনে হয়, স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে যে সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম বা সভ্যতার লোকেরা আছে, তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও ঐক্যসংস্থাপনের জন্য প্রথমত, আমাদের স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, এই জাতীয় একতা-স্থাপনের জন্য আমাদের জাতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আমি বলি না যে, তাহার জন্য আমাদের দুই হাজার বৎসর অতীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। যখনই এই রকম কথা আমি বলিয়াছি, তখনই অনেকে আমাকে ভুল বুঝিয়াছে। তাহা নয়। আমাদিগকে সম্মুখে নবযুগের মহামিলনের ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু আমরা আমাদের জাতীয় সভ্যতার যে বৈশিষ্ট্য, তাহাকে পরিত্যাগ করিব না। তাহাকে রক্ষা করিয়া, উত্তরোত্তর তাহাকে পরিপুষ্ট করিয়া অগ্রসর হইব। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, এই যে শৃঙ্খলার (Order) কথা আমি বলিতেছি, ইহা ইউরোপে যে ভাবে দেখা দিয়াছে, যে আকারে ফুটিয়াছে, ভারতবর্ষে সেইরূপ হইলে চলিবে না। ইউরোপের সমাজে ও রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের নানা বিভাগে যে শৃঙ্খলা দেখা যায়, তাহার মূলে একটা সামরিক (Military) ভাব বা অভিযান যেন লুক্কায়িত রহিয়াছে। ইংল্যান্ডের বর্তমান সমাজ ও শাসনযন্ত্রও এইরূপ একটা সামরিক শৃঙ্খলার দ্বারা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং রক্ষা পাইতেছে। আপনারা কেহ যেন মনে না করেন যে, এই প্রসঙ্গে আমি ইউরোপীয় সভ্যতাকে নিন্দা করিতেছি। ইউরোপের, তথা ইংল্যান্ডের সমাজ-জীবনের যে বৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়ে, আমি তাহার কথাই বলিতেছি মাত্র। তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য অবশ্যই তাঁহারা রক্ষা করিবেন, চাই কি বৃদ্ধিও করিবেন এবং করিতেছেনও। সমস্ত মানব সমাজের মধ্যে একটা ঐক্য থাকিলেও তাহাদের পথ আমাদের নয় এবং আমাদের পথ তাহাদের নয়। তাহারা তাহাদের পথে চলিবে, আমরা আমাদের পথে চলিব। উদ্দেশ্য এক। তবে পথ কিছু ভিন্ন। তৃতীয়ত, আমাদের পথে অগ্রসর হইতে কোনো বিদেশীয় রাজশক্তি আমাদের বাধা দিতে পারিবে না। এক্ষণে দেখিতে হইবে Independence-এর আদর্শ হইতে স্বরাজের আদর্শে পার্থক্য কী? স্বরাজের আদর্শে কী আছে, যাহা Independence-এর আদর্শে নাই? আমি বলি, আমাদের জাতির সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার যে আদর্শ, তাহাই স্বরাজ। Home Rule এবং Self-Government-এর

যে আদর্শ, তাহার মধ্যে আমি যেন ত্রুটি দেখিতে পাই। এই সমস্ত আদর্শের মধ্যে যাহা আছে, স্বরাজের আদর্শেও তাহা আছে। কিন্তু আমি যে শিক্ষা পাইয়াছি তাহাতে Rule অর্থাৎ শাসন এই কথাটির মধ্যে যে ভাব ফুটিয়া উঠে, তাহার বিরুদ্ধে আমার মন বিরূপ হইয়া উঠে, তা সে শাসন ঘরেরই (Home) হউক অথবা পরেরই (Foreign) হউক। Self-Government-এর বিরুদ্ধেও আমার ওইরূপ আপত্তি। কিন্তু কেবল নিজেদের দ্বারা এবং নিজেদের জন্যই যদি Self-Government হয়, তবে আমার আপত্তি বড়ো টিকে না, সত্য। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমি বলিতে পারি যে, স্বরাজের আদর্শে ইহার সমস্তই বিদ্যমান আছে।

তার পরে প্রশ্ন এই, আমরা যে জাতীয় মুক্তি লাভ করিব, তাহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া, না তাহার বাহিরে গিয়া? কংগ্রেস ইহার উত্তর স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার যে সমস্ত অধিকার তাহা যদি ব্রিটিশসাম্রাজ্য স্বীকার করে, তবে আমাদের এই সাম্রাজ্যের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন নেই। আর যদি স্বীকার না করে, তবে বাধ্য হইয়া সাম্রাজ্যের বাহিরে আমাদের যাইতে হইবে। কেন না, জাতীয় মুক্তি আমাদের লাভ করিতে হইবে, ইহা নিশ্চিত। আমরা সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিব, কী সাম্রাজ্যের গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়া পড়িব, ইহার উত্তর আমাদের অপেক্ষা আমাদের বর্তমান শাসনযন্ত্রের যাঁহারা নিয়ামক, তাঁহারাই বেশি করিয়া বলিতে পারেন। একটা জাতি হিসাবে আমাদের জীবনধারণ করিতেই হইবে। শুধু জাতীয়-জীবনধারণ নয়, জীবনকে প্রসার করিতে হইবে, পরিপূর্ণ করিতে হইবে ; জাতীয় জীবনের এই বিকাশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যদি আমাদিগকে যথোপযুক্ত সুযোগ দেয়, তবে সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াই আমরা মুক্তিলাভ করিব। আর যদি সুযোগ না দেয়, সাম্রাজ্যের রথচক্র যদি আমাদের নবজাগ্রত জাতীয় জীবনকে পিষিয়া ফেলে, তাহা হইলে সাম্রাজ্যের বাহিয়ে গিয়াই আমাদের স্বরাজলাভ করিতে হইবে। অন্যথা উপায় কী?

কিন্তু ইহা সত্য যে, আমরা যদি ওই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকি, তবে অনেক দিকে অনেক রকমের সুবিধা ও সুযোগ আমরা লাভ করিতে পারি। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিব সহিত এখন আর প্রভু ও ক্রীতদাসের সম্বন্ধ নাই। খণ্ড দেশ বা রাজ্যগুলি এখন স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছায় সাম্রাজ্যের সহিত একসঙ্গে গ্রথিত থাকিবার জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ। বাহ্যসম্পদ লাভের সুযোগ ও সুবিধার জন্য, স্বেচ্ছায় খণ্ডরাজ্যগুলি, সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে চায়। সুতরাং এই স্বাধীন চুক্তিমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ইচ্ছামতো খণ্ডরাজ্যগুলি অসুবিধা বুঝিলে, সাম্রাজ্যের গণ্ডীর বাহিরে যখন খুশি চলিয়া যাইতে পারে। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্বে, খণ্ডরাজ্যগুলির মধ্যে সাম্রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার একটা ভাব খুবই পরিস্ফুট হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ যখন শেষ হইয়া গেল, তখন কি সাম্রাজ্যবাদী, কি খণ্ড ও স্বতন্ত্র

রাজ্যবাদিগণ বুঝিতে পারিলেন যে, উভয়ের পক্ষেই স্বাধীনতামূলক যুক্তিশর্তে পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে একসঙ্গে থাকাই শ্রেয়স্কর। এখন ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, পৃথিবীর জাতিসকলের বর্তমান অবস্থায়, কোনো এক দেশ বা জাতিই অন্যের নিরপেক্ষ হইয়া, পৃথকভাবে থাকিতে পারে না, বাঁচিতে পারে না এবং এই আদর্শের অনুপাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত খণ্ডরাজ্যগুলি নিশ্চয়ই তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য স্বাধীনভাবে রক্ষা করিয়া ও তাহার উন্নতিকল্পে কোনোরূপ বাধা না পাইয়া, যদি অগ্রসর হইতে পারে, তবে সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াও স্বরাজ অর্থে আমি যাহা বুঝি, তাহা অবশ্যই লাভ করিতে পারে।

আমি নিজে এই সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিবার জন্য আর একটি বিশেষ কারণে উৎসাহ পাই। এই কারণটি রাজনৈতিক নহে, আধ্যাত্মিক। আমি জগতের পরিণামে একটা শান্তিতে বিশ্বাস করি। সমগ্র মানবজাতির একটা মহামিলনের যে স্বপ্ন, তাহাকে আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যদি তাহার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন খণ্ডরাজ্যগুলির বিশেষ বিশেষ স্বার্থ, স্বাতন্ত্র্য ও সভ্যতাকে রক্ষা করিয়া এক অখণ্ড ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, তবে এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঐক্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পৃথিবীতে সমগ্র মানবজাতির বিভিন্ন বিচিত্র শাখার মধ্যে এক অখণ্ড সুমহান ঐক্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। মানবজাতির ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা বড়ো কিছু কল্পনায় বা ধারণার আসে না। যদি প্রত্যেক জাতির উদার হৃদয় ও অসাধারণ মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই কার্যে ব্রতী হন তবে স্বতন্ত্র রাজ্যগুলিকে, সাম্রাজ্যের ঐক্যের জন্য আপাতত কোনো কোনো দিকে কিছু কিছু স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে। অন্য দিকে সাম্রাজ্যবাদীগণ অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলিকে দাসের প্রতি প্রভুর দৃষ্টি লইয়া যে দেখা, তাহা চিরকালের মতো পরিত্যাগ করিবেন। আমি মনে করি, ভারতের মঙ্গলের জন্য, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য, মানবজাতির মঙ্গলের জন্য, ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াই স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করিবে। এই চেষ্টা সফল হইলে, প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতি মানবজাতিকে যেভাবে সাহায্য করিতে পারে, ভারতবাসীও তাহা করিবেই এবং সম্ভবত তাহার অতিরিক্তও কিছু করিবে। কেন না, মানবজাতি ভবিষ্যৎ মহামিলনের একটা আদর্শ, ভারতবাসীর নিকট হইতে পাইবে।

এক্ষণে জাতীয়মুক্তির আদর্শ ছাড়িয়া তাহা লাভ করিবার জন্য কী উপায়ে অবলম্বন করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা আপনাদের সম্মুখে আমি উপস্থিত করিব। আমার নিজের এইরূপ ধারণা যে, উপায়কে আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করা যায় না। উপায় আদর্শেরই একটা অংশ। কেন না, যখনই আমরা উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হই, তখনই আমাদের মনের সম্মুখে উদ্দেশ্য বা আদর্শ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উপায় উদ্দেশ্য ছাড়া নহে। উদ্দেশ্য বা আদর্শের একটা অংশ।

এখন উপায় যদি আদর্শের একটা অংশ হয়, তবে হিংসা কোনো যুগেই আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শ ছিল না, বা এখনও নাই ; সুতরাং হিংসামূলক কোনো উপায় আমরা অবলম্বন করিতে পারি না। কেন না, তাহা আমাদের জাতীয় সভ্যতার আদর্শে নাই। আমি বলি না যে, ভারতের ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহ নাই, অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে হিংসামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নাই। আমাদের ইতিহাস কোনো বালকে পাঠ করিলেও আপনাদিগকে বলিয়া দিবে যে, ইহা মিথ্যা। কিন্তু অনেক জিনিস জোর করিয়া আমাদের মধ্যে প্রবেশ করানো হইয়াছে। ইতিহাস-পাঠকদের মধ্যে বিশেষজ্ঞগণ অবশ্যই আমাদের জাতীয় সভ্যতার যে যথার্থ স্বরূপ, তাহা হইতে তাহার উপর আরোপিত যে মিথ্যা আবরণ, তাহা অবশ্যই পৃথক করিয়া দেখিতে পারিবেন। হিংসা আমাদের প্রকৃতির মধ্যে তেমনভাবে নাই, যেমন ইউরোপে আছে। এই হিংসামূলক অবাধ্যতা দূর করিবার জন্য ইউরোপে যে আইনের সাহায্য লওয়া হয়, সে আইনের ভিত্তিও পাশবিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমরা ভারতবাসীরা স্বভাবতই প্রাচীন প্রথা ও আচার-ব্যবহার পালন করিয়া আসিতেছি। প্রাচীনতার প্রতি আমাদের স্বভাবের মধ্যে একটা ঝোঁক আছে। কতকটা এই গতানুগতিকভাবের জন্যই হিংসার ভাব আমাদের প্রকৃতির মধ্যে কম। আমাদের গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানগুলি অহিংসভাবে কাজ করিবার এক আশ্চর্য নির্দশন। আমাদের সর্বপ্রকার প্রতিষ্ঠানগুলিই, ফুল যে রকম আপনিই ফুটে, সেই রকম আপনা হইতেই বিকশিত হইয়াছে। পণ্ডিতেরা পাণ্ডিত্য লইয়া তর্ক করিয়াছেন, ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, বুভুক্ষু আত্মা সংসারের বন্ধন হইতে মুক্তির জন্য করুণ আর্তনাদ করিয়াছে! কলহ ও বাদবিসংবাদ, সালিশগণের সুপরামর্শে নিষ্পত্তি হইয়াছে। এইরূপ জাতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া যে-কোনো উপায় এখন অবলম্বন করা যাইবে, তাহা যে শুধু নীতির বিরোধী হইবে, তাহা নয়, তাহা ব্যর্থ হইবে। কোনো ফল প্রসব করিবে না।

আমি বলিতে দ্বিধা বোধ করি না যে, হিংসামূলক বিদ্রোহ দ্বারা আমরা কখনোই জাতীয়মুক্তি লাভ করিতে পারিব না। তারপর ভারতীয় প্রকৃতির অহিংসামূলক বৈশিষ্ট্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইহা কীরূপে সম্ভব যে, নিরস্ত্র একটা পরাধীন জাতি হিংসামূলক বিদ্রোহ দ্বারা অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত, গবর্নমেন্টের আজিকার দিনের প্রচণ্ড হিংসামূলক, প্রচুর আয়োজন ও বাধার বিরুদ্ধে জয়ী হইবে? ফরাসি বা অন্যান্য দেশের বিদ্রোহের কথা তুলিয়া কাজ নাই। সেই সমস্ত বিদ্রোহের যুগে মানুষেরা তির, ধনুক ও বর্শা হাতে যুদ্ধ করিত। কখনোবা জয়লাভও করিত। ইহা কি কল্পনায় সম্ভব যে, ওই উপায়ে আমরা এই বিজ্ঞানের যুগে সামরিক ভিত্তির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত একটা রাজ্যশাসনকে বিধ্বস্ত করিতে পারি? আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, ইংল্যান্ডেও এই শ্রেণির বিদ্রোহ আর আজিকার দিনে সম্ভবপর নয়।

তারপর ভারতবর্ষে জাতীয় একতা স্থাপনের জন্য বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধনের কথা আমি বলিয়াছি এবং যাহা ব্যতীত স্বরাজপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব বলিয়া আমার ধারণা, হিংসামূলক কোনো উপায় অবলম্বন করিতে গেলে তাহা একেবারে অসম্ভব হইবে। আমরা যদি হিংস্র হইয়া উঠি, তাহার ফলে গবর্নমেন্ট আরও অধিক হিংস্র হইয়া উঠিবে এবং এমন এক প্রচণ্ড দমন-নীতি আমাদের উপর চালনা করিবে, যাহার ফলে স্বরাজলাভ করিবার যে আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনের মধ্যে আছে, তাহা একেবারে নির্বাপিত হইয়াও যাইতে পারে। হিংসামূলক বিদ্রোহের পক্ষপাতী যে সমস্ত যুবকগণ আছেন, তাঁহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, আপামর সাধারণ দেশবাসী কি তাঁহাদের পক্ষ লইবে? যখন জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন হইবে, তখন যাহাদের বিপন্ন হইবার আশঙ্কা জন্মিবে, তাহারা সকলেই এই বিদ্রোহের ছায়ার ত্রিসীমানার মধ্যেও থাকিবে না। সুতরাং এইরূপ বিদ্রোহ কার্যকরী হইবে না, কিন্তু আমার কথা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, এই সমস্ত যুবকদের উদ্দেশ্যের সততা এবং স্বদেশপ্রেমের আতিশয্যের আমি অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য করিতেছি তাহা নহে। আমি শুধু বলিতে চাই যে, এই উপায় আমাদের প্রকৃতির সহিত মিলিবে না, আমাদের ধাতে সহিবে না, সুতরাং মহাত্মা গান্ধির ভাষায় বলিতে গেলে, ইহা শুধু 'সময় ও শক্তির অপব্যবহার মাত্র।' বাংলায় বিদ্রোহমূলক উপায়ের প্রতি আশা স্থাপন করিয়া আছেন যে সকল যুবকগণ, তাঁহাদিগকে আমি অনুনয় করিয়া বলিতেছি যে, ওইরূপ আশা যেন তাঁহারা অচিরাৎ পরিত্যাগ করেন। আর বাংলার প্রাদেশিক সম্মিলনকে আমি অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করুন যে, এই উপায়ে স্বরাজলাভ কোনো মতেই করা যাইবে না।

কিন্তু আমি যেমন হিংসামূলক উপায় অবলম্বনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলাম, তেমনই আমি না বলিয়া পারি না যে, গভর্নমেন্টের হিংসামূলক শাসনপদ্ধতিই বাংলা দেশে প্রজাশক্তির মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব সৃষ্টি করিয়াছে। আমার স্মরণ হয় যে, অধ্যাপক Dicey এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গত ত্রিশ বছরের মধ্যে ইংরেজ-জাতি আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার উপর যে একটা সম্ভ্রম, তাহা খুব বেশি রকম হারাইয়া ফেলিয়াছেন। সম্প্রতি ব্যবস্থা-প্রণয়নকার্যে স্পষ্টই লক্ষ করা যায় যে, আদালতের যে ক্ষমতা পূর্বে ছিল, এখন তাহা অনেকাংশে খর্ব করা হইয়াছে। ইহাতে আইন-রক্ষার প্রতি পূর্বের মতো শ্রদ্ধা নাই বলিয়াই প্রমাণ হয়। বস্তুত, হিংসা দ্বারা হিংসারই সৃষ্টি হয়। গবর্নমেন্ট যদি প্রজাশক্তির ন্যায্য দাবি, ন্যায্য আন্দোলনে অযথা বে-আইনি রকমে বাধা প্রদান করেন, তবে অধ্যাপক Dicey-র কথায় প্রজাশক্তির মধ্যে বে-আইনি অর্থাৎ আইন ভঙ্গ করিবার একটা স্পৃহা আপনা হইতেই সৃষ্টি হয়। ভারতের ইতিহাস, বিশেষভাবে বাঙলার ইতিহাস অধ্যাপক Dicey-র কথার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

ইংরাজ-রাজত্বে ভারতবর্ষে প্রজাশক্তির মধ্যে এই রাজদ্রোহিতা, এই বিদ্রোহের আবহাওয়া

এক দিনে সৃষ্টি হয় নাই। যেমন অন্যদেশে, তেমনই এখানেও, এই আবহাওয়া স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। ইহার প্রথম স্তরে একটা সাধারণ রকম অস্বস্তি বা চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছে। তাহার কারণ শতবর্ষব্যাপী ইংরাজ-শাসনের ফল। কেন না, প্রায় দীর্ঘ একটি শতাব্দী ধরিয়া ইংরেজরাজ, ইংরেজ দ্বারা ইংল্যাণ্ডের স্বার্থের জন্য এ দেশ শাসন করিয়াছেন মাত্র। এই অস্বস্তি বা চাঞ্চল্য ১৮৫৮ খ্রি. সিপাহি-বিদ্রোহের পর আরও ঘনীভূত হইয়াছে। ১৮৫৮ খ্রি. কোম্পানির হাত হইতে ভারতবর্ষের শাসন ইংল্যাণ্ডের রাজার অধীনে যাইয়া পড়ে। বিশেষভাবে এই সময় হইতে ১৯শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ভিক্টোরিয়া যুগের বেশির ভাগ, ভারতবর্ষকে এক বিদেশীয় আমলাতন্ত্র দ্বারা শাসন করা হইয়াছে এবং এই সময়ে ভারতবাসীদের জাতীয় স্বার্থের প্রতি কোনোরূপ দৃষ্টিপাত করা হয় নাই। এই যুগের ইংরাজ শাসনের বিশেষত্ব যে কেবল ভারতবাসীদের জাতীয় স্বার্থের প্রতি উদাসীনতা, তাহা নহে ইহার সব চেয়ে বিশেষত্ব এই যে, শিক্ষিত ভারতবাসীর মতামত রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে একেবারেই উপেক্ষা করা হইয়াছে। ভিক্টোরিয়া যুগের শেষাশেষি, প্রজার হিতের জন্য কতকগুলি সংস্কার করা হইয়াছিল, তাহা আমি জানি, আপনারাও জানেন। যেমন, Lord Ripon-এর Repeal of the Vernacular Press Act. The Inauguration of the Local Self-Government. The Ilbert Bill, এবং Revision of the Indian Councils Act. 1891, ইহা Lord Lansdown-এর সময়ে হইয়াছিল। ইহাকে আমি কতকটা Benevolent Despotism বলিতে চাহি। কেন না, এই সমস্ত সংস্কারের ভিতরকার কথা ছিল, আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটাইয়া আমলাতন্ত্রের শক্তিকে আরও অপ্রতিহত করিয়া তোলা। কেবল এক Local Self-Government-ই প্রজার হিতের জন্য বলিয়া ইতিহাসে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু যদি তলাইয়া দেখা যায়, তবে নিশ্চয়ই বুঝা যায় যে, ইহা মুখে যত বলে, কাজে তাহা কিছুই করে না।

প্রকৃতপক্ষে Local Self-Government-এর ব্যাপারে আমলাতন্ত্র এমন কোনো ক্ষমতাই প্রজার হাতে ছাড়িয়া দেয় নাই, যাহা দ্বারা প্রজা নিজের ইচ্ছামতো নিজেদের কোনো হিতসাধন করিতে পারে! অন্যদিকে Lord Lytton-এর Vernacular Press Act এবং Lord Dufferin-এর শিক্ষিত ভারতবাসীর মতামতের উপর ঘৃণাসূচক উক্তি ও তাচ্ছিল্য এবং দুর্ভিক্ষের সাহায্যকল্পে অতি নীচ মনের পরিচয়, এ সমস্তই পরবর্তীকালের ঘনীভূত বিদ্রোহমূলক আবহাওয়া সৃষ্টির পক্ষে একের পর আর সাহায্য করিয়া আসিতেছিল।

তারপর আমরা দ্বিতীয় স্তরে আসিতেছি। ভারতবর্ষে প্রজাশক্তির মধ্যে বিদ্রোহের আবহাওয়াকে এই দ্বিতীয় স্তরে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া, ইহাকে উদ্বোধন করিবার ভার লইয়াছিলেন লর্ড কার্জন। লর্ড কার্জনের অবিমৃষ্যকারিতা ও দাম্ভিকতাই এই দ্বিতীয় স্তরের রাজদ্রোহিতার প্রবর্তক। তিনিই লাটদিগের মধ্যে প্রথম শাসনকার্যের সুবিধাকে

(Adiministrative efficiency) প্রজাদের হিতের উপরে স্থান দিয়া গিয়াছেন। এক দিকে তিনি এই শাসনকার্যের সুবিধারূপ ধুয়া ধরিলেন অন্যদিকে শিক্ষিত ভারতবাসীর মতামতকে অতি যথেচ্ছ রকমে উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রজাশক্তির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত জাতীয় আন্দোলনকে সারকুলারের পর সারকুলার জারি করিয়া তাহাকে যেন গলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। ইহা একদিকে প্রচণ্ড দমননীতির সূত্রপাত করিল, অন্য দিকে দেশের এক শ্রেণির লোকের মনে প্রকৃতই রাজদ্রোহিতার এক বীজ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিল। যাহা বীজাকারে ছিল, তাহা অঙ্কুরিত হইল। ইহাই রাজদ্রোহিতার ভাবধারার দ্বিতীয় স্তরের দ্যোতনা।

লর্ড কার্জনের পর আমরা তৃতীয় স্তরে আসিয়া উপনীত হইতেছি। বীজে অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে। গর্তে লুকাইয়াছিল যে সাপ, লর্ড কার্জন বাঁশি বাজাইয়া তাহাকে গর্ত হইতে সাধ করিয়া বাহিরে আনিয়াছেন। সাপিনী ফণা তুলিতেছে। একটা দংশন না করিয়া সে যায় কোথায়? তৃতীয় স্তরের লক্ষণ যে, যাহা ভাবাকারে আবহাওয়ার মধ্যে ঘনীভূত হইয়াছিল, তাহা একটা বিষাক্ত দংশনে অতি ক্ষুদ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিল। লর্ড মিন্টোর রাজত্বকালে, আমলাতন্ত্র তাহার হিংস্রমূর্তির যে কোমল মসৃণ মকমলের বহিরাবরণ, তাহাও দূরে ফেলিয়া দিল : এক নগ্ন বীভৎসতা সংহারের মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল। বাঙলার যুবকদের মধ্যে এক শ্রেণি ইহাতে ভীত হইল না, কিন্তু তাহারা অন্ধকারে পথভ্রান্ত হইয়া পড়িল। তাহারা বোমা ও রিভলবার হস্তে ধাবমান হইল। কাহারও নিষেধ শুনিল না। ইহাই তৃতীয় স্তর।

ভারতে রাজবিদ্রোহের মূলে যে মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ ও বিকাশ আমি দেখাইলাম, রাজা ও প্রজার মধ্যে যে ঘাত-সংঘাতের দানবীয় লীলাভিনয় আপনারা দেখিলেন, ইহাকে আরও সম্পূর্ণ করিয়া দেখা হইবে, যদি আপনারা আরও দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখেন। ইহা সত্য যে, রাজশক্তির অবিমৃষ্যকারিতা, হঠকারিতা, অযথা নির্বিচারে সমস্ত দেশের উপর প্রচণ্ড দমননীতির প্রয়োগ বা অপ-প্রয়োগ, শিক্ষিত ভারতবাসীর মতামতকে অসীম অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা হইতেই রাজদ্রোহের আবহাওয়া জন্মলাভ করিয়াছে। তথাপি ভারতের বাহিরের কতকগুলি ঘটনাও এই সম্পর্কে আমাদের মনে না আসিয়া পারে না। যেমন ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে জাপান কর্তৃক রুসের পরাজয়, তাহার ফলে সমস্ত এশিয়া ভূখণ্ডে একটা নবজাগরণের সূত্রপাত, মিশরের স্বাধীনতা-প্রয়াসী বীরদিগের গরিলা যুদ্ধের সফলতা, আয়ারল্যাণ্ডের প্রজাতন্ত্রবাদীদের বিদ্রোহমূলক প্রচেষ্টা এবং সোভিয়েট রাশিয়ার পৃথিবী-কম্পনকারী বলশেভিক অভিযান, সর্বশেষে এঙ্গোরা গভর্নমেন্টের সিংহাসনতলে ইংরাজ ও গ্রিক জাতির নতজানু হইয়া অবস্থান, ইহা সমস্তই একের পর আর আমাদের মনের মধ্যে আসিয়া ভিড় করিয়া জমিয়া উঠিয়াছে, উঠিতেছে। তাহার ফলে এক শ্রেণির ভারতবাসী চিন্তা করিতেছেন, যে-কোনো উপায়েই

হউক, আমরাও স্বাধীনতা লাভ করিব।

আপনাদের কিঞ্চিৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলেও, এই সম্পর্কে ১৯০৫ হইতে ১৯০৯ এই পাঁচ বছরে ভারতবর্ষে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার একটা যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ তালিকা আমি আমার অভিভাষণের পরিশিষ্টভাগে দিলাম। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ হইতে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা আমি ওই তালিকাতে দেই নাই। আমার বিশ্বাস, এই সমস্ত ঘটনা ইহারই মধ্যে আপনারা ভুলিয়া উঠিতে পারেন নাই। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়। দিল্লি চাঁদনীচকে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়। Defence of India Act-এ বহু লোককে অন্তরীণে আবদ্ধ করা হয় ; রাউলাট আইন পাশ করা হয়, জালিওয়ানাবাগের লোমহর্ষণ বর্বর-সুল হত্যাকাণ্ডের অভিনয় হয়, কোমাগাটামারু, চরমাইনারের ঘটনা, এ সমস্তই আপনাদের স্মরণ আছে।

সুতরাং ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, রাজ-অত্যাচারের পরেই একটা রাজদ্রোহিতার সূত্রপাত হয়। আবার এই রাজদ্রোহিতার পরে পুনরায় একটা রাজ-অত্যাচার আত্মপ্রকাশ করে। খালি তাই নয়, যখনই গভর্ণমেন্ট আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রজার হিতের জন্য কোনো আইন পাশ করেন, আবার ঠিক তাহার সঙ্গে সঙ্গেই দমন-নীতি সমর্থন করিয়া আর একটা আইনও পাশ হয়।

জালিওয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ডের পরেই মহাত্মা গান্ধি স্বরাজলাভের জন্য এ যুগে আবার নূতন করিয়া এক অহিংসামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করিবার জন্য ভারতবাসীকে আহ্বান করেন। আমরা সকলেই আশা করি যে, আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারত মহাত্মা গান্ধির এই নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করিবে। করিবে কি, করিয়াছে। হিংসামূলক পদ্ধতি, কী গভর্নমেন্ট এবং কী হিংসামূলক বিদ্রোহীভাবাপন্ন ভারতবাসী, উভয়েই ইহা পরিত্যাগ করিবেন। কেন না, ইহা দ্বারা কেহই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিবে না।

এই যে নূতন Ordinance Act, ইহার দ্বারা ভারতবাসীর উপর অযথা অত্যাচার উৎপীড়ন বৃদ্ধি করা হইবে মাত্র। ইহার মূলে কোনো বিচারবুদ্ধি নাই। সমগ্র ভারত একবাক্যে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছে। ইহার সম্বন্ধে আমার নিজের মনের ভাব যথোপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ করিতে আমি ভরসা পাই না। কেন না, আমি পূর্ব হইতেই স্থির করিয়াছি যে, খুব সংযত ভাষায় আমি আমার মনের ভাব প্রকাশ করিব। আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, সর্বান্তঃকরণে আমি ইহার উচ্ছেদ কামনা করি। Lord Birkenhead ভারত গভর্নমেন্টের এই দমননীতিমূলক আইন সমর্থন করিয়া আমাকে এই গভর্নমেন্টের সহিত একত্রে কার্য করিবার জন্য যে সাদর আহ্বান করিয়াছেন, তাহার উত্তরে আমি যাহা বলিয়াছি, কোনো ভারতবাসীই তাহার উত্তরে অনুরূপ বলিতে পারে না।

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, Lord Birkenhead বলিয়াছেন যে, এই Ordinance আইন দ্বারা কেবল অপরাধী ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহই অসুবিধা ভোগ করিবে না।

আমি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলিবার স্পর্ধা করি যে, Lord Birkenhead এক্ষেত্রে অতি মারাত্মক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যাহাদিগকে এই Ordinance আইনের বলে কারাগারে অবরুদ্ধ করা হয়, আমরা স্বীকার করি না যে, তাহারা অপরাধী। তাঁহারা অপরাধী কি না, তাহা বিচারের পূর্বে কেহই স্থির করিতে পারে না। পুলিশ বা সি.আই.ডি.-র গোপন সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা বিচার নহে, অপরাধ সাব্যস্ত নহে। ইহা অবিচার। ইহা অত্যাচার। ইহা সভ্যতাভিমানী-ন্যায়বিচারাভিমানী সমগ্র ইংরেজ জাতির দুরপনেয় কলঙ্ক। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রহণযোগ্য সাক্ষী প্রমাণ লইয়া প্রকাশ্য আদালতে বিচার হউক। ইহা অতি স্বাভাবিক ব্যবস্থা। সুবোধ বালকেও ইহা বুঝিতে পারে।

গভর্নমেন্টের তিনটি বিভাগের মধ্যে প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিচার করিবার ক্ষমতা কেবল আদালতের হস্তেই ন্যস্ত। আদালত বিচার করিয়া যাহা স্থির করিবে—Executive বা শাসনবিভাগ নিজেই বিচার করিতে বসে, যিনি হুকুম পালন করিবেন, তিনিই যদি হঠাৎ হুকুম করিতে আরম্ভ করেন, তবে প্রজার স্বাধীনতাকে এমন যথেচ্ছ নিষ্ঠুরভাবে অপহরণ করা হয় যে, সে সম্বন্ধে ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের ইতিহাস লেখকগণ খুব বিশদরূপে বিশ্লেষণ করিয়াই লিখিয়াছেন। Lord Birkenhead তাঁহার নিজের দেশের ইতিহাস পড়েন নাই, এমন কথা কোন্ অর্বাচীন বলিতে সাহিস করিবে?

যখনই নূতন করিয়া গভর্নমেন্ট একটা দমন-নীতি প্রয়োগ করিয়াছে, তখনই তাহার সমর্থনের জন্য একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়াছে। সেই সব ঘটনার প্রত্যেকটির কথা বলিয়া আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি আমি করিব না। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু Bengal Ordinance সম্বন্ধে Legislative Assembly তে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি যে সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে এ বিষয়ে খুব বিস্তৃত রকমের সব কথাই তিনি বলিয়াছেন। আমি আপনাদের প্রত্যেককে সেই বক্তৃতাটি পড়িতে বলি। কেন না, তাহাতে পণ্ডিতজি গভর্নমেন্ট উল্লিখিত প্রত্যেকটি ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ওইরূপ ঘটনা হইতে কোনোমতেই কোনো প্রকারে দমন-নীতি প্রয়োগের অজুহাত বা অছিলা পাওয়া যাইতে পারে না। দমন-নীতি প্রয়োগের সময় গভর্নমেন্ট যে কৈফিয়ৎ ও যে ঘটনার উল্লেখ করেন, তাহা বিশ্বাস করা খুব শক্ত। আমি শুধু একটি দৃষ্টান্তের কথা আপনাদের নিকট উল্লেখ করিব। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ১১ ডিসেম্বর, স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ ৯ জন বাঙালিকে গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করা হয়। লর্ড মর্লি তখন ভারত গবর্নমেন্টের সেক্রেটারি। এই সম্পর্কে Lord Minto-কে তিনি লিখিয়াছিলেন,

> আপনি ৯ জন ব্যক্তিকে, এক বছর হইল কারারুদ্ধ করিয়াছেন। কারণ, আপনি বিশ্বাস করেন যে, তাহারা রাজদ্রোহিতামূলক ষড়যন্ত্রের সহিত অবৈধরূপে সংশ্লিষ্ট আছে এবং আপনি আরও বিশ্বাস করেন যে, তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলে, উল্লিখিত

ষড়যন্ত্রগুলির দমন হইবে।

এখন আপনারা শুনুন, Sir Hugh Stephenson এই সম্পর্কে Bengal Council-এ মাত্র সেদিন কি সব কথা বলিয়াছেন।

আমাদের দমন-নীতির অবলম্বিত উপায়ের অপপ্রয়োগ সম্বন্ধে আমি তিনটি ঘটনার উল্লেখ করিব। প্রথম দুইটি অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পর্কে। সংবাদপত্রে ইহা বলা হইয়াছে যে, ইহা কেহই বিশ্বাস করিবেন না যে, এই দুই জন রাজদ্রোহিতামূলক ষড়যন্ত্রের সহিত কোনো প্রকারে লিপ্ত ছিলেন। সুতরাং ইহাদের সম্পর্কে পুলিশের গোপন সংবাদ সম্পূর্ণই মিথ্যা এবং পুলিশের এই প্রকার গোপন সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া তখন যেরূপ গবর্নমেন্ট প্রতারিত হইয়াছিলেন, এখনও সেইরূপ হইতে পারেন। আমি বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তকে জানিতাম না। কিন্তু আহ্লাদের সহিত বলিতেছি যে, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং রাজদ্রোহিতামূলক ষড়যন্ত্রের সহিত তাঁহার কোনো সহানুভূতি নাই, ইহা আমি বলিতে পারি। কিন্তু আমি যতদূর জানি, তাহাতে কৃষ্ণবাবু, কি অশ্বিনীকুমার দত্ত কেহই রাজদ্রোহিতামূলক ষড়যন্ত্রকে উৎসাহ দিবার, বিশেষত উক্ত ষড়যন্ত্রে সাক্ষাৎভাবে থাকিবার অভিযোগ কেহই করে নাই! অশ্বিনীকুমার দত্ত সম্বন্ধে Bengal Government Regulation III- র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ, অশ্বিনীবাবু গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে নানা স্থানে বক্তৃতায় এক তুমুল ঝড় তুলিয়াছিলেন।

সুতরাং ইহা প্রমাণ দ্বারা স্থির হইল যে, এ দেশে অবৈধ আইন প্রচলন করিবার ক্ষমতা গবর্নমেন্টের আছে এবং সেই সঙ্গে ওই অবৈধ আইনের অপপ্রয়োগেরও যথেষ্ট অবসর আছে! আমাদের যেরূপ অবস্থা, আর গভর্নমেন্টের যেরূপ ব্যবস্থা, তাহাতে এরূপ না হইয়া যায় না। জগতের ইতিহাস এই কথারই প্রমাণ দেয় যে, আমলাতন্ত্র গভর্নমেন্ট সর্বত্রই, আইন ও শৃঙ্খলার ('Law and Order') অজুহাতে তাহাদের ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করিবার চেষ্টা করে। আইন ও শৃঙ্খলা, কথাটি শুনিতে খুব ভাল। কিন্তু আমাদের মতো দেশে যেখানে (আইনের রাজত্ব) 'Rule of Law' নাই, যেখানে আইন ও শৃঙ্খলার নামে, আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা মদমত্ত ব্যক্তিগণ কেবল তাঁহাদের অপ্রতিহত ক্ষমতাকে অপব্যবহার ও অত্যাচারে পরিণত করে মাত্র। আমলাতন্ত্রের দায়িত্বহীন ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করিবার এক উপায়, দমননীতির প্রয়োগ এবং গভর্নমেন্টের এই অযথা হিংসামূলক দমন-নীতির প্রয়োগকে আমি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। যেমন আমি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতালাভের পক্ষ হইতে হিংসামূলক রাজদ্রোহিতাকেও ঘৃণা করি। আমি গভর্নমেন্টকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত সতর্ক করিয়া দিবার জন্য একটা দায়িত্ব অনুভব করিতেছি যে, অযথা দমন-নীতির প্রয়োগ রাজ্য-শাসনের পক্ষে উৎকৃষ্ট পন্থা নহে। অতি অল্পসময়ের জন্য গভর্নমেন্ট ইহার বলে আপন ক্ষমতাকে অপ্রতিহত করিয়া তুলিতে পারে বটে, কিন্তু আমি আশা করি, Lord Birkenhead মনে মনে বুঝিতে পারেন যে, এ উপায়ে রাজ্যশাসন চলিবে না।

যাহা হউক, জাতীয় মুক্তিলাভের জন্য আমাদের কী উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার আলোচনা আমি করিয়াছি। হিংসামূলক রাজদ্রোহিতার ভাব আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেন না, এই উপায় প্রথমত নীতিবিরোধী ; দ্বিতীয়ত, ইহা দ্বারা কৃতকার্য হওয়া যাইবে না। ইহা নীতি-বিরোধী ; কেন না, আমাদের জাতীয় প্রকৃতি ও জাতীয় সভ্যতার সহিত ইহার মিল নাই। ইহা দ্বারা কৃতকার্য হওয়া যাইবে না, কারণ, ইহা করা যাইতে পারে না যে, আজিকার দিনে এমন একটা সুনিয়ন্ত্রিত গভর্নমেন্টকে কয়েকটা বোমা ও রিভলবারের গুলিতে আমরা একেবারে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া দিব।

তার পর প্রশ্ন, সেই চিরন্তন প্রশ্ন, তবে 'মুক্তি কোন্ পথে?' কী উপায় অবলম্বন করিলে আমরা স্বরাজ লাভ করিব? খুব বিজ্ঞতার সহিত অত্যন্ত গম্ভীরভাবে আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, Reform Act অনুযায়ী গভর্নমেন্টের সহিত একত্রে কার্য করিলেই স্বরাজ একেবারে আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে। ইহার উত্তরে আমার যাহা বলিবার—তাহা খুব পরিষ্কার করিয়া আবার আমি আপনাদিগকে বলিতেছি এবং আমি ইচ্ছা করি না যে কেহ এই প্রসঙ্গে আমার অভিপ্রায়কে অস্পষ্ট-দোষে দোষী করেন। আমি যদি বুঝিতাম, এই Reform Act-এ সত্যিকারের কোনো ক্ষমতা ও দায়িত্ব যথার্থই আমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে—যাহারা বলে—আমরা জাতীয় অভাব সকল পূর্ণ করিয়া, জাতীয় উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি—তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ গভর্ণমেন্টের সহিত একত্রে কার্য করিতে স্বীকৃত হইয়া Council Chamber-এর ভিতরে থাকিয়াই জাতির গঠনমূলক কার্যে প্রবৃত্ত হইতাম ও আমার দেশবাসীদিগকে সেইরূপ করিতে পরামর্শ দিতাম। কিন্তু মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া আমি আসল বস্তুটি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নই। Reform Act যে প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদিগকে কোনো ক্ষমতা দেয় নাই, তাহা আবার আজ আপনাদিগের নিকট বুঝাইতে গিয়া অযথা সময়ের অপব্যবহার করিব না। আপনারা ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। বাংলা দেশ ইহা আপনাদিগকে দেখাইয়াছে। দেখাইতে পারিয়াছে। আপনারা যদি এ সম্বন্ধে যুক্তি চান, বিচার করিতে চান, তবে আমি আমার আমেদাবাদ কংগ্রেসের বক্তৃতা আবার আপনাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে বলিব মাত্র, যদি আরও নিঃসংশয় হইতে চান, তাহা হইলে Muddiman Committee-র সমক্ষে যে সমস্ত সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা আর একবার পাঠ করিবেন এবং এমন সমস্ত লোক ওই সকল সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, স্বয়ং গভর্নমেন্টও তাঁহাদের ধীরতা ও রক্ষণশীলতা সম্বন্ধে কোনোরূপ সংশয় করিতে পারেন না। বর্তমান Reform Act-এর আসল কথা হইতেছে এই যে গভর্নমেন্ট মন্ত্রিদিগকে বিশ্বাস করে না। অবিশ্বাস করে এবং যেখানে এইরূপ অবিশ্বাস মনের মধ্যে থাকে, সেখানে সেই অবিশ্বাসের আবহাওয়ার মধ্যে সহযোগিতা বা একত্রে কাজ করিবার কথা মুখেও আনা যায় না। তথাপি গভর্নমেন্টের

সহিত একত্রে কাজ করা সম্বন্ধে আমার মত আমি সুস্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি। আমি আশা করি, বাংলার প্রাদেশিক সম্মিলন আমার সহিত একমত হইয়া এ বিষয়ে সুস্পষ্ট মতই প্রকাশ করিবে। আমার কথা এই যে, গভর্নমেন্টের সহিত একত্রে কাজ করিতে আমাদের কোনোই আপত্তি নাই—কেবল যদি গভর্নমেন্ট বিশ্বাস করিয়া সত্যিকার ক্ষমতা ও দায়িত্ব আমাদের উপর ছাড়িয়া দেন এবং কাজ করিতে কোনো বাধা না দেন তবে এই একত্রে কাজ করাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে দুইটি জিনিসের প্রয়োজন : প্রথমত, আমাদের শাসনকর্তাদের আমাদের প্রতি মনের ভাব যথার্থরূপে পরিবর্তন হওয়া চাই, দ্বিতীয়ত, সম্পূর্ণ স্বরাজ নিকটবর্তী ভবিষ্যতে আপনা হইতেই বিনা বাধায় যাহাতে আমরা পাইতে পারি, এখনই তাহার সূত্রপাত করা দরকার। গভর্নমেন্ট এ বিষয়ে আমাদিগকে এমন ভাবে কথা দিবেন যে, তাহার যেন আর নড়চড় না হইতে পারে।

আমি বারবার বলিয়াছি যে, গঠনমূলক কার্য আরম্ভ করিবার সুযোগ লাভ করিতে হইলে আমাদের প্রচুর স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। আপনারা বুঝিতে পারেন যে, একটা জাতির ইতিহাসে, স্বাধীনতালাভ করিবার পথে, কয়েক বৎসর মাত্র ব্যবধান খুব বেশি সময় নয়। অবশ্য সেই পথে অগ্রসর হইতে এখনই যদি আমরা সুযোগ পাই, প্রকৃত স্বরাজলাভের ভিত্তি যদি এখনই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যথার্থরূপে যদি আমাদের ও গভর্নমেন্টের মনের ভাব পরিবর্তন হয় আমি জানি, আপনারা বলিবেন 'মনপরিবর্তন' একটা সুন্দর কথা মাত্র। উহার কোনো অর্থ নাই, প্রকৃত কাজে উহার পরিচয় ও প্রমাণ আমরা চাই। ইহা খুব সত্য এবং আমিও ইহা স্বীকার করি। কিন্তু মুখের কথা কাজে পরিচয় দিবার জন্য, রাষ্ট্রক্ষেত্রে একটা নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি প্রয়োজন। এই আবহাওয়া সৃষ্টি হইতে পারে, যদি রাজা ও প্রজার মধ্যে মনোমালিন্য দূর করিয়া একটা মিটমাট বা আপোষের প্রস্তাব হয়। উভয় দলের মধ্যে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস উভয় দলেই অতি সহজে অনুভব করিতে পারে। ধীর ও শান্তভাবে সত্য যদি কোনো আপোষের প্রস্তাব হয়, তবে তাহার সার্থকতার জন্য, আমি মনে করি, সেই আপোষের সর্শ (terms) গুলি অপেক্ষা, ওই সমস্ত শর্তের (terms) পশ্চাতে যে মন আছে, সেই মানসিক অবস্থার প্রতি অধিকতর নির্ভর করিতে হইবে। উভয় পক্ষের মন যদি সরল হয়, সফলতা সহজেই করতলগত হইতে পারে। অন্যথা সফলতার কোনো সদুপায় আমিত দেখি না। বর্তমান অবস্থায়, এখনই আপোষের জন্য নিশ্চিতরূপে কোনো শর্ত (terms) উল্লেখ করা যাইতে পারে না। কিন্তু সত্যি কর্তৃপক্ষের মন যদি সরল হইয়া আসে, পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করিয়া, শান্তভাবে আপোষের কথাবার্তা চলিতে থাকে, তবে আপোষের শর্তগুলিকে স্থিরনিশ্চয়রূপে নির্ধারণ করিতে অধিক কালবিলম্ব হইবে না।

বাঙলা দেশের মনের ভাব আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে আভাসে কতকগুলি শর্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রথমত, গভর্নমেন্ট হঠাৎ দমন-নীতি প্রয়োগের যে কতকগুলি ক্ষমতা ধারণ করিয়া আছেন, তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিবেন এবং তাহার প্রমাণ স্বরূপ রাজনৈতিক বন্দিদের সর্বপ্রথমেই ছাড়িয়া দিবেন।

দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াই যাহাতে আমরা নিকটবর্তী ভবিষ্যতে পূর্ণ স্বরাজ লাভ করিতে পারি, তাহার সম্বন্ধে পাকা কথা দিবেন, যে কথার কোনো নড়চড় হইতে পারিবে না।

তৃতীয়ত, পূর্ণ স্বরাজ লাভের পূর্বে ইতিমধ্যে যখনই আমাদের শাসন যন্ত্রকে এমনভাবে পরিবর্তিত করিবেন, যাহাতে পূর্ণ স্বরাজ লাভের একটা স্থায়ী পাকা ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখন পূর্ণ স্বরাজ লাভের পথে কীভাবে এই বর্তমান শাসনযন্ত্রকে কোন্ দিকে কতটা পরিবর্তন করিতে হইবে, তাহা মিটমাট প্রসঙ্গে কথাবার্তার ওপর নির্ভর করে এবং সেই কথাবার্তা কেবল যে গভর্নমেন্ট ও সমগ্র প্রজাশক্তির প্রতিনিধিদের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে, তাহা নহে। দেশের সকল বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের সঙ্গেও পরামর্শ করিতে হইবে। দেশের ইউরোপীয় ও Anglo-Indian সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণকেও আহ্বান করা হইবে। আমার গয়া কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে আমি এ কথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছি।

আমি এ কথা আপনাদিগকে বিশেষরূপে চিন্তা করিতে বলিতেছি যে, আমরাও গভর্নমেন্টের সহিত এমন একটা শর্তে আবদ্ধ হইব যে, কী কথায়, কী কার্যে, কী হাব-ভাবে আমরা রাজদ্রোহমূলক কোনো আন্দোলনে উৎসাহ দিব না, অবশ্য এখনও দেই না এবং আমরা সর্বতোভাবে এইরূপ আত্মঘাতী আন্দোলন দেশ হইতে দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিব। এইরূপ একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার যে বিশেষ কোনো প্রয়োজন আছে, তাহা নয়, কেন না, বাংলার প্রাদেশিক সম্মিলন, কোনো দিনই রাজদ্রোহমূলক কোনো প্রকার আন্দোলনকে উৎসাহ দেয় নাই। তবে আমি বিশ্বাস করি যে, গভর্নমেন্টের মনের ভাব পরিবর্তিত হইলে তাহার ফলে স্বতঃই রাজদ্রোহীদের মনেও একটা পরিবর্তনের ভাব আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে এবং আমি যে ভাবের একটা আপোষের আভাস এই মাত্র দিলাম, তাহা কার্যে পরিণত হইলে, রাজদ্রোহের আন্দোলন একটা অতীতের বস্তু হইবে মাত্র—বর্তমানে তাহার কোনো অস্তিত্বই থাকিবে না এবং যে শক্তি ও সামর্থ ভ্রান্তপথে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে এখন প্রয়োগ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা হইতেছে, তাহা দেশের প্রকৃত কল্যাণকর কার্যে নিযুক্ত হইয়া সার্থকতা লাভ করিবে।

তার পরের কথা, যদি আমাদের আপোষের প্রস্তাবে গভর্নমেন্ট কর্ণপাত না করেন, তখন আমরা কী করিব? ইহার উত্তর খুব সহজ। আমরা গত দুই বৎসরকাল যেভাবে কার্য করিয়া আসিতেছি, সেই পথে, সেই ভাবেই কার্য করিতে থাকিব এবং তাহাতে ফল এই হইবে যে গভর্নমেন্ট তাহার বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাপ্রযুক্ত অধিকারের প্রয়োগ ও অপব্যয়

করা ভিন্ন, স্বাভাবিক নিয়মে শাসন-যন্ত্র পরিচালনা করিতে পারিবেন না। যেমন এখন পারিতেছেন না। কেহ কেহ বলেন যে, আমাদের এরূপ করা কর্তব্য নয়। তাঁহারা যুক্তিও দেন। বাজেটের প্রস্তাবে বাধা দিবার নাকি আমাদের নৈতিক অধিকার নাই। কেননা, তৎপূর্বে আমাদের নাকি প্রজাদের নিকট যাইয়া ট্যাক্স বন্ধ করিবার পরামর্শ দেওয়া উচিত।

এই কথার উত্তরে আমার আন্তরিক অভিপ্রায় এই যে, সমগ্র ভারতে প্রজাশক্তির মধ্যে একসঙ্গে একটা বিরাট অহিংসামূলক গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে অবাধ্যতার আবহাওয়া সৃষ্টি করা। স্বাধীনতাপ্রয়াসী পর্যুদস্ত আমরা, আমাদের হস্তে স্বাধীনতার যুদ্ধে ইহাই শেষ অস্ত্র। আমি বলি ব্রহ্মাস্ত্র। ধর্মযুদ্ধে কুরুক্ষেত্রে মহাবীর গাণ্ডীবী যেমন সর্বপ্রথমেই পাশুপাত প্রয়োগ করেন নাই, মহাবীর কর্ণও যেমন সর্বপ্রথমেই তাঁহার একাঘ্নী অস্ত্র ব্যবহার করেন নাই, কোনো বীরই তাহা করে না, আমরাও সর্বপ্রথমে আমাদের শেষ অস্ত্র ব্যবহার করিব না। কিন্তু যখন সমস্ত ফুরাইয়া যাইবে, শেষ যখন আমাদের সম্মুখে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন ধর্মযুদ্ধে কুরুক্ষেত্রের রথী যিনি, তাঁহাকে হৃদয়ে স্মরণ করিয়া আমরা শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে দ্বিধা করিব না, ভীত হইব না, কেন না, আমরা জানি যে, এ যুদ্ধ পশুবলের বিরুদ্ধে মানবের যে আত্মার বল, তাহারি যুদ্ধ। ইহা ধর্মযুদ্ধ। আমরা জয়ী হই বা পরাজিত হই, কিছু আসে যায় না। এ বিশ্বাস আমাদের কাছে যে, পৃথিবীর অতীত ও বর্তমান ইতিহাস আমাদের আজিকার যুদ্ধের মতো, কোনো একটা যুদ্ধও দেখাইতে পারে না। এক দিকে বর্তমান যুগের নব-আবিষ্কৃত বিজ্ঞান-সহায়ে সুসজ্জিত দৃঢ়বদ্ধ কাতারে কাতারে সশস্ত্র সেনা-সমাবেশ, অন্যদিকে নিরস্ত্র দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুৎপিপাসায় ম্রিয়মাণ অগণন ৩০ কোটি নর-কঙ্কাল। কটিমাত্র বস্ত্র আবরণে দেশব্যাপী ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের জীবন্ত বিগ্রহ ভারতের প্রধান সেনাপতি, আজ মাত্র আত্মার বলকে হস্তামলকবৎ ধারণ করিয়া, আমাদিগকে এই সমরাঙ্গণে আহ্বান করিয়াছেন।

হে আমার দেশবাসী ভ্রাতাগণ, ভগিনীগণ, সত্যি আমাদের বর্তমান ঘাত-সংঘাতের কোনো প্রতিধ্বনি কোনো জাতির অতীত ইতিহাসে দেখা যায় না। বাজেট প্রস্তাবে বাধা দেওয়ার বিরুদ্ধে যে আপত্তি, তাহার যদি অনুরূপ দৃষ্টান্ত একান্তই আপনাদের এত আবশ্যক হইয়া থাকে, তবে বাধ্য হইয়া ইংল্যান্ডের ইতিহাসের প্রতিই আপনাদের দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করিব। আপনারা কি জানেন না যে, স্টুয়ার্টদিগের রাজত্বকালে যখন প্রজারা ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিয়াছিল, তাহার বহু পূর্ব হইতেই পার্লামেন্টে প্রজাশক্তির প্রতিনিধিগণ বাজেট প্রস্তাবে বাধা দিয়েছিলেন? অহিংসামূলক অবাধ্যতার আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার উপায়, গভর্নমেন্টকে তাহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগে ট্যাক্স আদায় করিতে বাধ্য করা। আমরা বাজেট প্রস্তাবে বাধা দিয়া সফল হইলেই গভর্নমেন্ট বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগে ট্যাক্স আদায় করিতে উদ্যোগী হইবে এবং সেই সময় যদি নিতান্তই আসে, তবে আমরা আমাদের দেশবাসীকে ওইরূপ অবৈধ উপায়ে ট্যাক্স আদায়ের বিরুদ্ধে বাধা দিবার জন্য পরামর্শ

দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিব না।

তবু আমি আশা করি—সেই সময় হয় ত আসিবে না। কেন না, চারিদিকেই মনের একটা পরিবর্তন আমি লক্ষ করিতেছি। কিন্তু যদি আপোষের সকল প্রস্তাব উপেক্ষিত হয়, সকল ভরসা নির্মূল হইয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই ভারতবাসীকে অহিংসামূলক অবাধ্যতা (Civil Disobedience) গ্রহণ করিতে হইবে। গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে এই ব্রহ্মাস্ত্র সুযোগ বুঝিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও আপনাদের বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, Civil Disobedience শুধু মুখের কথা নয়। Civil Disobedience করিতে হইলে,

দেশের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে খুব বড়ো রকমের একটা শৃঙ্খলা রক্ষা করার প্রয়োজন হইবে।

আত্মোৎসর্গের জন্য অসীম সহিষ্ণুতা ধারণ করিতে হইবে।

ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত স্বার্থকে সমগ্র জাতির স্বার্থের নিকট বলি দিতে হইবে।

আমার আশঙ্কা হয় মহাত্মা গান্ধির গঠনমূলক কার্যপূর্ণ রকমে সফল না হইলে Civil Disobedience সম্ভবপর হইবে না। তথাপি আমাদের আদর্শকে সর্বদাই আমাদের চক্ষের সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে হইবে। কেন না, যে রকমেই হউক, স্বাধীনতাকে আমরা লাভ করিবই।

তবে আমি বলিতেছি যে, আপোষের সম্ভাবনা আমি দেখিতেছি। সমস্ত পৃথিবী যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমি দেখিতেছি, বিচ্ছিন্ন মানব জাতির মধ্যে একটা গঠন, একটা শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের জন্য মানবের আত্মা ব্যাকুল হইয়াছে। আমি বিশ্বাস করি, জগতের এই মহা-মিলনে ভারতবর্ষ খুব বেশি সাহায্য করিবে। জগতের সম্মুখে ভারতবর্ষের কিছু বলিবার আছে। ভারতবর্ষ তাহা বলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। পায়ে ভর করিয়া ভারতবর্ষ দাঁড়াইয়াছে, মানবের বিভিন্ন জাতির মিলন-মন্দিরের সিংহদ্বারে ভারতবর্ষ তাহার যুগ-যুগান্তরের অমরবাণী লইয়া সমুপস্থিত। ব্রিটিশ রাজনৈতিকগণ কি পথের কণ্টক হইবেন। আমি আশা করি না। তাঁহাদিগকে আমি বলি যে, তোমরা শান্তিলাভ করিতে পারো, যদি আপোষ করো। আপোষের সর্তগুলি তোমাদের ও আমাদের উভয় পক্ষেরই সম্মানজনক হইবে। ভারতের ইংরেজ সম্প্রদায়কে আমি বলি যে, তোমরা স্বাধীনতার পতাকা বহন করিবার অধিকারী একটা মহিম্নজাতির বংশধর, আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধে কী তোমরা সাহায্য করিবে না? আমরা ত এ দেশে তোমাদের ন্যায্য অধিকারের স্বত্ব সর্বদাই স্বীকার করিতে প্রস্তুত। বাংলার উৎসাহী কর্মীদিগকে আমি বলি যে, তোমরা এই স্বাধীনতার যুদ্ধে, এ যুগে বহু স্বার্থত্যাগ করিয়াছ, বহু কষ্ট পাইয়াছ, তোমাদের উপরেই রাজরোষ সংহারের মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এখনও সময় আসে নাই, যখন তোমরা সসম্মানে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে পার।

যুদ্ধক্ষেত্র এখনও তোমাদের অপেক্ষায় কলকোলাহলে মুখরিত। যাও বীর, যুদ্ধ করো। ইতিহাসের একটা মহা গৌরবান্বিত যুদ্ধের সৈনিক তোমরা, তাহা ভুলিও না। যখন যুদ্ধ শেষ হইবে, যখন সন্ধি হইয়া শান্তি আসিবে, নিশ্চয়ই আসিবে, তখন সংযত, শান্ত পদক্ষেপে সে শান্তিময় মিলন-মন্দিরে, সমুন্নত-শিরে তোমরা দলে দলে প্রবেশ করিবে, এই স্বপ্ন সাশ্রুনেত্রে আমি নিরীক্ষণ করিতেছি—। তোমরা তখন সর্বপ্রকার দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করিবে। জয়ী যে, সে দম্ভ করে না। বীর যে, সে জয়ের পর বিনয়ে অবনত হয়। মিলন-মন্দিরে যাত্রীরা যেন তোমাদের দেখিয়া বলিতে পারে, এরা সেই সমস্ত যোদ্ধা, যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়কে পরাজিত করিয়াছে, মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়াছে, আবার যুদ্ধাবসানে জয়মাল্য গলে, ইহারা বিনয়ে ও সৌজন্যে শত্রুকে অধিকতর পরাজিত করিয়াছে।

জাতীয়তা একটা উপায়, যাহা অবলম্বন করিয়া মানবাত্মা গতি-মুখে ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে। জাতীয়তার বিকাশের জন্য প্রয়োজন যে, ইহার মধ্য দিয়া সমগ্র মানবজাতি উত্তরোত্তর উন্নতির পথে আরোহণ করিতে পারে। জাতীয়তাই শেষ কথা নয় এবং আমি তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলিতেছি যে, যখন তোমরা মিলনের সর্তগুলিকে বিবেচনা করিবার জন্য আহূত হইবে—তখন জাতীয়তার গৌরবে অন্ধ হইয়া সমগ্র মানবজাতির যে ঐক্যমূলক গভীর স্বার্থ, তাহা ভুলিও না। আমি নিজে কি চাই, তাহার সম্বন্ধে আমার একটা স্পষ্ট ধারণা আছে। আমি চাই—ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে তাহার আপন সভ্যতার, আপন ধর্মের, আপন আচার-ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য নবযুগের উপযোগিভাবে রক্ষা করিয়া পরস্পরের সহিত একজাতীয়তার মধ্যে মিলিত হইবে। প্রত্যেক প্রদেশেই সমগ্র ভারতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো, ভারতের একতাকে রক্ষা করিবে।

ভারতের এই প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ও মিলন, সাম্রাজ্যের এক মহামিলনের অঙ্গীভূত। সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্যের ভিতরে একটা বিরাট অঙ্গের মতো অবরস্থান করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, সাম্রাজ্যের বল, সমৃদ্ধি ও গৌরব বৃদ্ধি করিবে।

প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতির স্বাধীনতার সার্থকতা সমগ্র মানবজাতিকে উন্নতির পথে সাহায্য করিবার উপর নির্ভর করিতেছে।

জাতিতে জাতিতে মিলন, পৃথিবীপৃষ্ঠে ব্যাকুল মানবাত্মার শান্তি আনয়ন করিবে।

বন্দে মাতরম্।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলাদেশের নূতন প্রকাশ মুহূর্তে

কালসমুদ্র থেকে বাংলাদেশের খণ্ডিত পূর্বাংশ পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান নূতন চেতনায় নূতন মহিমায় এক কথায় এক নবীন মহিমান্বিত সত্তায় যেন অভ্যুত্থিত হচ্ছেন, তাঁকে মাথায় করে দেবতার মতো তুলছেন পূর্ববঙ্গের সাড়ে সাত কোটি মানুষ। তাঁদের পুরোধা শেখ মুজিবর রহমান।

সমগ্র বিশ্ববাসী তাঁদের ঘোষণা শুনেছেন। এদেশ পূর্ব পাকিস্তান নয়, এদেশ বাংলাদেশ। সোনার বাংলাদেশ।

নূতন করে গান বেজে উঠেছে 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'।

মুজিবর রহমান—তুমি বঙ্গবন্ধু। তুমি নেতা। তুমি জাতি বন্ধু। ইতিহাসের একটি আত্মসংঘাত আত্মকলহে সমাপ্তির ছেদ টেনে দিয়ে নূতন অধ্যায় রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে। ২৬ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পূর্ব বাংলার পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে নূতন তারিখ।

মুজিবর রহমান পঁচিশ দিন সত্যাগ্রহের পর ঘোষণা করলেন—এ দেশ পূর্ব পাকিস্তান নয় এ দেশ বাংলাদেশ। এ দেশের মানুষ বাঙালি।

বাঙালির বাংলাদেশের জয়।

সোনার বাংলার জয়।

আমরাও এপার থেকে অভিভূত হয়েছি, তাঁদের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও জয়ধ্বনি দিয়েছি :

জয় বাংলাদেশ। সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি।

মুজিবর রহমান তুমি বঙ্গবন্ধু। তুমি আমার বন্ধু। তোমার জয় হোক। তুমি অমৃত লাভ করেছ তোমার জীবনে, তুমি বিনতার পুত্র গরুড়ের মতো মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনে জীবনমরণ

পণে যুদ্ধে নিরত হয়েছ। তুমি গরুড়। তোমার দিকে বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আর একজনের অমৃত অভিষিক্ত মূর্তি মনে পড়ছে। তিনি তোমারও পথপ্রদর্শক। তাঁকেও এই মুহূর্তে প্রণাম নিবেদন করি।

তোমাকে বন্ধু বলে আহ্বান করে আমরা তোমার কাছে তোমার তপস্যার অংশ চাই।

আমরা বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছি যে আমাদের পশ্চিম বাংলায় প্রতিদিনের জীবনে দেবমন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি ও শিশুকণ্ঠের কলহাস্যের ওপারে জীবন যখন সন্ত্রাসে ও গুপ্তহত্যায় মলিন ও বিড়ম্বিত হয়ে উঠেছে তখন ইতিহাসের কোন্ আশ্চর্য নির্দেশে আমাদের পূর্ব সীমান্তের ওপারে আমাদেরই ভাষা ও সংস্কৃতির আর এক অংশে দেশের সামগ্রিক জীবন এক আশ্চর্য ও অনির্বচনীয় মহিমায় ভাস্বর ও প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে প্রায় আশ্চর্য ও দিব্য স্বপ্নের মতো, অথচ আজ তা দিবালোকের মতো প্রত্যক্ষ। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, জীবলোকে যে প্রাণ জীবের শ্রেষ্ঠতম, প্রিয়তম সম্পদ, যে প্রাণকে শত বিরুদ্ধতা ও প্রতিকূলতার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখা অমোঘ জীবধর্ম, সেই প্রাণের সম্মান রক্ষার অনিবার্য প্রয়োজনে একটি সমগ্র জাতি, সাড়ে সাত কোটি জনসংখ্যা সমন্বিত একটি জাতি, একান্ত অবহেলায়, অকাতরে, হাসিমুখে সামগ্রিকভাবে নিজেদের প্রাণ নিঃশেষে দান করবার জন্য উদ্যত। সংখ্যা গণনার প্রায় অতীত সংখ্যায় প্রাণ ইতিমধ্যে নিবেদিত হয়েছে, বাকী প্রাণ নিবেদনের জন্য প্রস্তুত, উন্মুখ। একেই বলে অভ্যুদয়। মানুষ জাতি উদিত হয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে।

এই বীর্যবত্তার ও অভ্যুত্থানের বোধ হয় কোনো তুলনা সমসাময়িক ইতিহাসে নেই। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম বুঝি। সেখানে অস্ত্র দিয়ে অস্ত্রের মোকাবিলা হয়, অস্ত্রের বলে বলীয়ান শত্রুর সঙ্গে বীর অস্ত্র নিয়ে লড়াই করে। কিন্তু আজ আমাদের সীমান্তের ওপারে আমাদের ভাষাভাষী ভ্রাতা-ভগ্নীরা যে সংগ্রামে লিপ্ত সে সংগ্রাম একান্তভাবে অসম। একপক্ষ, যারা বিদেশি, যারা শাসকরূপী শোষক তারা আধুনিকতম মারণাস্ত্রের ঐশ্বর্যে ও সজ্জায় পূর্ণ সজ্জিত; আর অপরপক্ষ, যাঁরা নদীমাতৃক 'বাংলাদেশে'র মৃত্তিকার সন্তান, যাঁদের প্রাত্যহিক জীবনে লাঙল, পাঁচনলাঠি, কোদাল আর কাস্তে ছাড়া অন্য যন্ত্র ও অস্ত্রের সংবাদ রাখতেন না, তাঁরা। তাঁরা আজ হাতের কাছে যে যা অস্ত্র পেয়েছেন তাই সম্বল করেই বুকে সাহস, মুখে হাসি নিয়ে এগিয়ে এসেছেন লড়াই দিতে। এই অসম সংগ্রামে কী ফল হতে পারে তা সম্পূর্ণ জেনে বুঝেই তাঁরা অগ্রসর হয়ে এসেছেন। এই আশ্চর্য বীর্যবত্তা, সাহস ও আত্মসম্মানবোধের পদপ্রান্তে একজন বাঙালি লেখক হিসাবে নিঃশেষ প্রণাম নিবেদন করছি।

কিন্তু এতো শুধু বীর্যবত্তা, সাহস ও আত্মসম্মানবোধের কথা নয়। এর সঙ্গে প্রচণ্ডতম

ক্ষতির কথা জড়িয়ে আছে। সংখ্যাতীত প্রাণ প্রতিদিন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, মানুষ যেখানে নিজের ভালোবাসার মানুষ, প্রাণের মানুষ বুকে ধরে ঘর বেঁধে বসতি করে বাস করে সে বসতি জ্বলেপুড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের সীমান্তের ওপারের ভ্রাতা-ভগ্নীদের জন্য আজ আমাদের গৌরব এবং অহংকারও যত, বেদনা ও আশঙ্কা ঠিক ততখানি। তাদের প্রাণ ও বসতি যথাসম্ভব রক্ষিত হোক। এ রক্ষার প্রার্থনা কার কাছে জানাব জানি না। এ প্রার্থনা কোনো মানুষের কানে ও হৃদয়ে যদি প্রবেশ না করে, তাহলে সব প্রার্থনা মানুষ চিরকাল যাঁর পদপ্রান্তে একান্ত নিরাশ্বাস হয়েও নিবেদন করেছে, সেই ঈশ্বরের পদপ্রান্তেই নিবেদন করছি। এবং মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতির উপর বিশ্বাস হারাচ্ছি।

আজ সীমান্তের ওপারের বাংলা ভাষাভাসী ভ্রাতা ও ভগ্নীদের বীর্য ও বেদনার কথায় এপারে পশ্চিমবঙ্গবাসীর হৃদয় উত্তাল, এক একটি সংবাদের ঘোষণায় উথলে উথলে উঠছে। তাঁদের হৃদয়ের সেই অনুভবের কতকটা আজ প্রকাশ পাচ্ছে মহাকবির কিছু গানে। যে কয়েকটি গানের কলি আজ আকাশবাণী থেকে বার বার গীত হচ্ছে, যা নিঃশব্দে মানুষ এই প্রান্তে মন্ত্রজপের মতো জিহ্বার অক্ষমালায় উচ্চারণ করে চলেছে সেই সংগীতের দু-একটি পঙ্ক্তি আমিও পুনর্বার উচ্চারণ করি :

আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে
বাহির হলে জননী।
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ
দুই নয়নে স্নেহের হাসি
ললাট-নেত্র অগ্নিবরণ
তোমার মুক্ত কেশের পুঞ্জ মাঝে
লুকায় অশনি
তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে
রৌদ্রবসনী।

আজ মনে হচ্ছে এ কথাগুলি যেন শুধু কথার কথা নয়, কথার সঙ্গে ধ্বনির সঙ্গে বা ধ্যানের সঙ্গে ধারণা যেন প্রত্যক্ষ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন। সোনার বাংলা আজ বিচিত্রভাবে সীমান্তের ওপারের ভাই-বোনদের ধ্যান, কর্ম ও সাধনার পুণ্যে বাঙালির ও বিশ্ববাসীর দৃষ্টির সম্মুখে বিমূর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছেন। দেশের মৃত্তিকা আজ চিন্ময়ীর মূর্তিতে বর ও অভয় দুই নিয়ে তাঁদের জন্য, তাঁদের স্বপক্ষে আবির্ভূত হয়েছেন। সে বরাভয়ের প্রত্যক্ষ প্রকাশ সহস্রবাধা, বেদনা, ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও আজ দিনে দিনে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর রূপে প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরও কিছু বক্তব্য আছে। সে বক্তব্যের মধ্যে আমাদের সীমান্তপারের ভ্রাতা-ভগ্নীদের জয়োচ্চারণ, গৌরবগাথা বা বেদনা-প্রকাশ ছাড়াও আরও কিছু বক্তব্য আছে। এই যে একটি নিরস্ত্র, অস্ত্রসম্বলহীন জাতির নিজের ভূমিতে বিদেশি, সমরাস্ত্রসজ্জিত সামরিক শাসকরা, শাসিতের সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত সমস্ত দাবি ও সমস্ত অধিকার অস্বীকার করে, নির্বিচারে হত্যা, নির্যাতন ও অত্যাচারের বর্বরোচিত ও হীনতম অভিযান চালিয়েছে যার মধ্যে বাংলাদেশের নারীধর্ম ও নারীজীবনের উপর পৈশাচিক অত্যাচারের কথা আছে যা সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়েছে যার নিন্দা শুধু পশ্চিমবঙ্গেই ওঠেনি, সমগ্র ভারতবর্ষেই ধ্বনিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে তার সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের বিবেক, যা প্রতিটি জাতির কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়, সেই বিশ্ববিবেক নীরব কেন? সে ধিক্কারে সোচ্চার হোক!

কিন্তু সেও তো এদিক দিয়ে প্রথম পদক্ষেপ! একান্ত ন্যায়সঙ্গত স্বাধিকারলোপের জন্য এই যে মূঢ়, বর্বর অভিযান তার শুধুমাত্র নিন্দা করলেই তো চলবে না! এই মূঢ় ও বর্বর অভিযান রোধ করবার জন্য বিশ্বের যে হস্ত ন্যায়কে ধারণ করে থাকে, প্রলয়কালে পুরাণপুরুষের বেদধৃত হস্তের মতো, সেই হস্ত প্রসারিত হোক, সেই বিবেক তার রুষ্ট দৃষ্টি ক্ষেপণ করুক। অন্য দিকে ন্যায় যার পক্ষে, তাকে অভয় দেবার জন্য, রক্ষা করবার জন্য সেই বাণী সোচ্চার হোক, সেই বরাভয়ধৃত হস্ত উত্তোলিত হোক—তাদের মস্তককে স্পর্শ করুক।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করলে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত ভাষণ।

সুভাষচন্দ্র বসু

তরুণের আহ্বান

১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আর্যসমাজ হলে নিখিল বঙ্গ যুব সম্মিলনীর অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ

মাননীয় ভদ্রমণ্ডলী ও তরুণ বন্ধুরা,

আমার পরম সৌভাগ্য; আজ আমি আপনাদের সাদর সংবর্ধনা জানাবার সুযোগ পেয়েছি। আমার এই সৌভাগ্য সম্ভাবনার মধ্যে একটা বৈচিত্র্য আছে, সেটা এই যে আমি আপনাদের আহ্বান করছি বাংলার আনন্দ-উৎসবের মধ্যে নয়, সুখ-ঐশ্বর্যের মধ্যে নয়, বিত্তমানের মধ্যে নয়, শান্তিশৃঙ্খলার মধ্যে নয়, আমি আপনাদের আহ্বান করছি দুঃখ, দারিদ্র্য, নির্যাতনের মধ্যে, অভাব, অজ্ঞানতা, অবসাদের মধ্যে, অত্যাচার অনাচারের মধ্যে এবং সবার ওপর মনুষ্যত্বের পদে পদে অপমানের মধ্যে। এই তো সাধনার ক্ষেত্র, এখানে মাধুর্য কিছু নেই, কিন্তু সৌন্দর্য আছে, এখানে নিষ্ঠুর দুঃসহ আবির্ভাবের মধ্যে আমাদের যোগসাধনার জন্য দাঁড়াতে হবে। আনন্দ এই যে, এখানে ভোলাবার কিছু নেই, অপরিসীম রিক্ততা আর অপরিমেয় ত্যাগের মধ্যে আমাদের নিজের পথ নিজে করে নিতে হবে, পশুশক্তির সাধনায় নয়, কাপুরুষের ভেদনীতিতে নয়, এখানে সমাহিত আত্মসাধনার দ্বারা, সর্বস্পৃহাশূন্য পুণ্য প্রচেষ্টার দ্বারা, নরনারায়ণের নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা মুহ্যমান জাতির উদ্বোধন করতে হবে।

তাই বলছিলাম, এত বড়ো দুশ্চর্য সাধনায় আপনাদের আহ্বান করার সুযোগ যে আমি পেয়েছি, এ আমার পরম সৌভাগ্য। আর পরম আনন্দের কথা এই যে, আমি এই কঠিন তপস্যার জন্য সত্যের পথে আহ্বান করছি বাংলার তরুণ সম্প্রদায়কে। আমি আজ দেহে, মনে, আদর্শে ও উদ্দেশ্যে এক হয়ে তাদের কাছে আমার প্রীতির অর্ঘ উপহার দিয়ে তাদের সম্বোধন করে বলি, হে আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরাই তো যুগে যুগে, দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করে এসেছ। মুক্তিপথের নিশানধারী

তোমরাই তো চিরদিন অগ্রগামী হয়ে পথ দেখিয়ে এসেছ। তোমরা যে জেগেছ, অলস বিলাস পরিহার করে তোমরা যে আজ আত্মভোলা হয়ে পথ চলার জন্য দাঁড়িয়েছ তা আমি জানি। জানি বলেই তো তোমাদের আহ্বান করার সাহস আমার হয়েছে।

প্রলয়ের ঝড় আমাদের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল, বর্ষার দুর্যোগকে মাথায় করেও আমরা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সুযোগ যখন এসেছে, ভাগ্যবিধাতা মুখ তুলে চেয়েছেন, তখন তো আর বসে বসে তর্কযুদ্ধ করে জাতির লজ্জা, দেশের দৈন্য, মনুষ্যত্বের অপমানকে দিন দিন বাড়ালে চলবে না।

চেয়ে দেখ, যেখানে আমাদের সত্যিকার দেশ, যেখানে আমাদের জীবনের আশা, ভরসা, উৎসাহ, মান, সম্পদ, সেখানে আমরা নেই। সেখানে :

গভীর আঁধার ঘেরা চারিধার নিঝুম দিবস রাতি,
বুকের আড়ালে মিটি মিটি জ্বলে তৈলবিহীন বাতি।
গুম ধরে আছে পাতাটি কাঁপে না, ছম্ ছম্ করে দেহ,
দেবতাবিহীন দেবালয় আজ, জনহীন সব গেহ।
মানুষের দেহে প্রেতের নৃত্য, রণতাণ্ডব সম,
আপন রক্ত আপনি শুষিছে নিষ্ঠুর নির্মম।

তাই আমাদের দেশের বেদনাময়ী মাতৃমূর্তি নয়নজলে ছিন্ন অঞ্চল ভিজিয়ে আমাদেরই আশায় বসে আছেন।

যেখানে জীবনের লীলাখেলার আনন্দের লুঠ হত, যেখানে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উৎসগুলির প্রাচুর্যে আমাদের ভাণ্ডার উপচে পড়ত, যেখানে জলে সুধা, ফলে অমৃত, শস্যে অনন্ত, দেশের অনন্ত প্রাণদায়িনী শক্তি ছিল, সেখানে আজ বিরাট শ্মশান খাঁ খাঁ করছে। প্রেতের ছায়া দেখে অর্ধমৃত প্রাণ শিউরে উঠছে, লক্ষ লক্ষ চুলি দাউ দাউ করে জ্বলে যাচ্ছে। এক বিন্দু জল নেই, এতটুকু জীবন নেই।

তোমরা জাগো ভাই, মায়ের পূজার শঙ্খ বেজেছে, আর তোমরা তুচ্ছ দীনতা নিয়ে ঘরের কোণে বসে থেকো না।

এমন সুন্দর দেশ, এমন আলো, এমন বাতাস, এমন গান, এমন প্রাণ, আজ মা সত্যিই বুঝি ডেকেছেন। ভাই, একবার ধ্যাননেত্রে চেয়ে দেখ, চারদিকে ধ্বংসের স্তূপীভূত ভস্মরাশির ওপর এক জ্যোতির্ময়ী মূর্তি। কী বিরাট। কী মহিমময়!

শ্যামায়মান বনশ্রীতে নিবিড়কুন্তলা, নদীমেখলা, নীলাম্বর-পরিধানা, বরাভয়বিধায়িনী সর্বাণী, সদা হাস্যময়ী. সেই তো আমার জননী। শারদ জ্যোৎস্নামৌলি মালিনী, শরদিন্দু নিভাননা, অসুর-দর্প-খর্ব-কারিণী, মহাশক্তি, চৈতন্যরূপিণী জ্যোতির্ময়ী আজ আমাদের হৃদয়-পাদপীঠে তাঁর অলক্তরাগরঞ্জিত পা দু'খানি রেখে বলেছেন, 'মা ভৈঃ-জাগৃহি।'

জাগো মায়ের সন্তান, দূর করো তোমাদের বৃথা তর্ক, ধার করা কথার মালা, ধুলোয় ছুড়ে ফেলে দাও তোমাদের বিলাস ব্যসন, মুছে ফেল তোমাদের ললাট থেকে যুগযুগান্তরের সঞ্চিত ওই দাসত্ব-কালিমার রেখা।

নবীন সৃষ্টির গুরুদায়িত্ব মাথায় করে আমরা আজ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব। বিধাতা আমাদের তরুণ প্রাণে সৃষ্টিশক্তির প্রেরণা দিয়েছেন। আমাদের জীবনের সমস্ত উন্মাদনা, সকল ভাবুকতার মধ্যে আমরা যেন আজ এই কথা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারি যে, আমরা ছোটো নই আমরা বড়ো, না হলে সমস্ত ম্রিয়মাণ ধ্বংসোন্মুখ উপাদানের ওপর এই নব সৃষ্টির দুরূহ ভার বিধাতা আমাদের ওপর দিলেন কেন?

মনুষ্য জীবনের পরম সার্থকতা সৃষ্টির আনন্দে। আমরা আজ সেই সৃষ্টির আনন্দ উপলব্ধি করার জন্য আমাদের সমস্ত কর্মশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করব।

পরোপকারের হীন আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য নয়, পতিত জাতির উদ্ধারের অহংকারের জন্য নয়, কর্ম-কর্তৃত্বের আত্মম্ভরী জ্ঞান থেকে নয়, আমরা আমাদের মিলিত শক্তির দ্বারা, সমবেত চেষ্টার দ্বারা যে সেবাব্রত উদ্‌যাপন করব, তা শুধু নিজেদের মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনের জন্য, আত্মবিস্মৃত পুরুষ-সিংহের জাগরণের জন্য, মথিত নর-নারায়ণের উদ্বোধনের জন্য। অনাদিকাল থেকে ভারতবর্ষের যে মহান আদর্শ পরসেবাব্রতে প্রারব্ধ হয়েছে, তা এই সেবাব্রতেই উদ্‌যাপিত হয়ে আমাদের সিদ্ধির পথে অগ্রসর করে দেবে।

আমি জানি এই দুর্দিনে আমাদের এই সাধনা কঠোর, অতি ভয়ংকর:

পিছনে উঠিছে ঝড়, সম্মুখেতে অন্ধকার বন
নামমাত্র পথরেখা, তাও আজ হয়েছে নির্জন,
চরণ চলে না আর, দেহলতা কাঁপে থর থর,
কন্টকে সঙ্কট পথ, চোখ দুটি জলে ভর ভর।
তবু যে গো যেতে হবে, থেমে থাকা মরণের দায়,
কেন মিছে থেমে যাও, হে পথিক, ঘরের মায়ায়?
সর্বহারা মহাপ্রাণ, তাহারে কে রাখে বন্ধ করে,
আলোর ইশারা আসে, প্রতিদিন তারই অন্ধ ঘরে।
মৃতদেহ আগুলিয়া, সেই আছে নিশিদিনমান
কে জানে আসিবে কবে, এক বিন্দু অমৃতের দান।

এই অমৃতের দানের আশায় আমরা থাকব, নিশ্চেষ্ট হয়ে নয়, অদৃষ্টবাদীর মতো নয়, দুর্বল পরমুখাপেক্ষীর মতো নয়—আমরা আমাদের স্বাধীন, আত্মস্বতন্ত্র কর্মঠ শত শত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সদা জাগ্রত থাকব। সমগ্র বাংলায় এইরকম অসংখ্য কর্মকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। যেখানে কোনো কর্মকেন্দ্র নেই, সেখানে উৎসাহী কর্মীদলকে সংঘবদ্ধ

করে নতুন কর্ম প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। যে সব জায়গায় কর্মকেন্দ্র আগে থেকে জাগ্রত অথবা মৃতপ্রায় হয়ে রয়েছে সেগুলিকে বর্তমানে কর্মপযোগী করে নতুন প্রেরণা দিয়ে, নতুন আদর্শে সঞ্জীবিত করে, একটা বিরাট কর্মকেন্দ্রে অঙ্গীভূত করতে হবে। আমাদের আদর্শ যদি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে নানাভাবে বিস্তৃত বা বিক্ষিপ্ত সকল কর্মকেন্দ্রের মধ্যে একই দুর্লঙঘ্য অনিবার্য শক্তি আমাদের সমস্ত কর্মসাধনাকে সেই একই পরম লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবে। এইভাবে আমরা 'এক' থেকে 'বহুতে' এবং 'বহু' থেকে 'একের' মধ্যে একটা সহজ, সরল স্বাভাবিক সংযোগের সৃষ্টি করে, আমাদের সাধনার ক্ষেত্রকে আন্তরিক ঔদার্যের দ্বারা সর্বজনগ্রাহ্য এবং সকলের পক্ষে সুলভ করে আমাদের কর্মবাহুল্যের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য বিধান করতে পারব।

সেখানে রাজনীতিক মতদ্বৈধের স্থান থাকবে না। সমাজপদ্ধতির কোনও বিশিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানকে গোঁড়ামির দ্বারা বড়ো করে দেখা হবে না, বিভিন্ন ধর্মের পার্থক্য কোনও বাধা সৃষ্টি করবে না। সেখানে সমস্ত দেশবাসী জাতিধর্ম নির্বিশেষে একই আদর্শ অনুসরণ করে, একই লক্ষ্যে, একই পথে আপন আপন মনুষ্যত্বকে পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করে আমরণ চলতে থাকবে।

জনশিক্ষার বহুল প্রচার দ্বারা দেশের আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। নষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার করে তাকে গড়ে তুলতে হবে। ধ্বংসোন্মুখ পল্লিসমূহের সংস্কার দ্বারা দেশের লুপ্ত সৌন্দর্যকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এইসব বিভিন্ন কর্মের ভার আমাদের কর্মকেন্দ্রগুলিকেই গ্রহণ করতে হবে। আমাদের কর্মকেন্দ্র ছোটোই হোক আর বড়োই হোক, যেখানে সহকর্মীর সহায়তা, সমানুভূতি ও কর্মকুশলতার অভাব, সেখানে কোনও কাজে সাফল্য লাভ করা যায় না। যেখানে সুখ-দুঃখের ভাগাভাগি আছে, হাসি-কান্নার অংশ হিসাব আছে, সেখানে সহচর্য অযাচিতভাবে এসে উপস্থিত হয়। সেখানে সব কাজ সফলতার গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যে কাজে সাধারণের হৃদয় বিনিয়োগ হয়, তা অসাধ্য হলেও সমবেত ইচ্ছাশক্তি ও প্রেরণার বলে সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। আন্তরিকতাবিহীন অনুষ্ঠান বিধাতার অভিশাপে দুষ্ট। কাজেই আত্মনাম-ঘোষণার চেষ্টার মধ্যে কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ কাজের মধ্যে সার্থকতা নেই। তাই বলি, আমাদের হৃদয় দিয়ে কাজ করতে হবে, 'ছুঁৎমার্গ' পরিহার করে অস্পৃশ্যতার ভূতকে ঝেড়ে ফেলে সবাইকে নিজের বলে আলিঙ্গন করতে হবে। মনকে ফাঁকি দিলে চলবে না, বিবেকের গলা টিপে ধরলে কুকর্ম আরও জোর গলায় প্রচারিত হবে।

অন্তর থেকে যে কর্মশক্তি আমাদের উদ্বুদ্ধ করবে, যে নৈতিক বল আমাদের সত্য ও ন্যায়ের পথে চালিত করবে সেই শক্তি, সেই বলকে আহুতির অগ্নির মতো চিরন্তনের জন্য উদ্দীপ্ত রাখতে হবে। আশা চাই, উৎসাহ চাই, সহানুভূতি চাই, প্রেম চাই, অনুকম্পা চাই—সবার ওপরে মানুষ হওয়া চাই। মানুষের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠাই আমাদের

সাধনা। জীবনব্যাপী এই সাধনার মধ্যে আমাদের মুক্তি—নান্যঃ পন্থা।

মিলনের এই পূণ্যদিনে, এই কল্যাণকর্মের অনুষ্ঠানকল্পে, শুরুতেই আমি আপনাদের আহ্বান করছি। এ আহ্বান তাঁর, যিনি আমাদের শতাব্দীর পর শতাব্দী, বছরের পর বছর, দিনের পর দিন আহ্বান করেছেন ভোগ থেকে বিরত হয়ে ত্যাগ করার জন্য, অবসাদ থেকে জেগে উঠে কাজ করার জন্য, বিস্মৃতিকে বিসর্জন দিয়ে আমাদের জাতির ইতিহাসলব্ধ আত্মাকে অনুভব করার জন্য। নরনারায়ণের এই আহ্বান উপেক্ষা করার নয়। রোগে যারা অবসন্ন, দারিদ্র্যে, নির্যাতনে যারা কাতর, তাদের মধ্যে আমি সে আহ্বান, সে আদেশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। সে আদেশ আজ দেশের কানে পৌঁছেছে, তাই আজ আমাদের নিদ্রিত নারায়ণ জেগে উঠেছেন। ভোগবিলাস ও আরামের মাঝখানে নয়, যেখানে দারিদ্র্য, যেখানে দুর্ভিক্ষ, যেখানে নির্যাতন, যেখানে অপমান সেখানে গিয়ে আজ তাঁকে পূজা করতে হবে। পুরোনো পুঁথিপড়া মন্ত্র আওড়ালে চলবে না, আশার গান গেয়ে তাকে শোনাতে হবে, যে আশার গানে রোগী বিছানা থেকে বল পেয়ে উঠে দাঁড়াবে, ঋণভার-জর্জরিত কৃষক সাহস করে কাঁধে লাঙল তুলবে, অশীতিপর বৃদ্ধ বহুবর্ষসঞ্চিত দুঃখের গুরুভার লাঘব হয়েছে বলে মনে করবে।

আজ পৃথিবীর সমস্ত আলো, সমস্ত বাতাস থেকে আমাদের প্রাণে সেই অফুরন্ত সঙ্গীতের আনন্দধ্বনি আসছে, আমাদের বুকের মধ্যে আবেগের উল্লাস নৃত্য আজ সেই সুরের সঙ্গে পা ফেলে চলেছে। এ কী উৎসাহ। এ কী আনন্দ। আমার মনে হয় এই আনন্দই আমার জাতির আনন্দ, আমার নারায়ণের আনন্দ। তিনি কোনো ওপার থেকে আনন্দে এক সোনার সুতোয় কাটনা কেটে আসছেন—যা আজ রবির কিরণ হয়ে গাছের শ্যামলতায় চিকমিকিয়ে উঠছে, ভরা নদীর উচ্ছ্বসিত জলে শতধা বিভক্ত হয়ে আনন্দস্রোতে ভেসে চলেছে। আবার সেই সোনার সুতোই যেন আজ আমাদের হাতের রাঙা রাখি হয়ে, আমাদের সকলকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছে। ভোগীর সঙ্গে ত্যাগীকে, বার্ধক্যের সঙ্গে যৌবনকে, কর্মীর সঙ্গে ভাবুককে। এই সুরের জাল যখন সমগ্র দেশকে বেষ্টন করে ফেলবে, তখন আজকের এই পুণ্য দিনের ভরসার কিরণ-সম্পাত আসন্ন ভবিষ্যতের সার্থকতায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আর তখন, যিনি ওপারে, দ্যুলোকে আকাশের চরকায় আলোকবৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করছেন এবং ভূলোকে কালের চরকায় কত বিভিন্ন জাতির বিচিত্র ইতিহাসের সুবর্ণসূত্রের সৃষ্টি করছেন তাঁকে আমরা পরম বিষ্ণু বলে নয়, জাতির ভাগ্যবিধাতা বলে বরণ করব।

সুভাষচন্দ্র বসু

আগামী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ মে হাওড়ায় বেলিলিয়াস পার্কের সভায় প্রদত্ত ভাষণ

ফরওয়ার্ড ব্লক জন্মগ্রহণ করেছে। তার মূলমন্ত্র কী সে সম্পর্কে আমি কলকাতায় একটি জনসভায় গত পরশু উল্লেখ করেছিলাম। আমি ইতিপূর্বেই যেমন ঘোষণা করেছি, ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেসের মধ্যে একটি ব্লক, সেই জন্য এর কংগ্রেসের সংবিধান ও আদর্শ মেনে চলা আবশ্যক। কিন্তু এটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের উপায় হিসাবে অহিংস অসহযোগের পথ গ্রহণ করেছে। কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী কোনো গোষ্ঠী, দল কিংবা ব্লককে প্রতি বছর কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত কর্মনীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়।

একন প্রশ্ন ওঠে যে ফরওয়ার্ড ব্লক ও কংগ্রেসের সরকারি ব্লক কিংবা অন্য কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে তফাত কী? এই বিভিন্নতা দু-ধরনের। প্রথমত, ফরওয়ার্ড ব্লক সংশোধনমূলক কিংবা নরমপন্থী মনোভাব নিয়ে নয়, বিপ্লবী মনোভাব নিয়েই কংগ্রেসের বর্তমান কর্মসূচি রূপায়িত করতে হায়। দ্বিতীয়, এর একটি নিজস্ব সংগ্রামী কর্মসূচি আছে এবং তা যাতে কংগ্রেস গ্রহণ করে সেজন্য সে কংগ্রেসকে বুঝিয়ে রাজি করানোর চেষ্টা করবে। এই সংগ্রামী কর্মসূচির লক্ষ্য হবে শীঘ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন।

ফরওয়ার্ড ব্লক সমাজতান্ত্রিক দলগুলি সহ সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবী ও প্রগতিশীল গোষ্ঠীগুলির মিলন মঞ্চ বলে স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত বামপন্থী দলগুলির কিংবা গোষ্ঠীগুলির প্রতি এর বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব থাকবে। এই দল সজ্ঞানে এমন কিছু করবে না যাতে তারা দুর্বল হয় কিংবা তাদের ক্ষতি হয়। ফরওয়ার্ড ব্লক এই সব দল কিংবা গোষ্ঠী থেকে সদস্য পাওয়ার প্রত্যাশা করে। কিন্তু সেই সঙ্গে বিশ্বাস করে, নিজেদের সমাজতান্ত্রিক প্রচারের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর তারা দেশকে সমাজতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত করতে পারবে। আবার নিজে সমাজতন্ত্রী হয়ে তাদের ব্রত উদ্‌যাপনে সমাজতান্ত্রিক দলগুলির সাফল্য কামনা না করে আমি পারি না।

এই সব কারণে আমি ফরওয়ার্ড ব্লক ও বর্তমান বামপন্থী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কোনো বিরোধের কারণ দেখি না। স্পষ্টতই এই সব দলের বা গোষ্ঠীর সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের নিজস্ব কর্মসূচি থাকতে পারে এবং সেই কর্মসূচি ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মসূচির বহির্ভূত হতে পারে। আমি আশা করি যে তাদের সদস্যরা স্বেচ্ছায় ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দিতে চাইলে বামপন্থী দল ও গোষ্ঠীগুলি তাঁদের পথে বাধা সৃষ্টি করবে না।

এই বিষয়ে সংশয় নেই যে গত কিছুকাল ধরে আমরা সাংবিধানিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েছি। কংগ্রেসসেবিরা কয়েকটি প্রদেশে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পরে এই প্রবণতা আরও বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি বিস্ময়কর ঘটনা যে যাঁরা ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে আইনসভায় প্রবেশের ভয়ানক বিরোধী ছিলেন তাঁরাই আজ মন্ত্রীপদ গ্রহণের বিশেষ সমর্থক। আমি বিশ্বাস করি যে যখন কংগ্রেসসেবিরা মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছিলেন তখন কংগ্রেসের মর্যাদা ও শক্তি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এখন এই রকম লক্ষণ ফুটে উঠেছে যে আমাদের মন্ত্রীরা ধীরে ধীরে প্রশাসন যন্ত্রের অঙ্গ হয়ে উঠছেন এবং ক্রমশ তাঁদের বৈপ্লবিক সত্তা হারিয়ে ফেলছেন। সুতরাং একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, মন্ত্রীপদ গ্রহণের মধ্যে রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধনের যে সম্ভাবনা অন্তর্নিহিত ছিল তা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। এবং তা সাধারণভাবে কংগ্রেসেবিদের মধ্যে ব্যাপক হতাশার সৃষ্টি করছে। কেন আমরা ভুলে যাচ্ছি যে আমরা এখনও দাস জাতি এবং এখনও স্বাধীনতা অর্জন করতে পারিনি? এই নৈরাশ্য ও এই নরমপন্থী সংশোধনমূলক মনোবৃত্তি থেকে দেশকে বাঁচাতে হবে। অহিংস অসহযোগের প্রকৃত গান্ধিবাদী মনোভাব নব অর্জিত সংসদীয় ও সাংবিধানিক মনোবৃত্তির নীচে চাপা পড়ে যাচ্ছে এবং তা নরমপন্থীদের মনোভাব ছাড়া আর কিছু নয়।

আপনারা জানেন যে গত বছর থেকে যা আমাদের চেতনায় ঘুণ ধরিয়েছে তার বিরুদ্ধে চীৎকার করে আমার গলা ভেঙে গেল। আমি এই রোগের একটি প্রতিষেধকের কথাও বলে আসছি। আমার মতে, এই প্রতিকার হল ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম মুলতবি রাখা হয়েছিল সেই সংগ্রামের পুনরারম্ভ। আমার এই অভিযানের প্রত্যুত্তরে কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয়রা আমাকে বরেছেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পক্ষে দেশ প্রস্তুত নয়। আমি ত্রিপুরীতে সভাপতির ভাষণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অভিযানের যে পরিকল্পনা তুলে ধরেছিলাম তার প্রতি যথোচিত সৌজন্য প্রদর্শনও করা হয়নি।

তা সত্ত্বেও এখন আমি এই অভিমত পোষণ করি যে দেশ অহিংস সংগ্রামের পক্ষে উপযুক্ত এবং এ বিষয়ে যথোচিত মহল থেকে সে শুধু সঠিক নেতৃত্বের প্রত্যাশায় রয়েছে। সুতরাং 'আগামী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হোন' এই ধ্বনি কণ্ঠে নিয়ে আমাদের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে হবে। কংগ্রেসের সব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবী ও প্রগতিশীল

শক্তির কাছে এই হবে মিলন মন্ত্র। আমরা যদি এখন থেকে সারা দেশে বিক্ষোভ গড়ে তুলি তাহলে ডিসেম্বর মাসে, যখন পরবর্তী কংগ্রেসের অধিবেশন হবে তখন সেই কংগ্রেসকে আমরা স্বাধীনতার সংগ্রাম ফের আরম্ভ করার জন্য সর্বসম্মতভাবে ভোট দিতে রাজি করাতে পারব।

সুতরাং ফরওয়ার্ড ব্লকের কাজ দুটি : প্রথমত, কংগ্রেসের বর্তমান কর্মসূচিতে প্রাণ ও বিপ্লবী মনোবৃত্তির সঞ্চার করা এবং দ্বিতীয়ত, দেশব্যাপী বিক্ষোভ ও অগ্রগামী বিপ্লবী কর্মসূচির মাধ্যমে দেশকে আগামী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা। আমরা যদি এখন থেকে প্রয়োজনীয় প্রচার ও বিক্ষোভ চালাই তাহলেই কংগ্রেসকে দিয়ে ডিসেম্বর মাসে এই অগ্রগামী কর্মসূচি গ্রহণ করানো যাবে।

শেষ পর্যন্ত যদি দেখা যায় যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের সংসদীয় যন্ত্র এগিয়ে যাওয়ার পথে আর কোনো সাহায্য করতে পারছে না তাহলে তা আমাদের পরিত্যাগ করতে হতে পারে এবং আমাদের পুরোপুরি গণসত্যাগ্রহের পথে ফিরে যাওয়ার জন্য গণআন্দোলন আরম্ভ করতে হতে পারে।

আপনারা সম্ভবত আমাকে ফরওয়ার্ড ব্লকের অগ্রগামী বিপ্লবী কর্মসূচি সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। আমি এই সভায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব না এবং পরবর্তী সভার জন্য তা মুলতবি রাখব। আমি অবশ্য একথা বলব যে অগ্রগামী কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হবে আগামী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি। উদাহরণ হিসাবে, বলা যায় ব্রিটিশ ভারতে আমাদের একটি নিখিল ভারত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়তে হবে। শুধু আমাদের কর্মীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ সঞ্চারের জন্যই তা প্রয়োজন নয়, দেশকে অহিংস গণআন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করতেও এর প্রয়োজন। আমি একথা বিশেষ পরিতাপের সঙ্গে বলছি যে ওয়ার্কিং কমিটি এ পর্যন্ত এই কাজকে অবজ্ঞা করেছে এবং তার ফল হয়েছে এই যে দেশের কংগ্রেসবিরোধী সংগঠনগুলি নিজেদের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে তুলেছে এবং এরা কংগ্রেসের ভাবী কর্মীদের নিজেদের দলে টানছে।

আবার দেশীয় রাজ্যগুলির জনগণের জন্যও আমাদের একটি ব্যাপক পরিকল্পনা রাখতে হবে। ওয়ার্কিং কমিটির উচিত একই সঙ্গে গোটা দেশে দেশীয় রাজ্যগুলির জনগণের জন্য আন্দোলন পরিচালনা করা। ভারতবর্ষে দেশীয় রাজ্যগুলির অস্তিত্ব আমরা মানতে পারি না এবং আমাদের সমস্ত মনোযোগ রাজকোটে ও জয়পুরে নিবদ্ধ থাকা উচিত নয়। এখন থেকে যদি সব দেশীয় রাজ্যে একসঙ্গে জাগরণ ও প্রস্তুতি হয়, তাহলে যখন ভবিষ্যতে ব্রিটিশ-ভারতে গণআন্দোলন শুরু হবে তখন সমগ্র দেশীয় রাজ্যগুলির জনগণের কাছ থেকে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পাওয়া যাবে। এই উদ্দেশ্যে দেশীয় রাজ্য কংগ্রেসকে ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের অঙ্গ করে তোলা বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয়ত, কংগ্রেসকে যাতে কিষাণ সভা ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মতো অন্যান্য

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করা যায় সেই উদ্দেশ্যে ফরওয়ার্ড ব্লকের চেষ্টা চালানো ও আন্দোলন করা উচিত। এটি ভারতীয় জনগণের সংগ্রাম করার শক্তি বাড়াবে এবং দৃঢ় করবে। এই সংযুক্তি ধরে নেয় যে কংগ্রেস নির্যাতিত ও দারিদ্র্যপীড়িত শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থ সমর্থন করবে।

সবশেষে আমার এই বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া উচিত যে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত সরকারের আইনে যে ফেডারেশন পরিকল্পনার ব্যবস্থা আছে তা হয়তো ব্রিটিশ সরকার নীরবে ধামাচাপা দিতে পারে। সে রকম ঘটলে আমরা কী করব? সরকার সন্তুষ্ট হয়ে ভারতবর্ষ ফেডারেশনের উদ্বোধন না করা পর্যন্ত আমরা কী সময় গুণতে থাকব? এই মনোভাব অবলম্বন করা মূর্খতা ও আত্মহত্যার শামিল হবে। সরকার না করলে এই বিষয়টি আমাদের জোর করে সামনে আনতে হবে। সুতরাং আমাদের অভিযানের পরিকল্পনা নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যে রকম দেখা যায় তাতে এই অভিমতের সৃষ্টি হয় যে যুদ্ধের সংকট আমাদের ওপর ঘনীভূত হলে ব্রিটিশ সরকার বিষয়টি জোর করে সামনে আনতে পারে। উদাহরণ হিসাবে তাহলে প্রশ্ন রাখা যায়, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত সরকারের আইনের যে সংশোধনী বিলটি আছে তা পাশ হলে এবং পরে ভারতবর্ষে তা কার্যকর করা হলে আমরা কী করব? স্পষ্টতই আমরা প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতার অন্যায় অপহরণ সহজে মেনে নিতে পারব না। আত্মসমপর্ণের অর্থ হবে আমাদের রাজনৈতিক মৃত্যু। আমরা নিরপেক্ষও থাকতে পারব না। একটি ইঙ্গ-ভারতীয় সাময়িক পত্রিকা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে যুদ্ধের সময় কেউ মিত্র হয়, অথবা হয় শত্রু। আমরা যদি দীনভাবে আত্মসমর্পণ না করি তাহলে ব্রিটিশ সরকার আমাদের সংগ্রামে নামতে বাধ্য করবে।

এইভাবে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোই যে আমাদের আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হবে এবং সেই প্রস্তুতি অবিলম্বে শুরু করতে হবে। এই কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের দ্বারা প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে আমাদের কর্মপরিকল্পনা স্থির হওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যের বিষয়, কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং তাঁদের অনুগামীরা এই বিষয়টিকে আমাদের সঙ্গে এক দৃষ্টিতে দেখেন না। ত্রিপুরী কংগ্রেসে তাঁরা দোষারোপের ধারা ও ব্যক্তিগত মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজন সম্বন্ধে যে রকম উদ্বিগ্ন ছিলেন আসন্ন যুদ্ধের বিপদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতির প্রয়োজন সম্বন্ধে ততটা উদ্বিগ্ন ছিলেন না। যাই হোক, যা ঘটে গেছে তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। আসুন, আমরা আগামী দিনের কথা চিন্তা করি এবং যে প্রভাত আজকের রাত্রির অন্ধকারে সুপ্ত হয়ে আছে তাকে অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হই।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কমিউনিস্ট ইশতেহার প্রকাশের ১৫০ বর্ষপূর্তি

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা

'দর্শন ও সমাজ ট্রাস্ট'-এর আমন্ত্রণে কমিউনিস্ট ইশতেহার (১৮৪৮) প্রকাশের ১৫০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সুধীসমাবেশে আলোচনার সূচনা করতে পেরে কৃতজ্ঞ বোধ করছি।

খুব স্বচ্ছন্দে মনে আসেনি, কারণ বেশ কিছুকাল ধরেই দেখছি যে খোদ্ কমিউনিস্টদের অনেকেরই (সি.পি.আই.এম. কতকটা ব্যতিক্রম) কম্যুনিজম বিষয়ে যেন অপ্রতিভ তত্ত্বগত চিন্তা ও তদানুসারী কর্ম বিষয়ে অনীহা প্রায় সর্বত্র, আর 'পুরনো ঘরানা'-তে আটক রয়েছি বলে আমার মতো অকৃতীকেও কিছু বিদ্রূপের পাত্র হয়ে হয়েছে। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে খাস মস্কো 'ক্রেমলিনে' সোভিয়েট বিপ্লবের সপ্ততিতম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে মিখাইল গর্বাচভ্-এর বাক্ বিস্তার আর বিশেষ করে পশ্চিম দুনিয়ার কমিউনিস্ট নেতাদের মুখে তা নিষ্প্রাণ প্রতিধ্বনি শুনেছিলাম। সংক্ষিপ্ত হলেও আফগানিস্তানের তৎকালীন নেতা নজীবউল্লাহ-এর দৃপ্ত ব্যতিক্রমী ভাষণ শুনে তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলাম তার কথা থেকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পেয়ে। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে লক্ষ করেছিলাম ফিদেল কাস্ত্রোর বিলম্বিত এবং স্বভাববিরুদ্ধ বিষণ্ণবদন উপস্থিতি ও কাজ সারা ছোটো বক্তৃতা। মস্কোতেই মনের দুঃখ জানাই দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বদন্তী নায়ক Oliver Tambo এবং এদেশে সুপরিচিত (বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিদেশমন্ত্রী) Alfred Nzo-কে, আর তাম্বো বলেন : 'কমরেড এসব আমাদের সয়ে যেতে হবে' ('We have to live with it')। নজরে পড়েছিল পার্টি নেতা রাজেশ্বর রাওয়ের কেমন যেন অব্যক্ত অস্বাচ্ছন্দ্য (পার্টির বিবৃতি তিনি না পড়ে ভার দিয়েছিলেন কমরেড ফারুকী-কে)। অনুমান করি E.M.S. Namboodiripad মস্কোর নতুন আবহাওয়ায় যথেষ্ট বিচলিত। মস্কোতে তখন ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কার কম্যুনিস্টরা 'New Age' পত্রিকার সংবাদদাতা মসূদ আলি খান্-এর অফিসে

জড়ো হয়ে দেড়ঘণ্টা আমার বিপন্নবোধ জানিয়ে বক্তৃতা আর প্রশ্নোত্তরে একটা 'টেপ-রেকর্ড' বানিয়েছিলেন, শুনেছি। তবে তার পাত্তা আর নেই। যাই হোক্, দেশে ফিরে সাধ্যমতো আমাদের কমিউনিস্ট প্রত্যয়ের ধ্বজা তুলে ধরার অক্ষম চেষ্টা চালিয়েছি বলে যেন নিন্দিতই হয়েছি। উপহাস শুনেছি যে 'যত্র তত্র' মাথা কুটে মরছি আর বুঝছি না যে দুনিয়ার সঙ্গে আমাদের বদলাতে হবে।

আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলি যে, এত নির্বোধ নই যে সতত সঞ্চরমান এই বিশ্বে, যেখানে একই নদীর জলে কেউ একাধিকবার স্নান করতে পারে না, আমাদের এই 'বদলতী' দুনিয়ার সঙ্গে তাল রেখে চলতে চাইব না। মার্কস কথিত 'সুসমাচার'-কে সনাতন, সর্বগ্রাহ্য, সর্বাবস্থায় অভ্রান্ত ও অবশ্য মান্য ঐশ্বরিক অনুশাসন মনে করলে শুধু মার্কস চিন্তা নয় আমাদের মানবিক সত্তার অনন্তপার গৌরবেরই অপমান করা হয়। মার্কসবাদ কর্মপথের নিশানা দেয়, আপ্তবাক্যের অনুসরণ চায় না; 'domga' বস্তুটির মধ্যে বিপদের বিষ রয়েছে, তবে উল্টো পথে 'Pragma'-র প্রলোভন এড়িয়ে না গেলে নীতিভ্রংশ আর বহুবিধ অধঃপতন যে অনিবার্য, তা ভুলে যাওয়া একটা বিকট ভ্রান্তি। তাই মার্কিন মনীষী Professor Sweezy যখন সতর্ক করে দেন যে কমিউনিজম-এর 'বারোটা বেজে' গেছে আর মুনাফাখোর, পুঁজিশাহীর বিকল্প নেই ('There is No Alternative'—TINA) যে মানতে হবে এটা ভুল, তখন কমিউনিস্ট মহলে (অবশ্য ব্যতিক্রম বাদে) যেমন সাড়া স্বাভাবিক ও সমুচিত ছিল তা দেখিনি। এবংবিধ নানা কারণে এই বয়সে, ম্রিয়মান অবস্থাতেও যেখানে পেরেছি একটু বুঝি হল্লা করতেও চেয়েছি। কতকটা চাঙ্গা হলাম আপনাদের মতো বিদ্বজ্জন এই আলোচনার আয়োজনে আমার মতো 'বাতিল' একজনকে ডাকছেন দেখে।

এটাও দেখলাম যে 'দেশ' পত্রিকার মতো প্রবলপ্রতাপান্বিত প্রচার মাধ্যমে কমিউনিস্ট ইশতেহারকে 'মার্কসীয় ফতোয়া' আখ্যা দিয়ে কিছু পরিমাণে বিকৃত করেও সেই সংখ্যায় কয়েকটি দামি লেখা ছাপা হল যার একটি প্রধান রচনার শিরোনামা ছিল : 'যদি আজ মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবু তাঁদের নিজস্ব বিশ্বদর্শন এবং যুগান্তরের স্বপ্ন কি কখনও ভোলা যায়?' তুষ্ট হতে পারি না এই 'স্বল্প দাক্ষিণ্যে' 'ইংরিজিতে যাকে 'Small mercies' বলা যায়!), তবু এটা এরকম স্বীকৃতি তো বটে।

মার্কস-এঙ্গেলস্-এর 'স্বপ্ন' ব্যর্থ জেনে যতই পুলকিত আজকের সমাজপতিরা হতে থাকুন, ইতিহাস স্তব্ধ হয়ে যায়নি। আর রাহুগ্রাস থেকে সাম্যবাদের রেহাই যতই সময় সাপেক্ষ হোক না কেন, লোভসর্বস্ব শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থা নিজেরই জমে ওঠা কলুষের চাপে ভেঙে পড়া তো মানুষেরই এ যাবৎ ইতিহাসের সঙ্গে খাপ খায়। ইতিমধ্যে মার্কিন প্রভুদের জগৎজোড়া বাদশাহীর চিরস্থায়িত্ব ঘোষণা করে *Time*-এর মতো পত্রিকায় ('America Rules : Thank God' ০৪/০৮/৯৭) দর্পিত প্রবন্ধ বেরোতে থাকুক;

পুঁজিশাহী 'বিশ্বায়ন'-এর কৃপায় বিশ্বের অধিকাংশ বাসিন্দারই জীবন যন্ত্রণা বাড়তে থাকুক; তবু কি একেই ভবিতব্য বলে সবাই মানতে থাকব? সমসুযোগের সমাজ দুনিয়ার সর্বত্র আবাহন, সমাজরূপান্তরের 'স্বপ্নকে' বাস্তবায়নের ইতিহাসসঞ্জাত পথনির্দেশ, জ্ঞানকে শক্তিরূপে ('Knowledge is power') ব্যবহার করে, মেহনতী অর্থাৎ নির্বিত্ত দলিত মানুষের অপরাজেয় সংগঠন ও সংকল্পকে প্রকরণকে পরিণত করে যুগান্তরী বিপ্লব ঘোষণার মধ্যে দিয়ে মানুষের নতুন জগদ্ব্যাপী অভ্যুদয়ের দুন্দুভিনিনাদ ঘটেছিল ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। যখন মার্কস-এঙ্গেলস্ কর্তৃক রচিত এবং প্রথমোক্তের গহন গভীর সমাজচিন্তা ও মানবিক আবেগ থেকে প্রসূত এক বিস্ময়কর বিমোহন লিখনশৈলীর জাদু নিয়ে ঘোষিত হল কমিউনিস্ট ইশতেহার, 'গলিত সুবর্ণের প্রস্রবণ' ('a srteam of molten gold') যার এক অবিস্মরণীয় ভূষণ। মার্কস-এঙ্গেলস্ নিজেরাই বলে গেছেন এতে ভ্রান্তি আছে, ফাঁক আছে তৎকালীন সংকীর্ণতা ও অপূর্ণতা আছে, কিন্তু ইতিহাসে এর সগৌরব অধিষ্ঠান নিঃসংশয়। উচ্ছ্বাসপ্রকাশে স্বভাবত বিরূপ জোসেফ স্টালিন এই ইশতেহারকে বলেছিলেন 'The Song of Songs of Marxism'—ছেলেবেলায় খ্রিস্টান পাদরিদের কাছে শিক্ষা পেয়েছিলেন বলে বুঝি স্টালিনের আবেগ এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ পেয়েছিল।

২

আপনাদের সংগঠনের মুখপত্র 'তত্ত্ব ও প্রয়োগ' নামকরণটি ভারি ভালো লেগেছে। তত্ত্ব সন্ধানের বিমল আনন্দ সকলের কাছে সহজপ্রাপ্য হতে পারে না, কিন্তু জীবন বহির্ভূত কোনো কর্ম নেই। আমাদের ভারত চিন্তায় 'জগৎ ও জীবনকে নস্যাৎ' ('World-and-life negation') করার প্রবণতা নিয়ে মহামনীষী Schweitzer-এর সমালোচনার প্রত্যুত্তর রাধাকৃষ্ণনের রচনায় পড়েছি আর 'শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থ কোটিভিঃ/ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা/জীবো ব্রহ্মোতি নাপরঃ' উচ্চারণের সহজ অথচ কদর্থ করে আমাদের বহুযুগব্যাপী দর্শনচিন্তার গভীরতা সূক্ষ্মতা ও ব্যাপ্তির অবমাননা করার মতো নিরক্ষর নই। একটা দুঃখ অবশ্য লুকোতে পারছি না। 'বিচার স্বতন্ত্র' আর 'আচার'-এর নিগড়ে বিদ্বজ্জনসহ সকলকে বেঁধে রাখার সনাতন বর্ণাশ্রমী এবং কার্যত অমানবিক সমাজরীতি জীবনের স্বাভাবিক স্পন্দন ও বিকাশকে আবহমানকাল থেকে রুদ্ধ করে রেখেছে, ভারত চিন্তার বিভূতিকে কলুষিত করেছে। মার্জনা করবেন কিন্তু বড্ড গুরুগম্ভীর হয়ে পড়ছি বলে হঠাৎ মনে পড়ল অস্ট্রিয়ান্ 'সাধু' অগেহানন্দ ভারতীর কথা মনে এলে যে যাজ্ঞবল্ক্য থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত যে পরম্পরা তাতে আছে উদ্দীপনার অস্বাস্থ্যকর বাহুল্য। অবশ্য সবাই জানি কর্মযোগী বিবেকানন্দের সর্ব জীবে শিবদর্শী মহানুভবতা। আর আমার মনে পড়ছে ফরাসী ভারতবিদ্বান্ Louis Renou-র মজাদার আবিষ্কার যে মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য

একবার বুঝি মাংস ভক্ষণ বিহিত কি না জানতে চাওয়ায় জবাব দেন; 'হাঁ, বিহিত বই কি, তবে একটু নরম হওয়া চাই ('it must be tender')!'

কোথা থেকে কোথা আপনাদের টেনে এনে বসেছি, তাই রাশ টেনে বলি যে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে দর্শনকে মার্কস-এঙ্গেলস্-এর মতো বিরাট মর্যাদা আর কেউ দিয়েছেন মনে হয় না। নির্বিত্ত শ্রেণির মুক্তি সাধনে দর্শনকে আত্মস্থ না করতে পারলে চলে না আর নির্জিত শোষিত দলিত মানবের মুক্তি বিনা দর্শনেরও সার্থকতা নেই, এমন নির্ঘোষ অন্যত্র কোথায় মিলবে? দ্বিধাহীনভাবে ১৮৪৩-৪৪ খ্রিস্টাব্দে মার্কস-এর ঘোষণা : 'তত্ত্ব যখন জনমানসে সন্নিহিত হয় (অর্থাৎ তাদের চিত্ত জয় করে) তখন তা হয়ে দাঁড়ায় এক বাস্তব শক্তি' ('Theory becomes a material force when it grips the masses')। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে ফয়েরবাখ-এর (Feuerbach) সমালোচনায় আকাশবাণীর মতো মার্কস্-এর উচ্চারণ শুনি : 'দর্শনশাস্ত্রীরা বিশ্বের বিশ্লেষণ করেছেন নানাভাবে, কিন্তু যেটা চাই তা হল দুনিয়াকে বদলে দেওয়া।' সেখানেই দেখি 'The human essence'-এর সংজ্ঞা : 'মানবত্বের সারাৎসার প্রতিটি ব্যক্তিত্বের অন্তর্গূঢ় কোনো বিমূর্ত সত্তা নয়; প্রকৃতপক্ষে সামাজিক পরস্পর সম্পর্কের সাযুজ্যেই তার অবস্থান।' মার্কস্-এর জন্ম ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে আর এঙ্গেলস্ জন্মান ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে। কী বিপুল প্রতিভাধর এই 'দ্বয়ী' ('duo') যারা তরুণ বয়সেই সমাজসত্যসন্ধানে এমন অনন্যার পরিচয় দিলেন। বহু বৎসর ধরে অমুদ্রিত ছিল যে, 'Economic and Philosophical Manuscripts of 1844'. তাতে কত রত্ন ছড়িয়ে রয়েছে, অনুকূল পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিজম আর মানবিকবাদ যে অভিন্ন তা ঘোষিত হয়েছে। তার কমিউনিস্ট ইশতেহারের মূলে রয়েছে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা—In the beginning was not the word but the Deed বাক্য নয়, কর্ম, বহুজনের সম্মিলিত কর্মের ভিত্তিতে মানুষেরই সৃষ্ট সভ্যতার বহুমাত্রিক বিকাশ ঘটেছে। বাস্তব জাগতিক সত্তার ('Being') ভিত্তিতে তারই আনুষঙ্গিক ও অনুবর্তী চেতনা (Consciousness) আদিযুগ থেকে জীবন ও কর্মের রূপভেদ ঘটিয়ে এসেছে। যেভাবে মানুষ জীবনযাপন করেছে তারই ভিত্তিতে চিন্তাধারা নির্ধারিত হয়েছে। ইতিহাসে যুগ থেকে যুগান্তর, এক অধ্যায় থেকে অন্য অধ্যায়ে উত্তরণ এভাবেই বাস্তব জীবন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের উপর নির্ভর করেছে। শোষণ রহিত সমাজ, সমসুযোগের সমাজ, সর্বজনের সুখসাধনে প্রবৃত্ত সমাজ মানুষের চিন্তায় কল্পনায় নানারূপে নানাভাবে এসেছে বহুযুগ ধরে, কিন্তু মানুষেরই গ্রাসাচ্ছাদন ও জীবনধারণের চাহিদার চাপে আর তাদেরই কর্মশক্তির ক্রমোন্নতির সহায়তায় প্রাচীন যুগের দাসপ্রথা থেকে সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগ থেকে যন্ত্রোৎপাদনভিত্তিক বুর্জোয়া যুগের আবির্ভাব ঘটেছে। বাস্তব জীবনেরই তাগিদে, প্রতিটি সামাজিক স্তরের অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য খণ্ডনপ্রয়াসে, স্তর থেকে স্তরান্তরে মানুষের যাত্রা থেকে এভাবেই বুর্জোয়া কর্তৃত্বের যুগে অনিবার্যভাবেই জন্ম নিয়েছে

তারই সংহারক সর্বহারা মেহনতী মানুষের শক্তি, ইশতেহারের ভাষায় 'যারা বুর্জোয়া শ্রেণির কবর খুঁড়বে সেই প্রোলেটারিয়েট'। এমন নয় যে সবাই বসে আছি ইতিহাসের শকটে যা অকাট্য গতিতে যান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতা নিয়ে, নতুন সমাজ পর্যায়ে পৌঁছে দেবে। বাস্তব কারণেই পথ 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর' না হয়ে পারে না, তাই আত্মপ্রত্যয়ী মানুষকেই যথাযথ সমাজ চেতনা আর সংগঠন ও সংহতিকেই অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে অন্বিষ্ট সাধনের চেষ্টা করতে হবে। এরই আহ্বান ১৮৪৮-এর কমিউনিস্ট ইশতেহারে বিঘোষিত হয়েছে। কমিউনিস্ট বিপ্লবের সাফল্য দূরে থাক, সম্ভাবনা পর্যন্ত নিয়েও আজ বহু প্রশ্ন, বহু সংশয়, বহু দ্বিধা। মনে রাখতে চাই যে, মার্কসীয় নিরিখে এই বিপ্লব এমনই সুদূরপ্রসারী ও গভীরতাস্পর্শী যে এর সাফল্য শুধু ইতিহাসে কতকটা নতুন এক অধ্যায় আনবে তা নয়—সেই সাফল্য প্রকৃত ইতিহাসের জন্ম দেবে, নিঃশেষ করে দেবে 'প্রাক্-' ইতিহাস'কে ('pre-history')। বারবার বহু সমাজ রূপান্তরের মধ্য দিয়েও মানুষের বহুলাংশকে সমাজপতিদের কবলে শোষিত, বঞ্চিত, দলিত, অপমানিত হবার মানসিক লাঞ্ছনা থেকে নিস্তার দিতে পারেনি, তার অবসান ঘটাবে আর (সোভিয়েত দেশে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ভ্রমণরত রবীন্দ্রনাথের উক্তি অনুযায়ী) মানুষের সমাজসত্তায় প্রোথিত 'লোভ' নামক 'মৃত্যুশেল' উৎপাটিত করতে পারবে। এমন যে 'ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞ', তার সাফল্য সহজ নয়, সস্তা নয়। বিপ্লবী চেতনা সংকল্প ও সংগঠনের সঙ্গে বহুজনের শুভবুদ্ধি ও সহযোগিতার অপরিসীম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার দীর্ঘায়ত প্রয়াসে লিপ্ত হতে না পারলে সার্থকতা মিলবে কেমন করে? কমিউনিস্ট ইশতেহারে সাড়া দিয়ে এ যাবৎ দুনিয়ায় যে বিপ্লব ঘটতে পেরেছে, তার মূল্য ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করেই বুঝতে হবে যে এখনও বহু 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' লঙ্ঘন করে যেতে হবে।

৩

মার্কস-এর Capital গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 'The Genesis of the Industrial Capitalist'. অধ্যায়ের শেষে দেখা যায় যে, দি এক ফরাসি লেখকের ভাষায় বলা যায় যে টাকার যখন প্রথম আবির্ভাব ঘটে তখন যদি তার গায়ে লেগে থাকে 'জন্ম চিহ্ন এক রক্তাক্ত জড়ুল' তো পুঁজি যখন নিজেকে জাহির করে তখন 'তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রতি লোমকূপ থেকে রক্ত আর ক্লেদ ঝরতে থাকে।' বুর্জোয়া শ্রেণির সুবিপুল ঐতিহাসিক কৃতিত্বের যে বর্ণনা কমিউনিস্ট ইশতেহারে আছে তার তুলনা বুর্জোয়া সহিত্যে নেই। কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক নির্মম অমানুষিক যন্ত্রণা জগৎ জুড়ে অসংখ্য মানুষের জীবনে ঘটিয়ে বুর্জোয়াদের এই কীর্তি সম্ভব হয়েছে—অচিন্ত্যনীয় অত্যাচারের সেই কাহিনি এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার মানুষের মন থেকে মুছে দেবার প্রযত্ন বহুকাল ধরে চলেছে কিন্তু সপ্তসমুদ্রের

জল দিয়ে ধুলেও সেই কলঙ্ক কালিমা লুপ্ত হবে না। আরবের সকল কুসুমসৌরভ সেই কলুষের দুর্গন্ধ কাটাতে পারবে না। যাই হোক্ ইশতেহারের ছত্রে ছত্রে বুর্জোয়া দুর্বৃত্তি ও পৈশাচিকতার প্রতি যে অন্তহীন ঘৃণা ছড়িয়ে রয়েছে, তারই সন্ধান এখানে পাই। শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্ম সমবেত সবাইকে বলেছিলেন : 'ন ছিত্বা পরমর্মানি/ন কৃত্বা কর্ম দুষ্করম্/ন হত্বা মৎসঘাতীয়ম্/প্রাপ্নোতি মহতীম্ শ্রিয়ম্।' 'পরের মর্ম ছিন্ন না করে, অনেক দুষ্কর কর্ম না করে, জেলে যেমনভাবে মাছকে মারে তেমনই হত্যা না করতে পারলে, মহতী শ্রী (Big Money) অর্জন করা যায় না। কমিউনিস্ট ইশতেহার প্রসঙ্গে এই সুপ্রাচীন অনুভূতি আর মার্কস্ চিন্তার সঙ্গে পূর্ণ সাদৃশ্য আমরা এদেশে অন্তত স্মরণ করব।

রবীন্দ্রনাথ 'লোভ' নামক 'মৃত্যুশেল' সমাজদেহ থেকে উৎপাটিত করা যে কত দুরূহ তা জানিয়ে সোভিয়েত জনগণকে সতর্ক করে দেন আর সঙ্গে সঙ্গে আশীর্বাদও জানিয়ে আসেন (যা মতলব করে সবার মন থেকে মুছে দেওয়া হচ্ছে বেশ কিছু কাল ধরে) তিনি Zvestia পত্রিকাকে বলেছিলেন : 'তোমাদের কাজে কতকগুলো গলদের কথা বলেছি। কিন্তু বিশ্বাস করো, দেখাতে চেয়েছি 'চাঁদের কলঙ্ক' ('the shadow side of the moon')—তোমাদের কাজ যেন কলঙ্কশূন্য হয়।'

সমাজবাদ-সাম্যবাদের অগ্রগতি বিষয়ে, আত্মতুষ্ট থেকে কিংবা শৈথিল্যবশে কিংবা অন্য সমাবেশে আমাদের হিসাবের ভুল ধরা পড়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য মানুষকে নিয়ে আমাদের গর্বের সীমা নেই—'man, proud man' বলে আনন্দ পেতেন মার্কস, 'Man is the measure of everything' ছিল তাঁর এক প্রিয় উদ্ধৃতি। আমরা তো মহাভারতেই দেখি; 'ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরো হি কিঞ্চিৎ' ('মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই')। কে না জানি চণ্ডীদাসের উক্তি : 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'? সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে অষ্টাদশ শতকের বাঙালি কবি দৌলত কাজীর পঙ্ক্তি; 'নর সে পরম দেব, নর সে ঈশ্বর'। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে নানাদিক থেকে আজও মানুষ অনেকটা অসহায়, প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে আরও সামঞ্জস্য যথাযথ হয়নি—'Original sin'-এর তত্ত্ব মানার দরকার নেই কিন্তু মহাশক্তিধর হয়েও মানুষ এখনও খর্ব, হ্রস্ব, ব্যর্থ, নীতির বিচারে এখনও প্রায় নিঃস্ব, এমনই বৈপরীত্যের জালে জড়িত যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার গরিমা লুপ্ত হয়ে যায় 'অ্যাটম' বোমা ব্যবহারের মতো কুৎসিত বীভৎসতায় (আর স্বয়ং আইনস্টাইন মনস্তাপে বলে ওঠেন আবার জন্মালে বৈজ্ঞানিক না হয়ে যেন জলনিকাশী যন্ত্রপাতি বানাবার কাজে নামেন, যা শুনে 'American Plumbers' Union তাঁকে সাম্মানিক সদস্যপদ দিতে চান।) তবুও দোষে গুণে মোড়া এই মানুষকে দিয়েই মানুষের জগৎকে নতুন করে গড়তে হবে। তাই আনাতোল ফ্রাঁস্ অনেকদিন আগে বলেছিলেন যে, ভগবানের সবচেয়ে বড়ো মুশকিল হল যে দুনিয়ার সব কাজ করাতে হয় মানুষকে দিয়েই। সেই মানুষেরই অধঃপতন আর চারিত্রিক দৈন্য বিনা কি সোভিয়েত ও

অন্যান্য সোসালিস্ট দেশের নিঃসন্দিগ্ধ সমাজ নির্মাণ কীর্তির সৌধ অল্পকালের মধ্যেই (১৯৮৬-৮৯) ভেঙে পড়তে পারত? শত্রুপক্ষের নিরবচ্ছিন্ন আঘাত বহুরূপ নিয়ে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে চলেছিল বটে, কিন্তু তাকে প্রতিহত করা সম্ভব হল না কেন? কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর ১৫০তম বার্ষিকীতে এসব প্রশ্ন নিয়ে চিন্তাভাবনা যথাযোগ্যভাবে ঘটবে ভরসা করি।

ইতিমধ্যে একটু আশ্বাস খুঁজি বছর চোদ্দ-পনেরো আগে হাঙ্গেরির কমিউনিস্ট তো Janos Kadar-এর পার্টি কংগ্রেসে পেশ করা রিপোর্ট থেকে। তখনও গর্বাচভী প্রতিবিপ্লবের প্রারম্ভিক লক্ষণ স্পষ্ট হতে শুরু করেনি, তাই সুস্থ পরিহাসের সুরেই কাদার সমবেত পার্টি প্রতিনিধিদের তৎকালীন হাঙ্গেরির সমাজতান্ত্রিক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে কিছু অসাফল্যের উল্লেখ করে বলেন যে, মানুষের ইতিবৃত্তে হয়তো প্রথম তুলনীয় ম্যানিফেস্টো হল তিন হাজার বছর আগে হজরত মুসা-র (Moses) 'দশ নির্দেশ' ('Ten commandments'), আর এত কাল পরেও তা যখন সার্থক হতে পারেনি তখন ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ইশতেহার অনুসরণে কাজ অপূর্ণ থাকলে সেটা ক্ষমার্হ নয় কী? পরিহাসের সুরে বলা হলেও কথাটির গুরুত্ব প্রচুর। ইতিহাস তো আমাদের ইচ্ছাপূরণের ('wish-fulfilment') দায়িত্ব বহন করে না। ইতিহাস নিজের ছন্দে চলে আর মানুষ তার ভূমিকা পালনে শৈথিল্য দেখালে গতি ব্যাহত হয়, বিলম্বিত হয়—ইতিহাস গড়ে মানুষ, কিন্তু যথেচ্ছভাবে মানুষ তো তা পারে না। তার নিজের স্বভাব, তার পারিপার্শ্বিক তার সমসাময়িক জীবনসংস্থানের চেহারা ইত্যাদি বহু উৎপাদন জড়িয়ে থাকে। ('Man makes history, but not just as he pleases')। মানুষ তার পরিস্থিতিকে নির্মাণ করে আবার পরিস্থিতিও মানুষকে বানায় ('Man make circumstance but circumstances also make men')। মার্কস ১৮৫০-এর দশকেই সতর্ক করে দেন যে বিপ্লব যারা চায়, তাদের তৈরি করতে হবে নিজেদেরই, পনেরো কিংবা কুড়ি কিংবা পঞ্চাশ বছর লড়াই করে নিজেদেরই বদলাতে হবে আর তারই জোরে গোটা সমাজ বদলাবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি। সমাজবাদ সাম্যবাদের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার বিলম্ব ঘটছে বলে হাল ছেড়ে দেবার মতো ক্ষুদ্রচেতা হৃদয় দৌর্বল্য যেন আন্দোলনকে আচ্ছন্ন না করে।

কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করতে চাই। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায় ('Declaration of Independence') দ্বিধাহীন ভাষায় বলা হয় যে "সকল মানুষ জন্ম থেকে স্বাধীনতার অধিকারী," অথচ কৃষ্ণাঙ্গদের দাসত্ব বিধি বহুকাল অব্যাহত ছিল আর আজও তার অজস্র ছাপ রয়েছে সমাজজীবনে। ফরাসি বিপ্লবকালে (১৭৮৯-৯৪) 'মানবাধিকার' ('Rights of Man') অপরূপ মনোগ্রাহী ভাষায় বিশ্বজনসমক্ষে প্রচারিত হয়ে অভূতপূর্ব চমক সৃষ্টি করেছিল। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের সোভিয়েত বিপ্লবের পূর্বে ফরাসি বিপ্লবই ছিল ইতিহাসে শিরোমণি-স্বরূপ এক ঘটনা। 'সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার'

বাণী মানুষের জীবনে নবযুগের আস্বাদ এনে দিয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল দুশো বছর বাদে 'বাস্তিলের দুর্গপতন' দিবসে (১৪ জুলাই) অহঙ্কারী বলে খ্যাত রাষ্ট্রপতি মিত্তেরকে যেন বিদ্রূপ করে ব্রিটেনের মার্গারেট থ্যাচার স্পর্ধিত উক্তি করলেন যে ১২১৫ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের 'ম্যাগ্‌নাকার্টা' হল ঐতিহাসিক বিচারে আরও গৌরবান্বিত। অনেকে জানি যে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে বাস্তিল-এর পতন বিষয়ে বলা হয়েছিল যে তা হল জগতের ইতিহাসে 'সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম' ঘটনা! এখনও জগতের পরিস্থিতি এমন নয় যে ফরাসি বিপ্লবের যুগান্তকারী চরিত্র প্রকৃতপ্রস্তাবে মানুষের জীবনে বাস্তবায়িত হতে পেরেছে। সোভিয়েত বিপ্লব (১৯১৭), চিন বিপ্লব (১৯৪৯), আর সাম্যবাদী সংগ্রামজাত অন্যান্য বিপ্লব তো তুলনায় সাম্প্রতিক ঘটনা। কমিউনিস্ট তত্ত্ব ও কর্ম গতানুগতিক রাজনীতির আয়তনে সীমিত নয়; এত কালের ইতিহাসপুষ্ট মানবসমাজের মূলোৎপাটন করে, শোষণের সর্বত্র অবসান ঘটিয়ে, মানুষের লোভ জটিল মানসিকতার বন্ধন মোচন করে, সর্বার্থে নবজীবনের ভিত্তিস্থাপন কমিউনিজম-এর অন্বিষ্ট। যারা মামুলি রাজনীতির অভ্যস্ত, তাদের কাছে এর দাম না থাকতে পারে, কিন্তু এক অতি কঠিন সাধনার এই আহ্বান ; যা কঠিন হলেও জনগণের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে অতি স্বচ্ছ, অতি সহজ, অতি নির্মল (এ-বিষয়ে Bertold Brecht স্মর্তব্য)-হল কমিউনিস্ট ইশতেহারের প্রাণবস্তু।

৪

কমিউনিস্ট ইশতেহারের ছত্রে ছত্রে মেহনতী মানুষের মুক্তি-সংগ্রামের আন্তর্জাতিক চরিত্র ফুটে রয়েছে। প্রকৃত দেশপ্রেমের সঙ্গে এর পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য মার্কস-চিন্তার গৌরব। তবু দেখি কোনো কোনো মহল থেকে অনুযোগ এসেছে 'The working men have no country. We cannot take from them what they have not got' এই বাক্যটি সম্পর্কে। বেশি কথার দরকার বুঝি না। 'স্বভাব-কবি' বলে বর্ণিত (এবং অবজ্ঞাত), 'আমরা হরিহর' প্রভৃতি বহু মধুর অথচ তেজস্বী 'স্বদেশী' গানের রচয়িতা গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৪৫-১৯১৮) চমৎকারভাবে এই মার্কস উক্তির ব্যাখ্যা করেছেন :

> স্বদেশ স্বদেশ করিস তোরা/এদেশ তোদের নয়/তুমি কেবল ত্রাসের মালিক/গ্রাসের মালিক নয়/চাবুক খাবার বাবু কেবল তোমরা সমুদয়/যে দেশ যাদের অধিকারে/তারাই তাদের বলতে পারে/কুকুর মেকুর ছাগল কবে দেশের মালিক হয়? তোরাই কুলি/তাদের/কুলি তারাই নিচ্ছে টাকাগুলি/তোদের কেবল ভিক্ষার ঝুলি, ক্ষুধায় মৃত্যু হয়/তারাই মালিক তারাই সমুদয়/স্বদেশ স্বদেশ করিস তোরা এদেশ তোদের নয়!

অত্যন্ত অসৎ এক অভিসন্ধিমূলকভাবে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনকেও ইউরোপকেন্দ্রিক ('Euro-centric') মনোবৃত্তিসম্পন্ন বলে অভিযোগও উঠেছে। সন্দেহ নেই যে, জীবনের প্রথম অধ্যায়ে মার্কসের দৃষ্টি প্রধানত নিবদ্ধ ছিল পাশ্চাত্যের অগ্রসর দেশগুলির দিকে, ইংল্যান্ডের মতো সভ্যতার অগ্রগতির ফলে বিনা সংগ্রামে, মোটামুটি সংসদীয় 'গণতন্ত্র'-এর জোরে বিপ্লব এড়িয়ে যাবার সম্ভাবনাও কিছুকাল মনে এসেছিল। কিন্তু দেরি হয়নি তা ভেঙে যেতে আর বুঝতে যে ইংল্যান্ড হল একেবারে নিরেট 'বুর্জোয়া' ('the most bourgeois of all nations') আর সংসদীয় কুহকে শ্রমজীবী মানুষকে ধনিকশ্রেণির সহায়ক ('labour lieutenants of the capitalist class') বানানো যায়, পার্লামেন্টে গিয়ে তাদের অধঃপতন কতটা ঘটে তা জানতে ত্রুটি হয়নি।

শ্রেণিসংগ্রাম বিষয়ে তাই মার্কসচিন্তা অটল (তুলনীয় সম্প্রতিকালে মাওসেতুংয়ের বিখ্যাত বচন : ('Never forget the class struggle'), আর ইশতেহারে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে 'গণতন্ত্র'-এর নামাবলী পরলেও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রকৃত চরিত্র হল যে "তা ধনিকশ্রেণির কর্ম নির্বাহক সমিতি" ('executive committee of the captialist class')। বস্তুবাদী দর্শণের বিচারে মার্কস্‌বাদ পবিত্র, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, 'গণতন্ত্র'-এর অস্তিত্ব স্বীকার করে না, সেটা হয় বুর্জোয়া নয় প্রোলেটেরিয়ন গণতন্ত্র। আর ঠিক যেমন প্রথমোক্ত মেহনতী মানুষের অধিকার নিতান্ত নাম-কে-ওয়াস্তে, তেমনই দ্বিতীয়োক্ত ব্যবস্থায় বুর্জোয়াদের অধিকার হবে সংকুচিত। কিন্তু তাতে অপ্রতিভ হবার কিছু নেই কারণ চিরবঞ্চিত নিঃস্ব মানুষই সমাজের অধিকাংশ আর তাদের হাতে হাল থাকলে আসল গণতন্ত্রেরই জয় আর সমসুযোগের সমাজ স্থাপনের পথ সুগম হবার সম্ভাবনা। 'Dicta-torship' শব্দটি ম্যানিফেস্টোতে নেই কিন্তু এর সদর্থ সেখানেই বিজ্ঞাপিত। 'পবিত্র' 'গণতন্ত্র'-এর 'গঙ্গাজল' ছিটিয়ে বুর্জোয়া কর্তৃত্বকে (ও অত্যাচার) 'পরিশুদ্ধ' করার প্রক্রিয়া কমিউনিস্ট আন্দোলনের আদি থেকে আজ পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছে, সমাজবাদ-সাম্যবাদ বস্তুটিকেই অন্তঃসারশূন্য করার জন্য (কে যেন বলেছিলেন 'the dreary drip of democtratic drivel')। এ নিয়ে আলোচনার সময় আমার নেই। কিন্তু 'Social De-mocracy'-র ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে যথাযথ আলোচনা (বিশেষত আমাদের মতো একটা পরপদানত দেশের অভিজ্ঞতাসূত্রে) হয়েছে বলে মনে হয় না। একটু কৌতুক আর কৌতূহলের সঙ্গে দেখি যে ভারতবর্ষে 'সোসালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল'-এর (যা আজও বর্তমান) অদ্বিতীয় ও অকৃত্রিম মুখপাত্র জর্জ ফার্নান্ডেজ-এর সংকোচ হয়নি ভারতীয় জনতা পার্টির মতো দলের সঙ্গে 'দোস্তি' বানাতে। ফার্নান্ডেজ-এর অনেক গুণ আছে জানি, কিন্তু ভুলতে পারি না যে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে মার্কস-এর মৃত্যুর পর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে তিনি 'The Other Way' নামক তার নিজস্ব পত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন রামমনোহর লোহিয়া লিখিত এক প্রবন্ধ যার প্রতিপাদ্য ছিল যে কমিউনিজম হল 'এশিয়ার

বিরুদ্ধে ইউরোপের এক চক্রান্ত মাত্র'।

আবার বলি প্রথম দিকে মার্কস-এঙ্গেলস ভবিষ্যৎ বিষয়ে আশা-ভরসা গড়ে তুলেছিলেন পাশ্চাত্যের অগ্রসর দেশগুলিতে মেহনতী মানুষের অভ্যুত্থানের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু একেবারে প্রথম থেকেই তাদের বিশ্ববোধ ছিল অগাধ ও অটুট। আয়ার্ল্যান্ড থেকে চিন, ভারতবর্ষ থেকে আলজিরিয়া, রুশ দেশ থেকে আমেরিকা, সর্বত্র বিস্তারি ছিল তাদের দৃষ্টি আর সেদিনের সাম্রাজ্যলাঞ্ছিত দেশের মানুষের প্রতি আস্থা আর অনুরাগ। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিষয়ক মার্কস-এর রচনা অমূল্য হয়ে রয়েছে; ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ যাকে 'সাময়িক মিউটিনি' বলে প্রচার করছিল সেই সিপাহীদের অভ্যুত্থানকে 'জাতীয় বিদ্রোহ' বলতে মার্কসের আটকায়নি; আমাদের ইতিহাসে কলঙ্কময় অধ্যায়ের তীব্র সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ছিল গভীর অনুসন্ধিৎসা আর সংবেদনশীলতা; ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় মার্কস প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইন্টারন্যাশনালে কলকাতা থেকে শাখা স্থাপন প্রস্তাবে মার্কস সাড়া দিয়ে জানান যে স্থানীয় মানুষদের নিয়েই যেন আন্দোলন গড়ে ওঠে; ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে যখন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সিভিলিয়ান হিউম সাহেব সারা দেশ থেকে পাঠানো ত্রিশ হাজার গোয়েন্দা রিপোর্ট পড়ে ইংরেজ শাসনের বিপদে আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন তখনই মার্কস-এঙ্গেলস-এর পত্রালাপে দেখি ভারতবর্ষে 'বিপ্লব ঘটার সম্ভাবনা' নিয়ে তাদের আনন্দ। এ সবের পিছনে ছিল এক ধারণা যা ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে মার্কস-এঙ্গেলস-এর পত্রাবলিতে প্রকাশ হয়েছিল : বিপ্লব যদি শুধু আসে পৃথিবীর 'এই ছোট্ট প্রান্তে, যা হল ইউরোপ' ('This little corner') আর বাকি দুনিয়ায় পুঁজিশাহী পরাক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে সে বিপ্লব সহজেই 'চূর্ণ' হতে পারে—এই ছিল দুই মহারথীর দুশ্চিন্তা। এরই প্রতিধ্বনি বারবার মিলচবে লেনিনের চিন্তা আর কর্মে, পূর্ব জগৎকে বিপ্লবের আসরে টেনে আনার একান্ত দায়িত্ব তাদের আন্তর্জাতিকতাকে ভাস্বর করে রেখেছিল। মার্কস তো সর্বদাই বলতেন যে পুঁজিশাহী একটা দুনিয়া জোড়া শক্তি আর তাকে পরাস্ত করতে হলে গোটা জগতের নির্জিত মানুষকে গর্জন করে উঠতে হবে। সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে হবে।

৫

সম্প্রতি আজীবন দেশব্রতী শ্রদ্ধেয় পান্নালাল দাশগুপ্ত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো নিয়ে আলোচনায় জানিয়েছেন যে গ্রামের মানুষ আর কৃষকদের ভূমিকার ব্যাপারে মার্কস অনীহাগ্রস্ত ছিলেন। সন্দেহ নেই যে বুর্জোয়া বিধানে শহরবাসী শ্রমিকশ্রেণির গুরুত্ব উপলব্ধি করে মার্কস চিন্তা ও কর্মপ্রয়াসে কারখানার মজদুরদের উপর আস্থা অনেক বেশি রেখেছিলেন। পল্লিজীবনে নিয়তির উপর ভরসা মানুষের মনকে সহজে দখল

করে। কৃষিকর্মে তুলনামূলকভাবে একাকিত্ব এবং প্রকৃতির অনুগ্রহের উপর ভরসার অনুভূতিও প্রবল হয়। মনে হয় এজন্যই মার্কস-এর বিবেচনায় 'urban proletariat'-কে বিপ্লবপ্রহরণে 'ব্রহ্মাস্ত্র' ভাবা হয়েছিল। কিন্তু এটাও নিঃসন্দেহ যে গ্রামের গরীবদের ভূমিকা মার্কস-এর চোখে একটুও কম ছিল না। ১৮৭০ দশকের রচনায় দেখি তিনি অতি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে শ্রমিক যদি কৃষকদের সঙ্গে একত্র না হয়ে 'একা' গান ('solo') ধরে আর কৃষকদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে 'দ্বৈত' সঙ্গীত ('duet') না করে, তাহলে সেটাই হবে শেষ গান, জীবন থেকে বিদায় নেবার গান ('swan song')! বহুস্থলে মার্কস-এঙ্গেলস-এর রচনায়, 'The Peasant Question' প্রধান স্থান পেয়েছে। নিজস্ব ভঙ্গিতে মার্কস বলেছেন জার্মানীতে 'বিপ্লব' সফল হবে না যদি তার সঙ্গে 'কৃষক বিদ্রোহের এক নতুন সংস্করণ' যুক্ত না হয়। পান্নাবাবু 'বিপ্লবী' কমিউনিস্ট পার্টিতে বললেন, নীতিনিষ্ঠার গুণে তিনি প্রণম্য; হয়তো একটু ভুল করলেন মার্কসবাদ বিষয়ে এই আপত্তি জানিয়ে।

একান্ত শুভবুদ্ধি নিয়েই পান্নাবাবু আমাদের মতো দেশে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধির চিন্তার সঙ্গে মার্কসবাদী প্রয়াসকে সম্মিলিত করার কথা উত্থাপন করেছেন। অনেকে বিচলিত ও বিরক্ত হলেও আমার মনেও এই প্রসঙ্গ প্রায়ই ঘোরাফেরা করে। মহাত্মা গান্ধিকে 'বিপ্লবী' বলা নির্বুদ্ধিতা; 'বিপ্লবী আর রক্তাক্ত সর্বনাশ'-এর ('revoloutiln and red ruin') নিন্দা তাঁর কাছ থেকে এসেছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এসেছে জওহরলাল নেহরুকে লেখা (১ এপ্রিল ১৯২৮) চিঠিতে স্বীকারোক্তি; 'আমি তোমার সঙ্গে একমত যে একদিন না একদিন আমাদের আন্দোলন করতে হবে ধনীদের সরিয়ে রেখে আর বাক্যবাগীশ শিক্ষিতদের বাদ দিয়ে'। সে সময় অবশ্য গান্ধিজির বিচারে আসে নি, ১৯২১-এ, ১৯৩০-৩২-এ, ১৯৪৫-৪৬এ। সর্বদাই তিনি বাশ টেনে রেখেছেন; অহিংসা নীতির অনুসরণেই তাঁরই দেশবাসীকে দেওয়া 'অভয়' মন্ত্রকে লুকিয়ে রেখেছেন, বিশ্বাস করেছেন 'মিটমাটের সৌন্দর্যে' ('the beauty of compromise')। কিন্তু তিনিই ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে আদালতে বিবৃতি দিয়ে যে কথা বলেন তা আজও স্মরণ করলে শিহরিত হতে হয়;

> The miserable little comforts of the town dwellers in India repersent the brokerage they get for the work they do for the foreign exploiter, the profits and the brokerage being sucked form the masses।

অনুবাদ না হয় না-ই করলাম, কিন্তু আজ আবার বিশ্ব সাম্রাজ্যতন্ত্রের সঙ্গে 'Subsidiary Alliance' ('জো হুকুম বন্ধুতা') করেছে আমাদের দেশ, যাতে নতুন 'অর্থনীতির' কল্যাণে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিস্তার ঘটেছে, বিলাসিতা বেড়েছে, সমাজবাদ সাম্যবাদের আশঙ্কাকে প্রায় হঠিয়ে ফেলার আয়োজন এগিয়ে চলেছে। এখনও ধনীর ধন বাড়ছে, গরীবদের দুঃখও বাড়ছে—কিন্তু রাজনীতি শুধু কেন জীবনেরই মোড় যেন ঘুরে গেছে। 'Affluence'

সবাই বুঝি চাই, শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন পর্যন্ত মিলিয়ে যাবার উপক্রম। 'এ জীবনে হায়/ সেই বেশি চায়/আছে যার ভুরি ভুরি/রাজার হস্ত করে সমস্ত/কাঙালের ধন চুরি।' রবীন্দ্রনাথের এই সহজ সরল কথার সত্যতা বুঝতে তো কসরত করতে হয় না।

মার্কস-এর চিন্তা আর কর্মে সম্ভোসর্বস্বতার বিপক্ষে যে বিদ্রোহ জাজ্জ্বল্যমান তার সঙ্গে সাদৃশ্য পুরোপুরি রয়েছে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধির ভারত-চিন্তায়। এদেশের ঐতিহ্যকে বোঝার জন্য 'কৌপীনবন্তঃ) খুলু ভাগ্যবন্তঃ' একমাত্র কথা অবশ্য নয়; কিন্তু কৃচ্ছ্রসাধন এখনও আমাদের মন টানে। এজন্যই শুধু একটু আভাস দিতে চাই যে মার্কস কঠোর সমালোচনা করেছেন ধনতন্ত্রকে সমাজজীবনে মানুষের 'প্রয়োজন' ('needs') তুচ্ছ করে 'লোভ' ('greed')-এর ওপর প্রাধান্য দিয়ে। 'অস্বাভাবিক, আতিশয্য দুষ্ট, জীবনযাপনে অপ্রয়োজন, একেবারে অতিরিক্ত আর কৃত্রিম' আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরে মানুষের পক্ষে হানিকর বিলাপপ্রিয়তা বেড়ে ওঠে পুঁজির রাজত্বে, এমন কথা মার্কস-এর কাছ থেকে অনেক পাওয়া গেছে। বর্তমানে এদেশে নতুন অর্থনৈতিক অদলবদলের পরিবেশে যে সম্ভোগসর্বস্বতা আজকের ব্যাপক আর প্রায় যেন অনিবার্য নীতিভ্রংশ ও সর্ববিধ মানব কল্যাণ প্রয়াসে দেশব্যাপী অনীহার সৃষ্টি করেছে, তার বিপক্ষে মার্কসবাদীরাই সংগ্রামে অগ্রণী হতে পারেন আর রবীন্দ্রনাথ, গান্ধির মতো যুগন্ধর মহাত্মার চিন্তা থেকে অনেককিছু আহরণ করতে পারেন। এ কথাটাকে যেন যান্ত্রিকভাবে না নেওয়া হয়। মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন এবং বাবাসাহেব আম্বেদকর বৌদ্ধ জীবনদর্শন ও মার্কস চিন্তার সাযুজ্য বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করে গেছেন। তা থেকে বেশ কিছু ধারণা এভাবের প্রয়াসে সহায়ক হয়ে ভারতভূমিতে মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষার আত্মীয়তাকে সুদৃঢ় করে তুলতে পারে।

৬

অনেক বাগাড়ম্বর ঘটিয়ে ফেলেছি। উপসংহারে স্মরণ করি কবি রাম বসুর একটি লাইন : 'আনো এই মরুভূমে প্রত্যয়ের ব্রহ্মপুত্র! দেশ আর দুনিয়ার দুর্গতি যে আজ কোন্ পর্যায়ে হাজির হয়েছে তা সবাই জানি। সমাজবাদ-সাম্যবাদের আপাত ব্যর্থতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যেন চলছে দুনিয়া জুড়ে দুর্নীতির বাদশাহি—আমেরিকা, জাপান, ইটালি থেকে আমাদের মতো প্রাচ্য দেশসহ গোটা পৃথিবীতে ঘটছে 'কেলেঙ্কারির' পর 'কেলেঙ্কারি' ('Scam'), নীতি বলে বস্তুটিই যেন উধাও। দৃষ্টান্ত দিতে গেলে একটা নোংরা মহাভারত ফাঁদতে হয়। কে আজ বলবে : 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে/তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে'? সর্ববিধ দুর্বৃত্তি সয়ে যাওয়াই যেন বর্তমানের রেওয়াজ, কিন্তু এমন দুর্দশা মানুষ সইবে কেমন করে? তাই ভাবি যে এই জঘন্য কলুষিত দুর্বৃত্ত পরিস্থিতিকে

মানুষ বেশিদিন মাথা পেতে নিতে পারে না, 'তিমির বিদারি উদার অভ্যুদয়' আসবেই।

এই বলে নিশ্চিন্ত অবশ্য হওয়া অসম্ভব। কে বা কারা এবং কবে এগিয়ে এসে হাল ধরবে? তবু রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাব না। স্মরণ করব মার্কস-এর উচ্চারণ : 'এক এক সময় বিশ বৎসর কেটে যায় আর মনে হয় যেন মাত্র একদিন, আর আবার এমন সময়ও আসে যখন কয়েক দিনে বিশ বছরের নির্যাস (cssence) লুকিয়ে থাকে।' জনশক্তির অভ্যুদয় ঘটাবার উপাদান তো নির্মিত হয়ে চলেছে, শুধু যথাকালে যথাযথ কর্মের উদ্যোগেই দেখা যাচ্ছে না "এই পতনের দায়ভাগে/আমরা সবাই সমান অংশীদার"—রাজনীতিক্ষেত্রে বহুকাল বিরাজ করেছি বলে আমারও উত্তরদায়িত্ব একেবারে হয়ত অকিঞ্চিৎকর নয়। তাই দুঃখ হয় যন্ত্রণা বোধ করি আমাদের দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের দ্বিধা ত্রিধা বহুধা বিভক্তির ফলে যে ব্যর্থতা এসেছে তার কামড়ে।

এখনও আদি কমিউনিস্ট পার্টিতে আমার অবস্থান, যদিও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সমর্থন আমার মনের দিক থেকে বেশি। 'নকশালবাদী' নামে যাদের চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের উদ্দীপনা ও ঐকান্তিকতার সুফল থেকে দেশ যে আজও বঞ্চিত হয়ে রইল সেজন্য প্রধান কমিউনিস্ট পার্টিগুলির দায়িত্ব মানতেই হবে। 'মুহূর্তং জ্বলিতং শ্রেয়ঃ/ন চ ধূমায়িতং চিরং' ভেবে যারা বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই জীবন্মৃত দেশে সাহস সংগঠন ও শৌর্যের প্রাণবায়ু ফিরিয়ে আনার উন্মাদনা এনেছিল, তাদের কোল দেবার জন্য কেন যে ছুটে আসার মতো দরাজ রাজনীতির স্পর্শ দেশবাসী পেল না, তা বোঝা সহজ নয়। সন্দেহ নেই যে, তত্ত্ব বিষয়ে অনীহা, শ্রেণিসংগ্রামের অকাট্য উপস্থিতিকে এড়িয়ে যাবার মনোবৃত্তি, বিপ্লবী আবেগের অন্তর্ধান, প্রশাসন দখলের প্রলোভন, সংসদীয় মায়ায় জড়িয়ে পড়া, পঞ্চায়েৎ থেকে পার্লামেন্ট হরেকরকম নির্বাচন নিয়ে মেতে থেকে 'জনতার মুখরিত সখ্য'—কে বিপ্লবী প্রস্তুতির পথে না নিয়ে 'প্র্যাগম্যাটিক' কায়দায় আশু কয়েকটি সমস্যা নিয়ে বাগাড়ম্বর এবং প্রায় অনিবার্য ফলস্বরূপ 'rally' অনুষ্ঠানে অদ্ভুত সাফল্য আর সঙ্গে সঙ্গে 'revolution'-এর প্রস্তুতিতে জনসংগঠন ও সংগ্রাম মানসিকতা হারিয়ে ফেলা—এবংবিধ বহু দুর্ঘটনারই সবাই সাক্ষী। কথাটা কটুভাবে বলে ফেললাম কিন্তু উপায়ান্তর নেই।

তবু জানি কালচক্র ঘুরবেই। মার্কস যাকে বলেছিলেন 'ইতিহাসের চাতুরি' ("History's cunning), তাও কিছু হয়তো লুকিয়ে রয়েছে! ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে প্রবাসকালে লেনিন 'The Lessons of 1905' শীর্ষক বক্তৃতায় বলেন : 'পুরোনো প্রজন্মের আমরা হয়তো আসন্ন বিপ্লবের চরম লড়াইগুলো দেখতে পাব না।' অথচ বস্তুত এপ্রিলে জারশাসনের পতন ঘটল আর নভেম্বরে সোভিয়েত বিপ্লব! ১৯৮৭ থেকে ২০০৭, এই কুড়ি বছরের দুঃসময় শেষ হলে কে জানে মার্কস কথিত 'একই দিনে কুড়ি বছরের

সঞ্চিত নির্যাস'-রূপে নতুন বিপ্লব হয়তো ঘটবে জগৎ জুড়ে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বিশ্বায়নী অর্থনীতির চণ্ডমূর্তি আর সমুন্নত দেশগুলির সমস্যাকন্টকিত চেহারা ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে। জনশক্তির নবজাগৃতির প্রস্তুতি সে অনুপাতে তেমন দেখছি না বলেই কষ্ট। বার্লিন থেকে উলানবাটর, লেনিনগ্রাদ থেকে লিবিয়া, বহুদেশে দোষে গুণে জায়মান সমাজতন্ত্র দেখে মনে যে আশার সঞ্চার হয়েছিল তা ভেঙে পড়ার উপক্রম হলেও শেলির ভাষায় চাইব : 'To hope till Hope creates/From its own wreck the thing it contemplates'। কিন্তু ইতিহাস তো কারও ইচ্ছাপূরণের (wish-fulfilment) দায়িত্ব রাখে না। দায়িত্ব রয়েছে আমাদেরই জনশক্তির ওপর। আপনারা বিদ্বজ্জন, যে যেভাবে পারেন শোষণমুক্ত জীবন-আবাহনে লিপ্ত থাকুন।

দর্শন ও সমাজ ট্রাস্ট আয়োজিত কমিউনিস্ট ইশতেহার প্রকাশের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনার-এর উদ্বোধনী ভাষণ।

সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুক্তিসাধক সত্যেন বসু

পলাশির যুদ্ধের পনেরো বছর বাদে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে এমন একটি পুরুষ জন্মালেন এই বাংলা দেশে যিনি শুধু বাংলার জীবনে নয়, ভারতবর্ষের জীবনে নবজাগরণের, নব বসন্তের সব সম্ভাবনা বহন করে নিয়ে এলেন তিনি হচ্ছেন রামমোহন রায়। অন্য সব আন্দোলনের মতো রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত তিনিই করেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, ভারতীয়দের জুরি নিযুক্ত করার দাবি, নুনের একচেটিয়া ব্যবসা রদ করবার আন্দোলন, হাটে হাটুরেদের কাছ থেকে তোলা নেওয়ার প্রথা বন্ধ করবার দাবি, বিলাসসামগ্রীর উপর ট্যাক্স্ বসাবার দাবি, জমিদার কর্তৃক চাষি নিপীড়নের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ, এ সব তাঁর বিরাট কর্মধারার সামান্য অংশ। তিনি চলে গেলেন। তখন সেই নবযুগের ধারাকে মুক্তধারা করে রাখবার জন্যে এলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে দেশহিতার্থী সভ্য, পরে ভারতবর্ষীয় সভা British Indian Association স্থাপন করে ভারতবাসীদের অবস্থার উন্নতিসাধন, চৌকিদারি ট্যাক্স্ যাতে গ্রামবাসীদের না দিতে হয় তার দাবিকরণ, নুন তৈরি করার অপরাধে দণ্ডিত গ্রামবাসীদের যে কঠোর দণ্ড দেওয়া হত তার পরিবর্তন, স্বায়ত্তশাসন ; এই সব দাবি জানালেন ভারতবর্ষীয় সভার সেক্রেটারি রূপে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই প্রথম জানানো হল স্বায়ত্তশাসনের দাবি বিদেশি শাসকদের কাছে। ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোশিয়েসনের শাখা ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হল। আমাদের দেশে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্মদাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু মেলা প্রবর্তন করে দেশে তৈরি জিনিসের ব্যবহার ও মাতৃভাষার উন্নতি সাধন করার জন্যে দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে স্বদেশি আন্দোলনের সূত্রপাত করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ভারতবর্ষের তখনকার অবস্থায় এই ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনকে নিঃসন্দেহে বিপ্লবপন্থী আন্দোলন বলা যেতে পারে।

এর অল্পদিন পরেই এলেন রাজনারায়ণ বসু। বলপ্রয়োগের দ্বারা বিদেশি শাসকদের

দেশ থেকে বিতাড়িত করবার মতবাদ প্রচারের জন্য তিনি গুপ্তসমিতি স্থাপন করলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বালক রবীন্দ্রনাথ, এঁরা সবাই তখন রাজনারায়ণের চেলা। তারপরে সুরু হল কংগ্রেসের যুগ। বছরের পর বছর আটপৌরে প্রস্তাব পাশ করা ছাড়া আর কোনো কাজ তখন ছিল না কংগ্রেসের। মহারানি ভিক্টোরিয়ার দৈহিক ও মানসিক অসুখের জন্যে ব্যাকুলতা, গভীর অসোয়াস্তি বোধ, সমবেদনা ও ভগবানের কাছে প্রার্থনা তখন কংগ্রেসের প্রস্তাব হিসেবে মহারানির কাছে পাঠানো হত। আগের যুগের স্বদেশি জিনিস ব্যবহারের আন্দোলনও তখন অনুনয় বিনয় ও ভিক্ষার রাশিরাশি প্রস্তাবের তলায় চাপা পড়ে গেছে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বাগিচায় তখন দরখাস্ত রাজনীতিজ্ঞদের মৌসুম। সেদিন শুধু বাংলায় ও মহারাষ্ট্রে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামী সাধকদের দুঃসাধ্য সাধনা চলছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। এত কাপুরুষতা এত জমাট ভয় জাতির প্রাণকে চেপে ধরেছিল, আত্মঅবিশ্বাস সেদিন কর্মশক্তিকে এমন করে টুঁটি চেপে পঙ্গু করে রেখেছিল যে সাহস সঞ্চার করা, আত্মবিশ্বাস ও পৌরুষ ফিরিয়ে আনাই ছিল সেদিন ভারতবর্ষের মুক্তিসাধনার সবচেয়ে বড়ো কাজ। এই বৈপ্লবিক ব্রত সাধন করবার জন্যে এগিয়ে এলেন একদল তরুণ। বিদেশি শাসকদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করবার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করতে হবে ও সেই বলপ্রয়োগ নৈতিক, যিনি এই ধারণার পূর্ণ সমর্থক ছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর সেই প্রথম বলপ্রয়োগ সমর্থক বিপ্লবী রাজনারায়ণ বসুর পরিবার থেকেই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্রষ্টারা এলেন—অরবিন্দ ঘোষ, বারিন ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ও সত্যেন বসু। প্রথম দুজন হলেন রাজনারায়ণের দৌহিত্র ও শেষ দুজন হলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ও সত্যেন বসু হলেন রাজনারায়ণ বসুর ছোটো ভাই অভয়চরণ বসুর পুত্র। ১২৮৯ সালের ১৫ শ্রাবণ (ইংরেজি মতে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুলাই) মেদিনীপুর শহরে সত্যেন বসুর জন্ম। পনেরো বছর বয়সে জেলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করেন ও মেদিনীপুর কলেজ থেকে এফ্-এ পাশ করে কলকাতায় সিটি কলেজে বি-এ ক্লাসে ভর্তি হন। এই সময়ে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন, থাইসিস্ হয়েছে সন্দেহ হয়। তাই কলেজে পড়া ইস্তফা দিয়ে শরীর সারাতে ওয়ালটেয়ারে চলে যান। রাজনারায়ণ, অরবিন্দ ও ওঁর দাদা জ্ঞানেন্দ্রনাথ, এঁরা তিনজনই ছিলেন সত্যেন্দ্রের রাজনৈতিক প্রেরণার উৎস।

কিছু দিন পরেই ব্রিটিশ শাসনকে বলপ্রয়োগের দ্বারা উচ্ছেদ করবার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে কানাই দত্ত ও সত্যেন বসু আসেন প্রেসিডেন্সি জেলে। বন্দি অবস্থাতেই রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে নিহত করলেন তাঁরা প্রেসিডেন্সি জেলের ভিতরে। ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে তাঁদের ফাঁসি হয়ে গেল।

তারপরে প্রাণ-নিবেদনের রক্তরাঙা পথ ধরে বহু মুক্তিকামী সাধকেরা এলেন। জাতি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল, সাহস ও আত্মত্যাগের উদ্দীপনা। তার পরের ইতিহাস হচ্ছে যে

আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে জাতিকে যেতে হয়েছে মুক্তির সন্ধানে, তার ইতিহাস। সে ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে। ইতিমধ্যে দেশ ভুলেও গেছে সেই সাধকদের যাঁরা সমস্ত জীবন দিয়ে জাতির প্রাণের অন্ধকার দূর করে দিয়ে সেখানে আলো জ্বেলেছিলেন। এমনিই হয়ে থাকে। কাল বড়ো নির্মম, অতীতকে ভুলিয়ে দেওয়ার লীলাতেই কালের হৃদয়হীন কৌতুকপ্রিয়তার প্রকাশ। বর্তমান হচ্ছে এই ব্যথাহীন কালের সন্তান। তাই বেদনা পেলেও এই বিস্মরণকে কালের দান হিসাবে স্বীকার করে নিতেই হবে। কিন্তু মানুষ যখন ইতিহাসকে বিকৃত করে নিজের মনের বিকার দিয়ে, তখন সেই ইতর বিকৃতি মনকে পীড়া দেয়। তখন বীরের বীরত্ব, ত্যাগীর ত্যাগের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে সেই মিথ্যার প্রতিবাদ করা দরকার হয়ে পড়ে।

সত্যেন বসু সম্বন্ধে অনেক কাল থেকে একটি প্রচার চলে আসছে যে তিনি ফাঁসির কিছুদিন আগে থেকে বড়ো কাতর ও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। কে যে একথা রটনা করেছিল, কি উদ্দেশ্য নিয়ে রটনা করেছিল তা জানি না। বিপ্লবপন্থী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রেষারেষি থাকায় উপদলীয় শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করবার জন্যে এ ধরনের ইতর প্রচার কোনো সময়েই দুর্লভ ছিল না। পরবর্তী যুগে বিরুদ্ধ দলের লোকদের সম্বন্ধে এই ধরনের প্রচার দলগুলির রাজনৈতিক কর্মের অন্যতম কাজ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই প্রথম যুগে? তখনও কি এই ধরনের নীচতার বেসাতি ছিল?

কয়েক মাস আগে রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতি-বার্ষিকী-উৎসব উপলক্ষ্যে আমি মেদিনীপুরে গিয়েছিলুম। অনেক কাল থেকে শুনে আসছিলুম যে রাজনারায়ণ বসুর এক ভাইয়ের দুই মেয়ে মেদিনীপুরে বাস করেন। এবারে তাঁদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। দুই বোনের একজনের বয়েস আশি পেরিয়েছে, আর এক জনের বয়েস আশির উপকূলে। সেদিন বিকেলে তাঁদের বাড়িতে বসে আলাপ করবার সময়ে জানলুম যে এঁরা হচ্ছেন সত্যেন বসুর নিজের দুই দিদি। ঘরের দেয়াল থেকে একটি ফ্রেমে বাঁধানো আবছা হয়ে যাওয়া একটি চিঠি নামিয়ে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বৃদ্ধা বললেন, 'এটি সত্যেনের শেষ চিঠি, ফাঁসির তিন দিন আগে লেখা। দেখুন পড়ে, একটুও কাতর হয়নি সে।' মৃত্যুর হাত থেকে বরমাল্য নেবার জন্যে প্রতীক্ষারত সাধকের শেষ চিঠিখানি পড়লুম। চিঠির তারিখ ১৭ নভেম্বর, ১৯০৭ সাল। প্রেসিডেন্সি জেলের ফাঁসি-কুঠরি থেকে চিঠিটি লেখা। পঞ্চাশ বছর বয়ে গেছে চিঠিটির ওপর দিয়ে। এত কাল চিঠিটি গৃহকোণে পড়েছিল। আত্মীয়দের ভালোবাসাই এতদিন একে রক্ষা করেছে। লেখা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, কাগজটি জরাগ্রস্থ। পড়লুম চিঠিটি। এতটুকু উদ্বেগ বা ভয়ের চিহ্ন নেই চিঠিটিতে। পঞ্চাশ বৎসরের উজান ঠেলে মন চলে গেল ১৯০৭ সালে। দেখুলম মানসচক্ষে, বসে আছেন দেশের মুক্তিসাধক তরুণ বীর আধো-আলো অন্ধকার ছোট্ট ফাঁসি কুঠরিতে। ভয়হীন মন আনন্দোচ্ছল প্রশান্তিতে ভরা, বসে আছেন তিনি মৃত্যুর হাত

থেকে দেশপ্রেমের বরমাল্য নেবার প্রতীক্ষায়। বললুম মনে মনে—হায় রে, তোমাকে ভীরু বলে জাহির করবার লোকও এ দেশে জুটল। তা না হলে এত দুর্দশাই বা হবে কেন বাংলার ও বাঙালির।

সেই দিনই বিকেলে সত্যেন বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে গিয়েছিলুম। বীরেনবাবুর দিদি সত্যেন বসুর লেখা আর একটি চিঠি আমাকে দেখালেন।

পূজনীয় দাদাবাবু,

গত শনিবার আপনি আসিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু আসিলেন না কেন? সেদিন হইতে আপনার জন্য আশা করিয়াছিলাম কিন্তু আপনি আজ পর্যন্ত আসিলেন না। যাই হউক, আজ এখুনি সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব বলিলেন যে আপিল অগ্রাহ্য হইয়াছে এবং ২১শে তারিখ, শনিবার সকালে দিন স্থির হইয়াছে। অতএব মধ্যে আর মাত্র তিন দিন সময়। পত্র-পাঠ আপনি অবশ্য একবার শেষ দেখা করিয়া যাইবেন। যেদিন আসিবেন সেদিনই দেখা হইবে। অন্য কেহ যদি দেখা করিতে চান সঙ্গে লইয়া আসিবেন, মি. রায়কে দেখিতে ইচ্ছা করে যদি তিনি আসেন তবে সুখী হইব। তৎপরে দাদা! আপনার নিকট একটি অনুরোধ আছে, জানিবেন আপনার নিকট এটি আমার এই প্রথম ও শেষ অনুরোধ, সেটি এই যে আপনি যে রকমই ভাবুন আমার অনুরোধ ভাবিয়া দেখিবেন যেন শেষ জীবনে এই বৃদ্ধ বয়সে মা কোনো বিশেষ কষ্ট না পান। আর আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। শনিবার সকালে আসিয়া দেহ লইয়া যাইবেন। ন'দিদি প্রভৃতি আসেন ভালই। প্রার্থনাদি করিয়া যেন সৎকার করা হয়। আশা করি পত্র-পাঠ একবার দেখা করিয়া যাইবেন। ইতি

আপনার

স্নেহের ভাই সত্যেন

একই দিনে দুটি চিঠি তিনি লিখেছিলেন, একটি দিদিকে, অন্যটি দাদাকে। এই চিঠি দুটি থেকে সত্যেন বসুর মনের যে ছবি আমরা পাই তা যেমন বীরত্বপূর্ণ তেমনি কোমল। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। প্রকৃত কোমলতা সে তো বীরত্বের নিত্য উপাদান, চির সহচরী। আর কোমলতার যথার্থ প্রকাশ সে তো শুধু বীরত্বেই।

চিত্তরঞ্জন দাশ

সভাপতির অভিভাষণ

যুগে যুগে ভারতবর্ষ এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে, 'মুক্তি কোন্ পথে?' ইহাই ভারতবর্ষের আত্মপ্রশ্ন। বেদের অতি প্রাচীন মন্ত্রে এই প্রশ্ন ধ্বনিত হইয়াছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর চৈতন্যচরিতামৃতেও এই প্রশ্নের সমাধানের একটা চেষ্টা চলিয়াছে। এই প্রশ্নের উপর ভিত্তি করিয়া কেবল ধর্ম নহে, কেবল দর্শন নহে, কেবল কাব্য-মহাকাব্য বা সাহিত্যও নহে, পরন্তু কত বড় বড় সাম্রাজ্য, কত বড় বড় রাজপ্রতাপ আমাদের জাতির ইতিহাস পথে গড়িয়া উঠিয়াছে, আবার কালক্রমে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ইতিহাসের পথ, গতিমুক্তির পথ। ভারতবর্ষের যে ইতিহাস তাহাও এক প্রচণ্ড গতিপথে, যুগে যুগে মুক্তি পাওয়ার ইতিহাস, অথবা এক চিরন্তন মুক্তিপথে পুনঃ পুনঃ অতি দুর্দম গতিবেগের ইতিহাস। ভারতবর্ষের ইতিহাস কেবল ধর্মের ইতিহাস নহে। শুধু দাসত্বের ইতিহাসও নহে।

আজ আবার বর্তমান ভারতবর্ষ মর্মে মর্মে নিপীড়িত হইয়া তাহার সমষ্টিভূত জাতীয় চৈতন্যকে জাগ্রত করিয়া পুনরায় আত্মপ্রশ্ন করিতেছে, 'মুক্তি কোন্ পথে?' ইহা প্রাচীন ভারতের ব্যষ্টি, মুক্তি নয়। ইহা বর্তমান ভারতের সমষ্টিমুক্তি। হে ভারতের অতুলনীয় জাতীয় সম্পদ, হে বাঙালি, আমি আপনাদের সকলের প্রতিনিধিস্বরূপ আপনাদের সম্মুখে ভারতের সেই সনাতন প্রশ্নই উত্থাপন করিতেছি—এ সঙ্কটে, এ দুর্দিনে 'মুক্তি কোন্ পথে?' আমি অত্যন্ত সহজ ও সুস্পষ্ট করিয়া এই প্রশ্ন উত্থাপন করিলাম। কেন না, অতি সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিতরূপে আমাদের জানিতে হইবে যে, কি আমরা চাই এবং তাহা পাইবার জন্য কি আমাদের করিতে হইবে।

চিন্তার ধারায়, বিকাশের পথে একের পর এক আর অথবা যুগপৎ, জাতীয় মুক্তিপ্রসঙ্গে অনেকরকম আদর্শ আপনাদের সম্মুখে আসিয়া দেখা দিয়াছে। Self-Government—Home Rule, Independence এবং Swaraj—ইহা এক একটি কথা মাত্র। ইহার কোন্ কথাটি কি বুঝায়, তাহা না বুঝিতে পারিলে এবং বুঝিয়া আয়ত্ত করিতে না পারিলে যেমন সর্বত্র তেমনি আমি মনে করি, বিশেষভাবে জাতীয় মুক্তির ক্ষেত্রে, নিরর্থক কথা নিতান্তই ব্যর্থ। আর যদি এই সমস্ত অল্পাধিক সমতুল্য, অথচ বিশ্লেষণ-মুখে, বৈচিত্র্য-

বহুল আদর্শগুলির গূঢ় ইঙ্গিত স্পষ্ট বুঝা যায়, তবে ওই আদর্শ জাতীয় জীবনে আয়ত্ত করিতে হইলে কী বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা খুব বিবেচনার বিষয় হইয়া পড়ে।

এই সমস্ত আদর্শের মধ্যে যাহা আছে, স্বরাজ্যের আদর্শেও তাহা আছে। কিন্তু আমি যে শিক্ষা পাইয়াছি, তাহাতে রুল অর্থাৎ শাসন এই কথাটির মধ্যে যে ভাব ফুটিয়া উঠে, তাহার বিরুদ্ধে আমার মন বিরূপ হইয়া উঠে, তা সে শাসন ঘরেরই (হোম) হউক অথবা পরেরই (ফরেন) হউক। সেল্ফ-গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধেও আমার ঐরূপ আপত্তি। কিন্তু কেবল নিজেদের দ্বারা এবং নিজেদের জন্যই যদি সেল্ফ গভর্নমেন্ট হয়, তবে আমার আপত্তি বড় টিকে না সত্য; কিন্তু সে-ক্ষেত্রে আমি বলিতে পারি যে, স্বরাজ্যের আদর্শে ইহার সমস্তই বিদ্যমান আছে।

এখন উপায় যদি আদর্শের একটা অংশ হয়, তবে হিংসা কোনো যুগেই আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শ ছিল না বা এখনও নাই। সুতরাং হিংসামূলক কোনো উপায় আমরা অবলম্বন করিতে পারি না। কেন না, তাহা আমাদের জাতীয় সভ্যতার আদর্শে নাই। আমি বলি না যে, ভারতের ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহ নাই, অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে হিংসামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নাই।

আমি বলিতে দ্বিধাবোধ করি না যে, হিংসামূলক বিদ্রোহ দ্বারা আমরা কখনোই জাতীয় মুক্তিলাভ করিতে পারিব না। তারপর ভারতীয় প্রকৃতির অহিংসামূলক বৈশিষ্ট্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহা কিরূপে সম্ভব যে, নিরস্ত্র একটা পরাধীন জাতি হিংসামূলক বিদ্রোহ দ্বারা অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত, গভর্নমেন্টের আজিকার দিনের প্রচণ্ড হিংসামূলক, প্রচুর আয়োজন ও বাধার বিরুদ্ধে জয়ী হইবে? ফরাসি বা অন্যান্য দেশের বিদ্রোহের কথা তুলিয়া কাজ নাই। সেই সমস্ত বিদ্রোহের যুগে মানুষেরা তীর, ধনুক ও বর্শা হাতে যুদ্ধ করিত। কখনও বা জয়লাভও করিত। ইহা কি কল্পনায় সম্ভব যে, ওই উপায়ে আমরা এই বিজ্ঞানের যুগে সামরিক ভিত্তির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, একটা রাজ-শাসনকে বিধ্বস্ত করিতে পারি?

প্রকৃতপক্ষে লোকাল সেল্ফ-গভর্নমেন্টের ব্যাপারে আমলাতন্ত্র এমন কোনো ক্ষমতাই প্রজার হাতে ছাড়িয়া দেয় না, যাহার দ্বারা প্রজা নিজের ইচ্ছামত নিজেদের কোন হিতসাধন করিতে পারে। অন্যদিকে লর্ড লিটন-এর ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট এবং লর্ড ডাফরিন-এর শিক্ষিত ভারতবাসীর মতামতের উপর ঘৃণাসূচক উক্তি ও তাচ্ছিল্য এবং দুর্ভিক্ষের সাহায্যকল্পে অতি নীচ মনের পরিচয়, এ সমস্তই পরবর্তীকালের ঘনীভূত বিদ্রোহমূলক আবহাওয়া সৃষ্টির পক্ষে একের পর এক সাহায্য করিয়া আসিতেছিল।

যাহা হউক, জাতীয় মুক্তিলাভের জন্য আমাদের কী উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার আলোচনা আমি করিয়াছি। হিংসা-মূলক রাজদ্রোহিতার ভাব আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেন না, এই উপায় প্রথমত, নীতিবিরোধী। দ্বিতীয়ত ইহা দ্বারা কৃতকার্য হওয়া যাইবে না। ইহা নীতি-বিরোধী, কেন না, আমাদের জাতীয় প্রকৃতি ও জাতীয় সভ্যতার সহিত ইহার মিল নাই। ইহা দ্বারা কৃতকার্য হওয়া যাইবে না। কারণ, ইহা ধারণাই করা যাইতে পারে না যে আজিকার দিনে এমন একটা সুনিয়ন্ত্রিত গভর্নমেন্টকে কয়েকটা বোমা ও রিভলভারের গুলিতে আমরা একেবারে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া দিব।

তারপর প্রশ্ন, সেই চিরন্তন প্রশ্ন, তবে 'মুক্তি কোন্ পথে?' তবে আমি বলিতেছি যে, আপোষের সম্ভাবনা আমি দেখিতেছি। সমস্ত পৃথিবী যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমি দেখিতেছি, বিচ্ছিন্ন মানবজাতির মধ্যে একটা গঠন, একটা শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের জন্য মানবের আত্মা ব্যাকুল হইয়াছে। আমি বিশ্বাস করি, জগতের এই মহা-মিলনে ভারতবর্ষ খুব বেশি সাহায্য করিবে। জগতের সম্মুখে ভারতবর্ষের কিছু বলিবার আছে। ভারতবর্ষ তাহা বলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। পায়ে ভর করিয়া ভারতবর্ষ দাঁড়াইয়াছে, মানবের বিভিন্ন জাতির মিলন-মন্দিরের সিংহদ্বারে ভারতবর্ষ তাহার যুগ-যুগান্তের অমরবাণী লইয়া সমুপস্থিত। ব্রিটিশ রাজনৈতিকগণ কি পথের কন্টক হইবেন? আমি আশা করি না। তাঁহাদিগকে আমি বলি যে, তোমরা শান্তিলাভ করিতে পার, যদি আপোষ করো। আপোষের শর্তগুলি তোমাদের ও আমাদের উভয় পক্ষেরই সম্মানজনক হইবে। ভারতের ইংরাজ সম্প্রদায়কে আমি বলি যে, তোমরা স্বাধীনতার পতাকা বহন করিবার অধিকারী একটা মহিম্ন-জাতির বংশধর, আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধে কি তোমরা সাহায্য করিবে না—? আমরা তো এদেশে তোমাদের ন্যায্য অধিকারের স্বত্ব সর্বদাই স্বীকার করিতে প্রস্তুত। বাংলার উৎসাহী কর্মীদিগকে আমি বলি যে, তোমরা এই স্বাধীনতার যুদ্ধে, এ যুগে বহু স্বার্থত্যাগ করিয়াছ, বহু কষ্ট পাইয়াছ, তোমাদের উপরেই রাজরোষ সংহার মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এখনও সময় আসে নাই, যখন তোমরা সসম্মানে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে পার। যুদ্ধক্ষেত্র এখনও তোমাদের অপেক্ষায় কলকোলাহলে মুখরিত। যাও বীর, যুদ্ধ কর। ইতিহাসের একটা মহা গৌরবান্বিত যুদ্ধের সৈনিক তোমরা, তাহা ভুলিও না। যখন যুদ্ধ শেষ হইবে, যখন সন্ধি লইয়া শান্তি আসিবে—নিশ্চয়ই আসিবে, তখন সংযত, শান্ত পদক্ষেপে সে শান্তিময় মিলনমন্দিরে, সমুন্নতশিরে তোমরা দলে দলে প্রবেশ করিবে, এই স্বপ্ন শাশ্রুনেত্রে আমি নিরীক্ষণ করিতেছি। তোমরা তখন সর্বপ্রকার দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করিবে। জয়ী যে, সে দম্ভ করে না। বীর যে, সে জয়ের পর বিনয়ে অবনত হয়। মিলন-মন্দিরে যাত্রীরা যেন তোমাদের দেখিয়া বলিতে পারে, এরা সেই সমস্ত যোদ্ধা, যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়কে পরাজিত করিয়াছে, মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়াছে, আবার যুদ্ধাবসানে জয়মাল্য গলে, ইহারা বিনয়ে ও সৌজন্যে শত্রুকে অধিকতর পরাজিত

করিয়াছে।

জাতীয়তা একটা উপায়, যাহা অবলম্বন করিয়া মানবাত্মা গতি-মুখে ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। জাতীয়তার বিকাশ এইজন্য প্রয়োজন যে, ইহার মধ্য দিয়া সমগ্র মানবজাতি উত্তরোত্তর উন্নতির পথে আরোহণ করিতে পারে। জাতীয়তাই শেষ কথা নয় এবং আমি তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলিতেছি যে, যখন তোমরা মিলনের সর্তগুলিকে বিবেচনা করিবার জন্য আহূত হইবে, তখন জাতীয়তার গৌরবে অন্ধ হইয়া সমগ্র মানবজাতির যে ঐক্যমূলক গভীর স্বার্থ, তাহা ভুলিও না। আমি নিজে কি চাই, তাহার সম্বন্ধে আমার একটা স্পষ্ট ধারণা আছে। আমি চাই :

> ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ তাহার আপন সভ্যতার, আপন ধর্মের—আপন আচার-ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য নবযুগের উপযোগীভাবে রক্ষা করিয়া পরস্পরের সহিত একজাতীয়তার মধ্যে মিলিত হইবে। প্রত্যেক প্রদেশেই সমগ্র ভারতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত, ভারতের একতাকে রক্ষা করিবে।
>
> ভারতের এই প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ও মিলন, সাম্রাজ্যের এক মহামিলনের অঙ্গীভূত। সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্যের ভিতরে একটা বিরাট অঙ্গের মত অবস্থান করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, সাম্রাজ্যের বল, সমৃদ্ধি ও গৌরব বৃদ্ধি করিবে।
>
> প্রত্যেক স্বতন্ত্রজাতির স্বাধীনতার সার্থকতা সমগ্র মানবজাতিকে উন্নতির পথে সাহায্য করিবার উপর নির্ভর করিতেছে।
>
> জাতিতে জাতিতে মিলন পৃথিবীপৃষ্ঠে ব্যাকুল মানবাত্মার শান্তি আনয়ন করিবে।
>
> বন্দে মাতরম।

১৯২৫ সালে মে মাসে ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ।

ভাষা

রামনারায়ণ তর্করত্ন

প্রকাশ্য বক্তৃতা

তোমরা যেমন মনোযোগ পূর্বক ইংরেজি শিখিবে বাংলাও সেইরূপ শিক্ষা করিবে, বাংলার প্রতি কদাচ অনাস্থা করিবে না ; বাংলা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা, সুতরাং মাতৃবৎ এই মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। দেখ বর্তমান কালে যে সকল প্রদেশ দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচর হইতেছে সে সমস্ত দেশীয় লোকেরা সকলি স্ব স্ব দেশীয় ভাষাকে উত্তম ভাষা জ্ঞানে মান্য করিয়া থাকেন এবং সাধারণের এই এক প্রসিদ্ধ প্রথা আছে যে আপন আপন দেশীয় ভাষা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা না হইলে কেহই অন্য ভাষার প্রতি ধাবমান হয়েন না অতএব তোমাদিগের দেশ ভাষার প্রতি বিমুখ হওয়া কদাচ উচিত নহে।...

এক্ষণে ইংরেজি ভাষায় বিবিধ প্রকার পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, দণ্ডনীতি ও চিকিৎসা বিষয়ক উত্তমোত্তম প্রবন্ধ সকল দৃষ্ট হইতেছে যদি তোমরা স্বদেশীয় ভাষায় স্বরূপ যোগ্য হও তাহা হইলে ওই সমস্ত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত করিতে পারিবে তাহাতে দেশীয় ব্যক্তিদিগের যে কত উপকার হইবে তাহা কথনাতীত। দেশীয় লোকেরাও তাদৃশ অসামান্য উপকারে উপকৃত হইয়া ওই অনুবাদকর্তাকে গ্রন্থকর্তা বলিয়া চিরকাল স্ব স্ব স্মৃতিপথে আরূঢ় রাখিবেন, তাহাতে তাঁহার বিদ্যোপার্জন সার্থক হইবে।

বর্তমান কালে এই বিষয়ের দৃষ্টান্তপথে পতাকা স্বরূপ কতিপয় সুবিজ্ঞ মহোদয়েরা সাতিশয় যত্নপূর্বক নানা সংস্কৃত ও ইংরেজি গ্রন্থ দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছেন, এক্ষণেও করিতেছেন, তাহাতে পূর্বাপেক্ষা দেশীয়দিগের কত অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা একবার বিবেচনা করিলেই সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারা যায়, ফলত ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ করা আবশ্যক বোধ করিয়াও স্বদেশীয় ভাষার প্রতি অনুরাগ রাখা নিতান্ত উচিত।

এই সুকুমার দেশীয় ভাষা ইহা শিক্ষা করিতে তোমাদিগকে নিতান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে না, যেহেতু ইহা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা। মাতৃ জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেই ওই ভাষা কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইতে থাকে, এবং স্তন্যপান সমকালেও অনেক কণ্ঠস্থ হয়, পরে মাতা পিতা প্রভৃতি স্বপর সাধারণ সকলেরি নিকট সর্বদা তাহা শ্রবণ করাতে

বাল্যাবস্থাতেই প্রায় অর্ধেক অভ্যস্ত হইয়া থাকে, অনন্তর কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যথা নিয়মে শিক্ষা করিলেই সম্পূর্ণরূপে তাহাতে ব্যুৎপত্তি জন্মে, ফলত অনায়াসলভ্য এতাদৃশ উত্তম বস্তুতে কাহার না অভিলাষ হয়? যদি পথিমধ্যে এক অমূল্য রত্ন পতিত হইয়া থাকে এবং তাহা গ্রহণ করিতে কোনো প্রতিবন্ধক না থাকে তাহা হইলে চক্ষুষ্মান্ পথিক কি তাহা পরিহার করে? কদাচ করে না, কিন্তু যদি পথিক নয়ন বিহীন হয় তবেই সেই বস্তু সুতরাং পরিহৃত হয় তাহার ন্যায় যদি তোমাদিগের বিবেক নয়ন থাকে তবে কদাচ এই অযত্নলভ্য স্বদেশীয় বিদ্যারত্নকে অশ্রদ্ধা করো না।

বর্তমানাবস্থায় যে সমস্ত গ্রন্থ প্রচলিত আছে যদি ওই সকল গ্রন্থ স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হয় তাহা হইলে এতদ্দেশের কত মঙ্গলোন্নতি হইবে তাহা পূর্বে কহিয়াছি, অতএব যাঁহারা দেশানুরাগী তাঁহারা স্বদেশীয় ভাষার উন্নতি বিষয়ে একান্ত সচেষ্ট থাকেন। ইতিপৌর্বীয় যবন জাতীয় রাজারা আপনাদিগের ভাষার প্রতি নিতান্ত দৃঢ়ভক্তি রাখিয়াছিলেন ইহাদিগের মধ্যে কাহারো কাহারো নিজ ভাষার প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ ছিল যে তাঁহারা তদ্ভাষার সম্যক্ প্রচার করিবার নিমিত্ত অন্যান্য ভষার সমূলোৎপাটনেও চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইংলন্ডীয় পণ্ডিতেরা যত দূর পর্যন্ত ক্ষমতা স্বদেশীয় ভাষা প্রতি অনুরাগ রাখিয়া ইহার দৃষ্টান্ত পথে দণ্ডায়মান আছেন, কিন্তু এতদ্দেশের দৌর্ভাগ্যপ্রযুক্ত এতদ্দেশীয় লোকেরা প্রায় অনেকেই দেশীয় ভাষার প্রতি দ্বেষ করেন, বিদ্যালয়ে বাংলা বিদ্যা শিক্ষা ছাত্রদিগের অভিলাষানুসারেই চলিয়া থাকে, অর্থাৎ যে দিবস ইংরেজি শিক্ষা করিয়া অবসর সময় থাকে ও আলস্য দোষ উপস্থিত না হয় সেই দিনই একবার দেশীয় ভাষার পুস্তক অনাস্থা বুদ্ধিতে গৃহীত হয়, নতুবা হয় না, ইহাতে যে কেবল ওই সকল ছাত্রগণেরই দোষ এমত নহে, তাহাদিগের মাতা-পিতাও তদ্বিষয়ে দোষাঘ্রাত হইতেছেন, যেহেতু ইঁহারা স্ব স্ব সন্তান দিগের স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষা হইতেছে কি না ইহা একবারও দেখেন না, বালকেরা ইংরাজি পাঠাভ্যাস করিলেই প্রশংসা করেন, এবং যদি ওই বালক ইংরেজি কোনো পুস্তক ক্রয় করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকটে দশ বা দ্বাদশ মুদ্রা প্রার্থনা করে তবে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহা দেন কিন্তু বাংলা পুস্তক ক্রয় করিতে অর্ধমুদ্রা যাচ্ঞা করিলেও কহেন অর্থের বড়ো অনটন, কিছুদিন যাউক, এক্ষণ হইবে না, ইত্যাদি বিবিধ বাগাড়ম্বর করিয়া বালকদিগকে দেশ ভাষা শিখিতে অনুৎসাহ দেন, এই সমস্ত ব্যবহার কি দেশ ভাষা নির্মূল করার কারণ নহে? হায় কি আশ্চর্য দেশ ভাষার প্রতি ইহাদিগের এত অরুচি কেন? কেহ বা আপনি দেশানুরাগী ইহা জানাইবার নিমিত্ত মুখে মাত্র কহিয়া থাকেন যে 'আমাদিগের দেশ ভাষার উন্নতি করা নিতান্ত আবশ্যক' কিন্তু তাহা ইঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম নহে; যদি এমত অভিলষিত হইত তাহা হইলে কি তাঁহারা দেশীয় সভায় বিদেশীয় ভাষায় বক্তৃতা করিতেন, কি দেশীয় ভাষায় আলাপ করিতে হইলে ইংরেজি ভাষা মিশ্রিত করিতেন? কখনো করিতেন না।

বঙ্গ ভাষার আলাপ মধ্যে ইংরেজি দুই এক শব্দ প্রয়োগ করা আর বাঙালি পরিচ্ছদ অর্থাৎ ধুতি চাদর পরিধান করিয়া একটি উত্তম ইংরেজি টুপি ধারণ করা তুল্য হাস্যাস্পদ, সত্য মিথ্যা তোমরা বিবেচনা করো। যাহা হউক দেশীয় ভাষার আলাপ মধ্যে অন্য ভাষা সংশ্লিষ্ট করার কারণ দেশ ভাষার অনভিজ্ঞতা ব্যতীত আর কি বোধ হয়? বর্তমানকালে ইংরাজ রাজপুরুষগণের মধ্যে অনেকেই বাংলা ভাষা বিলক্ষণ জানেন কিন্তু ইঁহারা কি ইংরাজি কহিতে কহিতে দুই এক বাংলা ভাষা কহিয়া থাকেন? যদি বল এতদ্দেশীয়রা যে বাংলা কথার মধ্যে ইংরেজির দুই এক শব্দ কহেন তাহাতে ইঁহাদিগের ইংরাজি ভাষার অনুরাগই প্রকাশ পায়, কিন্তু ইহা আমাদিগের কদাচ অনুভবে আইসে না। ইংরাজ মহোদয়দিগের কি বাংলা ভাষায় অনুরাগ নাই এমত নহে, অনেকানেক ইংলন্ডীয় পণ্ডিতেরা এতদ্দেশীয় ভাষার প্রশংসা করিয়া থাকেন, তবে এই বরং করা যায় যে এতদ্দেশীয়দিগের দেশ ভাষায় অনুরাগ নাই, ইঁহারা দেশভাষা ক্রমশ নির্মূলিত করিবার মানসেই তাদৃশ ব্যবহার করেন কিন্তু ইহা নিতান্ত অনুচিত কর্ম।

ইংলন্ডীয় ভাষায় প্রেমমুগ্ধ কোনো কোনো ব্যক্তি কহেন যদি কোনো লোক জ্ঞানোপার্জনে অভিলাষী হয়, তবে কেবল ইংরেজি শিক্ষা করিলেই অভীষ্টসিদ্ধ করিতে পারিবে, স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষার অপেক্ষা কি, এতৎ-প্রদেশীয় সকল লোকের যদি জ্ঞানোপার্জন কর্তব্য হয় সকলেই ইংরেজি শিক্ষা করুন, কিন্তু আমি ইঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আত্মভাষায় বিদ্যা শিক্ষা ও পরভাষায় বিদ্যা শিক্ষা ইহার মধ্যে সুলভ কি, বোধ হয় ইহা বিবেচনা করিলে তাঁহারা আর এমত কথা কহিবেন না। অতএব ইঁহারা স্বদেশের প্রতি প্রীতি রাখিয়া যাহাতে আত্মভাষার উচ্ছেদ না হয় এমত চেষ্টা করুন।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা জন্মভূমিকে জননীর তুল্য বলিয়াছেন, সুতরাং সেই জন্মভূমিকে দুরবস্থা হইতে মোচন না করা আর ব্যাধি পীড়িতা জননীকে ঔষধ প্রদান ও শুশ্রূষা বিধানাদি দ্বারা সুস্থ না করা তুল্য কথা।

যে স্থানে আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়া শৈশবলীলায় লালিত হইয়াছি, সেই স্থানে যৌবন যাপন কালে ধন, জন, বিদ্যা, বুদ্ধি, সুনীতি, সচ্চরিত্রতা, যশ, সম্পত্তি প্রভৃতি সকল উপার্জন করিয়া সুখী হইতেছি এবং যে স্থানের স্মরণে মাতা, পিতা, দয়িতা, পরিণেতা, পুত্র, মিত্রাদির নির্মল বদন কমল সহসাই স্মৃতি পথে পতিত হয় এতাদৃশ অন্যাদৃশ প্রেমাস্পদ জন্মভূমির প্রতি অশ্রদ্ধা করা কি আমাদিগের উচিত কর্ম? যে ব্যক্তি দেশান্তরে অবস্থান করে সেই ব্যক্তিই জন্মভূমির মর্মস্নেহ অবগত থাকে, জন্মভূমি তাহারি আনন্দভূমি বোধ হয়, অতএব এই আনন্দভূমির প্রতি যাহার স্নেহ নাই সে কি মনুষ্য?

দেশীয় ভাষায় যাঁহাদিগের নিতান্ত দ্বেষ তাঁহারা ইংরেজি বিদ্যায় আপনাদিগের গাঢ়তর ব্যুৎপত্তি জ্ঞাপন করাইবার নিমিত্ত স্বদেশীয় স্বজনগণের সহিতও ইংরেজি ভাষায় আলাপ করেন; কিন্তু নিজ নিজ বাটীর পরিজনের সহিত আলাপ করিতে হইলে অবশ্যই ইহাদিগের

দেশীয় ভাষা অবলম্বিতা হয় তাহার সন্দেহ নাই ; সুতরাং যে ভাষা ব্যতীত সাংসারিক ব্যাপার সমাধা হয় না, তৎপ্রতি অনাস্থা বোধ বৈধ নহে, স্বদেশীয় ভাষা ব্যতীত মনোগত অভিপ্রায় প্রায় প্রকাশ পায় না। প্রসূতির স্তনক্ষীর যে প্রকার শরীরের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা সম্পাদক, স্বদেশীয় ভাষাও তদ্রূপ মানসিক শক্তিদায়ক সন্দেহ কি? ভাল স্বদেশীয় ভাষা প্রতি অশ্রদ্ধাকারীকে আরো জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা সেক্‌শপীয়্যার প্রভৃতি গ্রন্থ যখন পাঠ করেন তখন কি স্বদেশীয় ভাষায় ভাব উদয় করেন না? অগ্রে দেশ ভাষায় ভাব গ্রহণ না করিলে কখনোই ভিন্ন ভাষায় ভাবোদয় হয় না।

অতএব হে ছাত্রগণ তোমরা বাংলা সাধুভাষা প্রতি কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করো, ওই ভাষা এতদ্দেশের দেশীয় ভাষা, যত দিন পর্যন্ত এতৎপ্রদেশে উহার শ্রীবৃদ্ধি না হইবে, তত দিন নানা ইংরেজি গ্রন্থ প্রচার হউক, উত্তমোত্তম শিক্ষক থাকুন, কিছুতেই এতদ্দেশীয় সাধারণের জ্ঞানরসাস্বাদন হইবে না।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

সারস্বত সমাজে পরিভাষা বিষয়ে বক্তৃতা

প্রত্যেক গ্রন্থকার তাঁহার ভূগোল-গ্রন্থে নিজের নিজের মনোমতো শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, আবার মানচিত্রকারও তাঁহার মানচিত্রে স্বতন্ত্র শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং বালকেরা সর্বত্র এক শব্দ পায় না।

বক্তা দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিলেন যে এক Isthmus শব্দের স্থলে কেহ বা যোজক, কেহ বা ডমরু-মধ্যস্থান, কেহ বা সঙ্কটস্থান ব্যবহার করিয়া থাকেন। শেষোক্ত শব্দটি বক্তাই প্রচার করিয়াছেন। সংস্কৃত অর্থ অনুসারে সঙ্কট শব্দ স্থলেও ব্যবহার করা যায়, জলেও ব্যবহার করা যায়, গিরিতেও ব্যবহার করা যায়, সুতরাং উক্ত এক শব্দে Isthmus channel mountain-pass সমস্তই বুঝায়। অনেক গ্রন্থকার strait শব্দের স্থলে প্রণালী ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রণালী শব্দে মল-নির্গম পথ বুঝায়। প্রণালী অর্থাৎ খাল বা খানা শব্দ সমুদ্রে আরোপ কর্য়া অকর্তব্য।

Peninsulaকে বাংলায় সকলে উপদ্বীপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু উপদ্বীপগুলিতে দ্বীপের ছোটোই বুঝায়, অতএব এইরূপে প্রসিদ্ধ শব্দের অপভ্রংশ করা উচিত হয় না। বক্তা উক্ত স্থলে 'প্রায়দ্বীপ' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। 'প্রায়দ্বীপ' শব্দেই তাহার আকার বুঝায়।

এইরূপ অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে, তাহার একটা নিয়ম করা উচিত।

ভূগোলে কতকগুলি কথা আছে যাহা রূঢ়িক, এবং আর কতকগুলি কথা আছে যাহা অর্থজ্ঞাপনের নিমিত্ত সৃষ্ট। যেগুলি রূঢ়িক শব্দ তাহার অনুবাদ করা উচিত নহে, আর অপরগুলি অনুবাদের যোগ্য। ইংরেজিতে যাহাকে Red Sea বলে, ফরাসি প্রভৃতি ভাষাতেও তাহাকে লোহিত সমুদ্র বলে। কিন্তু India শব্দ অন্য ভাষায় অনুবাদ করে না। আমাদের ভাষায় এ নিয়মের প্রতি আস্থা নাই, কখনও এটা হয় কখনও ওটা হয়।

বক্তা বলিলেন, ইংরেজরা বিদেশীয় ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে শব্দের তদ্ধিত গ্রহণ করে না। ইন্ডিয়া শব্দ গ্রহণ করিয়া তাহার তদ্ধিত করিবার সময় তাহাকে ইন্ডিয়ান বলিয়া থাকে। বিভক্তি শুদ্ধ অনুকরণ করে না। কিন্তু বাঙলায় এ নিয়মের

ব্যভিচার দেখা যায়। অনেক বাংলা গ্রন্থকার কাস্পীয় সাগর না বলিয়া কাস্পিয়ান সাগর বলিয়া থাকেন।

এইরূপ শব্দ গ্রহণের একটা কোনো নিয়ম করা উচিত এবং কোন্‌গুলি অনুবাদ করিতে হইবে ও কোন্‌গুলি অনুবাদ না করিতে হইবে তাহাও স্থির করা আবশ্যক।

পরিভাষা, বিশেষ বিবেচনাপূর্বক ব্যবহার করা উচিত। Long সাহেবকে কেহই অনুবাদ করিয়া দীর্ঘ সাহেব বলে না, কিন্তু একটা পর্বতের নামের বেলায় অনেকে হয়ত ইহার বিপরীত আচরণ করেন। আমরা যাহাকে ধবলগিরি বলি, তাহার ইংরেজি অনুবাদ করিতে হইলে তাহাকে White mountain বলিতে হয়, কিন্তু আমেরিকায় White Mountain নামে এক পর্বত আছে। আবার ফরাসিতে ধবলগিরির অনুবাদ করিতে হইলে তাহাকে Mont Blanc বলিতে হয়, অথচ Mont Blanc নামে অন্য প্রসিদ্ধ পর্বত আছে। এইরূপ স্থলে একটি নিয়ম স্থির না হইলে দেশের নামের ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যভিচার হইয়া থাকে।

গ্রন্থের স্থৈর্যরক্ষা করিতে হইলে সর্বত্র এক অর্থ রাখা আবশ্যক। অভিধান স্থির করিলে ইহা সহজ হইতে পারিত; কিন্তু তাহার উপায় নাই। কারণ অনেক শব্দ এখনও প্রস্তুত হয় নাই। অতএব এক এক শাস্ত্র লইয়া তাহার শব্দগুলি আগে স্থির করা একান্ত আবশ্যক।

বক্তা বলিলেন, অল্পবয়স্ক শিশুদের হাতেই ভূগোল দেওয়া হয়, অতএব ভূগোলের পরিভাষা স্থির করাই সারস্বত সমাজের প্রথম কার্য হউক, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণেরও কিছু কিছু হইলে ভাল হয়।

উপসংহারে বক্তা বলিলেন, 'সারস্বত সমাজের তিন চারিজন সভ্য মিলিয়া একটি সমিতি করিয়া প্রথমত ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করুন, পরে সাধারণ সভায় তাহা স্থির হউক।' *

বঙ্কিমচন্দ্র এই সমাজের অন্যতম সহযোগী সভাপতি ছিলেন, 'কিন্তু তাঁহাকে সভার কাজে যে পাওয়া গিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না' (*জীবনস্মৃতি*, পৃ. ২৪১)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'বঙ্কিমবাবু এই সভার নাম ইংরেজিতে "Academy of Bengali Literature" রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।'

সারস্বত সমাজ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। রাজেন্দ্রলালের মনীষা এবং কর্মশক্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ *জীবনস্মৃতি*-তে লিখিয়াছেন :

> বলিতে গেলে যে কয়দিন সভা বাঁচিয়া ছিল, সমস্ত কাজ একা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই করিতেন। ভৌগোলিক পরিভাষা নির্ণয়েই আমরা প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরিভাষার প্রথম খসড়া সমস্তটা রাজেন্দ্রলালই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। সেটি ছাপাইয়া অন্যান্য সভ্যদের আলোচনার জন্য সকলের হাতে বিতরণ করা হইয়াছিল।....বিদ্যাসাগরের কথা ফলিল, হোমরা-চোমরাদের একত্র করিয়া কোনো কাজে লাগানো সম্ভবপর হইল না। সভা একটুখানি অঙ্কুরিত হইয়াই শুকাইয়া গেল।....তখন যে বাংলা সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠাচেষ্টা হইয়াছিল

সেই সভায় আর কোনো সভ্যের কিছুমাত্র মুখাপেক্ষা না করিয়া যদি একমাত্র মিত্র মহাশয়কে দিয়া কাজ করাইয়া লওয়া যাইত তবে বর্তমান সাহিত্য-পরিষদের অনেক কাজ কেবল সেই একজন ব্যক্তি দ্বারা অনেক দূর অগ্রসর হইত সন্দেহ নাই।

* মন্মথনাথ ঘোষ, *জ্যোতিরিন্দ্রনাথ* পৃ. ১১২-১৬।

সারস্বত সমাজের ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৮৯ তারিখের অধিবেশনে সভাপতির বক্তব্য।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতির অভিভাষণ

এইবারকার বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচন বিষয়ে আপনারা নতুন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। বাঙালি জাতির সাহিত্য-সম্পর্কীয় এই সর্বপ্রধান আলোচনা-সভায় এতাবৎ প্রতি বৎসর বাঙলা দেশের প্রথিতযশা সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, অথবা সাহিত্যের উদার ও রসজ্ঞ পৃষ্ঠপোষক, সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়া আসিয়াছেন। আপনারা এবার আমার মতো ব্যক্তি, রস-সাহিত্যের দরবারে যাহার কোনও স্থান নাই, আধুনিক ভারতের পক্ষে অত্যাবশ্যক পদার্থ-বিদ্যা বা রসায়ন বা অন্য কোনো ফলিত বিজ্ঞানে যাহার প্রবেশ হয় নাই এবং বিজ্ঞানের আলোচনা যাহার ক্ষমতার বাহিরে, যে শিক্ষাজীবী মাত্র, তাহাকে যখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি- পদের গৌরব দান করিয়াছেন, তখন কোন্ সাহসে আমি আপনাদের প্রদত্ত এই সম্মান-মাল্য শিরোধার্য করিয়া লইলাম, তদ্বিষয়ে কৈফিয়ৎ-রূপে অল্প-কিছু নিবেদন করিব। তৎপূর্বে মাতৃভাষার সাহিত্য জগতের প্রতিভূস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের পরিচালকবর্গকে আমার বিনীত কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। দেশবাসী স্বজাতীয়গণের প্রদত্ত এই সম্মান, দুর্লভ এবং সকলেরই কাম্য বস্তু ; কিন্তু এই সম্মান আমার প্রাপ্য বলিয়া আমি মনে করি না, এই সম্মান আপনাদের মাতৃভাষার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতিরই প্রতীক বলিয়া, মাতৃভাষার একজন ভক্ত ও শ্রদ্ধাশীল সেবক রূপে এবং বঙ্গভাষা-আলোচকদের অন্যতম রূপে, ইহাকে আমি গৌরব তথা দীনতাবোধের সহিত শিরোভূষণ করিয়া গ্রহণ করিতেছি।

ঊনবিংশ শতকের চতুর্থ পাদে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি সমাজ

ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি তাহার মাতৃভাষার সাহিত্য সম্বন্ধে সচেতন হইতে আরম্ভ করে, ঊনবিংশ শতকের চতুর্থ পাদ হইতে। ইহার পূর্বে, ছাপাখানার প্রসাদে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত (ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশক), ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল

(দ্বিতীয় দশক), বৈষ্ণবমহাজন-পদাবলি (তৃতীয় ও চতুর্থ দশক) প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ বই, বাঙালি জনসাধারণের পাঠের জন্য বহুল প্রচারিত হইতে থাকে, কলিকাতার বটতলার ছাপাখানাগুলি হইতে লোকপ্রিয় সাহিত্য হিসাবে রামায়ণ, মহাভারত, কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসান, রামেশ্বরের শিবায়ন, মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়া, প্রাচীনপন্থী বাঙালিদের সাহিত্য-ক্ষুধা মিটাইতে থাকে। ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি কিন্তু তখন ইংরেজি সাহিত্যের তীব্র মদিরা আকণ্ঠ পান করিয়াও তৃপ্ত হইতেছে না ; তাহার মাতৃভাষার সাহিত্য তাহার গ্রামীণ জীবনের সহিত জড়িত বলিয়া, বহির্জগৎ সম্বন্ধে কৌতূহলী তাহার মনকে কিছু কাল ধরিয়া তৎপ্রতি বিরূপই করিয়া রাখিয়াছিল। ভাষায়, মনে, প্রাণে সে ইংরেজ বনিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছিল। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি বুঝিতে পারিল, ভাষায় তাহাকে বাঙালিই থাকিতে হইবে এবং তাহার মাতৃভাষাতেই তাহাকে ইংরেজি সাহিত্যের দরে আধুনিক উচ্চকোটির সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। রঙ্গলাল, মধুসূদন, বঙ্কিম প্রমুখ লেখকগণ এই আদর্শকে কার্যকর করিয়া তুলিলেন। ইতিমধ্যে দুইটি জিনিস ইউরোপ হইতে আসিয়া ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালিকে তাহার মাতৃভাষায় নিবন্ধ সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট করিল ; একটি হইতেছে—ইউরোপীয় সাহিত্যের এবং ইউরোপীয় মানসিক সংস্কৃতির Humanism অর্থাৎ মানবিকতা বা মানবধর্মিতা, যে জিনিস দেশ-কাল-জাতি-নির্বিশেষে সমগ্র মানব-সমাজের সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন, তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার ভাব পোষণ করে, তাহা অনুশীলন করিয়া তাহা হইতে রস-গ্রহণে সচেষ্ট হয় ; অপরটি হইতেছে—স্যর উইলিয়াম জোন্সের সময় হইতে ইউরোপের প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতদের আলোচনার ফলে, ভারতের সংস্কৃতির প্রতি ইউরোপের মনে শ্রদ্ধার উন্মেষ, ও ভারতবর্ষে ইংরেজিশিক্ষিত ভারতীয়দের মনে এই শ্রদ্ধাভাবের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ, স্বদেশীয় সভ্যতা সম্বন্ধে গৌরব-বোধ, স্বদেশীয় সভ্যতার অঙ্গ সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের স্পৃহা। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি, সাহিত্য-জগতে নূতন সৃষ্টির খেলায় মাতিয়াছে ; পুরাতন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাহার মনে তেমন কোনো দরদ, কোনো মোহ আসে নাই। সিভিলিয়ান জন বীম্‌স্‌ 'ইন্ডিয়ান আন্টিকোয়ারি' পত্রিকায় ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বাংলা দেশের প্রাচীন কবি রূপে পরিচিত বিদ্যাপতির ভাষায় আলোচনা করিলেন, ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার নবীন ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির তুলনামূলক ব্যাকরণের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিলেন ; সিভিলিয়ান জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন্‌ ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে উত্তর-বাংলায় সংগৃহীত 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' প্রকাশিত করিলেন। ঊনিশের শতকের সাতের দশকে দেশভাষার প্রতি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অনুসন্ধানাত্মক কৌতূহলের সঙ্গে সঙ্গে, দেশের শিক্ষিত লোকেদের মনেও একটা সাড়া পড়িয়া গেল, নিজেদের ভাষা ও সাহিত্যকে, বিশেষ করিয়া সাহিত্যকে,

ভালো করিয়া জানিবার জন্য বুঝিবার জন্য তাগিদ আসিল। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন 'বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্যবিষয়ক' প্রস্তাব প্রকাশিত করিলেন ; ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিলেন, ইংরেজি ভাষায়। পরের দশকে, ওদিকে গ্রিয়ারসন্ সাহেব মৈথিলীর আলোচনায় ব্যাপৃত হইলেন, রুডলফ্ হ্যোর্নলে সাহেব উত্তর ভারতের আর্য ভাষাগুলির নূতন একখানি ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ব্যাকরণ লিখিলেন এবং মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর সংস্কৃত হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের আর্য ভাষার ইতিহাস প্রকাশিত করিলেন—আর এদিকে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সারদাচরণ মিত্র, অক্ষয়কুমার সরকার ও জগদ্বন্ধু ভদ্র এবং নয়ের দশকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রমণীমোহন মল্লিক, শিশিরকুমার ঘোষ, দীনেশচন্দ্র সেন, কীটদগ্ধ পুঁথি ঘাঁটিয়া, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন বইয়ের নষ্টকোষ্ঠি উদ্ধার করিয়া, বাঙালি শিক্ষিত সমাজের পাঠের জন্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা এবং গবেষণাও আরম্ভ করিয়া দিলেন। এইভাবে আধুনিক কালে নূতন করিয়া ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি তাহার জাতীয় সাহিত্যের সহিত পরিচয়-সাধনে উন্মুখ হইলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম যুগ

ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদ এবং মোটামুটি বিংশ শতকের প্রথম পাদ—এই শতকার্ধ বা পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া যে দুই পুরুষ অতিবাহিত হইল, সে দুইটিকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনা-বিষয়ে, মুখ্যত সেই সাহিত্যের সহিত একটা সাধারণ পরিচয়-সাধনের কাল বলা যাইতে পারে। তখন বাংলা সাহিত্য—বিশেষ করিয়া ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব যুগের সাহিত্য-সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ছিল অল্প ; বঙ্গের ভাণ্ডারে কী কী বিবিধ রত্ন আছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আমরা তখন চেষ্টিত হইলাম; তখন আমাদের যাহা কিছু আছে, তাহা কোনো রকমে বাহির করিয়া, সাজাইয়া ফেলিতে আমরা আগ্রহান্বিত হইলাম—যাহা পাইলাম, তাহা যাচাই করিয়া দেখিবার—তাহাতে কতটা মাটি আর কতটা মণি, কতটা সাচ্চা আর কতটা ঝুটা, তাহার খুঁটিনাটির খোঁজ লইবার মতো আমাদের সময়ও ছিল না, জ্ঞানও ছিল না। সেটা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম যুগ ; বাংলা সাহিত্যের পুঁথি খুঁজিয়া রক্ষা করা, শীঘ্র শীঘ্র ছাপাইয়া ফেলা—যাহাতে পিতৃপুরুষদের সাহিত্য-চেষ্টা লোপ হইতে বাঁচিয়া যায়, যাহাতে আমাদের পিতৃপুরুষ হইতে লব্ধ সাহিত্যিক রিক্থকে আমরা সমাজে দশের সমক্ষে প্রদর্শন-যোগ্য রূপে ধরিয়া দিতে পারি। এইভাবে আমরা অনেকটা নির্বিচারে যাহা পাইয়াছি, তাহা প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছি ; প্রাচীন পুঁথি দুই-পাঁচখানি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশের দ্বারা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছি।

কিন্তু এই পঞ্চাশ বৎসরের সাহিত্যসংগ্রহের এবং প্রকাশের ফলে, এবং আনুষঙ্গিকভাবে তাহার কথঞ্চিৎ আলোচনার ফলে, আমাদের হাতে যে-সকল মাল-মশলা জমিয়া গিয়াছে যে-সকল সমস্যা আমাদের সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, সেই মাল-মশলার মূল্য নির্ধারণের এবং সেই সকল সমস্যার সমাধানের সময় এখন আসিয়া গিয়াছে। আমাদের যাহা আছে, বা যাহা পাওয়া গিয়াছে, মোটামুটি তাহার তালিকা হইয়াছে ; এখন এই তালিকা-নির্দিষ্ট, আমাদের সমক্ষে প্রসারিত সাহিত্যনিদর্শনগুলিকে লইয়া, বাংলা ভাষার সাহিত্যিক ইতিহাসের, বাঙালি জাতির সাহিত্যিক সংস্কৃতির যথার্থ পরিচয় লাভের আবশ্যকতা আমরা উপলব্ধি করিতেছি। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের পরের আধুনিক বাংলা সাহিত্য তাহার নানা বৈচিত্র্য লইয়া আমাদের সমক্ষে প্রবহমান ; মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে, নানা উপায়ে সংরক্ষিত উপাদানের বাহুল্যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন করা তত কঠিন ব্যাপার হইবে না। কিন্তু এখন শিক্ষিত বাঙালি তাহার পুরাতন সাহিত্যের স্বরূপ বুঝিতে চায়, তাহার প্রাগ্-ইউরোপীয় যুগের ভাবধারার এবং ভাবনিয়ন্ত্রক বা ভাবপ্রকাশক লেখকদের পূর্ণ পরিচয় চায়।

এই আলোচনা যে বস্তুনিষ্ঠ নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অপেক্ষা রাখে, তাহা আমরা সকলেই অল্পবিস্তর স্বীকার করিতেছি। ইতিমধ্যে বাংলা ভাষায় ইতিহাসের আলোচনা, বৈজ্ঞানিক (অর্থাৎ কার্যকারণাত্মক পারম্পর্যানুসারী যুক্তিতর্কের) ক্ষেত্রে উন্নীত হইয়াছে। বাংলার পুরাতন সাহিত্যের ঐতিহাসিক আলোচনায় বিজ্ঞানানুমোদিত ভাষাতত্ত্বের দাবিকে কেবল রসাস্বাদনের অজুহাতে আর ঠেকাইয়া রাখিতে পারা যায় না। সার্থক সাহিত্যের আত্মস্বরূপ ইহার অন্তর্নিহিত রস-বস্তু দেশকালাতিগ ; যুগে যুগে নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাহা মানুষের চিত্তকে সরস করিবে, আনন্দযুক্ত করিবে। কিন্তু সাহিত্যের বহিরঙ্গ, দেশ-কাল-পাত্রাদি ধর্মের সহিত জড়িত ; সেখানে ভাবুকের রাগরঞ্জিত স্নেহসিক্ত দৃষ্টি অপেক্ষা, বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিকের শুষ্ক শুভ্র আলোকপাতের উপযোগিতা অনেক বেশি।

বাক্‌কে আশ্রয় করিয়া বাঙ্ময় বা সাহিত্য ; বাক্-এর জ্ঞান না হইলে বাঙ্ময়ের উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর নহে। ধীরে ধীরে এই বোধ আমাদের মাতৃভাষায় বাঙ্ময়ের সেবকদিগের মনে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সেই জন্যই বোধ হয়, বাগ্-দেবীর ধ্বনিময় ও লিপিময় রূপের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের দিগ্‌দর্শনে নিযুক্ত আমার মতো অসাহিত্যিককে, এই নিখিল বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনে আপনারা আহ্বান করিয়াছেন। যে-সকল স্থপতি বঙ্গবাণীর দেউল গড়িয়া তুলিয়াছেন, যে-সকল শিল্পী ভাস্কর্যে চিত্রে অলঙ্করণে এই দেউলকে মহিমময় করিয়া তুলিয়াছেন, আমার মতো ভাষাতাত্ত্বিকের স্থান তাঁহাদের বহু নিম্নে— ভাষাতাত্ত্বিক ভাষার মাটিকাটা মজুর মাত্র। তথাপি, আমাদের আলোচিত শাস্ত্র আমাদের সাহিতের সত্য স্বরূপটি বুঝাইবার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক—কেবল আবশ্যক নহে,

পরিহার্য ; অনুশীলন ও ভুয়োদর্শনজাত এই বিশ্বাসে, নীরস ভাষাতাত্ত্বিক হইয়াও, আমি আপনাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সাহসী হইয়াছি।

বাংলা ভাষার সাহিত্যের পত্তন

বিষয়টি একটু আলোচনা-সাপেক্ষ। যুগে যুগে ভাষা যখন মৌখিক ও সাহিত্যিক রূপের মধ্য দিয়া এক পুরুষ হইতে অন্য পুরুষে বাহিত হয়, তখন তাহাতে পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। এই পরিবর্তনের ধারাটি খুঁজিয়া বাহির করিলে, ভাষার ইতিহাস বা ইতিবৃত্ত পাওয়া গেল। বাংলা দেশ বিদেশি তুর্কিদের দ্বারায় বিজিত হইবার কিছু পূর্বে, খ্রিস্টীয় ১২০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে বাংলা ভাষা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বাংলা ভাষার সাহিত্যের পত্তন হইয়াছে। এই সাহিত্যের অতি অল্প নির্দশন, ৪৭টি বৌদ্ধ চর্যাপদ—নেপাল হইতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উদ্ধার করিয়া আনিয়া দিয়া বাঙালি জাতিকে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই চর্যাপদ কয়টি অত্যন্ত বিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে ; এগুলির সংস্কৃত টীকা আছে, কিন্তু সেই টীকা যখন রচিত হয়, তখন মূলের পাঠ ঠিক ছিল না। চর্যাপদ কয়টির মূল পাঠের নির্ণয় ও নির্ধারণ এবং ক্কচিৎ পুনর্গঠন করা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম যুগের ইতিহাসের সম্পর্কে এক অতি আবশ্যক কার্য। সুখের বিষয়, এই কাজে চর্যাপদের প্রাচীন তিব্বতী অনুবাদ খুঁজিয়া বাহির করিয়া শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাপাইয়া দিয়াছেন। চর্যাপদের ভাষার প্রকৃত স্বরূপ কী, তৎসম্বন্ধে বাংলা দেশে ও বাংলার বাহিরে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, চর্যাপদের ভাষা বাংলা নহে, একটা মিশ্র বা খিচুড়ি ভাষা, তাহাতে বিভিন্ন ভাষার শব্দ ও বিভক্তি প্রত্যয়াদি সন্নিবেশিত হইয়াছে ; কাহারও মতে, উহা প্রাচীন বাংলা নহে, প্রাচীন বিহারি, বা প্রাচীন উড়িয়া। এই মতভেদের নিরসনের জন্য ভাষাতত্ত্ব আমাদের একমাত্র সাধন। চর্যাপদের ভাষা যে প্রাচীন বাংলা, ইহা মিশ্রভাষা বা প্রাচীন বিহারি বা অন্য কিছু নহে, সেকথা বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ যুক্তিতর্কানুমোদিত ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে জোর করিয়া বলা যায়। চর্যাপদের প্রাচীন বাংলার প্রকৃতি নির্ণয়ও কঠিন ব্যাপার নহে—এই ভাষার উপরে তখনকার যুগের হিন্দি যাহাকে বলা যায় সেই পশ্চিমা অপভ্রংশের প্রভাব কেমনভাবে পড়িয়াছিল, তাহা ধরিতে দেরি হয় না।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য

তারপরে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রায় সবই সমস্যাময়। তুর্কি, বিজয় ও তুর্কি সুলতানদের যুগ ; পাঠান সুলতানদের যুগ ; মোগল যুগ ; নবাবি আমল ; ১২০০

হইতে ১৮০০ পর্যন্ত ছয় শত বছর ধরিয়া, বাঙালি কবিরা কাব্য রচনা করিয়াছেন, গান বাঁধিয়াছেন, দেবতার লীলা বর্ণনা করিয়া বড়ো বড়ো কাব্যের দেবতাদের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, দেবতার লীলাকে প্রতীক করিয়া গীতি-কবিতায় ও গানে মানুষের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রেম-ভালোবাসা শ্রদ্ধাভক্তির উৎস খুলিয়া দিয়াছেন ; এবং চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্ব দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, পুণ্য-চরিত মানবের চরিত্রচিত্রণ রূপ নূতন ধারা উত্তর-ভারতের সাহিত্যে প্রবর্তিত করিয়াছেন। এই সকল কবি আমাদের নমস্য। ইঁহাদেরই প্রসাদে বাঙালির বাঙালিত্ব বাঙ্ময় মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু আমরা কখনও কবিদের সম্বন্ধে কোনো ঔৎসুক্য দেখাই নাই। আমাদের মন ঐতিহাসিক তথ্য অপেক্ষা রস-বস্তুর প্রতি বেশি আকৃষ্ট থাকায়, বৈষ্ণব-রচিত সাহিত্যের বাহিরে, তথ্য সংরক্ষণের প্রায় কোনও ব্যবস্থা আমরা করি নাই। বরঞ্চ, কবিদের আহৃত রসবস্তুর আস্বাদনে তৃপ্ত হইয়া, সেই রসবস্তুরই পুর্ণতর পরিস্ফুটনে আমাদের সাহিত্য-চেষ্টা নিয়োজিত করিয়াছি। ইহার ফলে এই ঘটিয়াছে যে, প্রায়ই কবিদের পরিচয় তাঁহাদের সাহিত্যিক জীবনের কথা, যেটুকু দয়া করিয়া তাঁহারা আমাদের জানাইয়া গিয়াছেন, সেইটুকুর বাহিরে আমাদের অজ্ঞাত ; এবং তাহারা যাহা রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাও সর্বত্র আমাদের যুগ পর্যন্ত যথাযথ রূপে পৌঁছায় নাই। তখনকার দিনে নিজ নামের অপেক্ষা, নিজ রচনার প্রতি লোকের মমতা বেশি হইত ; সেহেতু অনেক কবি নূতন রচনা পূর্বের বড়ো কবির নামে জুড়িয়া দিয়া, তাঁহার পুঁথিতে বসাইয়া দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। লিপিকর-প্রমাদ লেখকের অনবধানতা, ভাষা প্রাচীন হইয়া গেলে বহু শব্দ দুর্বোধ্য হইয়া পড়ায় সেগুলির স্থানে নূতন শব্দ ব্যবহার, প্রভৃতি নানা কারণে মূল রচনা একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। অল্প কতকগুলি কবির রচনা ছাড়া, পুরাতন যুগের বাঙলা সাহিত্যের কোনও কবি সম্বন্ধে আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না যে আমাদের কাছে তাঁহার রস-সৃষ্টি ঠিক তাঁহারই কথায় পৌঁছিয়াছে। আমরা আবার তথ্যের অভাবে গাল-গল্পকে ইতিহাসের মূল্য দিয়া, বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এই কবিদের মধ্যে কাহারও কাহারও সম্বন্ধে কতকগুলি কল্পনোজ্জ্বল কাহিনিকে খাড়া করিয়া, তদ্দ্বারা ইতিহাসের অভাব পূরণ করিয়াছি। একই নামের একাধিক কবির রচনা মিলিয়া গিয়াছে ; সঙ্গে সঙ্গে একাধিক কবি একই ব্যক্তিতে সম্মিলিত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা আমরা ভুলিয়াই গিয়াছি। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদ এবং মুখ্যত সহজিয়াদের রচিত কতকগুলি পদের আধারে, আমরা এক চণ্ডীদাস কবিকে গড়িয়া তুলিয়াছি, তাঁহাতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়াছি, এবং এই চণ্ডীদাসকে বাংলা সাহিত্য-মন্দিরে এক দেবতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি। ভাবের ঠাকুর চণ্ডীদাসকে লইয়া তাঁহার নামের সহিত জড়িত পদ আস্বাদন করিয়া যাঁহারা রসানুভূতি লাভ করেন, তাঁহারা করুন, কাহারও তাহাতে আপত্তি হইতে পারে না, এবং হয় তো বহুজনের পক্ষে তাহা

কাম্য হইতে পারে। কিন্তু আমরা বাংলা সাহিত্যের নাড়ি-নক্ষত্রের কথা জানিতে চাহিতেছি ; চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদসমূহের মধ্যে এবং অন্য গ্রন্থের মধ্যে তথ্য কি আছে, তাহা আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় হইয়াছে। ভাব-সাধনার কালে চণ্ডীদাস এক কি বহু সে তথ্যে কিছু আসে যায় না। কিন্তু সাহিত্যালোচনার কালে, চণ্ডীদাস কাব্যের বাহ্যরূপ, তাহার অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু, তাহার ভাবাবলির বিকাশ, ইত্যাদি আলোচনার কালে, এক অথবা একাধিক চণ্ডীদাস, একাধিক চণ্ডীদাস হইলে বিভিন্ন চণ্ডীদাসের জীবৎকাল, সম্ভব হইলে তাঁহাদের সময়ের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও তাঁহাদের সাহিত্য-জীবনের প্রেরণা, এই সকল বিষয়ে তথ্য-নির্ধারণ সাহিত্যালোচকের প্রধান কর্তব্য হইয়া উঠে। তখন ব্যাপকভাবে ভাষাতত্ত্ববিদ্যা সাহিত্যালোচকের অন্যতম প্রধান এবং অপরিহার্য সাধনারূপে প্রতিভাত হয়।

বাঙালি আজকাল তাহার পূর্বকথা জানিতে উৎসুক হইয়াছে—সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির মন এ বিষয়ে যে অনেকটা সংস্কারমুক্ত, ইহা তাহার মানসিক সংস্কৃতির পক্ষে গৌরবের কথা। তাহার জাতির উৎপত্তি, ভাষার উৎপত্তি, সাহিত্যের উৎপত্তি, ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ—এসব বিষয়ে অনাবিল সত্য যাহা, তাহা উদ্ঘাটন করিবার মতো সাহস ও সাধুতা তাহার হইয়াছে। আমার মনে হয়, এই শুভ অবসরে, আমাদের আত্মজ্ঞান সত্যের আধারের উপরে, যুক্তিতর্কের ভিত্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, বৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বাঙালির প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাহিত্যের আলোচনা, নূতন করিয়া আরম্ভ করা উচিত। এই কার্যে বিজ্ঞানসম্মত ভাষাতত্ত্ব যতটুকু পারিয়াছে করিয়াছে এবং আরও সহায়তা করিবার জন্য সদা প্রস্তুত রহিয়াছে।

ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহের মধ্যে বাঙালির স্থান

একথা সকলেই স্বীকার করিবেন উপস্থিতকালে শিক্ষিত বাঙালি সবচেয়ে বেশি গৌরব অনুভব করে তাঁহার ভাষা ও সাহিত্য লইয়া। চল্লিশ বৎসর পূর্বে এ বিষয়ে আমরা ততটা সচেতন ছিলাম না—যদিও বাঙালি সাহিত্যিকমণ্ডলীর মধ্যে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে একটা সহজ প্রীতির অভাব ছিল না। ঊনবিংশ শতকে যে-সকল বাংলা লেখক বাংলা ভাষার শক্তি সম্বন্ধে উচ্চ ভাব পোষণ করিতেন, আমার মনে হয় বাংলা ভাষার অন্তর্গত সংস্কৃত শব্দ-সম্ভারই তাঁহাদের মনে এই ভাব দৃঢ় করিতে সাহায্য করিয়াছিল। আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির মধ্যে বাংলার স্থান অতি উচ্চে, কারণ বাংলা সংস্কৃত-বহুল ভাষা, সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য, প্রাকৃত বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ভাষার সৌন্দর্য ও শক্তি আনয়ন করিয়া দিয়াছিল। নিজ সাহিত্য লইয়া ঘরে বাহিরে গর্ব করিবার সময় তখনও আসে নাই—নিজ পৃথক অস্তিত্বের আশ্রয়স্বরূপ প্রাণপণ যত্নে মাতৃভাষাকে আঁকড়াইয়া ধরিবার কারণ তখনও ঘটে নাই। কিন্তু পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে বুঝি তাহার

ভাষাকেও দ্বিখণ্ডিত করিবার চেষ্টা যখন তাহার সামনে দেখা দিল, তখন সমগ্র ও অখণ্ড বঙ্গদেশের মধ্যে অচ্ছেদ্য যোগসূত্ররূপে তাহার মাতৃভাষা বাঙালির নিকট আত্মপ্রকাশ করিল। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে, রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিগণ কতকগুলি অতি-জনপ্রিয় গীতি-কবিতায় বাংলা ভাষার প্রশস্তি গাহিয়া গিয়াছেন। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম, মধুসূদন, হেম, নবীন প্রমুখের সাহিত্য-সাধনার মূল্য বাঙালি বুঝিতে পারিল—এককথায়, বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে বাঙালি নিজেকে আবিষ্কার করিল, তাহার রাষ্ট্রনৈতিক আকাঙক্ষাকে প্রত্যক্ষ করিল, তাহার ভাষা ও সাহিত্যকে ঘরে ও বাহিরে উভয়ত্র সংহতির এক প্রচণ্ড শক্তির আকর বলিয়া সে দেখিতে পাইল। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের আট বৎসর পরে, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের দরবারে তাঁহার বাঙলা কবিতার জন্যই যশের মুকুট পরিয়া আসিলেন, তাঁহার নোবেল-পারিতোষিক প্রাপ্তি দ্বারা একদিকে যেমন বঙ্গ-ভারতীর ও সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বাঙ্ময়ের মুখ উজ্জ্বল হইল, অন্য দিকে তেমনি বাঙালির ভাষা ও সাহিত্য লইয়া গর্বের ভিত্তি যেন আরও সুদৃঢ়ীকৃত হইল। ঊনবিংশ শতকে ইংরেজের অনুগামী বাঙালি, ইংরেজি শিক্ষায় ভারতের গুরুস্থানীয় ছিল ; বিংশ শতকের প্রারম্ভে, স্বদেশি আন্দোলনের যুগে এবং তাহার পরে, বাঙালি রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে নিখিল ভারতের অবিসংবাদিত নেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিংশ শতকের সেই স্বল্পকাল-স্থায়ী গৌরব এখন প্রায় অস্তমিত। অবস্থাগতিকে এবং তাহার নিজের বিষয়-বুদ্ধির ও সংহতি শক্তির অভাবে, বাঙালিকে সব বিষয়ে হঠিয়া আসিতে হইতেছে। ইংরেজি শিক্ষায় তাহার একাধিপত্য আর নাই ; রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারেও সে পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছে ; ভারতের প্রদেশান্তরের জনগণের চাপে, নিজ বাসভূমেও পরবাসী হইতে সে বাধ্য হইতেছে ; তাহার নিজ প্রদেশে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা বীভৎসতার চরমে উঠিয়া, সভ্যজনোচিত জীবনযাত্রাকেও তাহার পক্ষে অসম্ভব করিয়া তুলিতেছে। ঘরে অন্ন নাই, সম্প্রীতি নাই ; বাহিরে পূর্ব প্রতিষ্ঠা নাই; ঘরে বাহিরে অভাব, অপমান; এই পরাভবের ও নৈরাশ্যের আবেষ্টনীর মধ্যে একটি প্রধান আশ্রয় সে পাইয়াছে—তাহার ভাষা ও সাহিত্যে।

মানব সমাজের প্রধান বন্ধন ভাষা

মাতৃভাষা এবং তাহার সাহিত্য, যে-কোনো জাতির পক্ষে একটা মস্ত বড়ো অবলম্বন। প্রাচীন যুগ হইতে ভাষা মানব সমাজের প্রধান বন্ধন হইয়া আছে। প্রাচীন কালে nationlism বা জাতীয়তা, সামাজিক জীবনে বড়ো স্থান পায় নাই ; কিন্তু ভাষাকে অবলম্বন করিয়া, সমভাষী জনগণ ঐক্যের একটা সূত্র পাইত। যাহার ভাষা বুঝি, সে আমার সমান জাতির, আমার মতো মানুষ তাহাকে বলিতে পারি, আমার মতো শ্রেষ্ঠ জাতির লোক সে ;

যাহার ভাষা বুঝি না, সে বোবা, সে বর্বর, সে ম্লেচ্ছ বা সঙ্কর জাতির লোক, সে অনার্য অন্য জাতীয়। প্রাচীন কাল হইতে বহু জাতির মধ্যে সম-ভাষী এবং অন্য-ভাষী জনসমূহকে এইভাবে পরস্পর পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করিয়া আসা হইয়াছে। কখনো কখনো কোনো বিরাট রাষ্ট্রীয় বা ধার্মিক আদর্শ ভাষার পার্থক্যকে অতিক্রম করিয়া, বিভিন্ন ভাষাভাষী মানব-সমাজকে একত্র গ্রথিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল ; যেমন রোম সাম্রাজ্যে ঘটিয়াছিল ; যেমন প্রাচীন ভারতে হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য আদর্শ, আর্য ও দ্রাবিড়ভাষী হিন্দুদের এক সংস্কৃতির সূত্রে ও ক্বচিৎ এক রাজ্যের সূত্রে সম্মিলিত করিয়াছিল ; যেমন ইসলামের আদর্শ এক ইসলামীয় ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল, 'আরব' ও 'আজম' অর্থাৎ আরব ও অন্-আরবকে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া এক ধর্মরাজ্যপাশে বাঁধিয়া দিয়াছিল, যেমন রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্মের আদর্শ এককালে ফরাসি জারমান ও ইটালীয়দের এক রাষ্ট্রান্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ভাষাগত জাতীয়তা বরাবরই কেন্দ্রাপসারিতার দিকে কার্য করিয়াছে। ধর্ম বা রাষ্ট্রনীতির নামে যেখানে যেখানে কেন্দ্রীকরণ বা কেন্দ্রাভিমুখীকরণের আদর্শ আসিয়া বিভিন্ন ভাষাভাষী নানা জনগণকে মিলাইয়া এক করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে, ভাষাগত জাতীয়তা সেইখানেই আসিয়া শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, এই আদর্শকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

রাষ্ট্রীয় জীবনে ভাষাগত জাতীয়তা বোধ

আধুনিক জগতে Linguistic Nationalism অর্থাৎ ভাষাগত জাতীয়তাবোধ, রাষ্ট্রীয় জীবনে একটা প্রবল মনোভাব। অবস্থাগতিকে এই মনোভাব প্রচণ্ড শক্তির সঙ্গে কার্য করিয়া সম-ভাষীদের মধ্যে ঐক্য এবং বিষম-ভাষীদের বিপক্ষে বা বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা ও প্রতিস্পর্ধিতা আনয়ন করিয়া থাকে। আমাদের ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে ভাষাগত জাতীয়তাবোধের বিশেষ অবকাশ ছিল না। আর্য এবং অনার্য, এই দুই মুখ্য ভাষা স্বীকৃত হইত ; আর্য ভাষাগুলির মধ্যে, কথ্যভাষা প্রাকৃত কখনো কখনো রাজভাষারূপে দ্রাবিড় ও অন্য অনার্য দেশে প্রচলিত হইলেও (যেমন মহারাজ অশোকের আমলে, দাক্ষিণাত্যে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদের আমলে এবং প্রাচীন অন্ধ্র রাজাদের আমলে হইয়াছিল), আর্যভাষা সংস্কৃত, বেদ উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ সূত্রগ্রন্থ রামায়ণ, মহাভারত পুরাণের কল্যাণে, সর্বজন-সম্মানিত দেবভাষার স্থান পাইয়াছিল, অনার্য দ্রাবিড় ও কোলভাষীরা ব্রাহ্মণের আদর্শ গ্রহণ করিয়া দেবভাষা সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষারূপে মানিয়া লইয়াছিল ; জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে প্রাকৃতকেও মানিতে তাহাদের বাধা ছিল না। দক্ষিণ-ভারতে সুসভ্য দ্রাবিড়জাতীয় জনগণের মধ্যে 'আর্য' ও 'তামিল' এই দুই পরস্পরবিরোধী জনসংঘের বা জাতির ধারণা, খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রকের মধ্যভাগেই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল ; প্রাচীন

তামিল সাহিত্যে ইহার কিছু পরিচয় আছে। উত্তর ভারতে বহুকাল ধরিয়া কথিত প্রাকৃতগুলির মধ্যে তাদৃশ পার্থক্য না থাকায় এবং সর্বত্রই সংস্কৃত ভাষার অবিসংবাদিত প্রভাব স্বীকৃত হওয়ায়, ভাষাশ্রয়ী জাতীয়তা-বোধ হিন্দু যুগে দেখা দেয় নাই—যদিও কাশ্মীর, মদ্রদেশ বা উত্তর পাঞ্জাব, সিন্ধুসৌবীর, লাট বা গুজরাট, বিদর্ভ, মালব, শূরসেন বা মথুরা, কান্যকুব্জ, চেদিরাজ্য, কাশী, কোশল, মিথিলা, মগধ, রাঢ়, বরেন্দ্রী, বঙ্গ, কামরূপ, ওড্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশের বৈশিষ্ট্য, অল্পাধিক পরিমাণে ফুটিয়া উঠিতেছিল, এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টি লোকেদের কাছে এই সব বৈশিষ্ট্য ধরা দিতেছিল। খ্রিস্টীয় ১০০০ এর দিকে বিভিন্ন প্রদেশের প্রাকৃত ও অপভ্রংশ হইতে আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাগুলি নিজ নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়া বসিল ; খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষ দুই তিন শতকে মগধ ও গৌড়ে পাল বংশের অভ্যুদয়ের পরে, গৌড়-বঙ্গের ভাষা, মাগধী, অপভ্রংশ, বা গৌড়ী অপভ্রংশ অবস্থা হইতে আর এক ধাপ আগাইয়া যে নবীন রূপ ধারণ করিল, তাহাকেই প্রাচীন বাংলা বলিতে হয়। এই 'প্রাচীন বাংলা'য় যে সাহিত্যের ভগ্নাবশেষ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, বৌদ্ধ চর্যাপদের ৪৭টি গান, সেগুলি আনুমানিক ৯০০-১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অন্য নিদর্শনের অভাবে, এই চর্যাপদগুলিকে বাংলা দেশের লোকের নিজ মাতৃভাষায় রচনা করিবার প্রথম প্রয়াসের ফল বলিতে হয়। চর্যাপদের পূর্বে বাংলার অধিবাসীরা দেশ-ভাষায় বাংলা ভাষার পূর্ব-রূপ অপভ্রংশ ও প্রাকৃতে কোনো সাহিত্য রচনা করিয়াছিল কিনা, আমাদের জানা নাই। বাংলার পণ্ডিতেরা অবশ্য সংস্কৃতে রচনা করিতেন ; বাঙালি পণ্ডিতের হাতে সংস্কৃতে একটি শক্তিশালী রচনানীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'গৌড়ী রীতি'; হয়তো প্রাকৃতেও অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত জন, গান ও গাথা রচনা করিতেন—কিন্তু তাহা রক্ষিত হয় নাই। আধুনিক আর্য-ভাষা প্রাচীন বাংলা , প্রাচীন গুজরাটি, প্রাচীন মারাঠী, প্রাচীন ব্রজভাষা, প্রাচীন অউধী, প্রাচীন মৈথিল প্রভৃতির বিকাশের বা রূপগ্রহণের পূর্বে লোকভাষাকে অবলম্বন করিয়া ব্যাপকভাবে সাহিত্য রচনা হয় গুজরাটে, মালবে, রাজপুতানায় এবং মধ্যদেশে অর্থাৎ এখানকার পশ্চিম-সংযুক্ত প্রদেশে ; এই পশ্চিমের দেশগুলিতে, রাজপুত রাজাদের সভায়, ওই অঞ্চলের লোকভাষার আধারে একটি সমৃদ্ধ সাহিত্যের ভাষা দাঁড়াইয়া গেল। সেটির নাম দেওয়া হইয়াছে 'পশ্চিমা-অপভ্রংশ'—পশ্চিমের বৈয়াকরণগণ ভাষাটিকে কেবল 'অপভ্রংশ' নামেই অভিহিত করিয়াছেন। এই পশ্চিমা-অপভ্রংশ খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষ কয় শতক এবং দ্বিতীয় সহস্রকের প্রথম দুই তিন শতক ধরিয়া, কথ্যভাষার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত একটি প্রবলপ্রতাপ সাহিত্যের ভাষারূপে, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র হইতে বাংলা পর্যন্ত সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রসৃত হয়। বাংলা দেশেও ইহার প্রচলন ঘটে, বাঙালি বৌদ্ধ সাধকদের রচিত বহু পদ এই ভাষায় পাওয়া গিয়েছে। বাংলা ভাষা, লিখিত সাহিত্যে প্রথম ব্যবহৃত হইবার পূর্বে, বাংলা দেশে

সম্ভবত এই পশ্চিমা অপভ্রংশই লৌকিক সাহিত্যের ভাষারূপে ব্যবহৃত হইত। পালবংশীয় রাজাদের আমলে গুর্জর-প্রতিহার প্রমুখ পশ্চিমাদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ, ভাষাবিষয়ে তখনকার যুগের রাঢ়-বরেন্দ্রী-বঙ্গবাসীদিগকে স্বদেশের গৌড়বঙ্গের ভাষার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া থাকিবে ; অবশ্য এটা একটা অনুমান মাত্র। যাহা হউক, বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি তাহাতে সাহিত্য-রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিল ; ভারতের অন্যান্য বহু প্রদেশ সম্বন্ধে, এ কথা বলা চলে না। অবশ্য এ কথা বলিব না যে, তখনই গৌড়-বঙ্গের অধিবাসী পাল-যুগে নিজ ভাষা সম্বন্ধে সাত্মাভিমান হইয়া উঠে, ভাষাগত জাতীয়তা-বোধের দ্বারায় অণুপ্রাণিত হয়। ভাষাগত জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ দেখা যায়, ইউরোপের ছোঁয়াচে, উনিশের শতকে, এবং বিংশ শতকেই এই বস্তুটি ভারতবর্ষময় বিভিন্ন প্রান্তিক ভাষাকে অবলম্বন করিয়া প্রাদেশিক জাতীয়তারূপে দেখা দিতেছে—ইংরেজিকে বা হিন্দিকে লইয়া যে নিখিল-ভারতীয় মহাজাতি গঠনের প্রয়াস চলিয়াছে, এই প্রাদেশিক জাতীয়তা ভাব-জগতে ও কর্ম-জগতে তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতেছে।

কিন্তু বাঙালির মধ্যে ভাষাগত এবং প্রদেশগত জাতীয়তাবোধ অন্য প্রদেশের চেয়ে আগে আগে আসিয়া গিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। পূর্ব-পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মালব, মধ্যভারত, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার—এই বিরাট ভূখণ্ডে ভাষাগত জাতীয়তাবোধ যেভাবে বাংলা দেশে জাগিয়া উঠিয়াছে সে ভাবে কখনও দেখা দেয় নাই ; রাজপুতানার অধিবাসীর, পাঞ্জাবীর, পূর্বী হিন্দি ভাষীর ভোজপুরিয়ার, মগহিয়ার, মৈথিলের মনে নিজ মাতৃভাষার সম্বন্ধে বোধ বা দরদ নাই, সকলেই দিল্লি অঞ্চলের ভাষা হিন্দুস্থানীকে (হিন্দি বা উর্দুকে) মানিয়া লইয়াছে। বাংলায় কিন্তু ইহার বিপরীত—অন্তত শিক্ষিত লোকদের সম্বন্ধে। আমরা হিন্দু যুগে উত্তর-ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে অংশগ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু তাহার পরে তুর্কি বিজয় হইতে আকবর কর্তৃক বাংলা দেশ জয় পর্যন্ত ১২০০ হইতে ১৫৭৫ পর্যন্ত পৌনে চারিশত বৎসর ধরিয়া, পৃথক রাষ্ট্র হিসাবেই আছি ; মোগল বাদশাহদের আমলকে মোগল সাম্রাজ্যের কেন্দ্র দিল্লি আগরার সহিত সংযুক্ত হইলেও আমাদের দেশ এক টেরে পড়িয়াছিল—উত্তর ভারতের নাগরিক সভ্যতার সহিত আমাদের তেমন যোগ ছিল না ; পৃথকভাবে আমরা মধ্যযুগে আমাদের পল্লিসমাজ এবং গ্রামীণ সভ্যতা গড়িয়া তুলিতেছিলাম। ইংরেজ আমলে আমরা ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে ইংরেজের অনুচর হিসাবে একটু পাণ্ডাগিরি করিবার সুযোগ পাইলাম—সমগ্র বঙ্গভাষী জাতি একই শাসনের অন্তর্ভুক্ত থাকায়, আমাদের ভাষাগত ঐক্য-বোধ আমাদের জাতীয় চেতনায় একটি স্থান করিয়া লইল। বঙ্গভঙ্গের বিপদে সেই বোধ আরও সুদৃঢ় হইল। রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বে তাহা আমাদের প্রধান গৌরবের বস্তু হইয়া দাঁড়াইল।

ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার পক্ষে বাংলা ভাষার দাবি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দারভাঙা সৌধে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তির পাদপীঠে যে উক্তি উৎকীর্ণ আছে : His noblest achievement, the surest of all. The place for his mother-tongue in step-mother's hall—তাহা হইতে মাতৃভাষা সম্বন্ধে বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালির মনোভাব বুঝিতে পারা যাইবে। বাঙালিই প্রথমে বিমাতা ইংরেজির ঘরে তাহার মাতৃভাষার স্থান করিয়া দিয়াছে—প্রথমেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষাকে বি-এ পরীক্ষা পর্যন্ত অবশ্য পাঠ্য বিষয় করা হয়, এম-এ পরীক্ষার জন্য আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির স্থান করা হয় ; বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষা পি-এইচ-ডি-র জন্য মৌলিক গবেষণা প্রণয়ন কার্যে বাংলা ভাষার দাবিকে কার্যত স্বীকার করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার বাহনরূপে বাংলা প্রভৃতি চারটি ভাষাকে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বাঙালির মাতৃভাষা প্রীতির অনুকরণ দেখা যাইতেছে।

বাহির হইতে দেখিলে, বাংলা ভাষার বেশ বাড়-বাড়ন্ত অবস্থা। এই ভাষায় যুগোপযোগী সাহিত্য রচিত হইতেছে, ইহার অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তির আবাহন হইতেছে ; বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার গৌরবময় স্থান হইল। বাংলা ভাষা পাঁচ কোটির অধিক লোকের মাতৃভাষা—পৃথিবীর সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠ জনগণের ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষার স্থান সপ্তম ভাবের স্ফুরণে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষার গৌরব সম্বন্ধে আমরা এতটা স্থিরনিশ্চয় হইয়াছি যে, সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার জন্য বাঙালির দাবি যে আর সব ভাষার আগে, এ কথাও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি।

কিন্তু বাংলা ভাষায় সমক্ষে একটি ঘোর বিপদের ছায়া আসিয়া পড়িতেছে—তদ্দ্বারা হয়ত আমাদের এক এবং অখণ্ড বাংলা ভাষা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িবে। আমার মনে হয়, নিখিল ভারতের রাষ্ট্রভাষাপদবীর জন্য বাংলার দাবি উত্থাপন অপ্রাসঙ্গিক ; এবং হিন্দি অথবা হিন্দুস্থানী কবে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইয়া বাংলা ভাষার হানি করিবে, তজ্জন্য আমাদের কাহারও কাহারও মনে যে দুশ্চিন্তা দেখা দিতেছে, তাহাও নিতান্ত অসাময়িক এবং অমূলক ভীতিপ্রসূত। ভারতের রাষ্ট্রভাষার প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা এক্ষেত্রে আমাদের বিষয় বহির্ভূত হইবে, সুতরাং পূর্ণভাবে সে আলোচনা হইতে নিবৃত্ত রহিলাম। প্রথমত, প্রসঙ্গক্রমে এই কথা বলিতে চাহি যে, ইংরেজিকে বাদ দিয়া অন্য কোনও ভাষাকে তাহার স্থানে বসাইতে গেলে আমাদের মানসিক ক্ষতি ঘটিবে। 'রাষ্ট্রভাষা' বলিতে কি বুঝিব, তাহা লইয়াও বিচার চলে। যদি রাষ্ট্রভাষা অর্থে ভারতের ইংরেজি অনভিজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে সাধারণ প্রয়োজনের তাগিদে মেলামেশার ভাষা, বাজারু

ভাষা বুঝি, তাহা হইলে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে এক প্রকার সহজ ব্যাকরণদুষ্ট চলতি হিন্দুস্থানী বহুদিন হইতেই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি উহার অতিরিক্ত আরও কিছু বুঝি, নিখিল ভারতের জনগণের মধ্যে মাতৃভাষার অতিরিক্ত একটি Culture Language অর্থাৎ সংস্কৃতিবাহী সৎসাহিত্যের ভাষা বুঝি, তাহা হইলে দেবনাগরীতে লেখা সংস্কৃত শব্দবহুল শুদ্ধ হিন্দীকে মানিব, কিংবা ফারসি হরফে লেখা আরবি-ফারসি শব্দবহুল শুদ্ধ উর্দুকে মানিব ; কিংবা ব্যাকরণশুদ্ধ সাহিত্যিক হিন্দি এবং কেতাবি উর্দু, অথবা অশুদ্ধ ব্যাকরণ বাজারচলতি হিন্দুস্থানীর আধারে নতুন করিয়া গড়া ভবিষ্যতের গর্ভে কোনো অভিনব অপ্রাপ্তরূপ সাহিত্যের ভাষাকে মানিব ; তাহা স্থির করিয়া লইতে হইবে। হিন্দি উর্দু হিন্দুস্থানীর প্রশ্ন আমাদের কাছে কতকটা দূরের বস্তু ; আবার হিন্দি উর্দুর ঝগড়া, ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষা হিন্দু হিন্দুস্থানীতে আরবি-ফারসি শব্দ বেশি থাকিবে কি সংস্কৃত শব্দ বেশি থাকিবে, ইহা আমাদের ভাষায় নতুন করিয়া দেখা দিতেছে এমন কতকগুলি সমস্যার সহিত সম্পৃক্ত। হিন্দুস্থানীকে (হিন্দি উর্দুকে) পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত, সংযুক্ত-প্রদেশ, বিহার, আংশিকভাবে গুজরাট, ভারতের এই কয়টি প্রদেশের লোকেরা, সাহিত্যের ভাষা বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। এই সমস্ত প্রদেশের অনেকের ইচ্ছা, হিন্দুস্থানী ভাষা (উর্দুরূপে হউক বা হিন্দিরূপে হউক) ভারতের অন্য প্রদেশের লোকদিগকে শিখানো হইবে—তাহারা যদি স্বেচ্ছায় শিখিতে না চাহে, তাহা হইলে জোর করিয়া শিখানো হইবে। মাদ্রাজে এই জবরদস্তী নীতি ইতিমধ্যে অনুসৃত হইতেছে, তাহার ফলে মাদ্রাজে তামিলভাষীদের মধ্যে বিক্ষোভ এবং হিন্দি বিরোধী সত্যাগ্রহের কথা প্রতিদিন সংবাদপত্রে আমরা পড়িতেছি। এইরূপে জোর করিয়া অনিচ্ছুক প্রজার ঘাড়ে আর একটি ভাষা চাপানো ঘোর অত্যাচার—এই Linguistic Imperialism বা ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যেকেরই বিদ্রোহ করা উচিত। হিন্দুস্থানী (হিন্দি বা উর্দু) যাহাদের মধ্যে পূর্ব হইতেই শিক্ষা ও সাহিত্যের ভাষা বলিয়া গৃহীত হয় নাই এমন ভারতীয় জনগণের মধ্যে যদি অবশ্যপাঠ্য বলিয়া নির্দেশ করা হয়, তাহাদের যদি হিন্দুস্থানী পড়িতে বাধ্য করিবার কথা মনে হয়, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে যাহারা হিন্দুস্থানী মাতৃভাষা বা সাহিত্যের ভাষারূপে ব্যবহার করিতেছে তাহাদের মধ্যে অন্য একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা (তাহাদের রুচি ও সুবিধা মতো বাংলা, মারাঠি, গুজরাটি, উড়িয়া, তেলেগু, তামিল, কানাড়ি, মালয়ালম্, যাহাই হউক না কেন) বাধ্যতামূলক করিয়া দেওয়া উচিত; অন্যথা, শিক্ষাজীবনে এবং জীবনের প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানীওয়ালাদের অনুচিত এবং পক্ষপাতপূর্ণ সুবিধা দেওয়া হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানী ভাষা হিন্দুস্থানী ব্যবহারকারী ছাত্রদের মধ্যে বিহার, সংযুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে আর একটি ভারতীয় ভাষা ব বাধ্যতামূলক করা না হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত অন্য প্রদেশের ছাত্রদের উপরে হিন্দুস্থানী চাপানোর বিরুদ্ধে আমাদের যথাশক্তি লড়িতে হইবে।

বাংলা ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিবার আকঙক্ষা কেহ কেহ প্রকট করিয়াছেন। আমাব মাতৃভাষা ভারতের আন্তঃপ্রাদেশিক হউক ; ভারতের প্রধান ভাষা হউক, ইহা কোন্ বাঙালির অনভীপ্সিত ? কোন্ বাঙালি ইহাতে খুশি হইবে না ? কিন্তু এই ইচ্ছা কতদূর কার্যে পরিণত হইতে পারে, তাহা বিচারসাপেক্ষ ; কেবল মাতৃভাষার প্রতি প্রীতির বশে, মাতৃভাষার ও তাহার সাহিত্যের গৌরব লইয়া উচ্ছ্বাস করিলে চলিবে না। নাথ-পন্থ, সহজিয়া-পন্থ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ অবলম্বন করিয়া প্রাচীন ও মধ্যযুগে, খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষে ও ষোড়শ শতকের পরে, বাংলার বাহিরে বাংলা ভাষা কিছু প্রসার লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা অতি সীমাবদ্ধরূপে। কিন্তু পশ্চিমের লোকেরা আবহমানকাল ধরিয়া বাংলায় আগমন করিতেছে, তাহাদের ভাষার প্রভাব বাংলা ভাষার উপর আসিয়াছে। ভাষা প্রসার লাভ করে, কেবল তাহার সাহিত্যের জন্য নহে ; যাহারা কোনো ভাষা ব্যবহার করে, তাহাদের প্রসারশক্তি, কর্মশক্তি এবং অধিকারশক্তির উপরে সেই ভাষার প্রসার নির্ভর করে ; সঙ্গে সঙ্গে যদি সেই ভাষা সরল ও সবল হয়, বিদেশির দ্বারা সহজে যদি আয়ত্ত করা যায় এবং মানসিক অথবা ভাবজগৎ সম্পৃক্ত সংস্কৃতির বাহন যদি হয়, তাহা হইলে তো কথাই নেই। কর্ম এবং সংহতি শক্তিযুক্ত উৎসাহী পাঞ্জাবি মারোয়াড়ি হিন্দুস্থানী বিহারিরাই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া সহজেই হিন্দি বা হিন্দুস্থানী ভাষার প্রসার ঘটাইতেছে ; বাঙালি সেভাবে ছড়াইতে পারে নাই—দুই দশ জন চাকুরিজীবী, কেরানি বাঙালির ততটা শক্তি নাই যে, বাংলার বাহিরে নিজ মাতৃভাষার কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে ; বাঙালি কখনও সেদিকে কোনো চেষ্টাও করে নাই। বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, এক-আধজন গুজরাটি, হিন্দুস্থানী, মারাঠা, তেলেগু, কানাড়ি বা মালয়ালি বাঙলা শিখিতে পারেন, কিন্তু সেরূপ শেখার দ্বারা বাংলা ভাষার প্রসার ঘটিয়াছে বলা যায় না। এতদ্ভিন্ন, সরল হিন্দুস্থানীর তুলনায় বাংলা অপেক্ষাকৃত কঠিন ভাষা ; বাংলার ব্যাকরণ সরল বটে, কিন্তু ইহার বাক্যভঙ্গী, ইহা সাধু ও চলিত দুই রূপ এবং ইহার উচ্চারণ রীতি বাংলা ভাষাকে অ-বাঙালির পক্ষে নিতান্ত দূরধিগম্য করিয়া রাখিয়াছে। বাংলার বাহিরে প্রায় সমগ্র ভারতে সংস্কৃত শব্দের যে সাধু উচ্চারণ প্রচলিত আছে, তাহা বর্জন করিয়া বাঙালির মতো সংস্কৃত উচ্চাবণ অ-বাঙালি কেহ করিবে কিনা সন্দেহ ; অ-বাঙালির সুবিধার জন্য বাঙালি যে তাহার ভাষার উচ্চারণ বদলাইবে, তাহাও অসম্ভব। তা ছাড়া সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া হিন্দি বা হিন্দুস্থানী ভাষার ঝঙ্কার সকলেরই কানে পৌঁছিতেছে, বাংলার সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। মারাঠী গুজরাতির মতো বাংলা যদি দেবনাগরী অথবা দেবনাগরীর বিকারজাত কোনও লিপিতে লিখিত হইত, তাহা হইলে হিন্দির সঙ্গে বাংলা কতকটা পাল্লা দিতে পারিত। বাংলা ভাষার রাষ্ট্রভাষারূপে সমগ্র ভারত কর্তৃক গ্রহণের যে কতকগুলি দূরপনেয় বা অনপনেয় অন্তরায় আছে, তাহা আমাদের

জানিয়া রাখা উচিত।

বাঙলা ভাষাকে দ্বিখণ্ডিত করিবার প্রয়াস

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন অপেক্ষা আরও গুরুতর ব্যাপার হইতেছে, বাংলা ভাষাকে নূতনতর দ্বিখণ্ডিত করিবার আকাঙ্ক্ষা। হাজার বছর ধরিয়া বাংলা ভাষা বিদ্যমান—বাংলা ভাষার প্রারম্ভ হইতে এখন পর্যন্ত শত শত বঙ্গদেশীয় কবি, মনীষী ও সুলেখক এই ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া বিরাট করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন।

অন্য পাঁচটি প্রাকৃতজাত ভাষার মতো , বাংলা ভাষা তাহার প্রাকৃতজাত শব্দাবলি অবলম্বন করিয়া রূপগ্রহণ করিয়াছিল ; সেই শ্রেণির প্রাকৃত শব্দ এখনও বাংলায় বিদ্যমান থাকায় বাংলা ভাষার বাংলাত্ব। বাংলা ভাষার পিছনে আছে তাহার মাতামহী সংস্কৃত ভাষা ; যেন সংস্কৃতের কোলেই বাংলার জন্ম ও পরিপুষ্টি এবং তদনন্তর সব বিষয়ে অনুপ্রাণনা লাভ। প্রাকৃত যুগ হইতেই যখনই নতুন শব্দের আবশ্যক হইয়াছে, যেখানে খাঁটি প্রাকৃত ধাতু প্রত্যয় দ্বারা শব্দ-গঠন সুষ্ঠু হয় নাই, বিনা দ্বিধায় সংস্কৃত হইতে শব্দ গৃহীত হইয়াছে ; বাংলা ভাষার আদি যুগ হইতে সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষায় আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। সংস্কৃতের অক্ষয় শব্দ ভাণ্ডার চিরকালই বাঙলার নিকট উন্মুক্ত ; সংস্কৃত যে একটা পৃথক ভাষা, সংস্কৃতের শব্দসম্ভার যে বাঙলার শব্দসম্ভার হইতে ভিন্ন এ ধারণা সে দিন পর্যন্ত বঙ্গভাষীর মনে উদিত হয় নাই—এখনও অনেক বাঙালির মনে এ ধারণা স্থান পায় নাই। চর্যাপদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার সমস্ত লেখক, এতাবৎকাল পর্যন্ত প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া, সহজভাবে মাতৃভাষা বাংলার সহিত সংস্কৃতের নাড়ীর টান মানিয়া লইয়া,—সংস্কৃতের বিকারে বাংলা, অতএব বাংলার শুদ্ধতর পূর্ণতর রূপই হইতেছে সংস্কৃত এই বিচারে এবং সংস্কৃতের শব্দসম্পৎ উত্তরাধিকারসূত্রে নিঃসংশয়ে বাংলারই এই বোধে, বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ আমদানী করিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে হয়ত, বাংলা ভাষার একটু হানি হইয়াছে—ঐশ্বর্যশালী সংস্কৃতের উপর শব্দ দানের ভার অর্পণ করিয়া বাংলা ভাষা ততটা নিজের পায়ে দাঁড়াইবার কথা মনে রাখে নাই, বাংলা অনেকটা পরমুখাপেক্ষী, সংস্কৃতের প্রসাদ-পুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান তাবৎ কবিদের দ্বারা এই রীতি অনুসৃত হইয়াছে। চর্যাপদের সিদ্ধা কবিরা ; বড়ু চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস, মালাধর, বিপ্রদাসাদি চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কবিগণ ; বৈষ্ণবচরিত রচয়িতৃগণ, মহাজন পদকারগণ ; কবিকঙ্কন, কাশীরাম, আলাওল ; মাণিক গাঙ্গুলি, ঘনরাম, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র ; রামমোহন রায়, ভবানীপ্রসাদ ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রঙ্গলাল, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব ; গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল ; রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, আধুনিক মুসলমান লেখকগণের মধ্যে মীর মুশারফ হোসেন,

মৌলানা আকরাম খাঁ এবং অন্যান্য গদ্য লেখক ও কবি—বাংলা সাহিত্যের এই সমস্ত ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ লেখক, ইঁহাদের কেহ বাংলা ভাষার শব্দস্রোতের স্বাভাবিক উৎসকে বিস্মৃত হন নাই ; হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই এতাবৎ মিলিতভাবে একই মাতৃভাষার সেবা করিয়া আসিয়াছে। 'প্রবাসী' ও 'মাসিক মোহাম্মদী' বাংলা ভাষার নিদর্শন হিসাবে এখনও মোটের উপর তুল্যমূল্য। এই ভাষা সাম্য, ইহা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি জাতির প্রতি ভগবানের এক বিশেষ করুণা বলিয়া মনে করি। উত্তর-ভারতে একই হিন্দুস্থানি ভাষা কেবল বর্ণমালা এবং ভাষান্তর হইতে আনীত শব্দাবলির পার্থক্য হেতু, এক ব্যাকরণ এবং এক সাধারণ প্রকৃতি ও সাধারণ শব্দসম্ভার সত্ত্বেও, হিন্দি ও উর্দু এই দুই প্রতিস্পর্ধীরূপে দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। মুখ্যত বাঙালি হিন্দু বাংলা ভাষার সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছে। সেইজন্য এই সাহিত্যে বাংলার হিন্দু সংস্কৃতির অর্থাৎ বাংলা দেশের মুসলমান পূর্ব যুগের সংস্কৃতির ছাপ বেশি করিয়া পড়িয়াছে। মুসলমান লেখক যাঁহারা বাংলায় লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা না করিলে বিদেশি শব্দের আমদানি করিতেন না। বাংলা ভাষার কাঠামো বদলাইতে কেহ কখনও চেষ্টা করে নাই, তাহার উপরের সাজস্বরূপ শব্দাবলিরও ব্যাপকভাবে পরিবর্তনের চেষ্টা এতাবৎ হয় নাই। বাংলা দেশের মুসলমানগণের মধ্যে, নিতান্ত অল্পসংখ্যক পশ্চিম হইতে আগত মুসলমানদিগের বংশধরদিগকে বাদ দিলে (এবং এই মুসলমানদের পশ্চিম হইতে প্রথম আগত পিতৃকুল বাংলার বাহিরের হইলেও, পুরুষের পর পুরুষ ধরিয়া মাতৃকুল প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই এ-দেশীয়) শতকরা নব্বইয়ের উপর মুসলমান বাঙালি—হিন্দুদের সঙ্গে সমান ভাষায়, রক্তে, বংশগত মানসিক গুণ ও অবগুণে। তুর্কিদের দ্বারা বাঙলা দেশ বিজিত হইল, তুর্কি বীরের দল এদেশেই রহিয়া গেলেন ; যুদ্ধবিজয়ী ফৌজের দলে স্বদেশীয় স্ত্রীলোক বেশি থাকে না, যে দেশ তাহারা জয় করিয়া বাস করিতে থাকে সেই দেশেরই লোকদের ঘর হইতে তাহাদিগকে মেয়ে লইতে হয়। এইভাবে তুর্কি ও তাহার পরে পাঠান এবং পাঞ্জাবি ও হিন্দুস্থানি মুসলমান (ইহারা রক্তে পুরোপুরি ভারতীয়), তিন চারিপুরষের মধ্যে বাঙালি বনিয়া গেল—ভাষায়, রক্তে, চিন্তারীতিতে। মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত জাত-বাঙালিদের তো কথাই নাই।

ভারতীয় ভাষাব সংস্কৃত শব্দাবলিতে কখনও কোনো প্রাচীন মুসলমান লেখকের আপত্তি হয় নাই। আরবি ফারসি শব্দ যাহা আসিয়াছে, তাহা ধীরে ধীরে আসিয়াছে, সাহিত্যের উপরে জবরদস্তী করিয়া আনা হয় নাই। উর্দু ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিলেই এই বিষয়টি স্পষ্ট দেখা যায় উর্দু কবিতার আরম্ভ হয় দাক্ষিণাত্যে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে দক্ষিণের প্রাচীন উর্দু কবিতার ভাষা আর ; তখনকার দিনের হিন্দি কবিতার ভাষা, দেশি হিন্দি আর সংস্কৃত শব্দ প্রায় সমান ভাবেই ব্যবহার করিয়াছে বাংলা দেশে কতকগুলি মুসলমান লেখক এখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে 'ইসলামীয়' করিতে

চাহিতেছেন। উর্দু ভাষায় যে আরবি ফারসি শব্দের বাহুল্য বর্তমানে দেখা যায়, তাহা ইঁহাদের কাহারও কাহারও কাছে বাংলা ভাষাতেও কাম্য এবং অনুকরণীয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইঁহারা দুইটি কথা ভুলিয়া যান। প্রথমত, ভাষার শব্দ হইতেছে বস্তু, ক্রিয়া বা ভাবের প্রতীক ; শিক্ষা ও সংস্কৃতি দ্বারা আমাদের ভাব উন্নত বা বিশুদ্ধ অথবা কোনো ইপ্সিত মতবাদের অনুসারী হইয়া দাঁড়াইলে, শব্দ পুরাতন হইলেও নূতন ভাবকে গ্রহণ করে। ইংরেজি God শব্দ মূলত সংস্কৃত 'হুত' শব্দেরই প্রতিরূপ God এবং 'হুত' উভয় শব্দ আদিম আর্য (ইন্দো-ইউরোপীয়) * ghuto শব্দ হইতে জাত, ইহার অর্থ, 'যাঁহার জন্য আহুতি দেওয়া হয় ; এক্ষণে ইংরেজিতে God শব্দের এই মৌলিক অর্থ কোথায় তলাইয়া গিয়াছে, যিনি আহুতির অপেক্ষা রাখেন না। এমন খ্রিস্টান ঈশ্বরের ভাব এই God শব্দ এখন প্রকাশ করে। ফারসির 'খোদা' শব্দ মূলত সংস্কৃতের 'স্ব-ধা' শব্দের ইরানীয় প্রতিরূপ হইতে জাত—ইহার অর্থ, 'যিনি নিজে কার্য করেন বা শক্তি প্রকাশ করেন ; ইহা আরবি 'অল্লাহ' শব্দের ফারসি প্রতিশব্দ হইয়া গিয়াছে ; আবারু কলিকাতায় চিনাদের মুখে যে 'বাজারু' হিন্দুস্থানী প্রচলিত, তাহাতে 'খোদা' শব্দ যে কোনো দেবতা, ঠাকুর বা মূর্তি অর্থে ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দুর কালীমূর্তি কলিকাতার চিনার কাছে 'খোদা', আবার তাহার নিজের ধর্মের দেবতা বা মূর্তি ও 'খোদা'। ইংরেজের God মুসলমানের খোদাকেও ওই নামে সে অভিহিত করে।

নানা ভাষা হইতে বহু দৃষ্টান্ত দিয়া দেখা যায়, প্রচলিত একটা ভাষায় তাহার পুরাতন শব্দের রূপ না বদলাইয়া, ভাব বদলাইতে পারা যায় ; এবং তাহা সহজ ভাবেই ঘটিয়া থাকে। অন্যথা ফরমাইশ মতন তাড়াতাড়ি কিছু করিতে গেলে, নানা রকমের বিভ্রাট সৃষ্টি হয় ; শব্দ নূতন হইলেও, লোকের মনের সংস্কৃতি বা চিন্তাপ্রণালী পূর্ববৎ থাকিলে, নূতন শব্দেরই অর্থ বিকৃত হয়। 'গুরু' বা 'শিক্ষক' স্থানে 'ওস্তাদ', 'মারা গেলেন' বা 'দেহত্যাগ করিলেন' স্থলে 'এন্তেকাল ফর্‌মাইলেন', 'বিচার' স্থলে 'এন্‌সাফ', 'সেবক' স্থলে 'খাদেম', 'মানুষ' স্থলে 'এনছান' অর্থাৎ 'ইন্‌সান্' 'মাতা-পিতা' স্থলে 'ওয়ালিদায়েন', 'গুরুজন' স্থলে 'বুজুর্গান্', ঈশ্বর-দত্ত' বা 'ভগবানের দেওয়া' স্থলে 'খোদাদাদ', 'কবিত্ব' স্থলে 'শাইরী', এইরূপ বিদেশি শব্দ প্রয়োগে, ভাষা অর্ধেকের উপর বাঙালির কাছে দুর্বোধ্য হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় কথা এই যে, ভাষাকে আরবি ফারসি শব্দে ভরপুর করিয়া না দিলে, সেই ভাষা যাহারা বলে তাহাদের ইসলামী প্যাকাপোক্ত হয় না, এইরূপ এক অনৈতিহাসিক এবং হানিকর ধারণার বশবর্তী ইঁহারা হইয়াছেন। বাঙালি মুসলমান বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধারণ সংস্কৃত শব্দ বুঝে, অনেক স্থলে আরবি ফারসি শব্দের অর্থ তাহাকে বাঙালি হিন্দুর মতোই জানিয়া লইয়া তবে বুঝিতে হয়। এই জন্যই সহজে উচ্চ-শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানগণ তাঁহাদের মধ্যে মাতৃভাষার চর্চার উদ্দেশ্যে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' করিয়াছেন, তাঁহারা এই সমিতির ফারসি নামকরণ করেন নাই—'আঞ্জুমান

এ ইসলামিয়া বরায় তরক্কীএ আদব-এ-বাংলা'। প্রথম তুর্কি-বিজয়ের যুগে গজনার সুলতান মহমুদ প্রমুখ তুর্কি রাজারা ভারতবর্ষে অনেকবার বিজয় অভিযান করিয়াছিলেন, পাঞ্জাবকে তাঁহারা গজনার সাম্রাজ্যের অংশীভূত করিয়া লইয়াছিলেন—তাঁহারা 'বুৎ-শিকন' বা 'মূর্তিধ্বংসী' ছিলেন, কিন্তু 'জবান-শিকন' বা ভাষা-ধ্বংসী হন নাই। গজনার সুলতানেরা ভারতীয় প্রজাদের জন্য প্রথম যে সকল মুদ্রা জাহির করেন, সেগুলির মধ্যে তাঁহারা মুসলমান ধর্মবীজ কলমা-মন্ত্র 'লা ইলাহ্-ইল্লাল্লাহ ব্যতীত ইলাহ্ বা উপাস্য নাই, মুহম্মদ অল্লাহের রসূল, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেরিত), ইহার দেশীয় অনুবাদ করাইয়া ভারতীয় মুদ্রায় চাঁদয়া ছিলেন—'অব্যক্তম্ একম্, মুহম্মদ অবতার ; তারিখ দিয়াছেন হিজিরার অব্দে, কিন্তু 'হিজিরা' অর্থাৎ মক্কা হইতে নবী মুহম্মদের পলায়নের বছর হইতে যে সংবতের উৎপত্তি তাহার ভারতীয় অনুবাদ করেন 'জিনায়ন'—অর্থাৎ মুহম্মদ, যেন বুদ্ধ ও মহাবীরের দরের 'জিন' বা জেতা—তাঁহার 'অয়ন' বা গমনের তারিখ। এখন 'হিজিরাকে' কোনো ভারতীয় মুসলমান 'জিনায়ন' বলিতে চাহিবে কি? 'অব্যক্ত এক, মুহম্মদ অবতার'—ইহা অবশ্য কলমার ঠিকঅনুবাদ নহে, কিন্তু এই অনুবাদের চেষ্টা হইতে তখনকার মনোভাব বুঝা যায়। ঔরঙ্গজেব বাদশাহের পুত্র রাজকুমার আজম পিতার নিকটে কতকগুলি অতি উৎকৃষ্ট আম পাঠাইয়া দেন, পিতাকে অনুরোধ করেন ওই জাতীয় আমের যেন একটি করিয়া নাম তিনি ঠিক করিয়া দেন ; ভারতে মুসলমানগণের মধ্যে রাজর্ষিরূপে সম্মানিত ঔরঙ্গজেব আলমগীর বাদশাহ এই আমের নাম রাখেন, ভারতের সকলের বোধ্য সংস্কৃত শব্দ দিয়া—'সুধারস' এবং 'রসনা-বিলাস' ('রোক্কা-আৎ-এ-আলমগিরী', নয়ের সংখ্যার চিঠি)। গান্ধিজির প্রস্তাবিত লোকশিক্ষার বিধি প্রবর্তিত করিবার জন্য যে-সব স্কুল স্থাপিত করা হইতেছে সেগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে 'বিদ্যামন্দির'—'বিদ্যা' এবং 'মন্দির' এই দুইটি শব্দ উর্দুওয়ালারাও বুঝিবেন, কিন্তু এই নাম সংস্কৃত ভাষার শব্দে গঠিত বলিয়া কতকগুলি মুসলমান আপত্তি করিলেন—তাঁহারা আরবি নাম 'বৈতু-ল্-ইলম্' না হইলে প্রস্তাবিত বিধির বিরোধিতা করিবেন। ওদিকে ভারতের বাহিরে তুর্কিস্তানে ও পারস্যদেশে মুসলমান সাহিত্যিক মহলে চেষ্টা চলিতেছে, তুর্কি ফারসি ভাষাদ্বয়কে খাঁটি তুর্কি ও ফারসি ভাষা করিয়া তোলা,—তুর্কি হইতে আরবি ফারসির, এবং ফারসি হইতে আরবির শব্দ বহিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে। পারস্যের রাজধানী তেহ্‌রান-এর বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন নাম ছিল আরবি ভাষায়—দাবি ল রু-উলুম, এখন এই নাম বদলাইয়া ফারসি আর্য-ভাষার শব্দ দিয়া নূতন নাম হইয়াছে, 'দানিশ গাহ', তুর্কিস্থান ও ইরান এতদিন ধরিয়া বিদেশি শব্দের সাধনা করিতেছিল, এখন তাহার মোহ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতেছে। ভারতে মুসলমান শাসনের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় প্রথম যুগে, এবং মোগল-যুগে, এই মোহ ভারতীয় মুসলমানদের ততটা আবিষ্ট করে নাই ; অবস্থাগতিকে ফারসি খুব বেশি করিয়া উত্তর ভারতে রাজ-ভাষা, রাষ্ট্র-ভাষা, দফতরের ভাষা এবং সংস্কৃতির ভাষা থাকায়,

ফারসির প্রভাব 'মুসলমানী হিন্দি' বা উর্দুতে গভীরভাবে পড়িয়াছে। কিন্তু এখন উর্দু ভাষাতেই নবীন কতকগুলি মুসলমান লেখক দেখা দিয়া দিয়াছেন, যাঁহারা উর্দুর বিদেশি আরবি-ফারসি শব্দাবলি কমাইয়া দিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছেন, যুগোপযোগী প্রচেষ্টা বাংলার বাহিরে আরম্ভ হইয়ছে ; পশ্চিমের মুসলমান লেখকগণের মধ্যে ভাষা-বিষয়ে নির্বিচারে আরবি-ফারসি শব্দ গ্রহণের রীতিকে বর্জন করিবার কথাও উঠিয়াছে; কেবল বাংলা ভাষাতেই কি সেই রীতি নূতন করিয়া গৃহীত হইয়া, বাঙালি জনসাধারণকে ধাঁধায় ফেলা হইবে, এবং পাঁচ কোটির উপর লোকের দুর্লভ ভাষাগত ঐক্যকে স্বেচ্ছায় বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে?

বাংলা ভাষার প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করিতে গেলে, এই ভাষার উপরে ভীষণ এক জুলুম হইবে—এবং এই পরিবর্তন দুই এক পুরুষে সম্ভব হইবে না। পুরাতনকে মুছিয়া ফেলিয়া আবার নূতন এক ধারা গড়িয়া তুলিতে হইবে। সেরূপ নূতন কিছু গড়িয়া তুলিবার মতো কল্পনা ও শক্তি এবং মানসিক প্রবণতা, 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ইসলামীয় করিয়া ফেলিতে হইবে' এই মত যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহাদের আছে কি না জানি না ; কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে, যেখানে laissez faire অর্থাৎ যা খুশি তাই করো নীতি অবাধে চলিতেছে, সেখানে এই প্রকার মানসিক শক্তি এবং কল্পনায় পরিচয় বাংলা ভাষায় কেহ এখনও দেখান নাই। আরবি-ফারসি বহুল বাংলায় যেখানেই শক্তিশালী মুসলমান লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে, সেখানেই তাঁহার সমাদর হিন্দুমুসলমান-নির্বিশেষে সকল বাঙালির নিকটেই হইয়াছে, বাঙালি হিন্দুর কাছেও তাঁহার জনপ্রিয় হইতে বাধা ঘটে নাই। শ্রীযুক্ত কাজি ইমদাদুল হক সাহেবের আব্দুল্লাহ্-এর মতো উপাদেয় সামাজিক উপন্যাসে স্থানে স্থানে যে আরবি ফারসি মিশ্র বাংলা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে কোনো হানি হয় নাই, বরঞ্চ তাহার দ্বারা বাস্তবের যথার্থ অনুকরণ হইয়া রস-সৃষ্টিতে সহায়তা হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও আরবি-ফারসি-মিশ্র বাঙলা, কবি প্রসঙ্গক্রমে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং সে সম্পর্কে তিনি যে অভিমত দিয়াছেন তাহা সকল সাহিত্যিক মানিয়া লইবেন—যে হৌক সে হৌক ভাষা—কাব্য রস লয়ে—'

বিগত শতকের মধ্যে কলিকাতায় মুদ্রিত মুসলমানি কেচ্ছা-সাহিত্যের যে একটা খিচুড়ি বাংলা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, যাহা প্রাচীন মুসলমান লেখকগণের ধারাকে অনুসরণ করে না, বাংলা দেশের কোনো অঞ্চলের মুসলমানদের বা হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত মৌখিক ভাষার সঙ্গে যাহার কোনো সংযোগ নাই, যাহার মধ্যে বিশেষ কৃত্রিমতার সঙ্গে অনাবশ্যক ভাবে উর্দুর শব্দ ও বাক্যরীতির প্রয়োজন করা হয় (যথা-'তেরা পাঙ' অর্থাৎ 'তোমার পা', 'দেলের বিচেতে' = 'মনের মাঝে', পয়দা করে জাহান' = 'জগৎ সৃজন করে', 'এছা, জেছা, তেছা' = এমন, যেমন, তেমন, ইত্যাদি)—সেই কেচ্ছা-সাহিত্যের ভাষাকে কেহ কেহ

মুসলমান বাঙালির ভবিষ্যৎ সাহিত্যের ভাষা-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। যদি এই ভাষায় শক্তিশালী লেখক দেখা দেন, তাহা হইলে বিশ্বজগৎ ইহাকে মানিয়া লইতে বাধ্য হইবে। কিন্তু যাঁহারা ইহার প্রকৃতি আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে এই ভাষা, সাহিত্য-বোধ এবং ভাষা-জ্ঞান, উভয় বিষয়েই অক্ষমতার পরিচায়ক। বাংলা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে, হিন্দু এবং মুসলমানের লেখা পুরাতন বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় নাই, যাঁহাদের প্রধান সম্বল অল্প সল্প আরবি ফারসি ও উর্দু, এনে শক্তিহীন পেশাদার লেখকের হাতে এই আরবি-ফারসি-মিশ্র কেচ্ছা-সাহিত্যের বাংলা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহা খাঁটি বাংলাও নহে, শুদ্ধ উর্দুও নহে,—'ন ঘর-কা, ন ঘাট-কা'। কেচ্ছা-সাহিত্যের বাহিরে, মুসলমান-ধর্মসংক্রান্ত কিছু কিছু পুস্তক এই ভাষায় লিখিত হইয়াছে—তাহাতে আরবি ফারসি শব্দের অবাধ প্রবেশের অজুহাত অনেকে দেখিয়াছেন।

কীরূপে সমাধান সম্ভব

এক্ষেত্রে অনুযোগ অভিযোগ উপরোধে কিছু কার্য হইবে বলিয়া মনে হয় না—বিষয়টি হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণের সহজ বুদ্ধির উপরে ছাড়িয়া দিতে হইবে। তবে এই রকম একটা বোঝাপড়ায় বোধ হয় সুবিধার দিক্ হইতে সকলেই স্বীকৃত হইবেন—বাংলা ভাষায় যে সাহিত্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকের পাঠের উদ্দেশ্যে লিখিত হইবে, বিদ্যালয়ে হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সমস্ত ছাত্রগণের পাঠ্য হইবে, তাহাতে বাংলা সাধু-ভাষায় যে রীতি অধুনা প্রচলিত আছে সেই রীতিই আপাতত বহাল থাকুক। মুসলমান ধর্ম ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় বিশেষ শব্দ আবশ্যক হইলে আরবি ফারসি হইতে বাংলায় লইতে হইবে—এ বিষয়ে কাহারও আপত্তি হইবে না। কিন্তু যদি বাংলা শব্দ (ইহার মধ্যে প্রচলিত সংস্কৃত শব্দও ধরিতে হইবে) অনুরূপ অর্থে ইতিপূর্বেই বিদ্যমান থাকে, তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না তাহা বিবেচনা করিলে ভাল হয়। আমার মনে হয়, মৌলানা আকরামি খাঁ, অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ মুসলমান সাহিত্যিক, যাঁহারা বাংলা ভাষা ভালো জানেন, এবং যাঁহারা আরবি ফারসিতেও প্রবীণ আরবি-ফারসি-জানা কয়েকজন হিন্দু সাহিত্যিকের সঙ্গে মিলিত হইয়া, সমগ্র বঙ্গভাষী হিন্দু-মুসলমানগণের বোধগম্যতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, এবং বাংলা ভাষায় ঐক্য-সংরক্ষণ বিষয়ে যত্নবান হইয়া, এ বিষয়ে বাঙালি-জাতিকে যথাকর্তব্য নির্দেশ করিয়া দিলে ভালো হয়।

বাংলা-ভাষী হিন্দু-মুসলমানের ভাষাগত ঐক্যের হানি যাহাতে না হয়, তাহার জন্য দেশের যথার্থ হিতকামী বঙ্গসন্তান চেষ্টিত হইবেন ; অন্যথায় হিন্দু এবং মুসলমান উভয়

সম্প্রদায়েরই মহান্ অনর্থ হইবে। আমার মনে হয় উপস্থিত ক্ষেত্রে ভারতের রাজনৈতিক গগন যেরূপ মেঘাড়ম্বরময়, তাহার কৃষ্ণ ছায়া আমাদের সাংস্কৃতিক জগতেও প্রতিফলিত না হইয়া পারে না। রাজনৈতিক গগন পরিষ্কার হইলে, আশা করি এ বিষয়েও আমাদের দৃষ্টি খুলিবে, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যও নবীন গরিমার দ্বারা উদ্ভাসিত হইবে।

প্রসঙ্গত এই সম্পর্কে আর একটি কথা বলিতে চাই বাঙালি খ্রিস্টান সম্প্রদায়, কী রোমান-ক্যাথলিক কী প্রটেস্টান্ট, সম্প্রতি যেভাবে তাঁহাদের ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধীয় শব্দাবলির বাংলা করিতেছেন, তাহা হইতে দেখা যায় যে তাঁহারা ইউরোপীয় (গ্রিক) শব্দ বাংলা ভাষায় চালাইবার পক্ষে তো নহেন, বরঞ্চ সহজভাবে বাংলা ভাষার খাঁটি বাংলা অথবা বাংলা ভাষায় আগত সংস্কৃত শব্দ এবং ধাতু ও প্রত্যয় সাহায্যে, বাংলার প্রকৃতির অনুযায়ী শব্দ গ্রহণ করিতেছেন বা গঠন করিতেছেন। Baptism অর্থে 'দীক্ষা-স্নান', Eucharist অর্থে 'খ্রিস্টপ্রসাদ', Confession = 'পাপ-স্বীকার' Extreme Unction = 'অন্তিম লেপন' Sacred Heart of Jesus অর্থে 'যীশুর শ্রীহৃদয়', Mass = 'খ্রিস্ট-যাগ', Sacrament = 'সংস্কার', প্রভৃতি অনুবাদ, 'হিজিরা' অর্থে 'জিনায়ন' এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার দ্বারা খ্রিস্টান মতবাদ বিপন্ন হইয়া পড়িবার আশঙ্কা ইঁহারা করেন না। ইহার সুফল এই হইবে যে, আমাদের সাধারণ মাতৃভাষার মধ্য দিয়া অখ্রিস্টান বাঙালি, হিন্দু ও মুসলমান বাঙালি, খ্রিস্টান ধর্মের সহিত পূর্ণ পরিচয় লাভ করিতে পারিবেন, এবং খ্রিস্টান আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও উপলব্ধির রস আস্বাদন করিতে পারিবেন।

নতুন যুগ-সন্ধি

বাংলা ভাষার ইতিহাসে এখন নতুন যুগ-সন্ধি আসিয়া উপস্থিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বাংলা ভাষা প্রবর্তিত হওয়ায়, মাতৃভাষা বাংলার প্রতিষ্ঠা শিক্ষার মধ্য দিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে আরও সুদৃঢ় হইবে। শিক্ষার বাহন ইংরেজি থাকায় ইংরেজি-শিক্ষিত এবং ইংরেজিতে অনভিজ্ঞ এই দুই শ্রেণিতে বাঙালি জনগণ বিভক্ত হইয়া পড়িতেছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে বাংলা ভাষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহন হইয়া দাঁড়াইলে, আধুনিক যুগের উপযোগী প্রৌঢ় ও শিক্ষিত মনোভাব, বাংলা ভাষায় রচিত বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তকের সাহায্যে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই যে নূতন বিধি প্রবর্তিত হইল, তাহার ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনে, বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা, প্রাদেশিক, সাম্প্রদায়িক ও গ্রাম্য মনোভাবের পরিবর্তে সর্বজনীন বিশ্বসাহিত্যের আলোচনার উপযোগী উচ্চ আদর্শ ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব

সুপ্রতিষ্ঠিত হউক, এই বিধি বাংলা ভাষার ও বাংলা সাহিত্যের পক্ষে একটি শুভ যোগ হউক, ইহা আমরা সকলেই কায়মনবাক্যে কামনা করি।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা-বিষয়ে নানা দিকে সার্থক উদ্যোগ দেখা যাইতেছে। এমন সময় ছিল যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বাংলা ভাষার সাহিতের—বিশেষত আমাদের পুরাতন সাহিত্যের আলোচনার, তাহার উদ্ধারের এবং প্রকাশের, মুখ্য কেন্দ্র ছিল। এ বিষয়ে সাহিত্য পরিষদের যে প্রয়াস, তাহা সমবেত ও সচেতনভাবে বাঙালি জাতির প্রয়াস। ইহা ভিন্ন, ব্যক্তিগত ভাবে অনেকে বহু অত্যাবশ্যক কার্য করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন। বহরমপুরের রাধারমণ যন্ত্রের স্বত্বাধিকারিগণ, বৃন্দাবনের নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, 'অমৃতবাজার পত্রিকার' পরিচালকগণ প্রমুখ বৈষ্ণব সাহিত্যানুরাগীদের চেষ্টায় বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের বহু দুর্লভ রত্ন আমাদের পক্ষে সুলভ হইয়াছে। 'বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারিগণ সংস্কৃতের ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থনিচয় বাংলা অক্ষরে এবং বাংলা অনুবাদ সহিত সুলভমূল্যে প্রচার করিয়া বাঙালিকে তাহার জাতির প্রাচীন আধ্যাত্মিক ও মানসিক সম্পদের সহিত পরিচিত হইতে আহ্বান করিয়াছেন ; বাঙালি, বিশেষ করিয়া হিন্দু বাঙালি, এই জন্য 'বঙ্গবাসী'র স্বত্বাধিকারিগণের নিকট চিরকাল ঋণী থাকিবে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কতকগুলি প্রধান পুস্তকও ইঁহারা প্রকাশিত করিয়াছেন। তদ্রূপ বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা ও অধুনাতন স্বত্বাধিকারী বাংলার প্রাচীন ও আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি সুলভ গ্রন্থাবলি আকারে প্রকাশিত করিয়া, দেশের মধ্যে সেগুলিকে ছড়াইয়া দিয়াছেন—অন্যথা বাঙালির পক্ষে তাহার নিজের সাহিত্যের সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটিত কিনা সন্দেহ। বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরের কল্যাণে বাঙালি পাঠক নূতন করিয়া কালিদাসের গ্রন্থাবলির মূলের সৌন্দর্য মাতৃভাষার মাধ্যমে উপভোগ করিতে সমর্থ হইতেছে, ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গেও পরিচয় লাভ করিতে পারিতেছে ; এই প্রতিষ্ঠানটি সমস্ত শেক্‌সপিয়ারের গ্রন্থাবলির যে সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা বাঙলা ভাষার পক্ষে একটি সুসংবাদ, বঙ্গভাষী জাতিকে তজ্জন্য অভিনন্দিত করা হইতে পারে। 'হিতবাদী' যন্ত্র হইতে পূর্বে যে সমস্ত বাংলা সাহিত্যগ্রন্থ ও অনুবাদগ্রন্থ বাহির হইয়াছে, সেগুলির দ্বারাও বঙ্গবাণীর মহিমা দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের প্রসার-বৃদ্ধি বিষয়ে চট্টগ্রামের বাঙালি বৌদ্ধগণ রেঙ্গুন ও কলিকাতা হইতে বঙ্গাক্ষরে মূল পালি ত্রিপিটক ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতেছেন তৎসম্বন্ধে বাঙালির কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

সুখের বিষয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পাশে আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের চর্চায় এবং প্রকাশে তৎপরতা দেখাইতেছেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাংলা সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনাকে অবলম্বন করিয়া, পঁচিশ বছরের অধিক কাল হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্যের ও ভাষার চর্চাকে উৎসাহ দিতেছেন, এবং এ সম্পর্কে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লক্ষণীয় ও কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ সার্থক অনুসন্ধান হইয়াছে। কলিকাতা তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পুঁথির সংগ্রহ, পুরাতন বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালার মতো অপরিহার্য হইয়াছে। চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধান বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও চেষ্টা চলিতেছে—এ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুর আলোচনা, তৎকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদের নূতন পুঁথির ও দীন চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদময় পুঁথির খণ্ডিত অংশের আবিষ্কার, এবং বড়ু চণ্ডীদাস হইতে পৃথক্ দীন চণ্ডীদাসের পদের নির্ণয়ের প্রয়াস ও সেগুলির সংস্করণ, এই লক্ষণীয় কার্যগুলির বিশেষ উল্লেখ করিতে পারা যায়। ঢাকায় ও কলিকাতায় চর্যাপদগুলি লইয়াও আলোচনা চলিতেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভবানন্দের 'হরিবংশ' প্রভৃতি প্রাচীন বাঙলা পুস্তকের প্রকাশ হইয়াছে, এবং ঢাকার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের কৃত্তিবাসের রামায়ণের সংস্করণও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব আলাওলের 'পদ্মাবত'-এর একটি প্রামাণিক সংস্করণ বাহির করিবেন, আমরা এইরূপ আশ্বাস পাইয়াছিলাম ; প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এই শ্রেষ্ঠ বইখানি যত শীঘ্র যথোচিত পাণ্ডিত্যের সহিত প্রকাশিত হয় ততই মঙ্গল। পুরাতন বাংলা সাহিত্য প্রচার কল্পে 'শনিবারের চিঠি'র স্বনামধন্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের সম্পাদনায় যে 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা' খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতেছে, তাহা এই যুগে বাঙালির মাতৃভাষা চর্চার ইতিহাসে এক লক্ষণীয় ঘটনা। পুঁথি হইতে উদ্ধার করিয়া আমরা অনেক লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় গ্রন্থ বাঁচাইয়া রাখিতেছি, কিন্তু মুদ্রণের সহায়তা লাভ করিবার পরও অনেক বাঙলা গ্রন্থ আমাদেরই সংগ্রহশীলতার অভাবে লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। সেগুলির পুনর্মুদ্রণ দ্বারা, আধুনিক কালে ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত আমাদের সংঘাতের সন্ধিক্ষণে নূতন ভাবধারা কিভাবে আমাদের মনে কার্য করিতেছিল, তাহার পরিচয় আবার সহজ-লভ্য হইতেছে, এই জন্য দুষ্পাপ্য গ্রন্থমালার সম্পাদকগণ ধন্যবাদার্হ।

মেদিনীপুর ঝাড়খণ্ডের কুমার শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব মহাশয়ের বদান্যতায় এবং মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের আগ্রহে, পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলির একটি প্রামাণিক সংস্করণ বাহির হইতেছে ; এতদ্‌ভিন্ন, বঙ্কিমচন্দ্র শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানকে চিরস্মরণীয় করিবার চেষ্টায়, ঝাড়গ্রামের কুমার বাহাদুরের প্রদত্ত অর্থে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র গ্রন্থাবলির একটি শোভন ও প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। বাঙালির পক্ষে এই দুইটি সংবাদে বিশেষ আত্মপ্রসাদ হইবার কথা।

ভাষার আলোচনার জন্য, এবং ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান আহৃত করিয়া দিবার জন্য প্রামাণিক

অভিধান ও বিশ্বকোষের আবশ্যকতা বাংলায় কাজ-চালানো ভাবে পূরণ করা হইয়াছে। ছোটো কার্যকর অভিধানের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের সুপরিচিত 'চলন্তিকা'র তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে ; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের বৃহৎ বাংলা ভাষার অভিধান-এর দ্বিতীয় সংস্করণ কিছুদিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে ; এই বইয়ে এক লক্ষ পনেরো হাজারের অধিক শব্দ স্থানালাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রাণপাত করিয়া তাঁহার সুবৃহৎ 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' মুদ্রিত করিতেছেন, তাঁহার এই কার্য অদ্ভুত পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যের ফল—তাঁহার অধ্যবসায় এবং উৎসাহ, সাহস এবং কার্যশক্তি অদম্য ; এই বই সম্পূর্ণ হইলে, বাংলা ভাষার অভিধানজগতে এক কীর্তিস্তম্ভ, 'শব্দকল্পদ্রুম' বা 'বাচস্পত্য', অথবা ব্যেট্‌লিঙ্ক ও রোটের সংস্কৃত অভিধানের দরের এক বৃহৎ অভিধান বাংলা ভাষা লাভ করিবে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শান্তিনিকেতনের শিক্ষকতা কার্য হইতে অবসর লইয়াছেন, এই বিরাট কার্য সম্পন্ন করা তাহার একার সাধ্য নহে ; এ বিষয়ে দেশের মাতৃভাষাপ্রেমী লক্ষ্মীমন্তগণের সহায়তা নিতান্ত আবশ্যক। কুমিল্লার বিদ্বান ও কর্মী সন্তান, মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবক, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশীভূষণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় অনুরূপ একটি বড়ো কাজে হাত দিয়াছেন। তিনি ইতিমধ্যে কয়েক খণ্ডে একখানি পৌরাণিক অভিধান বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত করিয়াছেন—রেঙ্গুনে থাকিয়া তিনি এই কার্য আরম্ভ করেন ; সংস্কৃত ইতিহাস ও পুরাণ বর্ণিত তাবৎ পাত্র-পাত্রীর পরিচয় ইহাতে আছে। এক্ষণে ইনি বহু খণ্ডে একটি প্রামাণিক ঐতিহাসিক 'জীবনী-কোষ' প্রকাশ করিতে ব্যাপৃত আছেন, তাহারও তিন খণ্ড ইতিমধ্যে বাহির করিয়াছেন—বাঙলা ভাষায় এইরূপ বহির প্রভাব আছে ; কিন্তু এ কাজ তাঁহার একার নহে—তিনি জীবনী-কোষ সংকলন করিয়া দিলেন, ছাপাইবার ভার মুখ্যত দেশের—সরকারের, অথবা বিদ্যোৎসাহী ভাগ্যবানদিগের। এই দুই নিঃস্বার্থ, নিঃস্ব বিদ্যা-সর্বস্ব পণ্ডিতের কার্যের প্রতি দেশবাসীর সহানুভূতি পূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি।

বাংলা ভাষায় এবং পরে হিন্দিতে 'বিশ্বকোষ' সংকলন করিয়া যিনি বাঙালি জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, সেই কর্মবীর পণ্ডিত, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলা ভাষার অনপত্তের হানি হইল। সহকর্মী একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পরেও বসুজ মহাশয় অদম্য উৎসাহে তাঁহার বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণের সংশোধন এবং প্রকাশকার্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এই মহাগ্রন্থের অল্পমাত্র অংশ তিনি মুদ্রিত করিয়া যাইতে সমর্থ হন ; তাঁহার অভাবে বোধ হয় এই আরব্ধ কার্য আর বুঝি সম্পূর্ণ হইল না। বসুজ মহাশয় তাহার বিশ্বকোষকে আধুনিক এবং যুগোপযোগী তথ্য দ্বারা নূতন কলেবরদান করিতে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহা বাঙালির দুর্ভাগ্য যে, তাঁহার এই বিরাট কার্য অসমাপ্তই রহিয়া গেল। এখন আমাদের ভরসাস্থল শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মহাকোষ।

শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রসঙ্গে মনে হয়, এই বৎসর বাংলায় সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিক হইতে বিশেষ এক দুর্বৎসর গেল। বাংলা সাহিত্যের, বাঙালির বিদ্যার জ্ঞানবিজ্ঞানের ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে কতকগুলি ইন্দ্রপাত হইয়াছে—কতকগুলি মনীষীর মৃত্যুতে বাঙলা দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহার আর পূরণ হইবার নহে। আমি কেবল শ্রদ্ধার সহিত এই সকল মনীষীর নাম করিব ; তাঁহাদের গুণকীর্তন করিয়া, প্রদীপের সাহয্যে সূর্যকে দেখাইবার চেষ্টা করিব না। শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ; শিক্ষাব্রতী, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক গিরিশচন্দ্র বসু, সুসাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃতত্ত্ববিৎ শরৎচন্দ্র মিত্র, স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর প্রচারক ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী শুদ্ধানন্দ ; ভারতগৌরব প্রত্নতত্ত্ববিৎ ননীগোপাল মজুমদার ; ব্যবহারবিদ কলারসিক সতীশচন্দ্র বাগচী, সংস্কৃতজ্ঞ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সেবক শিবরতন মিত্র, সুসাহিত্যিক হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, বনওয়ারিলাল গোস্বামী, দেবেন্দ্রনাথ বসু, গণিতবিদ্ অপূর্বচন্দ্র দত্ত ; রাজা জগৎকিশোর আচার্য ও রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।

সাহিত্যের প্রকৃতি, গতি ও আদর্শ

সাহিত্য-সম্মেলনে সাহিত্যের প্রকৃতি, গতি বা আদর্শ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হওয়া উচিত ইহা অনেকেই মনে করেন। আমিও মনে করি ; তবে আমি সাহিত্যিক অর্থাৎ রস-সাহিত্যের স্রষ্টা নহি, সুতরাং নিজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা আমি বলিতে পারিব না—কোন্ প্রেরণার ফলে এবং কোন্ লক্ষ্যের অভিমুখী হইয়া সাহিত্য-চেষ্টা সার্থক দৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করে। আমি ব্যবসায়ী সাহিত্য-বিচারক অর্থাৎ সাহিত্য-সমালোচকও নহি যে, অধ্যয়ন এবং অবলোকনের দ্বারা, বস্তুনিষ্ঠ ভাবেই হউক অথবা আত্মনিষ্ঠ ভাবেই হউক, সাহিত্যের মধ্যে স্থিত রসবস্তুর আবিষ্কার করিব এবং তাহার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিব, তাহার স্বরূপ ও উৎপত্তি নির্ণয় করিব। সাধারণভাবে সাহিত্য সম্বন্ধে যে ধারণা আমরা পোষণ করিয়া থাকি, তাহা কতকটা আমাদের শিক্ষা এবং বহুল পরিমাণে আমাদের রুচি ও মানসিক প্রবণতার ফল। এই ধারণা প্রধানত দুই প্রকারের দেখা যায় ; পদার্থ-বিজ্ঞানের ভাষায়, ইহা হয় কেন্দ্রাভিমুখী, না হয় কেন্দ্রাপসারী। এই দুই প্রকার সাহিত্য-দৃষ্টি এবং সাহিত্য-সাধনা পরস্পরের পরিপূরকও বটে, পরস্পরের পরিপূরকও বটে। অন্য বিষয়ে যেমন, তেমন সাহিত্যের কেন্দ্রাভিমুখী মনোভাবের নিকট সংহতি, সমবায়, সমষ্টি-ধর্ম বা সঙ্ঘ-ধর্ম, diseipline বা বিনয়, নিয়ম বা বিধিনিষেধের অনুবর্তিতা, প্রাচীন রীতির অনুসরণ, নীতিপরায়ণতা প্রভৃতি ধর্ম বা গুণ অভীপ্সিত, এবং কেন্দ্রাপসারী মনোভাব, স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য, ব্যাষ্টি ধর্ম বা ব্যক্তি ধর্ম, স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাবৃত্ততা, নবীনের প্রতি আকর্ষণ, অনৈতিকতা

প্রভৃতি ধর্মের বা গুণের অনুকূল। সাধারণত প্রত্যেক মানবের মনে এই দুই মনোভাবের মিশ্রণ থাকে—কোথাও বা কেন্দ্রাভিমুখী ভাব অধিক কোথাও কেন্দ্রাপসারী ভাব প্রবল। এই দুই বিভিন্ন মনোভাব যতক্ষণ পর্যন্ত কেবল ভাব-জগতে নিবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ ইহাদের মধ্যে বিরোধ প্রকাশ পায় না ; কিন্তু যখন সাহিত্যের রূপ গ্রহণ করে তখন, এবং যখন চরিত্রে রীতি ও নীতিতে প্রকট হয়, তখনই ভাব-সংঘাতের এবং চরিত্র সংঘাতের অবকাশ ঘটে। ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক নীতি-মূলক ও সৌন্দর্যবোধ মূলক সমাজ সংরক্ষক ও ব্যক্তিত্ব প্রসারক বিচারমূলক ও অনুভূতিমূলক যুক্তিধর্মী ও কল্পনাধর্মী, আদর্শবাদী ও বাস্তববাদী—এই প্রকার বিপরীত অথবা পরস্পরের পূরক ভাব ও চিন্তাধারা অবলম্বন করিয়া সাহিত্যচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। এই দুই শ্রেণির ভাবকে পরস্পর-বিরোধী বা প্রতিস্পর্ধী না বলিয়া পরস্পরের সহিত সংযুক্ত, একই বস্তুর দুই মুখ বলিয়া বর্ণনা করিলে, ইহাদের যথার্থ সম্বন্ধ প্রকাশ করা হয়। কেন্দ্রাভিমুখী এবং কেন্দ্রাপ্রসারী এই উভয় ভাবের সুসামঞ্জস্য হইলে, মানসিক ও সামাজিক জীবনে সুসার আসে, সাহিত্যে চিরস্থায়ী শাশ্বতগুণ যুক্ত রসসৃষ্টি ঘটিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ রসসৃষ্টি কখনও একদেশদর্শী হইতে পারে না; তাহার মধ্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি সুষমা ও শক্তি, স্বাধীনতা ও নিয়মানুবর্তিতা নীতির বন্ধন ও বাধাবন্ধনহীন স্বচ্ছন্দ গতি, উভয়েরই সামঞ্জস্য দেখা যায়। বন্ধনের মধ্যেই মুক্তি এই মহাসত কেন্দ্রাভিমুখী মনোভাব প্রকাশ করিতে চাহে; কেন্দ্রাপসারী মনোভাব মুক্তির মধ্যে আপনাকে বাঁধিতে চাহে। যেখানে এই দুই ভাবকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা হয়, সেইখানেই একদেশদর্শিতা আসিয়া পড়ে, সেখানেই এক দিকে ভার পড়ে, সৎ-এর বহু মুখের মধ্যে একটিকে মাত্র স্বীকার করিয়া লইলে যাহা হয়, তাহা ঘটে—একের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অন্যকে বর্জন করিবার অন্যকে দূরীভূত করিবার আকাঙ্ক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা হয়। আমাদের দেশে সাহিত্যবিষয়েও উপস্থিত সেই পরস্পর বিরোধী মনোভাবের প্রকাশ দেখা যাইতেছে। এইরূপে একদেশদর্শী হওয়ায় আমাদের সাহিত্যিকগণের মধ্যে দুইটি দল দেখা দিয়াছে; প্রাচীন পন্থী ও আধুনিক পন্থী, আদর্শ-বাদী, ও বাস্তব-বাদী, নীতি-নিষ্ঠ ও দৃষ্টি-নিষ্ঠ, স্থিতিশীল ও প্রগতিশীল, এইরূপ পরিচয় বা নাম হয় ইঁহারা স্বয়ং লইতেছেন, না হয় অপরে ইঁহাদের দিতেছে; এতদ্ভিন্ন বিরোধী পক্ষ মনে করিয়া অন্য দলের প্রতি বিরূপ ভাব প্রকাশক শ্লেষ বা কটূক্তিময় অন্যান্য নানা নামও আছে। 'প্রগতি সাহিত্য'—এই নামটি, কয়েক মাস যাবৎ হঠাৎ কতকগুলি তরুণ সাহিত্যিকের প্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ নামের সার্থকতা বুঝি না। আমরা এই নাম এবং ইহার মধ্যে নিহিত মনোভাবের গতি অনুসরণ করিবার জন্য উৎসুক রহিলাম। আদর্শবাদ ও বাস্তবানুসারিতা উদ্দেশ্যশীলতা ও উদ্দেশ্যহীনতা, শিবের অর্থাৎ কল্যাণের প্রতিষ্ঠার জন্য সাহিত্য, অথবা অনৈতিক হউক বা প্রতিনৈতিক হউক, কেবল সুন্দরের প্রতিষ্ঠার জন্যই সাহিত্য-সমাজ ও ধর্ম সংরক্ষণ করিব, কি ব্যক্তিত্বের, বাধাহীন প্রকাশের আবাহন করিব—এই দুই ধরনের

মতবাদকে আশ্রয় করিয়া, এই দুই বিভিন্ন শ্রেণির সম্মুখহীন হইয়াছেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার সংরক্ষণ ও বিধ্বংসনের প্রশ্নও উঠিয়াছে Art for Art's sake–এই মত লইয়া পুরাতন কলহও উঠিয়াছে। সাহিত্যে পরকীয়াবাদের প্রাবল্য, দুর্নীতির প্রসার প্রভৃতি অনাচার অনেককে বিচলিত করিতেছে।

এ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিমতের বিশেষ মূল্য বা কার্যকারিতা আছে বলিয়া মনে হয় না। বিশ্বসাহিত্যের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের সহিত অল্পাধিক পরিচয়ের ফলে আমার বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে, যাহা সত্যকার রস-রচনা, তাহা প্রাণধর্মী—প্রাণের স্ফূর্তি যেমন স্বতঃ হইয়া থাকে, এই রূপ রস-রচনার স্ফূর্তিও স্বতঃ হইয়া থাকে; দেশ, কাল, পাত্র—এগুলির প্রভাব বা আবেষ্টনীকে এই রূপ প্রাণধর্মী রচনা বর্তন করিতে পারে না,—এই জন্য ইহা বাস্তবানুসারী হইতে বাধ্য; আবার সেই সঙ্গে, লোকতিগ দৃষ্টি বা অনুভূতির পরিচয়ও ইহাতে পাই,—অন্যথা বিশ্ব মানবের আস্বাদনের উপযোগী রসের সৃষ্টি ইহাতে হইতে পারিবে না। সাহিত্য-রচনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য মহাকালের মান-দণ্ডের আবশ্যকতা আছে; যাহা সত্য, যাহা মহৎ, যাহা সার্থক, তাহাই নিরবধি কালের স্রোতের মধ্যে টিকিয়া যায়; যাহা অসত্য, যাহা ক্ষুদ্র, যাহা নিরর্থক, তাহা ক্ষণিকের খ্যাতি পাইয়া বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যায়।

উপস্থিত কালে প্রাচীন ও অতি আধুনিক স্থিতিশীল ও প্রগতিশীল ভেদে বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্য-রচনার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষদলের অভিযোগ উঠিতেছে। প্রাচীন-পন্থী সাহিত্যিকেরা—বঙ্কিমচন্দ্র ইঁহাদের প্রতীস এমন অচল, কারণ ইহারা আদর্শবাদী, ইহারা সমাজ সমাজ করিয়াই পাগল, ইহারা নীতিবাগীশ; ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ইঁহারা হইতে দিবেন না, ইঁহারা বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া আদর্শকে লইয়াই মাতিয়া থাকেন ; নবীনপন্থী সাহিত্যিকেরা বাস্তবানুসারিতার দোহাই দিয়া সাহিত্যে পঙ্কিলতা আনয়ন করিতেছেন, ইঁহাদের মনোভাব প্রতিনৈতিক, ইঁহারা ব্যক্তিত্বের নামে সাহিত্যে ও সমাজে স্বৈরাচার আনয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহিত্যের মাপকাঠি ছাড়া আর কোনো মান ইঁহারা অস্বীকার করেন, সাহিত্যের কোনো নৈতিক সামাজিক বা অপর কোনো আদর্শ, মতবাদ উদ্দেশ্য, বা প্রয়োজন থাকিলে তাহা সাহিত্যগৌরব হইতে ভ্রষ্ট হয়, ইহাই ইঁহাদের অভিমত। আর্টের খাতিরেই আর্ট-সাহিত্যের জন্যই সাহিত্য, সাহিত্যের অন্য কোনো দায় বা কর্তব্য নাই—এ কথার বিচার তখনই হইতে পারে, যখন এই আর্ট এবং ইহার চরম স্বরূপ বা প্রকৃতি কী, সে সম্বন্ধে এবং ইহার সহিত জীবনের সম্বন্ধ কী, সে বিষয়ে আমরা স্থির ধারণা করিতে পারিব ; আর্টের অনুশীলনের বা আস্বাদনে—সে আর্ট রূপ কলারই হউক, বা সাহিত্য রচনারই হউক, সঙ্গীতেরই হউক বা নৃত্য ও নাটকেরই হউক—আমরা যে অপার্থিব রসানুভূতির অধিকার; হই, তাহাই আর্টের লক্ষ ; এবং সাংসারিক জীবনের বিষবৃক্ষে ইহাই অন্যতর মধুর ফল। আর্টের উদ্দেশ্য আর্ট, অর্থাৎ এই রসানুভূতি;

সুতরাং যেখানে এই রসানুভূতি নাই, সেখানে আর্ট নিষ্ফল সাহিত্য সেখানে নিরর্থক। ইহা হইল আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক জগতের কথা। সামাজিক ও ব্যক্তিগত নৈতিক জীবনে আর্ট অর্থাৎ কলা ও সাহিত্য উদ্দেশ্য-বিহীন থাকিতে পারে কি না, তাহা বিচার্য। মানসিক ও আত্মিক জীবনের প্রভাব, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে অপরিহার্য ভাবে আসিয়া পড়ে, সুতরাং জীবন সাহিত্যের প্রভাব হইতে মুক্ত নহে। এইরূপ প্রভাব কাম্য কি না, ইহা হইতে আমরা মানসিক, আত্মিক, নৈতিক ও ব্যবহারিক জীবনে নিজেদের মুক্ত রাখিতে পারি কী না, এ কথার সমাধানের সঙ্গে, সাহিত্য উদ্দেশ্য যুক্ত হইবে অথবা নিরুদ্দেশ্য হইবে, এই প্রশ্ন ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ। এক প্রকার সাহিত্য আছে, যাহার প্রেরণা এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, সেই প্রকার সাহিত্যের উৎস রিরংসা এবং তাহার কাম্য ওই মনোবৃত্তির উত্তেজনা ; সেই প্রকার সাহিত্য হয় তো আধুনিকতার, বাস্তবের ও শিল্পের দাবি করিয়া, সাহিত্য নীতিনিষ্ঠ হইবে না এই মতবাদের ধ্বজা উড়াইয়া লোকের কাছে সাফাই গাহিবার চেষ্টা করে। সে রূপ সাহিত্য জগতে নূতন নহে, তাহা কখনও টিকে নাই, টিকিবেও না ; এবং এ যুগে সেইরূপ সাহিত্যের জন্য ধর্মাধিকরণের ব্যবস্থা সব দেশেই অল্পবিস্তর আছে। যথার্থ বাস্তববাদী সাহিত্য যদি সত্য দৃষ্টির সঙ্গে দর্শনের লক্ষ্য বা আদর্শ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহা আমাদের আদরের সহিত গ্রহণীয়। প্রাচীন আরব কবির উপদেশ এই প্রসঙ্গে সার্থক উপদেশ বলিয়া মনে হয়—তুমি যে সব কবিতা ও শ্লোক রচনা করিয়াছ, সেগুলির মধ্যে প্রশংসার যোগ্য ও সকলের চেয়ে সুন্দর কবিতা সেইটি যেটি শুনিয়া লোকে বলে—হাঁ, ইহা সত্য বটে।'

মানুষের মনের ধর্ম বহু জটিলতায় পূর্ণ ; সাহিত্য এই সমস্ত জটিলতারই প্রকাশ করিয়া থাকে ; এখানে আমরা একটি বা দুইটি ধর্মের ধ্বজা খাড়া করিয়া, অন্য সবগুলিকে উড়াইয়া দিতে পারি না। নিছক সাহিত্যদৃষ্টিতেই দেখিব, ব্যক্তিগত ও জাতিগত রুচি এবং সংস্কৃতি আমার কাছে কিছুই নহে, যেহেতু আমি বাস্তববাদী সাহিত্যিক, এই সাহসের উক্তি তাঁহারই সাজে, যাঁহার শক্তি আছে, যাঁহার পক্ষপাতহীন সমদৃষ্টি আছে, মানবধর্মিতার সাধনার ফলে যাঁহার চিত্তে সহানুভূতি আছে, ধৈর্য আছে, ক্ষমা আছে এবং যাঁহার রস-সৃষ্টি অনুভূতির বা বৈজ্ঞানিক চিন্তার আলোকে উদ্ভাসিত। সাহিত্যে উদ্দেশ্যহীনতা—ইহা নিষ্কাম কর্মের মতো ; eppursi muove–'নিষ্কাম' ভাবের মধ্যেও . in tune with the infinite হইবার আকাঙক্ষা বা কামনা রহিয়াছে। বাহ্যপ্রকৃতির মধ্যেই বা উদ্দেশ্যহীনতা কোথায় ? সাহিত্যের মধ্যে যদি অবশ্যাম্ভাবিতা থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রভাবশালিতার সঙ্গে অপরোক্ষ ভাবেও উদ্দেশ্য আরোপ করা যাইতে পারে।

সাহিত্যের এই প্রভাবশালিতা, ব্যক্তি-মন ও সমাজ-মনের উপর তাহার কার্য, আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। অবস্থা বা পারিপার্শ্বিক অনুসারে একই বস্তুর বা ভাবের স্বরূপ এবং প্রভাব বিভিন্ন হয়। Totalitarian State অর্থাৎ সর্বগ্রাসী রাজতন্ত্র যেখানে

প্রচলিত, সেখানে মনের জগতে সাহিত্যের জগতে, কেন্দ্রাপসারিত্বের, ব্যক্তিত্বমূলক সংস্কৃতির আবশ্যকতা আছে। আমাদের মতো অবস্থায়, যেখানে সবই খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, যেখানে জাতীয় সংঘবদ্ধতা সকলের চেয়ে অধিক অপেক্ষিত, যেখানে ব্যষ্টি অপেক্ষা সমষ্টি দুর্বল, সেখানে কেন্দ্রাভিমুখিতা হইলে, সামাজিক এবং জাতীয় বিনয় ও সংহতি সুদৃঢ় হইতে পারে। মুদ্রিত সাহিত্য হাতের ঢিল, বা ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত বীজ কোথায় গিয়া কাহার মনে কীরূপ কার্য করে, তাহা কাহারও জানা নাই। প্রারম্ভে ভাবশুদ্ধি, অমায়িকতা, সত্যাদিদৃক্ষা থাকিলে, তবেই যথার্থ রসসৃষ্টি সম্ভব হয় ; তখন সার্থক ও কল্যাণকর সাহিত্য-রচনা দেশকে ও সমগ্র মানব জাতিকে ধন্য করে।

সুনীতি ও দুর্নীতির প্রশ্ন

সাহিত্যে নীতিনিষ্ঠতা থাকিবে কী না, তাহা বিচার করিতে হইলে, 'নীতি' বলিলে আমরা কী বুঝিব তাহা জানা দরকার। 'নীতি' শব্দে সাধারণত আমরা বুঝি morality ; এই শব্দ যে অর্থে স্বামী বিবেকানন্দ একবার ব্যবহার করিয়াছেন, সেই অর্থ বিশেষভাবে আমার মনে লাগে—Morality is that which strengthens immorality is that which weakens ; যে নীতি মানুষকে জীবনের সব দিকে শক্তি দিতে পারে না, তাহার আবশ্যকতা নাই ; এই দৃষ্টিতে বিষয়টি দেখিলে বোধ হয় সাহিত্যে সুনীতি বা দুর্নীতির প্রশ্নের সমাধান অনেকটা সহজ হইয়া উঠে।

আমাদের বাঙলা সাহিত্যে এখন 'আধুনিক' বা 'প্রগতিবাদী' লাঞ্ছন বা নিশানা অথবা নাম দিয়া কোনো লেখক বা পুস্তককে চিহ্নিত করিয়া দিবার কোনও কারণ দেখি না। এখন আমাদের দেশে যুগ-সন্ধির কাল ; আদর্শ-বিপর্যয় এবং তৎসঙ্গে সাহিত্যের ক্ষেত্রে নানা অভূত-পূর্ব মনোভাব দেখা দিবেই। প্রগতি সাহিত্যের বা আধুনিকতার নাম দিয়া আনুষ্ঠানিক হিঁদুয়ানির মধ্যে নিহিত মৃত বা মৃতকল্প প্রাচীনপন্থীতাকে আক্রমণ করা বা ইহার প্রতি শ্লেষ বা কটূক্তি করা, মরা ঘোড়ার ওপর চাবুক মারা বা মরা সিংহকে বধ করার মতো ; ইহাতে সাহসের বা বীরত্বের কিছুই নাই। আধুনিক বাস্তববাদী সাহিত্যিকের কর্তব্য, দরদ দিয়া নির্ভীক ভাবে সত্য-দৃষ্টির সহিত আমাদের সমাজের পরিস্থিতি দেখানো—আমাদের জীবন-মরণ সমস্যাগুলি পরিস্ফুট করিয়া তোলা। এই আধুনিক কালে অর্থনৈতিক কারণে নানা ক্লান্তিকর মনোভাব দেখা দিতেছে, ও আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের ভিত্তিকে নাড়া দিতেছে। আমাদের সাহিত্যে যদি এই সব বিষয়ের প্রতিচ্ছায়া না পড়ে, তাহা হইলে যে সাহিত্যকে দেশকালের পক্ষে নিরর্থক বলিতে হয়। সমস্যা আমাদের অনেক ; কিন্তু প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির মধ্যে, কাহারও কাহারও নিকট মাত্র স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধটাই সর্বপ্রধান বলিয়া দেখা দিয়াছে, তাঁহারা ইহারই বর্ণনায় ইহারই চিত্রণে বিশেষ ভাবে অবহিত হইয়াছেন। এ বিষয়ে আবার বাহিরের জগতের—

ইউরোপের নানা দেশের ও আমেরিকার—সমাজের উপযোগী দৃষ্টিকোণ হইতে অনেকে পরিদর্শন করিতেছেন। আমার বক্তব্য এই—আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে বুভুক্ষা, নিষ্ঠুর সাম্প্রদায়িক, সমাজগত ও ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা, বিভীষিকা এবং নৈরাশ্য যেখানে প্রেতলোকের সৃষ্টি করিতেছে, সেখানে সাহিত্যে ভাব-বিলাস এক হৃদয়-বিদারক ট্রাজেডি বলিয়া মনে হয়। শক্তিশালী সাহিত্যিক নৈর্ব্যক্তিক বস্তুবাদিকতার সহিত আমাদের জীবনের যথার্থ স্বরূপটি দেখান, জীবনের সব দিকে আমাদের আশা-আকাঙক্ষা, ব্যর্থতা-সার্থকতা, শোক-আনন্দ, জয়-পরাজয়, শক্তি-দৌর্বল্য, সত্য-মিথ্যা প্রকট করিয়া দিন, তাঁহাকে পাইয়া, তাঁহার সত্য দর্শন ও প্রদর্শনের শক্তির অনুপাতে আমাদের বঙ্গ-ভারতী গৌরবশালিনী হইবেন।

সাধুভাষা ও চলিতভাষা

প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক্. বাংলা সাহিত্যে উপস্থিত যে দুই প্রকার রচনারীতি চলিতেছে—সাধু-ভাষা ও চলিতভাষা তাহা বাংলা ভাষার ঐক্যের পক্ষে কোনো কোনো বিষয়ে হানিকর হইয়াছে বলিয়া মনে হয় । বাংলা সাধুভাষা , পুরাতন বাংলার ব্যাকরণ, শব্দ ও ধাতুরূপ প্রভৃতিকে আঁকড়াইয়া রহিয়াছে ; এবং বাংলা চলিতভাষা, আধুনিক কালে ভাগীরথী তীরের ভদ্র-সমাজের মৌখিক ভাষার সাহিত্যিক রূপ মাত্র। সাধুভাষা নিখিল বঙ্গদেশের প্রাদেশিক কথ্য-ভাষার পূর্বরূপ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার আধারে গঠিত, এবং সাধুভাষা এখনও এই সমস্ত কথ্য ভাষার মধ্যে সহজ যোগ-সূত্র রূপে বিদ্যমান। বিগত পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ে ভাগীরথী তীরস্থিত নবদ্বীপ পরে কলিকাতা বাঙালি জাতির কেন্দ্র—হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয়ই হইয়ও রহিয়াছে, সেই জন্য এই অঞ্চলের কথ্য ভাষার যে একটা বিশেষ সম্মানের স্থান হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। এই কারণে বিগত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচলিত সাধুভাষার পার্শ্বে কলিকাতা অঞ্চলের ভাষা, একটি লঘু শৈলীর সাহিত্যের ভাষারূপে নিজ স্থান করিয়া লইয়াছে। বিংশ শতকের তৃতীয় পাদ হইতে এই চলিতভাষা বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত তরুণ সাহিত্যিকদের নিকট বিশেষ 'ফ্যাশনেবল' বা নবীন ঢঙের বলিয়া অনুকরণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিকগণ চলিতভাষায় বহুল পরিমাণে লিখিয়াছেন, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় চলিত ভাষার পক্ষে তাহার শক্তিশালী লেখনী ধারণ করিয়াছেন নিজেও তিনি এই ভাষায় লোকপ্রিয় সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অনেকের কাছে চলিত ভাষা আধুনিকতার প্রতীক বলিয়া মনে হইয়াছে। এইসব কারণে আজকাল চলিত ভাষার প্রতি বহু সাহিত্যিকের একটা আকর্ষণ দেখা যাইতেছে ; এমনকী অনেকে সাধু ভাষাকে পুরোপুরি অপ্রচল করিয়া দিয়া, একমাত্র চলিত-ভাষা, সারা বাংলা জুড়িয়া সমগ্র বঙ্গভাষীর মধ্যে সাহিত্যের ভাষা হইয়া যায়, ইহা কামনা করেন, অবশেষে এইরূপই

হইবে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। আমিও এক সময়ে এইরূপ কামনা করিতাম—মনে করিতাম, বুঝি প্রাচীনপন্থী ভাষা বলিয়া সাধু-ভাষার আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া আসিল। কিন্তু আধুনিকতার লেবেল গায়ে লাগাইয়া কতকগুলি তরুণ সাহিত্যিক যে ভাবে এক উৎকট চলিত-ভাষার প্রয়োগ করিতেছেন, তাহা দেখিয়া এবং কয়েক বছর ধরিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বাংলা ভাষার প্রধান পরীক্ষকের কার্য করিবার সময়ে, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলার ছাত্রদের বাংলা রচনা দেখিয়া, আমার মনে দৃঢ় ধারণা দাঁড়াইয়াছে যে, সাধু-ভাষার উপযোগিতা এখনও যায় নাই—আরও কিছুকাল ধরিয়া সাধু-ভাষা বাঙালি জাতির সাহিত্য ও মানসিক সংস্কৃতির বাহন থাকিতে পারে ; এবং থাকা আবশ্যক বলিয়া আমার মনে হয়। এ কথা, যাঁহারা ঘরে চলিত -ভাষা কাছাকাছি ভাগীরথী-অঞ্চলের কথ্য ভাষার মতো কথ্য ভাষা বলেন না, চলিত-ভাষা যাঁহাদিগকে শিখিয়া লইয়া তবে ব্যবহার করিতে হয়, তাঁহাদের সম্বন্ধে যেমন খাটে ; তেমনি যাঁহারা ঘরে চলিত-ভাষা বলিয়া থাকেন এমন ভাগীরথী-তীর-নিবাসী সাহিত্যবুদ্ধিহীন বা সাহিত্য সাধনা-হীন সাধারণ ব্যক্তির সম্বন্ধেও খাটে। আমি ইতিপূর্বে এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার পুনরুল্লেখ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি, উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, সাধু-ভাষায় শিক্ষানবিশী করা, ইহার চর্চা করা এবং বিশুদ্ধ ভাবে অর্থাৎ চলিত-ভাষার সহিত মিশ্রণ না ঘটাইয়া সাধু-ভাষায় লেখা, বাংলা ভাষায় যাঁহারা অধিকার লাভ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগের পক্ষে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয়, এমন-কি অপরিহার্য ব্রত বা সাধনা। চলিত-ভাষারও স্বকীয় ব্যাকরণ আছে, নিজস্ব শব্দ আছে, ধ্বনিগত ও তদবলম্বনে বর্ণ বিন্যাসগত স্বাতন্ত্র্য আছে, নিজস্ব বাক্যরীতি ও নানা রুচি প্রয়োগ আছে। যাঁহারা জন্ম ও শিক্ষাগত অধিকারে এইগুলি প্রাপ্ত হন নাই, এইগুলি আয়ত্ত করিয়া লইয়া তবে তাঁহাদিগের চলিত-ভাষায় লিখিবার প্রয়াস করা উচিত। এই বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য, সাধু-ভাষার সঙ্গে চলিত ভাষারও ব্যাকরণ আবশ্যক; এখানেও নানা স্থূল ও সূক্ষ্ম নিয়মের যে যথেষ্ট বাঁধাবাঁধি আছে, অনেক সময়ে আমরা সে কথা ভুলিয়া যাই। ভাগীরথী-তীরের আশে-পাশে একাধিক পুরুষ ধরিয়া যাঁহাদের বাস, তাঁহারা বলিতে পারেন, যে দিকে সূর্য উদিত হয় সেই দিকই পূর্ব দিক্, ঘরে আমরা যাহা বলি, তাহাই চলিত-ভাষা। যাঁহারা এই কথা বলিতে পারেন না, বিশেষ করিয়া তরুণ লেখকদের অনেকে, তাঁহাদের এবং ভাগীরথী তীরবাসী ছাত্র ও ভাষার উপর অধিকার লাভে ইচ্ছুক অন্য সাধারণ লোকেরও কর্তব্য প্রথমে সাধু-ভাষার সাধনা করা। সাধু-ভাষা মনোভাব-প্রকাশের পক্ষে প্রশস্ত রাজবর্ত্ম-স্বরূপ বিদ্যমান; চলিত-ভাষা এখনও বহু লোকের পক্ষে সঙ্কীর্ণ পল্লিবীথি মাত্র, সে পথের সঙ্গে অপরিচিত লেখকের পক্ষে, পদে পদে পথভ্রান্তি বা পদস্খলনের সম্ভাবনা। চলিত-ভাষায় লিখিবার প্রয়াস করেন এমন বহু তরুণ লেখকের লেখা দেখিয়া মনে হয়, ইঁহাদের বক্তব্য সাধুভাষায় আরও গুছাইয়া বলিতে পারিতেন, নিজ বিশিষ্ট ব্যাকরণ ও বাক্য-রীতি এবং প্রয়োগ সমেত চলিত ভাষাকে দুর্বোধ্য করিয়া হত্যা না করিলেই পারিতেন। মাতৃভাষার প্রকৃতি এবং তাহার বাক্যভঙ্গী না বুঝিয়া, কেবল

অল্প ইংরেজি সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের জোরে বাংলা ভাষা লিখিতে চেষ্টা করিয়া আবার বহু স্থলে ব্যর্থতার পরিচয় অনেকে দিতেছেন, এই দৃশ্য বাস্তবিকই হৃদয়-বিদারক। আমার মনে হয়, ইস্কুলগুলিতে বাংলা ভাষার পঠন-পাঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবিলম্বে হওয়া উচিত সাধু-ভাষার আলোচনা প্রথম আবশ্যক। আধুনি বাংলা সাহিত্যের পূর্ণপরিচয়ের জন্য চলিত ভাষারও দরকার—কিন্তু তাহাতে লিখিবার প্রয়াসের পূর্বে, তাহার ব্যাকরণাদির জ্ঞান যাহাতে বঙ্গভাষা, অধ্যাপনের সময়ে দিতে পারা যায়, সে বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত। চলিত ভাষায় যাঁহাদের অধিকার জন্মগত, অথবা শিক্ষার দ্বারা যাঁহারা এই অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা রুচি বা অবস্থা মতো চলিত-রূপ অবলম্বন করিয়াই মাতৃভাষার সেবা করিবেন। চলিত-ভাষার সহিত পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইলে, ভবিষ্যতে হয়তো ইহা সাধু-ভাষার স্থান দখল করিবে। কিন্তু আপাতত তাহা দূরের কথা বলিয়া মনে হয়।

বাংলা বানানে বিশৃঙ্খলা

এই প্রসঙ্গে বাংলা বানান সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত বলিয়া মনে করি। বাংলা বানানে, বিশেষত চলিত-ভাষায়, নিয়মানুবর্তিতা নাই ; এক করছে বা করবো শব্দের দশ রকম বানান হয়। বিদেশি নামের বানানেরও কোনো নিয়ম নাই। এই সমস্ত বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বাংলা বানানের সংশোধন উদ্দেশ্যে একটি সভা নিযুক্ত করেন, সেই সভা হইতে বাংলা বানানের কতকগুলি নিয়ম নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়। শুদ্ধ সংস্কৃতশব্দের বানানে কোনো পরিবর্তন প্রস্তাবিত হয় না, কেবল রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব না করিয়া একক অবস্থান অনুমোদিত হইয়াছে। 'সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে রেফের পর দ্বিত্ব বিকল্পে সিদ্ধ ; না করিলে দোষ হয় না, বরং লেখা ও ছাপা সহজ।' অসংস্কৃত শব্দে কতকগুলি বিধান প্রস্তাবিত হইয়াছে, এগুলি বাংলা ভাষা তত্ত্বের দিক্ হইতে বিচার করিয়া গৃহীত হইয়াছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত চলিত বানানের দিকে লক্ষ রাখিয়া, বৈকল্পিক ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। ছাত্রগণের পক্ষে নূতন বানানে অভ্যস্ত হইতে সময় লাগিবে, এ জন্য প্রথম প্রথম কয়েক বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পুরাতন বানানে লিখিলেও চলিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত ও অনুমোদিত বাঙলা বই একটি নির্দিষ্ট বানানে মুদ্রিত হইলে, ক্রমে এই অত্যাবশ্যক বিষয়ে আমরা একটি নিয়মানুবর্তিতার অবকাশ পাইব। রেফের পরে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব-ভাব বর্জনের দ্বারা। (বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিত্ব-বর্জন অনুমোদন করিয়াছেন মাত্র, প্রচলিত রীতি অনুসারে দ্বিত্ব করিয়া লিখিলে ভুল হইবে এ কথা বলেন নাই। এবং অ-সংস্কৃত শব্দে 'ণ' বর্জন করায়, 'শ'-সর ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়ায়, কেহ কেহ অনাবশ্যক ভাবে আতঙ্কিত হইয়া এই বানানের বিপক্ষে আন্দোলন করিয়াছেন। আমার মনে হয়, তাঁহাদের এই আশঙ্কা অমূলক। যাহা হউক, বহু স্থলে বিকল্পের ব্যবস্থা থাকায়, বাংলায় শিক্ষক, ছাত্র এবং লেখকগণ প্রস্তাবিত সংস্কারের উপযোগিতা বা অনুপযোগিতা বুঝিতে পারিবেন, এবং আমাদের বিশ্বাস, লিখিবার

সুবিধা এবং বাংলা ভাষার প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য দেখিয়া, সকলেই এই সংস্কার ধীরে ধীরে মানিয়া লইবেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের গুরুত্ব আমরা মাতৃভাষানুরাগী শিক্ষিত বাঙালি সকলেই উপলব্ধি করি। জাতি মানেই ভাষা এই সংজ্ঞায় স্বজাতীয়দের সঙ্গে বৎসর বৎসর মিলিত হইয়া আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি জাতীয়তা—এইগুলির আলোচনা করি, এইগুলির সংরক্ষণ, পরিপোষণ এবং পরিবর্ধনের কথা চিন্তা করি। এইরূপ সম্মেলন ধর্ম-বর্ণ-বৃত্তি নির্বিশেষে সকল বাঙালির মিলনের এবং কর্মপ্রচেষ্টার ক্ষেত্র হওয়া উচিত। কিন্তু সকল শ্রেণির বঙ্গভাষী ইহাতে এখনও তাদৃশ আকৃষ্ট হয় নাই। শিক্ষিত ও অভিজাত শ্রেণির বঙ্গভাষী ইহা গড়িয়া তুলিয়াছেন, এখন ইহাতে যাতে বঙ্গভাষী জনসাধারণও সম্মিলিত হন, বাংলা দেশের যে প্রান্তে এই সম্মিলন হইবে সেই প্রান্তের সকলকেই যাহাতে ইহার প্রতি আকৃষ্ট করা যায়, সেদিকে এইবার আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। শিক্ষার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য সম্মেলনেরও জনপ্রিয়তা বাড়িবে, তাহা আশা করিতে পারা যায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারও আবশ্যক। আলোকচিত্র যোগে বক্তৃতা রেডিয়ো প্রভৃতির সহায়তা এই কার্যে গ্রহণ করিতে হইবে।

কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত এই দ্বাবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি শ্রীমান মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর ইহার উদ্বোধন করিয়া ইহাকে সম্মানিত করিয়াছেন। ত্রিপুরার রাজবংশের সহিংলা সাহিত্যের অচ্ছেদ্য প্রীতির সংযোগ, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস চিরপ্রসিদ্ধ ; বহু বহু বৎসর ধরিয়া বঙ্গবাণী ত্রিপুরা রাজসভায় সম্মানিতা হইয়া আসিতেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সহিত ত্রিপুরাধীশের এই সহযোগিতার ফলে, বঙ্গসাহিত্যের সহিত এই রাজবংশের যোগসূত্র দৃঢ়তর হউক, মহারাজ শ্রীমান বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে তাঁহার পূর্বগামীদের ন্যায় অবহিত হউন এবং তাঁহার উপর সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের পরিবর্ধনের সহায়তা করিয়া সমগ্র বঙ্গভাষী জনগণকে তিনি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন।

কুমিল্লা অধিবেশনের দ্বাবিংশ সম্মেলনে প্রদত্ত।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

সভাপতির অভিভাষণ

পূর্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনি
একাদশ অধিবেশন কিশোরগঞ্জ
১০ ও ১১ আষাঢ় ১৩৪৫

পূর্ব ময়মনসিংহের সাহিত্যামোদী বন্ধুগণ,

এই স্থান বাংলার শেষ স্বাধীন বীর ঈসা খান মসনদ আলী এবং তাঁহার যোগ্য বংশধরগণ দেওয়ান মুসা খান, মাসুম খান ও মনুয়ার খানের কীর্তিগানে মুখরিত। নারায়ণ দেব, দ্বিজ বংশীবদন, চন্দ্রাবতী, নয়ান চাঁদ ঘোষ, জমাতুল্লা, মনসুর বয়াতি প্রমুখ কত কবি ও গায়েন এই অঞ্চল ধন্য করিয়াছেন। এই পূর্ব ময়মনসিংহ কাব্য ও গীতিকথার এক গুঞ্জনমুখর নিকুঞ্জ। সেই পূর্ব ময়মনসিংহের সাহিত্য-সম্মিলনীর একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে আপনারা আমাকে সভাপতির পদ গ্রহণে আমন্ত্রণ করিলে, আমি সকল কাজকর্ম ছাড়িয়া মধুলুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় আপনাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমার কৃতজ্ঞ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু আপনাদের সভাপতি নির্বাচন বিষয়ে আমি আপনাদিগকে অভিনন্দিত করিতে পারিতেছি না।

শ্রদ্ধেয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংকলিত *ময়মনসিংহ গীতিকা* ও *পূর্ববঙ্গ গীতিকা* প্রকাশের পূর্বে কে জানিত যে বঙ্গসাহিত্যের এক অপূর্ব মধুর ভাণ্ডার এ অঞ্চলে ভাষাজননী সাদরে নিজ অঞ্চলে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। Thomas Perey-র *Reliques of Aneient English Poetry* (১৭৬৫ খ্রি. অ.) প্রকাশের ফলে যেমন ইংরেজি সাহিত্যে এক নূতন ধারা সংযোজিত হইয়াছিল, এই *ময়মনসিংহ গীতিকা* ও *পূর্ববঙ্গ গীতিকা* প্রকাশেও তদ্রূপ বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিতে হইয়াছে।

যেমন চন্দন তরুগুলি মলয় পর্বতের নিজস্ব সম্পদ, ময়মনসিংহ গীতিকাগুলিও এই পূর্ব ময়মনসিংহেরই নিজস্ব সম্পদ। এখানকার জলে স্থলে আকাশে বাতাসে গীতিকাগুলি

গানের সুরের রেশের ন্যায় ছড়াইয়া রহিয়াছে। মলুয়ার করুণ স্মৃতি-কণা এই কিশোরগঞ্জের আরালিয়া গ্রাম, জাহাঙ্গীরপুর, ধনাই বিল, ধনু নদী ও সুত্যা নদী আজও বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। এই মহকুমার পাতুয়ার গ্রামে দ্বিজ বংশীদাস ও যৌবনে যোগিনী চন্দ্রাবতী পিতা ও দুহিতায় একত্রে মনসার ভাসান রচনা করিয়াছিলেন। চন্দ্রাবতীর রামায়ণও প্রকাশিত হইয়াছে। সুন্ধা নদী আজও চন্দ্রাবতীর নয়নের জলে ভিজিয়া আছে। পাতুয়ার গ্রামের নিকটস্থ জালিয়ার হাওর ও ফুলেশ্বরী নদী অনুতপ্ত ডাকাত কেনারামের স্মৃতির সহিত জড়িত রহিয়াছে। নেত্রকোণা মহকুমার বামনকান্দা, উলুয়াকান্দা ও কংস নদী নৃত্যচঞ্চল মহুয়া ও প্রেমিক নদের চাঁদের স্মৃতি মনে জাগাইয়া তোলে। নেত্রকোণার দক্ষিণে বিপ্রগ্রাম ও রাজী নদী কবি কঙ্ক ও লীলার বিরহের শোকসন্তপ্ত বায়ু এখনও বহন করিতেছে। এই কবি কঙ্ক চৈতন্যদেবের কিঞ্চিৎ পরবর্তী ও বিদ্যাসুন্দরের একজন আদি কাব্য-লেখক। কত নাম করিব? এ অঞ্চলের গীতি-লেখকেরা কাব্যের বস্তুর জন্য পুরাণের পুঁথি ঘাঁটিতে যান নাই কিংবা কোনো দূর দেশ হইতে নায়ক নায়িকা আমদানি করেন নাই! নিজেদের বাড়ির চারিপাশে কাব্যের যে অপরূপ সুরভি ফুল ফুটিয়াছিল, তাহা হইতেই তাঁহারা অম্লান গীতিমাল্য রচনা করিয়াছেন। ময়মনসিংহ গীতিকার এই এক চমৎকার বিশেষত্ব। এই জন্যই সেগুলি এরূপ বস্তুতান্ত্রিক, এরূপ স্বাভাবিক, ও এরূপ মর্মস্পর্শী।

শ্রদ্ধেয় শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রসাদে আমরা এ পর্যন্ত ৫৪টি গীতি কবিতা ও রূপকথা পাইয়াছি। তাহাদের মধ্যে ১২টি মুসলমান কবির রচিত। ইহাদের অনেকগুলি এই পূর্ব ময়মনসিংহ হইতে সংগৃহীত। এইগুলির সাহিত্যিক মূল্য বিদেশের সাহিত্য-রসিকেরা কি দিয়াছেন ; তাহা জানিলে বোধ হয় আমরা আমাদের ঘরের জিনিসকে একটু বেশি আদর করিব। 'গোরু গোয়াল-দোরের ঘাস খায় না'—এ প্রবাদ আমাদের সম্বন্ধে অনেকটা প্রযোজ্য বটে।

বিদুষী Madame Andres Carpeles Hoegman বলিয়াছেন :

> These ballads were a revelation to me. Though since 20 years I study as much as I can anything that concerns India, I never suspected such treasures were still in store for me. Those characters of Bengali heroines ought to be familiar to everybody and my dream is that they should be translated in French.

মনীষী M. Romain Rolland বলেন .

> I was specially delighted with the touching story of Madina which although only two centuries old is an antique beauty and a purity of sentiment which art has rendered faithfully without changing it. Chandravati is a very

noble story and Malua, Kanka and Lila are charming to mention only these ones.

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির মি. উইলিয়াম ভি. অ্যাল্লেন বলেন :

> In these Mymensingh ballads I found an instinct for original thinking, countless instances of individual swaraj, and a high value attached to deeds in contrast to passiveness–all of which confirmed my conviction on reading history that India could never have reached such age unless bearing within it the roots of unweakening youth.

আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অনার্সের পাঠ্যতালিকায় 'মহুয়া' স্থান পাইয়াছে। কিন্তু প্রকাশিত গীতি-কথা লইয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। কবি গ্রের কবিতার 'full many a gem of purest ray serene'-এর ন্যায় কত অমূল্য সাহিত্যিক মণিমাণিক্য বাংলার চারিদিকে বিশেষত পূর্ব ময়মনসিংহের কোথায় কোন্ গায়েনের ঘরের কোণে লুকাইয়া আছে, কে জানে। এইগুলিকে প্রকাশ করিতে হইবে। আনন্দের বিষয় আমার চেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে সম্প্রতি চেষ্টিত হইয়াছেন। কিন্তু স্থানীয় সাহিত্য সেবকগণের আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত কোনো প্রতিষ্ঠানই এই বিষয়ে সফলকাম হইতে পারে না। আরও অনেক কাজ আছে। তাহার জন্য বঙ্গবাণীর সেবক ও ভক্তগণের ধারাবাহিক সুশৃঙ্খলাবদ্ধ যত্নের প্রয়োজন। একে একে তাহাদের কথা বলিব।

আমাদের সেই শিশুকালের মনভোলানো কাহিনির কতগুলি সংগৃহীত হইয়াছে? Rev. লালবিহারী দে, শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রমুখ দুই-চারিজন লেখকের চেষ্টায় অতি সামান্যই উপকথা প্রকাশিত হইয়াছে। বহু সহস্র এখনও কালি কলমে ধরা পড়ে নাই। ইউরোপে ও আমেরিকায় বহু Folk-Lore Society আছে। তাহাদের চেষ্টার ফলে বিভিন্ন দেশের উপকথা বহু ভলুম পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমস্ত উপকথার বৈজ্ঞানিক তুলনামূলক আলোচনায় নৃতত্ত্বের কত মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাংলার উপকথা যদি সিংহল, কাম্বোডিয়া, সুমাত্রা, জাভা বা বালিদ্বীপে আমরা পাই, তবে সে দেশগুলির সঙ্গে বাংলার ঔপনিবেশিক সম্বন্ধের একটা বড়ো প্রমাণ পাওয়া গেল না কি? বাংলার কোনো উপকথা যদি কোল, সাঁওতাল, খাসী, মন্, খের প্রভৃতি অস্ট্রো-এশিয়াটিক জাতির মধ্যে, কিংবা বোড়ো, নাগা, গারো, টিপ্‌রা তিব্বতি-বর্মা জাতির মধ্যে, অথবা তামিল, তেলেগু, কানাড়ি, মালাবরি, তুলু, কুড়াগু প্রভৃতি দ্রাবিড় জাতিদের মধ্যে বিকৃত বা অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে বাংলার আর্য জাতিদের রক্তের অনেক গুপ্ত রহস্য বাহির হইয়া পড়ে না কি? এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক বিষয় ভিন্ন শিশুসাহিত্যের জন্য 'রাখালের

পিঠাগাছ', 'দুয়ো রাণীর ও সুয়ো রাণীর কাহিনী', 'রাজপুত্তুর ও কোটালপুত্তুরের কাহিনী', 'রাক্ষস রাক্ষসীর কাহিনী' প্রভৃতি উপকথাগুলি কি কম মূল্যবান্? আমরা এগুলি ছাড়িয়া Grimms' Fairy Tales বা আরব্য উপন্যাসের ইংরেজি বা বাংলা অনুবাদ শিশুদের হাতে দিতেছি! এখনকার স্কুলের ছেলেমেয়েরা Jack the giant-killer-এর গল্প জানে, কিন্তু দেশের রূপকথা জানে না।

ব্রতকথাগুলিও উপেক্ষার বিষয় নহে। এই ব্রতকথাগুলির কতক গদ্যে, কতক গদ্যে ও পদ্যে, কতক শুধু পদ্যে। অশিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যেও সত্য পিরের সিন্নি, ত্রিলক্ষ পিরের সিন্নি প্রভৃতি অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। এই উপলক্ষে প্রাচীন কাহিনিও শোনা যায়। ব্রত ও ব্রতকথাগুলি লইয়া লৌকিক ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করা যাইতে পারে। কিন্তু বাংলার বিভিন্ন স্থানের ব্রতকথাগুলি এখনও সংগৃহীত হয় নাই। বিভিন্ন জেলার ব্রতের ছড়াগুলি তুলনা করিলে যে পাঠভেদ লক্ষিত হয়, তাহা হইতেও অনেক কিছু শিখিবার আছে। এখানে যমপুকুর ব্রতের ছড়ার দুইটি রূপ উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথমটি পণ্ডিত অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ প্রণীত 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-সমালোচনী' হইতে, দ্বিতীয়টি শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের *খুকুমণির ছড়া* হইতে উদ্ধৃত।

১

শুষুনী কলমী ন ন করে,
রাজার বেটা পক্ষী মারে।
মারণ পক্ষী সুখের বিল ;
সোনার কৌটো রূপোর খিল।
খিল খুলতে হাতে ছড়।
আমার ভাই বাপ নক্ষেশ্বর।

২

হেলেঞ্চা কলমী লক্ লক্ করে,
রাজার বেটা পক্ষী মারে ;
মারেন পক্ষী, শুকোয় বিল,
সোনার কৌটা, রূপোর খিল ;
খিল খুলতে লাগল ছড়,
আমার ভাই, বাপ—ধনে পুত্রে লক্ষেশ্বর।
লক্ষ্মী দিয়ে গেলেন বর,
আমার ভাই, বাপ—ধনে পুত্রে লক্ষেশ্বর।

ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলি এই ব্রতকথার বীজ লইয়াই রচিত হইয়াছিল। সত্যপিরের পাঁচালি এখনও ব্রতকথার রূপ ছাড়িয়া কাব্যে পরিণত হয় নাই।

বাংলার বাহিরে কোথায়ও এইরূপ ব্রতকথা প্রচলিত আছে কিনা, তাহাও অনুসন্ধানের বিষয়। মনসামঙ্গলের বেহুলা লখিন্দরের উপখ্যান ছাপরা জিলায় প্রচলিত আছে। সেখানকার বুলিতে *বিহুলা বিষহরী* নামে পুস্তক ছাপা হইয়াছে। ইহাতে চৌপাই নগরের রাজা চান্দো সৌদাগর। তাঁহার স্ত্রী সোনিকা। উভয়ের পুত্র লখিন্দর। বিহুলার পিতামাতার নাম বাসু সৌদাগর ও মানিকো। বাসস্থান উজনি নগর। ইহাতে হাসন হোসেন পালা নাই। আসামি সাহিত্যে মনসার (পদ্মার) উপাখ্যান বাংলারই অনুরূপ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের জন্যও ব্রতকথার সংগ্রহ আবশ্যক।

ছেলে-ভুলানো ছড়া পৃথিবীর সকল ছেলেমেয়েদের মায়ের দুধেরই মতো বড়ো আদরের। এখানে সভ্য অসভ্য কোনো ভেদ নাই। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ *লোক সাহিত্য*-এ এ সম্বন্ধে ৪৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী অতি দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। পরলোকগত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী *খুকুমণির ছড়া*-য় এক দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়াছেন। বাংলার ছেলে-ভুলানো ছড়া এক সময়ের রচনা নহে। 'খোকা ঘুমুল পাড়া জুড়ল, বর্গী এল দেশে' ছড়াটি বর্গীর হাঙ্গামার সময়ের; সুতরাং আধুনিক। 'মাসীপিসী বনগাঁ-বাসী' ছড়ায় পাই—'আপনি যাব গৌড়, আনব সোনার ময়ূর'। এই ছড়াটি গৌড় রাজধানীর সময়ের। ছড়াগুলির বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত পাঠান্তর নির্ণয় এবং বাংলার বাহিরের ছড়ার সহিত তুলনা প্রয়োজন। কিন্তু এ কার্য এ পর্যন্ত কেহ করেন নাই। নমুনাস্বরূপে একটি ছড়ার পাঠ-ভেদ দিতেছি।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান।
শিবু ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান।।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান।
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান।।

লোক সাহিত্য পৃ. ১০

২

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদী এল বাণ,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান,
এক কন্যে গোঁসা করে বাপের বাড়ি যান!
বাপেদের তেল সিন্দুর, মালীদের ফুল,
এমন খোঁপা বেঁধে দেবো, হাজার টাকা মূল!

খুকুমণির ছড়া পৃ. ১২০

৩

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বাণ।
শিয়ালের বিয়ে হচ্ছে তিন কন্যা দান।।
এক শিয়ালে রাঁধে বাড়ে, এক শিয়ালে খায়।
আর এক শিয়ালে গোঁসা করে বাপের বাড়ি যায়।।
বাপের বাড়ির তেল সিন্দুর মালীর বাড়ির ফুল!
শিয়ালের বিয়ে হল ক্ষীর নদীর কূল।।
বাপ দেয় ধান দুর্বা মা দেয় ফুল।
এমন খোপা বেঁধে দিছে হাজার টাকা মূল।।

খোকা খুকুর ছড়া পৃ. ১৩

এখানে কয়েকটি লক্ষ করিবার বিষয় আছে। 'শিবু ঠাকুরের' পাঠান্তর (১) 'শিব ঠাকুরের,' (২) 'শিয়ালের'। কাজেই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ শিবু ঠাকুর সম্বন্ধে যে গভীর গবেষণা করিয়াছেন, তাহা মাঠেই মারা গেল! আমাদের অঞ্চলে শিয়ালকে উপহাস করিয়া 'শিবরাম পণ্ডিত' বলা হয়। এখানে প্রকৃত পাঠ 'শিব ঠাকুরের'; 'শিবু ঠাকুর' কিংবা 'শিয়ালের' পাঠে ছন্দে ব্যাঘাত হয়। কিন্তু শিব ঠাকুর অর্থে শিয়াল বটে। 'বাপেদের তেল সিন্দুর, মালীদের ফুল'—পাঠে ছন্দপতন হয়। 'বাপের বাড়ির তেল সিন্দুর, মালীর বাড়ির ফুল'—এই পাঠই প্রকৃত। তৃতীয় পাঠে পুরা ছড়াটি রক্ষিত হইয়াছে। বলা আবশ্যক এই পাঠ বিক্রমপুর প্রচলিত। ইহাতে গোঁসা আরবি গুস্‌সহ্ শব্দজাত এবং হাজার শব্দটি পারসি। এইরূপ বিদেশি শব্দ অন্য ছড়াতেও আছে।

ডাক ও খনার বচন ছড়াজাতীয়। ইংরেজি Nursery Rhyme-এ এইরূপ বচন পাওয়া যায়; যথা :

The south wind brings wet weather,
The north wind wet and cold together;
The west wind always brings us rain,
The east wind blows it back again.

ডাক কোনো ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে। এক শ্রেণির বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধককে ডাক বলিত।

অন্তরালেষু যচ্চিত্তং তচ্চিত্তং সমরসীগতম্।
ডাকঃ সম্ভবতে তস্মাৎ মহামণ্ডলযোগতঃ।।

ডাকার্ণব

ডাকের বচন বাংলা, আসামি ও উড়িয়ায় দৃষ্ট হয়।

বাংলা

১

নিয়ড় পোখরি দূরে যায়।
পথিক দেখিয়ে আউড়ে চায়।।
পর সম্ভাষে বাটে থিকে।
ডাক বলে এ নারী ঘরে না টিকে।।

আসামি

ওচরত পুখুরী দূরক যায়।
পরক আশায়ে বাট চায়।।
পর ঘর হন্তে রাখিব নারী।
তেবেসে ধর্মক রাখিতে পারি।।

উড়িয়া

নিয়ড় পোখরি দূরে যাএ।
পথিক দেখি আউড়ে চাএ।।
পর সম্ভাষে বাটে থিকে।
ডাকে বোলে এ নারী ঘররে ন টিকে।

বাংলা

২

পানি ফেলিয়া পানিকে যায়।
আন পুরুষে আড়ে চায়।।
তারে নাহি বলিহ সতী।
স্বরূপে সে দুষ্টমতি।।

আসামী

পানীক পেলাই পানীক যায়।
ডাকে বোলে তাইক নি দিবা ঠাই।।

বাঙলা

৩

যাহার বহু ঝি দূরে যাতি।
নিকটে যার বৈঠে অসতী।।
কথা হইতে করে হাস।
বলে ডাক জার নির্জাস।।

আসামী

যাহার বহুরী দূরক যান্তি।
সি জনী সতীর ধর্ম্ম ন পান্তি।।

খনার বচন ডাকের বচনের ন্যায় ; তবে উহা প্রধানত ফলিত জ্যোতিষ ও কৃষিবিষয়ক। খনার অর্থ খাঁদা। বচনগুলি খনার নামে আরোপিত হইয়াছে। কয়েকটি বচন রাবণের নামেও রচিত দেখা যায়। খনার বচন উড়িয়া ভাষাতেও দৃষ্ট হয়।

বাংলা

হাত বিশে করি ফাঁক।
আম কাঁঠাল পুতে রাখ।।
গাছাগাছি ঘন সবে না।
ফল তাতে ফলবে না।।

উড়িয়া

হাত বিশো করি ফাঁক।
অম্ব কণ্ঠল পুথি রাখ।।
গছ গছলি ঘন হেবো না।
গছ হেব ত ফল হেব না।।

এই ডাক ও খনার বচন যে সমস্তই সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। শহরের ভদ্রলোকেরা তাহা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছে ; কিন্তু পল্লির দুলাল কৃষকেরা তাহাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় এই সমস্ত ছড়াগুলি সযত্নে মনে গাঁথিয়া রাখিয়াছে।

এবার গানের কথা বলি। কোকিল দোয়েল শ্যামা পাপিয়ার কলতানে মাতোয়ারা পল্লির প্রাণে গান স্বতঃই ফুটিয়া ওঠে। তাই অসংখ্য গান পল্লির ঘাটে মাঠে বাটে ছড়াইয়া আছে। চাষি, মাঝি, মাল্লা, ফকির, বৈরাগী ইহারাই তাহার রচয়িতা। সেগুলির সন্ধান কে রাখে? বনফুলের মতো মিষ্ট সুবাস বিলাইয়া তাহারা কালে বিস্মৃতির শুষ্ক ভূমিতে ঝরিয়া পড়ে। এগুলিকে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলে দেখা যাইত বৈষ্ণব পদাবলির পাশে তাহাদেরও একটি সুন্দর স্থান আছে, দেখা যাইত নিরক্ষর মুসলমান কবির মারফতি গান সাধক রামপ্রসাদের পদের স্পর্ধা করিতে পারে। এখানে একটি মারফতিপদ তুলিয়া দিতেছি :

মন আমার চিনির বলদ চিনি বয়, চিনে না চিনি,
ও! ভুলে কল্লি না একদিন চিনির সাথে চিনা চিনি।
কার কি কুমন্ত্রনা পেলে,

ঘোল খেতে চাও মাখম ফেলে,
ওহে! বুঝবে মজা নোকরি পেলে,
(তখন) সার হবে শুধুই কাঁদুনি।
ওহে! সোনার কমল গেছ ভুলে,
মজে আছ শুক্‌নো ফুলে ;
আবার সোজা পথে কাঁটা দিলে,
কি সাহসে বল শুনি।
ওহে! জমির বলে অবোধ মন,
বাঁচবে যদি চিনি চিন,
কেন কড়ি দিয়ে জহর কিন,
আপন হাতে খাও আপনি।

আজকাল বিদেশি খেলার চাপে দেশের সাবেক খেলাধুলা একরূপ বিদায় লইয়াছে। বাংলার নানাস্থানে নানারূপ দেশি খেলা প্রচলিত আছে। কতক খেলার সঙ্গে নানা ছড়া ব্যবহৃত হয়। আমাদের অঞ্চলে কপাটী খেলার সঙ্গে খেলুড়েকে 'চু' টানিতে হয়। এক দমে কতকগুলি কথা বা ছড়া বারংবার আবৃত্তি করিতে হয়, ইহাকে 'চু টানা' বলে। কেহ বলে শুধু 'কপাটী, কপাটী,' কেহ ছড়া বলে ; যেমন :

চু যাব চরণে যাব।
পাতিনেবুর মাতি খাব।।

কিংবা :

এক হাত বোল্লা, বারো হাত শিং।
উড়ে যায় বোল্লা, ধা তিং তিং।।

খেলার বিবরণের সহিত এ সকল ছড়াও সংগ্রহ করা আবশ্যক। অবশেষে এগুলি ডোডো পক্ষীর দশা পাইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়।

এখন হিঁয়ালির কথা বলি। হিঁয়ালি প্রাচীন জগতের সৃষ্টি। গ্রিক সাহিত্যে দেখি রাক্ষসী স্ফিংক্‌স প্রশ্ন করিত, কোন্ জীব আছে বাল্যে চতুষ্পদ, যৌবনে দ্বিপদ ও বার্ধক্যে ত্রিপদ। এই সমস্যা পূরণ করিতে না পারিয়া কত লোক প্রাণ দিয়াছিল। অবশেষে কিন্তু ঈদিপুস্ তাহার উত্তর দিয়াছিলেন যে সেই জীব মনুষ্য, এবং রাক্ষসীকে হত্যা করিয়াছিলেন। সুদূর বিদেশ হইতে ঘরের দিকে ফিরিলে দেখিতে পাই কবিকঙ্কণ চণ্ডীর শারী-শুক-সংবাদে শুক কয়েকটি সমস্যা পূরণ করিতে বলিতেছে। তাহার একটি সমস্যা এখানে

উদ্ধৃত করি :

জীয়ন্তেতে মৌনী সে মরিলে ভাল ডাকে।
অঙ্গেতে নাহিক ছাল বিধির বিপাকে।।
অবশ্য আনয়ে নর মঙ্গল বিধানে।
হিঁয়ালি প্রবন্ধ কবি কঙ্কণেতে ভণে।।

শঙ্খ

এই ভারতবর্ষে সমস্যা পূরণ অতি প্রাচীন। ঋগ্‌বেদে ইহার অনেকগুলি উদাহরণ আছে। একটি উদ্ধৃত করি :

দ্বাদশ প্রধয়শ্চক্রমেকং ত্রীণি নভ্যানি ক উ তচ্চিকেত।
তস্মিন্‌ৎসাকং ত্রিশতা ন শংকবোঽর্পিতাঃ ষষ্টি র্ন চলাচলাসঃ।।

১।১৬৪।৪৮

দ্বাদশ নেমি, এক চক্র ও চক্রের তিন ছিদ্র। কে তাহা জানে? তাহাতে ৩৬০টি চলাচল অর (spoke) আছে। (অর্থ—নেমি = চক্রমাস, = বৎসর, ছিদ্র = ঋতু, অর = দিন)।

বাংলা দেশে বহু হিঁয়ালি মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। আমাদের ২৪ পরগনা অঞ্চলের দুটি হিঁয়ালি বলি :

১

আকাশ গুড়্ গুড়্ পাথর ঘাটা।
সাত শ ডালে দুটি পাতা।। চাঁদ ও সূর্য

২

বাগান থেকে বিরুল টিয়ে।
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।। আনারস

এই সমস্ত হিঁয়ালি সংগ্রহ করিলে শিশুসাহিত্যের এক চমৎকার উপাদান হয়। আজকালকার বাক্য পূরণ সমস্যা অপেক্ষা আমাদের হিঁয়ালিগুলি কম বুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

এখন প্রবাদবাক্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। সুন্দরীর অলক তিলকের ন্যায় প্রবাদ বাক্যগুলি ভাষার সৌন্দর্য ফুটাইয়া তোলে। অতীতের মনস্তত্ত্ব এবং ইতিহাসও অনেক প্রবাদ বাক্যে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের ভাষাগুলির প্রবাদ বাক্য তুলনা করিলে অনেক কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বাংলা সাহিত্যে প্রবাদ বাক্যের প্রয়োগ অতি প্রাচীনকাল

হইতেই পাওয়া যায়। বৌদ্ধ গানের একটি চর্যাপদে পদকর্তা ভুসুকু বলিতেছেন, 'আপনার মাংসেঁ হরিণা বৈরী।' *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ পাই, 'আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরি।' কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে আছে, 'হরিণ জগৎ বৈরী আপনার মাংসে।' বাংলা দেশে এই প্রবাদ এখনও কোনো স্থলে অবশ্য প্রচলিত আছে, যদিও কোনো পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বর্তমানে আসামে ইহার প্রচলনের প্রমাণ Major Gordon-এর Some Assamese Proverbs : 'হরিণার মাংসই বৈরি।' *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ দৃষ্টান্ত স্থলে দুইবার বলা হইয়াছে, 'মাকড়ের হাথে যেহ্ন ঝুনা নারিকেল।' হিন্দিতে ঠিক এইরূপ প্রবাদ বাক্য আছে : 'বান্দর কে হাথ মেঁ ঝুনা নারিয়ল।' নারিকেল ত পশ্চিম দেশে হয় না। তবে কি বাংলা হইতে এই প্রবাদ পশ্চিমে গিয়াছে? প্রবাদ বাক্যগুলির কয়েকটি সংগ্রহ দেখিয়াছি ; কিন্তু কোনোটাই সম্পূর্ণ বলিতে পারি না। প্রাদেশিক প্রবাদ বাক্যগুলিরও সংগ্রহ আবশ্যক। এ বিষয়ে জনাব মোহাম্মদ হানিফ পাঠান সাহেবের 'পল্লী সাহিত্যের কুড়ানো মাণিক' পথ প্রদর্শক হইতে পারে। এই পুস্তিকায় ঢাকা জিলার ২৩৫টি প্রবাদ বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে।

সাধারণ সংস্কারগুলি অতি প্রাচীন। পেঁচার ডাককে আমরা অশুভ মনে করি। ঋগ্‌বেদের যুগেও সেইরূপ বিশ্বাস ছিল। ঋষি বলিতেছেন :

যুদুলূকো বদতি মোঘমেতদ্ যৎ কপোতঃ পদমগ্নৌ কৃণোতি।
যস্য দূতঃ প্রহিত এষ এতৎ তস্মৈ যমায় নমো অস্তু মৃত্যবে।।

১০।১৬৫।৪

এই পেচক যাহা বলিতেছেন, তাহা মিথ্যা হউক। কারণ এই কপোত অগ্নিস্থানে উপবেশন করিতেছে। যাঁহারা প্রেরিত দূতস্বরূপ এ আসিয়াছে, সেই মৃত্যুস্বরূপ যমকে নমস্কার করি।

রমেশ দত্তের অনুবাদ

নৃতত্ত্বের ও ধর্ম-বিশ্বাসের আলোচনায় এই সংস্কারগুলির মূল্য অত্যন্ত বেশি। কিন্তু সাহিত্যের অর্থ বোধের জন্যও ইহার মূল্য কম নয়। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ শ্রীমতী রাধিকা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন :

ভাদর মাসের তিথি চতুর্থীর রাতী।
জল মাঝেঁ দেখিলোঁ মো কি নিশাপতী।।
পুন্ন কলসে কিবা ভরিলোঁ হাথে।
যে কারণে বাঁশী চুরি দোষসি জগন্নাথে।।
জানি মেন—আল বড়ায়ি কাহ্নের কাঁহিনী।
কলঙ্ক থুয়িল মোর বাঁশী চুরণী।।
গুরুর আসনে কিবা চাপিআঁ বসিলোঁ।
জলের আখর কিবা ভূমিত লেখিলোঁ।।

খণ্ডবিচনীর কিবা বাঅ (পাঅ) তুলী লৈলোঁ গাএ।
তে কারণে কাহ্নাঞিঁ বাঁশী চুরি দোষাএ।।

৩২১ পৃ.

এইরূপ সংস্কার এখনও বোধ হয় অশিক্ষিত সমাজে আছে।

এই সকল সংস্কার উপলক্ষ্যে নানা উপকথাও প্রচলিত আছে। চাঁদে কলঙ্ক কেন— হিন্দু পুরাণে বলা হইয়াছে যে চন্দ্রের কোলে একটি মৃগ আছে, এবং এই সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই জন্য সংস্কৃতে চন্দ্রের এক নাম মৃগাঙ্ক। বৌদ্ধ জাতকে বলা হইয়াছে সক্ক (শক্র) চাঁদের উপর শশকের ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন এবং এই সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের শশকরূপে পূর্ব জন্মের একটি উপাখ্যান বর্ণনা করা হইয়াছে। হিন্দুগ্রন্থে ইহা না থাকিলেও সাধারণের যে এইরূপ সংস্কার ছিল, তাহার প্রমাণ চন্দ্রের শশধর, শশাঙ্ক নাম। আমাদের লোক-সংস্কার ছিল বা আছে যে চাঁদের মা বুড়ি বটতলায় বসিয়া সুতা কাটিতেছে। আজ আমাদের বিজ্ঞানের আলোয় চাঁদের কলঙ্ক দূর হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর অনেক আদিম জাতি চাঁদের কলঙ্ক সম্বন্ধে নানারূপ বিশ্বাস করে। তাহাদের মধ্যে কোনো জাতির বিশ্বাস উহা শশক, কাহারও বিশ্বাস উহা ভেক, কাহারও বা বিশ্বাস উহা শৃগাল। Mr. Thomas Harley এই সম্বন্ধে *The Moonlore* নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। এইরূপ সাধারণ সংস্কারকে folklore বলে, বাংলায় আমরা ইহাকে 'লোক-সংস্কার' বলিতে পারি। ইউরোপ আমেরিকায় এই লোক-সংস্কার সংগ্রহ ও আলোচনার জন্য অনেক বড়ো বড়ো সমিতি আছে এবং এ সম্বন্ধে নানা ভাষায় বড়ো বড়ো বই লেখা হইয়াছে। ইহা সাহিত্যের অঙ্গ না হইলেও সাহিত্যের আনুষঙ্গিক রূপে আমরা আমাদের দেশের লোক-সংস্কারগুলি সংগ্রহ ও অন্য দেশের সহিত তাহাদের তুলনামূলক আলোচনা করিতে পারি।

সাহিত্যের ভিত্তি ভাষা। এই ভাষার ইতিহাসের জন্য বাংলা দেশের প্রত্যেক স্থানের বুলির নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে। ভাষাতাত্ত্বিকের নিকট ভদ্র অভদ্র কোনো বুলি নাই। অনেক স্থলে তথাকথিত অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণির বুলিতে ভাষার প্রাচীন রূপ পাওয়া যায়। কয়েকটি উদাহরণ দিই। পরিধান অর্থে পেন্ধা শব্দ এখন সাহিত্যে অচল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যযুগের সাহিত্যে ইহার বহুল প্রয়োগ ছিল।

নাহিঁ পিন্ধে উত্তম বসনে।
শরীরে দুবল ভৈল কাহ্নে।।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ৩২৮ পৃ.

পিন্ধ—সংস্কৃত পিনদ্ধ, অপিনদ্ধ।

প্রভাত অর্থে বিহান শব্দ এখন অপ্রচলিত। কিন্তু বৌদ্ধগানের সময় হইতে মধ্যযুগের সাহিত্যে ইহার ব্যবহার ছিল।

জীবনে ভেলা বিহাণি (বিহুণি)। *বৌদ্ধগান* ৪০ পৃ.

কালি যাইব আহ্মে বড়ায়ি বিহাণী।

তোহ্মে সোঁঅরিহ বড়ায়ি আহ্মার বাণী।। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* ৩০ পৃ.

বিহান—কথ্য সংস্কৃত বিভান।

পানি শব্দ এখন মুসলমানি বাংলা। কিন্তু পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সর্বত্র ইহার ব্যবহার ছিল। এখনও 'হালে পানি পায় না', 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' ইত্যাদি বাক্যে এবং পানিফল, পানি বসন্ত, পানসা ইত্যাদি শব্দে সাহিত্যে ইহার ব্যবহার আছে।

পালি—গঙ্গায় পানীয়ং পিবিত্বা।

সুংসুমার-জাতক

পানীয়ং সলিলং দকং'। *অভিধানপ্পদীপিকা*

প্রাকৃত—হয়-কম্হার-হুরড়ঈ-চিক্কিণ-তিমিরস্স গহিয়-পাণীয়া।

পাণিয়-তড়ম্মি বিপ্পা অজ্জুণ্ণ-সূরস্স দেন্তগ্ ঘং।। *কুমারপাল চরিত* ১।৬৫

অপভ্রংশ—গিরিহেঁবি আণিউ পাণিউ পিজ্জই। *কুমারপাল চরিত* ৮।১৯

প্রাচীন বাংলা—তিণ ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন্ পাণী।

হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জাণী।।

বৌদ্ধগান ১২ পৃ.

মধ্যম বাংলা—মারন্তাকে যে না মারে।

তার পাণী না লএ পীতরে।। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* ২৭৬ পৃ.

ভোখে (ভোজ্যে) অন্ন দিলা জে তৃষাতে দিল পানি।

তাহার ভোজন পান দেখিল আপনি।।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ *রামায়ণ* উত্তরকাণ্ড, ৭৩ পৃ.

ব্যাকরণের দিক্ হইতেও প্রাদেশিক বুলি ভাষাতত্ত্বের অনেক সাহায্য করে। বাংলার কয়েকটা বুলিতে এখনও 'মুই' কর্তার সহিত ক্রিয়ার একবচন এবং 'আমি' কর্তার সহিত ক্রিয়ার বহুবচন ব্যবহৃত হয়। পূর্ববঙ্গের করব, চলব পশ্চিমবঙ্গের করবে, চলবে অপেক্ষা প্রাচীন রূপ রাখিয়াছে।

Sir George Grierson-এর অধ্যক্ষতায় বাংলা সমেত সমস্ত ভারতবর্ষের সভ্য অসভ্য সকল ভাষার ও বুলির নমুনা *Linguistic Survey of India* নামক বিরাট গ্রন্থমালায় সংগ্রহ করা হইয়াছে। আমার নিকট কিন্তু তাঁহার বাংলা বুলির সংগ্রহ বৈজ্ঞানিকরূপে হয় নাই বলিয়াই মনে হইয়াছে। আমাদিগকে এই কার্য সুসম্পন্ন করিতে হইবে। বুলির বৈজ্ঞানিক

জরিপের জন্য জানা প্রয়োজন কোথায় কোনো বুলির আরম্ভ এবং কোথায় তাহার শেষ। যেমন ধরুন কলিকাতা হইতে বরাবর উত্তর-পূর্বে আসিতে আসিতে কোথায় আমাদের, তোমাদের ইত্যাদি শব্দরূপ শেষ হইয়া আমাগো, তোমাগো হইল ; কোথায় বা আমাগো, তোমাগো শেষ হইয়া আমারগো, তোমারগো হইল, কোথায় বা আমাগোর, তোমাগোর হইল, কোথায় বা আমরার, তোমরার হইল ; কোথায় বা আঁরার, তোঁরার হইল; ভাষাতত্ত্বের জন্য এই সমস্ত বুলির একটি নির্দিষ্ট চৌহর্দি জানা প্রয়োজন। ইউরোপের কোনো কোনো দেশে এইরূপ বুলির জরিপ হইয়াছে। আমাদের দেশেও ইহার আবশ্যকতা আছে।

উপসংহারে বিশেষ করিয়া এই পূর্ব ময়মনসিংহের সাহিত্যিকদের নিকট আমার অনুরোধ তাঁহারা যেন নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের এক বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করেন। প্রায় চারি শত বৎসর পূর্বে চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পরে নারায়ণ দেব এই কিশোরগঞ্জ মহকুমার নসিরউজ্জিয়াল পরগনার বোর গ্রামে মৌদ্‌গল্য গোত্রে কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত পদ্মাপুরাণ বাংলা ও আসামে এখনও সাদরে পঠিত হয়। ময়মনসিংহের চারু প্রেসে ১৩১৪ খ্রিস্টাব্দে এই পদ্মপুরাণ একবার ছাপা হইয়াছিল। তাহা এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। আমার একটি প্রিয় ছাত্র আমাকে ইহার একখানি উপহার দেয়। ইহাতে কিন্তু বৈদ্য জগন্নাথ, দ্বিজ বংশীদাস, বিপ্র জানকীনাথ. চন্দ্রাবতী প্রভৃতি অনেক কবির পদ মিশ্রিত হইয়াছে। আমরা নারায়ণ দেবের একটি খাঁটি গোটা বই চাই। এখানে একটি পদের বাংলা ও আসামী পাঠ উদ্ধৃত করিব। তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে কালক্রমে একই পুস্তকের কত পাঠান্তর ঘটিয়াছে।

বাংলা পাঠ

ওঠ ওঠ ওহে প্রিয়া কত নিদ্রা যাও।
কাল নাগে খাইল মোরে চক্ষু মেলি চাও।।
তুমি হেন অভাগিনী নাহি ক্ষিতি তলে।
অকারণে রাঁড়ি হৈলা খণ্ড ব্রত ফলে।
কত খণ্ড তপ তুমি কৈলা গুরুতর।
সে কারণে তোমা ছাড়ি যায় লক্ষ্মীন্দর।।
মাও সোণকা মোর মৃত্যু কথা শুনি।
অগ্নিকুণ্ড করি মায়ে ত্যজিবে পরাণি।।
আমার মরণে মায়ে.বড়ো পাবে তাপ।
পুত্র শোকে মাও মোর সাগরে দিবে ঝাপ।।
আমার মরণে মাও হইবে পাগল।

মাগনি হইয়া মায়ে বেড়াবে সহর।।
ছয় পুত্র পাশরিল আমাকে দেখিয়া।
কেমনে ধরাবে দুঃখ মা ঘরে রৈয়া।।
খেয়াতি রাখিল মায়ে সংসার জুড়িয়া।
মায়ে পুত্রে মরিবেক চিতাতে পুড়িয়া।।
চিতা সাজাইবে নিয়া গুঙ্গড়ীর তীরে।
আমা সঙ্গে প্রবেশিবে অগ্নির মাঝারে।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সরল পাঁচালী।
পয়ার ছাড়িয়া এক বলিব নাচাড়ী।।

আসামী পাঠ

দিহা— বেহুলা জাগ, উঠা মোর প্রিয়া।
উঠা উঠা প্রাণেশ্বরী কত নিদ্রা যাস।
মোক খাইলা কাল নাগে চক্ষু মেলি চাস।।
তোর সম অভাগী নাহিকে ক্ষিতি তলে।
অকালত রাঁরী ভৈলী খণ্ড ব্রতর ফলে।।
কতোজন্মে খণ্ড ব্রত কৈলি বহুতর।
সেহি দোষে তোক এরি যাও লখিন্দর।।
মাপ সনেকা মোর মরণ শুনিলে।
অগনি জালিয়া মাঘ গাঘর অঞ্চলে।।
আমার মরণে মাঘ মরিব পুরিয়া।
খ্যাতি রাখিবো মাঘে সংসার জুরিয়া।।
বিষর জালত লখাই বিনায়ে বচন।
কালনিদ্রা হৈয়া বেহুলার নাহিকে চেতন।
কায়া আঙ্গুলির বিষে ব্রহ্মার দ্বার পাইলা।
বেহুলা বেহুলা লখাই ডাকিবে লাগিলা।।
সুকবি নারায়ণ দেবর সরস পাঞ্চালী।
লখাইর করুণা বুলি এক যে লেচারী।।

পল্লি-সাহিত্য, পল্লির লোক-সংস্কার ও পল্লির ভাষা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলাম। এ সমস্ত কি আমার অরণ্যে রোদন হইবে? তারাদর্শক জ্যোতিষিকের মতো আমরা উর্ধ্বে বড়ো বড়ো জিনিস দেখিতেছি বা দেখিতে চেষ্টা পাইতেছি। কিন্তু পদ-পার্শ্বে যে কত অমূল্য হীরা মাণিক গড়াগড়ি যাইতেছে, তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করিতেছি না। আধুনিক বাংলা

সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইতেছে সত্য; কিন্তু তাহার ভাব বিদেশের আমদানি। খদ্দরের কাপড়ে আমরা বিলাতি সুট তৈয়ারি করিতেছি। দেশি খাটে শুইয়া বিলাতের স্বপ্ন দেখিতেছি। আজ আমাদের মহাকাব্য, খণ্ড কাব্য, গীতি কাব্য, কবিতা, গান, গল্প, নাটক, উপন্যাস সবই পশ্চিমের ভাবে ভরপুর। বাঙালি সাহিত্যিক, আজ তুমি ঘরের দিকে ফের। বিলানি ডেষি, ড্যাফোডিল, ক্রিসান্‌থেমসের চটকে গন্ধরাজ, জুঁই, বেলা, চামেলী, চাঁপা, অপরাজিতাকে উপেক্ষা করিও না। বিদেশি ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা করো ভালই; কিন্তু স্বদেশি ভাষা ও স্বদেশি সাহিত্যের সেবায় ত্রুটি করিও না। স্বদেশি সাহিত্যের সেবায় দেশপ্রীতি জাগিবে, হিন্দু-মুসলমানের ভেদ ঘুচিবে, স্বরাজ্য আসিবে।

বাঙালির পণ
বাঙালির আশা
বাঙালির কাজ
বাঙালির ভাষা
সত্য হউক
সত্য হউক
সত্য হউক
হে ভগবান।।

স্বস্তি! আমীন!

বিজ্ঞান

অক্ষয়কুমার দত্ত

হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাংবৎসরিক সভার বক্তৃতা

সপ্তাহ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পরে সূর্য প্রকাশ হইলে চিত্ত কী প্রকার প্রফুল্ল হয়! গ্রীষ্মেতে গাত্র দাহ হইয়া পরে মন্দ মন্দ শীতল বায়ুর হিল্লোলে শরীর স্নিগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে অন্তঃকরণে কি প্রকার সন্তোষের উদয় হয়! সেই রূপ হিন্দুদিগের মলিন চরিত্রকে ক্রমশ উৎকৃষ্ট দেখিয়া চিত্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছে। আমরা কত কাল আক্ষেপ করিতেছি, যে স্বদেশের মঙ্গল চেষ্টা করা যে মনুষ্যের প্রধান ধর্ম তাহা ভারতবর্ষস্থ লোকদিগের চিত্ত হইতে লুপ্ত হইয়াছে, অনুৎসাহ, অল্প প্রতিজ্ঞা, দ্বেষ, কলহ, বিচ্ছেদ আমারদিগের মহাশত্রু হইয়াছে। আমরা কত কাল আক্ষেপ করিতেছি, যে আমারদিগের জ্ঞানের প্রতি সমাদর নাই, সত্যের প্রতি প্রীতি নাই, কোনো কর্মের উদ্যম নাই, এবং যতক্ষণ কোনো বিপদ মস্তকোপরি পতিত না হয় ততক্ষণ তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও হয় না। আমরা কত কাল আক্ষেপ করিতেছি, যে এ দেশীয় লোক ইতর জন্তুর ন্যায় আহার বিহারাদি অলীক আমোদকেই জীবনের মূলাধার কার্য বোধ করেন, এ প্রযুক্ত কিঞ্চিৎ কালের ঐন্দ্রিয় সুখ নিমিত্তে রাশি রাশি ধন সমর্পণ করেন; কিন্তু ইহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না, যে জগদীশ্বর কী নিমিত্তে তাঁহারদিগকে ইতর পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া বুদ্ধির সহিত ভূষিত করিয়াছেন? তাঁহার নিয়মানুসারে উপযুক্তরূপে ক্ষুধা শান্তি না করিলে যে প্রকার শরীরের সুস্থতা ভঙ্গ হয় উপযুক্তরূপে বুদ্ধির আলোচনা না করিলে সেইরূপ মূর্খতা ও কদাচার রূপ মানসিক রোগ উপস্থিত হয়, এই সত্যকে অজ্ঞাত হইয়া তাঁহারা জ্ঞানের অবহেলা সর্বদা করিয়া আসিতেছেন। পুত্রের বিবাহোপলক্ষ্যে কত ব্যক্তি লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু সেই পুত্রের বিদ্যা উপার্জন নিমিত্তে মাসে পাঁচ টাকাও ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। এক রজনীর অপবিত্র আমোদ উপলক্ষ্যে যাঁহারা সহস্র টাকা অনায়াসে ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহারা কোনো বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য দশ টাকা দান করিতেও বিমুখ হইয়াছেন। এই প্রকারে এ দেশস্থ লোকের

মনুষ্যত্বের চিহ্ন প্রায় ছিল না। কিন্তু এরূপ অবস্থা কত কাল স্থায়ী হইতে পারে? বায়ু প্রবাহিত না হইয়া কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে? কালক্রমে লোকের মনঃক্ষেত্র পরিষ্কৃত হইতে লাগিল, এবং উৎসাহের বীজ অঙ্কুরিত হইতে আরব্ধ হইল। পদ্মের ঘ্রাণ যিনি অনুভব করিয়াছেন, তিনি বন্ধুদিগকে সেই ঘ্রাণ সুখ প্রদান করিবার জন্য অবশ্য যত্নবান হয়েন। যাঁহারা জ্ঞানের স্বাদ প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারা সেই আস্বাদন সুখ অন্যদিগকে দিবার জন্য উৎসাহী হইলেন। কিন্তু কিয়ৎ কাল সে উৎসাহ কেবল মৌখিক উৎসাহ মাত্র হইল, তদনুসারে কার্য হওয়া দুষ্কর হইল। আমরা বিদ্যা বিষয়ে, লোকের উৎসাহ বিষয়ে, রাজনিয়ম বিষয়ে কত আলোচনা করিয়াছি, ধর্মাধর্মের বিষয়ে কত চর্চা করিয়াছি, এবং নানা প্রকারে স্বদেশের মঙ্গলোন্নতি জন্য কত আন্দোলন ও কত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছি, কিন্তু সে কেবল আন্দোলন মাত্র হইয়াছে। দুই বিদ্বান ব্যক্তির পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে স্বদেশের মঙ্গল তাঁহারদিগের আলাপের প্রথম সূত্র হইত, কিন্তু পৃথক হইলে চিত্তপটে সে সমুদয়ের চিহ্নমাত্রও থাকিত না। কত ব্যক্তির অন্তঃকরণে উৎসাহের শিখা তৃণ সংযুক্ত অগ্নির ন্যায় একেবারে জাজ্বল্যমান হইয়াও পরক্ষণে নির্বাণ হইয়াছে। সাধারণের হিতজনক কৃত কর্মের সূচনা হইয়াছিল, সে সকল কোন্ কালে লুপ্ত হইয়াছে। এক দিবস যাহার অঙ্কুর দৃষ্টি করিয়াছি, পর দিবসে তাহাকে উচ্ছিন্ন দেখিতে হইয়াছে। এই রূপে স্বদেশহিতৈষী মহাত্মাদিগের কত যত্ন বিফল হইয়াছে। কিন্তু কতদিন বিনা বর্ষণে মেঘগর্জন হইতে পারে? নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া মনুষ্য কতক্ষণ শয্যাগত রহিতে পারে? কেবল ইচ্ছাতে লোক তৃপ্ত থাকিতে পারিবেক না। অভিলাষ কার্যেতে পরিণত হইতে লাগিল, ধর্মের উন্নতি জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং এ দেশের সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি নিমিত্তে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি সংস্থাপিত হইল। এই উভয় সভার সভ্যেরা প্রতিজ্ঞার সহিত তাঁহারদিগের কর্ম সম্পন্ন করিতেছেন। বিশেষত এ দেশীয় লোকের উৎসাহ প্রবাহ তখন প্রবল দেখি, এবং তখন অন্তঃকরণ সাহসে পরিপূর্ণ হয়, যখন এই সম্প্রতিকার ঘটনাকে স্মরণ করি, যখন স্মরণ করি, যে দরিদ্র হিন্দু-বালকদিগকে বিদ্যা দানের নিমিত্তে নগরস্থ সকল লোক উদ্যোগী হইয়াছেন। অন্য জাতি মধ্যে যদিও এ অতি সামান্য কার্য, কিন্তু ভারতবর্ষ পরাধীন হইলে এ দেশীয় লোকের মধ্যে এমত শুভসূচক ঘটনা কদাপি হয় নাই, এমত ঐক্য কদাপি বন্ধ হয় নাই, এবং এই উপলক্ষ্যে সভাতে যে সমারোহ হইয়াছিল এদেশের কোনো সাধারণ মঙ্গলজনক কর্মে এ প্রকার বহু ব্যক্তি এক স্থানে এককালে কদাপি একত্র হয় নাই। যে স্থানে দশ জনকে একত্র দেখি সেই স্থানেই এই ভাবী হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ের * উন্নতি বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রীতি হয়, যেহেতু সকল মঙ্গলের আকর যে জ্ঞান কেবল তাহাই যে ইহার দ্বারা বিস্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা এমত নহে, এই ঘটনাতে ভারতবর্ষের সৌভাগ্য দিবসের উষাকাল প্রাপ্ত দেখিতেছি। অনুৎসাহ, আলস্য, অনুদ্যোগ প্রভৃতি যে আমারদিগের অপবাদ তাহা মোচনের উপক্রম দেখিতেছি, এবং যে ঐক্যের অভাব প্রযুক্ত এ দেশের সকল শুভ কর্মের সূচনা বিফল হইয়াছে, এ বিষয়ে সেই ঐক্য সংস্থাপনের সম্ভাবনা দেখিয়া আনন্দিত

হইতেছি। ধনি দরিদ্র, বিদ্বান্ অজ্ঞ, বৃদ্ধ বালক, ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সকল প্রকার ভিন্ন বর্ণস্থ, ভিন্ন মতস্থ, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি এ বিষয়ে একত্র হইয়াছেন। এই ঐক্য সংস্থায়ী হইলে কোন্ দুঃখ মোচন না হইতে পারে? ঐক্য দ্বারা কত গভীর অরণ্য উচ্ছিন্ন হইয়াছে, রাজ্য সকল স্থাপিত হইয়াছে, নগরসমূহ নির্মিত হইয়াছে, এবং সভ্যতার আলোক প্রদীপ্ত হইয়াছে। এই ঐক্য সংস্থায়ী হইলে আমরা কেবল এক পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াই কি তৃপ্ত থাকিব? আমারদিগের আশা কত দীর্ঘ হইতেছে, আমারদিগের ভরসা কত বৃদ্ধি হইতেছে। এই ঐক্য দ্বারা উৎসাহের স্রোত প্রবল হইলে যত প্রকার মঙ্গল এইক্ষণে আমারদিগের মনে জাগ্রত রহিয়াছে, সকল সফল করিবার সামর্থ্য হইবে। এ দেশের রাজনিয়ম যাহাতে উৎকৃষ্ট হয়, অন্য কর স্থাপন খণ্ডিত হয়, শান্তি রক্ষার সুশৃঙ্খলা হয়, বিচার কার্য সুসম্পন্ন হয়, কৃষিকার্যের বৃদ্ধি হয়, শিল্প কর্মের উন্নতি হয়, বাণিজ্যের বিস্তার হয়, এবং যাহাতে এ দেশস্থ লোকের সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্যক্ প্রকারে বৃদ্ধি হয় তাহা এই ঐক্য দ্বারা সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টাবান্ হইতে পারিব। এইক্ষণে ভরসার সহিত সেই সুখের দিবসকে প্রতীক্ষা করিতেছি যখন ভারতবর্ষস্থ লোক আপনারদিগের বুদ্ধি ও ক্ষমতা দ্বারা সমুদ্রপোত নির্মাণ করিবেক, সেতু রচনা করিবেক, বাষ্পযন্ত্র প্রস্তুত করিবেক এবং স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা স্বদেশে নানা প্রকার শিল্প কার্যের উন্নতি করিবেক। কিন্তু এইক্ষণে যে এই সকল মঙ্গলের চিহ্ন দেখিতেছি, এবং ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রত্যাশাতে পুলকিত হইতেছি, ইহার মূল কোথায়? নদীর স্রোতে স্নিগ্ধ হইয়া তাহার উৎপত্তিস্থান অন্বেষণ করিলে যে প্রকার পর্বতশিখরের প্রতি দৃষ্টি হয়, বায়ুপ্রবাহের সৌগন্ধের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হইয়া তাহার আকর অন্বেষণ করিলে যে প্রকার মনোহর পুষ্পোদ্যানের স্মরণ হয়, তদ্রূপ এই বর্তমান জ্ঞানের বৃদ্ধি ও তৎফল সৌভাগ্যের উপক্রম আলোচনা করিয়া সেই পরম হিতৈষীর নাম ও সেই পরম দয়ালু ব্যক্তির চরিত্র স্মরণ হইতেছে, যাঁহার উপকার দ্বারা এ দেশ পূর্ণ রহিয়াছে, যাঁহার দয়াকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারতবর্ষের লোক কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র রহিয়াছেন, যাঁহার নামকে স্থায়ী করিবার জন্য এই সাংবৎসরিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং যাঁহার গুণানুবাদ করিবার জন্য আমরা অদ্য এই অট্টালিকাতে একত্র হইয়াছি, এই মহাত্মার নাম শ্রীযুক্ত ডেভিড হেয়ার সাহেব। তাঁহার এই সত্য জ্ঞান ছিল, যে পরের উপকার জন্য তাঁহার জন্ম, এবং পরের উপকার তাঁহার জীবনের সমুদায় কার্য; এবং শরীর, বুদ্ধি, সম্পত্তি সমুদয় তিনি পরের হিতের জন্য সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষকে ভিন্ন জানিতেন না। এই সত্যের প্রতি তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, যে পৃথিবী তাঁহার জন্মভূমি, এবং সমুদয় মনুষ্য তাঁহার পরিবার। বিশেষত তাঁহার চরিত্র তখন বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, যখন এ দেশের বিদ্যা উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়। কিয়ৎ বৎসর পূর্বে এদেশ অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু তিনি এ দুরবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া এই অন্ধকারময় ভারতবর্ষকে জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল করিতে যত্নবান্ হইলেন, এবং লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞাত কার্য অনেক ভাগে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই মহোপকার সাধন জন্য তিনি শারীরিক ক্লেশ, মানসিক পরিশ্রম,

অর্থের ব্যয় ইত্যাদি কোন্ প্রকারে যত্ন না করিয়াছিলেন? এইক্ষণে আমরা যা কিছু জ্ঞান উপার্জন করিতেছি, সে কেবল তাঁহারই প্রসাদাৎ। তাঁহার প্রসাদাৎ আমরা সৃষ্টির নিয়ম সকল জ্ঞাত হইতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ সূর্য নক্ষত্রাদির স্বভাব জানিতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ গ্রহ চন্দ্র ধূমকেতুর দুর, পরিমাণ, এবং গতিবিধি সকল শিক্ষা করিতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ পৃথিবীস্থ স্বদেশ বিদেশাদি সমূহ স্থানের বৃত্তান্ত আলোচনা করিতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ আমরা আপনারদিগের শরীরের নিয়ম, মনের স্বভাব, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিদ্যা লাভ করিতেছি, অধিক কী কহিব, তাঁহার প্রসাদাৎ আমরা এক নূতন প্রকার জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করিয়াছি। ভারতবর্ষের মহৎ বিদ্যালয় যে হিন্দু কলেজ, তাহা স্থাপনের মূলাধার কারণ কোন্ ব্যক্তি? সকলেই অবশ্য ব্যক্ত করিবেন যে শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেব। বঙ্গভাষাকে উন্নত করিবার জন্য প্রথম যত্নবান্ কোন্ মনুষ্য— ? ডেভিড হেয়ার সাহেব। উপদেশ দ্বারা চিকিৎসা বিদ্যা বিস্তার জন্য মহোৎসাহী কোন্ পুরুষ?—ডেভিড হেয়ার সাহেব। অশেষ মঙ্গলের কারণ যে মুদ্রাযন্ত্র তাহার স্বাধীনতা স্থাপনে বিশেষ উদ্‌যোগী কোন্ মহাত্মা?—ডেভিড হেয়ার সাহেব। এই রূপে এদেশের জ্ঞান বৃদ্ধির কারণ সন্ধানের জন্য যে প্রশ্ন করা যায়, সেই প্রশ্নের উত্তরেই ভারতরাজ্যের বিদ্যারূপ বৃক্ষমূলে হেয়ার সাহেবকে বীজ রূপে দৃষ্টি করা যায়। তিনি আমারদিগকে হীরক দেন নাই, স্বর্ণ দেন নাই, রজতও দান করেন নাই, কিন্তু তাহার অপেক্ষা সহস্র গুণ-কোটি-গুণ মূল্যবান্ বিদ্যারত্ন প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা দ্বারা আমরা জ্ঞানের আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাঁহার চরিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা দয়া ও সত্য ব্যবহার যে কী মহোপকারী, তাহা পূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। পীড়িতের রোগ শান্তি, বিপদ্‌গ্রস্তের দুঃখ মোচন, অবিজ্ঞকে পরামর্শ দান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান ইত্যাদি হিতকার্য তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। তাঁহার স্থাপিত বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাঁহার দ্বারা কেবল বিদ্যারত্নের অধিকারী হয়েন নাই, তাঁহার স্নেহ ও প্রীতি দ্বারা সর্বদা লালিত হইয়াছিলেন। আহা, তাঁহার মনের ভাবকে চিন্তা করিলে চিত্তে কী আনন্দের উদয় হয়। যখন আমারদিগের উপকারে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল, তখন তাঁহার চিত্ত দয়াতে কি পরিপূর্ণ হইয়াছিল! যখন তিনি সকল প্রতিবন্ধক মোচন করিয়া তাঁহার মানস সফল হইবার উপক্রম দেখিলেন, তখন কী আশ্চর্য মনোহর সন্তোষ তাঁহার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিয়াছিল! যখন তাঁহার বাসনাবৃক্ষ যথেষ্ট রূপে ফলবান্ হইল, তখন তিনি আপনাকে কৃতার্থ জানিয়া কি মহানন্দে মগ্ন হইয়াছিল। যিনি সকল স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্বক কেবল আমারদিগেরই উপকার করিয়া এমত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিমিত্তে কী প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব! তাঁহার কী প্রকার ধন্যবাদ করিয়া তৃপ্ত থাকিব!

হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় ১ মার্চ ১৮৪৮ তারিখে স্থাপিত হয়। "The Hindoo Charitable Institution—happily came to the birth on sunday last, the 1st of March"—The Friend of India, 5 March 1846.

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ

সাহিত্য সম্মেলনে বিজ্ঞান কথা, মার বিসর্জনের দিনে ভাঙা কাঁসির মতো বেসুরো ঠেকবে। আশা করেছিলাম যে যোগ্যতর সাহিত্যরসিক কেউ, আপনাদের নানা দেশের নানা খবর দিয়ে খুশি করবেন, তা কিছুতেই রাজি হলেন না কর্মকর্তারা। তাই যে কটি কথা জীবনের শেষে মনে উঠেছে তাই আজ শুনিয়ে যাব।

অল্প কয়েক দিন আগে সৌম্যেন্দ্র ঠাকুর এদেশে বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস শুরু থেকে আজ পর্যন্ত খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। রামমোহন ও অক্ষয়চন্দ্র চেয়েছিলেন যুক্তিতর্কের সাহায্যে দেশের কুসংস্কার দূর করতে, রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছিলেন বিদেশি জাহাজে যে জ্ঞান আমাদের দেশে এসে পৌঁছেছে, দেশি নৌকা ও ডিঙি মারফত সে সব বাংলার গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দিতে। হাজার বছরের সাধনার বিজ্ঞান যে আমাদের গরিব দেশেরও কাজে আসে, তার জন্য তিনি চেয়েছিলেন মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চা শুরু করতে। যে সমস্ত শিল্প সম্ভার উৎপন্ন করে আগেকার বাঙালি দেশ-বিদেশ থেকে নানা সম্পদ আহরণ করে বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়ে রাখত, যা বিদেশির ক্রুর শাসনে শুকিয়ে গেছে, প্রাচুর্যের বদলে সেখানে উঠেছে রোজই দারিদ্র্যের হাহাকার ধ্বনি, তিনি চেয়েছিলেন সত্যিকারের শিক্ষার প্রচলন করে, সেই সব কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবন, যাতে কৃষক বোঝে কীভাবে উন্নত প্রথায় চাষ করলে এ মাটিতে আবার সোনা ফলবে; প্রতি গ্রামে পরস্পরকে সাহায্য করলে কীভাবে দুরূহ কাজকে সহজে নিষ্পন্ন করা যাবে, এ সব। তারপর জগদীশচন্দ্র এলেন নিপুণ হাতে এই দেশের গড়া সূক্ষ্ম যন্ত্রে প্রাণের রহস্যের সন্ধান নিতে এবং নানাভাবে প্রমাণ করলেন বিজ্ঞানের এই নতুন রাজত্বে কীভাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে জাতির হারানো আত্মসম্মান উদ্ধার করা যায়। ওদিকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র চেয়েছিলেন বাঙালিকে বাণিজ্যে নামাতে; দেশের চাহিদা, দেশের তৈরি জিনিস দিয়ে মেটাবার চেষ্টা করতে, ও আরও কত কী। দেশের নানা আন্দোলনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চেষ্টা বাংলা ভাষায় বাঙালির বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজনের

প্রচেষ্টা আজ চাপা পড়ে গিয়েছে। শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে কবির কল্পনাকে রূপ দেবার জন্য চেষ্টা চলেছিল কিছুদিন, কিন্তু আজ যে রাজনৈতিক ঝড় উঠেছে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে, তার তাণ্ডবে আমাদের যা সত্যিকারের শ্রেয় ও প্রেয় হিসাবে কর্তব্য তা আমরা অনেকেই ভুলে যেতে বসেছি। যে অল্পসংখ্যক শিক্ষিত আছেন দেশে, ভেবেছিলাম তাঁরা বুঝবেন যে শুধু তাঁরাই এ জগন্নাথের রথ টেনে নিয়ে যেতে পারবেন না। আজ যারা বেশির ভাগ নিরক্ষর ও সামাজিক জাঁতার মধ্যে পড়ে চেপ্টে গিয়েছে তাদের চাঙা করে সঙ্গে নিতে হবে। কিন্তু এখনও সে বিষয়ে আমরা একমত হতে পারিনি।

স্বাধীনতার যুগে আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে চাই। বিদেশি শত্রুর বিরুদ্ধে চাই সঙঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে, তাই ভাবতে বসি যে, একভাষার সূত্রে বাংলা ও অবাঙালি সকলকে না বাঁধলে, আমাদের নিস্তার নেই। আবার মনে করি বিদেশি ইংরেজ যেভাবে শাসন করে এসেছে, সেই বোধ হয় নিপুণতার শেষ কথা, তাই ইংরেজ চলে গেলেও ইংরেজি ভাষার মোহ আমাদের কাটেনি। একবার প্রথম গণনির্বাচনের ঠিক আগের বছর বিজ্ঞান কংগ্রেসের মধ্যে আমরা বিচার করেছিলাম কিভাবে দেশের মধ্যে প্রচার কার্য চালান সহজ হবে। তখন কেউ কেউ এক লিপির কথা পেড়ে বসেছিলেন, হয়ত প্রাদেশিক ভাষার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া দরকার হলেও রোমান লিপির সাহায্য পেলে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে লোকের কাছে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি পৌঁছে দেবার কাজ সহজ হবে। অবশ্য শেষ অবধি সে মতে সকলের সায় মেলেনি। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন আমেরিকা থেকে প্রায় চল্লিশ বছর বাদে প্রত্যাগত এক ভারতীয়, তিনি একটা অদ্ভুত কথা বলে বসলেন। তিনি বললেন, আপনারা, কেন ইংরেজিকেই সকলের ভাষা বলে চালান না, এ তো আমেরিকায় সম্ভব হয়েছে, তবে নানা রকমের বাধার জট কেটে সহজেই আপানারা সহজ রাস্তা পেয়ে যাবেন। অনেকের মনে ধারণা আছে যে, ভারতের ঐক্য, এটা আমরা ইংরেজির কল্যাণে বুঝতে শিখেছি। কাজেই ইংরেজি শিক্ষা কায়েম করলেই হয়তো সেই ঐক্য জ্ঞান অটুট থাকবে। তাঁরা ভেবে নিয়েছেন, দেশের মধ্যে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের স্তর বিভেদ থাকবেই এবং উপরের স্তরে ইংরেজি জানালা দিয়ে যে যে জ্ঞান ওই জানালা সমীপবর্তীদের উদ্ভাসিত করে তুলবে, তারই কিছু বুদ্ধিমানের মতো নিম্নভাগে পরিবেশন করে নিজেদের স্বার্থবৃত্তি অনুযায়ী রঙিন করে নিয়ে বর্তমানে যে ধরনের স্তরবিন্যাস সমাজে আছে তা চিরন্তনী করে রাখতে পারবেন। তাই এখনও পর্যন্ত দেশের মন্ত্রী, উপাচার্যরা ও আরও অনেকে বলে চলেছেন, এই ভাবে বিদেশি ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত না রাখলে আমরা দেশের অমঙ্গল টেনে আনব। মাঝে মাঝে শুনা যায় যে, ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা বোধ হয় বিজ্ঞান প্রচারে সহায়তা করবে না। নতুন পরিভাষা দরকার হবে প্রত্যেক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই, অতএব সেই রকম চেষ্টা এখন থেকে শুরু হতে পারে, তবে আমার দুর্ভাগ্য যে সেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন উৎসবে এক উলটো সুরে আমি কয়েকটি কথা

বলেছিলাম। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা ভাষা যে-কোনো কাজে অপটু এ আমি স্বীকার করতে নারাজ। জলে না নেমে সাঁতার শেখানোর দুরাশার মতো, ভাষাকে শিক্ষায় বাহন করবার চেষ্টা না করে শুধু পরিভাষা সৃষ্টির চেষ্টা আমার কাছে হাস্যকর বলে মনে হয়েছে। অবশ্য তার পর থেকে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা চলছে নানা প্রদেশে; এদিকে নিজের দেশে আমি দেখেছি যে, দরকার হলে দেশের শিক্ষিত বিজ্ঞানীরা উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক লিখতে পারেন, তার উদাহরণ বিরল নয়। তবে এখানেও বেকার সমস্যার ভয় দেখিয়ে প্রগতির চেষ্টা সব ব্যর্থ করে দিতে চাইছেন অনেকে। হায়দরাবাদে মাতৃভাষার স্বপক্ষে ওকালতি করার পর এক বন্ধু লিখলেন যে, বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার আয়োজন হলে বাঙালির বেকার সমস্যা আরও সঙ্গিন হয়ে দাঁড়াবে। তাই আর্থিক অবস্থায় কুলিয়ে গেলে অভিভাবক আমরা ছেলেদের পাঠিয়ে দিচ্ছি সেই সব শিক্ষায়তনে যেখানে নিম্নশ্রেণি থেকেই ইংরেজি মাধ্যমে সব শেখানোর বন্দোবস্ত রয়েছে। জাতির ভবিষ্যতের সঙ্গে তার শিক্ষা ও আদর্শের কথা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কাজেই সাহিত্যের আসরে তার উপযুক্ত আলোচনার অবতারণা করা শক্ত। একসময় এই ধরনের বুলি কানে আসত, অধীন জাতের আবার রাজনীতি চর্চা কেন? এখন তারই প্রতিধ্বনি শুনছি, যে বাঙালি চাকুরে জাত, তার আবার ভাবনা ভাববে তার কর্তারা, সে যেভাবে খুঁটে খেতে পারে সেই ভাবে চলুক। সাহিত্য রচনা কিংবা ভাষার ভবিষ্যৎ ইত্যাদি বড়ো বড়ো কথায় তার কী দরকার।

ভাবের তরঙ্গ আমাদের দেশে একটু দেরিতে পৌঁছায়। অবশ্য আজকের দিনে ভাবনার বালাই জলাঞ্জলি দিয়েছি। আমাদের কাছে বিভিন্ন দেশের প্রচার বিভাগ থেকে যে খবর আসে, তাই তর্জমা করে প্রকাশ করেই নিশ্চিত। তাকে যাচাই করে দেখবার মতো সামর্থ্য নেই। আমরা ইতিহাস পড়ি, রুশ, জাপান, মিশর ইত্যাদি দেশের নবজাগরণের খবর পড়ি। কিন্তু যদি বলা যায়, এসব দেশে দ্রুত প্রগতি সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞান শিক্ষা মাতৃভাষায় চালু করার ফলে এবং সেই ভাবে আমাদের দেশে শিক্ষা-নীতিতে পরিবর্তন আনলে, আমরাও তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলতে পারব, তখনই তর্কের ধোঁয়ায় আসল কথা চাপা পড়ে যায়। জাপনের কথা আমি অনেক জায়গায় বলেছি। সেদিন এক জাপানি বিজ্ঞানী কলকাতায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, বললেন, আমরা বিজ্ঞান বিদেশির কাছে শিখেছি এবং হয়ত এতে সত্যিকারের মৌলিক অবদান আমাদের খুব বেশি নেই, তবে যা আমরা শিখেছি, সবই জাপানের উপযুক্ত রূপ দিয়ে তাকে আপনার করে নিয়েছি। কাজেই শিল্প-বাণিজ্যে আমরা এই প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার মধ্যেও নিজেদের জাহির করে রেখেছি। এই বক্তৃতার পর এক বিজ্ঞানী বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন স্নাতকোত্তরদের বিজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্ত তোমাদের কোন্ ভাষায় হয়, জাপানি যখন উত্তর দিলেন, সে ভাষা মাত্র একটি, সেটি জাপানির মাতৃভাষা ও তারই ব্যবহার চলেছে স্কুল-কলেজে, তখন জিজ্ঞাসু একটু আশ্চর্য হলেন, কথাটা বিশ্বাস করতে তাঁর ইচ্ছা হচ্ছিল না। এঁরাই বলে আসছেন এদেশে ইংরেজি মাধ্যম ছাড়া

উচ্চ বিজ্ঞান শেখানো সম্ভভ নয়। তাই এই অবিশ্বাসের সুর। এ মনোভাব আমাদের অনেক্ দিনের। প্রায় চল্লিশ বছর আগে শিক্ষার্থী হয়ে যখন ফ্রান্স দেশে রয়েছি তখন ইংল্যান্ড থেকে সে দেশে বেড়াতে এলেন বাঙালি এক ডাক্তার বসু। একদিন সেখানের আড্ডায় ভারতীয় ও ফরাসি দুইই উপস্থিত ছিলেন, তার মধ্যে তিনি হাজির। ডাক্তারি শিক্ষার কথা উঠল, বন্ধুটি জিজ্ঞাসা করলেন, সে দেশে Anatomy কীভাবে শেখানো হয়। যখন শুনলেন ও দেশে Gray's Anatomy চলে না, তখন তিনি চোখ কপালে তুললেন। এইভাবে আমরা ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কেউ যদি বলে Shakespeare ক্লাশে বাংলা ভাষায় পড়াচ্ছি, তখনই ব্যঙ্গের হাসি আমাদের মুখে ভেসে উঠে। যদিও সনাতনী গ্রিক সাহিত্য কিংবা আধুনিক জার্মান সাহিত্য যে তাঁরা তর্জমায় উপভোগ করেন সেটা স্বীকার করতে তাঁরা দ্বিধা করেন না।

শত শত বৎসর দাসত্ব করে আমরা যে কিছু নিজেদের মতো করে ভেবে, নিজেদের ভাষায় শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে পারি এবং সেই শিক্ষার ফল সুদূরপ্রসারী হয়ে দেশের লোককে উদ্বুদ্ধ ও সঞ্জীবিত করতে পারে, এ ভরসাও হয় না আমাদের। ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা নাই বা তুললাম। কারণ এ সব ব্যাপারে বড়োবাবু কিংবা ম্যানেজার হলেই খুশি হব। চাকুরে বাঙালির তার বেশি ভাবনার কী দরকার!

বিজ্ঞান শিক্ষার কথা পেড়ে অনেক দূর এসে পড়েছি। সব জায়গায় শুধু একই কথা বলে বেড়াই এইটে আমার বদনাম হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই একথা আর বেশি বাড়িয়ে আপনাদের মন খারাপ করে দেব না। বিবেকানন্দজীর শত বার্ষিকীর বছর আপনারা সকলে একত্র হয়েছেন। কামারপুকুরে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান। আশা করি, এই দুর্দিনে আমরা সুপথের নির্দেশ পাব। হেমবাবুর বিখ্যাত কবিতার চরণ কটি বলে নিলে হয়ত সে উৎসাহের বাণী কানে ও মনে সাহস আনতে পারে :

কীসের লাগিয়া হলি দিশেহারা
জ্ঞান বুদ্ধি জ্যোতি তেমতি প্রখরা
তবে কেন ভূমে পড়ে লুটাও।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কটকে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞান শাখাব সভাপতিরূপে সত্যেন্দ্রনাথের ভাষণ।

শিল্প

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

অভিভাষণ

কুমিল্লা অধিবেশনের দ্বাবিংশ সম্মেলনে প্রদত্ত

শ্রীঃ

ওঁ নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়

তোমাকে নমস্কার ; তুমি চিৎ বা জ্ঞান শক্তি ; সমস্ত রূপ বা নেত্রগ্রাহ্য সৌন্দর্যের আভ্যন্তর আত্মা তুমি।

পঞ্চদশ প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের পরিচালকগণ আমাকে কলা-বিভাগের সভাপতি নির্বাচন করিয়া আমায় বিশেষভাবে সম্মানিত করিয়াছেন। আমার আলোচ্য বিদ্যা ব্যবসায় মুখ্যত হইতেছে ভাষা তত্ত্ব, এই বিদ্যা বা বিজ্ঞানের সহিত সুকুমার শিল্প বা কলার কোনো সংযোগ বাহ্যত দৃষ্ট হয় না ; ভাষা-বিজ্ঞান ও শিল্প-কলা, আপাত দৃষ্টিতে ইহাদের পরস্পর-বিরোধী বলিয়াই মনে হয়। শিল্প-কলার সহিত আমার পরিচয় গভীর নহে, এবং আমার পরিচয় বিশেষজ্ঞের পরিচয় নহে, শিল্প-কলা আমার মুখ্য উপজীব্য বা আলোচ্য বিষয় নহে। তবে আমি শিল্প-কলার একজন সামান্য অনুরাগী, শিল্প-কলার চর্চাকে আমার জীবনের অন্যতম প্রধান আনন্দ-রূপে গণ্য করিয়া থাকি, এমনকি ইহাকে আমার একটি ব্যসন বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি। ব্যবসায়ীর পরিবর্তে আপনারা ব্যসনীকে আহ্বান করিয়াছেন এবং ব্যসনী কেবল বিষয়ের প্রতি আন্তরিক প্রীতির বলেই এই গুরুভার গ্রহণ করিতে সাহসী হইয়াছে। অনধীতশাস্ত্র অব্যবসায়ীর আলোচনায় শাস্ত্র ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা আছে ; যদি এক্ষেত্রে শাস্ত্রের ব্যত্যয় ঘটে, তাহা অশ্রদ্ধাপ্রসূত হইবে না, সুধীগণ তাহাকে অজ্ঞতাপ্রসূত বলিয়া ক্ষমা করিবেন।

ঘরবাসীই হই আর পরবাসীই হই, আমরা বাঙালিরা আমাদের মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য

লইয়া আলোচনা করিতে ভালোবাসি। সাহিত্য, অর্থাৎ ভাষায় রচিত কাব্য নাটক উপন্যাস প্রবন্ধাদি, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির বিবিধ প্রকাশের মধ্যে অন্যতম মাত্র। 'সাহিত্য' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ 'সংযোগ', 'সঙ্গ' বা 'সংসর্গ'; ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও ছন্দশাস্ত্রের 'সহিত' আলোচিত হয় বলিয়াই কেবল ভাষা-নিবদ্ধ রস-রচনার যে 'সাহিত্য' সংজ্ঞা আলঙ্কারিকগণের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহাকে আমরা আধুনিক যুগে ধীরে ধীরে আরও ব্যাপক করিয়া লইয়াছি। এখন জীবনের সহিত মিলিত হইয়া, জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া যাহা কিছু বিদ্যমান, সে সমস্তের প্রকাশ যদি বাঙ্ময় রূপে দেখা দেয়, তাহা হইলে সেগুলিকেও 'সাহিত্য' নামে আমরা অভিহিত করিয়া থাকি ; গীতি-কবিতা, কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও অন্য গদ্য রচনা প্রভৃতি 'সুকুমার সাহিত্যই' কেবল সাহিত্য-পদবাচ্য নহে—বাঙ্ময় ইতিহাস, দর্শন, মানবজীবনের বিশেষ কতকগুলি দিকের সহিত সম্বন্ধ রাখে এমন বিজ্ঞান (অর্থশাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি), এগুলিকেও আমরা ব্যাপকভাবে সাহিত্যের পর্যায়েই ফেলিয়া থাকি। ভাষাশ্রিত সাহিত্যে বা বাঙ্ময় ভিন্ন, মানব-সংস্কৃতির আরও অন্য নানাপ্রকারের প্রকাশ আছে। যেমন সঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্য, নানাপ্রকারের অনুষ্ঠান এবং শিল্প-কলা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলি বাঙ্ময়ের সহিত জড়িত (যথা, সঙ্গীত) ; অথবা এগুলি শ্রোত্রগ্রাহ্য বাঙ্ময়ের স্থলে, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির নেত্রগ্রাহ্য এবং স্থিতিশীল রূপময় প্রকাশ (শিল্প-কলা—বাস্তুশিল্প, ভাস্কর্য ও চিত্রবিদ্যা) ; কিংবা শ্রোত্র ও নেত্রগ্রাহ্য অথবা কেবল নেত্রগ্রাহ্য গতিশীল ছন্দোময় বিকাশ (অভিনয়, নৃত্য)। কেবল বাঙ্ময়ের আলোচনায় সমগ্র সংস্কৃতির বোধ হয় না ; এই জন্য, বাঙ্ময়কে মুখ্য করিয়া ধরিলেও, কোনো জাতির সংস্কৃতিকে সব দিক দিয়া দেখিতে হইলে, বাঙ্ময়ের সহিত আনুষঙ্গিকভাবে দর্শন ও বিজ্ঞান, সঙ্গীত ও শিল্প, অপরিহার্য হইয়া উঠে। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন বাঙালির সমগ্র সংস্কৃতির আলোচনার জন্য অনুষ্ঠিত হয়। সেই হেতু, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে আমরা অতি সহজভাবে রসানুভূতি-গ্রাহ্য বঙ্গীয় বাঙ্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে, বঙ্গভাষার সাহায্যে দর্শন বিজ্ঞান আদি বুদ্ধি-গ্রাহ্য বিষয়েরও প্রসঙ্গ করিয়া থাকি, শিল্প-কলা ও সঙ্গীতের আলোচনাকেও বর্জন করি না।

আমাদের আলোচ্য বিষয় 'শিল্প-কলা'। বাহিরের পরিদৃশ্যমান বস্তু-জগৎ এবং ভিতরের অদৃশ্য মনোজগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ, এই দুইয়ে মিলিয়া মানুষকে যখন একাধারে রূপের অনুকৃতি এবং রূপের মাধ্যমে অরূপের অভিব্যক্তির জন্য উদ্বুদ্ধ করে, তখন হয় শিল্প-সৃষ্টি। পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং আধ্যাত্মিক বা আধিমানসিক জগৎ—ইহাদের বিরোধ কল্পনা করিলে, রূপ-শিল্পের সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না। কেবল অনুকৃতিতে শিল্প হইতে পারে না ; এবং ভৌতিক-জগতের আধারে বিদ্যমান চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রতীককে আশ্রয় না করিলে, আধ্যাত্মিক বস্তুর শিল্পময় প্রকাশও অসম্ভব। অনুকৃতি এবং অভিব্যক্তি, প্রতিস্পর্ধন ও প্রকাশ—এই দুটিই শিল্পের মৌলিক বা মুখ্য প্রেরণা। বিশ্বপ্রকৃতি এবং জাতি ও সভ্যতার

পারিপার্শ্বিক অনুসারে শিল্প-রচনা বিভিন্ন দেশে ও জাতিতে এবং বিভিন্ন কালে নানা বিশিষ্টত্য বা স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত হয়। কিন্তু এই বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও, মূল প্রেরণাদ্বয় এক অখণ্ড মানব জাতির মধ্যে সর্বত্রই মিলে বলিয়া, এবং অনুকৃতি ও অভিব্যক্তি বিষয়ে সমগ্র মানবজাতি একই সূত্রে গ্রথিত বলিয়া, মানবের মনের শিল্পময় প্রকাশও অখণ্ড এবং এক ; এবং তদনুসারে, সার্থক শিল্প দেশ-কাল-পাত্র-নিবদ্ধ নহে—তাহা বিশ্বমানবের সম্পত্তি, সকল দেশের রসিক জনের আস্বাদ্য এবং উপভোগ্য। মানব-সমাজের কৃত্রিম জাতি-বিভাগের উর্ধ্বে যেমন সাধারণ একটি মানবিকতা বিদ্যমান, তেমনি বিভিন্ন জাতিতে ও কালে মূর্তি গ্রহণ করিয়াছে এমন নানা প্রকারের শিল্পের পার্থক্যের উর্ধ্বে, শ্রেষ্ঠ শিল্প-রচনার মধ্যে একটা সার্বজনীনতা বিদ্যমান আছে, যাহার অস্তিত্ব এবং প্রভাব এত অধিক যে শ্রেষ্ঠ জাতীয় শিল্পগুলিকে পরস্পর-বিরোধী পর্যায়ে ফেলা চলে না। মানসিক অন্য নানা ব্যাপারের মতো, শিল্পকে 'প্রাচ্য' ও 'পাশ্চাত্য', Greek and Gothic, Western and 'Oriental', Ancient and Modern, প্রভৃতি বিভিন্ন বিরোধী শ্রেণিতে রাখা কঠিন। শিল্পের প্রকাশভঙ্গী নানা প্রকারের, কিন্তু ইহার মূল প্রাণ-বস্তু এক এবং দেশকালাতিগ—কোনো জাতির শিল্প আলোচনার কালে, বিশেষ করিয়া একাধিক জাতির শিল্পের তুলনা-মূলক আলোচনার কালে আমাদের ইহা স্মরণে রাখিতে হইবে।

শিল্প অনুকৃতিময় হইবে কিংবা ছন্দোময় হইবে, অথবা প্রতীকময় হইবে কিংবা ভাবময় হইবে, অথবা এই একাধিক প্রকাশ-ভঙ্গীর মিশ্রণ-জাত হইবে—ইহা নির্ভর করে, শিল্পের আবশ্যকতা, প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যের উপর। অনুকৃতি ও প্রকাশ, এই মৌখিক প্রেরণাদ্বয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তৃতীয় প্রেরণা-রূপে আবশ্যকতা, উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনকে উল্লেখ করিতে হয়। সকল যুগে বা সকল জাতির মধ্যে শিল্পের প্রয়োজন একই প্রকারের থাকে না। আদিম প্রত্ন-প্রস্তর যুগে মানুষ যখন হাড় বা শিঙের উপরে পাথরের ছুরি চালাইয়া হরিণ, মাছ বা বুনো ঘোড়ার ছবি খুদিত, রঙ দিয়া পাহাড়ের গায়ে ঘোড়া, মহিষ বা শূকরের ছবি আঁকিত, তখন তাহার যে উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য আজকালকার পরের মুখ চাহিয়া যাহাকে থাকিতে হয় না এমন প্রচুর বৈভবশালী স্বাধীন শিল্প-স্রষ্টার নহে ; এবং যাহাকে ফরমাইস মতো বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিতে হয়, তাহার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন ইহাদের উভয়ের উদ্দেশ্য হইতে পৃথক। প্রাগৈতিহাসিক যুগে শিল্পী মূর্তি খুদিত বা ছবি আঁকিত, এই মূর্তি বা ছবির magic বা মায়াজাল বিস্তার করিয়া বন্য পশুকে সহজে মৃগয়া করিবার উদ্দেশ্যে ; ছবির যাদুতে বা সম্মোহনী শক্তিতে পশু-মৃগয়াকে সহজ করিয়া আহার্য সুলভ করাই ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্পীর মুখ্য প্রেরণা—নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের এই অভিমত। কিন্তু মৃগয়ার জন্য মায়াজাল বুনিবার উদ্দেশ্য একমাত্র উদ্দেশ্য থাকিতে পারে নাই—অলঙ্করণ এবং সৌন্দর্য-বোধের প্রেরণাও যে প্রাগৈতিহাসিক শিল্পীর মনে ছিল,

তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ বা ইঙ্গিত আছে। উত্তর কালে বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে মানুষের হাতের কাজ শিল্প-বস্তুতে, সম্মোহনী ও সৌন্দর্য-বোধ, উভয় প্রকারের তাগিদ, পৃথক বা মিলিতভাবে শিল্প-রচনায় কাজ করিয়া আসিয়াছে। আদিম যুগে যে যাদু বা সম্মোহনীর প্রয়োজন শিল্প-প্রাণের বা শিল্প-রচনার আবাহন করিয়াছিল, পরবর্তী কালে মানবের আধ্যাত্মিক চিন্তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই যাদু বা সম্মোহনী, দেবপ্রতীকের এবং ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধীয় শিল্প-চেষ্টায় উন্নীত হইল। আদিম মানবের যাদুবিদ্যার প্রয়োগে যে বাদ্য, যে মন্ত্রাদি প্রযুক্ত হইতে, তাহার আধারের উপরে সঙ্গীত—বিশেষ করিয়া ধর্মসঙ্গীত এবং স্তোত্রাদি আধ্যাত্মিক সাহিত্য গঠিত হইল। চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় মানুষের হৃদয় ও মন—মানুষের ভাবজগৎ—অপার্থিব অনুভূতির জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সঙ্গীত, পাঠ ও অনুষ্ঠানের ন্যায়, শিল্পও হইল ধর্মের সেবায় আত্মনিয়োজিত।

সৌন্দর্য-বোধ দ্বারা উদ্বোধিত অপার্থিব সত্তার অনুভূতি, অথবা অনুভূতির আভাস ; সুসভ্য জনসমাজে এখন ইহাই হইতেছে শিল্পের চরম উদ্দেশ্য। শিল্পের এই উদ্দেশ্য প্রাচীন মিশরে, ব্যাবিলনে এবং বিশেষ করিয়া প্রাচীন গ্রীসে, ভারতবর্ষে ও বৃহত্তর ভারতে—বৌদ্ধ চিন ও জাপানে, এবং মধ্যযুগের খ্রিস্টান জগতে দেখা যায়। যে-সকল জাতি সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল এবং লক্ষণীয় শিল্প রচনা করা যাহাদের দ্বারা সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে শিল্পের আদর হইয়াছে, ধর্মের বা আধ্যাত্মিক সাধনার পথ হিসাবে। তাহারা মানবজাতির গৌরব-স্বরূপ বিভিন্ন শিল্পশৈলী বিশ্বমানবকে উপহার দিয়া গিয়াছে। যে জাতি বাস্তব সভ্যতায় পিছনে পড়িয়া আছে, তাহার মধ্যেও শিল্পের প্রতি আকর্ষণ দেখা যায়—ধর্মানুভূতি তাহাদের মধ্যেও শিল্পের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছে ; যেমন আফ্রিকার নিগ্রো জাতীয় লোকেরা। কিন্তু সভ্যতার পথে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ইহুদি ও আরবদের মধ্যে ধর্মসাধনায় রূপ-শিল্পের স্থান সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই হওয়া সম্ভব যে, ইহুদিদের ও আরবদের আদিপুরুষ উত্তর আরবের মরুবাসী শেমীয় জাতির মধ্যে আদিম যুগেই তাহার ধর্মবোধে প্রতীকের ভীতি আসিয়া যায়। শেমীয় জাতির মধ্যে প্রাচীনতম কালে সভ্যতার উন্নতি তেমন হয় নাই, তাই শিল্প-কলা তাহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই ; শিল্প সম্বন্ধে অক্ষমতা, এই জাতির মনে প্রতীক বা মূর্তির সম্মোহনী শক্তি বিষয়ে একটা ভয়ও আনিয়া দিয়াছিল ; এবং আদিম মনোভাবের পরিচায়ক এই ভয়, পরে কল্পনান্তর-অসহিষ্ণু দেবকল্পনা-বিশেষের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে, আরও সুদৃঢ় হইয়া, মূর্তি-প্রতীকের বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছিল। অহৈতুক ভয় হইতেই অহৈতুক বিদ্বেষের উদ্ভব ঘটিয়া থাকে। চক্ষু, কর্ণ এবং ক্বচিৎ নাসিকা—এই তিনটি ইন্দ্রিয় সহযোগে আমরা চিত্তকে ঊর্ধ্বমুখী করিয়া লইতে পারি। এইজন্যই ধর্মানুষ্ঠানে মূর্তি বা চিত্রের এবং সঙ্গীত বা পাঠের স্থান অল্পবিস্তর সকল ধর্মেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে,

মন্দিরে ও অন্য দেবায়তনে ধূপ-ধুনা, সুগন্ধি কুসুম প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ধর্ম-সাধনায় যাঁহারা মূর্তি বা রূপ-শিল্প বর্জন করিতে চাহেন, অথচ সঙ্গীত বা পাঠ বজায় রাখেন, ধূপ-ধুনার ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা শ্রোত্র ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে প্রশ্রয় দিয়া নিতান্ত অযৌক্তিকতার সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়কে পরিহার করেন।

শিল্প সম্বন্ধে সুসভ্য হিন্দু, গ্রিক, ও চিনা জাতির (এবং এই তিন জাতির শিষ্য-স্থানীয় আরও কতকগুলি জাতির) মনোভাব সম্পূর্ণ পৃথক্, এই তিন প্রাচীন জাতি রূপ-শিল্পকে মানবের এক প্রধান কৃতিত্ব বলিয়া সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছে। গ্রীকজাতির শিল্প-প্রাণতার কথা আমরা সকলেই জানি ; বিশ্বমানবকে গ্রীকজাতির প্রতিভা অপরূপ শিল্পের মহিমায় উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছে। চিনা ও জাপানি জাতিদ্বয়ের শিল্প-চেতনাও পৃথিবীতে অপূর্ব, এবং আধুনিক জগতে একক। ভারতবর্ষে শিল্প সেদিন পর্যন্ত জীবনের সঙ্গে অঙ্গীভূত হইয়াই ছিল—দৈনন্দিন জীবন হইতে শিল্পকে পৃথক্ করিয়া দেখা হইত না। তাই, ভারতীয় জনগণের শিল্পবোধ স্বত-উৎসাহিত হইয়াই বিদ্যমান থাকিত, তাহার পৃথক বিশ্লেষের জন্য পণ্ডিতগণ চেষ্টিত হন নাই! সাহিত্য-বিচারে, দর্শনে ও অন্য কতকগুলি বিষয়ে প্রাচীন ভারতের চিন্তানেতৃগণ যেমন শক্তি দেখাইয়াছেন, রূপ-শিল্পের চর্চায় তেমন শক্তি দেখান নাই। গুপ্ত যুগে ভারতীয় শাস্ত্রের ও শিল্পের স্বর্ণযুগ অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি ভরত, দণ্ডী, মম্মট প্রমুখের মতো রূপ-শিল্পের সমালোচক পণ্ডিত দেখা দিলেন না। এইখানে ভারতীয় সংস্কৃতির বাঙ্ময় প্রকাশের একটা দিক্ অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

কিন্তু প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য-বোধ ও শিল্প-চেতনা সম্বন্ধে ভারতীয় বাঙ্ময় একেবারে নীরব নহে। সৌন্দর্য-বোধ ভারতের আর্যজাতির মধ্যে যথেষ্ট ছিল এবং সুসভ্য অনার্য জাতিগুলির মধ্যেই যে ভারতের রূপ-শিল্প জন্মগ্রহণ করে, ও প্রথম বিকাশ ও পুষ্টিলাভ করে, আজকাল একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। জগতে কোনো কিছুকে ভালো বা লক্ষণীয়, প্রধান বা তুলনায় উৎকর্ষযুক্ত হইতে হইলে, তাহার প্রধান উপলব্ধি-যোগ্য গুণ থাকিবে, তাহার সৌন্দর্য ভারতের আর্যজাতির সুপ্ত চেতনায় সৌন্দর্য এবং উৎকর্ষের পরস্পরের সংযোগ সম্বন্ধে এই প্রকার বোধ বা বিচার ছিল ; সেই জন্য 'শ্রী' শব্দ হইতে সাধিত, 'শ্রী'র তারতম্য বা অতিশায়ন বাচক দুইটি শব্দ 'শ্রেয়স্ (শ্রেয়ান্, শ্রেয়সী, শ্রেয়ঃ)' এবং 'শ্রেষ্ঠ', সংস্কৃত ভাষায় সর্ববিধ উৎকর্ষের, এমনকী চরম বা পরম উৎকর্ষের অর্থে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। 'শ্রী' শব্দের প্রধান ও প্রাচীনতম অর্থ, নেত্রের সাহায্যে দর্শনীয় দ্যুতিমান্ সৌন্দর্য ; যাহাতে অত্যধিক পরিমাণে এই 'শ্রী' বা 'সৌন্দর্য' আছে, তাহাই 'শ্রেয়স্', তাহাই 'শ্রেষ্ঠ'—সৌন্দর্য ও উৎকর্ষ দুই যেন মিশিয়া গিয়াছে। অধিকন্তু, কোনো পদার্থ 'সুন্দর' হইলেই মঙ্গলময় হইবে—এই বোধেই সৌন্দর্য-বাচক কল্যাণ (কল্য)'

শব্দের প্রাথমিক অর্থ 'সুন্দর' (যে অর্থ 'কল্য' শব্দের গ্রীক প্রতিরূপ Kalos, Kallos-এ পাই), 'মঙ্গল, ক্ষেমঙ্কর' এই অর্থে পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যের মনোভাব যেন গ্রিক আর্যের মতোই ছিল—গ্রিকদিগের Kaloskagathos আদর্শের অনুরূপ—'যাহা সুন্দর, তাহাই ভাল'। আবার, যাহা ভাল করিয়া বুঝা যায়, চিৎশক্তির দ্বারা যাহা গ্রহণ করা যায়, তাহাই 'চিত্র' অর্থাৎ 'সুন্দর'। এইরূপ কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের অর্থ বিচার করিয়া জারমান পণ্ডিত Oldenberg ভারতের আর্যজাতির চিত্তে অন্তঃসলিলা ফল্গু-নদীর মতো একটা সৌন্দর্য-বোধের ধারা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সহজ সৌন্দর্য-বোধের স্রোতস্বতী আর্য ও অনার্য নির্বিশেষে ভারতের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে কখনও অবলুপ্ত হয় নাই। মুসলমান ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান তাহার মূর্তি বা রূপ বিরোধী ভাব-সম্পুট ভারতে লইয়া আসিলেও, রূপ-রসিক পারস্যের প্রভাবে ইতিপূর্বেই এক ধর্মের রূপ-বিরোধিতা অনেকটা খর্ব হইয়া গিয়াছিল বলিয়া, তুর্কি, ইরানি ও অন্য বিদেশীয় মুসলমানের আগমনে এদেশের রূপ-শিল্পের ধ্বংস ঘটে নাই ; বরঞ্চ পারস্যের মুসলমান সভ্যতার সহিত ভারতের হিন্দু মনোভাবের আশ্চর্য সাহচর্য ঘটায়, ভারতের মোগল চিত্রকলার উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছিল।

শিল্পের উদ্দেশ্য বা আদর্শ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ যুগের ঋষিদের চিন্তা বা ধারণা যে কত উচ্চ ছিল, তাহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই বচনটি হইতে অনুধাবন করা যাইবে ·

আত্মসংস্কৃতির্বাব্য শিল্পানি। ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমানো আত্মানং সংস্কুরুতে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ষষ্ঠ পঞ্জিকা পঞ্চম অধ্যায় প্রথম মন্ত্র

নিশ্চয়ই, শিল্পসমূহ আত্ম-সংস্কৃতির কারণ। যজমান বা শিল্পানুষ্ঠাতা নানাপ্রকার শিল্পের দ্বারা নিজ আত্মাকে পরিপূর্ণরূপে ছন্দোময় করিয়া থাকেন।

মানুষকে উন্নত ও উন্নীত করিতে যে শিল্পেরও সামর্থ্য আছে, তাহা ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ স্বীকার করিয়াছেন। উপরে প্রদত্ত মন্ত্রাংশের পূর্বে ঋষি বিভিন্ন প্রকারের শিল্পের উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন—'হস্তী, কংসো, বাসো, হিরণ্যম্, অশ্বতরীরথঃ শিল্পম্।' হাতির দাঁতের কাজ (মূর্তি, ফলক প্রভৃতি), কাংস্য বা তামা, কাঁসা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতুতে প্রস্তুত শিল্প-দ্রব্য, বিচিত্র বসন, স্বর্ণালঙ্কার ও নানাপ্রকার স্বর্ণ-শিল্প, সুদৃশ্য কাষ্ঠ-শিল্প যথা অশ্বতরীবাহিত সুন্দর রথ—এই প্রকারের শিল্প। এই সব শিল্প—রচনায় বা দর্শনে মানুষের মনকে সংস্কৃতিযুক্ত করে, উদার করে, বিশ্বাত্মার সহিত মিলিতভাবে ছন্দোময় করে।

জগতে নিসর্গজাত বস্তুর পরেই, মানুষের হাতের শিল্প-রচনাকে ভগবানের সত্তার এবং তাহাতে নিহিত শাশ্বত সৌন্দর্যের অংশ স্বরূপ বলা যায় নাই। গীতায় যে বলা

হইয়াছে:

যদ্যদ্‌বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদুর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংসম্ভবম্।। ১০।৪১

তুমি ইহা জানিও যে, বিভূতি বা ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রী বা শোভাযুক্ত এবং শক্তি বা প্রভাবশালী যে যে পদার্থ আছে, সে-সমস্তই আমারই তেজ বা শক্তির অংশ হইতে উৎপন্ন।

—সে কথা শিল্প-সম্বন্ধেও বিশেষ করিয়া প্রযোজ্য।

ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনে শিল্পের প্রভাব লইয়া অনেক কথা বলা হইয়াছে, অনেক কথা বলা যায়। আমি নিজ ব্যক্তিগত কথা দুই-একটি বলিতে চাহি। সৎ বা উচ্চকোটির শিল্প আমার কাছে আধ্যাত্মিক অনুভূতির আভাস আনয়ন করে। যাঁহারা সহজ ভক্তি অথবা দার্শনিক বিচারের দ্বারা পরমার্থ বা শাশ্বত সত্তাকে জীবনে উপলব্ধ করিয়াছেন, যাঁহারা বলিতে পারেন—'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্'—তাঁহাদের চরণে আমাদের প্রণাম। কিন্তু আমাদের মতো অনেকে আছে, যাহাদের উপলব্ধি বা অনুভূতি হয় নাই এবং যাহারা বিচার এবং তত্ত্বালোচনার পথ উন্মুক্ত রাখিয়া অনুভূতির আবাহন করিতেছে, যাহাদের কাছে তত্ত্ব গুহানিহিত হইয়াই আছে, উপলব্ধি বা অনুভূতি তাহাদের কাছে জ্ঞান বা বিচারের সিংহদ্বার দিয়া আসিতে চাহে না, emotion বা ভাবাবেগ অথবা রসাবেশের খিড়কিদ্বার দিয়াই তাহাদের চিত্তে অনুভূতির ছায়া বা আভাস কখনো কখনো চকিতের ন্যায় উঁকি দিয়া চলিয়া যায়। এই emotion বা ভাবাবেগকে দৌর্বল্যের পরিচায়ক বলিয়া অনেকে বিনষ্ট বা ক্ষুণ্ণ করিতে করতে চাহেন। কিন্তু প্রকৃতিজাত এবং দেহেন্দ্রিয়াশ্রয়ী emotion বা ভাবরাজিকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টায়, প্রায়ই দেখা যায় যে প্রতিক্রিয়ার ফলে আধ্যাত্মিক বা মানসিক কুফল ঘটিয়া থাকে। বরং ইহাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, কী করিয়া চিত্তের ভাবরাজিকে আমরা সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া জীবনে শ্রেয় ও কল্যাণের পথে, শাশ্বত বস্তুর উপলব্ধির পথে চালিত করিতে পারি। এই ভাবরাজিকে শোধন করিয়া শুদ্ধ করিয়া লইতে একমাত্র সুকুমার কলাই সমর্থ হইয়া থাকে।

নয়ন ও শ্রবণের পথ দিয়া সঙ্গীত ও সুন্দর দর্শনীয় বস্তুর সহায়তায় যে চিত্তের ভাবসম্পুট উন্মুক্ত হয়, কবি কালিদাস শকুন্তলা নাটকে তৎসম্বন্ধে অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন:

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বম্

ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি।। ৫।৩৪।।

রম্য বস্তু দর্শনে, কিংবা মধুর শব্দ শ্রবণে, সুখিত ব্যক্তিরও চিত্তে যে উৎকণ্ঠা জন্মে, তাহা বুদ্ধি -পূর্বক না হইলেও তথাপি নিশ্চয়ই জন্মান্তরীণ স্থির সৌহার্দের ফল।

একটু অন্যভাবে এই কথাটা বলা যায় যে, শিল্প-কলা ও প্রাকৃতিক বস্তু প্রভৃতি দর্শন দ্বারা, এবং সঙ্গীতাদি মধুর ধ্বনি শ্রবণের দ্বারা, মনে যে সুখময় ঔৎসুক্য বা উৎকণ্ঠা বা আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তাহা আমাদের অজ্ঞাতে লোকাতিগ অবস্থার আভাস আমাদের অনুভূতিতে জাগরিত করিয়া দেয়।

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।

অথবা :

ধুনি সুনি মোহি রহৌ ন জায়।
ঘায়ল-সী ঘুমত রহৌঁ। ঘর-মেঁরী মোহি কছু ন সুহায়।

ধ্বনি শুনিয়া আমার আর রহা জায় না।

আহতের মতন আমি ঘুরিয়া বেড়াই—ওগো, ঘরে আমার কিছুই ভালো লাগে না।

শাশ্বত বস্তুর সঙ্গে মিলনের জন্য এই যে আকূতি, এই যে দিব্যোন্মাদের অবস্থা—ইহার আধার বা উৎপত্তি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রম্য বস্তু বা মধুর ধ্বনি।

সঙ্গীতকে তাবৎ সুকুমার কলা মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঐশীশক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল বর্ণনা করিয়াছেন। সঙ্গীত বা বাদ্য শ্রবণে মানুষের চিত্ত বাস্তব হইতে উর্ধ্বে উন্নীত হয়, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বা উদাহরণ আছে, এ বিষয়ে আমাদেরও অভিজ্ঞতা আছে। ধ্রুপদ চৌতাল সংগীত শ্রবণে অনেকের ভাবাবেশ হয়, দেবারাধনার এবং দেবসান্নিধ্যের অনুভূতি আইসে ; বৈষ্ণব কীর্তনে বা সুফি গজলে ভক্ত বা মজযুব জনের দশা-প্রাপ্তি ঘটে। স্নিগ্ধ-গম্ভীর সুরে সংস্কৃত বা লাতিন বা আরবী মন্ত্র উচ্চারণে, অথবা ইংরেজি বা অন্য আধুনিক ভাষায় পাঠে, অন্তত ক্ষণিকের জন্য মনের উন্নয়ন ঘটিতে দেখা যায়।

সঙ্গীতে যাহা হয়, শিল্প-কলা বা রূপ-কলার দ্বারাও তাহাই হয়। শ্রেষ্ঠ গ্রিক বা ভারতীয়, চিনা বা জাপানি ভাস্করের কৃতিত্ব কোনো দেব-মূর্তি ; চিনা বা জাপানি চিত্রকরের অঙ্কিত প্রাকৃতিক দৃশ্যপট ; বিজান্তীয় মোজাইক কাজ ; পারস্য-দেশীয় গালিচার অপূর্ব চিত্র এবং

বর্ণসমাবেশ ; মধ্যযুগের হিন্দু অথবা খ্রিস্টানি চিত্র-কলা ; এবং পার্থেনন, তাজ-মহল, শার্ত্র-এর গির্জা, সান্-মার্কোর গির্জা—প্রভৃতি বাস্তু-শিল্পের বিরাট কীর্তি ; এ সমস্ত দর্শনে ও অনুধ্যানে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা রসানুভূতিরই পর্যায়ের। এই প্রকার শিল্প-বস্তুর গভীর অনুধ্যান, অনেক সময়ে প্রার্থনা দ্বারা ভাষারাজির উদ্বোধনের মতো মনকে আবিষ্ট করে। তখন শিল্প-জগৎকে লক্ষ করিয়া বলা যায় :

রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ-রতন আশা করি।

শিল্পের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা লইয়া কিছু বলিলাম—এই জন্য যে আমাদের দেশে পণ্ডিতগণের মনে শিল্পের উপযোগিতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস বা সন্দেহ আছে। শিল্প একটা বাহুল্য, এবং জীবনে একটা অনাবশ্যক অথবা অপ্রধান বস্তু, সাধারণত আমরা এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকি। শিল্প-চর্চা কেবল অবসরের চিত্তবিনোদনের জন্য, ইহাতে গভীর বস্তু কিছুই নাই, সঙ্গীতের মতো কেবল মেয়েদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইতে পারে—এই প্রকার প্রাকৃত-জনোচিত মনোভাবও প্রবল। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, শিল্পের প্রকৃষ্টভাবে আলোচনা মানব-চিত্তের সাধারণভাবে উৎকর্ষ বর্ধনের এক প্রধান পথ। শিল্পের মধ্যে জাতির উৎকর্ষের, জাতির আধ্যাত্মিক, মানসিক এবং জাগতিক সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কোন্ কোন্ ভাবধারা কীভাবে একটি বিশিষ্ট জাতির শিল্পকে উদ্বুদ্ধ বা অনুপ্রাণিত করিল, ইহাকে পুষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিল, যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির জাতীয় শিল্পে লক্ষণীয় ভঙ্গী বা বৈশিষ্ট্য কী ; কীভাবে শিল্প হইতে জাতির সংস্কৃতি পুষ্টিলাভ করিল, কিংবা জাতির চরিত্র ভ্রষ্ট বা বিক্ষিপ্ত হইল ; জাতির মৌলিক প্রকৃতি তাহার শিল্পের মধ্যে কিভাবে আত্মপ্রকাশ করিল, এবং এই মৌলিক প্রকৃতি কী উপায়ে বিদেশীয় অথবা ভিন্ন জাতির প্রকৃতিজাত শিল্প-রীতি দ্বারা, প্রভাবান্বিত, প্রবর্ধিত বা ব্যাহত হইল ; বিভিন্ন যুগের সামাজিক, ধর্মীয় ও বাস্তব সভ্যতা কীভাবে শিল্পে প্রকটিত হয় ; এই সমস্ত বিষয় লইয়া বিচার, জাতির রাষ্ট্রনৈতিক বা দার্শনিক, সমাজনৈতিক বা অন্যবিধ ইতিহাস আলোচনা অপেক্ষা কম উপযোগী এবং চিত্তের পরিপোষক বিদ্যা নহে। বিদ্যালয়ে আমরা ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস অধ্যয়ন করি, কিন্তু জাতির আত্মার সহিত চাক্ষুষ পরিচয়ের ক্ষেত্র-স্বরূপ তাহার শিল্প-কলার আলোচনা সম্বন্ধে আমাদের কোনো উৎসাহ বা আকাঙ্ক্ষা নাই। অথচ, জাতির মধ্যে উদ্ভূত দ্রব্য অবলম্বনে আমরা সহজেই সুন্দরভাবে তাহার ইতিহাসের ও চিন্তার, সভ্যতার ও নৈপুণ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিতে পারি। নানা যুগের শিল্প-দ্রব্য দর্শনে এই পরিচয় ঘটিতে পারে, সুতরাং ইহা মনের উপরে বিশেষ দাগ রাখিয়া যায়, ভাসা-ভাসা থাকিতে পারে না।

আমাদের বিদ্যালয়ে শিল্পেতিহাস এবং শিল্পাস্বাদন উভয়ই অল্পবিস্তর পরিমাণে শিক্ষা

দেওয়া উচিত। মানসিক সংস্কৃতির পথে এই বিষয় দুইটি অপরিহার্য। বিদেশে নানা স্বাধীন জাতির মধ্যে শিক্ষাজগতের নেতৃস্থানীয় মনীষীদের চিত্ত এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে—Art Education-কে সকলেই সাধারণ শিক্ষার অঙ্গীভূত করিয়া লইবার প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করিতেছেন। আমাদের দেশে কিন্তু এ বিষয়ে কাহারও তেমন উৎসাহ নাই। দেশের বা বাহিরের শিল্প-সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ, রূপ 'শিক্ষিত' ব্যক্তি এ দেশে প্রচুর। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ দুই, চারিজন শিল্প-রসিক পণ্ডিত ভারতীয় শিক্ষা-নেতাদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন—কিন্তু তাঁহাদের প্রয়াস, অরণ্যে রোদন মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার মনে হয়, প্রথমটায় কেবল ইতিহাস বা মানব সভ্যতার অঙ্গ-স্বরূপ শিল্পেতিহাসের চর্চা আমাদের বিদ্যালয় সমূহে প্রবর্তিত হইতে পারে। তৎপরে এ বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি পড়িতে পারে, এবং সাধারণ শিক্ষার মধ্য দিয়া, কাব্যাস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পাস্বাদন করাইবারও চেষ্টা হইতে পারে।

আমাদের দেশের শিল্পের ধারাটি, দেশের রাষ্ট্রীয় ও সাহিত্যিক ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে, সংক্ষিপ্ত আকারে মাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পর্যন্ত আবশ্যিক পাঠ্য বিষয় করিতে পারা যায়। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাট্রিকুলেশনের নূতন-গৃহীত পাঠ্য-বিষয়সমূহের মধ্যে, 'শিল্প-রীতি পর্যালোচনা এবং চিত্রাঙ্কন-বিদ্যা' এই দুইটি বিষয়কে ঐচ্ছিক বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম হিসাবে স্থান দিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা কেবল মেয়েদের জন্য হইয়াছে, পুরুষ পরীক্ষার্থীরা এই দুইটি বিষয় গ্রহণ করিতে পারিবে না। অবশেষে এইভাবে শিল্প-শিক্ষার অবতারণা করা হইয়াছে, ইহাই যথেষ্ট আনন্দের বিষয়। আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা—যথাকালে শিল্পেতিহাসও দেশের ইতিহাসের অংশ-স্বরূপ বিবেচিত হইয়া যেন সকল ছাত্রের আলোচ্য বিষয়-রূপে গৃহীত হয়।

ভারতের শিল্পের ঐতিহাসিক যুগের ধারাটি, অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতের শিল্প-কাহিনি মোটামুটি আমরা ধরিতে পারিতেছি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কানিংহাম, ফর্গুসন, হ্যাভেল, আনন্দ কুমারস্বামী, গ্র্যুন্‌ভেডল্, ফুশে, গোলুবিএফ, বাখ্‌হোফর্, মার্শাল, গ্রিফিথ্‌স্, স্পুনর, পার্সি ব্রাউন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উইলিয়াম্ কোন্, ডিএট্‌স্, গ্যোট্‌স্, গোপীনাথ রাও, স্টেল্লা ক্রামরিশ, ফোগেল, ড্যোরিং, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, আলিস গেটি, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, নানালাল চমনলাল মেহতা, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, অজিত ঘোষ, ঝুভো-দ্যুব্র্যোই, কৃষ্ণশাস্ত্রী, রয়টার, র‍্যনে গ্রসে, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, সত্তার খয়্‌রী, নর্‌মান ব্রাউন প্রমুখ পণ্ডিতগণের চেষ্টায়, ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিল্পের ইতিহাসের গতি

আমাদের সমক্ষে উদঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু সব কথা জানা যায় নাই। ভারতীয় শিল্পের উৎপত্তির কথা, এবং ইহার প্রাথমিক অর্থাৎ মৌর্য-পূর্ব যুগের ইতিহাস—সে সম্বন্ধে আমাদের কোনও স্পষ্ট ধারণা এখনও হয় নাই। অতীতের অন্ধতমিস্রাময় প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোন্ কোন্ জাতির রক্ত মিশিয়া প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু জাতিকে গড়িয়া তুলিয়াছিল; অস্ট্রিক বা অস্ট্রো-এশিয়াটিক, দ্রাবিড়, মোঙ্গোল, সম্ভবত ফিন্নো-উগ্রীয় বা উরালীয়, এবং আর্য জাতি—ভারতের হিন্দু সভ্যতার গঠনে কে কোন্ উপাদান আনিয়া দিয়াছিল, এ সমস্ত তথ্য এখন অজ্ঞাত, অবলুপ্ত। আদিত্তনল্লুর ও মোহেন্-জো-দাড়োর যুগ হইতে মৌর্য যুগ পর্যন্ত তিন চারি হাজার বছর ধরিয়া ভারতের সংস্কৃতি ও শিল্পের ইতিহাস এখনও নির্ধারিত হয় নাই। এই কার্যে ভারত এবং ইউরোপের নৃতত্ত্ববিৎ, সমাজতত্ত্ববিৎ, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, ভাষাতত্ত্ববিৎ এবং ঐতিহাসিকগণের সমবেত চেষ্টা উপেক্ষিত। কত দিনে ভারতের প্রাচীন শিল্পের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের দিগ্‌দর্শন ঘটিবে, তাহা আমরা জানি না। বস্তুর অভাবে এখানে বিচারের বিশেষ অবকাশ নাই।

ভারতের অংশীভূত আমাদের বঙ্গদেশের শিল্পের কথাও আমরা তেমন জানি না। বাঙালি তাহার সাহিত্যের ইতিহাস লইয়া, তাহার ভাষার ইতিহাস লইয়া কাজ করিতেছে, সুফলও তাহাতে যথেষ্ট হইয়াছে। বাংলা দেশের ধর্ম ও দর্শন লইয়াও কাজ চলিতেছে। কিন্তু বঙ্গীয় বাঙ্ময়ের অতিরিক্ত, বঙ্গদেশের বাস্তব-সংস্কৃতির প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করি না। তুর্কি আক্রমণের পূর্বের যুগে. বাঙালি জাতি বাংলা ভাষা লইয়া গড়িয়া ওঠে নাই ; বাংলা ভাষা নিজ বিশিষ্ট রূপ ধরিয়া দাঁড়াইবার পূর্বে, আমরা বাঙালি জাতির কল্পনা করিতে পারি না। আমার মনে হয়, খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি যখন বঙ্গ ও মগধে পাল রাজবংশের অভ্যুত্থান ঘটিল, তখন বাংলা ভাষাও মাগধী-অপভ্রংশ হইতে আর একটু পরিবর্তিত হইয়া, আদিম বঙ্গভাষার রূপ ধারণ করিল; তখন হইতেই বাঙালি বা বঙ্গভাষী জাতির উদ্ভব হইয়াছে, ইহা ধরিয়া লইতে পারি। এই নব-সৃষ্ট বা সৃজ্যমান বাঙালি জাতি প্রথম হইতেই মানসিক ও বাস্তব উভয় প্রকার সংস্কৃতিতে লক্ষণীয় কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হয়। বঙ্গদেশের তুর্কি-পূর্ব যুগের সংস্কৃত চর্চা ভারতের সংস্কৃত বিদ্যার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, বঙ্গদেশের পণ্ডিতদের 'গৌড়ী-রীতি'র রচনাকে সারা ভারতবর্ষও সম্মান করিয়াছে। বঙ্গদেশ হইতেই বৌদ্ধ আচার্যগণ ভোট-দেশ বা তিব্বত, সুবর্ণভূমি বা বর্মা এবং দ্বীপময় ভারতে গিয়া বৌদ্ধধর্মকে সংস্কৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ ও শৈব সাধকেরা সারা উত্তর-ভারতে নিজেদের প্রভাব বিস্তীর্ণ করেন। শিল্প-জগতেও নিখিল ভারতের জাতীয় শিল্প, ভাস্কর্য ও চিত্র-কলা, এই দুইটিকেই নূতন ভাবধারায় অভিষিক্ত করিয়া, বঙ্গীয় শিল্পীগণ একটি নূতন শিল্প-ধারার প্রবর্তন করেন ; ষোড়শ শতকের তিব্বতি ঐতিহাসিক লামা তারনাথ সে কথা আমাদের জানাইয়া গিয়াছেন, এবং রীতি-প্রবর্তক

দুইজন প্রধান শিল্পীর নামও আমাদের বলিয়া গিয়াছেন—বীতপাল ও ধীমান্। পালযুগের গৌড়-মগধ শিল্প ভারতীয় ভাস্কর্যে এক নবীন বস্তু আনয়ন করিল; ভারতের শিল্প-জগতে ইহা পূর্ব-ভারতের, বিশেষত বঙ্গদেশের, বিশিষ্ট দান। পাল ও সেন যুগের বিষ্ণু, হরগৌরী, দুর্গা, সূর্য, বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, তারা প্রভৃতি মূর্তির মতো ধ্যান-স্থির দেবতা-মূর্তির এমন অপরূপ ভাবশুদ্ধ বিলাস, মধ্যযুগের ভারতের শিল্পে আর কোথায় পাওয়া যায়? এই গৌড়-মগধ শিল্পের প্রভাব বাংলা ও বিহারের বাহিরে, দেশ-দেশান্তরে প্রসৃত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের ধ্যানময় দেবমূর্তি, নেপালে, এবং ভারতের বাহিরে ভোট-দেশে, ব্রহ্মে, চিনদেশে, যবদ্বীপে, সমস্ত বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী দেশে ভক্ত ও সাধকগণের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ভারতের শিল্পের এই অভিনব ধারা গৌড়-মগধ শিল্প, বৃহত্তর ভারতের মধ্যে এক আন্তর্জাতিক বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বাঙালির সংস্কৃতির প্রথম যুগের এই বিশিষ্ট এবং মনোহর প্রকাশ লইয়া বাঙালি পণ্ডিত ও কলা-রসিক সার্থক গবেষণা করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার মৈত্র, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এবং শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞাতব্য বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, বাংলার এই প্রাচীন মূর্তি-শিল্পের প্রেরণা এবং রচনা-ভঙ্গীর মৌলিকত্ব ও সৌন্দর্য, আভ্যন্তর তত্ত্ব এবং বাহ্য স্বরূপ আমাদের চক্ষুর সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। বিদেশি পণ্ডিতদের মধ্যে ইংরেজ জে-সী ফ্রেঞ্চ, অস্ট্রিয়া-দেশিয়া স্তেল্লা ক্রামরিশ, ফরাসি র‍্যনে গ্রসে এবং ওলন্দাজ শিল্পবিৎ বের্নেট্ কেম্পস-এর অনুশীলন ও গবেষণাও এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু প্রথম যুগের শিল্পকলার আলোচনা এই সকল রসজ্ঞ তত্ত্ববিদ্গণের চেষ্টায় সুস্থাপিত হইলেও পরবর্তি কালের বাঙালির শিল্পময় প্রকাশ সম্বন্ধে এখনও আমরা অবহিত হইতে পারি নাই। তুর্কিদের আগমনের পূর্বের যুগের বঙ্গদেশীয় গৌড়-মগধ-জাত শিল্পরীতির মধ্যে, বাংলার বাস্তু-শিল্প প্রাচীন মন্দিরাদির তেমন আলোচনা হয় নাই। মুসলমান-পূর্ব যুগের পাথরের বা ইটের তৈয়ারি যে অল্পকয়টি মন্দির বাংলার বাস্তু-শিল্পের নির্দশন-স্বরূপ বিদ্যমান আছে, সেগুলিকে আশ্রয় করিয়া প্রথম যুগের বাংলার গৃহশিল্পের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা এখনও হয় নাই। মুসলমান রাজাদের আমলে পাথরে দেউল-তোলার পাট বাংলা দেশের হিন্দুদের মধ্য হইতে একেবারে উঠিয়া গেল, পাথরের স্থাপত্যের সঙ্গে সঙ্গে পাথরের ভাস্কর্যও প্রায় শেষ হইয়া গেল। মন্দির ও ইমারতের ইট কাটিয়া, নূতন ধরনের পোড়ামাটির ভাস্কর্য আরম্ভ হইল, হিন্দু মন্দিরে দেবদেবী নরনারী পশুপক্ষী লতাপাতা প্রভৃতির ছবি, মুসলমান মসজিদে নানা রকমের নকাশী কাজের অলঙ্কার। বাংলার এই নবীন স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের চর্চা, বা ইহা লইয়া গবেষণা, এখনও হয় নাই; যে স্থাপত্য পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুরের সুন্দর মন্দিরাবলি, উত্তরবঙ্গের কান্তনগরের মন্দির, এবং দক্ষিণ,

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের অন্য নানা মনোহর মন্দির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার আলোচনা এবং বাঙালি কলাবিদের হাতে তাহার আলোচনা না হওয়া লজ্জার কথা। বাঙালির মধ্যযুগের চিত্রশিল্প ও মূর্তিশিল্প, রাজসভায় আদৃত মহিমময় শিল্প-স্বরূপ এখন আর বিদ্যমান নাই, ইহা এখন পল্লিঅঞ্চলে অনাদৃত অখ্যাত গ্রাম্য শিল্পের কোঠায় নীত হইয়া, স্বদেশি ও বিদেশি ছাপা ছবি এবং সেলুলয়েড পুতুলের প্রতিযোগিতায় আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে। মধ্যযুগের বাংলার চিত্রশিল্প লইয়া, পুঁথির পাটার ছবি, পট, চালচিত্র ও অন্য ছবি, এবং কালীঘাটের পট প্রভৃতি বাঙালির বিশিষ্ট শিল্প-প্রকাশের নির্দশন লইয়া বাঙালি শিল্পবিদ্‌গণের আলোচনা এখনও অপেক্ষিত। বাংলার গ্রাম্যশিল্পের আধারে বিগত খ্রিস্টীয় শতকের শেষপাদে কলিকাতায় একটি ইউরোপীয়-ভাব মিশ্র নতুন শিল্প-ধারা ধীরে ধীরে প্রবর্তিত হয়। পাথরে ছাপা রঙিন দেবদেবী চিত্রে এবং পৌরাণিক ও কচিৎ ঐতিহাসিক এবং সামাজিক চিত্রে ইহার একটি লক্ষণীয় এবং সুন্দর প্রকাশ ঘটিয়াছিল। ইহারও সম্যক আলোচনা আবশ্যক; কিন্তু ৫০।৬০ বছর পূর্বে কাগজের উপরে ছাপা এই সব রঙিন লিথোগ্রাফের ছবি এখন দুষ্পাপ্য বা অপ্রাপ্য। আধুনিক যুগের বাঙালির একটি বিশেষ শিল্পময় আত্মপ্রকাশের নির্দশন এইরূপে প্রায় অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বা যাইতেছে। বহু প্রাচীন পরিবারে পুরাতন আমলের ছবি-রূপে ফ্রেমে বদ্ধ হইয়া এইসব ছবি এখনও দুই-চারিটা পাওয়া যাইতে পারে, এগুলিকে রক্ষা করিয়া, সংগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্য অবহিত হওয়া উচিত।

বাঙালির গ্রাম্য শিল্প বা লোক-শিল্পের প্রতি প্রথম দৃষ্টি পড়ে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রাচীন বাংলা পট, পুঁথির পাটা, হাতে আঁকা ছবি, মাটির মূর্তি ও পুতুল প্রভৃতির সংগ্রহে ইনি নিযুক্ত হন। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত নবীন-ভারতীয় শিল্প-সংঘের মধ্যেও, অজন্তা এবং রাজপুত ও মোগল চিত্র-প্রণালীর মতো কালীঘাটের পটের চর্চা এবং প্রভাব দুইই বিদ্যমান। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুও বাংলার লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন এবং তিনি এই লোকশিল্পের প্রাণবস্তু ও ইহার ভঙ্গিমা দুইই আয়ত্ত করিয়া এবং নিজ প্রতিভার দ্বারা ইহাদের মণ্ডিত করিয়া কতকগুলি অতিসুন্দর চিত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায় বাংলার গ্রাম্যশিল্পের ভাষাকেই তাঁহার শিল্পরচনার বাহন করিয়া লইয়াছেন। বাংলার এই লৌকিক-শিল্পের সবল রেখা-বিন্যাসের মধ্যেই তিনি তাঁহার সব কিছু বলিবার ভাষা পাইয়াছেন।

বাংলার লোকশিল্পের মধ্যযুগের বাংলার যাবতীয় শিল্পের, আদর করিবার লোক বিরল নহে। বাংলার লোক-নৃত্যের মধ্যে অমৃতময় প্রাণের সন্ধান যিনি পাইয়াছেন এবং এই অপূর্ব জিনিস দিয়া বাঙালিকে জিয়াইয়া তুলিবার আকাঙক্ষায় তাঁহার ব্রতচারিদের মারফত যিনি সারা বাংলাময় ইহার প্রচার করিতেছেন, বাংলা ছাড়িয়া ভারতের অন্য প্রদেশে,

এমনকি সুদূর বিলাতেও যিনি বাংলার লোকনৃত্যের বাণী পৌঁছাইয়াছেন, সেই ভাবুক ও কর্মী শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ও বাংলার লৌকিক শিল্পকলার একজন অনুরাগী সংরক্ষক ও সমালোচক। তাঁহার মতো রসজ্ঞ সংগ্রাহক ও বিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট হইতে আমরা বাংলার লৌকিক-শিল্প লইয়া ধারাবাহিক ও রীতিবদ্ধভাবে পূর্ণ আলোচনা প্রার্থনা করিতে পারি। বিখ্যাত গুণজ্ঞ শিল্প-সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ মহাশয়ও বাঙলার লোক-শিল্পের আলোচনা করিয়াছেন। রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও, বাঙালির শিল্পের, বিশেষ করিয়া মধ্যযুগের এবং আধুনিক লৌকিক শিল্পের পরিচয়, বহু চিত্রযোগে তাঁহার 'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থে দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বাংলা ভাষা বা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের মতো, বাংলার শিল্পের পূর্ণ ইতিহাসের যে অভাব আমাদের আছে, তাহা মোচনের জন্য বাংলা দেশের তরুণ গবেষকগণ বদ্ধপরিকর হউন। উপস্থিত আবশ্যক, বিভিন্ন যুগের শিল্পের নির্দশন সংগ্রহ করা। কলিকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালায়, রাজশাহির বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহে, এবং ঢাকার মিউজিয়ামে ও অন্যত্র কতকগুলি ব্যক্তিগতসংগ্রহে, পাল ও সেন যুগের ভাস্কর্যের বহু সুন্দর নির্দশন আছে। পরবর্তী কালের গৌড়-বঙ্গের শিল্পের জন্য একটি বিরাট ও ব্যাপক কেন্দ্রীয় সংগ্রহশালা স্থাপিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহ মুসলমান ও আধুনিক যুগের বাংলা শিল্প বিষয়ে নগণ্য; কিন্তু এই সংগ্রহকে, অথবা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন স্থাপিত আশুতোষ ভারতীয় কলাশালার ক্ষুদ্র সংগ্রহকে অবলম্বন করিয়া, বাঙালির শিল্পের পূর্ণ পরিচয় যেখানে পাওয়া যাইবে এমন একটি সংগ্রহ গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করা উচিত।

বাংলা দেশের সংস্কৃতির বাঙ্ময় প্রকাশ প্রাচীনকালে চর্যাপদের গান এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং মধ্যকালে চণ্ডীদাস, মঙ্গলকাব্যকারগণ, বৈষ্ণবপদকর্তৃগণ ও অন্য কবিদের রচনা অবলম্বন করিয়া ধারাবাহিকরূপে চলিয়া আসিয়াছে; ইংরেজি শিক্ষার ফলে, ইউরোপের মনের সহিত সংস্পর্শ বাঙালির চিত্তে সোনার কাঠির স্পর্শ দিল, তাহার চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিল। আধুনিক যুগে বাঙালি তাহার বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখাইল সাহিত্যে; ভারতবর্ষ তথা বিশ্বকে বাঙালি দান করিল—বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ। যে বাঙালির মধ্যে গৌড়-মগধ শিল্প রীতি সৃষ্ট এবং পুষ্ট হইয়া ভারতের শিল্প ক্ষেত্রকে প্রভামণ্ডিত করিয়াছে, সেই বাঙালির শিল্প-প্রতিভা বিগত সাত শত বছর ধরিয়া ম্লান হইয়াই ছিল ; মন্দিরের মূর্তি-শিল্প, পট, পাটা এইগুলিতে তাহার যে পরিচয় পাই, তাহা পাল ও সেন যুগের মহিমমণ্ডিত কৃতিত্বের পার্শ্বে নিতান্তই গ্রাম ও লৌকিক বলিয়া প্রতিভাত হয়। বাঙালির সাহিত্যিক জাগরণের শতবর্ষ পরে, কতকগুলি চেষ্টা ও অপচেষ্টা এবং অপূর্ণ কৃতিত্ব ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়া, খ্রিস্টীয় বিংশ শতকের প্রারম্ভে বাঙালির শিল্পবোধ এবং শিল্প চেষ্টা নূতন পথ

পাইল। বাহিরের স্পর্শ এক্ষেত্রেও কার্যকর হইয়াছিল; ভগিনী নিবেদিতা ও ঈ-বী হ্যাভেল প্রমুখ ইউরোপীয় মনীষীদের দ্বারা প্রাচীন ভারতের শিল্পের চর্চা এবং প্রতিস্পর্ধী ইউরোপীয় রেনেসাঁস ও গ্রিক—শিল্পের পার্শ্বে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের গৌরবময় প্রতিষ্ঠা, ভারতের শিষীদের আর একবার অনুর্মুখী হইতে উৎসাহ দিল; নিজ জাতীয় শিল্পের রক্ষা বিষয়ে জাপানের চেষ্টাও ভারতীয় শিল্পীদের উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা আনিয়া দিল। ইহার ফলে আশার বাণী এবং কৃতকারিতার গৌরব লইয়া দেখা দিলেন শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর; আধুনিক ভারতের সাংস্কৃতিক জাগরণে তাঁহার নাম চিরকাল ধরিয়া শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত হইবে। গুরুর আবাহনে যে শিল্পদেবতা জাগরিত হইলেন, অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যানুশিষ্যেরা তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন, এবং এইরূপে যথাশক্তি ভারতের সংস্কৃতির শাশ্বত গৌরবকে আরও মহনীয় করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োজিত হইলেন। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যবর্গের মধ্যে, 'সিদ্ধশিল্পী,' 'রূপপতি' নন্দলাল বসু, নিজ গুরুর সহিত মিলিতভাবে বিশ্বশিল্পসভায় ভারতের আসন আবার উন্নীত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভারতীয় ও বিশ্ব সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যে স্থান, আমার মনে হয়, ভারতের ও বিশ্বের শিল্পকলায় নন্দলালের সেই স্থান; আদিম যুগ হইতে পৃথিবীর তাবৎ শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে বাংলার নন্দলাল অন্যতম। গুরু-নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া নন্দলাল একাধারে প্রাচীন শিল্পের প্রাণরস ও তাহার শক্তিটুকু আহরণ করিয়াছেন, এবং আধুনিক ভারতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ সত্যতম এবং সুন্দরতম রূপময় প্রকাশ করিয়াছেন। শিব-উমার যে মহনীয় কল্পনা ভারতীয় ধর্মোপলব্ধি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, এবং যাহা বিশ্বের তাবৎ দেব-কল্পনার মধ্যে উদার, বিরাট, গভীর, গম্ভীর ও সর্বন্ধর ভাবে অতুলনীয়, সেই গরিমময় কল্পনাকে রূপ দিয়াছিলেন প্রাচীন ভারতের শিল্পীরা—ধারাপুরী বা এলিফান্টায়, এলোরায়, মহাবলিপুরমে, চোলযুগের ধাতুমূর্তিতে, কাঙড়ার রাজপুত চিত্রে; নন্দলালের হাতে সেই মহনীয় কল্পনা, নতুনভাবে আবার প্রকাশিত হইয়াছে, শিব-উমা যেন নন্দলালের সমক্ষে সাক্ষাৎ প্রকটিত হইয়াছেন; নন্দলালের শিব-উমার পরিকল্পনা মহত্ত্বে ও সৌন্দর্যে প্রাচীন ভাস্করদের ও চিত্রকরদের সৃষ্টির পার্শ্বে গৌরবের সহিত স্থান পাইবার যোগ্য। নন্দলালের কৃতিত্ব বাঙালির এবং ভারতবাসীর গৌরব এবং গর্বের বিষয়। নন্দলালের সতীর্থ ও অনুগামী শিল্পীরা ভারতের অন্যত্র বঙ্গদেশের এই নব শিল্পাদর্শ এবং শিল্প-চেষ্টাকে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন এমন শিল্পী আছেন, আধুনিক ভারতের শিল্পক্ষেত্রে যাঁহাদের নাম সম্মানের সহিত উল্লিখিত হইয়া থাকে। অবনীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের শিষ্যদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ গুণবত্তা দেখাইবার পর অকালে পরলোকগমন করেন। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার, ইঁহাদের কতকগুলি মনোহর রচনা, এবং বিশেষভাবে অসিতকুমারের নানামুখী প্রতিভা ভারতীয় শিল্প-জগতে ইঁহাদের অমর করিয়া রাখিবে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর চিত্র-শিল্পী রূপে সর্বজনাদৃত কতকগুলি রচনায় কৃতিত্ব দেখাইবার পরে, বাস্তু-শিল্পে একটি নূতন এবং অতি মনোহর ধারার প্রবর্তন

করিয়াছেন; এ বিষয়ে তাঁহার বলিষ্ঠ কল্পনা ও কুশলতা দেশবাসীর নিকটে সুপরিচিত হওয়া উচিত। আধুনিক বঙ্গীয় তথা ভারতীয় গুণীদের মধ্যে ভাবুকশিল্পী শ্রীযুক্ত কামিনীরঞ্জন রায়ের আসন একটি বিশিষ্ট স্থানে। ইউরোপীয় এবং পুনরুজ্জীবিত আধুনিক ভারতীয়, উভয় প্রকার শিল্পরীতি সম্যক আয়ত্ত করিয়া, ইনি এখন বাংলার গ্রামশিল্পের কতগুলি বিশিষ্ট ভঙ্গীর আধারে নিজ শিল্পময়তা প্রকাশের অভিনব ভাষা সৃষ্টি করিয়াছেন। বাংলা গ্রাম শিল্পের সবল রেখা এবং পরিস্ফুট বর্ণ সমাবেশ যে কত শক্তির পরিচায়ক, তাহা যামিনীরঞ্জনের রচনায় বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন গৌড়-মগধ শিল্পীরা দেবমূর্তি রচনায় প্রতিমালক্ষণ শাস্ত্রকে মানিয়া লইয়া, ওই শাস্ত্রের নিদিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিয়া, অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। যামিনীরঞ্জনও তেমনি মধ্য-যুগের বাংলা চিত্রের রেখা ও বর্ণবিন্যাসের ধারার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে স্বেচ্ছায় নিজেকে বন্ধন করিয়া, এই সীমাবদ্ধ রূপের মধ্যেই অরূপের আবাহন করিয়াছেন, এবং তাঁহার স্বল্পভাষী রচনায় মহাভারত সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যামিনীরঞ্জনের শিল্পকলা আধুনিক বাংলা তথা ভারতে এক অপূর্ব বস্তু; ইহার শক্তি ও সৌন্দর্য, স্বল্পভাষিতার সহিত বাগ্মিতা, দুইই ইহাকে এক নতুন বিশিষ্টতা দান করিয়াছেন। নন্দলাল গভীরত্ব ও ব্যাপকত্ব উভয়েই অতুলনীয়, এবং তিনি তাঁহার বহুবিধ রচনায় আমাদের অরূপের রূপ দেখাইয়াছেন ও রূপাতীতের বাণী শুনাইয়াছেন; যামিনীরঞ্জন দৃঢ় রেখা ও পরিস্ফুট বর্ণের অতলে ডুব দিয়া অরূপ-রত্নের অন্বেষণ করিতেছেন ; মনে হয়, তাঁহার ছবিতে এই অরূপ-রত্নের জ্যোতি প্রতিফলিত হইয়াছে।

বাংলা দেশের শিল্পীরা আধুনিক ভারতের শিল্প-চেতনায় এবং শিল্প-সৃষ্টির রাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন, ইহা বাংলা দেশের পক্ষে এক গৌরবের বিষয়। কিন্তু বাঙালি শিল্পীর নবীন চেষ্টার মধ্যে, সব সময়েই শক্তি বা কৃতকারিতা দেখা যায় না। প্রাচীন শিল্পের প্রতি একটা অন্ধ শ্রদ্ধা আসিয়া পড়ায়, বহুত জীবন্ত সৃষ্টি অপেক্ষা প্রাণহীন অনুকরণ চেষ্টাই দেখা যায়। দর্শন-শক্তিযুক্ত চক্ষু এবং শিল্পদৃষ্টি-নিয়ন্ত্রিত অকম্পিত হস্ত, এই দুইই বিশেষ সাধনার অপেক্ষা রাখে। সংস্কৃতের মতো প্রাচীন ভাষা শিখিতে গেলে, ব্যাকরণ-চর্চা অপরিহার্য; প্রাচীন ভারতের শিল্পের প্রাণটুকু আধুনিক রচনায় ফুটাইয়া তোলা অসাধারণ শক্তি ও সাধনার দ্বারাই সম্ভব। আধুনিক বাঙালি শিল্পীদের অনেকে প্রাচীনের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় রাখেন না, আধুনিক জীবনও ভালো করিয়া জানেন না। তাঁহারা কেবল গুরু-নির্দিষ্ট পথ, গুরুর আচরিত পদ্ধতি, অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিলেই কর্তব্য শেষ হইল মনে করেন। সত্য-দর্শনের চোখের অভাব, আবার সঙ্গে সঙ্গে সবল রেখাপাতের উপযোগী হস্ত নিবারণ শক্তিরও অভাব। সুতরাং, ফিকা রঙের কোয়াসায় অক্ষম রেখাপাতকে আবৃত করিয়া, ততোধিক অক্ষম কল্পনার প্রকাশ, তথাকথিত 'ভারতীয় পদ্ধতি'র আধুনিক

বাঙালি শিল্পীর রচনায় অত্যন্ত সাধারণ। বাংলা কাব্য ও নাট্য সাহিত্যে যে গতানুগতিকতা, যে অনুকরণ, যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বিদেশি ভাব বা রীতির অনুবর্তন দেখা যায়, 'ভারতীয় শিল্প-রীতি' অনুসারে যে সকল বাঙালি শিল্পী ছবি আঁকেন, তাঁদের অনেকের ছবিতে সেই সেই অবগুণ পাওয়া যায়। চারিদিকের জীবনের সঙ্গে ইঁহাদের যোগের অভাব, প্রাচীন শিল্পের বাহ্য ভাষাটুকুকে একমাত্র পুঁজি করিয়া লইবার চেষ্টার সহিত মিলিত হইয়া, ইঁহাদের অনেকের শিল্প-রচনাকে নিতান্ত মূক ও প্রাণহীণ করিয়া ফেলিয়াছে। সংস্কৃত বা ফারসি বা হিন্দি যদি বলিতে না পারি, খাঁটি বাংলা বলিতে চেষ্ট করা উচিত; যদি খাঁটি বাংলাও না আসে, ভাষা দুরস্ত করিয়া লইয়া, তবে তাহাতে ভাব প্রকাশের চেষ্টা করা উচিত; এমনকী, নিজ বক্তব্য যদি সুবোধ্য করিয়া ইংরেজি-বাংলা মিশ্র চল্‌তি ভাষায় বলা যায়, তাহা অবোধ্য ব্যাকরণাশুদ্ধ প্রাচীন ভাষা বা অন্য প্রদেশের ভাষা ব্যবহার অপেক্ষা কার্যকর হইবে। আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত সম্মিলিত না রাখিয়া, কেবল কাব্য ও শিল্পের উপজীব্য রূপে প্রাচীন দেবকল্পনাকে দেবমূর্তি ও দেব-চরিত্রকে ব্যবহার করিলে, কল্পনা ক্ষুণ্ণ হয়; আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও দর্শন হইতে উদ্ভূত বিরাট রূপ-সৃষ্টি তাহাতে কেবল বিলাসে পরিণত হয়; এবং সে বিলাস প্রীতিকর হইলেও, প্রাণের পরিচায়ক চিরন্তন শক্তি ও সৌন্দর্যের আধার শিল্প-পদবাচ্য হইতে পারে না। গ্রিসের শিল্পের ইতিহাসে আমরা এই ভাবটিই দেখিতে পাই। গ্রিক জাতি জে. উস্, দেমেতের, আপোল্লো, আর্তেমিস্, দিওনুসস্, আথেনা, হের্মেস্, আফ্রোদিতে, আরেস্ প্রভৃতি দেবতাগণে বিশ্বাস হারাইল, এই দেবতাদের বিরাট আধ্যাত্মিক স্বরূপ খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক হইতে তাহাদের জীবনে আর প্রতিস্পন্দন জাগাইল না; অথচ তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম খ্রিষ্টপূর্ব শতকে এবং তাহার পরেও রোমান যুগে, এইসব দেবতাদের লইয়া মূর্তি গঠন ও সাহিত্য রচনা চলিল; পরবর্তী আস্থাহীন শিল্পীদের হাতে, দেবমূর্তি রচনায় ব্যাপৃত গ্রিক শিল্প, আপাত-নয়নাভিরাম থাকা সত্ত্বেও, decadant বা ক্ষয়িষ্ণু এবং পতিত হইয়া গেল। বাংলা দেশেও এ যুগে যেন ইহারই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাইয়াছি।

আধুনিক বাঙালি শিল্পী, যে শিব ও উমা, কৃষ্ণ ও রাধার কল্পনার আধ্যাত্মিক শক্তিতে আস্থা পোষণ ক রেন না, কিংবা এই সকল কল্পনার গভীরত্ব ও গাম্ভীর্য যথাযথ উপলব্ধি করেন না; অথচ রাজপুত বা মোগল অথবা অজন্তার ছবির ভঙ্গীর হাস্যকর অনুকরণের উপরে জাপানি হালকা রঙের পোঁছ্ লাগাইয়া সেই শিব-উমা, কৃষ্ণ-রাধার লীলার ছবি আঁকিবার চেষ্টা করেন, মনে করেন, 'ভারতীয় শিল্প' হইতেছে। ইহা অপেক্ষা সোজাসুজি বাস্তবানুকারী ইউরোপীয় ভঙ্গীতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাকে, আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়কে, শিল্পে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টার মূল্য অধিক হইবে। এ স্থলে অক্ষম রেখাপাত ও ধোঁয়াটে বর্ণ-সমাবেশের সুবিধা নাই ; রচনায় ব্যাকরণ-দোষ

সহজেই ধরা পড়ে।

আধুনিক ইউরোপীয় technique–বাস্তবানুকারী চিত্রণ-পদ্ধতি লইয়া যে সকল বাঙালি শিল্পী কাজ করিতেছেন, বাংলার শিল্প-জগতে তাঁহাদেরও একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। এইরূপ শিল্পীদের মধ্যে চিত্রকর শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু ও চিত্রকর ও ভাস্কর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতুল বসু ও দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কৃত কতকগুলি প্রতিকৃতিময় চিত্র ও মূর্তি বাংলার শিল্পেতিহাসে সম্মানের সহিত উল্লিখিত হইবে।

বাংলা তথা ভারতের শিল্প-সৃষ্টি এবং শিল্পালোচনার ক্ষেত্রে সহজ ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিবর্তে, অত্যধিক দেশাত্মবোধ দ্বারা দুষ্ট Orientalism বা 'প্রাচ্যবাদ'—'আর্যামি'র জ্ঞাতি হিসেবে যে 'প্রাচ্যবাদ'কে আমরা 'প্রাচ্যামি'ও বলিতে পারি, সেই 'প্রাচ্যামি' আসিয়া গিয়াছে। শিল্পজগতে যদি অনুচিত দেশাত্মবোধ আসে, তাহা শিল্পের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হইবে না। ইউরোপীয় শিল্পী ও শিল্প রসিকেরা আমাদের শিল্পকে অবহেলা করিয়া আসিয়াছে, আমরাও করিয়াছি; এতদিনে এই অবহেলার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে, আমরা Indian Spirituality vs. Western Materialism, 'ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা বনাম ইউরোপীয় ইহলোক-সর্বস্বতা' ; এই বুলি আওড়াইতেছি, এবং এই বুলিতে বিশ্বাসও করিতেছি। সেইজন্য আমরা এখন এই কথাটি শুনিতে বা বলিতে ভালোবাসি যে ভারতীয় শিল্প আধ্যাত্মিকতার রসে ভরপুর, ইউরোপের শিল্প (কী গ্রিক, কী বিজান্তীয়, কী গথিক, কী রেনেসাঁস, কী আধুনিক, সব আমরা এক কড়ায় চড়াইয়া দেই) মানবিকতার পূজায় মত্ত। এই প্রকার বিশ্বাস বা বিচারের বশবর্তী হইয়া, আমরা এখন (অন্তত বাহিরে) প্রাচ্যের পূজারি হইয়া পড়িতেছি; আভ্যন্তর প্রেরণা হইতে, আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির জোরে, আর খাঁটি প্রাচ্য থাকিতেছি না; বাহিরের জগতের চাপে ভিতরে আমরা যতই ইউরোপীয়-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছি, ততই আমরা প্রাচ্যামিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া, বাহ্য জীবনে ইহার ছিটাফোঁটা লাগাইয়া, আমাদের অবস্থায় যে অস্বস্তি আমরা অনুভব করি সেই অস্বস্তিকে কাটাইয়া উঠিতে চাহিতেছি। শিল্পে আমাদের এই প্রাচ্যামিও দেখা দিতেছে; এবং 'কস্‌মেটিক্'-এর বিজ্ঞাপনের ছবিতে, অজন্তার যুগের মেয়েদের অনুকরণে বুকে গামছা বাঁধিয়া, গামছা বা খাটো লুঙ্গি পরিয়া, ইউরোপীয় সুন্দরীরা যে আধুনিক বাঙালি ঘরের শিক্ষিতা মেয়েদের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহা শিল্প-বিষয়ক এই প্রাচ্যামির একটা প্রকাশ মাত্র। ইউরোপীয় প্রেমিক-প্রেমিকা যুগলের ফোটোগ্রাফের নকলে অনুরূপ ভঙ্গীতে রাধা-কৃষ্ণের ছবি আঁকা, ইহাও এই প্রাচ্যামির এক অপকৃষ্ট বিকার মাত্র। শিল্পকলায় এই বাহ্য প্রাচ্যামি একটা ভাণ মাত্র; ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা মনে-প্রাণে না বুঝিয়া, দৈনন্দিন জীবনে ইহাকে কার্যকরী করিবার কোনো চেষ্টা না রাখিয়া, কেবল শিল্প-সৃষ্টিতে ইহার বিলাস প্রদর্শন করা একটা মিথ্যাচার, একটা প্রাণহীন ভঙ্গী-মাত্রতে

পর্যবসিত হয়। ইহাতে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য, মাত্র নাম এবং বাহ্য অপ্রধান দুই একটি বস্তু ব্যতীত আর কিছুতেই বিদ্যমান নাই। এই সমস্ত জিনিস যেন, 'পরশুরাম'-দৃষ্ট, বঙ্গদেশের আধুনিক শিক্ষিত লোক এবং এমনকি 'জজ মেজিস্ট্র মহামহোপাধ্যায়'গণের দ্বারা পৃষ্ঠ-পোষিত 'রেণ্ডেজ্‌ভোঁস্' 'আংগ্লো-মোগলাই কেফ্'-এর 'নবতম অবদান' ; 'কচি ভাইটো-পাঁঠার ইষ্টু', 'মুরগির ফ্রেঞ্চ মালপো,' অথবা 'ডবল ডিমের রাধাবল্লভী'; কিংবা অতি-আধুনিক বাঙালি সংগীত-স্রষ্টার 'ধ্রুপদী গজল' অথবা 'ঠুমরির 9th Symphony.'

আকাঙক্ষা না হইলে পূর্তি হয় না। দেশের লোকের মধ্যে চাহিদা না থাকিলে শিল্প অথবা অন্য কোনো বস্তুরই প্রসার বা উন্নতি সম্ভব হয় না। ভারতবর্ষে এবং বঙ্গদেশে, শিল্পের সমঝদার এবং শিল্পের পৃষ্ঠপোষক, উভয়েরই অভাব। শিল্পের জন্য অর্থব্যয় করিতে যে ভাগ্যবান ব্যক্তি সমর্থ, অধিকাংশ স্থলে তাঁহার রুচি বিকৃত, এবং স্বদেশি শিল্পী ও শিল্পদ্রব্য দুইই তাঁহার অনুগ্রহ হইতে প্রায়ই বঞ্চিত হয়। দেশের সাধারণ শিক্ষার সহিত শিল্প-শিক্ষারও অভাব; এবং দেশ নিতান্ত দরিদ্র। দেশের রাজশক্তির নিকট উপস্থিত অবস্থায় শিল্পকলা বিশেষ কোনো সহায়তা পাইবার আশা করিতে পারে না, শিল্প এখন অবহেলিত। অন্যান্য সভ্য ও স্বাধীন দেশে, নগর ও জাতীয় সৌধাবলির শোভা বর্ধনের জন্য শিল্পী সর্বত্রই আহুত হন। কিন্তু ভারতবর্ষে এতদিন এই রীতি প্রায় অজ্ঞাত ছিল; সম্প্রতি দিল্লিতে স্বল্প পরিমাণে শিল্পের জন্য স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। বঙ্গদেশে ইহা আরও অজ্ঞাত ছিল। পোস্টার বা প্রাচীর-বিজ্ঞাপন এবং গল্প, উপন্যাস ও ইস্কুলপাঠ্য পুস্তকের ছবির রেওয়াজ না আসিয়া গেলে, অধিকাংশ শিল্পীকে অনাহারে থাকিতে হইত। অধুনা কলিকাতার দুই-একটি সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে বাঙালি শিল্পীরা নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইবার কথঞ্চিৎ সুযোগ পাইয়াছেন। যাহা বাংলার গভর্নমেন্ট বা তদনুরূপ প্রতিষ্ঠান করিলেন না, সেই শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা বিষয়ে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী হইলেন; সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে শিল্পী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা ভারত ইতিহাসের যে ভিত্তি-চিত্রমালা অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা আধুনিক বঙ্গদেশের শিল্পের ইতিহাসে এক অতি লক্ষণীয় ও স্মরণীয় ব্যাপার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত বহুতঃ অনুকৃত হইলে, বাংলাদেশের শিল্পীদের মধ্যে নূতন প্রেরণা ও উৎসাহ দেখা দিবে। সুখের বিষয়, কলিকাতায় দুই চারিজন গুণগ্রাহী ও শিল্প-রসিক ব্যক্তি এইরূপে বাংলার শিল্পী ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা আরম্ভ করিয়াছেন।

বাঙালির শিল্পকে জীবন্ত করিতে হইলে, বাঙালির জীবনের মধ্যে নিহিত সুখ ও দুঃখ, আনন্দ ও বেদনা, আদর্শবাদ ও বাস্তবিকতা, এই সমস্তইকেই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এই ফুটাইয়া তোলার সার্থকতা থাকিবে অজন্টা বা মোগল শিল্প, অথবা পুঁথির পাটার ছবির

ভঙ্গিতে নহে, কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত সত্য-দর্শনের মধ্যে এবং শক্তিময় প্রকাশের মধ্যে। ভঙ্গি যাহাই হউক না কেন, সারল্য ও সততাই হইতেছে সার্থক শিল্পের প্রাণ। বাঙালির জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যদি কিছু বড়ো জিনিস থাকে, এমন জিনিস যাহা সত্যসত্যই সমগ্র জাতির দেহ, মন ও প্রাণকে নাড়া দেয়, তবে সর্বদর্শী এবং কৃতী শিল্পী থাকিলে তাহার উপযুক্ত শিল্পময় প্রকাশ হইবেই। আর বাঙালির জীবন যদি ক্ষুদ্র ও নগণ্য থাকে, হাজার অজন্তার ভারত বা রেনেসাঁস ইটালি, আধুনিক ইউরোপ বা জাপানের অনুপ্রেরণা তাহাকে শিল্পে বড়ো করিয়া তুলিয়া ধরিতে পারিবে না। শিল্প ও সাহিত্য, এ সমস্তই জীবনের অংশ, এ কথা আমাদের অহরহ মনে রাখিতে হইবে। বাঙালি শিল্পী বাঙালির জীবনে মহাকাব্যের অনুরূপ রচনার বস্তু না পাইতে পারেন; কিন্তু বাঙালির ঘরোয়া জীবন লইয়া, ওলন্দাজ শিল্পীদের মতো অথবা জাপানি 'উকিয়ো-য়ে' শিল্পীদের মতো এক অভিনব গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন-সম্পৃক্ত চিত্রণ-রীতি তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে হওয়া উচিত নহে। এখানেও সত্যতা ও সত্যদৃষ্টি চাই, চোখ ও হাত চাই।

বাংলা সাহিত্যে এখন অরাজকতা চলিতেছে; ইউরোপীয় সাহিত্যের কতকগুলি নূতন জিনিস বাংলার সাহিত্যে এবং সমাজে চালাইবার চেষ্টা প্রায় সর্বত্র পরিদৃশ্যমান। বাংলা শিল্প-ক্ষেত্রেও এখন কোনো আদর্শ, কোনো বিশেষ রীতি নাই; জাতীয়তার নামে, Indian Art-এর দোহাই পাড়িয়া, ইউরোপীয় নকল-শিল্পের উপরে এক পোঁচ প্রাচ্যামির রং লেপিয়া, এখন সাধারণত বাঙালি শিল্পী আত্মপ্রকাশ বা আত্মবঞ্চনায় ব্যস্ত। এ ক্ষেত্রে একমাত্র দিগ্‌দর্শন আসিতে পারে,—প্রথমত, শিল্পীদের মানসিক সংস্কৃতির পরিবর্ধনে, শিল্পেতিহাসের আলোচনায়; মিসরীয়, গ্রিক, বিজান্তীয়, প্রাচীন ভারতীয়, গথিক, চিনা, জাপানি, রেনেসাঁস প্রভৃতি শিল্পের বড়ো-বড়ো সৃষ্টির অনুধ্যানে; দ্বিতীয়ত,—বহু বর্ষব্যাপী সাধনার দ্বারা সৌন্দর্যগ্রাহী দিব্যদৃষ্টি লাভে, এবং দিব্যদৃষ্টির প্রকাশক তুলিকা বা ছেদনী চালনার শক্তি অর্জনে। দেশের শিল্পের ধারাকে হৃদঙ্গম করিয়া, নিজ প্রচেষ্টাকে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে না দিলে, দেশের মাটি হইতে রস পাইয়া তবে শিল্প প্রাণবন্ত থাকিবে। যুগপ্রবর্তক অবনীন্দ্রনাথ, সিদ্ধশিল্পী রূপপতি নন্দলাল, ভাবুক রূপকার যামিনীরঞ্জন, নবীন বাংলার শিল্প-জগতের এই ত্রয়ী শক্তির অনুপ্রেরণা, তরুণ বাঙালি শিল্পীকে অমৃতের সন্ধান দিতে পারিবে, মানসিক ও শিল্প-বিষয়ক সংস্কৃতি ও উপলব্ধি, শক্তি ও দৃঢ়তা, সত্য-দর্শন ও সত্য-প্রকাশনের সাধনায় তাহার জন্য যুগোপযোগী পথ নির্দেশ করিতে পারিবে।

পঞ্চদশ প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের শিল্পকলা বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ : পাটনা ১২-১৪ পৌষ ১৩৪৪, ২৭-২৯ ডিসেম্বর ১৯৩৭ পুস্তিকাকারে মুদ্রিত।

দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

অভিভাষণ

সম্মিলনের কর্তৃপক্ষ আমাকে শিল্প-বিভাগের সভাপতিত্বের ভার দেওয়ায় খুবই সম্মানিত বোধ করছি এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিছু বলবার আগে এইটুকু জানিয়ে রাখতে চাই যে, লেখা কিংবা বলায় আমি অপটু, কারণ আসলে আমি পেশাদার পটো। তথাপি উপরোধে ঢেকি গেলার মতো বলার শাস্তি আমাকে মাথা পেতে নিতে হয়েছে। উপস্থিত আমার বক্তব্য, আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা, যাকে সাধারণে ওরিয়েন্টাল আর্ট বলে থাকেন। ওরিয়েন্টাল আর্টের অর্থ ব্যাপক হলেও আমরা তাকে আধুনিক বাংলার চিত্রকলা বলে ধরে নিয়েছি।

ছবি সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে সর্বাগ্রে মনে আসে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের কথা। ২৫-৩০ বৎসর আগে তিনি যখন ভারতীয় চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি অনুসরণ করে নিজস্ব প্রতিভা স্বতন্ত্রভাবে ফুটিয়ে-তুলছিলেন, তখন তাঁর গুণগ্রাহী ছিল খুবই কম, কিন্তু আজ তাঁর কাজের আদর শুধু ভারতবর্ষে কেন, ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে।

লম্বা আঙুল তিনি আজ আঁকেন তথাপি জনসাধারণের অনেকেই তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ রূপস্রষ্টা বলে মেনে নিয়েছেন।

সকলেই যে বুঝে মেনেছেন এ রকমটি আশা করা অন্যায়, কারণ কোনো দেশেই সাধারণে সব বিষয়ে নিজেরা বিচার করেন না, তৎকালীন চলতি রুচিই তাঁদের ব্যক্তিগত রুচি হয়ে দাঁড়ায়। ছবি সম্বন্ধে ভালো-মন্দ মতামতও কতকটা এই প্রকারের বিশেষজ্ঞের মতো চলতি হলেই সেটা সময়মতো সৌন্দর্য নির্ণয়ের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়।

সৌন্দর্যভোগস্পৃহা মানুষের জন্মগত সংস্কার। দেশ, কাল এবং পাত্র হিসাবে তা আপেক্ষিক এবং ভিন্নাকার হয় মাত্র। সুতরাং ছবি ছাড়াও পারিপার্শ্বিক সব জিনিসকেই সুন্দর করে দেখতে চাওয়া তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু একই রূপকে সে চিরকাল ভালোবাসে না, পরিবর্তন তাকে একঘেয়েমি থেকে বাঁচায় অথচ অজানা নূতনকে আহ্বান করার মতো সাহসও তার নেই, কারণ নিজের ভালো লাগলেও সমাজ নামঞ্জুর করে

দিতে পারে ; সুতরাং পরিচিত গণ্ডির ভিতর তাঁকে থাকতে হয়, কিন্তু তাঁর মন ঘুরে বেড়ায় নূতনের সন্ধানে।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রধারা অবলম্বন করে বাংলা দেশে যে নূতন আন্দোলন চলেছে, সেটাকে মোটমাট আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার আন্দোলন বলা চলতে পারে। এই নূতন আন্দোলন চলতি হবার পর মাসিক-পত্রিকার শিল্পীরা নির্দয়ভাবে নরদেহের উপর অত্যাচার করলেও তাতে আনুমানিক ভারতীয় চিত্রকলার ধারা বজায় থাকায় বিকলাঙ্গ দেহও মার্জনীয় হয়ে উঠেছে।

এই সব যথেচ্ছাচারিতার সমর্থন করার মূলে রয়েছে ফ্যাশান বা চলতি রুচি।

ইউরোপের বড়ো বড়ো শিল্পীরাও ফ্যাশানের আধুনিকতা বজায় রাখতে চিত্রাঙ্কনের যে আদর্শ এনেছেন, তা ছেলেমানুষি বা প্রাগৈতিহাসিক চিত্রধারার সূত্র ধরে গড়ে উঠেছে।

গড়ার দিকে এই আন্দোলনের তীব্র প্রতিবাদ হয়েছিল, কিন্তু ক্রমে সয়ে যাওয়ায় প্রতিবাদ বন্ধ হয়েছে। এই আন্দোলন প্রথমে যাঁরা করেন তাঁদের উদ্দেশ্য যে মহৎ ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ তাঁদের মতে শিল্পীর স্বতঃপ্রবৃত্তি, নির্ভীকিতা এবং বাহুল্য বর্জনই ছিল রূপকারদের আদর্শ, যা শিশুর ভাবপ্রকাশে অথবা প্রাগৈতিহাসিক শিল্পীর কাজে পাওয়া যায়। উক্ত গুণ, প্রতিভা এবং বিকৃতমস্তিষ্ক, উভয়েরই থাকা অসম্ভব হয়। বিদেশিদের অনুকরণে মাঝে মাঝে এদেশেও এমন ছবি বার হয়, যা দেখে বুঝতে পারি, প্রতিভা এবং পাগলামির মাঝে যেটুকু প্রভেদ আছে, তা উঠিয়ে দেবার দক্ষতা অনেকে অর্জন করেছেন।

ওরিয়েন্টাল আর্টের ফ্যাশানও আমরা নির্বিচারে মেনে নিয়েছি। অথচ এ রাস্তার পথপ্রদর্শক অবনীন্দ্রনাথকে অনেক ভালো কাজ করা সত্ত্বেও অযথা নিন্দা নির্বিবাদে সহ্য করতে হয়েছিল। সাহিত্যে বাঁশির মতো নাক, চাঁপার কলির মতো আঙুল ইত্যাদি প্রচলন আছে, অথচ ছবিতে সেগুলি রূপ পেলে আমরা তা সহজভাবে মেনে নিতে পারি না। সাহিত্য যা কল্পনা করল ছবিতে তা প্রত্যক্ষ করতে বাধে। এর কারণ খুঁজলে দেখতে পাব, ছবির ভাষার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতার অভাব। তদুপরি নূতনের সঙ্গে পরিচয় না থাকায় তাকে আপনার করে নিতে পারছি না। সাহিত্যের আঙুলকে সুন্দর বলে মেনে নিলেও ছবির আঙুলকে পারিনি। তার আর এক কারণ হতে পারে, ছবির আঙুলের রূপ অত্যন্ত স্পষ্ট, হয়ত তার আকার দ্রষ্টার কল্পনার বাইরে চলে গিয়েছে।

সাহিত্যে অথবা ললিতকলায় আমরা কী নিরবচ্ছিন্ন বাস্তবকেই পেতে চাই, না বাস্তবালম্বনে শিল্পীর পরিকল্পিত রূপসৃষ্টির রসভোগে বেশি আনন্দ পাই? সত্য কথা বলতে হলে বলব, শিল্পী যখন বাস্তবকে অবলম্বন করে একটি বিশেষ সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলল, তখনই তার ভাব এবং কলানিপুণতার রস-গ্রহণে আনন্দ পাই।

রঙ্গমঞ্চে নরহত্যার মতো ভয়াবহ দৃশ্যও দেখতে ভালো লাগে, কিন্তু সেই দৃশ্য বাস্তবে

পরিণত হবার সম্ভাবনা থাকলে অনেকেরই পক্ষে পীড়াদায়ক হবে।

রঙ্গমঞ্চে হত্যার দৃশ্য আমরা ভালো রকম জানি যে, তার উপকরণ মাত্র খানিকটা লাল রং এবং রাংতা-মোড়া একটি ছোরা। আরও জানি যে, লোকাভাবে মৃত ব্যক্তিও অন্য দৃশ্যে ফিরে আসতে পারে। এ সব জেনেও আমরা অভিনেতার মৃত্যুকে মেনে নিয়েছি।

ছবির মানুষকেও আমরা সত্য সত্যই জীবন্ত চাই না, কারণ এরকমটি যদি ঘটত যে, ছবির মানুষ জীবন্ত হওয়ায় প্রত্যহ তার ক্ষৌরকার্যের প্রয়োজন হচ্ছে, তাহলে এই ছবির সঙ্গে বসবাস করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠত।

রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা, কথাশিল্পে সাহিত্যিক যে অধিকার পেল, চিত্রশিল্পীর তার নিজের কাজে সেই একই অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার কোনো কারণ দেখি না।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, চিত্রশিল্পীর পরিকল্পনাতে বাস্তব থেকে কতটা প্রভেদের অধিকার নেওয়া শোভনীয়। এর সঠিক উত্তর দেওয়া শক্ত, কারণ রূপ ও রসের গুণগ্রহণ, দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করা চলে না, অথবা অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে হিসাব করে দেখানো যায় না, ঠিক কতটা প্রভেদ আইনসঙ্গত এবং কতটা নয়। ছবির গুণগ্রহণ নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে দ্রষ্টার সহানুভূতি এবং রসলব্ধির ক্ষমতার উপর।

এ বিষয়ে একটা উপমা না দিয়ে পারছি না, মহাপণ্ডিত রাস্কিন্ বিশ্ববিখ্যাত চিত্র-শিল্পী হুইস্লারের একটি রাত্রির ছবির তীব্র সমালোচনা করায়, বদরাগী হুইস্লার তার শোধ তোলেন একেবারে আদালতে গিয়ে।

বড়ো বড়ো ওস্তাদের অভিমত নেওয়ার পর জজসাহেব হুইস্লারকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এটা কি অমুক সাঁকো হয়েছে?' হুইস্লার উত্তর করলেন, 'ঠিক হওয়া না হওয়া নির্ভর করে যে দেখছে তার উপর ; আমি অমুক সাঁকোকে রাত্রে ঠিক ওই ভাবেই দেখেছি।' জজসাহেব আবার প্রশ্ন করলেন, 'ওই যে পোলের উপর কতকগুলি রংয়ের থ্যাবড়া লাগিয়েছ ওগুলি কি মানুষ?' হুইস্লার হেসে উত্তর দিলেন, 'যাক্ এতক্ষণে ওটা বুঝতে পেরেছেন জেনে খুশি হলাম।'

উল্লিখিত ঘটনা এখানে উত্থাপন করার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয় কেবল এইটুকু প্রমাণ করা যে সাহিত্যের মতোই ছবিরও ভাষার সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। এই ভাষার মধ্যে আছে রূপ-সৃষ্টির কৌশল, রংয়ের সামঞ্জস্য এবং প্রকাশ ভঙ্গীর একটি বিশেষ ধারা এবং শিল্পীর ব্যক্তিত্ব। এদের সহিত পরিচিত না হলে ছবির ভাষা বোঝা অসম্ভব হয়ে ওঠে এবং রসগ্রহণও সমুচিতভাবে হয় না।

সব দেশের কথিত ভাষা যেমন এক হয় না, তেমনি চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি এবং তার ধারা দেশ, কাল এবং পাত্র হিসাবে বিভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক।

ইউরোপ, চিন, জাপান ইত্যাদি দেশের কথিত ভাষা এবং চিত্রাঙ্কনের ধারা এক নয়। প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ভাষা এবং চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য আছে। এ দেশেও আমরা আমাদের

পুরাতন ধারাকে বজায় রেখে চলবার চেষ্টা করি। যখন আমাদের নিজেদের একটি বিশেষ চিত্রাঙ্কনের ধারা আছে এবং সেটি যখন অন্য চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি অপেক্ষা আর্টের দিক দিয়ে নিকৃষ্ট নয়, তখন আমাদের জাতীয় চিত্রধারা অনুসরণ করা দূষণীয় নয় যতক্ষণ শিল্পী তার কাজকে প্রাণবান করে তুলতে সমর্থ হয়। তবে যে পদ্ধতি অনুসরণ করেই ছবির সৃষ্টি হোক না কেন, তার মধ্যে শিল্পীর নিষ্ঠা, সাধনা এবং প্রকাশভঙ্গীতে স্বাচ্ছন্দ্য ফুটে ওঠা দরকার। কেবল ভাবের উচ্ছ্বাস এবং জাতীয় ধারার গোঁড়ামি বজায় রাখলেই ছবি কেন, কোনো কলারই সার্থকতা হয় না। ছবির বক্তব্য বিষয় অভাব থাকলে তাকে আর্টের কোঠায় ফেলা চলে না। যাঁরা ছবিতে subject-কে বড়ো করে দেখেন তাঁদের কাছে দেব-দেবীর রূপকারেই শিল্পীর আসরে শ্রেষ্ঠত্ব অধিকার করার দাবি কায়েমী হয়ে দাঁড়ায়। দেব-দেবীর চরিত্র অথবা ভাব ছবিতে প্রকাশ পেল কী না বিচারের প্রয়োজন বোধ করি না। এর প্রমাণ আধুনিক দেব-দেবীর রূপসৃষ্টি। দেব-সেনাপতি চিরকুমার কার্তিক রিস্টওয়াচ এবং পাম্প-সু পরার ফ্যাশান ছাড়তে পারেননি। মহাযোগী হিমালয়বাসী শম্ভু ক্লীন শেভ হয়ে আমাদের দর্শন দিয়ে থাকেন। পদ্মাসনে অভ্যস্ত তাণ্ডবনৃত্যের স্রষ্টা হয়েও তাঁর উদরের এমন বৃদ্ধি ঘটেছে যে, তাঁকে প্রথম দর্শনেই আয়েস-বিলাসী সচল মাংসপিণ্ড বলে ভ্রম হয়। এরূপ অবস্থায় কার্তিকের অথবা মহাদেবের চরিত্র শাস্ত্রানুসারে প্রকাশ পেয়েছে বলা চলে না। তথাপি subject sentimental হওয়ায় উক্ত কাজ ললিতকলার নিদর্শন বলে ধরে নিচ্ছি।

চৈনিক এবং জাপানি শিল্পীরা দু-চারটি তুলির আঁচড় মেরেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সঙ্গে সমান আসনে বসবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তাঁদের বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে পোকা-মাকড় জীবজন্তু ইত্যাদিই বেশি। তাঁরা এই সব কাজে জাতীয় চিত্রধারা অনুসরণ করেও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য হারাননি। তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে আছে সাধনার একাগ্রতা এবং ছবির ধর্মের উপর অকপট শ্রদ্ধা। তাঁরা জাতীয় চিত্রধারার উপরের খোলসটাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি, ছবির উদ্দেশ্যে যে গভীরতা আছে তার মধ্যে প্রবেশ করেছেন এবং তার সত্য বহির্জগতে প্রকাশ করেছেন, নিজেদের পরিপক্ক কলা নিপুণতার সাহায্যে।

কিন্তু আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার দোহাই দিয়ে মাসের পর মাস যেসব ছবি কাগজে ছাপা হচ্ছে সেগুলি হয়ত শিল্পীকে উৎসাহ দেবার জন্যই সম্পাদকেরা প্রকাশ করে থাকেন ; কিন্তু এ রকম ছবির প্রচারে ব্যভিচারই বেশি করে প্রশ্রয় পেয়ে থাকে। শিল্পীর সাধনা এবং রস সৃষ্টির অপেক্ষা তার প্রতারণা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ললিতকলার সৌন্দর্যকেবল জাতীয় চিত্রধারা অবলম্বন করলেই হয় না, তার মধ্যে যে সত্য এবং রস রয়েছে তার উপলব্ধি একান্ত প্রয়োজন।

উত্তরাধিকারসূত্রে পণ্ডিত হওয়া এখনও হয়ত প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণের পুত্র শাস্ত্র

বুঝুক বা না বুঝুক আমরা তাকে পণ্ডিতের সম্মান দিয়ে থাকি। বাস্তবিক তার পেশা জাতের উপযুক্ত কী না সে বিষয়ে অনুসন্ধান করি না। সে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করাতে তার সম্মান অধিকারসূত্রে প্রাপ্য বলে মেনে নিয়েছি। সেই রকম ভারতীয় চিত্রকলার দোহাই দিয়ে যেসব কাজ এখন ছবি বলে চলেছে, তাদের মধ্যে অধিকাংশকেই আমরা দেশীয় কোঠায় ফেলতে পারায় পরম পরিতোষ লাভ করেছি। ছবির জাতি-ধর্ম তাতে রক্ষা হয়েছে কী না তা বিচার করিনি। যারা এই সব কাজ ভারতীয় চিত্রকলা বলে প্রচার করেন তাঁরা হয়ত ভাবেন, যেহেতু অর্থহীন রেখা বিকলাঙ্গ দেহকে আবেষ্টন করেছে সেহেতু সেটি ভারতীয় চিত্রকলার অন্তর্ভুক্ত এবং যেহেতু ভারতীয়, সেই হেতু তার দোষগুণের বিচারের প্রয়োজন নেই। এমনও দেখেছি, তকমাধারী পণ্ডিতরা বড়ো বড়ো কথার যোগে এইসব কাজকে শ্রেষ্ঠ কলার নিদর্শন বলে প্রমাণ করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন। তাঁদের সমালোচনা পড়লে বোঝা যায়, শিল্পী অথবা শিল্পীর কাজের সহিত কোনোরূপ ঘনিষ্ঠতা তাঁদের ঘটেনি। তাঁদের ভাষায় সাহিত্যের কসরতই বেশি চোখে পড়ে। এই ধরনের সমালোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে, নিজেদের রসগ্রাহী বলে প্রমাণ করা।

ছবিতে মুখ্যত আমার দেখি, কতকগুলি রঙের বিন্যাস এবং রেখার লীলায়িত অথবা তেজোময় ভঙ্গী এবং উভয়ের মিলিত অথবা স্বতন্ত্র সামঞ্জস্যে কোনো বিশেষ ভাবের প্রকাশ। চিত্রশিল্পী এই কয়টি ভাব নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে কিন্তু সমালোচকের ভাষায় এইটুকু যথেষ্ট নয়। তাঁরা অনেক সময় ভাষার উপর দখল দেখাবার লোভ সংবরণ করতে পারেন না, ফলে এমন একটি ভাবের জন্ম দিয়ে বসেন যা শিল্পী কস্মিন্‌কালেও পরিকল্পনা করেননি। শিল্পীর কাছে সমালোচকের ভাব চাপানো ততক্ষণই শোভনীয় যতক্ষণ ছবির সত্যকে তাঁরা অস্বীকার না করেন।

ইউরোপের অতি আধুনিক ছবির অনেক সময় সোজা-উলটো বোঝা যায় না। গুজব, সেখানকার জনৈক সমালোচক ভাবাধিক্যে কোনো ছবির তিন পাতা প্রশংসা লিখেছিলেন পরে জানা গেল ছবির মাথা নীচের দিকে যাওয়াতেই ওইরূপ সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছিল। জনরব আমাদের দেশেও এরকম ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করেছে। আশা করি তা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়াবে না।

আমাদের প্রাচীন চিত্র প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত, যথা : ব্যাখ্যাত্মক এবং ভাবাত্মক। ইউরোপের অপেক্ষাকৃত আধুনিক ছবি ধরলে এ ছাড়া আরও অনেক ভাগে ভাগ করা চলে। যথা : Cubism, Pointism, Impressionistic, Primitive ইত্যাদি।

নূতন রূপসৃষ্টির তাড়নায় ছবির রাজ্যে ইউরোপীয় শিল্পীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। নেতাদের মধ্যে এপস্‌টাইন্‌, বুরদ্যেল্‌, ম্যাস্‌ট্রোফিক্‌, সিজান ইত্যাদি বড়ো বড়ো ওস্তাদরা যোগ দিলেও ফলাফল না দেখে ওদের অনুসরণ করতে যাওয়া বিপদসংকুল মনে করি।

কারণ তাঁদের কাজ যতই অদ্ভুত হোক না কেন, তাঁদের নূতন রূপ-সৃষ্টির প্রেরণার ভিত্তি দাঁড়িয়েছে চিত্রকলার সাধনা এবং প্রকৃত রসবোধের উপর। চলবার পথ সহজ না হলেও তাঁদের চলবার শক্তি আছে যথেষ্ট। তাঁরা বিদ্রোহ করেছেন নিজেদের কথা বলবার জন্য, তাঁরা ছবির আইন ভাঙছেন নূতন আইন গড়বার জন্য, সে ক্ষমতা তাঁরা এ পথে চলবার আগেই অর্জন করেছেন। ছবির রাজ্যে দাসত্বপ্রথা উঠিয়ে দেওয়াও আর একটি কারণ হতে পারে।

আমাদের প্রাচীন চিত্র ছিল প্রধানত ব্যাখ্যাচিত্র। তখনকার চিত্রশিল্পীরা আধুনিকদের মতো ছবিতে ব্যক্তিগত ভাব অথবা চিত্রাঙ্কনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার সুযোগ কম পেতেন। ছবির বক্তব্য বিষয়ের অধিকাংশই ধর্মসংক্রান্ত হওয়ায় ব্যাখ্যার কড়া শাসন তাঁদের না মেনে উপায় ছিল না। মানুষের দেহে হাতির শুঁড়, একটি দেহে দশটি হাত ছাড়াও প্রত্যেকটি অঙ্গের মাপ এবং তুলনাসূচক আকার ব্যক্তিবিশেষে ঠিক করা ছিল। সুতরাং শিল্পীর কাজে উচ্চ কলা-নিপুণতা থাকলেও ছবিতে নির্দিষ্ট রূপ না আঁকাটা তাঁরা ধর্মবিরুদ্ধ কাজ মনে করতেন।

তখনকার দিনে ব্যক্তিবিশেষের সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি ছিল—কবাটবক্ষ, সিংহকটি, চম্পকঅঙ্গুলি, পদ্মপলাশলোচন ইত্যাদি। উক্ত সৌন্দর্যের ধারা শত শত বৎসর ধরে চলে এসেছে, সুতরাং তার প্রভাব অল্পবিস্তর থেকে যাওয়াটা অসঙ্গত নয়। কিন্তু আধুনিক ছবিতে আমরা পুরাতন ছবির ধারার আসল রূপ হারিয়ে ফেলেছি। যেটা আমাদের উপস্থিত সম্বল, তাতে আছে মাত্র গতপ্রাণ খোলসটা। সুতরাং এখন ভাববার সময় এসেছে, পুরাকালের সব কিছুই আমরা আজকের আবহাওয়ায় আদর্শ করে নিতে পারি কিনা।

আমরা পড়ে গিয়েছি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মাঝখানে। প্রাচীনপন্থীরা বলেছেন, জাতীয় চিত্রধারা রক্ষা করো, তা না হলে দেশ থেকে সুন্দরের পূজা উঠে যায়।

আধুনিকরা উত্তর দিচ্ছেন, 'শিল্পীকে কি দাসখৎ লিখে দিতে বল, শিল্পী কি তোতাপাখি যে, তার মুখ থেকে যা শুনতে ভালোবাস তাই তাকে মুখস্থ করতে হবে, তোমার শেখানো বুলি ছাড়া তার নিজের যে ঈশ্বরদত্ত ভাষা আছে সেটা কি নির্বাক হয়েই থাকবে?'

পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া এবং সমাজের প্রভাব শিল্পীর উপর অল্পবিস্তর থাকে, কারণ শিল্পীও মানুষ এবং কোনো—না—কোনো সমাজভুক্ত। সাধনার জন্য হয়ত তাকে লোকবিরল স্থানে যেতে হয়, কিন্তু এতে প্রমাণ হয়'না যে, সে সমাজের সব প্রভাব থেকেই মুক্ত। শিল্পীর নিজের অজ্ঞাতে এমন সব চিন্তাধারার ছাপ তার কাজে প্রকাশ পায়, যার গোড়ায় থাকে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার প্রেরণা।

পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সহিত প্রাচীনকালে আমাদের যে দূরত্ব ছিল আজ ঠিক ততটা নেই। ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে ওদের ভালোমন্দ অনেক কিছুই আমরা গ্রহণ করেছি। যা আমাদের মধ্যে এসে গিয়েছে তাকে অস্বীকার করা চলে না। একথা কখনোই আজ জোর করে বলা

চলে না যে, বিংশ শতাব্দীর বিদেশি প্রভাব সম্পূর্ণ আগ্রাহ্য করে আমাদের সহস্র বৎসরের পুরোনো চাল পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখব, অতীতকে শ্রদ্ধা করবার জন্য উপস্থিতকে তাচ্ছিল্য করব। জাতির ভবিষ্যৎ গড়বার জন্য যেমন অতীতকে দরকার আছে তেমনি বর্তমানকেও বাদ দিতে পারি না। বিদেশি প্রভাব বাদ দিলেও সে-কাল ও এ-কালের মিল অপেক্ষা প্রভেদটাই স্পষ্টতর।

পরিবর্তনশীল জগতে এই প্রভেদ অবশ্যম্ভাবী ; কিন্তু যাঁরা নির্বিচারে দেশের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতে অভ্যস্ত হয়েছেন, তাঁদের কাছে শিল্পীর সৃষ্টিতে এই সহজ গতি আপত্তিজনক হয়ে উঠেছে। আপত্তির কারণ সম্ভবত জাতিচ্যুতি। কিন্তু ভাষা সম্বন্ধে এখনও কেউ বিরুদ্ধমত প্রকাশ করেননি। নিরবচ্ছিন্ন বিদেশি ভাষায় সাহিত্যিক অথবা রাজনৈতিক নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তখন লোকে দেখেছে কী প্রকাশ হল ; কী উপায়ে প্রকাশ হল তার জন্য মাথা ঘামায়নি। সুতরাং ছবির ভাষায় বিদেশি ভাষার সাহায্য নিলে যদি শিল্পীর ভাবপ্রকাশ আরও সহজ এবং স্পষ্ট হয় তাহলে তাকে নিজের করে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। ছবিতে বিদেশি অঙ্কন পদ্ধতি নিয়েও জাতীয় আদর্শ বজায় রাখবার সম্ভাবনা থাকলে, তাকে বাধা দেওয়া সঙ্গত নয়, কারণ রূপকারের আসল উদ্দেশ্য হল আনন্দ পাওয়া এবং দেওয়া। সুন্দরকে চেনাই যার কাজ তার কাছে দেশি-বিদেশির পার্থক্য থাকতে পারে কি? সব সময়ে সব দেশের সুন্দর জিনিসই তাকে আনন্দ দেবে। হীরক সব দেশেই পাওয়া যায় কিন্তু নিজেরটি ব্যতীত বিদেশি হীরককে ভালো বলে প্রতিপন্ন করাকে দুর্বলতা এবং কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

দেশি চিত্রকলায় যে ধারা ছিল বা আছে তাকে সুস্থ সবল অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখা রসিক মাত্রেরই কর্তব্য কর্ম. কিন্তু যে কারণেই হোক, ছবির প্রাণ যদি মরণোন্মুখ হয় এবং দেশীয় ঔষধের সন্ধান অথবা ব্যবহার জানা না থাকে, তাহলে বিদেশি ঔষধ ব্যবহারের নিষেধ কি মেনে নিতে হবে? সজীব সুস্থ দেহ অপেক্ষা প্রাণহীন অবয়বটাকেই আপনার করে তুলব?

বিদেশি ঔষধ সেবনে দেশি মানুষের সাহেব বা চৈনিকের আকার ধারণ করবার সম্ভাবনা থাকলে ভয়ের কারণ আছে। কিন্তু তা যখন এখনও হয়নি তখন বাঁচার অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত হব কেন?

আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ যা দান করেছেন তার মধ্যে বিদেশি প্রভাব নেই এ কথা কেউ বলতে পারেন না। তাঁর অধিকাংশ কম্পোজিশনই বিদেশি ছাঁচে ঢালা, তথাপি তাঁর ছবিকে কেউ বিলাতি ছবি বলবে না, কারণ টেকনিক সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব, যার তুলনা জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কাজের সহিত করা চলে। তাঁর রঙের সামঞ্জস্য অতুলনীয়। তাঁর প্রত্যেকটি রেখা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেদের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। অনেকের ধারণা তাঁর ছবি মোগল অথবা রাজপুত অঙ্কন-পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি মাত্র।

তিনি মোগল এবং রাজপুত ছবির spirit নিয়েছেন সত্য, বাকিটা, যা প্রাচীন শিল্পীরা চেষ্টা করেও পারেননি, সেই অভাবটুকু অবনীন্দ্রনাথ পুরিয়ে দিয়েছেন। মোগল অথবা রাজপুত শিল্পীর সাধনা সফলতা পেয়েছে অবনীন্দ্রনাথের তুলির কাছে। এই সফলতা কখনোই সম্ভভ হত না যদি দেশি এবং বিদেশি কলাকৌশল উভয়কেই অতি আপনার করে তিনি না নিতে পারতেন। দেশি চিত্রকলায় যেগুলির অভাব ছিল সেগুলি বিদেশি বিজ্ঞানের সহায়তা নিয়ে পূরণ তো করেছেনই, অধিকন্তু দেশীয় চিত্রকলার সমৃদ্ধি বাড়িয়েছেন বলা চলতে পারে।

অবনীন্দ্রনাথের পরই তাঁর ছাত্র নন্দলাল বসুর দান কম নয়। গুরুর সহিত তুলনা করলে তাঁর কাজ হয়ত ততটা বিজ্ঞানসম্মত না হতে পারে, কিন্তু নন্দলাল তাঁর ছবিতে যে বিশেষ একটি জ্ঞান-প্রণালী গড়ে তুলেছেন এবং সঠিক দেশি ছবির রসের সন্ধান দিয়েচেন, তা রসিকের কাছে যুগ-যুগান্ত ধরে অমর হয়ে থাকবে। তাঁর আগেকার কাজে ছবির জাতধর্ম এবং দেশীয় কলা-বিজ্ঞানের আদর্শ দুটোই সমানভাবে বজায় রেখেছেন, যা আর কোনো শিল্পীই এ পর্যন্ত সমর্থ হননি। যামিনী রায় দেশের দিকে ফিরেছেন সত্য, কিন্তু তাঁর কাজে রস অপেক্ষা জাতীয় ধারার প্রতি টানই অধিক প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে বেশি কিছু বলতে চাই না, কারণ তাঁর সৃষ্টি-শক্তি আছে, হয়ত উপযুক্ত সময়ে রসও তিনি ছবিতে আনতে পারবেন।

এই প্রসঙ্গে নির্ভীক শিল্পী শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথের চিত্রকলা সম্বন্ধে উল্লেখ না করা অন্যায় হবে। বিদেশিদের অনুকরণে Cubism-কে মধ্যস্থ করে তিনি যেসব রূপসৃষ্টি করেছেন, তা দেখলে মনে হয় Cubism নেহাতই আমাদের নিজেদের জিনিস। তাঁর চিন্তাশক্তির ভেতর এত গভীরতা আছে যা ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব, অন্তত আমার ক্ষমতায় কুলায় না।

বিদ্রোহ করেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মন্ত্রও বিদেশি এবং বিকট আধুনিক। তাঁর ছবিতে ধ্বংসের ডাক থাকলেও সৃষ্টির সাড়াও শুনতে পাই, যা হয়ত ভবিষ্যতে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। গড়া ভাঙা জগতের অতি সহজ এবং চলতি নিয়ম। অনাদিকাল হতে নিয়ম চলে এসেছে সুতরাং বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ ভাঙনের পথে এগিয়ে চললেও তাঁর কাজ নূতন রস এবং নব রূপ দিয়ে আমাদের সামনে যে দাঁড়াবে না, তা কে বলতে পারে? যে শিল্পী রূপকারের আসন দখল করেছেন, ভিক্ষা নেননি, তাঁকে বড়ো এবং ছোটো করার কোনো অর্থ হয় না। তিনি নিজের শক্তি নিয়ে এসেছেন, দান কিছু করবেনই।

যে-কোনো ললিতকলায় ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে হলে সর্বাগ্রে দরকার হয়, বিশেষ রূপের উদ্দেশ্যকে জানা, এবং তাকে প্রকাশ করতে হলে টেকনিককে খেলার সামগ্রী করে তোলা চাই। কিন্তু সমালোচকের দাপটে ভালোমন্দ কোনো কাজেরই প্রভেদ নেই। সকল কাজের মধ্যেই তাঁরা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য দেখতে পান। উক্ত গুণের অপব্যবহারের

কুফল শিল্পী এবং সমাজের উপর ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছে। সমাজের ন্যায় এবং যুক্তিসঙ্গত নীতি মেনে চলাকে আমরা সকলেই সমর্থন করে থাকি। নীতিবিরুদ্ধ কাজকে যাঁরা প্রশ্রয় দেন তাঁদের নিন্দা করতে আমরা কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করি না, কিন্তু ছবির নীতি কে মানল বা না মানল, তথাকথিত সমালোচকরা তা দেখেন না। অযথা প্রশংসাই তাঁদের কাজ। এ জাতীয় প্রশংসাকে প্রতারণার রূপান্তর ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। প্রতারণাকেই আমরা কী জাতীয় শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধন বলে মেনে নেব?

এখন Portrait বা মূর্তিচিত্র সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার মনে করি। মূর্তচিত্র বলতে ঠিক যা বোঝায় তার প্রচলন এদেশে খুবই আধুনিক। আগে যেসব ছবি মূর্তিচিত্র বলে চলত, তাতে কোনো বিশেষ ব্যক্তির প্রতিরূপ অথবা চরিত্র ফোটাবার চেষ্টা ছিল না। বেশভূষা এবং তুলির মিহি কাজই Portrait-এর সব উদ্দেশ্য সাধন করত। অনেক সময় এসব ছবি উচ্চ কলানিপুণতার পরিচয় দিয়েছে সত্য, কিন্তু Portrait-এর যা উদ্দেশ্য তা সফল হয়নি, অর্থাৎ বিশেষ ব্যক্তিটি ছবির মধ্যে ধরা পড়েননি। দেব-দেবীর প্রতিমূর্তি অথবা মোগল এবং রাজপুত বাদশা ও রাজাদের ছবিকে লেকে মূর্তিচিত্র বলে থাকেন। কিন্তু দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় সেগুলি রূপ পেয়েছে বেশির ভাগ কল্পনার উপর। সুতরাং সেগুলিতে ব্যক্তিগত চরিত্র এবং সাদৃশ্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে বলব না। এর আরও প্রমাণ এই যে, প্রত্যেকটি বাদশার মুখাকৃতির মাংসপেশির চামড়া ইত্যাদি একই ছাঁচে ঢালা, যা ভিন্ন ভিন্ন মানুষের থাকা সম্ভব নয়।

তথাকথিত Oriental Art-এর মুরুব্বিরা ধরে নিয়েছেন মূর্তিচিত্র নীচু স্তরের ছবি ; যেহেতু তাতে শিল্পীর কাল্পনিক দৌড় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। আগেই বলেছি ছবির জাতধর্ম বজায় না রাখতে পারলে কোনো ভাবেরই সার্থকতা হয় না। সেইরূপ ভাবরাজ্যে কোন্‌টি ছোটো এবং কোন্‌টি বড়ো নির্দিষ্ট করা চলে না, কারণ প্রকাশভঙ্গীই ছবির সব চেয়ে বড়ো সম্পদ। যাঁরা ভাবটাকেই বড়ো করে দেখেন, তাঁদের নিজেদের প্রকৃতি অনুযায়ী কোনো একটি বিশেষ ভাবকে তাঁরা উচ্চাসন দিয়ে থাকেন। যে দার্শনিক তাঁকে অজানার তত্ত্বই বেশি আনন্দ দেবে, বীররস বাস্তব জগতের কথা, তাতে তমোগুণ প্রকাশ হওয়ায় ভাবের রাজ্যে নিচুস্থান নেবে। আদিরসের কথা তো উত্থাপনযোগ্যই নয়। আবার যাঁরা করুণরস ভালোবাসেন, তাঁদের মনে হাস্যরস কোনো ফেলতে দেবে না। কিন্তু বিশ্বকবি 'পরশ-পাথরে' অজানার সন্ধানেই কেবল ক্ষ্যাপাকে ঘুরিয়ে মারেননি, সঙ্গে সঙ্গে অন্য কবিতায় যৌবনের পূর্ণানন্দ ভোগের উচ্ছ্বাসও সমানভাবে প্রকাশ করেছেন, 'দেহের মিলনে' :

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।

বীররসও তাঁর দক্ষতায় সমানভাবে প্রকাশ পেয়েছে 'বন্দীবীরে',

জয় গুরুজীর হাঁকে শিখবীর
সুগভীর নিঃস্বনে।
মত্ত মোগল রক্ত পাগল
দীন দীন গরজনে।

এই সব উচ্ছ্বাস বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব সুন্দরের রূপ আকাশ, বাতাস, মাটি সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে, তাকে খুঁজে বেড়ানোই হল কবি এবং শিল্পীর কাজ ; ধরতে পারাটাই সার্থকতা। মূর্তিচিত্রের সম্বন্ধেও এই নিয়মই খাটে, কারণ তার সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয়েছে কোনো একটি বিশেষ ব্যক্তির মুখাকৃতি ও চরিত্র অবলম্বন করে। যখন আমরা কোনো বিশেষ ভাবের ছবি দেখি, তাতে যেমন সেই ভাব ছাড়া অন্য ভাব আশা করি না, সেইরূপ মূর্তিচিত্রেও শিল্পীর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব হল বিশেষ ব্যক্তিটির আসল রূপ ধরা। আসল মানুষকে ছবির মধ্যে ধরার কৌশল আয়ত্ত করতে প্রকৃত কাল্পনিক ছবি অপেক্ষা অনেক বেশি সাধনার দরকার হয়। কাল্পনিক ছবির সীমা বিস্তৃত, সেখানে শিল্পীর স্বাধীনতাও অনেক বেশি। কাল্পনিক ছবির সামঞ্জস্য বজায় রাখতে যেসব মাল-মসলার দরকার হয়, সে-সব ইচ্ছামত গড়ে নিতে পারা যায়, কিন্তু মূর্তিচিত্রে সে উপায় নেই। সেখানে বাঁধাধরা গণ্ডীর মধ্যে থেকেও এবং আদর্শ শিল্পীর নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশই হল মূর্তিচিত্রের সাফল্য। কাল্পনিক ছবিতে, প্রাকৃতিক দৃশ্যে, গাছপালা ঈষৎ এদিক-ওদিক হলে সে ভুল মারাত্মক হয় না, কিন্তু রামের চেহারা আঁকতে গিয়ে যদুর সহিত সাদৃশ্য বেশি এসে পড়লে সেটা রামের মূর্তিচিত্র হয়েছে বলা চলে না। মূর্তিচিত্রে সামান্য ভুলেই সমস্ত ছবিটি ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে, কাল্পনিক ছবিতে যা কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। অথচ মূর্তিচিত্রে শুধু মুখাকৃতির সাদৃশ্য থাকলেই হয় না, তদুপরি আদর্শের ব্যক্তিত্ব স্পষ্টভাবে প্রকাশ হওয়া দরকার হয়। কাল্পনিক এবং মূর্তিচিত্রের অঙ্কন প্রণালীর তুলনা করলে সকলেই বুঝবেন, মূর্তিচিত্রের শিল্পীর জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টি কাল্পনিক শিল্পী অপেক্ষা কত বেশি প্রয়োজন।

সকলের মুখাকৃতিতে চারিত্রগত ভাব প্রকাশ পায় না এবং যাঁদের পায় তাঁদের মধ্যে অনেকে দরকার মতো অবলীলাক্রমে এমন ভাবে মুখের ভাব পরিবর্তন করতে পারেন যে সৃষ্টিকর্তার পিতৃদেবও সঠিক চরিত্র বলতে ইতস্তত করবেন। পেশাদার দুশ্চরিত্রদেরও দেখেছি আদালতে অতি নিরীহ সাজতে, শুধু দুশ্চরিত্রদেরই দোষ দিই কেন, খুব কম মানুষই আছেন যাঁরা সময়োপযোগী করে মুখের খোলস না বদলান! রাগ, দুঃখ, আনন্দ সকলেরই প্রকাশ বিভিন্ন মুখভঙ্গীতে এবং উক্ত ভাবও সাময়িক। সুতরাং আদর্শের স্বভাবজাত স্থায়ী চরিত্র জানতে হলে তার কাজ, জীবনী অথবা মানুষটির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া দরকার। অথচ প্রত্যেক মানুষেরই চেষ্টা থাকে নিজের দুর্বলতা লুকানো। এত বাধা সত্ত্বেও মূর্তিচিত্রে শিল্পী আদর্শের এবং নিজের ব্যক্তিত্ব বাদ দিতে পারেন না, কারণ

মূর্তিচিত্রে সাদৃশ্য বজায় রেখে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলাই বড়ো কৃতিত্ব। আদর্শের স্বভাবজাত ভাব প্রকাশ করতে অনেক সময় বাস্তবের সত্যকেও শিল্পী অগ্রাহ্য করতে বাধ্য হন। অনুসন্ধানে শিল্পী জানল, আদর্শের প্রকৃতি শান্ত, অথচ মুখাকৃতিতে এমন কতকগুলি রেখা চরিত্রের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে যা অনুসন্ধানের ফল সমর্থন করে না। এ অবস্থায় শিল্পীকে সে রেখাগুলি বাদ দিতে হয় ; যেখানে সামান্য পরিবর্তনে মারাত্মক ভুলের সম্ভাবনা থাকে, ব্যর্থতা সুনিশ্চিত হয়ে উঠে, সেখানে এই জাতীয় কাজ সম্ভব হয় সেই শিল্পীর দ্বারা যাঁর দুর্দান্ত সাহস, বিরাট পাণ্ডিত্য এবং রঙের সামঞ্জস্যের উপর পূর্ণ দখল আছে। অজ্ঞতাবশত যেসব শিল্পী মূর্তিচিত্রকে ছোটো করে দেখেন তাঁদের বলি, এই জাতীয় ছবি একবার চেষ্টা করে দেখতে ; আরম্ভতেই বুঝবেন মূর্তিচিত্রের সফলতায় কতটা সাধনার প্রয়োজন হয়।

মুখ্যত ছবিমাত্রই অল্পবিস্তর Decorative বা সাজানো। প্রাকৃতিক চিত্র ও মূর্তিচিত্র সম্বন্ধে ওই একই নিয়ম। ইউরোপে Realistic ও Decorative আর্টের যতটা পার্থক্য আছে, আমাদের দেশে ঠিক ততটা নেই। মোগল এবং রাজপুত ছবিতে অন্তত তা পাওয়া যায় না। অজন্তায় নিরবচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য নেই বললেই চলে। এই পার্থক্য না থাকার প্রধান কারণ আমাদের চিত্রবিজ্ঞানে রং এবং পরিপ্রেক্ষণ ইউরোপীয়দের মতো নয়। ইউরোপীয়েরা Realistic ছবিতে atmosphere-এ যতটা পারেন প্রকৃতির সহিত মিল রেখে চলবার চেষ্টা করেন। অবশ্য ইউরোপের প্রাচীন শিল্পীদের ছবি আধুনিকদের মতো বাস্তবসম্মত ছিল না। আমাদের মতো তাঁরা পরিপ্রেক্ষণ আগ্রাহ্য তো করতেনই, তদুপরি রং-ও কতকটা কাল্পনিক ব্যবহার করতেন। এর ফলে প্রাচীন ইউরোপীয় এবং ভারতীয় চিত্রকলার প্রাকৃতিক দৃশ্যে ছবির atmosphere থাকলেও বাস্তবের সহিত তাদের মিল স্পষ্ট ছিল না। সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় ও ইউরোপীয় চিত্রে প্রাকৃতিক দৃশ্য উদ্দেশ্য থাকলেও সেটা বাস্তবিক Decorative art-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। আধুনিক ইউরোপীয় বাস্তবসম্মত ছবিতেও কোনো শিল্পী যথাযথ প্রাকৃতিক দৃশ্যকে নকল করেন না, তার কারণ প্রত্যেক শিল্পীরই বিভিন্নভাবে রং চাপাবার কায়দা আছে। আদর্শ স্থান এক হলেও বিভিন্ন শিল্পী ভিন্নভাবে আদর্শের সৌন্দর্য গ্রহণ করল এবং প্রকাশও করল বিভিন্ন সৌন্দর্য ফুটিয়ে। একই স্থান বিভিন্নভাবে প্রকাশ হওয়ায়, আসলের সহিত নকলের প্রভেদ না হয়ে পারে না, অতএব ছবির প্রাকৃতিক দৃশ্যে এবং বসুন্ধরার প্রাকৃতিক দৃশ্যে পুরাপুরি মিল আছে একথা বলা চলে না। ছবি সাজানোর সময় শিল্পীরা স্ব স্ব রুচি অনুসারে প্রকৃতির বিক্ষিপ্ত আকাশ, জল, মাঠকে এমনভাবে একত্রিত করে সাজান, যাতে তাঁদের পরিকল্পনার সহায়তা করতে পারে। এই সাজানোর সময় কোনো গাছের গড়ন কোনো ছবির সামঞ্জস্যের অনুপযুক্ত মনে হলে শিল্পীকে তা বাদ দিতে হয় অথবা রূপান্তরিত করে তুলতে হয়। রং সম্বন্ধেও ওই কথা খাটে, এক ধারের রং-এর পাল্লা ঠিক রাখতে হয়ত অপর ধারের রং-এর প্রকৃতির

সহিত প্রভেদ ঘটে যায়। সুতরাং আমরা যাকে Natural ছবি বলি সেগুলি বাস্তবিক Natural নয়, Nature-এর মতো।

চিত্রবিদ্যার শেষ কোথায় জানি না, গোড়াও এখনও ঠিকভাবে ধরতে পারনি, চলার পথে যেটুকু জানতে পেরেছি তারও বিশদ সমালোচনা এত অল্প সময়ের ভেতর অসম্ভব। সুতরাং আমার বক্তব্য যতটা পেরেছি সংক্ষেপে বলেছি, দু-চারটি কথা বলবার যা আছে তা আরও সংক্ষেপে সারবার চেষ্টা করব।

কিছুকাল আগেও চিত্রাঙ্কন এবং সঙ্গীত-বিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ব্যর্থ না হলে শেখবার উপায় ছিল না। অনেকে আবার উক্ত চর্চাকেই বিলাসিতার অঙ্গ বলে ধরে নিয়েছিলেন। ভাগ্যগুণে রক্ষা পেয়েছিল সাহিত্য এবং কাব্য। জাতীয় জাগরণের সঙ্গে সে ভাব কতকটা তিরোহিত হয়েছে বলে আমার ধারণা। তা না হলে সাহিত্যের আসলে আমার মতো কোণঠাসা জীবের ডাক পড়ত না।

চিত্রশিল্পী সম্মান পেলেও অন্য রূপকারের উপযুক্ত মর্যাদা আমরা এখনও দিই না। মাটির কলসি যে গড়ল তাকে আমরা কুমোর বলেই অবহেলার চক্ষে দেখেছি, কাপড়ের পাড়কে যে সুন্দর করে তুলল তাকে শুধু তাঁতি বলেই জেনেছি, লোহার তৈজসাদি যে গড়েছে তাকে কামার ছাড়া আর কিছু ভাবিনি ; কিন্তু প্রত্যেকেরই নিজস্ব দান আমাদের জাতীয় সম্পদের দিক দিয়ে কম নয়।

শিল্পী বলতে আমি শুধু চিত্রকরের কথা বলিনি, যাঁরা কুৎসিতের প্রভাব থেকে মানুষকে বাঁচিয়েছেন, যাঁরা শত দুঃখের মাঝেও ক্ষণিকের আনন্দ দিতে পেরেছেন সেইসব রূপস্রষ্টাদের কথাও বলেছি।

দেহকে সুস্থ রাখতে হলে যেমন তার কোনো অনুষ্ঠানের ত্রুটি করি না সেইরূপ মনের সূক্ষ্মবৃত্তিগুলি বাঁচিয়ে রাখতে হলে সুন্দরের প্রয়োজনীয়তা সব সময়ে অনুভব করি। সুন্দরের গতি সর্বত্র, রাজপ্রাসাদ অথবা দীনের কুটিরে সে পার্থক্য করে না, রান্নাঘরের আসবাব থেকে আরম্ভ করে রক্তপিপাসু তলোয়ারকেও মানুষ সুন্দর করতে পারলে ছাড়েনি।

যে সুন্দরকে আমরা নিত্য ব্যবহার্য যে-কোনো দ্রব্যের মধ্যে পেতে পারি, যার দর্শনে ক্ষণিকের তরেও মনে আনন্দের সঞ্চার হতে পারে, তাকেই আমরা দূরে ঠেলে রেখেছি বিলাসিতার অঙ্গ ভেবে।

দেবতার পূজার ন্যায় সুন্দরের পূজায় আনন্দ পাবার অধিকার ছোটো বড়ো ধনী নির্ধন নির্বিচারে সকলেরই আছে। তা যদি না থাকত তাহলে দেব-মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা এবং পুরোহিত ব্যতীত জনসাধারণের ঠাকুর পূজার অধিকার দাবি করতে পারত না। অর্থের বিনিময়ে ধনী সুন্দরকে ক্রয় করলে তার স্বত্ব দাঁড়ায় বিশেষ বস্তুটির উপর কিন্তু তার গুণ-গ্রহণের দাবি থাকে, গুণগ্রাহী মাত্রেরই, কারণ তার আনন্দ উপভোগ করি মন দিয়ে। আমাদের মনের গণ্ডি বিস্তৃত করতে হলে এই সব শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার দরকার এবং কারিগরদের

ছোটো করে না দেখে তাদের এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত, যাতে তারা কারিগর ছাড়া শিল্পী হয়ে উঠতে পারে এবং প্রত্যেকে সুন্দরকে নূতন রূপে ধরতে শেখে।

চিন, জাপানের কুমারদের নিজেদের সমাজে এবং দেশে বড়ো স্থান তো আছেই, অধিকন্তু বিদেশিরাও তাঁদের কম সম্মান দেন না। বিদেশীয় কারুশিল্পের সংগ্রাহক একটি ভালো 'চায়না' নিজের বলতে পারলে ধন্য মনে করে। এ দেশেও ইস্পাতের উপর কামারের তৈরি এমন মিহি কারুগিরির নিদর্শন আছে, যা দেখলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। ঢাকার মসলিনের কথা কে না শুনেছেন। এই সব রূপস্রষ্টাদের অস্তিত্ব আজ দেশ থেকে প্রায় মুছে গিয়েছে, পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বা কুৎসিতের প্রাচুর্যে।

আমার শেষ বক্তব্য, এই জাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে শিল্পের সহায়তাকে অবহেলা করা চলে না। সাধারণ মানুষের সূক্ষ্ম প্রবৃত্তিগুলি প্রকাশ পায়, কবি বা শিল্পীকে মধ্যস্থ করে। আনন্দ ইত্যাদি মনের উচ্ছ্বাস সকলেরই আসে কিন্তু সাধারণে তা পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে না, যারা প্রকাশ করে তারা শিল্পী কিংবা কবি। তাদের শক্তি হ্রাস হলে সমস্ত জাতি নির্বাক হয়ে যেতে পারে।

অসিতকুমার হালদার

অভিভাষণ

শিল্পী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ এবং উপস্থিত সুধীজনমণ্ডলীকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নমস্কার জানাচ্ছি। বাংলার অগণ্য শিল্পী ভ্রাতাদের মধ্যে এই নগণ্য শিল্পীকে যে আপনারা সভাপতির আসরে কেন নাবালেন জানিনা। এ গুরুকার্যভার কতদূর যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদন করতে পারব তা জানিনা, তা আপনারাই বিচার করবেন এবং দোষত্রুটি নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

এই সুযোগে আমাদের শিল্পী ভ্রাতাদের তরফ থেকে যা কিছু সামান্য কথা বলবার আছে তা বলবার চেষ্টা করব।

শিল্পী সুন্দরের উপাসক, তাই শিল্পী ও শিল্পকলার কথা মনে এলে প্রথমেই আমাদের মনে আসে সুরুচির কথা। শিল্পীর প্রধান কাজ মনুষ্য সমাজে কেবলমাত্র সুরুচি আনা না হলেও তার খানিক কাজ মানুষকে রসপিপাসু ও সুরুচিগ্রাহী করে তোলা। তাই বলে আমরা শুচিবাই-গ্রস্ত রুচি-বাগীশের কথা বলছি না। যেমন তেমন করে, যা-তা করে দুনিয়া চলতে পারে, কিন্তু পারেনা শিল্পীর পছন্দসই ঘরের আঙিনা সাজানো। সেখানে শিল্পীর হাতের আল্পনা-কল্পনা চাই, তাকে সাজিয়ে তাঁর মনমতো করে তুলতে। তবে এই এক প্রশ্ন উঠতে পারে যে শিল্পীর হাতের আঁকা আল্পনা কেন, কলে-কাটা 'স্টেন্‌সিলের' উপর 'এলিওগ্রাফ' বুলিয়ে গেলেই তো হল? তা হল বটে, কিন্তু এটা হল 'স্টেন্‌সিলের' আর 'এলিওগ্রাফের' গোলামী, তার আর নড়চড় নেই; আর শিল্পী যা হাতে টানলেন তা হল তাঁর কল্পনাপ্রসূত আল্পনা, এর মাধুর্য ও বৈচিত্র্যের তুলনাই হয় না। এই সামান্য কথাটাই দুঃখের বিষয় লোকে বোঝবার চেষ্টা করে না। কারু শিল্প (Art) আর শ্রমশিল্প (Industry) এ দুয়ের মধ্যে মানুষ একটিতে পায় মনের খোরাক আর অপরটিতে পায় পেটের। শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা রুচি মার্জিত হলে আশা করা যায় যে মানুষ মনের খোরাক যোগাবার জন্যেই বেশি ব্যাকুল হয় এবং ক্রমশ শিল্পীদেরও শিল্পকাজের কদর করে। গ্রিস যে ইউরোপের মধ্যে বড়ো জাতি বলে আজ খ্যাত এবং যে দেশের গৌরবের বিষয় হয়ে আছে, তার গোড়ায়ও দেখা যায় শিল্পকলা। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের উৎকর্ষই আজ

তাকে পৃথিবীর মধ্যে এতবড়ো স্থান দিয়েছে। গ্রিস তাই আজকালকার ইউরোপের সভ্যতার মাপকাঠিতে পরিণত হয়েছে। অপর দেশের প্রাচীন সভ্যতাকে বিচার করতে হলে ইউরোপের পণ্ডিতেরা গ্রিসের সঙ্গে তুলনা না করে থাকতে পারেন না। গ্রিক মূর্তি-শিল্প অবশ্য কারু অবিদিত নেই। গ্রিক বাসনের অনুরূপ বাসন প্রভৃতি সবই ইউরোপে এখন সব জায়গায় বিরাজ করছে। দেশের রুচিকে গ্রিক আর্ট এবং আর্টিস্টরাই সেখানে গড়ে তুলেছে। নচেৎ অসভ্য হুন, তাতার, কাফ্রি, নাগা, কুকিদের মতো ইউরোপও আজ কত পিছিয়ে থাকত তার আর ইয়ত্তা নেই।

ভারতবর্ষেরও এইরূপ একটি সনাতন সভ্যতার প্রমাণ আমরা প্রাচীন শিল্পকলা থেকেই আজ পচ্ছি। অবশ্য ভারতের সাহিত্যের প্রাচীনতার সঙ্গে শিল্পের প্রাচীনতা নিয়ে আমরা এখানে লড়াই করতে চাই না। তবে এটা ঠিক সাহিত্য-কলার সাহায্যেই আমরা আরও জানতে পারি যে ভারতের শিল্পকলা একটি প্রাচীনতম অনুষ্ঠান। আর্ট অবশ্য এক হিসাবে প্রাগৈতিহাসিক যুগে সভ্যতারও বাহন ছিল, তা গ্রিসের পূর্বে মিশরের পিরামিড প্রভৃতিতে নিদর্শন আজ পর্যন্ত জাজ্বল্যমান আছে। অতি সনাতন যুগেও মানুষে গুহা গহ্বরে বাসকালে পাহাড়ের গায়ে ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছে। এটা কেবল তার মানবপ্রকৃতির মধ্যে সিঞ্চিত রসবোধের পরিচয় দেয়। স্পেনে এবং ভারতবর্ষে এইরূপ গুহাবাসীদের আঁকা ছবি অনেক পাওয়া গেছে। মানুষের সুরুচির অঙ্কুর এই প্রাচীন মানবদের কাছ থেকে ক্রমশ আধুনিক মানবের ভিতর কীরূপ পরিণত হয়ে ডালপালা প্রসার করে বেড়ে উঠেছে তার পরিচয় শিল্পী ও ঐতিহাসিক মাত্রেই অবগত আছেন। আমরা লখনউ শহরে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় রায় রাজেশ্বর বালী মহোদয়ের উদ্যোগে সর্বসাধারণের অবগতি ও শিক্ষার জন্যে একটি শিল্প প্রদর্শনী করেছিলুম। তাতে যথাসম্ভব প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ করে প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ, প্রাগ্-আধুনিক যুগ ও আধুনিক কালের একটি চিত্রকলার সংগ্রহ করা হয়েছিল। আমরা দেখতে পাই, খুব প্রাচীনকালের চিত্রকলায় সজ্জাচিত্র বা মণ্ডনচিত্রের (decorative art) দিকটায় একটু বেশি নজর ছিল। ক্রমশ মানুষ সে ভাবটা যেন ত্যাগ করে এখন প্রকৃতির বাহ্য আকারের মধ্যে সৌন্দর্য যা পাচ্ছে সেটাকে হুবহু নকল করছে আর নতুন করে ভাঙাগড়া করছে না। তবে সৌন্দর্যরুচির দিক থেকে দেখলে দেখা যায় যে শিল্পকলার ভিতর দিয়ে মানুষের রস-পিপাসা ও রুচির ক্রমবিকাশ হয়ে উঠেছিল যতদিন স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে শিল্পকলা দেশের মধ্যে বেড়ে উঠেছিল। মোগল আমল পর্যন্ত সে যুগ আমরা পেয়েছি। তারপর এখনকার কালে আমরা যা পচ্ছি সবই দেশের বাহির থেকে ধার করা এবং তা আমাদের ভিতর থেকে স্বতঃস্ফূরিত নয়।

শিল্পকলাই বল আর সৌন্দর্য-রুচিই বল, তার স্ফূর্তি পায় দেশের ও দশের কাছে তার আদর হলে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, ইউরোপেও আর্ট মধ্যযুগের ধনী রসিকের দ্বারাই গড়ে উঠেছিল। তখনকার কালে ধনিলোকেরা শিল্পীদের ঘরে রেখে নানাপ্রকারের কারুকার্যের

নিদর্শন গড়াতেন। ধনীদের মধ্যে রেশারেশি চলত, কার অধীনস্থ শিল্পী কত ভালো রচনা করতে পারেন। বৌদ্ধ মন্দিরে, ইউরোপে খ্রিস্টীয় গির্জায়, শিল্পীরা ভিত্তিগাত্রে ছবি আঁকতেন এবং নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর দ্রব্যসম্ভার তৈরি করতেন মন্দির সাজাবার জন্যে কিন্তু এখন সেরূপ ব্যক্তিগতভাবে কিংবা সংঘবদ্ধভাবে শিল্পকলার প্রচার একপ্রকার স্বপ্ন কথা। তাই এখন আমাদের 'ready made' কলে তৈরি খেলনায়, বাসনে, দ্রব্যসম্ভারে আমাদের ঘর বোঝাই করি। আর শিল্পীদের হাতের কাছে মিউজিয়াম আর্ট স্কুল থাকা সত্ত্বেও তাদের নব নব উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ আর হতে দেখা যায় না। নবাবি আমলে মুরাদাবাদী বাসন এখন কলে খোদাই করা বাসনে পরিণত হতে চলেছে, সে প্রাণ আর তাতে নেই। দেয়ালের গায়ে ভিত্তিচিত্রের বদলে জার্মানির ছাপা ছবিই আমরা যথেষ্ট বলে মনে করি। এখন শিল্পীর গোষ্ঠী বৃদ্ধি হলেও দেশের রুচির কোনোই উন্নতি দেখা যাচ্ছে না।

সম্প্রতি ইউরোপে এই শিল্পকলার নবজাগরণ দেখা দিয়েছে, বিশেষভাবে কারুশিল্পে। তাঁরা আর Georgian period-এর রূপার বাসন আর Victorian আসবাবপত্রে সন্তুষ্ট নন। নতুন নতুন জিনিসের উদ্ভাবনা করবার চেষ্টা চলছে। জাপান, চিন থেকে তাঁরা আসবাবপত্রের ধরণ হুবহু নকল না করলেও তা থেকে রসগ্রহণ করছেন। গ্রিক আদর্শে আর তাঁরা সন্তুষ্ট নন। সমস্ত পৃথিবী থেকে তাঁরা আর্টের অনুপ্রেরণা আহরণ করছেন। চিত্রকলায়ও তাঁরা নানাপ্রকার নতুনের দিকে চেষ্টা করছেন। আমাদের দেশে কেবলমাত্র চিত্রকলায় কিছু জাগরণের ভাব দেখা দিলেও কারু-শিল্পের যে ভয়ানক দুর্দিন এসেছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। সব সময়েই রচনা-রীতির আমূল পরিবর্তন যে বাঞ্ছনীয় তা বলছি না, তবে অভিনব চিন্তা ও চিন্তাশক্তির উন্নতির দিকে আমাদের লক্ষ রাখা ভালো।

জাতীয় ঐতিহ্যের (Tradition) উপর ভিত্তি স্থাপনা করে আমাদের দেশের শিল্পকলাতে যখন নব নব উদ্ভাবনী শক্তি আমরা নতুন করে দেখাতে পারব তখনই আমাদের সত্যিকারের গৌরব করবার অধিকার হবে। এখন আমরা কেবল প্রাচীন শিল্পকলার দোহাই দিয়ে দেশের আর্টকে এবং সৌন্দর্য রুচিকে যদি জগতের মধ্যে তুলে ধরতে চাই তবে কেবল আমাদের দৈন্যই তাতে বেশি করে প্রকাশ পাবে। আমরা যখন কোনো প্রাচীন শিল্পকীর্তি দেখি, তখন আমাদের মনে গৌরব আসে বটে, কিন্তু সে গৌরব সার্থক হয় যদি আমরা সেটা নিজেদের জীবন দিয়ে এবং কাজ দিয়ে ধরে রাখতে পারি। ইউরোপ তার ঐতিহ্যের পূজা এককালে করেছে এবং এখন তারই উপর ভিত্তিস্থাপন করে জগতের শিল্পকলার পরিচয় লাভ করে আজ পুনরায় নিজেদের আর্টের উৎকর্ষের চেষ্টা করছে।

শিল্পকলার ও রুচির অধঃপতনের কারণ এই যে এখনকার দিনে মানুষের কেবল রোজকারের দরুণই কাজ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, এখন শিল্পসম্ভার তাই খালি ঘরের শ্রীসম্পাদনের জন্যে তৈরি হচ্ছে না। ভারতের কারুশিল্পের বিষয়ে একটা কথা বলা যেতে পারে যে সেটা আগেকার মতো সময়সাপেক্ষ সূক্ষ্ম কারুকার্যে ভারাক্রান্ত হলে

এখনকার দিনে আর চলবে না। এখন ঠিক ওজনমতো ও সুছাঁদে জিনিসটি তৈরি হওয়া দরকার। কেননা এখন পূর্বকালের মতো সূক্ষ্মকাজের চুলচেরা বিচার করবার মতো সমঝদার পাওয়া শক্ত। এখনকার কালের শিক্ষাদীক্ষার অনুকূল রুচির পরিবর্তন যে দিক দিয়ে হয়েছে সেইরূপ কালের পরিবর্তন কতকটা মেনে নিয়েই কারুসূত্রের কারিগরদের প্রস্তুত হতে হবে। ঠিক যতটা ওস্তাদি দেখান সঙ্গত ঠিক ততটাই দেখাবেন, তার অধিক নয়। গানেতে বাড়াবাড়ি রকমের তান যেমন কানকে পীড়া দেয়, কারুশিল্পেও বেশি কারিগরির বোঝাও তেমনি। এবিষয়ে সংযম শিক্ষা আমাদের প্রাচীন শিল্পীদের মোটেই ছিল না। বিশেষত মোগল আমলের শিল্পীদের। তাঁদের কি চারুশিল্পে কি কারুশিল্পে সবেতেই সূক্ষ্মকাজের যেন বাড়াবাড়ি দেখা যায়। অবশ্য সে সময় যত সংযমী আর্টিস্টও যে ছিল না তা বলছি না। সে সময় কাঁসার বাসনের উপর অতি সূক্ষ্ম মড়ুড়ির কাজ, শালোয়ার আর জামেওয়ারের ছুঁচের কাজ, প্রাসাদের উপর লতাপাতার মণ্ডনচিত্রের কারিগরির বাহুল্য কমে গিয়ে যখন ওজন মতো বুঝে শিল্পীরা তাঁদের কাজকে অলংকৃত করবেন তখন আবার শিল্পকলায় এক নতুন যুগের সৃষ্টি হবে। উদ্যান রচনা, গৃহ রচনা, আসবাবপত্র সব জিনিসকেই শিল্প-সুরুচি সঙ্গত করে তুলতে পারেন, যাতে করে মানুষ এই পৃথিবীতেই স্বর্গীয় রস আস্বাদ করতে পারেন। কাপড়খানির পাড়ে ও জমিতে ভালো ভালো নক্সার সৃষ্টি হলেই কাপড়টি মোটা খদ্দড়েরই আর রেশমেরই হোক, ভদ্র ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তা সকলেই দেখেছেন।

পূর্বে নিজের নিজের আভিজাত্যের অনুরূপ শিল্পসম্ভার বিবাহে পূজাপার্বনে লোকে উপহার দিত, তত্ত্বতাবাসী কারুকার্য করা বড়ো বড়ো থালা এবং সেগুলিকে ঢাকবার জন্যে তৈরি রেশমী ছিটের রুমাল প্রভৃতির পূর্বে খুব বেশি চলন ছিল। মুরশিদাবাদী তত্ত্বতাবাসী রুমাল লর্ড কারমাইকেলের পকেটে বিরাজ করে 'কারমাইকেল হ্যাণ্ডকারচিপ রূপে' যে দেশে পুনরায় আদরলাভ করেছে তা সকলেই জানেন। এইরূপ দেখা যায় দেশের আর্ট বিদেশের সার্টিফিকেট না পেলে আমরা তার কদর করি না।

নক্সার বাহুল্য ছাড়াও আমাদের কারুশিল্পের অধঃপতনের আর একটি প্রধান কারণ বিদেশি লোকেরা, যাঁরা ভারতবর্ষে দেশভ্রমণে আসেন, তাঁদের জন্যে তাঁরা অল্প মূল্যে ভালো ভালো গৃহসজ্জার উপযোগী শিল্পসম্ভার কিনে নিতে চান। সস্তায় অথচ ঠিক ঠিক ভারতের প্রাচীন নমুনার মতো জিনিস হলেই তাঁরা সন্তুষ্ট থাকেনা। অথচ তাঁদের পকেটের উপযোগী করে গড়তে গিয়ে ভারতের বিশেষ বিশেষ শিল্পকলা যে কতদূর অধঃপতিত হচ্ছে, তা তাঁরা জানতেও পারেন না। কাশীর বাসনের এককালে খুব খ্যাতি ছিল তার সূক্ষ্ম কারুকার্যের জন্যে। এখন কাশীর কারুকার্য করা বাসনগুলি ওজনদরে পরিব্রাজক ইউরোপীয়দের কাছে বিক্রি করা হয়। সুতরাং পূর্বের কাজের সঙ্গে এখনকার কাজের আকাশপাতাল তফাত হয়ে পড়েছে। মুরাদাবাদী বাসনেরও ওই একই কারণে অধঃপতন

হতে দেখা যায়। বহু প্রাচীন কারুশিল্পের ভালো ভালো নমুনা মিউজিয়ামের শোকেসের মধ্যেই কিছু কিছু আবদ্ধ আছে, কারীগরেরা ক্রমশ নতুন তৈরি করতে ভুলে যাচ্ছে। দিনকে দিন শিল্পীরা তাই এরূপ রুচিভ্রষ্ট হয়ে পড়ছে। বড়ো বড়ো ব্যবসাদারেরা গরিব শিল্পীদের দাদন দিয়ে ভুরি ভুরি জিনিসপত্র তৈরি করাচ্ছেন বাজারে বেচবার জন্যে, শিল্পীদের তাতে পেটও ভরছে না অথচ ভালো কাজ ধরে তা মেহনৎ করে তৈরি করবার সুযোগও পাচ্ছে না। শিল্পীরা যত শীঘ্র তাড়াতাড়ি গুনতিতে বেশি জিনিস তৈরি করবে ততই তাদের লাভ। এইভাবে ভালো ভালো কাজ আমাদের দেশ থেকে চিরকালের জন্যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কোনো কোনো ব্যবসাদার আরো সস্তা হবে বলে হাতের বদলে কলে শিল্পকলার নকল করাবারও ব্যবস্থা করেছেন। তাতে শিল্পকলার মূলে কুঠারাঘাত করা হচ্ছে।

এখন দেশে যেমন নানান দিকে জাগরণ হয়েছে এক কারুশিল্পের দিকে নবজাগরণেরও বিশেষ প্রয়োজন। আমরা শিল্পীরাও আমাদের চিন্তাশীল বন্ধু মাত্রেই এবিষয়ে অভাব অনুভব করছেন, এবং ক্রমশ জাতীয় ঐতিহ্যের ভিতর থেকে দেশের আর্টের সব রকমে যাতে প্রসার হয় তার চেষ্টা করছেন। সাহিত্যের সঙ্গে শিল্প একযোগে যদি অগ্রসর না হয় তো কখনোই দেশের কলালক্ষ্মীর পূজা সুসম্পন্ন হবে না। দেশের রুচিও মার্জিত হবে না। ঝুটা নকলের দ্বারাও আমাদের দেশের শিল্পকলার যে কতদূর ক্ষতি হচ্ছে তার আর ইয়ত্তা নেই। বাংলা দেশের বিশেষত্ব ছিল শীতকালে শাল পরা। মহিলারাও আজকাল শাল পরা তুলে দিয়ে 'চেস্টার' পরতে শুরু করেছেন। শাড়ির সঙ্গে 'চেস্টার', ঘোমটার সঙ্গে হিলওয়ালা জুতো, ধুতির সঙ্গে বুকখোলা কোট প্রভৃতি যে শিল্পীর চক্ষে কতদূর বিসদৃশ ঠেকে তা রসিকমাত্রেই অনুভব করবেন। এই শালের রেওয়াজ উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শালের কাজও উঠে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হয়ত একেবারেই উঠে যাবে। আমাদের আধুনিক পোশাকের অনুরূপ বিদেশি আমদানি গৃহসজ্জারও প্রয়োজন হয়েছে। আমরা তাই আর পূর্বের মতো ফরাস বিছানায় তাকিয়া হেলান দিয়ে বসি না। আমরা চেয়ারের টঙ্গে সুট পরে আড়ষ্ট হয়ে বসি। আমাদের রেওয়াজের বদল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীদের কাজেরও বদল হচ্ছে এবং অনেক সময়ই আমাদের নিজস্ব আমরা তাতে করে হারাচ্ছি। আসবাব দেশি ধরনের হওয়ার প্রয়োজন হলেই ক্রমশ সেইরূপ দ্রব্যসম্ভারও শিল্পীরা তৈরি করতে বাধ্য হবেন এবং সে বিষয়ে চিন্তাও তাঁদের মনে আসবে।

শিল্পকলার উন্মেষ যখন যে দেশে হয় তখন সে দেশের শ্রী, সম্পদেরই মধ্যে হয়ে থাকে। বড়ো বড়ো দেশে, বড়ো বড়ো রাজ্যে তাই দেখা যায় প্রাচীন কীর্তিগুলির মধ্যে। কিন্তু শিল্পকলা যে কেবলই ধনীকে আশ্রয় করেই থাকবে একথা বললে চলবে না! জাপানের প্রতি গরিব গৃহস্থের বাড়িতে, ইউরোপের অজপল্লির মধ্যে তাদের দেশোচিত সৌন্দর্যের আদর্শ যা দেখা যায়, তাতে শ্রী যে সম্পদেরই সাথী, তার মোটেই সাক্ষ্য দেয় না। আমরা

আমাদের মাটির কুঁড়ে ঘরটিতেও সুরুচির পরিচয় দিতে পারি, তাতে হাতের কাজের উৎকর্ষ দেখিয়ে। বাংলার গ্রাম্য আল্পনা সেই জন্যই শিল্পীদের এত আদরের, কেননা সেটা গৃহস্থের ঘরের হাতের কাজ। গৃহদেবতাকে সাজাবার একমাত্র সহজ ও সরল শিল্পকলা।

বাংলার এই আল্পনার ধরনের নক্সায় মণ্ডিত করে আমরা আমাদের তৈজসপত্র প্রভৃতিকে বাংলার বিশেষ ছাদের কারুশিল্পের আদর্শে তৈরি করতে পারি। পিতলের বাসনে, কাঠের কাজে, বস্ত্রবয়নে সকল রকমে আমাদের বাংলা দেশের বিশেষত্বে মণ্ডিত করে তুলতে পারি। ঢাকা, মুরশিদাবাদ, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কয়েকটি জায়গা ছাড়া বাংলা দেশে কারুশিল্পের বিশেষ উন্নতি আর কোথাও হয়নি। তাই প্রকৃত সৌখিন বাঙালির ঘর সাজাবার প্রয়োজন হলে হয় উত্তর-পশ্চিম বা দক্ষিণ-ভারতের শরণাপন্ন হতে হয়। বেশির ভাগ জিনিস এই যুক্তপ্রদেশেই তাঁরা পান। মুরাদাবাদী বাসন, বেনারসী শাড়ি, সাহারাণপুরী কাঠের কাজ, লখনউ-এর ছিটের কাজ প্রভৃতি গৃহসজ্জার সব তোড়জোড়ই এই যুক্তপ্রদেশ থেকে বিশেষভাবে বাঙালিরা আহরণ করে থাকেন। ভালো জিনিস ভারতের যেখানেই হোক তাকে আদর করে গ্রহণ করতে কোনো দোষ নেই, তবে নিজেদের দেশেও যাতে তার প্রচার হয় এ বিষয়ে আমরা লক্ষ রাখতে পারি। দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ না খাওয়াতে পারলে বাইরে থেকে জোর করে কোনো জিনিস গড়ে উঠতে পারে না। সেই জন্যে বাংলার বিশেষত্ব রক্ষার দ্বারাই বাংলার শিল্প বাঁচবে। তাতে তার নব নব কল্পনার উন্মেষের বাধা থাকবে না। এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত চিত্রশিল্পও Rayal College ot Art-এর অধ্যক্ষ বন্ধুবর Prof. W. Rothenstine ভারতের সাধুর একটি চিত্র আঁকতে গিয়ে কীরূপ বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর ছবি তিনি ভারত ভ্রমণকালে এঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু সাধুদের বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা খুবই কম। দেশে ফিরে গিয়ে যখন তাঁর Sketch-গুলি থেকে একটি সাধুর ছবি তিনি আঁকলেন তখন সেটাতে জটাজুটধারী সাধুবেশের সবই ঠিক ঠিক হল বটে কিন্তু প্রকৃত সাধুটি ঠিক গড়ে উঠল না। অর্থাৎ তাঁর জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনো মিল না থাকায় তিনি এরূপ বিব্রত হয়ে পড়লেন। আবার তাঁরই আঁকা ইহুদি ধর্মযাজকের ছবি তাঁর তুলিকাকে সার্থক করেছে। সেই জন্যে নিজের জাতীয় শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে যোগযুক্ত না হলে আর্ট থার-করা পোশাকের মতো খাপ খায় না, বেখাপ্পা হয়ে পড়ে।

শিল্প শিক্ষায় Tradition (ঐতিহ্য) Originality (মৌলিকতা) এবং Nature (প্রকৃতি) এই তিনটির বিষয়ে জাপানের শিল্পকলার উদ্ধারকর্তা কাউন্ট ওকাকুরা শিল্পীদের সর্বদা স্মরণ রাখতে বলতেন। Tradition ঐতিহ্যের বিষয় আমি পূর্বেই বলেছি, এখন Originality মৌলিকতা সম্বন্ধেও কিছু বলব। মৌলিকতা মানে এ নয় যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার জন্যে একটা কিছু ভেবে নতুন কিছু করা। সেই জন্যে ঐতিহ্যের কথাও তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মৌলিকতা ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে তবে দাঁড়াবে। কেবল ঐতিহ্যের

খাতিরে প্রাচীনের নকল করলেও চলবে না। বাপ-দাদার মুখোস পরে বেড়ালেই যে বাপ-দাদার গৌরব বাড়ে না, তা বলাই বাহুল্য। নিজের কৃতিত্ব চাই বংশগত ধারার সঙ্গে। এখানে আমাদের একটা কথা বলবার আছে যে, উত্তর ভারতের কারুশিল্প যা এখনও চলে আসছে সেটার ভিতর ওই প্রাচীনের নকল করবার ভাবই বেশি বর্তমান। অর্থাৎ পুরুষানুক্রমে শিক্ষালাভ করে যা একটা দাঁড়িয়ে গেছে তার আর কোনোই নড়চড় নেই। সেদিক থেকে জাগরণের প্রয়োজন। উত্তরভারতে সেই জন্যে কারিগর আছে কিন্তু শিল্পী নেই। আমরা শিল্পী অর্থে বুঝি যে সৃষ্টি করে। শিক্ষার অভাবে এবং সমঝদার Patron-এর অভাবেই হোক, ক্রমশ এদেশের কারিগরেরা মন-মাথা দিয়ে কাজ করতে ভুলে গেছে, তারা শেখানো বুলি আবৃত্তি করে চলেছে। প্রত্যেক শিল্পীর নিজের নিজের বিশেষত্বটি তাঁর কাজে যতক্ষণ না ফুটিয়ে তুলতে পারছেন ততক্ষণ তাঁর কাজের কদর বাজারে হতে পারে কিন্তু গুণিসমাজে হবে না। বাজারে চলা জিনিসে আর সৌখিন আর্টিস্টের তৈরি জিনিসের এইখানেই হল আসল পরখ।

এখন আমরা দেখছি যে জাতীয় ধারার সঙ্গে মৌলিকতা থাকলেই আর্ট পুষ্ট হয়। কিন্তু তাই বলে Nature (প্রকৃতিকে) বাদ দিলে আর্টিস্টদের চলে না। প্রকৃতির মধ্যে যে আনন্দ অহরহ আমাদের মুগ্ধ করছে পাখির গানে, ফুলে, ফলে, লতায় পাতায়, তার ভিতর থেকেই আমাদের আহরণ করতে হবে। শিল্পীর চক্ষে প্রকৃতির রূপ খালি বাইয়ের সুন্দর কাঠামোটি নয়। তাই কেবল প্রকৃতির সুন্দর চেহারা, সুন্দর বর্ণের নকল করেই শিল্পী ক্ষান্ত নন। তার মধ্যে রস-স্বরূপের সন্ধান শিল্পী পান রূপ ও অরূপের মধ্যে। জীর্ণ মলিন ভিক্ষুর ছবিও শিল্পী আঁকেন, আবার ভুবনমোহিনী রানির ছবিও এঁকে থাকেন। বাইরের চেহারা আঁকার দরুণই যে শিল্প বড়ো হল তা নয়, বিষয় নির্বাচন ও চিন্তা শক্তির সূক্ষ্ম বিচার দ্বারাই Artist-কে বিচার করা হয়। প্রকৃতি আমাদের মন ভোলায়, নানান ছলে, ঋতুতে ঋতুতে, সকাল সন্ধ্যায়, বর্ণের বৈচিত্র্যে, সুষমার তারতম্যে। আমরা তার ভিতর থেকে আহরণ করব, যা আমাদের রুচিবোধকে জাগাবে, আমাদের রুচিকে মার্জিত করবে। শিল্পী তাই প্রকৃতির পূজা করতে যান ঝরনার ... রমণীয় দৃশ্যাবলির মধ্যে। এখানে আমরা পূজা বলে যা বলছি তার মানে এই নয় যে প্রকৃতির হুবহু নকল করতে বসে গেলেই প্রকৃতির পূজা করা হল। প্রকৃতি শিল্পীর কাছে যে দুয়ার খুলে দেন তা থেকে শিল্পী তাঁর মনের অনেক খোরাক সংগ্রহ করেন, কেবল তার বাইরের আকারটি ধরে রাখেন না। শিশুর খেলাঘরের যেমন একটি স্বতন্ত্র রাজ্য আছে তার 'খেলাঘরের পৃথিবী, শিল্পীরও তেমনি দুনিয়াছাড়া এক শিল্পরাজ্য আছে। কচি শিশুটি তার খেলাঘরের মধ্যে যে একটি সত্যিকারের দুনিয়া উপলব্ধি করে, যদিও তার সঙ্গে বাস্তবের কোনোই যোগ নেই ; সেইরূপ শিল্পীদেরও একটি দুনিয়া আছে, যেটা দুনিয়াছাড়া কিছু না হলেও এবং দুনিয়া থেকে আহরণ করা হলেও সম্পূর্ণ তার নিজের স্বকপোলকল্পিত। যে শিল্পী যত সেই দুনিয়ার

খবর তাঁর শিল্প-কলায় প্রকাশ করতে পারেন, সমজদারের কাছে তারই তত আদর হয়।

শিল্পীদের শুধু এই কয়েকটি বিষয়ে মন দিলেই চলে না, ছন্দ (Rhythem) ওজন বা প্রমাণ (Balance) ও মাপ (Proportion) এই তিনটি মুখ্য বিষয়ও জানতে হয়। তার কলাকে সুরুচিকর করতে হলে, তার মাপ, ওজন বা প্রমাণ এবং ছন্দোবদ্ধ ক'রে তবে গড়ে তুলতে হয়। ছন্দকে এক কথায় মিল বা সামঞ্জস্য বলা যেতে পারে অবশ্য ছন্দ জিনিষটা কবিতায় যেমন সুস্পষ্ট, কারু বা চারুকলায় তা নয়। এই জন্যে এটাকে কোনো দৃষ্টান্তের দ্বারা বোঝানো কঠিন। কারুকার্যের মধ্যে কতটা কারিগরির প্রয়োজন এবং কতটা অপ্রয়োজন তার মাপকাঠি যেমন হয় না, তেমনি তার ছন্দেরও মাপকাঠি নেই। কলা-রসিক মাত্রেই তা বুঝতে পারেন। শিল্পের ওজন সম্বন্ধেও ওই একই কথা খাটে। দাঁড়িপাল্লার সঙ্গে এই ওজনের কোনোই সম্পর্ক নেই। এটা ভাবের গুরুলঘু সম্বন্ধে জ্ঞান। সূক্ষ্ম রসাস্বাদী মাত্রেই এই ওজনের তারতম্য শিল্পকার্যের মধ্যে ধরতে পারেন। মাপের বিষয় কতকটা বাইরের শিক্ষার দ্বারা ধরা সহজ হয়। স্থাপত্যের মধ্যে, আসবাবপত্রের মধ্যে; যে-কোনো শিল্পদ্রব্যের মধ্যে তার মাপ সঙ্গত হল কী না তা সহজেই ধরা যায়। ঘরের দেওয়ালের চেয়ে চালাটা যদি উঁচু বেশি করা হয়, গায়ের চেয়ে মাথাটা বেশি বড়ো করা হয়, ত কার না চোখে পীড়া দেয়? সুসংযত, সুডৌল, সুছাঁদ করে তোলাই হল শিল্পীর শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। শিল্পকলা একটি ফুলের মতো আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে। জানা যায় না তার শেষ কোথা আর কোথা তার আরম্ভ শিল্পীরা করেছিল। ফুলটি যেমন তার পাপড়ি, পরাগ ও রেণুগুলি নিয়ে সম্পূর্ণ এবং সেটির যে কোন্‌খান থেকে আরম্ভ আর কোন্‌খানে গিয়ে তার শেষ জানা যায় না, প্রকৃত কারু ও চারুশিল্পেরও পরখ তাই।

এখন দেশে যেরূপ শিক্ষা-দীক্ষার প্রসারের দিকে লোকের নজর পড়ছে, তাতে আশা করা যায় চোখ ও হাতের শিক্ষার দিকেও তাঁদের দৃষ্টি থাকবে। বিশেষ করে যে যে শিল্পকলার আজকাল দুর্দিন চলছে তার দিকে সবিশেষ দৃষ্টি দেবেন। ঘরে ঘরে গৃহস্বামী ও গৃহলক্ষ্মীরা কলাদেবীর আবার পূজা করবেন। আর আমাদের শিল্পলক্ষ্মীর ভাঙা দেউলে আবার ধূপধুনা আরতিতে ভরে উঠবে শিল্পীদের পূজায়। গৃহীরা ঘরে ঘরে শিল্পীসঙ্ঘ গড়ে তুলবেন।

অবশেষে আপনাদের বিনীত নমস্কার জানিয়ে শিল্পীদের তরফ থেকে একটি প্রস্তাব আজ উপস্থিত করছি। আমাদের এই প্রবাসী বাঙালি সম্মিলনীর বৈঠকে আমাদের প্রত্যেক প্রদেশস্থ শিল্পী ও গৃহলক্ষ্মীদের হাতের কাজের যদি একটি প্রদর্শনী খোলা হয় তা হলে আমাদের মধ্যে একটু বেশ সাড়া পড়তে পারে। নচেৎ আমাদের ইউরোপীয় কলে তৈরি শিল্প-সম্ভারেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আসবাবপত্র ছাড়া আমাদের দেবতাদের ছবি ও প্রতিমা পর্যন্ত জার্মানির কলে তৈরি হয়ে আসবে আর আমরা তারই পূজা করব। আমাদের ঘরে ঘরে হাতের কাজ করতে পারলে উদ্ভাবনী শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হবে এবং ভারতবর্ষ

প্রাচীন কালে শিল্প-সম্ভারের জন্যে যে খ্যাতি অর্জন করে এসেছিল তাও অটুট থাকবে। ফোটোর সাহায্যে ছাপা কাপড়ের নক্সা আর হাতের আঁকা অফুরন্ত রকমারি কাজের ছাপা এই দুয়ের তারতম্য সহজেই ধরা যাবে। ভারতবর্ষের দ্রব্য-সম্ভারের জন্যে এককালে সমগ্র ইউরোপ যে মুখ চেয়ে থাকত তার কারণ ভারতবর্ষ কলে-কৌশলে শিল্পদ্রব্য তৈরি করত তা নয়, ভারতবর্ষ হাতের ও মাথার সাহয্যে নানান কারুশিল্পের সৃষ্টি করত যা দেখে তাঁরা মুগ্ধ হতেন। এখন সেই প্রাচীন শিল্পকলার পুনরাবৃত্তি কলের সাহয্যে তৈরি করে পণ্যদ্রব্য হিসাবে বাজারে সস্তা দরে চালানো সহজ হবে বটে কিন্তু তার কদর গুণিসমাজে যে একেবারেই কমে যাবে তা বলাই বাহুল্য। ইউরোপের ভাবুক শিল্পীরা এখন এ বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করছেন এবং হাতে-গড়া জিনিসের কদর পুনরায় যাতে হয় তার জন্যে চেষ্টা করছেন। তাঁরা সঙঘবদ্ধভাবে দেশের হাতের কাজের কারখানা খুলে এবং প্রদর্শনী প্রভৃতি কায়েম করে ক্রমশ দেশের লোকের ভিতর হাতের কাজের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে প্রচার করবার চেষ্টা করছেন। এখন তাই কলে ঢালাই বাসনের চেয়ে হাতের পেটাই বাসনের কদর হতে আরম্ভ হয়েছে। আমরা ক্ষুদ্র ভাবেও যদি আজ কারুসত্রের সূচনা ঘরে ঘরে করতে পারি এবং দেশের ঐতিহ্যের অনুরূপ গৃহশিল্প গড়ে তুলতে পারি তো আমাদের পক্ষে কম লাভ হবে না। শিল্প সম্ভারের মধ্যে চিত্রকলাকে আমরা বাদ দিতে বলছি না। চিত্রকলা সম্বন্ধে জগৎপূজ্য কবি রবীন্দ্রনাথ লেখক-প্রণীত *বাঘগুহা ও রামগড়* পুস্তিকার ভূমিকায় যা বলেছেন তার এ স্থলে উল্লেখ করে আমরা আমাদের বক্তব্য আজ শেষ করব :

> চিত্রকলাকে আধুনিক ভারত অনেক দিন থেকে অবজ্ঞা করে এসেছে। এ সম্বন্ধে আমাদের চিত্তের অসাড়তা এতদূর এগিয়েছে যে, আমরা যে কেবলমাত্র চিত্র সৃষ্টি করতে পারছিনে তা নয়, প্রাচীন ভারতের চিত্ররচনা রীতি আমরা বুঝতেই পারিনে, তাকে আমরা ব্যঙ্গ করতে ছাড়িনে। আমরা যখন স্বাদেশিকতার অভিমানে উন্মত্ত হয়ে উঠি তখনো এই কথাটি বুঝতে পারিনে যে, যে জাতি কলাবিদ্যায় আপন চিত্তের পরিচয় দেয়নি সে জাতি মহাপ্রাণ জাতি নয়। তা ছাড়া এ কথা আমরা মনের দৈন্য বশতই ভুলেছি যে, এক টুকরো কাগজে একটুখানি ছোটো ছবি যদি সত্যি করে আঁকতে পারি তার দ্বারা নিত্যকলার কাছে দেশের যে পরিচয় প্রকাশ হবে তা রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে খবরের কাগজের বড়ো বড়ো ধ্বজা আস্ফালন করেও হবে না। অজন্তার সময়কার রাষ্ট্রীয় ঐশ্বর্যের একটি খুঁদকুঁড়োও আজ ভারতের ভাগ্যে বাকি নেই, কিন্তু অজন্তা গুহার ভিত্তি চিত্রে তখনকার ভারত যে লিপিখানি লিখে গেছে সেই লিপি যুগ হতে যুগান্তরে আপন বাণীকে প্রচার করে চলেছে।

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন—পঞ্চম অধিবেশন, দিল্লি—কারু ও চারু শিল্প বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ, ১৩৩৩।

ধর্ম

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের বৃত্তান্ত

ওঁ তৎসৎ

প্রথম অদ্যকার এই ব্রাহ্মবন্ধু সভা দেখিয়া আমার মন আনন্দে প্লাবিত হইতেছে। আমারদের দেশে এ নতুন ব্যাপার। এখানে বিষয়ের চিন্তা নাই, আমোদ প্রমোদ নাই; কীসে দেশের উন্নতি হয়, আত্মা উন্নত হয়, ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়; এই জন্য এখানে সকলে মিলিত হইয়াছেন। এমন মনোহর দৃশ্য বঙ্গদেশে আর কোথাও নাই।

পঞ্চবিংশতি বৎসর ব্রাহ্মসমাজ যে প্রকারে উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা বলিবার নিমিত্তে প্রাণাধিক শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দজী অদ্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। আহ্লাদপূর্বক যথাসাধ্য তোমারদিগকে তাহা অবগত করিবার জন্য চেষ্টা করিব। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে সকল ঘটনা জানিলে তাহার উপর ঈশ্বরের হস্ত তোমরা বুঝিতে পার, এবং ভবিষ্যতে ইহার উন্নতি সাধনের নিমিত্তে প্রকৃষ্ট উপায়-সকল অবলম্বন করিতে পার, এই উদ্দেশ্যে ইহার পূর্ব বৃত্তান্ত-সকল তোমারদিগকে অবগত করিতেছি। যদি এমন শুভ সংবাদ আমার মনের মতো সুবিস্তার করিয়া বলিয়া উঠিতে না-ও পারি, তথাপি তোমারদের উদারতার উপর নির্ভর করিয়া তাহাতে কুণ্ঠিত হইতেছি না।

প্রথমত, ব্রাহ্মসমাজের কথা মনে হইলেই এই দেশের প্রথম বন্ধু রাজা রামমোহন রায়কেই স্মরণ হয়। তাঁহার শরীর যেমন বলিষ্ঠ ছিল, বুদ্ধিও তেমনি সারবান ছিল; শ্রদ্ধা ভক্তি হৃদয়ের ধনও তাঁহার সেই প্রকার ছিল। এখন প্রথমেই তাঁহার মুখশ্রী আমার চক্ষুর সমক্ষে আবির্ভূত হইতেছে। তাঁর ভক্তি শ্রদ্ধাতে উজ্জ্বল মুখ, তাঁর সেই উদার ভাব, সমুদায় যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাঁর শরীরের বল, মনের বীর্য, হৃদয়ের ভাব, সকলি অনুরূপ। ধর্মের উন্নতির জন্যই তিনি এখানে উদিত হন। তিনি জীবনের প্রথম অবধি শেষ পর্যন্ত একাকী অসংখ্য প্রকার পৌত্তলিকতার সহিত নিরন্তর যুদ্ধ করিলেন এবং সকলকে পরাভূত করিয়া অবশেষে গঙ্গা স্রোতের ওপর এই সমাজ-রূপ জয়স্তম্ভ নিখাত

করিলেন। তিনি যে বয়সে পৌত্তলিকতার দুর্গ প্রথম আক্রমণ করিলেন, তাহা শুনিলে অবশ্য তোমরা চমৎকৃত হইবে। তিনি ষোড়শ বর্ষে পৌত্তলিকতার বিরোধে একখানি পুস্তক প্রস্তুত করিয়া প্রথম অস্ত্র নিক্ষেপ করেন; তাহা সেই সময়ে, যে সময় তিনি পারসিক ও আরবিক পাঠ সাঙ্গ করিয়া গ্রামে গিয়া সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। সে পুস্তকের নাম 'হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম-প্রণালী।' সেই পুস্তক প্রকাশ করাতে সকলেই তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইল এবং তিনি পিতা মাতা স্ত্রী কর্তৃকও গৃহ হইতে নির্বাসিত হইলেন। তখন তিনি হিমালয় অঞ্চল তিব্বতে ভ্রমণ করত বৌদ্ধধর্মের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখ কেমন আশ্চর্য! প্রথম বয়সেই সাংসারিক সকল সুখ পরিত্যাগ করিয়া এক সত্যের জন্য কত কষ্ট স্বীকার করিলেন! এত অল্প বয়সে একাকী পরিব্রাজক হইয়া কঠোর হিমালয় ভেদ করিয়া ধর্মের অপ্রতিহত অনুরাগ প্রকাশ করিলেন! চারি বৎসর পরে তাঁহার পিতা দয়ালু হইয়া তাঁহাকে গৃহে আহ্বান করিলেন। একটি কী গ্রন্থ লিখিয়া তাঁহার কত কষ্ট বহন করিতে হইল। কিন্তু তাহার দ্বারা তাঁহার আত্মার আরো উন্নতি হইল; আপনার প্রতি নির্ভর শিক্ষিত হইল, সহিষ্ণুতা বর্ধিত হইল। তিনি জানিতে পারিলেন, আত্মার কত বল, আর সংসারের কি ক্ষুদ্রতা। তখন আরও তাঁর উৎসাহ শত গুণ বর্ধিত হইল এবং সেই নূতন উৎসাহের সহিত সংস্কৃত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পিতৃপুরুষেরা বৈষ্ণব ছিলেন, যতদিন তাঁহার সে ধর্মে শ্রদ্ধা ছিল, ততদিন তিনি তাহা নিপুণরূপে পালন করিতেন। যখন জানিলেন যে অসীম জগতের ঈশ্বর অনন্ত, তখনি তিনি সেই অনন্তের উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইলেন. যেমন সত্য জানিলেন, অমনি সেই সত্যের অনুরোধে শরীর মনকে ধাবিত করিলেন। যখন তাঁহার বয়স ষোড়শ বৎসর, তখন ১৭১১ শক (১৭৮৯খ্রি.)। এই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৭১১ শকে পৌত্তলিকদিগের বিরুদ্ধে প্রথম গ্রন্থ রচিত হয়। তাহার পরে তিনি বিষয়-কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া যে কিছু অর্থ অর্জন করিলেন, তাহা সমুদয় নিঃশেষে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কার্যে নিক্ষেপ করিলেন।

তিনি যে সময় উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সে সময়কার ভীষণ সামাজিক ভাব ও অবস্থা মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তখন অন্ধকারের কাল, দ্বিপ্রহরা রজনীর কাল; এখন আমরা সে সময়ের ভাব বুঝিয়াও বুঝাইতে পারি না, যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের নামে সকলে খড়্গহস্ত হইত। বঙ্গভূমি নিবিড়ান্ধকারাবৃত অরণ্যভূমি, রাক্ষসভূমি ছিল; ভ্রষ্টাচারের পিশাচ-সকল তাহাতে রাজত্ব করিত। তিনি একা অজ্ঞাত শত সহস্র শত্রু দ্বারা আবৃত হইয়া কুঠার হস্তে সেই ঘোর অবিদ্যা-অরণ্য সমভূম করিয়া দেশোদ্ধরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে তাহাতে ব্রাহ্মসমাজ-রূপ বীজ বপন করিয়া ব্রাহ্মধর্মকে সংসারের মধ্যে আনয়ন করিলেন। এখন তো দিনে দিনে জ্ঞান-প্রভাবে বঙ্গদেশের ধর্মক্ষেত্রে কৃষিকার্যের সুবিধা ও ফলের প্রাচুর্য হইয়া আসিতেছে। তখন সে প্রকার ছিল না। তখন বিংশতি বৎসরে যাহা হইত, এখন এক বৎসরে তাহা সম্পন্ন হয়। যে সময়ে তিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন,

সে সময় তিনি ভিন্ন আর কেহই ব্রাহ্মধর্মকে এই সংসারে আনিতে পারিত না, তাঁরই প্রখর জ্ঞানাস্ত্রে কুসংস্কার-রূপ অরণ্য ছিন্নভিন্ন হইল, তাঁরই বুদ্ধির কিরণে প্রথম আলোক তাহাতে প্রবিষ্ট হইল। যদি তিনি কুসংস্কার-অরণ্যে প্রথম কুঠারি নিক্ষেপ না করিতেন, তবে হয়তো এখন ব্রাহ্মসমাজের উত্থান হওয়া অসম্ভব হইত। তাঁর কোনো ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য ছিল না; তাঁর জীবনের এই মহান লক্ষ ছিল যে, পৃথিবীর সকল লোকেই কলহ বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র পুরাতন অনাদি ঈশ্বরকে উপাসনা করে এবং পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করে। এই লক্ষ্য করিয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন এবং এই সমাজ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম-বীজ বপন করিলেন। যে-কোনো ধর্মের লোক হউক, এই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবে। দেখ তাঁর কেমন উচ্চ লক্ষ্য। তাঁহার এই উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার জন্য ক্রমে অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিবার আবশ্যক হইল। ক্রমে দেখা গেল যে ব্রহ্মোপাসনা কেবল এই ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের চতুষ্পার্শ্বের প্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ করিলে হইবে না, তাহা মনুষ্যের হৃদয়ে বদ্ধ করিতে হইবে, মনুষ্যের জীবনে প্রকাশ করিতে হইবে। অতএব ব্রাহ্মধর্ম-ব্রত সংস্থাপন করিবার আবশ্যক হইল এবং উক্ত ব্রত গ্রহণের নিমিত্তে কতিপয় প্রতিজ্ঞা ধার্য হইল। যাঁহারা উক্ত প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম-ব্রত গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম নামে খ্যাত হইলেন। ব্রাহ্মদিগের মতের ঐক্যতার জন্যে চারিটি ব্রাহ্মধর্ম-বীজ নির্ণীত হইল এবং সেই সকল বীজ অঙ্কুরিত হইয়া যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ মহাবৃক্ষ-রূপে ঈশ্বরের দিকে সমুত্থিত হইল, তাহা হইতেই নানা প্রকার জ্ঞানময় ভাবপূর্ণ পুস্তক সকল প্রসূত হইয়া পুষ্পের ন্যায় সুসৌরভে চতুর্দিক আমোদিত করিল এবং তাহাই ফলবন্ত হইয়া এখন সংসারের দিকে অবনত হইতেছে। যে সকল শুভানুষ্ঠান দেখিতেছি, তাহাতেই তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। এখন যদিও নানা উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার হইতেছে, কিন্তু রামমোহন রায় যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহারই এ সকল শাখা পল্লব মাত্র। যে বীজ, যে প্রশস্ত জ্ঞান তিনি বপন করিয়াছেন, তাহা চিরকালই অঙ্কুরিত হইতে থাকিবে; তাঁর আশা কেবল ইহলোকে নয়, পরলোকেও সম্পন্ন হইতে চলিবে এবং এই সমাজ-গৃহ ঈশ্বরের সমুদায় রাজ্য অধিকার করিবে।

প্রথম যখন সত্যের ভাব তাঁহার মনে উদয় হইল, তখন তাঁহার কি করিবার ভার হইল? বনচ্ছেদন করিবার ভার হইল। যেমন কাছাড় দেশে অগ্রে বনচ্ছেদন করিলে পরে তাহাতে চা-র উদ্যান হয়, সেইরূপ রামমোহন রায়ের বুদ্ধি-সমুদ্ভূত তর্কাস্ত্রজালে চিরবদ্ধমূল কুসংস্কার-রূপ বৃক্ষ-সকল ছিন্নভিন্ন হইলে ব্রাহ্মসমাজের পত্তনভূমি দীপ্তি পাইল। তিনি পথ্য-প্রদান প্রভৃতি নানা প্রকার পুস্তক রচনা করিয়া লোকের কুসংস্কার সকল উন্মূলন করিতে লাগিলেন এবং ১৭৪১ শকে (১৮১৯ খ্রি.) ব্রহ্মোপাসনার একটি সংক্ষেপ পুস্তক মুদ্রিত করিলেন, তার নাম অবতরণিকা। এই পুস্তকেতেই ব্রহ্মোপাসনার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ১৭৫০ শকে (১৮২৮ খ্রি.) কমল বসুর বাটীতে ব্রাহ্মসমাজে রোপণ করেন। ১৭৫১

শকে (১৮৩০ খ্রি.) এই স্থানে* তাহা প্রতিরোপিত হয়। ১৭৫২ শকে (১৮৩০ খ্রি.) তিনি ইংল্যান্ডে যাত্রা করেন, এবং ১৭৫৫ শকে (১৮৩৩ খ্রি.) সেখানে ব্রিস্টল নগরে তাঁহার মৃত্যু হইয়া সমাধি হয়।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য তাঁর কত যত্ন করিতে হইয়াছিল; তাঁর ধন গেল, সমুদায় বিষয় গেল, দিল্লির বাদশাহের বেতনভোগী পর্যন্ত হইয়া জীবন পোষণ করিতে হইয়াছিল। তখন তাঁর মনে কেবল এই আনন্দ ছিল যে ভবিষ্যদ্বংশ আমার আশা সফল করিবে। তাঁর এই ভাব ছিল যে তিনি ব্রাহ্মসমাজের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন; আমরা একত্র হইয়া ইহাকে ব্যবহার করিব, আমরা কর্ষণ করিয়া ইহাকে উর্বরা করিব। অতএব রামমোহন রায় আপনার গৃহকার্যে যে চেষ্টা না করিয়াছিলেন, তাহার শতগুণ একব্রাহ্মধর্মকে সংস্থাপনের জন্যে তাঁহার করিতে হইয়াছিল, ইহার জন্যে তিনি শরীর মন ধন সকলি দিয়াছিলেন। এক দিনের জন্য নয়, এক মাসের জন্য নয়, কিন্তু ষোড়শ হইতে উনষষ্টি বৎসর পর্যন্ত ইহাতে সমান ভাবে তাঁহার যত্ন ছিল। তাঁহার সেই যত্নের ফল দেখিয়া কি আমারদের উৎসাহ বর্ধন হইতেছে না? যে মহাত্মা আপনার হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক করিয়া ব্রাহ্মধর্মের প্রথম পথ আবিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, আমরা যেন তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করি। যদি অদ্য তিনি এখানে আসিয়া এখানকার ভাব দর্শন করিতেন, তবে তাঁহার যত পরিশ্রম সার্থক হইত; বুঝিতে পারিতেন যে তাঁহার সকল আশা সফল হইতেছে।

যখন কলিকাতায় তিনি প্রথম বাস করেন, যখন তিনি ১৭৩৬ শকে (১৮১৪ খ্রি.) একাকী বিদেশি উদাসীনের ন্যায় এখানে আইলেন, তখন কে তাঁহার সহযোগী হইয়া তাঁহাকে সাহায্য দিতে পারে? তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে ও ধর্মের অনুরাগে বিষয়ী লোকদিগকে আপনার পথে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। যখন প্রথম তিনি কলিকাতা নগরে আইলেন, তখন লোকেরা তাঁহাকে ধর্মচ্যুত, ধর্মভ্রষ্ট, নরকে পতিত, বলিয়া তিরস্কার করিত; তাঁহার মুখ দর্শন করিতে নাই, নাম উচ্চারণ করিতে নাই, এই প্রকার বাক্য-সকল তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করিত। তাঁহার কী এমন বল ছিল, যে সেই বলে লোকের হৃদয় ও মন আকর্ষণ করিলেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে সে সময়কার কলিকাতার ক্ষমতাপন্ন অনেক বড়ো মানুষ তাঁহার সহচর ছিলেন! তাঁর সঙ্গে বিষয়ীদিগের কীসের সম্বন্ধ ছিল? আপনার ধর্মমূর্তি দ্বারা তিনি তো সকলকে বশীভূত করিতেনই, তদ্ব্যতীত তিনি নানা প্রকারে বিষয়ীদিগের বিষয়ের উন্নতি করিয়া দিতেন এবং বিষয়ীরা বিনিময়ে কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার ধর্মপ্রচার কার্যে সাহায্য করিতেন। ধর্মের উন্নতি তাঁহারদের লক্ষ্য ছিল না কিন্তু তাঁহার মহদ্ভাব দেখিয়া তাঁহারা বশীভূত হইতেন এবং প্রত্যুপকার বলিয়া রামমোহন রায়ের ধর্মপ্রচারে সাহায্য করিতেন।

রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা হইবার কতক দিন পূর্বে রবিবারে রবিবারে য়ুনিটেরিয়ান্ খ্রিস্টানদিগের উপাসনা গৃহে যাইয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। কিন্তু কী ক্ষুদ্র হইতে

কী মহদ্ব্যাপার সমুদ্ভূত হয়। একদিন সেই উপাসনা-গৃহ হইতে আসিবার সময় তাঁহার দুই নিয়ত সহচর চন্দ্রশেখর দেব ও তাঁরাচাঁদ চক্রবর্তী কথায় কথায় বলিলেন, আমরা পরের সমাজে কেন যাই, আমারদের নিজের ধর্ম ও বিশ্বাস অনুযায়ী ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটি স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করা উচিত। তারি কিছুদিন পরে কমল বসুর বাটীতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল।

যখন প্রথম ইহা সংস্থাপিত হইল, তখন সেখানে কী হইত? তখন সূর্য অস্ত হইবার কিছু পূর্বে একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ সমাজের পার্শ্ব-গৃহে উপনিষদ্ পাঠ করিতেন, সেখানে কেবল রামমোহন রায়, বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা উপবেশন করিয়া তাহা শ্রবণ করিতে পাইতেন, শূদ্রদিগের সেখানে যাইবার অধিকার ছিল না। সূর্য অস্ত হইলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও উৎসবানন্দ গোস্বামী সমাজের ঘরে আসিয়া বেদিতে বসিতেন। উৎসবানন্দ উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করিতেন, বিদ্যাবাগীশ রামমোহন রায়ের রচিত ব্যাখ্যান পাঠ করিতেন এবং কখনো-কখনো বেদান্ত দর্শনেরও ব্যাখ্যা করিতেন। সঙ্গীত হইয়া সেই সমাজ ভঙ্গ হইত। সেই সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, খ্রিস্টান, মুসলমান সকলেরই সমান অধিকার ছিল। যাঁহারা রামমোহন রায়ের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে আসিতেন, তাঁহারদের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো জানিতেন না যে কীসের জন্য তথায় আসিয়াছেন। তাঁহারা রামমোহন রায়ের সন্তোষের জন্য, তাঁহার অনুরোধ রক্ষার জন্যই যেন আসিতেন। একদিন রামমোহন রায় বলিলেন যে ভাল ভাল গায়ক-সকল সংগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত দিলে ভাল হয়; অমনি গুণী গায়ক-সকল সেখানে একত্রিত হইল এবং নানা ভাবের সঙ্গীত চলিল। রামমোহন রায় বলিলেন, ও সব গান কেন? 'অলখ নিরঞ্জন' গাও। তখন সেই অবধি ব্রহ্মসঙ্গীত হইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্যে এতটুকুও তখন কাহারো বুঝা হয় নাই যে ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত গাইতে বলিলে ঈশ্বরের সঙ্গীত গাইতে হইবে।

যে ১৭৫১ শকে [১৮৩০ খ্রি.] ব্রাহ্মসমাজ এখানে উঠিয়া আইল, সেই শকে সতী দগ্ধ হওয়াও নিবারিত হইল এবং তাহার সঙ্গে বিরোধী ধর্মসভাও স্থাপিত হইল। রাজা রাধাকান্ত দেব সেই ধর্মসভার সভাপতি ছিলেন। তখন সমাজের প্রতি অনেকেই অনেক নিন্দাবাদ করিতেন। কেহ বলিতেন তথায় 'নাচ তামাশা', নৃত্য-গীত হয়, কেহ বলিতেন তথায় সকলে মিলিয়া খানা খায়, ও বিশেষ এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহারদের উপর মনের দ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেন যে ব্রহ্মসভার দল সহমরণ নিবারণের দল। ধর্মসভার দল সতী দগ্ধ করিবার দল। এই দুই দলের মধ্যে কে জয়ী আর কে পরাজিত, তাহা আমরা এখন দেখিতেই পাইতেছি। কিন্তু সে সময় ধর্মসভা প্রবল ছিল এবং ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে অতি সংকট কাল ছিল। কেহ বলিতেন ব্রাহ্মসমাজ জ্বালাইয়া দিবেন, কেহ বলিতেন রামমোহন রায়কে মারিয়া ফেলিবেন। কিন্তু তিনি গাম্ভীর্যভাবে সমাজে আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন, কোনো সহযোগী সঙ্গে থাকুক আর নাই থাকুক। যেমন গঙ্গার বা জগন্নাথের

যাত্রীরা দূর হইতে পদব্রজে আইসে, তেমনি তিনি তাঁহার শিষ্যদের সহিত একত্র হইয়া মাণিকতলা হইতে পদব্রজে এই সমাজে আসিতেন। যাইবার সময় গাড়ি করিয়া বাড়ি যাইতেন। এই একটি তাঁর অতীব শ্রদ্ধার ভাব ছিল।

প্রথম যখন সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল, তখন ইংরেজরাও তাহতে যোগ দিত। তখনকার লোকের মধ্যে সমাজের সহিত এখন আর কাহারো যোগ দেখা যায় না; কেবল তখনও যে বিষ্ণু গান করিত, এখনও সেই বিষ্ণু আছে। ইহার অভাব হইলে কে আর এমন ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিবে? ১৭৫১ শকের দ্বাদশ বৎসর পরে ব্রাহ্মসমাজের সহিত যখন আমার প্রথম যোগ হয়, তখন দেখিলাম, সেই প্রকার নিভৃতরূপেই বেদ পাঠ হইতেছে, বিদ্যাবাগীশ সেই প্রকারই প্রাচীন প্রণালী মতো ব্যাখ্যান করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন রামচন্দ্রের অবতার হওয়া বর্ণন করিতেছেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে ব্রাহ্মসমাজের বেদি হইতে পৌত্তলিকতার উপদেশ দেওয়া ধর্মবিরুদ্ধ হইয়াছে। তিনি সেই অবধি উক্ত কর্ম হইতে অবসৃত হইলেন।

রামমোহন রায়ের পর রাধাপ্রসাদ রায়ের প্রতি স্বভাবতই সমাজের ভার নিক্ষিপ্ত হইল। যদিও ধর্ম বলিয়া তাঁর তাদৃশ যত্ন ছিল না, কিন্তু পিতৃ-কীর্তি বলিয়া তিনি সমাজকে যত্নপূর্বক রক্ষা করিতেন। কিছুদিন পরে কর্মানুরোধে তাঁহার দিল্লিতে অবস্থান করিতে হইল। তখন সমাজকে কে দেখে? তখন রামমোহন রায়ের যাঁহারা বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা বন্ধুর কীর্তি রক্ষা করা উচিত বলিয়া সমাজের সাহায্য করিতে লাগিলেন। দেখ দেখি, ইহাতে ঈশ্বরের হস্ত আছে কী না? বিদ্যাবাগীশ যথার্থ ধর্মভাবে ব্রাহ্মসমাজে আসিতেন। তাঁর কথায়, তাঁর ব্যাখ্যানে, আমারদের মন আকৃষ্ট হইত; আর সমাজের প্রতি তাঁহার যে যথার্থ শ্রদ্ধা ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইয়াও মৃত্যু সময়ে ৫০০ টাকা সমাজকে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি রামমোহন রায়ের পরে দ্বাদশ বৎসর পর্যন্ত কেবল একমাত্র স্বকীয় যত্নে সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঝড়ই হউক, বৃষ্টিই হউক, তিনি বুধবারে সমাজে থাকিবেনই। প্রথমে যখন সমাজ স্থাপিত হয়, তখন শনিবারে সমাজ হইত। রবিবারে সকলের অবকাশ ছিল, শনিবার রাত্রিতে অধিক কাল পর্যন্ত উপাসনা হইলেও কাহারো অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু রামমোহন রায়ের যাঁহারা সহযোগী, তাঁহারদের পক্ষে আমোদের দিন শনিবার, সুতরাং সে দিন সমাজে আসিতে তাঁহারা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেন; এই জন্য বুধবার সমাজের দিন স্থির হইল। আমরা যখন সমাজে আসি, তখন বুধবারেই সমাজ হইত। ক্রমে এই বারই পবিত্র হইয়াছে।

যখন ১৭৬৩ শকে (১৮৪২ খ্রি.) আমি সমাজের সহিত যোগ দিলাম, তখন তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিত হইয়াছে। সেই তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে ১৭৬৫ শকে (১৮৪৩) *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকা প্রকাশ হয়। *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ জন গ্রাহক ছিল; তাহা কেবল এক অক্ষয়বাবুর দ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময় পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন, তাহা

হইলে *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না। পুনর্বার ইহাতে নূতন প্রাণের সঞ্চার চাই; তখন ইহার আদর আরো বৃদ্ধি হইবে। ব্রাহ্মধর্ম এই প্রকার নানা লোকের সাহায্য পাইয়া উন্নত হইতেছে; এ কথা যথার্থ নয় যে একজনের দ্বারা এ ধর্মের উন্নতি হইবেক। তত্ত্ববোধিনী সভা হইবার পূর্বে ব্রাহ্মসমাজের ব্যয়ের জন্য রামমোহন রায়ের একজন শিষ্য ৬০ পরে ৮০ টাকা করিয়া মাসে দিতেন। তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা দেখিলেন যে একজনের উপর ব্রাহ্মসমাজের নির্ভর করা উচিত হয় না; এই বিবেচনা করিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের ব্যয় নির্বাহের ভার গ্রহণ করিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার যোগের অগ্রে ব্রাহ্মসমাজ যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, স্পন্দনহীন হইতেছিল; তাহার যতদূর পর্য্যন্ত দুর্গতি হইতে পারে, তাহা হইয়াছিল। যখন তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত তাহার পরিণয় হইল, তখন তাহার প্রাণসঞ্চার হইল। ১৭৬৩ শকে তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত যোগ না হইলে ব্রাহ্মসমাজের কী পরিণাম হইত, বলা যায় না। হয়তো আমরা ইহার কিছুই দেখিতে পাইতাম না। রামমোহন রায়ের এক ইংরাজি বিদ্যালয় ছিল, আমরা সেখানে অধ্যয়ন করিয়াছি। কিন্তু তাহা এখন কোথায়? হয়তো ব্রাহ্মসমাজের দশা সেই প্রকার হইত। তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত সংযোগের সময়ে এই আন্দোলন হইল যে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পূর্ণ পৃথক থাকা আবশ্যক কী ইহা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়া যাইবে? নির্ধারিত হইল যে তত্ত্ববোধিনী সভার উপাসনা-কার্য ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিবে এবং তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধারণ করিবে। সেই অবধি তত্ত্ববোধিনী সভার মাসিক উপাসনা রহিত হইয়া তাহার পরিবর্তে প্রাতঃকালে ব্রাহ্মসমাজের মাসিক সমাজ ধার্য হইল; এবং ২১ আশ্বিনে তত্ত্ববোধিনী সভার যে সাংবৎসরিক উপাসনা হইত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ যে দিবসে এখানে উঠিয়া আইসে, সেই দিবস ধরিয়া ১১ মাঘে সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ পুনর্বার আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মসমাজের সহিত আমার যোগ হইবার পূর্বে তাহার ভাদ্রমাসের সাংবৎসরিক সমাজ উঠিয়া গিয়াছিল,—সেই আমাকে ভাদ্রমাসের স্থানে মাঘের একাদশ দিবস গণ্য করিয়া তাহা পুনরুদ্ধার করিতে হইল।

প্রথম যখন ১৭৬৩ শকে ব্রাহ্মসমাজ দেখি, তখন তাহাতে লোকের সমাগম অতি অল্পই ছিল। বেদির পূর্ব দিকে ফরাশ চাদর পাতা থাকিত, তাহাতে পাঁচজন কী ছয়জন উপবেশন করিতেন; দেখিতাম যে শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় তাহার মধ্যে প্রতিবারেই আছেন। আর পশ্চিম দিকে খানকতক চৌকি পাতা থাকিত, তাহাতে আগন্তুক পথিকেরা আসিয়া বসিত। তখন আমারদের এই চিন্তা হইল, সমাজে অধিক লোক কী প্রকারে হইবে? ক্রমে ঈশ্বর-প্রসাদে লোক বাড়িতে লাগিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘরও বাড়িতে লাগিল। ইহাতেই আমারদের কত উৎসাহ। প্রথমে ইহা দুই তিন কুঠুরিতে বিভক্ত ছিল, ক্রমে সেই সকল ভাঙিয়া ফেলিয়া এই শাল প্রস্তুত হইয়াছে। যতই ঘর প্রশস্ত হইতে লাগিল, ততই লোকের

কোলাহল দেখিয়া মনে করিতাম যে ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি হইতেছে। যখন দেখি এই ঘরেতে নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়, তার পরে তেতালা নির্মিত হইল। যখন লোক বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন মনে হইল যে লোক বাছা আবশ্যক। কেহ বা যথার্থ উপাসনা করিতে আগমন করে, কেহ বা লক্ষ্যশূন্য হইয়া আইসে, কাহাকে আমরা আমারদের বলিয়া বলিতে পারি? এই আন্দোলন হইয়া স্থির হইল, যাঁহারা প্রতিজ্ঞাপূর্বক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন। যখন ব্রাহ্মসমাজ আছে, তখন তাহার প্রতি সভ্যের ব্রাহ্ম হওয়া চাই। যাঁহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রতী হইয়া প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষর করিবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন, এই মনে করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রতিজ্ঞা রচনাপূর্বক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আচার্যের নিকট ১৭৬৫ শকের (১৮৪৩ খ্রি.) ৭ পৌষে আমরা প্রথম একদল ব্রাহ্ম হইলাম। অনেকে হঠাৎ মনে করিতে পারেন যে, ব্রাহ্ম দল হইতে ব্রাহ্মসমাজ নাম হইতেছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে ব্রাহ্ম নাম স্থির হয়। যখন প্রতিজ্ঞা দ্বারা ব্রাহ্ম হওয়া স্থির হইল, তখন এই মনে ছিল যে যাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্ম হইবেন, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন, যত্নশীল হইয়া ব্রাহ্মধর্ম পালন করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই হইল যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াও তাহা পালন করিতে অনেকে ঔদাস্য করিতেন ও গর্হণীয় হইতেন। এতদিন পরে সেই প্রতিজ্ঞা গ্রহণের ফল ফলিয়াছে, অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে, পরিমিত দেবতার স্থানে অনন্ত ঈশ্বরকে আনিয়া তাঁহার পূজার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমক্ষে গৃহধর্মের অনুষ্ঠান হইয়াছে। এখন বলিতে হইবে, যাঁহারদের ধর্ম-দীক্ষা হইবে, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন। প্রথম লোক আনিবার জন্য যত্ন, পরে তাহারদিগকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করাইবার জন্য যত্ন, এখন তাহারদিগকে অনুষ্ঠানে বদ্ধ করিবার জন্য যত্ন হইতেছে।

রামমোহন রায়ের মনের ভাব কীসে সকল প্রকার পৌত্তলিকতা গিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়। এই জন্য একদিক হইতে যেমন ভারতবর্ষের লোকদিগের বেদান্ত-প্রতিপাদ্য একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিলেন, তেমনি আবার পৃথিবীর সমুদায় লোককে ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত করিবার জন্য আর দিক হইতে তিনি কী করিলেন? না বাইবেলকে নিয়ামক বলিয়া তাহাতে যে পৌত্তলিক ভাগ আছে, তাহা পরিত্যাগপূর্বক বাইবেল দ্বারাই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা সিদ্ধান্ত করিলেন। সেই প্রকার কোরাণকে নিয়ন্তা করিয়া মহম্মদকে পরিত্যাগপূর্বক কোরান দ্বারাই এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিপন্ন করিলেন। ইহাতে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান সকলের সহিত তাঁহার বিবাদ হইল। তাঁহার মনে আর একটি ভয় ছিল, পাছে যিশু খ্রিস্টের ন্যায় প্রচারককে ঈশ্বর বলিয়া নির্বোধেরা পূজা করে, পাছে তাহারা প্রচারকের ছবি কি মূর্তি আনিয়া সমাজগৃহে স্থাপিত করে, পাছে মনুষ্য মনুষ্যকে আদর্শ করে; এই জন্য স্পষ্টাক্ষরে তিনি ব্রাহ্মসমাজের অধিকার পত্রে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, যে সমাজের মধ্যে কোনো প্রকার ছবি বা মূর্তি

রক্ষিত হইবেক না। আমারদেরও সেই অভিপ্রায়ানুসারে নিয়ত কাল চলিতে হইবে। এই অভিপ্রায় রক্ষা করিয়াই ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞা-পত্র প্রস্তুত হইয়াছে। 'সর্বস্রষ্টা পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোনো বস্তুর আরাধনা করিব না।'—এই প্রতিজ্ঞা ব্রাহ্মদিগের সর্বতোভাবে পালনীয়। অতএব ব্রাহ্মেরা মনুষ্যকে কখনও ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিতে পারেন না। আমরা যদিও লোকের সাহায্যে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারি, কিন্তু পাপীর পরিত্রাতা কেবল একমাত্র ঈশ্বর, এই আমাদের চিরন্তন বিশ্বাস। খ্রিস্টান ধর্মের মধ্য হইতে পৌত্তলিকতা, মুসলমান ধর্মের মধ্য হইতে মহম্মদ, হিন্দুধর্মের মধ্য হইতে যাগযজ্ঞ, পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরেরই ভাব জগন্ময় প্রচার করিতে হইবে। আমরা দেখিতেওছি যে সেই দিন ক্রমে উদয় হইতেছে। ক্রমে অন্ধকারের রাজ্য চলিয়া গিয়া সত্যের রাজ্য প্রকাশ হইতেছে।

রামমোহন রায়ের আর একটি এই মহৎ লক্ষ্য ছিল যে ধর্মের জন্য বিবাদ কলহ হইবেক না; কিন্তু সকলেই এক ঈশ্বরের উপাসক হইবেক। একমাত্র সহজ জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের বিষয় বলিয়া ঈশ্বরকে লোকের প্রতিপন্ন করিবার তাঁহার ভরসা ছিল না। যদিও তিনি জানিতেন, ধর্ম প্রচার ও রক্ষার জন্য এক এক আপ্ত পুস্তকের অবলম্বন চাই, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসের ভূমি সহজ জ্ঞান ছিল; তাহা না হইলে সকল ধর্মের মধ্য হইতে তিনি সার সত্য কেমন করিয়া সংকলন করিলেন। যদিও তিনি ভরসা করিয়া আত্মপ্রত্যয়ের উপর লোকদিগকে নির্ভর করিতে বলিতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি নিজে আত্মপ্রত্যয় দ্বারা চালিত হইতেন; তিনি বেদ, কোরান, বাইবেল, পুরাণ, তন্ত্র মন্ত্র, সকল হইতেই সহজ জ্ঞানের আলোতে আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা বাহির করিলেন; ইহাতে তিনি মনে করিলেন যে তবে ধর্ম লইয়া এত কলহের আবশ্যক কী? এই জন্য তিনি প্রত্যেক ধর্মপুস্তক লইয়া এক ঈশ্বরেরই উপাসনাবিধি প্রচার করিতে গেলেন কিন্তু তাঁহার কথা কাহারও মনে সংলগ্ন হইল না। খ্রিস্টানদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ হইল, হিন্দুরা তাঁহাকে গৃহ হইতে নির্বাসিত করিল, মুসলমানেরা তাঁহাকে কাটিতে গেল। ভবিষ্যতের এক আশাই তাঁহার মিত্র ছিল, নতুবা সংসার তাঁহার আত্মীয় ছিল না, সংসারের সঙ্গে তাঁহার কেবলই বিরোধ। তিনি যেমন সংসারকে কিছুই দিলেন না, তেমনি সংসারও তাঁহাকে কিছুই দিল না।

রামমোহন রায় মনে করিয়াছিলেন, যাহারা বেদ মানে তাহারদের মধ্যে বেদ রক্ষা করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচলিত করা; কিন্তু যাহারা জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত হইয়া বেদকে আপ্ত বাক্য বলিয়া না মানিবে, তাহারদের মধ্যে কি করা, ইহা তাঁহার তখন বিবেচনায় আইসে নাই। ক্রমে সেই কাল উপস্থিত হইল, ক্রমে বেদের দোষ সকল পরিস্ফুটিত হইয়া পড়িল। তখন আমরা মনে করিলাম যে বেদের মধ্যে যে সত্য আছে, তাহাই সংকলন করা। এই জন্য দুই বৎসর লইয়া শ্রুতি স্মৃতি হইতে টীকার সহিত ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থ প্রস্তুত

করিয়া ব্রাহ্মধর্মের বীজ তাহাতে অন্তর্নির্বেশিত করা হইল। শেষে ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়াই ব্রাহ্ম দলের মধ্যে বিবাদ পড়িয়া গেল। তাঁহারা তর্ক উপস্থিত করিলেন, ঈশ্বর অনন্ত কী প্রকারে হইতে পারেন? হস্তোত্তলন করো দেখি, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ কিনা? কী হাস্যস্পদ! দ্বার রুদ্ধ করিয়া হস্তোত্তলন দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা যে কি হাস্যাস্পদ, ইহা তাঁহারা তখন বুঝিতেন না। যখন বেদের প্রতিষ্ঠা গেল এবং সহজজ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয় তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, তখন বড়ই কলহ হইতে লাগিল। ১৭৭৭শক (১৮৫৫ খ্রি.) অবধি ক্রমাগতই এইরূপ গোল চলিল। আমি এই সকল বিবাদ-বিস্বাদ দেখিয়া হিমালয়ে চলিয়া গেলাম। হিমালয়ে কখনো-কখনো মনে হইত, এমন কী হইবে যে বঙ্গদেশে গূঢ় সত্য ভাব-সকল প্রতিষ্ঠিত হইবে? কিন্তু এখন যে প্রকার ব্রাহ্মধর্মের ব্যবস্থা মতো গৃহধর্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ দেখিতেছি, তাহাতে এ ধর্ম পুরাতন ধর্মের ন্যায় হইয়া আসিতেছে, কিছুদিন পরে ইহার আর কেহ প্রতিবাদী থাকিবে না। যে পরিবারের মধ্যে একবার ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান হয়, সে পরিবার হইতে ব্রাহ্মধর্ম কদাপি অন্তর্হিত হয় না। যখন বঙ্গদেশে পরিবারের মধ্যে এ প্রকার অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন বঙ্গদেশকে ব্রাহ্মধর্ম আর কখনও পরিত্যাগ করিবেন না। যে ধর্ম সহজ জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে, সে ধর্ম হইতে যে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি নিবদ্ধ হওয়া ও কার্যেতে তাহা পরিণত হওয়া, ইহা পৃথিবীর কোনো পুরাবৃত্তে নাই। ভারতবর্ষেই কেবল এই নূতন সৃষ্টি। ভারতবর্ষ ব্যতীত এমন দৃষ্টান্ত আর পৃথিবীতে নাই।

আমি আহ্লাদপূর্বক ব্যক্ত করিতেছি যে, ১৭৮১ শকে (১৮৫৯ খ্রি.) শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের যত্নে ও পরিশ্রমে একটি ব্রহ্ম-বিদ্যালয় এই কলিকাতাতে স্থাপিত হয়। সেখানে তিনি যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহাতে ছাত্রদিগের মন উৎসাহে উদ্দীপিত হইত। তিনি ব্রাহ্মধর্মের সত্য সকল যে প্রকার সহজে বলিতেন, তাহা অনায়াসে তাহারা গ্রহণ করিত। তাঁহার সতেজ বাক্যে তাহারদের হৃদয় বিগলিত হইত। এই জীবন্ত সত্য বলপূর্বক তিনি সকলের মনে বিদ্ধ করিয়া দিতেন যে, জ্ঞান প্রীতি অনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্মের সমগ্র অবয়ব। ইহার মধ্যে একের অভাবে ব্রাহ্মধর্ম অঙ্গহীন হয়। হৃদয়ের প্রীতি ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান যে, সে শুষ্ক জ্ঞান; জ্ঞান ব্যতীত প্রীতি যে, সে অন্ধকার; অনুষ্ঠান ব্যতীত জ্ঞান প্রীতি উভয়ই নিষ্ফল, আবার জ্ঞান প্রীতি ব্যতীত অনুষ্ঠান কেবল বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। ব্রাহ্মধর্মের এই সকল সরল সত্য যে যে ছাত্রদিগের হৃদয়কে অধিকার করিল, তাহারা ব্রাহ্মধর্মকে জীবনে ও অনুষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া সঙ্গত নাম দিয়া এক স্বতন্ত্র দলে আবদ্ধ হইল। সেই সঙ্গতের মধ্যে অনেকেই অদ্য এই ব্রাহ্মবন্ধু সভাকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। সঙ্গত যেন একটি কল প্রস্তুত হইতেছে, কালে ইহা মহাভার বহন করিবে। ইহা একটি অবয়বের ন্যায়, ইহাতে মস্তকও আছে, হৃদয়ও আছে, হস্ত পদও আছে। যেমন বাষ্পীয় শকট নিজে ক্ষুদ্র

হইয়াও মহাভার বহন করে, সেই রূপ সঙ্গতের সভ্য যদিও দশ বারো জন, তথাপি আশা হইতেছে যে ইহা প্রকাণ্ড ভার বহন করিবে।

বোম্বাই নগর হইতে ভাওদাজি নামক একজন কৃতবিদ্য এখানকার সমাজে আসিয়া বলিলেন যে, ব্রাহ্মেরা বৌদ্ধের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া কেবল উপাসনা করে। উপাসনার সময় ব্রাহ্মেরা আর কী করিবে? তাহারা কি ইতস্তত বেড়াইয়া বেড়াবে? তিনি বীটন সভা দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রহ্মানন্দ তো কোনো অভাব রাখেন না। তিনি মনে করিলেন আমারদেরও বীটন সভার ন্যায় একটি সভা চাই। এই মনে করিয়া তিনি এই ব্রাহ্মবন্ধু সভা স্থাপিত করিলেন। এখন বিদেশি কেহ আসিয়া মনে করিতে পারিবেন না যে, আমরা কেবল উপাসনাই করি; এখন জানিতে পারিবেন যে, আমরা চলি বলি এবং আমারদের শরীরে জীবন আছে। আমি তো ব্রাহ্মবন্ধু সভাতে ইহার পূর্বে কখনও আসি নাই। আমিই আশ্চর্য হইতেছি, এত লোকে একত্র মিলিয়া কেমন উৎসাহের সহিত দেশের হিতজনক আলোচনাতে এখানে ব্যস্ত রহিয়াছেন।

১৭৬৫ শকে [১৮৪৩ খ্রি.] ৭ পৌষে ব্রাহ্মধর্ম ব্রত স্থাপিত হয়। আমি সেই শকে সেই দিনে আচার্য শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম-ব্রত গ্রহণ করি। সেই অবধি আমারদের বাটীর দুর্গোৎসবের সময়ে প্রতি বৎসরে আমি বাহিরে বাহিরে ভ্রমণ করিতাম। আশ্বিন মাসের রৌদ্র ও কার্তিক মাসের ঝড় আমার মস্তকের উপর দিয়া কতবার চলিয়া গিয়াছে। কতবার আমি ঈশ্বরের নিকটে অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রার্থনা করিয়াছি যে, কবে পরিমিত দেবতার উপাসনা উঠিয়া গিয়া আমারদের বাটীতে অনন্ত-দেবের উপাসনা আরম্ভ হইবে। দেখ করুণানিধানের কেমন করুণা! তিনি আমার মনোগত প্রার্থনা ও সাধু ইচ্ছা কেমন পূর্ণ করিলেন। আমি হিমালয়ে থাকিয়া মনে করিয়াছিলাম যে, আমারদের বাটী হইতে যে অবধি প্রতিমা পূজা রহিত না হয়, সে অবধি আমি গৃহে ফিরিয়া যাইব না। আমি এখানে ফিরিয়া আসিবা মাত্র কেমন সহজে সহজে আমারদের গৃহে প্রতিমা পূজা বিলুপ্ত হইল। শালগ্রাম-শিলার নিত্য পূজা, সংবৎসরের দুর্গা পূজা, পৌত্তলিকতার কোলাহল, যেমন আমারদের বাটী হইতে অন্তরিত হইল; অমনি সেখানে অনন্ত-দেবের পবিত্র নিশ্বাস সমীরিত হইল। যেখানে পরিমিত দেবতার উপাসনা ছিল, সেখানে এখন প্রতিদিন আমরা সপরিবারে একত্র হইয়া বিমল মনে, আনন্দ হৃদয়ে, সত্যস্বরূপ প্রেমস্বরূপের উপাসনা করি। ইহাতে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। আমারদের পরিবারে এখন ব্রাহ্মধর্মের পদ্ধতি মতো গৃহধর্মের অনুষ্ঠান কেমন সহজ হইয়া উঠিয়াছে। ভদ্রাসন বাটী স্থাপনাবধি যে গৃহে পরিমিত দেবতার উপাসনা হইয়া আসিতেছে, সে গৃহে যে ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান প্রচলিত হওয়া আমি এই চক্ষে দেখিব, এমত আমার আশা ছিল না। ঈশ্বর-প্রসাদে তাহাও আমার জীবনে ঘটিল। ১৭৮৩ শকে (১৮৬১খ্রি.) আমার কন্যা সুকুমারীর বিবাহ ব্রাহ্মধর্ম-বিধান মতো

প্রথম অনুষ্ঠিত হইল। ব্রাহ্মধর্মের সেই প্রথম অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মধর্মের সেই প্রথম ফল। তাহার পরে আর দুই পরিবারে ব্রাহ্মধর্মের বিশুদ্ধ ব্যবস্থা মতো কন্যা সম্প্রদান হইয়া গিয়াছে। গত বৎসরে সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী সত্যনিষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত হরদেব চট্টোপাধ্যায় এবং এই গত রবিবারে আমারদের প্রিয় সুহৃৎ ব্রহ্মবাদী শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু, উভয়েই ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে ব্রহ্মনিষ্ঠ সৎপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া ব্রাহ্মধর্মকে রক্ষা করিয়াছেন এবং আপনারা কৃতপুণ্য হইয়া সকল ব্রাহ্মদিগের আদরণীয় হইয়াছেন। ১৭৮১ শক (১৮৫৯ খ্রি.) হইতে বর্তমান পর্যন্ত এই প্রকার শুভজনক উৎসাহকর ঘটনা সকলই তোমারদের প্রত্যক্ষ গোচর; এ বিষয়ে আমার আর অধিক বলিতে হইবে না। ১৭৯১ শকে যে কী হইবে, তাহা বলিতে পারি না।

যদি বঙ্গভূমির বর্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখি, দেখি যে এমন হিংস্র জন্তুদিগের তেমন আক্রমণ নাই, যাহার জন্য রামমোহন রায়ের অস্ত্র লইয়া থাকিতে হইত। ব্রাহ্মসমাজ যেন এখন চম্পক বৃক্ষের উদ্যান হইয়াছে। কোথায় মাদ্রাজ, কোথায় বম্বে, কোথায় বেরেলী, কোথায় লাহোর, চতুর্দিকে ইহার সৌরভ বিকীরিত হইতেছে। সেই সৌরভে কুসুমান্বেষণে বহু দূর হইতেও এখানে কেহ কেহ সমাগত হইতেছেন। যে দিকে চাই, দেখি যে, সকল অভাব পূরিত। আচার্য আবশ্যক, আচার্য উপস্থিত; পুরোহিত আবশ্যক, পুরোহিত উপস্থিত; প্রচারক আবশ্যক, প্রচারক উপস্থিত। দেখি যে, যেখানে ঈশ্বর সহায়, সেখানে লোকের অভাব, অর্থের অভাব ভাবিতে হয় না।

তোমরা যদি ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস শ্রবণে অদ্য মনোযোগী হইয়া থাক, তবে ইহার পরে আলোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি একটি সূত্রেই গ্রথিত আছে। এক সময় যে বীজ বপিত হইয়াছিল, তাহাই শাখা পল্লব পুষ্প ফলে সুশোভিত হইতেছে। রামমোহন রায় যে সময়ে ছিলেন, শত্রুরা সে সময় কী না করিয়াছিল? কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কিছুই হানি হয় নাই। সেই যে ব্রাহ্মসমাজ-রূপ পর্বত তখনও অটল ভাবে ছিল, এখনও অটল ভাবে দণ্ডায়মান আছে। এক সময় ব্রাহ্মেরা যখন হস্তোত্তলন করিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলেন, তাহাতেই বা কী হইল? তখনও এই গৃহ যেমন অটল ভাবে ছিল, এখনও তেমনি আছে। কত লোকের মনে হইয়াছিল, বীজ স্বতন্ত্র থাকুক, তাহার বৃক্ষ স্বতন্ত্র থাকুক; জ্ঞানকাণ্ড, কর্মকাণ্ড বিযুক্ত থাকুক; কিন্তু নিত্যযুক্ত জ্ঞান-ধর্ম একত্রই রহিয়াছে। রামমোহন রায়ের এক উদ্দেশ্য, আর আমারদের আর এক অভিসন্ধি লইয়া উৎসাহ, তাহা নহে। তখনও যে বিষয়ের জন্য তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন, এখনো সেই বিষয়েরই জন্য আমরা দণ্ডায়মান আছি। সেই উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার জন্যই এইক্ষণে আচার্য উপাচার্য অধ্যেতা প্রচারক স্ব স্ব কার্যে উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত রহিয়াছেন।

পৌত্তলিকতা পঙ্কে নিমগ্ন হিন্দুধর্মকে পুনরুদ্ধার করিবার নিমিত্তে যে সময়ে যে অবস্থাতে রামমোহন রায় আসিবার উপযোগী, সেই সময়ে সেই অবস্থাতে তিনি আসিয়াছিলেন।

হিন্দুধর্ম অতি প্রশস্ত ও উদার ধর্ম, ইহা সকল প্রকার উন্নতি আপনার মধ্যে নিবিষ্ট করিতে পারে। অতএব হিন্দুদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া তাহারদের মধ্যে থাকিয়াই ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে হইবে। হিন্দুধর্মকেই উন্নত করিয়া ব্রাহ্মধর্মে পরিণত করিতে হইবে। হিন্দুদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে এ দেশের ব্রাহ্মধর্মের প্রচার বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারিবে না। এই কারণেই বৌদ্ধধর্ম এখানে স্থান পায় নাই; এই কারণেই মুসলমানেরা সাত শত বৎসর পর্যন্ত তরওয়ারের শাসনেও হিন্দুধর্মকে পরাস্ত করিতে পারে নাই; এজন্যই মায়াবী খ্রিস্টানেরা শত বৎসর পর্যন্ত কৌশল-জাল বিস্তার করিয়াও তাহাকে মুগ্ধ ও কুণ্ঠিত করিতে পারে নাই। এক সময়ে চৈতন্যের উদয়ে সহসা জাতিভেদ উন্মূলিত হইয়া স্বতন্ত্রে বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্থাপিত হয়, তাহাতে দেশের কত গুরুতর অমঙ্গল উৎপন্ন হইল; বৈষ্ণব নাম বঙ্গদেশে যেন অধর্মের অন্বর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমারদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করিয়া কার্য করা উচিত; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হওয়া উচিত। আমা কর্তৃক দেশের উন্নতি হইবে, এই উৎসাহে লোকাচার দেশাচার উন্মূলন ও বিজাতীয় সভ্যতা আনয়ন করিবার নিমিত্তে সময়ের ব্যবধান সংকোচ করিতে গেলে আমারদের লক্ষ্য সিদ্ধি আরো সুদূরপরাহত হইবে। ফরাসি বিপ্লবের সময় সহস্র বৎসরে যে লক্ষ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা একদিনে করিতে গিয়াছিল; এই জন্য সময়ের ব্যবধান আরও অধিক হইয়া গেল। ইংল্যান্ডে ইহার বিপরীত, সেখানে যে সময় যাহা নহিলে নয়, তাহার জন্য লোকেরা দণ্ডায়মান হয় এবং বিনা বিপ্লবেও তাহা সিদ্ধ হয়। এই হেতু ফরাসি দেশ হইতে ইংল্যান্ড অধিক স্বাধীন।

পরস্পর সাহায্য ভিন্ন কোনো কর্ম সিদ্ধ হয় না। যেমন বায়ু প্রতি বায়ুর হিল্লোলকে সাহায্য করে, তেমনি প্রতিজন প্রতিজনকে সাহায্য করে, তেমনি এ ব্রাহ্মসমাজের পূর্বতন ভাব এখনকার ভাবকে সাহায্য করিতেছে। ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি ব্রাহ্মমণ্ডলী হইতে, অতএব প্রকৃত ব্রাহ্মের সংখ্যা অধিক আবশ্যক। বল অনেক চাই, নেতাও চাই। যদি এমন নেতা পাওয়া যায়, যিনি বোম্বাই, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ, হিন্দুস্থান, পাঞ্জাবকে এক ব্রাহ্মধর্মের অধীন করিতে পারেন, তিনি উৎকৃষ্ট নেতা। যদি ভারতবর্ষকে এই ধর্মেতে এক করিতে চাও, অমনি দেখিতে পাইবে যে সংস্কৃত আবশ্যক। ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশকে একত্রিত করিবার জন্য সংস্কৃত-রজ্জু চাই। সংস্কৃতের মধ্যে উপনিষদ্ বলবান। সেই উপনিষদ হইতেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ পুষ্ট হইয়াছে। রামমোহন রায়ই প্রথম ভারতবর্ষের জন্য উপনিষদ্ অবলম্বন করিয়াছিলেন; তাহা হইতেই ক্রমে ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি দেখা গেল, পৌত্তলিকতার প্রবল প্রতাপ অবসন্ন হইল।

এখন তোমরা সকলে মিলিয়া ব্রহ্মের জয় ঘোষণা কর। আপনার আপনার ক্ষুদ্র ভাবের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, ঈশ্বরের জয় ঘোষণা কর। দেখ, যখন রামমোহন রায় সত্য-ধর্ম প্রচার করিতেন, তখন তিনি সত্যের আলোকই প্রকাশ করিতেন, আপনি পশ্চাদ্ভাগে কুণ্ঠিত হইয়া থাকিতেন। তখন শান্তভাবে ঈশ্বরের জয় ঘোষিত হইত। আমরাও যেন সেইরূপ শান্তভাবে ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করি, আমরা যাহা কিছু করি, যেন ঈশ্বরের মহিমা প্রচারের

জন্যই করি। আপনার গর্বের জন্য নয়, ব্রাহ্মধর্ম ঈশ্বরের জয় ঘোষণার জন্য। রামমোহন রায়ের সময় একথা কেহ বলিতে পারিত না যে, তিনি আপনার সংসারের উন্নতির জন্য, যশোমান-প্রভুত্ব লাভের জন্য, ধর্ম প্রচার করিতেছেন। এখনও যেন এমত কথা কেহ আমারদিগকে বলিতে না পারে। যেন ঈশ্বরেরই মহিমা ঘোষণা করিবার জন্য আমারদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে, যেন তাঁহারই ধর্ম সাধনের জন্য আমারদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়।

* ব্রাহ্মবন্ধু সভা, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহ, ১৭৮৬ শক ২৬ বৈশাখ শনিবার।

প্রধান আচার্য মহাশয় কর্তৃক বিবৃত ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত।

রাজনারায়ণ বসু

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা

হিন্দুধর্মের বিষয় বলিতে গেলে প্রথমত এই অবধারণ করা কর্তব্য যে, হিন্দুধর্ম কাহাকে বলে? বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে পরব্রহ্মের উপাসনাই হিন্দুধর্ম। সকল হিন্দুশাস্ত্র সমস্বরে পরব্রহ্মের উপাসনা প্রতিপাদন করে। সকল শাস্ত্র সমস্বরে এই কথা বলে যে পরব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না। ব্রহ্মই হিন্দুধর্মের মধ্যবিন্দু। জ্ঞানীরা জ্ঞানযোগ দ্বারা পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে এবং তাঁহার ধ্যানধারণায় রত হইয়া তাঁহাকে লাভ করিতে চেষ্টা করেন। কর্মীরাও সকল কর্মের শেষে 'ব্রহ্মার্পণমস্তু' বলিয়া কর্মের ফলাফল পরব্রহ্মে অর্পণ করেন। শ্রুতি অর্থাৎ বেদেতে পরব্রহ্মের স্বরূপ কথিত হইয়াছে। স্মৃতিতেও মনুষ্যের নানা প্রকার কর্তব্যের মধ্যে ব্রহ্মলাভ জন্য কী কর্তব্য, তাহাও পরিব্যক্ত হইয়াছে। পুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মকে লাভ না করিলে কখনও মুক্ত হইতে পারা যায় না। তন্ত্রেতেও সেই রূপ। এই সকল শাস্ত্রে অসংখ্য দেবদেবীর কথা আছে, কিন্তু ব্রহ্মের শক্তি অথবা লক্ষণই রূপকচ্ছলে দেবদেবীরূপে কল্পিত হইয়াছে। ঈশ্বরের সৃজন শক্তি ব্রহ্মা রূপে কল্পিত হইয়াছে; তাঁহার পালন শক্তি বিষ্ণুরূপে কল্পিত হইয়াছে; তাঁহার সংহার শক্তি শিব রূপে কল্পিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে 'স্রষ্টাদরোহরি বিরিঞ্চিহরেতিসংজ্ঞা'। সর্বপ্রধান দেবতারাও ব্রহ্মোপাসক বলিয়া শাস্ত্রের অনেকানেক স্থানে কথিত হইয়াছে যথা, মহাভারতের শান্তি পর্বের ৫৩ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে 'সধ্যানপথমাধিশ্য সর্বজ্ঞানানি মাধবঃ। অবলোক্য ততঃ পশ্চাৎ দধ্যৌ ব্রহ্ম সনাতনং।' শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানপথে আবিষ্ট হইয়া সমস্ত জ্ঞান আলোচনা করিয়া তৎ পশ্চাৎ সনাতন ব্রহ্মকে ধ্যান করিলেন। এতদ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে ব্রহ্মই হিন্দুধর্মের মধ্যবিন্দু, ব্রহ্মোপাসনাই হিন্দু ধর্ম।

সকল ধর্মের শাসন আছে। হিন্দুধর্মের শাসন ও উপদেশ কী, তাহা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। এই সকল ধর্মগ্রন্থ কী, না, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র। মহাভারত ও রামায়ণ, এই দুইখানি গ্রন্থকে ইতিহাস বলে। কিন্তু আমি তাহাদিগের প্রকৃতি

বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে পুরাণ মধ্যে গণনা করিলাম। শ্রুতি অর্থাৎ বেদ সর্বপ্রধান শাস্ত্র। শ্রুতির অর্থ, যাহা পরম্পরায় এক মুখ হইতে আর এক মুখে শুনা হইয়াছে। তৎকালে লেখার সৃষ্টি ছিল না ; গুরু শিষ্যকে বলিতেন, এইরূপে কালপ্রবাহে উহা বহুকাল চলিয়া আসিতেছিল, এই জন্য লোকে বেদকে শ্রুতি বলিয়া ডাকিত। শ্রুতির অর্থ স্মরণ করিয়া মনু প্রমুখ ধর্ম প্রবর্তকেরা যাহা বলিয়াছেন তাহাই স্মৃতি নামে প্রসিদ্ধ। শ্রুতির ও স্মৃতির মতে যেখানে বিরোধ হয়, সেখানে শ্রুতিই গরীয়সী জ্ঞান করিতে হইবে। 'শ্রুতিস্মৃতিবিরোধের্ত শ্রুতিরেব গরীয়সী।' শ্রুতি অর্থাৎ বেদ দুই অংশে বিভক্ত : মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রের অন্য নাম সংহিতা। সংহিতাতে ইন্দ্রাদি দেবতার স্তব আছে। ব্রাহ্মণে সংহিতার অর্থ ব্যাখাত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের শেষ ভাগ উপনিষদ। তাহাতে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কথা আছে ; তাহা বেদের অন্ত ভাগ বলিয়া তাহাকে বেদান্ত বলা যায়। অনেকে ব্যাসপ্রণীত বেদান্তসূত্রকে বেদান্ত কহেন কিন্তু প্রকৃত বেদান্ত উপনিষৎ। বেদ চারি অংশে বিভক্ত। ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব। ঋক্ দেবতাদিগের স্তব, যজুঃ যজ্ঞের বিধি, এবং সাম ধর্মসঙ্গীত। অথর্ব বেদে এই সকলই আছে। বেদ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ঋষি দ্বারা রচিত। মধ্যে মধ্যে এক এক জন ঋষি উত্থিত হইয়া এই সকল মুখপরম্পরাগত শ্রুতিকে সংগ্রহ করিয়া শ্রেণিবদ্ধ করিতেন। এই সকল শ্রুতি সংগ্রহকর্তাদিগের নাম ব্যাস। অনেক ব্যাস জন্মিয়াছিলেন ; শেষ ব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। আমাদের দেশে রঘুনন্দনের স্মৃতি বলিয়া যাহা প্রচলিত আছে, তাহা কোনো বিশেষ স্মৃতি নহে। তাহা অনেক স্মৃতি হইতে সংগৃহীত। রঘুনন্দনের সংগ্রহ নিতান্ত আধুনিক গ্রন্থ। প্রধান স্মৃতিকর্তাদিগের নাম এই :

মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোসনোহঙ্গিরা
যমাপস্তম্বসম্বর্তা কাত্যায়নোবৃহস্পতিঃ।।
পরাশরোব্যাসশংখলিখিতাদক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপোবশিষ্টশ্চ ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রয়োজকাঃ।।

মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞাবল্ক্য, উসন, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্তা, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শংখ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ, ইহারাই ধর্মশাস্ত্রের প্রয়োজক।

পুরাণের সংখ্যা আঠারোটি। তাহাদের নাম, গরুড়, কূর্ম, বরাহ, মার্কণ্ডেয়, লিঙ্গ, স্কন্ধ, বিষ্ণু, শিব, মৎস্য, পদ্ম, ব্রহ্ম, ভাগবত, নারদ, অগ্নি, ভবিষ্য, বামন, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত। এতদ্ব্যতীত মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ মধ্যেও গণ্য করা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন অনেক উপপুরাণ আছে। তন্ত্র সর্বাপেক্ষা আধুনিক শাস্ত্র।

হিন্দুধর্মের বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান করিতে গেলে, প্রথম ঋগ্বেদের উপরেই দৃষ্টি পতিত হয়। পৃথিবীর মধ্যে ঋগ্বেদ অত্যন্ত প্রাচীন গ্রন্থ। উহার অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ আর নাই।

ঋগ্বেদে কি দেখিতে পাওয়া যায়? আর্যগণ ভৌতিক পদার্থের এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করিয়া তাঁহাদের আরাধনা করিতেন। তাঁহারা পরমব্রহ্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়া উপাসনা করিতেন। তাঁহারা ঈশ্বরকে অবিজ্ঞাত থাকিয়া বায়ু নামে বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ঈশ্বর মনে করিয়া উপাসনা করিতেন ; মিত্র নামে সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ঈশ্বর মনে করিয়া উপাসনা করিতেন ; মিত্র নামে সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ঈশ্বর মনে করিয়া উপাসনা করিতেন ; বরুণ নামে জলের অধিষ্ঠাত্রী তাকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করিতেন। তাঁহারা পরব্রহ্মকে অবিজ্ঞাত থাকিয়া এই সকল দেবতাকে ব্রহ্মের স্থানীয় করিয়া উপাসনা করিতেন। কিন্তু সেই আদিম আর্যরা যে কেবল সূর্য চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার আরাধনা করিতেন, সাক্ষাৎ ব্রহ্মকে যে অবগত ছিলেন না, এমনও নহে। সেই ঋকের মধ্যেই 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম' সেই ঋকের মধ্যেই 'দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া,' সেই ঋকের মধেই 'বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখঃ' প্রভৃতি বিখ্যাত ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহারা স্পষ্ট জানিয়াছিলেন যে 'একং সদ্বিপ্রা বহুধাবদন্তি অগ্নিং যমং মাতবিশ্বানমাহু।' এক সৎপদার্থকে বিপ্র সকল অগ্নি, যম, বায়ু, এই সকল নামে উক্ত করেন। সেই আদিম আর্যগণ ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের গাঢ় সম্বন্ধ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ঈশ্বর মনুষ্যের পিতা মাতা ইহা তাঁহারা অবগত ছিলেন। 'ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং হিনা মাতা' তুমি আমারদিগের পিতা, তুমি আমারদিগের মাতা। তাঁহারা ঈশ্বরকে 'সখা পিতা পিতৃতমঃ পিতৃণাম্' সখা, পিতা, পিতৃগণের মধ্যে পরম পিতা বলিয়া জানিতেন তাঁহারা ঈশ্বরকে সখা বলিয়া জানিতেন ; তাঁহারা বন্ধুত্বা, তাঁহার সহবাস, তাঁহাদের অত্যন্ত সুখকর বোধ হইত। এই জন্য তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, 'স্বাদু সখাং স্বাদ্বীপ্রণীতীঃ' তোমার বন্ধুতা অতি সুস্বাদু, তোমার নেতৃত্বও সুস্বাদু। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন, 'ত্বমস্মাকং তবাস্মি' তুমি আমারদের আমরা তোমার। এই তো ঋগ্বেদের কথা বলিলাম। উপনিষদে দেখা যায় যে তৎকালে ঋষিরা যেমন ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখিতেন, তেমনি তাঁহাকে আত্মার আত্মারূপে উপলব্ধি করিতেন, 'তিনি আত্মার আত্মা' এই পরম সত্য প্রাচীন হিন্দুদিগের হৃদয়ে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। পিতা মাতা অপেক্ষা আত্মার আত্মা যে নিকটের সম্বন্ধ, তাহার সন্দেহ নাই। এইরূপে ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের কী নিকটতম কী গূঢ়তম সম্বন্ধ, তাহা উপনিষৎকার ঋষিগণ সুস্পষ্টরূপে জানিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বৈদিক সংহিতাতে বাহ্যবস্তুতে, ঈশ্বরের আপোপ দেখা যায়, উপনিষদে এই কথা পাওয়া যায় যে যিনি বাহ্যবস্তুতে ; তিনিও আত্মাতে, 'যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ' যিনি এই আত্মাতে, তিনি এই আদিত্যে, তিনিই এক মাত্র। 'তমাত্মস্থং যেইনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং' তাঁহাকে যে সকল ধীরেরা আত্মস্থ করিয়া জানেন তাঁহারদের নিত্য শান্তি হয়, তদ্ব্যতীত শাশ্বতী শান্তি আর কেহ লাভ করিতে পারে না। উপনিষৎ বেদের শিরোভাগ। উপনিষদের পর স্মৃতি রচিত হয়। রাজনীতি, দণ্ড-নীতি, গার্হস্থ্য কর্মের বিধি, এই সকল স্মৃতিতে পাওয়া

যায়। ধর্মগ্রন্থের মধ্যে আমি দর্শনকে গণ্য করিলাম না কারণ, তাহা কেবল বিচার গ্রন্থ মাত্র। দর্শনকে ধর্মগ্রন্থ বলিয়া কোনো দেশেই গ্রহণ করে না। এদেশেও উহা ধর্ম বিষয়ে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদির ন্যায় প্রামাণিক গ্রন্থ নহে। * পুরাণের মধ্যে মহাভারত ও ভাগবত পুরাণ প্রধান। ভাগবতপ্রণেতা তৎকালে দর্শনশাস্ত্রীয় শুষ্কতর্কের প্রবলতা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া ঈশ্বরকে ভক্তি ও প্রীতি করিবার উপদেশ আবশ্যক বোধে ভাগবত রচনা করেন। ভক্তি কী, তাহা ভাগবত ব্যাখ্যাকারী শাণ্ডিল্যসূত্রে ব্যক্ত হইয়াছে, 'অত্যন্তানুরক্তিরীশ্বরে ভক্তিঃ।' তন্ত্রের মধ্যে প্রধান মহানির্বাণ মন্ত্র। এই মন্ত্রে পরমব্রহ্মের উপাসনা সম্বন্ধীয় অতি আশ্চর্য উপদেশ সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থ সর্বত্র মান্য। তন্ত্র প্রধানত বঙ্গদেশে মান্য। এই সকল গ্রন্থ হিন্দুধর্মের প্রধান শাস্ত্র। এই সকল গ্রন্থ দ্বারা জানিতে পারা যায় হিন্দু ধর্ম কি?

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিবাদন করা আদ্যকার বক্তৃতার বিষয়। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতি পাদন করিতে গেলে অগ্রে হিন্দুধর্ম বিষয়ে কতকগুলি অমূলক প্রবাদকে নিরাকরণ করা আবশ্যক।

উল্লিখিত অমূলক প্রবাদ সকলের মধ্যে প্রথম অমূলক প্রবাদ এই যে হিন্দুধর্ম পৌত্তলিকতা-প্রধান-ধর্ম। কিন্তু বস্তুত হিন্দুধর্ম পৌত্তলিকতা-প্রধান-ধর্ম নয়। পৌত্তলিকতার নিন্দা, হিন্দুধর্মে বিলক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বিবিধ শাস্ত্র হইতে অনেক যত্নের সহিত নিম্নোলিখিত শ্লোক সকল সংগ্রহ করিয়া তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা।।
রূপস্থানাং দেবতানাং পুং স্ত্র্যংশাদিককল্পনা।।

স্মার্তধৃত যমদগ্নি বচন

জ্ঞানস্বরূপ অদ্বিতীয় উপাধিশূন্য শরীর রহিত যে পরমেশ্বর তাঁহার রূপের কল্পনা সাধকের নিমিত্ত হইয়াছে ; রূপ কল্পনা স্বীকার করিলে পুরুষের অবয়ব, স্ত্রী অবয়ব ইত্যাদি অবয়বের সুতরাং কল্পনা করিতে হয়।

রূপনামাদিনির্দ্দেশবিশেষণবিবর্জিতঃ
অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামার্তিজন্মভিঃ।
বর্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্‌ন।।

বিষ্ণু পুরাণ

পরমাত্মা রূপনাম ইত্যাদি বিশেষণ রহিত, নাশ রহিত, অবস্থান্তর শূন্য, দুঃখ ও জন্ম

বিহীন হয়েন ; কেবল আছেন এই মাত্র বলিয়া তাঁহাকে কহা যায়।

অপ্সু দেবামনুষ্যাণাং দিবি দেবামনীষিণাং।
কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা।।

স্মার্তধৃত শতাতপ বচন

জলেতে ঈশ্বর বোধ ইতর মনুষ্যদিগের হয়, গ্রহাদিতে ঈশ্বর বোধ দেব জ্ঞানীরা করেন, কাষ্ঠ মৃত্তিকা ইত্যাদিতে ঈশ্বর বোধ মূর্খেরা করে ; পরমাত্মাতে ঈশ্বর বোধ জ্ঞানীরা করে।

পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলং।

???

পরব্রহ্মের জ্ঞান হইলে কর্মকাণ্ডাদি কোনো নিয়মের প্রয়োজন থাকে না। যেমন, মলয়ের বাতাস পাইলে তাল বৃন্ত কোনো কার্যে আইসে না।

এবঙ্গুণানুসারেণ রূপানি বিবিধানিচ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং।।

মহনির্বাণ তন্ত্র

এইরূপ গুণের অনুসারে নানা প্রকার রূপ অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের নিমিত্ত কল্পনা হইয়াছে।

মনসা কল্পিতামূর্তির্নৃণাঞ্চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা।।

মহানির্বাণ তন্ত্র

অভিপ্রেত মূর্তি যদি মানবগণের মুক্তির কারণ হয়, তবে স্বপ্নলব্ধ ও মনুষ্য অনায়াসে রাজা হইতে পারে।

বালক্রীড়নবৎ সর্বং রূপনামাদিকল্পনাং।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তোনাত্র সংশয়।।

মহানির্বাণ তন্ত্র।

নাম রূপাদি কল্পনাকে বালক্রীড়াবৎ জানিয়া মনুষ্য সৎ স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা মুক্ত হয়েন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

মৃচ্ছিলাধাতুদার্বাদিমূর্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তি তপসামূঢ়াঃ পরাং শান্তিং ন যান্তি তে।।

শ্রীমদ্ভাগবত

যে সমস্ত মূঢ় মনুষ্য মৃত্তিকা প্রস্তর তথা সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতু এবং কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত বিগ্রহে ঈশ্বর জ্ঞান করে, তাহারা ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। পরম শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

ন কর্মণা বিমুক্তঃ স্যান্ন মন্ত্রারাধনেন বা।
আত্মনাত্মনমাজ্ঞায় মুক্তোভবতি মানবঃ।।

মহানির্বাণ তন্ত্র

মনুষ্য কর্ম দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না, মন্ত্র বা আরাধনার দ্বারা মুক্তিভাজন হয় না, কেবল আত্মা দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারিলেই মুক্ত হয়।

যোমাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ।।

শ্রীমদ্ভাগবত

সকল প্রাণীতে বর্তমান সকলের আত্মা ও ঈশ্বর যে আমি আমাকে মূঢ়তা প্রযুক্ত যে ত্যাগ করিয়া প্রতিমা পূজা করে সে ভস্মে হোম করিয়া থাকে।

সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারস্তু নিশ্চলং।

অস্টবক্র সংহিতা

সাকারকে মিথ্যা বলিয়া জান, নিরাকার পরব্রহ্মকে অচল সত্য জ্ঞান করো।

তোয়োবিনা যথা নাস্তি পিপাসানাশকারণাং।
তত্ত্বজ্ঞানবিনা দেবি তথা মুক্তির্নজায়তে।।

কুলার্ণব তন্ত্র

হে দেবী! জল বিনা যেমন পিপাসা শান্তি হয় না, তেমনি তত্ত্ব জ্ঞান বিনা মুক্তিলাভ হয় না।

নানা শাস্ত্রের এই সকল বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, যে সকল অল্পবুদ্ধি অজ্ঞব্যক্তি নিরাকার অনন্ত পরমেশ্বরকে ধারণা করিতে অসমর্থ, তাহারদিগের উপাসনার

সহায়তার নিমিত্ত ব্রহ্মের বিবিধ রূপ কল্পনা হইয়াছে ও বিবিধ পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপের বিধান হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপকে না জানিলে কদাপি মুক্তি লাভ হয় না। এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে হিন্দুধর্ম পৌত্তলিকতা-প্রধান-ধর্ম নহে। পরব্রহ্মের উপাসনাই এ ধর্মের প্রধান উপদেশ। হিন্দু শাস্ত্রে এই কথা ভুয়োভূয়ঃ উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা করিবে, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির অন্য উপায় নাই।

হিন্দুধর্ম বিষয়ে আর এক অমূলক প্রবাদ এই যে হিন্দুধর্ম অদ্বৈতবাদাত্মক ধর্ম। যে মতে বলে যে, এই সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই ঈশ্বর, তাহাকে অদ্বৈতবাদ বলে। এই অদ্বৈতবাদ ইদানীন্তন গ্রন্থে বাহুল্য, উপনিষৎ প্রভৃতিতে অল্পই পাওয়া যায়। উপনিষদে ঈশ্বর হইতে জগৎ পৃথক, ঈশ্বর হইতে জীবাত্মাও পৃথক, এইরূপ বাক্য অনেক স্থানে আছে।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোভিচ্যাকশীতি।
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যথীশমস্য মহিমানমিতিবীতশোকঃ।

মুণ্ডকোপনিষৎ

দুই সুন্দর পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা সর্বদা একত্র থাকেন এবং উভয়ে পরস্পরের সখা। তন্মধ্যে একটি সুখেতে ফল ভোজন করেন, অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন। জীবাত্মা শরীর মধ্যে নিমগ্ন রহিয়া দীনভাবে মুহ্যমান হইয়া সর্বদাই শোক করিতে থাকে। কিন্তু যখন সর্বসেব্য ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখিতে পায়, তখন তাহার আর শোক থাকে না।

কঠোপনিষদে আছে, 'ছায়াতপৌ ব্রহ্ম বিদোবদন্তি' এই শ্লোকে ঈশ্বর ও জীবাত্মাকে আতপ ও ছায়ার ন্যায় প্রভেদ নিরূপণ করা হইয়াছে। প্রশ্ন উপনিষদে আছে।

এষহিদ্রস্টাস্প্রষ্টা ঘ্রাতা রসয়িতামন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা
পুরুষঃ। স পরে অক্ষরে আত্মনিসং প্রতিষ্ঠাতে।

এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ স্রষ্টা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা ও কর্তা, ইনি অক্ষর পরমাত্মাতে সম্প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন।

মনুসংহিতাতে উক্ত আছে :

উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।

যাহাতে আত্মা প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে, তিনিই উপাস্য পরমব্রহ্ম।

তলবকারোপনিষদে উক্ত আছে:

অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।

তিনি বিদিত কী অবিদিত সকল বস্তু হইতে ভিন্ন।

কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে:

অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।

তিনি এই কার্য-কারণবিশিষ্ট জগৎ হইতে ভিন্ন।

শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতাতে উক্ত আছে:

ন তং বিদাথ যইমা জজানান্যৎ যুষ্মাকমন্তরং বভূব।

তাঁহাকে তোমরা জান না যিনি এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি যে এ সকল হইতে ভিন্ন হইয়াও তোমারদিগের অন্তরে স্থিতি করিতেছেন।

এইরূপ প্রধান প্রধান হিন্দু শাস্ত্রোক্ত বচন দ্বারা যেমন প্রতিপন্ন হয় যে, পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা ও জগৎ ভিন্ন, তেমনি হিন্দুদিগের ব্যবহার দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে সাধারণ হিন্দুবর্গের বিশ্বাস এই যে ব্রহ্ম সমস্ত বস্তু হইতে ভিন্ন। সমস্ত হিন্দুরা বিবিধ প্রকারে সেই পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, যিনি উপাস্য তিনি অবশ্যই উপাসক হইতে ভিন্ন। যখন হিন্দুরা ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন, তখন ঈশ্বর এবং মনুষ্য এক ইহা তাঁহারা কখনোই কার্যত বিশ্বাস করেন না, ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। বেদান্ত-দর্শনে এই অদ্বৈতবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বেদান্ত-দর্শন শঙ্করাচার্য প্রণীত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য বুঝায়, নিজ বেদান্তসূত্র বুঝায় না ; যেহেতু শঙ্করাচার্য যেমন বেদান্তসূত্র অদ্বৈত কল্পে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, রামানুজস্বামী তেমনি দ্বৈতকল্পে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব উপনিষদের কথা দূরে থাকুক বেদান্তসূত্রও যে অদ্বৈতবাদাত্মক শাস্ত্র তাহা প্রমাণ হয় না। বেদান্ত শাস্ত্র শঙ্করাচার্য প্রণীত। শঙ্করাচার্য এক জন অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি বত্রিশ বছর মাত্র জীবিত ছিলেন। এই বত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে তিনি অলৌকিক বীর্য ও তেজস্বিতা সহকারে ভারতবর্ষের সর্বত্র আপনার মত প্রচার করিয়াছিলেন। হিমালয় অবধি কন্যাকুমারী পর্যন্ত এমন স্থান নাই, যেখানে শঙ্করাচার্যের মঠ দেখিতে না পাওয়া যায়। তিনি বৌদ্ধ, চার্বাক, সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়স্থ লোক সকলের সহিত তর্ক করিয়া আপনার মত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্যের মত ভারতবর্ষে এক্ষণে এমনি প্রচলিত হইয়াছে যে কবির পন্থি, দাদু পন্থি, নানক পন্থি, চৈতন্য সম্প্রদায়ের ন্যায় শঙ্করাচার্যের মতাবলম্বীদিগকে শঙ্করপন্থি অথবা শঙ্কর সম্প্রদায় বলিয়া কেহ ডাকে না।

অন্য সকল মতের অনুবর্তীদিগকে সম্প্রদায় বলিয়া ডাকে, কিন্তু শঙ্করাচার্যের অনুবর্তীদিগকে কেহ শঙ্কর সম্প্রদায় বলিয়া ডাকে না। তাহার কারণ এই যে শঙ্করাচার্যের মত ভারতবর্ষে বিস্তৃতরূপে প্রচলিত হইয়াছে। পশ্চিম অঞ্চলের যে অজ্ঞ স্ত্রীলোক সুগভীর কূপ হইতে জল তুলিতেছে, সেও ওইরূপ জল তুলিবার সময় বিচারে জীবাত্মা পরমাত্মা অভেদ ও জগৎ স্বপ্নবৎ বলিয়া থাকে আর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতও তাঁহার টোলে বসিয়া শিষ্যদিগকে ওইরূপ উপদেশ দেন। শঙ্করাচার্যই অদ্বৈত মত ভারতবর্ষে প্রচলিত করিয়া যান ; উপনিষদাদি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে ওই মতের চিহ্ন তত পাওয়া যায় না।

হিন্দুধর্মের বিষয়ে লোকের আর এক অমূলক প্রবাদ এই যে, হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণরূপে সন্ন্যাস ধর্মের পোষকতা করে। তাহাও অযথার্থ। শঙ্করাচার্য সন্ন্যাস ধর্মের সৃষ্টিকর্তা। ঋষিরা বনে বাস করিতেন কিন্তু একবারে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিতেন না। শাস্ত্রে ঋষিপত্নী, ঋষিকুমার ইত্যাদির কথা শ্রবণ করা যায়। তবে তাঁহারা নির্জন স্থান অন্বেষণ করিতেন, কারণ তাহা ঈশ্বরোপাসনার পক্ষে অনেক সহায়তা করে। এখনও ভারতবর্ষের ও অন্যান্য দেশের অনেক গৃহস্থ বৃদ্ধ হইলে সাংসারিক কার্য হইতে অবসৃত হইয়া নির্জনে বাস করেন। তাহাদিগকে কখনোই সন্ন্যাসী বলা যায় না। ঋষিরা নির্জনে থাকিয়াও লোক সমাজের কার্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহারা নির্জনে থাকিয়াও রাজনীতি, লোকযাত্রা বিধান, কৃষি প্রভৃতি নানা লোকোপকারী বিদ্যাবিষয়ে গ্রন্থ সকল রচনা করিতেন, রাজসভায় আসিয়া রাজাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেন এবং রাজ্যে অমঙ্গল ঘটনা ঘটিলে তাহার নিরাকরণ জন্য রাজাকে সৎপরামর্শ প্রদান করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে।

ভয়ং প্রমত্তস্য বনেম্পপিস্যাদ্‌তঃ সআস্তে সহষট্‌সপত্নৈঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতেবুধস্য গৃহাশ্রমঃ কিন্নুকরোত্যবদ্যং।।
যঃ ষট্‌ সপত্নান্‌ বিজিগীষমানো গৃহেহ নির্বিশ্য যতেত পূর্বং।
অত্যেতি দুর্গাশ্রিতউর্জিতারীন ক্ষীণেষু কামং বিচরেদ্বিপশ্চিৎ।।

শ্রীমদ্ভাগবত

যে প্রমত্ত ব্যক্তির ষড়রিপু প্রবল তাহার বনেও ভয় আছে, আর যে ব্যক্তি জ্ঞানী জিতেন্দ্রিয় ও ঈশ্বরপরায়ণ তিনি গৃহাশ্রমে থাকিলেও তাঁহার কি দোষ হইতে পারে? যিনি ষড়রিপুকে জয় করিয়া গৃহে ধর্ম সাধন করেন তিনি দুর্গাশ্রিত ব্যক্তির ন্যায় প্রবল শত্রুদিগকে পরাজয় করেন। সেই জ্ঞানী ব্যক্তি ক্ষীণ রিপু হইয়া যথেচ্ছা বিচরণ করেন ; তাঁহার কোনো আশঙ্কা নাই।

শান্তিশতক সকল হিন্দুরা শাস্ত্রসম্মত কাব্য বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন, তাহাতে উক্ত হইয়াছে।

বনেহপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্মণি যঃ প্রবর্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং।।

রিপুপরতন্ত্র লোক সকল বনে থাকিলেও পাপকর্মের অনুষ্ঠান করে ; গৃহে পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহই তপস্যা। যে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কুৎসিত কর্মে প্রবৃত্ত না হন, তাহার সম্বন্ধে গৃহই তপোবন।

হিন্দুধর্মের বিষয়ে আর এক অমূলক প্রবাদ আছে। তাহা এই যে হিন্দুধর্ম কঠোর তপস্যাবিধায়ক ধর্ম। প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে কৃচ্ছ্রসাধন তপস্যা প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা পাপ কার্য হইতে বিরতিই যে প্রধান তপস্যা বলিয়া জানিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

যে পাপানি ন কুর্বন্তি মনোবাক্‌কর্মবুদ্ধিভিঃ।
তে তপন্তি মহাত্মানো ন শরীরস্য শোষণং।।

মহাভারত

যে ব্যক্তি মন, বাক্য, কর্ম ও বুদ্ধি দ্বারা পাপ কার্য না করেন তিনিই তপস্যা করেন। যিনি শরীর শোষণ করেন তাঁহার তদ্দারা তপস্যা হয় না।

হিন্দুধর্মের বিষয়ের আর এক প্রবাদ এই যে হিন্দুধর্মে পাপক্ষয় নিমিত্ত বহুল কৃচ্ছ্রসাধন প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে কিন্তু অনুতাপ যে প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত, হিন্দুধর্মে তাহার উপদেশ নাই। এই প্রবাদ অমূলক। মনুস্মৃতিতে আছে।

কৃত্বা পাপানি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎপ্রমুচ্যতে।
নৈনং কুর্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পুয়তে ত সঃ।।

যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়া তজ্জন্য সন্তাপিত হইয়া সেই পাপ হইতে বিরত হয় এবং আর এরূপ পাপ করিব না বলিয়া একেবারে নিবৃত্ত হয়, সে পবিত্র হয়।

হিন্দুধর্মের বিষয়ে আর একটি অমূলক প্রবাদ এই যে ইহা ঈশ্বরকে পিতা মাতা বলিয়া জ্ঞান করে না। ইংল্যান্ডবাসিনী ব্রহ্মবাদিনী মিস্ কব্ বলেন যে এমেরিকার থিওডোর পার্কর প্রথমে ঈশ্বরকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুধর্মশাস্ত্রের অনেক স্থানে ঈশ্বরকে পিতা মাতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ঋগ্বেদে ঈশ্বরকে পিতা মাতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। শুক্ল যজুর্বেদে আছে, 'পিতা নোহসি পিতা নো বোধি।' তুমি আমাদিগের পিতা, পিতার ন্যায় তুমি আমাদিগকে জ্ঞান

প্রদান করো। 'য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্ ঋষির্হোতা নাসীদৎ পিতানঃ' যিনি এই ভুবনকে অস্তিত্বে আহ্বান করিলেন, তিনি ঋষি অর্থাৎ সর্বদৃক্ তিনি হোতা অর্থাৎ আহ্বানকর্তা, তিনি আমারদিগের পিতা। ভগবদগীতাতে শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মের উক্তি স্বরূপ, বলিতেছেন, 'পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ' আমি এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা ও পিতামহ। অর্জুন এইরূপ বলিতেছেন, 'পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য, ত্বমস্যপূজ্যশ্চ গুরোর্গরীয়ান্' তুমি এই চরাচর জগতের পিতা, তুমি ইহার পূজ্য, তুমি গুরু অপেক্ষাও গরীয়ান।

হিন্দুধর্ম বিষয়ে আর এক অমূলক প্রবাদ এই যে, হিন্দুধর্ম অত্যন্ত নীরস ধর্ম। উহা কেবল শুষ্ক জ্ঞানের ধর্ম, উহাতে প্রীতিভাবের কোনো কথা নাই। কিন্তু বাস্তবিক এই প্রবাদ যথার্থ নহে। উপনিষদে আছে :

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।

পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করিবেক :

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ
সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়ং আত্মা।

পরমাত্মা পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়।

এই সকল বাক্য এবং 'ভজতাং প্রীতিপূর্বক' প্রভৃতি গীতাবচন কি প্রকাশ করিতেছে? কর্মীরা সংকল্পবাক্যে যে বিষ্ণুপ্রীতিকামনার উল্লেখ করিয়া থাকেন তাহাতেই বা কি প্রকাশ পাইতেছে?

হিন্দুধর্ম বিষয়ে আর এক অমূলক প্রবাদ এই যে তাহাতে ত্যাগ স্বীকারের কথা নাই। এ সংস্কার যে অমূলক তাহা শাস্ত্রের এই শ্লোকের দ্বারা প্রমাণ হইতেছে।

ন ধনেন ন প্রজয়া ন কর্মণা ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্ত্বমানশুঃ।
শঙ্করাচার্যধৃত রচনা

ধনের দ্বারা, পুত্র দ্বারা, কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান দ্বারা অমৃত লাভ করা যায় না, কেবল ত্যাগ দ্বারা অমৃত লাভ করা যায়।

প্রাচীন হিন্দুদিগের অগ্নি প্রবেশ, প্রায়োপবেশন ও পঞ্চতপাদি কৃচ্ছ্রসাধনে এবং অধুনাতন কালের হিন্দুদিগের সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণে ধর্ম জন্য হিন্দু জাতির অসাধারণ ত্যাগ স্বীকারের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যদিও উল্লিখিত কার্য সকল নির্মল জ্ঞান প্রয়োজিত নহে; তথাপি মুক্তির জন্য হিন্দুরা কত ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন, ওই সকল কার্যের দ্বারা তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

হিন্দুধর্ম বিষয়ে আর এক অমূলক প্রবাদ এই যে হিন্দুধর্মে শত্রুর উপকার করার কথা নাই। যাহাদিগের এই সংস্কার আছে, শাস্ত্রোক্ত নিম্নোলিখিত উপদেশ তাহাদিগের দেখা আবশ্যক।

ন ক্রুধ্যন্তং প্রতিক্রুধোদাক্রুষ্টঃ কুশলংবদেৎ।

মনুসংহিতা

যদি তোমার প্রতি কেহ ক্রোধ করে, তাহার প্রতি তুমি পুনরায় ক্রোধ করিবে না। যদি কেহ তোমার প্রতি আঘাত করে, তাহাকে তুমি আশীর্বাদ করিবে অর্থাৎ তোমার ভাল হউক, এই কথা বলিবে।

অতিবাদং ন প্রবদেন্নবাদয়েৎ
যোনাহতঃ প্রতিহন্যান্ন ঘাতয়েৎ।
হন্তুং চযোনেচ্ছতিপাপকংবৈ
তস্মৈদেবাঃ স্পৃহয়ন্ত্যাগতায়।।

মহাভারত উদ্যোগ পর্ব

যিনি কঠোর বাক্য বলেন না, অথবা তাহা বলিতে অন্যকে উত্তেজিত করেন না, যে ব্যক্তি আহতহইয়াও অন্যকে আঘাত না করেন কিংবা আঘাত করিতে অন্যকে উত্তেজিত করেন না, যিনি পাপকারীকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করেন না, তাহার আগমন দেবতারা স্পৃহা করেন।

অরাবপ্যুচিতং কার্যামাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাং ছায়াং নোপসং হরতি দ্রুমঃ।।

মহাভারত আদিপর্ব

শত্রুও গৃহে সমাগত হইলে তাহার যথোচিত আতিথ্য করিবেক, বৃক্ষ তাহার ছেদকের পার্শ্বগত ছায়া কদাপি হরণ করে না।

তুমি যে রূপ ইচ্ছা করো অন্যে তোমার সম্বন্ধে করিবে, অন্যের প্রতি তোমার সেইরূপ করা কর্তব্য, ঈসার এই সুমহৎ বাক্য খ্রিস্টীয়ধর্মের প্রধান গৌরবস্থল। অনেকের এইরূপ সংস্কার আছে যে এইরূপ মহোচ্চ উপদেশ হিন্দুশাস্ত্রে নাই, কিন্তু এ সংস্কার অমূলক। মহাভারতে আছে:

শ্রূয়তাং ধর্মসর্বস্বং শ্রুত্বাচাপ্যবধার্যতাম।
আত্মনঃ প্রতিকুলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ।।

ধর্মসর্বস্ব শ্রবণ কর, এবং শ্রবণ করিয়া তাহা মনে ধারণ করিয়া রাখ। আপনার যাহা প্রতিকূল অন্যের সম্বন্ধে তাহা করিবে না।

আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।
আপনার ন্যায় যে সকল জীবকে দেখে সে যথার্থ দেখে।
আত্মৌপমেন সর্বত্রং সমং পশ্যতি যোনরঃ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী ইতি মে মতিঃ।।

ভগবদ্‌গীতা

যে ব্যক্তি সুখ কিংবা দুঃখ সম্বন্ধে আপনার ন্যায় সকলকে দেখে, সেই ব্যক্তিই আমার মতে যথার্থ যোগী।

অনেকে বলেন, হিন্দুধর্ম জাতিভেদের বিশেষ পোষকতা করে। কিন্তু একথা যথার্থ নহে। ঋগ্বেদে জাতিভেদের উল্লেখ নাই। মহাভারতে আছে।

ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টংহি কর্মণা বর্ণতাংগতং।।

এই ব্রাহ্মণময় জগতে বর্ণের বিশেষ নাই। ব্রহ্ম দ্বারা পূর্বসৃষ্ট মনুষ্য সকল কর্ম দ্বারা বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উচ্চনীচ কর্মানুসারে মনুষ্যগণ এক এক শ্রেণিতে বদ্ধ হইয়াছিল, তাহা হইতেই জাতির উৎপত্তি হয়। ভারতবর্ষে প্রথমে এক ব্যক্তির চারি পুত্রের মধ্যে বৃত্তি অনুসারে একজন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয়, একজন বৈশ্য ও একজন শূদ্র হইয়াছিলেন, এমন সকল দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। * পুরাকালে কর্ম ও চরিত্র গুণে ব্রাহ্মণ শূদ্র হইত, শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইত।

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতিশূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাৎবৈশ্যাত্তথৈবচ।।

মনু

শূদ্র ব্রাহ্মণ পদ প্রাপ্ত হয়েন এবং ব্রাহ্মণও শূদ্র পদ প্রাপ্ত হয়েন, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সন্তানের বিষয়েরও এই প্রকার জানিবে।

সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্য তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতিঃ।।
শূদ্রেতু যত্তবেল্লক্ষ্য, দ্বিজেতচ্চ না বিদ্যতে।
নবৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ।।

যত্রৈতৎ লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দিশেৎ।।
মহাভারতীয় বনপর্বান্তর্গত আজগীর পর্বাধ্যায়

সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, আনৃশংস্য, তপস্যা, দয়া এই সকল গুণ যাঁহাতে দৃষ্ট হয় তিনিই স্মৃতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হয়েন। শূদ্রেতে যে সকল লক্ষণ, ব্রাহ্মণে সে সকল বিদ্যমান নাই। লোকে শূদ্র হইলেই শূদ্র হয় না, ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্মণ হয় না। হে সর্প! যাঁহাতে উক্ত রূপ আচরণ লক্ষিত হয় তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্মৃত হয়েন। হে সর্প ! যাঁহাতে উক্ত রূপ আচরণ বিদ্যমান না থাকে তিনি শূদ্র বলিয়া নির্দেশিতব্য।

এভিস্তু কর্মভির্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা।
শূদ্রোব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ।।
এতৈঃ কর্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজোভবতি সংস্কৃতঃ।।
ব্রাহ্মণোবাপ্যসদ্বৃত্তঃ সর্বসঙ্করভোজনঃ।
ব্রাহ্মণ্যং সমুনুৎসৃজ্য শূদ্রোভবতি তাদৃশঃ।।
কর্মভিঃশুচিভির্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোঽপিদ্বিজবৎ সেব্যইতিব্রহ্মানুশাসনং।।
স্বভাবং কর্ম চ শুভং যত্র শূদ্রেঽপিতিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ সদ্বিজ্জাতের্বৈ বিজ্ঞেয়ইতি মে মতিঃ।।
ন যোনিনাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণং।।
সর্বোযং ব্রাহ্মণোলোকে বৃত্তেনচ বিধীয়তে।
বৃত্তেস্থিস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিয়চ্ছতি।।
ব্রহ্মস্বভাবঃ কল্যাণিসমঃ সর্বত্র মেমতিঃ।
নির্গুণং নির্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ।।
এতত্তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা শূদ্রো ভবেদ্দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণো বা চ্যুতোধর্মাৎ যথা শূদ্রত্বমাপ্নুতে।।
মহাভারতী অনুশাসনপর্বান্তর্গত উমামহেশ্বর সম্বাদ

হে দেবী! শূদ্র এই সকল শুভ কর্ম এবং শুভ আচরণ করিলে ব্রাহ্মণ হয়েন এবং বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের আচরণ করিলে ক্ষত্রিয় হয়েন। হে দেবী! এই সকল কর্ম করিলে অতি হীনবংশোদ্ভব শূদ্র আগমসম্পন্না সংস্কার বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ হয়েন। যে সর্বসঙ্করভোজনকারী ব্রাহ্মণ অসচ্চরিত্র হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ্য পরিত্যাগ পূর্বক শূদ্র হয়েন। হে দেবী! কর্ম দ্বারা জিতেন্দ্রিয় শুদ্ধচিত্ত যে শূদ্রসন্তান তিনি শুচি ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজনীয়, এই ব্রহ্মের অনুশাসন। শূদ্রসন্তান যদি শুভ কর্ম এবং উত্তম স্বভাববিশিষ্ট হয়েন, তবে তিনি দ্বিজ অপেক্ষা নিশ্চিত শ্রেষ্ঠ ; ইহা

আমার অভিপ্রায় জানবে। উত্তমকূলে জন্ম, সংস্কার, বেদ পাঠ, এবং উত্তমের সন্তান হইলে ব্রাহ্মণ হয় না ; যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র, সেইব্রাহ্মণ। চরিত্রের দ্বারা সকলে, ব্রাহ্মণ হয়, অতএব শূদ্র সচ্চরিত্র হইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। হে কল্যাণি! ব্রহ্মের স্বভাব সর্বত্র সমান, এই আমার অভিপ্রায় ; অতএব নির্গুণ নির্মল ব্রহ্ম যাঁহার হৃদয়ে ধৃত হয়েন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যে প্রকারে শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়েন এবং ব্রাহ্মণ ধর্মভ্রষ্ট হইলে যে প্রকারে শূদ্র হয়েন, এই গুহ্য বাক্য তোমাকে কহিলাম।

হিন্দুদিগের মধ্যে চিরপ্রচলিত উক্ত ভাবানুসারে বেদে উল্লিখিত কবস ঋষি শূদ্র হইয়াও এবং পুরাণে উল্লেখিত বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং লোমহর্ষণ সূত জাতীয় হইয়াও ঋষিদিগের শ্রদ্ধেয় হইয়াছিলেন এবং তাহাদিগের দ্বারা ভারতবক্তা পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পুরাকালে প্রচলিত অসবর্ণ-বিবাহে, পরস্পর ভোজ্যান্নতার নিয়মে ও সমুদ্রযাত্রা রীতিতেও প্রকাশ হইতেছে যে অধুনাতন কালের ন্যায় প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে জাতিভেদের নিয়ম এরূপ কঠোর ছিল না। এখনও বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলে কোনো কোনো ভদ্রজাতির মধ্যে অসবর্ণ-বিবাহ প্রচলিত আছে।

হিন্দু ধর্মের বিষয়ে এই সকল অমূলক সংস্কারের অমূলকত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহা অন্যান্য ধর্মাপেক্ষা কী কী বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথমত, সাধারণ হিন্দু ধর্ম অন্য ধর্ম অপেক্ষা কী কী বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তাহা দেখাইব। তাহার পর সমর্থাধিকারীদিগের ধর্মের অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব।

প্রথমত, হিন্দু ধর্মের নাম কোনো ব্যক্তি-বিশেষের নাম মূলক নহে। যেমন বৌদ্ধ, খ্রিস্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম বুদ্ধ, খ্রিস্ট ও মহম্মদের নামে প্রচলিত, হিন্দু ধর্ম তেমন কোনো ব্যক্তি বিশেষের নামে প্রচলিত নহে। ইহা দ্বারা হিন্দু ধর্মের প্রশস্ততা প্রমাণীকৃত হইতেছে। ধর্ম সনাতন পদার্থ, তাহার নাম কোনো ব্যক্তির নামে হওয়া উচিত নহে। এই জন্য হিন্দুরা আপনারদিগের ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলিয়া ডাকেন এবং কোনো ব্যক্তির নাম আপনাদিগের ধর্মের নামকরণ করেন নাই।

দ্বিতীয়ত, হিন্দু ধর্ম ব্রহ্মের অবতার স্বীকার করে না। হিন্দু ধর্মে বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতার বহুল অবতারের কথা কথিত হইয়াছে কিন্তু তাহা এমন বলে না যে অনাদ্যনন্ত নির্বিকার পরব্রহ্ম কোনো মানবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। উপনিষদে ব্রহ্মসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে:

নজায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
নায়ং কুতশ্চিন নবভুব কশ্চিৎ।

পরমাত্মা জন্মেন না, মরেন না, এই সকল বস্তুর মধ্যে তিনি কোনো বস্তুই নহেন এবং তিনি কোনো বস্তুও হয়েন নাই।

এই ভাব সমস্ত হিন্দু ধর্মে রক্ষিত হইয়াছে। শাস্ত্রে অত্যুক্তিস্থলে কোনো দেবতা অথবা দেবাবতারকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রের কোনো স্থানে এমন উল্লেখ নাই, যে নিরাকার নির্বিকার পরব্রহ্ম মনুষ্য উদরে জন্মগ্রহণ ও মানব আকার ধারণ করিয়াছিলেন।

তৃতীয়ত, হিন্দু ধর্ম কোনো মধ্যবর্তী অর্থাৎ পেয়গম্বর স্বীকার করে না। খ্রিস্টানেরা যেমন প্রত্যেক প্রার্থনার শেষে, 'Through Jesus Christ our Lord and Saviour' 'প্রভু ও পরিত্রাতা ইশু দ্বারা তুমি আমাকে পরিত্রাণ করো' বলে হিন্দুরা সে প্রকার বলেন না। নবি অর্থাৎ পেয়গম্বরে বিশ্বাস শেমীয় * ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে অর্থাৎ ইহুদী, খ্রিস্টিয়ান ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। পেয়গম্বরে বিশ্বাস ওই সকল ধর্মের বিশেষ লক্ষণ। একটি বিশেষ ব্যক্তি মাত্র আমারদিগকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যাইতে পারেন, তিনিই ঈশ্বরের নিকট যাইবার একমাত্র পথ, এরূপ ব্যক্তিকে পেয়গম্বর বলে। এরূপ ব্যক্তিকে ঈশ্বর ও আপনি এই দুয়ের মধ্যে রাখিয়া ঈশ্বরকে উপাসনা করিবার রীতি হিন্দুদিগের মধ্যে নাই। 'মুসলমানেরা এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে উপদেশ দেয় কিন্তু বলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদকে না মানিলে মুক্তিলাভ হইবে না। কেহ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেও মহম্মদের অনুমোদন ব্যতীত ঈশ্বর তাঁহাকে মুক্তি দিতে পারিবেন না। মৃত্যুর পর শেষ বিচারের দিন মহম্মদ বলিবেন, আমি ইহাকে চিনি না, ঈশ্বর অমনি তাহাকে নরকে নিক্ষিপ্ত করিবেন। খ্রিস্টিয়ানদিগের মধ্যেতেও কেহ কেবল ঈশ্বরকে আরাধনা করিলে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না, খ্রিস্টকেও মানা চাই। এক ব্যক্তি বলিলেন আমি ঈশ্বরের সমুদায় আজ্ঞা পালন করিয়াছি, আমার উদ্ধার হইবে কি না? খ্রিস্টানদিগের মতে তাহার মুক্তি হইবে না, 'খ্রিস্টকে না মানিলে ঈশ্বর মুক্তি দিবেন না' * কিন্তু আমারদিগের শাস্ত্রকারেরা কেবল ব্রহ্মজ্ঞানকে মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন; মুক্তিলাভ জন্য কোনো মধ্যবর্তীর উপাসনা আবশ্যক করে না।

চতুর্থত, আর একটি বিষয়ে হিন্দু ধর্ম অন্যান্য ধর্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহা এই, ইহাতে ঈশ্বরকে হৃদয়স্থিত জানিয়া উপাসনা করিবার উপদেশ আছে। কী বাইবেল, কী কোরান, কী আর কোনো ধর্ম শাস্ত্র, কোথাও এরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এইটি হিন্দু ধর্মের প্রধান গৌরব স্থল। ঈশ্বরকে হৃদয়স্থিত করিয়া দেখিলে ঈশ্বরকে যেমন নিকট করিয়া দেখা হয় তেমন অন্য প্রকারে দেখা হয় না।

পঞ্চমত, হিন্দু ধর্ম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ যে ইহাতে ঈশ্বরের সহিত যোগের উপদেশ আছে। যোগের বিষয় হিন্দু শাস্ত্রে যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচারিত, নিয়মিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এমন আর কোনো জাতির ধর্মশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি সে যোগের কথা বলিতেছি না যাহাতে সংসার ত্যাগ করিয়া বনে যাইতে হয়। যে যোগ সংসারে থাকিয়া হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ যোগ। হিন্দু শাস্ত্রের এক স্থানে এই প্রকার

যোগের একটি সুন্দর উপমা আছে:

পুঙ্খানুপুঙ্খবিষয়েক্ষনুতৎ পরোপি।
ধীরোন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দং।।
সঙ্গীতনৃত্যকতিতানবশংগতাপি।
মৌলিস্থকুম্ভপরিরক্ষণধীর্নটীব।।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত ভাগবতের টীকা

যেমন সুধীরা নটী সঙ্গীত, নৃত্য ও কত প্রকার তানের বশবর্তী হইয়াও মস্তকস্থিত কুম্ভ পতিত হইতে দেয় না, তদ্রূপ ধীর ব্যক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিয়াও মুক্তিদাতা ঈশ্বরের পদারবিন্দ পরিত্যাগ করেন না।

এ বিষয়ে একটি চমৎকার গল্প হিন্দু সমাজ মধ্যে প্রচলিত আছে। ব্যাসপুত্র শুকদেব পিতার নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ প্রার্থনা করাতে, ব্যাস উত্তর করিলেন, তুমি রাজর্ষি জনকের নিকটে যাও, তাঁহার নিকট হইতে ওই বিষয়ে উত্তম উপদেশ পাইবে। শুকদেব জনকালয়ে উপস্থিত হইলেন কিন্তু জনককে ঐশ্বর্যসম্ভোগী ও রাজ কার্যে অত্যন্ত ব্যস্ত দেখিয়া বিরক্ত হইলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন এমন বিষয়ী ব্যক্তি কীরূপে আমাকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিবেন। জনক তাঁহার মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া যথোচিত অভ্যর্থনা পূর্বক একটি তৈলপূর্ণ পাত্র তাহার হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন এই তৈল পাত্র হস্তে লইয়া তুমি সমস্ত নগর ভ্রমণ করিয়া আইস কিন্তু দেখিও যেন বিন্দু মাত্র তৈল ভূমিতে পতিত না হয়। শুকদেব তাহাই করিলেন। যথোচিত যত্নসহকারে তৈলপাত্র হস্তে ধারণ করিয়া সমস্ত নগর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ফিরিয়া আইলে জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, নগরে কী দেখিলে। শুক যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিলেন তৎপরে রাজর্ষি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন তৈল পতিত হইয়াছিল? শুকদেব উত্তর করিলেন, একবিন্দুও পড়ে নাই। জনক বলিলেন, এইরূপ মনোনিবেশ সহকারে সমস্ত সাংসারিক কার্য করিতে পারা যায়, অথচ এক মুহূর্তের জন্যও ব্রহ্মের সহিত যোগ স্খলিত হয় না।

ষষ্ঠত, হিন্দু ধর্মের আর একটি চমৎকার লক্ষণ এই যে তাহাতে নিষ্কাম উপাসনার বিধি আছে। হিন্দু ধর্মে সকাম নিষ্কাম, দুই প্রকার উপাসনারই বিধি আছে কিন্তু অন্যান্য ধর্মে আদোবে নিষ্কাম উপাসনার কথা নাই। হিন্দুশাস্ত্র নিষ্কাম উপসনাকে শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়াছেন। অন্য সকল ধর্মে কেবল পারলৌকিক সুখ প্রত্যাশায় ধর্মানুষ্ঠানের বিধান দৃষ্ট হয় কিন্তু হিন্দু ধর্মের প্রধান উপদেশ এই যে কোনো ফল কামনা না করিয়া কেবল ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। ধর্মের নিমিত্তই ধর্ম সাধন করিবে। উপনিষদে উক্ত আছে:

উপাসতে পুরুষংহ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্তন্তি ধীরাঃ।

যে ধীর ব্যক্তি নিষ্কাম হইয়া সেই পরম পুরুষের উপাসনা করেন তাঁহার জন্ম হয় না।

যাহারা বিবিধ যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকেও কর্মের শেষে 'এতৎ কর্ম ফলং ব্রহ্মার্পণমস্তু' বলিয়া কর্মফল ত্যাগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি ফলাকাঙক্ষা করিয়া ধর্ম কর্ম করে সে এক প্রকার ধর্মবণিক ; তাহার ধর্ম অতি হেয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বণিক যেমন মূল্যের বিনিময়ে দ্রব্য দেয়, সেইরূপ এতাদৃশ ধার্মিক ব্যক্তি পারলৌকিক সুখের বিনিময়ে ঈশ্বরকে ভক্তি ও প্রীতি প্রদান করেন। কামনা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণ করিবার নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্রে ভুয়ো ভুয়ঃ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমনকী, এমন সামান্য গ্রন্থ যে বাংলা ভাষায় কাশীদাস কৃত মহাভারত তাহাতেও ইহার উপদেশ আছে। যুধিষ্ঠির কহিতেছেন :

আমি যত কর্ম করি ফলাকাঙক্ষা নাই।
সমর্পণ করি সব ঈশ্বরের ঠাই।।
কর্ম করি যেই জন ফলাকাঙক্ষী হয়।
বণিকের মতো সেই বাণিজ্য করয়।।
ফললোভে কর্ম করে গরু বলি তরে।।
লোভে পুনঃ পনঃ যায় নরক দুস্তরে।।
ধর্ম কর্ম করি ফলাকাঙক্ষা নাহি করে।
ঈশ্বরেরে সমর্পিলে অবহেলে তারে।।
ধর্মফল বাঞ্ছা করি ধর্ম গর্ব করে।
ধর্মেরে করিয়া নিন্দা অধর্ম আচরে।।
এইসব জনেরে পশুর মধ্যে গণি।
বৃথা জন্ম যায় তার পায় পশু যোনি।।

সপ্তমত, হিন্দু ধর্ম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা আর এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এই, উহাতে সর্বভূতের প্রতি দয়া করিবার উপদেশ আছে। বাইবেল ও কোরাণে কেবল মনুষ্যের প্রতি দয়া করিতে উপদেশ দেয়। হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ এই যে সর্বভূতের হিত সাধন করিবে। হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের দৃষ্টি এই বিষয়ে কেবল মনুষ্যের প্রতি নিবদ্ধ ছিল না। পশু পক্ষী জীব মাত্রেই উহা বিস্তারিত ছিল। মাহিংস্যাৎ সর্বভূতানি, সর্বভূত হিতে রতঃ ইত্যাদি বাক্য ইহার প্রমাণ।

অষ্টমত, পরকালসম্বন্ধীয় মতে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষ প্রকাশিত আছে। যোনিভ্রমণ অর্থাৎ পাপী মনুষ্য মৃত্যুর পর পশু যোনিতে অথবা কীটযোনিতে অথবা মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে, এইমত পরকাল বিষয়ক হিন্দু ধর্মমতেও নিকৃষ্ট অংশ। কিন্তু দেখ ইহাতেও হিন্দু ধর্মের কেমন শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ পাইতেছে। মুসলমান ও খ্রিস্টান ধর্মে অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত নরকের কথা আছে। পুণ্যবান ব্যক্তি অনন্তকাল স্বর্গভোগ করিবে, পাপী ব্যক্তি

অনন্তকাল নরকে পতিত থাকিবে। ইহাতে পাপী মনুষ্যের আর পরিত্রাণের আশা থাকে না। কিন্তু হিন্দু ধর্ম এই আশা প্রদান করিতেছেন যে যোনিভ্রমণ দ্বারা পাপী ব্যক্তির পাপ ক্ষয় হইলে সে পুনরায় উন্নতির পথে সংস্থাপিত হইবে। এ মত সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, কিন্তু উহা যে পূর্বোল্লিখিত মত অপেক্ষা ঈশ্বরের ন্যায় ও করুণাভাবের সঙ্গে অধিক সঙ্গত তাহার আর সন্দেহ নাই। পুণ্যবান ব্যক্তি এক লোক হইতে উৎকৃষ্টতর লোকে গমন করিবেন, পরকাল বিষয়ে হিন্দু ধর্মমতের এই উৎকৃষ্ট অংশে তাহার বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাইতেছে। আত্মার এই প্রকার ক্রমশ উন্নতি স্বভাবের উন্নতিশীলতার সহিত সুসঙ্গত। হিন্দু ধর্মের মত এই যে আত্মা এক লোক হইতে উৎকৃষ্টতর লোকে গমন করিবে যে পর্যন্তনা সে ব্রহ্মালোক প্রাপ্ত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের এক স্থানে এই ব্রহ্মালোকের চমৎকার বর্ণনা আছে:

> নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ ন জরা ন মৃত্যুর্নশোকো ন সুকৃতং ন
> দুষ্কৃতং। সর্বেপাপ্মানোঽতোনিবর্তন্তে। অপহতপাপমাহ্যেষ ব্রহ্মালোকঃ।
> তস্মাদ্বাএতং সেতুং তীর্ত্বা অন্ধসন্নন্ধোভবতি বিদ্ধঃসন্নবিদ্ধোভবতি উপতাপী
> সন্ননুতাপী ভবতি। তস্মাদ্ধা এতং সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তম হরেবাভিনিষ্পদ্যতে।
> সকৃদ্বিভাতোহ্যেবৈষব্রহ্মালোকঃ।

এই আত্মার সেতুর এপারে দিনরাত্রি নিয়মিত হইতেছে, ওপারে দিনও নাই রাত্রিও নাই, সুকৃতিও নাই দুষ্কৃতিও নাই; ইহা পুণ্য-জ্যোতিতে সদা পবিত্র রহিয়াছে। জীব ইহার ওপারে উত্তীর্ণ হইলে পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, এই নিষ্পাপ ব্রহ্মালোক। এই সেতুর পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া যে অন্ধ সে অনন্ধ হয়, যে সংসারের দুঃখ ক্লেশে বিদ্ধ সে অবিদ্ধ হয়, যে পাপে ও দোষে উপতাপী সে অননুতাপী হয়। এই সেতুকে উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি, দিনের সমান আলোকধারণ করে। এই ব্রহ্মালোক, ইহার দিবালোক কখন অস্ত হয় না, ইহার প্রকাশ ও নির্বাণ হয় না; ইহা সদাই প্রকাশিত রহিয়াছে।

নবমত, হিন্দু ধর্মের ঔদার্য সর্ব ধর্মাপেক্ষা অধিক। খ্রিস্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্মাবলম্বীরা বলে যে আমার এই ধর্মটি না মানিলে তুমি অনন্ত নরকে পড়িবে, হিন্দুধর্মের ভাব তেমন নয়। হিন্দু ধর্মের মুখ্য উপদেশ এই যে, যাহার যে ধর্ম সে ব্যক্তি সেই ধর্ম সর্ব প্রকারে পালন করিলেই উদ্ধার হইবে। সকল হিন্দুরই এই বিশ্বাস। ভট্টাচার্যমহাশয়েরা যে মহিম্নস্তব নিত্য পাঠ করেন, তাহাতে আছে:

> রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
> নৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণবইব।

রুচির ভেদানুসারে ঋজু কুটিল পথ দিয়া মনুষ্য সর্বশেষে তোমাকে লাভ করে, যেমন নদী সকল যে যেরূপ পথ দিয়া যাউক না কেন, শেষে সাগরে গিয়া মিলিত হয়।

এরূপ ঔদার্যভাব আর কোন্ ধর্মে পাওয়া যায়? বর্ণাশ্রমাচারবিহীন লোকেরাও হিন্দুদিগের নিকট হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইত। বেদান্তসূত্রে আছে 'অন্তরা চাপিতু তদ্দৃষ্টে' 'রৈক্য বাচক্লবি প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাচারবিহীন লোকেরাও ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী ইহার প্রমাণ বেদে দৃষ্টে হয়।' কেবল যে বর্ণাশ্রমাচারবিহীন হিন্দুরাই পরিত্রাণের অধিকারী, এমন নহে, কিরাত যবন প্রভৃতি অনার্যজাতীয়েরা যাহারা আর্যদিগের প্রতি সর্বদা বিদ্রোহাচরণ করিত এবং সর্বদা তাহাদের ধর্মের বিঘ্ন উৎপাদন করিত, তাহাদিগকেও তাঁহারা একেবারে ধর্মাধিকারে বঞ্চিত অথবা ঈশ্বরের পরিত্যাজ্য, এমন বিবেচনা করিতেন না। এক স্থানে এরূপ স্পষ্ট উক্তি আছে:

কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসাআবীরকঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেন্যেচপাপাযদ পাশ্রয়াশ্রয়াঃ পুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ।।

শ্রীমদ্ভাগবত

কিরাত, হুন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আবীর, কঙ্ক, যবন, খস প্রভৃতি লোক এবং অন্যান্য পাপাচারী ব্যক্তিরা যাহার আশ্রয় লইয়া শুদ্ধ হয়, সেই বিষ্ণুকে আমি নমস্কার করি।

দেখ ইহাতে হিন্দু ধর্মের কী ঔদার্য প্রকাশ পাইতেছে। এমন ঔদার্য্য আর কোনো ধর্মে আছে? দরাপ খাঁ নামক একজন মুসলমানের বিরচিত গঙ্গাস্তব বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণেরা গঙ্গা স্নানের সময় পাঠ করিয়া থাকেন। ইহা ওই ঔদার্যের অন্যতর প্রমাণ। কোন্ খ্রিস্টিয়ান বেদোক্ত ঈশ্বরস্তব উপাসনার সময় পাঠ করিয়া থাকেন? হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন তাঁহারা দেব দেবীর পূজা অর্চনা ও যাগ যজ্ঞ করিতেন না কিন্তু যাহারা তাহা করিত তাহাদিগকে তাঁহারা কনিষ্ঠ অধিকারী বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা তাহাদিগকে স্বধর্মভুক্ত বলিয়া গণ্য করিতেন, কখনও তাহাদিগকে স্বধর্ম হইতে পৃথক বা বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন না। কিন্তু মুসলমান ও খ্রিস্টীয়ধর্মের ভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলমানেরা বলে, পৌত্তলিক দেখ্ আর কাট্। খ্রিস্টানেরা বলে হিন্দুরা যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির পূজা করে, তাহার দ্বারা তাহারা ঈশ্বরের পূজা করে না, শয়তানের পূজা করে। শয়তান ওই সকল দেবতার ভেতরে বাস করে। এ সকল কথা নিতান্তই অসঙ্গত ও অনৌদার্য-প্রসূত। যাহারা পুত্তলিকার পূজা করে, তাহারা ব্রহ্মকে না জানিয়াই পুত্তলিকাকে ব্রহ্মের স্থানীয় করিয়া পূজা করে। নাস্তিকতা অপেক্ষা পৌত্তলিকতা ভাল। ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে দেবদেবীর উপাসনা করা অকর্তব্য, কিন্তু পৌত্তলিকদের পৌত্তলিকতা পাপ কর্ম নহে, তাহা কেবল ভ্রম মাত্র। বস্তুত সকল লোকের বুদ্ধি, জ্ঞান ও ধারণাশক্তি সমান নহে। সমুচিত চর্চার ত্রুটি, উপদেশের অভাব ও বুদ্ধি ও ধারণ শক্তির বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত অনেকে ব্রহ্মকে অনেক

প্রকারে ভাবনা করে। ইহার মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতা প্রযুক্ত অনীশ্বরে ঈশ্বর জ্ঞান করিবে অথবা কল্পিত দেব দেবীকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরাংশ বোধে পূজা করিবে, ইহার বিচিত্রতা কী? এই সকল লোককে এক সম্প্রদায় ভুক্ত করিয়া রাখা এবং উপদেশাদি দ্বারা তাহাদের অজ্ঞানতা মোচন ও জ্ঞানের উন্নতি সাধন করা কর্ত্তব্য এই মত হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করিতেছে ভিন্ন আর কী বলা যাইতে পারে? আর বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে স্বভাবের সঙ্গে এই মতের সম্পূর্ণ মিল আছে। ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়াই মনুষ্য ব্রহ্মের অচিন্ত্য অনন্ত স্বরূপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। অতএব দেব দেবীর পূজা ব্রহ্ম-জ্ঞানের সোপান স্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবে। কিন্তু যাহারা এই সোপান অবলম্বন করে তাহাদের প্রতি এই উপদেশ অবশ্যক হয় যে চিরকাল তোমরা সোপানে থাকিও না, ছাদে উঠ। কিন্তু তাহারা যে ধর্ম বহির্ভূত লোক তাহা কখনোই বলা যাইতে পারে না।

দশমত, হিন্দু ধর্ম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ যে এই ধর্মে জীবনের প্রত্যেক কার্যে ঈশ্বরের স্মরণ করিবার বিধান দেখা যায়।

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে :

ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনেচ জনার্দনং।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহেচ প্রজাপতিং।
যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসেচ ত্রিবিক্রমং।
নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে।
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং শঙ্কটে মধুসূদনং।
কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনং।
জলমধ্যে বরাহঞ্চ পর্বতে রঘুনন্দনং।
গমনে বামনঞ্চৈব সর্বকার্যেষু মাধবং।।

শব্দকল্পধৃত বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ

প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়হ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ
যৎকরোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনং।

কৃষ্ণানন্দ সঙ্কলিত তন্ত্র সার

হে জগন্মাতঃ! প্রাতঃকালে উঠিয়া সাংয়কাল পর্যন্ত এবং সায়ংকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত যাহা আমি করি তাহা তোমার পূজা স্বরূপ।

মূলার্থ এই যে-কোনো কার্যে ঈশ্বরকে ত্যাগ করিবে না। ঈশ্বরকে স্মরণ না করিয়া কোনো কার্য করিবে না। হিন্দুরা সামান্য পত্র লিখিতে হইলে ঈশ্বরের নামে তাহা আরম্ভ করেন। এমন ধর্মপরায়ণ জাতি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

একাদশত, অন্যান্য ধর্মাপেক্ষা হিন্দু ধর্ম এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ যে হিন্দুদিগের সকল কার্য

ধর্মের অনুশাসনানুসারে সম্পাদিত হয়। কোনো মহাশয় ব্যক্তি যথার্থই বলিয়াছেন যে 'হিন্দুগণ ধর্মানুসারে আহার করে, ধর্মানুসারে পান করে, ধর্মানুসারে নিদ্রা যায়।' হিন্দু ধর্ম শরীর, মন, আত্মা, সমাজ ইহার কাহাকেও অবজ্ঞা করে না। প্রথমত, শরীর পালন অর্থাৎ স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে ইহাতে যেমন উপদেশ ও যেমন অনুশাসন পাওয়া যায় তেমন আর অন্য কোনো ধর্মে পাওয়া যায় না। শারীরিক নিয়ম পালন করা কর্তব্য, শারীরিক নিয়ম পালন না করিলে ধর্ম সাধনের বিশেষ ব্যাঘাত হয় এই ভাব হিন্দু ধর্মে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। এমনকি, ওই উপদেশ সামান্য কাব্যেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনং'। শরীর সুস্থ থাকিলে মন সুস্থ থাকে, মন সুস্থ থাকিলে তাহা ধর্মসাধনের অনুকূল হয়। শরীরের সঙ্গে মনের বিলক্ষণ যোগ আছে। মদ্যপান ও মাংস ভোজন করিলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রবল হয় অতিভোজন করিলে বুদ্ধির জড়তা হয়। ইহা সকলেই অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন। এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষত তদন্তর্গত যোগ শাস্ত্রে আহারের নিয়ম সকল কথিত হইয়াছে। ভগবদগীতাতে উক্ত হইয়াছে, 'যুক্তহার বিহারশ্চ যুক্ত চেষ্টশ্চ ক। যুক্তস্বপ্নাববোধশ্চ যোগো ভবতি দুঃখহ।' 'যুক্ত আহার, যুক্ত বিহার, যুক্ত চেষ্টা, যুক্ত কর্ম, যুক্ত নিদ্রা ও যুক্ত জাগরণকে দুঃখহারী যোগ বলে।' হিন্দু ধর্মে এই রূপে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের সহিত ধর্মের যোগ স্থাপন করা হইয়াছে। বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তিরা এইরূপ ব্যবস্থাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। এই রূপে রাজনীতি, সামরিক নীতি, সামাজিক নীতি ও গার্হস্থ্য নীতি, সকলই ধর্মের অঙ্গ করিয়া লওয়া হইয়াছে। ব্যাকরণ ও জ্যোতির্বিদ্যারও ধর্মের সহিত সংশ্রব রহিয়াছে। অন্যান্য সভ্য দেশে যেমন সাত্ত্বিক ও বৈষয়িক * দুই প্রকার শাস্ত্র বিভাগ আছে হিন্দুদিগের মধ্যে সেরূপ নাই। হিন্দু ধর্ম শরীর, মন, আত্মা, সমাজ কাহাকেও অ বজ্ঞা না করাতে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রকৃত সভ্যতা অর্থাৎ ধর্মোৎপাদ্য সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল। এক্ষণে যে সভ্যতা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা নিতান্ত অসার। বাহিরে চাকচিক্য, ভিতরে উৎকৃষ্ট উৎকট পাপ। ইহা কৃত্রিম সভ্যতা। ধর্মোৎপাদ্য সভ্যতাই যথার্থ সভ্যতা। ভারতবর্ষ এককালে এরূপ সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল যাঁহারা আলেকজান্ডারের সহিত ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে স্ট্রেবো নামক গ্রিক ভূগোল লেখক তাঁহার লিখিত ভূগোলের উপকরণ সংগ্রহ করেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থান্তর্গত ভারতবর্ষের বৃত্তান্তে এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে ভারতবর্ষের লোকদিগের দ্বারে কুলুপ দিবার ও দেনাপাওনায় অঙ্গীকার পত্রের আবশ্যকতা হয় না। পুরাকালে ধর্মযুদ্ধের কী চমৎকার নিয়ম ছিল! এরূপ সাধুতা থাকিলেই যথার্থ সভ্যতা হয়। এই সভ্যতার কাল যখন পুনরাগমন করিবে ও উন্নত আকারে পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইবে তখন পৃথিবীর এক নূতন শ্রী হইবে।

দ্বাদশত, অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা হিন্দু ধর্ম অতিশয় প্রাচীন। মনুষ্যের পুরাবৃত্তের অভ্যুদয়ের পূর্বে এই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহা খ্রিস্টীয়োন ধর্ম অপেক্ষা প্রাচীন, বৌদ্ধ ধর্ম ইহার

বিদ্রোহী সন্তান, ইহার তুলনায় মহম্মদীয় ধর্ম ত সে দিনের। ইহা মনুষ্যের পুরাবৃত্তের অভ্যুদয়ের পূর্ব হইতে অদ্যাপি বর্তমান হইয়াছে, ইহাতে প্রতীত হইতেছে যে ইহাতে এমন কোনো পদার্থ আছে, যাহা মনুষ্যের হৃদয়কে অতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত অধিকার করিয়া রাখিতে পারে। এই দীর্ঘকালস্থায়ী ধর্ম হইতে কত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে ও হইতেছে। এই এক এক সম্প্রদায়ের ধর্ম আবার এক এক অতি বিস্তৃত ধর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নর্মদা তীরস্থ কবীর বটের সহিত হিন্দু ধর্মের তুলনা হইতে পারে। ওই বটবৃক্ষ কত প্রাচীন, উহার এক এক শাখা আবার এক এক বৃহৎ বৃক্ষ হইয়াছে। অত্যন্ত প্রাচীন হইলে যেমন লোকে দুর্বল ও বুদ্ধিহীন হয়, হিন্দু ধর্ম সেরূপ নহে, উহার স্বীয় নব যৌবন সম্পাদনের ক্ষমতা আছে। উহার আভ্যন্তরিক সারবত্তা আছে। উহা কবীর বটের ন্যায় নবপল্লবিত ও মুকুলিত হইবার ক্ষমতা ধারণ করে। লোক সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, উহা বুদ্ধিবৃত্তিচরিতার্থকারী নূতন আকার ধারণ করিতে পারে। এই আভ্যন্তরিক সারবত্তা জন্য উহাকে অন্য ধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে।

সাধারণ হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া এক্ষণে হিন্দুদিগের সার ধর্ম ব্রহ্ম জ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা যাহা জ্ঞান কাণ্ড বলিয়া আখ্যাত তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহাকে হিন্দুরা সমর্থাধিকারীর ধর্ম আর দেব দেবীর উপাসনা কনিষ্ঠাধিকারীর ধর্ম বলিয়া থাকেন।

জ্ঞান কাণ্ডের লক্ষ্য সাক্ষাৎ ব্রহ্মের উপাসনা। ব্রহ্মের উপাসনা ঈশ্বরধারণে সমর্থ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে বিহিত হইয়াছে। ব্রহ্ম কীরূপ ও তাঁহার উপাসনা কীরূপে করিতে হইবে, তাহা উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। সকল শাস্ত্রে জ্ঞানের কথা আছে কিন্তু বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদ জ্ঞানকাণ্ডের প্রধান গ্রন্থ। জ্ঞানকাণ্ডে ঈশ্বরের বিষয় যেরূপ উপদেশ আছে, তাহার তুল্য উপদেশ, অন্য কোনো জাতির ধর্ম গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বাইবেল ও কোরাণে এইরূপ উপদেশ আছে যে ঈশ্বর জগতের কোনো বিশেষ স্থানে অর্থাৎ স্বর্গে বিশেষরূপে প্রকাশমান আছেন। কিন্তু হিন্দুদিগের জ্ঞান শাস্ত্রে বলে যে তিনি 'বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং' তিনি সর্বত্র বিরাজমান্ আর তিনি অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। বাইবেলের মত এই যে ঈশ্বর স্বর্গের উপর এক স্থানে সিংহাসনে বসিয়া আছেন আর খ্রিস্ট তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিয়া আছেন। জ্যোতির্বেত্তারা নিরূপণ করিয়াছেন যে সূর্য যেমন আমাদের সৌর জগতের অবলম্বন তেমনি এমন এক নক্ষত্র আকাশে আছে, যাহা সমস্ত জগতের অবলম্বন। তাহার চতুর্দিকে আমাদের সূর্য স্বীয় অধীনস্থ গ্রহ উপগ্রহ লইয়া ভ্রমণ করিতেছে। ডিক্ নামে আমেরিকার এক জন ধর্মোপদেষ্টা ওই নক্ষত্রকে ঈশ্বরের বিশেষ বাসস্থান অর্থাৎ স্বর্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন হিন্দু জ্ঞানীরা এরূপ ভ্রমে কখনও পতিত হয়েন নাই।

জ্ঞান কাণ্ডের এক প্রধান উপদেশ এই যে মনুষ্য মধ্যবর্তীর সহায়তা না লইয়া

অব্যবহিতরূপে ঈশ্বরকে দর্শন করিবে :

জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্বস্ততস্তুতং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।

মুণ্ডকোপনিষৎ

জ্ঞানশুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া নিরবয়ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তিসূরয় দিবীব চক্ষুরাততম্।

ঋগ্বেদ

চক্ষু যেমন প্রসারিত আকাশকে দেখে, সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে জ্ঞানীরা সেইরূপ দেখেন।

জ্ঞানকাণ্ডের গ্রন্থ সকল পাঠ করিলে বোধ হয়, যে তাহাদিগের প্রণেতাদিগের মধ্যে কাহারো-কাহারো আপ্ত বাক্যে অন্ধ নির্ভর ছিল না। কঠঋষি বলিয়াছেন :

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ্বণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তণুং স্বাং।

পরমাত্মাকে প্রকৃষ্ট বচন অর্থাৎ বেদিক বচন দ্বারা অথবা উত্তম মেধা দ্বারা অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি তাঁহাকে প্রার্থনা করে সেই তাঁহাকে পায়, তাহারই আত্মাতে তিনি আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।

শ্বেতাশ্বতর ঋষি বলিয়াছেন :

যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যত।

যে ইহাকে না জানে, ঋক্ বাক্যে তাহার কী করিবে?

মুণ্ডক ঋষি বলিয়াছেন :

তত্রাপরা ঋগ্বেদে যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ। শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তংছন্দোজ্যোতি মিতি। অথপরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ এ সকল অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, আর যে বিদ্যা দ্বারা অবিনাশী পরব্রহ্মকে জানা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন :

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোবিনির্ণয়ঃ
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।

কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া কোনো তত্ত্ব নির্ণয় করা উচিত হয় না। যুক্তিহীন বিচারে ধর্মের হানি হয়।

ভগবদ্‌গীতাতে আছে:

যদাতে মোহ কলিলং বুদ্ধিব্যতিচরিষ্যতি।
তদাগন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্যচ।।

যখন তোমার বুদ্ধি মোহ সমূহের অতীত হইবে তখন তুমি শ্রোতব ও শ্রুতি সম্বন্ধে বৈরাগ্য লাভ করিবে।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণান্তর্গত উত্তরগীতাতে আছে:

গ্রন্থমভাস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদগ্রন্থমশেষতঃ।।
উল্কাহস্তো যথা কশ্চিৎ দ্রব্যমালোক্য তাংত্যজেৎ
জ্ঞানেন জ্ঞেয়নালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেৎ।।
যথাঽমৃতেন তৃপ্তস্য পয়সাকিং প্রয়োজনং
এবং তৎপরমং জ্ঞাত্বা বেদে নাস্তি প্রয়োজনং।।

যেমন ধান্যার্থী ব্যক্তি তৃণসহ ধান্যেরধান্যমাত্র গ্রহণ করিয়া তৃণগণকে পরিত্যাগ করে তেমন মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপর ব্যক্তি গ্রন্থ অভ্যাস করিয়া অশেষ গ্রন্থ নিচয় পরিত্যাগ করিবে। যেমন কোনো মনুষ্য উল্কা হস্তে লইয়া প্রার্থিত দ্রব্য দর্শনান্তর হস্তস্থিত উল্কা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞেয় ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া জ্ঞানের গ্রন্থ পশ্চাৎ পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি অমৃতপান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে তাহার যেমন জলে প্রয়োজন নাই, তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তি পরম পদার্থকে জানিলে তাঁহার বেদে প্রয়োজন নাই।

পুনরায়:

বিজ্ঞেয়োঽক্ষর সন্মাত্রো জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলং।
বিহায় সর্বশাস্ত্রানি যৎ সত্যৎ তদুপাস্যতাং।।

জীবিতকালকে অতি চঞ্চল জানিয়া সমস্ত শাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক সৎস্বরূপ ক্ষয়বিরহিত সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করিবে।

পুনরায় :

অনন্ত শাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং, স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং. হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বু মিশ্রং।।

শাস্ত্র সকলের অন্ত নাই, জানিবার বিষয় অনেক, কাল সংক্ষেপ, বিঘ্নও বিস্তর, অতএব হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ পাইলে জল পরিত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধপান করে, সেইরূপ যাহা সার তাহার উপাসনা করিবে।

বশিষ্ঠ বলিয়াছেন :

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যং তৃণমিবত্যজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা।।

যুক্তিযুক্ত বাক্য বালকে বলিলেও গ্রহণ করিবে, কিন্তু ব্রহ্মা যদি ও অন্য অর্থাৎ অযুক্তিযুক্ত কথা বলেন, তাহাও তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।

এ প্রকার স্বাধীনতার ভাব হিন্দু ধর্ম ব্যতীত আর কোনো ধর্মে পাওয়া যায় না।

জ্ঞানকাণ্ডের আর এক উপদেশ এই যে কর্ম অর্থাৎ যাগ যজ্ঞ পরিত্যাগ করিবে। এই কর্মত্যাগের ভাব হিন্দু ধর্মে চিরকাল আছে। মুণ্ডক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে।

প্লবাহ্যেতে অদৃঢ় যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষ কর্ম।
এতচ্ছ্রেয়োহভিনন্দন্তি মূঢ় জরা মৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি।।

এই যজ্ঞরূপ অশ্রেষ্ঠ কর্ম সকল অস্থায়ী ও অদৃঢ়, যাহা অষ্টাদশ ঋত্বিক দ্বারা সম্পন্ন হয়। যে মূঢ়েরা ইহাকে শ্রেয়ঃ বলিয়া অভিনন্দন করে তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। মনুসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে।

যথোক্তান্যপি কর্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্।।

দ্বিজোত্তম ব্যক্তি উল্লিখিত কর্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান আলোচনা, শম ও বেদাভ্যাসে যত্নবান হইবেন।

আমাদিগের বঙ্গদেশের অলঙ্কার স্বরূপ কুল্লুক ভট্ট, যাঁহাকে সর্ উইলিয়াম্ জোন্স পৃথিবীর সকল টীকাকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহার প্রণীত মনু সংহিতার টীকাতে 'বেদ সন্ন্যাসিনাং গৃহস্থানং' এই বাক্যে এক দল বেদসন্ন্যাসী গৃহস্থের কথা উল্লেখ

করিয়াছেন। এই সকল গৃহস্থেরা বৈদিক কর্ম সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ করিতেন। এখনও দণ্ডী পরমহংসেরা কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরের ধ্যান ধারণাতে নিমগ্ন থাকেন।

হিন্দু ধর্মের জ্ঞানকাণ্ড ধ্যানপ্রধান। উপনিষদে যে কেবল ধ্যানের কথা আছে, প্রার্থনা নাই, তাহা বলা যাইতে পারে না, কারণ 'অসতো মা সদগময় তমসো মা জ্যোতির্গময়' ইত্যাদি চমৎকার প্রার্থনা উপনিষদে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের সহিত সহবাসই ধর্মের উদ্দেশ্য, প্রার্থনা এবং অনুতাপ দ্বারা পাপ পাইতে বিমুক্তি সেই সহবাসের উপায় মাত্র। যখন ঈশ্বরের সহিত সহবাসই ধর্মের উদ্দেশ্য এবং কেবল ধ্যান দ্বারা আমরা সে সহবাস লাভ করিতে সমর্থ হই, তখন ধ্যানকে প্রধান উপাসনা বলিতে হইবে। শরীর দ্বারা যেমন আমরা মনুষ্যের সমীপস্থ হই, সেইরূপ তদ্দ্বারা অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের আমরা সমীপস্থ হইতে পারি না। আমরা কেবল ধ্যান দ্বারা তাঁহার সহবাস লাভ করিতে পারি। 'ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা। জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্বস্ততস্তুতং প.শ্যাতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।।' 'তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, বাক্য দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, অন্য কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, কঠোর তপস্যা কিংবা ক্রিয়া কর্মরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, যে ব্যক্তির চিত্ত জ্ঞান প্রসাদে বিশুদ্ধ হইয়াছে, কেবল সে ব্যক্তিই ধ্যানযুক্ত হইয়া সেই অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরকে দেখিতে পান।' এই ধ্যান যখন অবিচলিত ভাব ধারণ করে, যখন আমরা তাঁকে সকল সময়ে, এমনকি, বিষয় কার্য সম্পাদন সময়েও ঈশ্বরকে ধ্যান করি, যখন আমরা তাঁহাকে সর্বদা নয়নে নয়নে রাখি, যখন আমরা অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে দর্শন করি, তখন তাহা যোগ বলিয়া অখ্যাত হয়। ইউরোপখণ্ডে প্রার্থনার ভাব অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু ইদানীন্তন কোনো কোনো ব্যক্তিকে যোগ প্রধান উপাসনা বলিয়া স্বীকার করিতে দেখা যায়। কোনো কবিশ্রেষ্ঠ এইরূপ উক্ত করিয়াছেন।

> Rapt into still communion which transcends
> The inferior offices of prayer and praise.

> প্রশান্ত যোগেতে হৃত তাঁহার মানস,
> যোগের মাহাত্ম্য কাছে গণ্য নাহি হয়
> স্তব ও প্রার্থনা আদি নিকৃষ্ট সাধন।।

জ্ঞানীর সম্বন্ধে ঈশ্বরের উপাসনার নিমিত্ত স্থানের নিয়ম নাই, কালেরও নিয়ম নাই। যে স্থানে যে কালে মন ঈশ্বরে সংলগ্ন হয়, সেই স্থান ও সেই কাল তাঁহার উপাসনার প্রশস্ত স্থান ও প্রশস্ত কাল।

> যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ।
>
> *বেদান্তসূত্র*

যেখানে মনের একাগ্রতা হইবে সেইখানে উপাসনা করিবে।

জ্ঞানীর সম্বন্ধে তীর্থ পর্যটনের আবশ্যকতা নাই। বিশুদ্ধচিত্তই পরম তীর্থ। স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডে আছে।

সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্বভূত-দয়া তীর্থং সর্বত্রার্জবমেবচ।।
দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থমুচ্যতে।
ব্রহ্মচর্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা।।
জ্ঞানংতীর্থং ধৃতিস্তীর্থং পুণ্যং তীর্থমুদাহৃতং।
তীর্থানামপিততীর্থং বিশুদ্ধির্মানসঃ পরং।।

মহানির্বাণ তন্ত্রের একস্থানে ব্রহ্মজ্ঞানীর কর্তব্য সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

যতো জগন্মঙ্গলায় ত্বয়াহং বিনিয়োজিতঃ।
অতস্তে কথয়িষ্যামি যদ্বিশ্বহিতকৃৎ ভবেৎ।।
কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেসঃ পরমেশ্বরঃ।
প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতোবিশ্বং তদাশ্রিতং।।
স এক এব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
স্বপ্রকাশঃ সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ।।
নির্বিকারো নিরাধারো-নির্বিশেষো নিরাকুলঃ।
গুণাতীতঃ সর্বসাক্ষী সর্বাত্মা সর্বদৃগ্বিভুঃ।।
গূঢ়ঃ সর্বেষু ভূতেষু সর্বব্যাপী সনাতনঃ।
সর্বেন্দ্রিগুণাভাসঃ সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতঃ।।
লোকাতীতো লোকহেতুরবাঙ্মনসগোচরঃ।
স বেত্তি বিশ্বং সর্বজ্ঞস্তং ন জানাতি কশ্চন।।
তদধীনং জগৎ সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তদালম্বনত্যস্তিষ্ঠেদবিতর্ক্যমিদং জগৎ।।
তৎসত্যত্যমুপাশ্রিত্য সদ্বদ্ভাতি পৃথক্ পৃথক্।
তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জ্ঞাতা মহেশ্বরি।।
কারণং সর্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ।
লোকেম্ সাষ্ট করণাৎ স্রষ্টা ব্রহ্মেতি নীয়তে।
...সূর্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
বর্ষন্তি তোয়দাঃ কালে পুষ্পন্তি তরবো বনে।।
কালং কালয়তে কালো মৃত্যুর্মৃত্যুং ভিয়োভয়ং।

বেদান্তবেদ্যো ভগবান্ যৎতচ্ছব্দোপলক্ষিতঃ।।
বহুনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে কথ্যতে প্রিয়ে।
ধ্যেয়ঃ পূজ্যঃ সুখারাধ্যস্তং বিনা নাস্তি মুক্তয়ে।।

যেহেতু আমি জগতের হিত কথন জন্য তোমা কর্তৃক নিয়োজিত হইয়াছি, যাহাতে বিশ্বের হিত হয়, তাহা আমি তোমাকে বলি। হে দেবী! বিশ্বের হিত করিলে বিশ্বেশ বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর, যাঁহাতে বিশ্ব আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, তিনি প্রীতি হয়েন। তিনি একমাত্র, তিনি সৎস্বরূপ, তিনি সত্য, তিনি অদ্বিতীয়, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, তিনি স্বপ্রকাশ, তিনি সদাপূর্ণ, তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তিনি নিরাকার, নির্বিকার, নিরাকুল গুণাতীত, সর্বসাক্ষী, সর্বাত্মা, সর্বদৃক্ ও সর্বত্র বর্তমান। তিনি গূঢ়রূপে সকল ভূতে বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনি সর্বব্যাপী ও সনাতন। তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ প্রকাশক কিন্তু তিনি নিজে সকল ইন্দ্রিয় বিবর্জিত। তিনি লোকাতীত অথচ লোকহেতু। তিনি বাক্য মনের অগোচর। সেই সর্বজ্ঞ পুরুষ সকলকে জানেন ; কিন্তু কেহ তাঁহাকে জানে না। চরাচর সমস্ত জগৎ তাঁহার অধীনে রহিয়াছে, অবিতর্কিত সত্যরূপে সকল জগৎ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। তাঁহার সত্যতাকে আশ্রয় করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বস্তু সত্যরূপে প্রকাশিত হইতেছে। হে মহেশ্বরি! সেই কারণ স্বরূপ পরমেশ্বরের দ্বারা আমরা সৃষ্ট হইয়াছি। তিনি সকলের কারণ, তিনি একমাত্র পরমেশ্বর ; সৃষ্টিকার্য জন্য লোক সকল তাঁহাকে স্রষ্টা ও ব্রহ্ম বলিয়া কীর্তন করে। যাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, যাঁহার ভয়ে সূর্য উত্তাপ দিতেছে ও বনে তরু সকল পুষ্পিত হইতেছে, যাঁহার ভয়ে ঋতু সকল গমনাগমন করিতেছে ও মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে, যাঁহার ভয়ে ভয়ে ভীত হয়, যে ভগবান্ বেদান্ত শাস্ত্রে তৎ শব্দে উল্লিখিত হইয়াছেন, হে প্রিয়ে! তাঁহার বিষয়ে আমি তোমাকে অধিক কী বলিব? তিনি ধ্যেয়, তিনি পূজ্য, তিনি সহজে আরাধ্য, তাঁহা বিনা কখনোই মুক্তিলাভ হইতে পারে না।

পুনরায় :

অস্মিন্ ধর্মে মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পরোপকারনিরতো নির্বিকারঃ সদ্যশয়ঃ।।
মাৎসর্যহীনোঽদম্ভীচ দয়াবান্ শুদ্ধমানসঃ।
মাতাপিত্রোঃ প্রীতিকারী তয়োঃ সেবনতৎপরঃ।।
ব্রহ্মশ্রোতা ব্রহ্মমন্তা ব্রহ্মান্বেষণমানসঃ।
যতাত্মা দৃঢ়বুদ্ধিঃস্যাৎ ...
ন মিত্রা ভাষণং কুর্যান্ন পরানিচন্তনম্।
পরস্ত্রীগমনঞ্চৈব ব্রহ্মমন্ত্রী বিবর্জয়েৎ।।
তৎসদিতি বদেদ্দেবি প্রারম্ভে সর্বকর্মণাং।
ব্রহ্মার্পণমস্তুবাক্যাং পানভোজন কর্মসু।।
যেনোপায়েন মর্তানাং লোকযাত্রা প্রসিদ্ধতি।

তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈরিদংধর্ম্মং সনাতনম্।।

যে ব্যক্তি এই ধর্ম অবলম্বন করিবেন, তিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় পরোপকারনিরত, নির্বিকার, সদাশয়, মাৎসর্যাবিহীন, দম্ভহীন, দয়াবান, বিশুদ্ধচিত্ত, এবং মাতাপিতার প্রীতিকারী ও তাঁহাদিগের সেবায় তৎপর হইবেন। তিনি সর্বদা ব্রহ্মবিষয়ক কথা শ্রবণ করিবেন, তিনি ব্রহ্মকে সর্বদা মনন করিবেন, তাঁহার মন ব্রহ্মান্বেষণে সদা নিযুক্ত থাকিবে। তিনি সংযতচিত্ত ও দৃঢ়বুদ্ধি হইবেন। ব্রহ্ম সম্মুখে আছেন, এইরূপ তিনি ভাবিবেন। তিনি মিথ্যা কথা কহিবেন না ও পরানিষ্ট চিন্তা করিবেন না ; ব্রহ্মমন্ত্রে যিনি দীক্ষিত হইয়াছেন, তিনি পরস্ত্রী গমন পরিত্যাগ করিবেন। তিনি সকল কর্মের আরম্ভে 'তৎসৎ' বলিবেন ; তিনি পানভোজনাদি সকল কর্মের শেষে 'ব্রহ্মার্পণমস্তু' বলিবেন। যে কার্য দ্বারা লোকযাত্রা সুন্দররূপে নির্বাহিত হয়, তাহাই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সনাতন ধর্ম।

পুনরায় :

বাচিকং কায়িকং চাপি মানসং বা যথামতিঃ।
আরাধনে পরমশস্য ভাবশুদ্ধর্বিধীয়তে।।
পূজনে পরমেশস্য নাবাহনবিসর্জনে।
সর্বত্র সর্বকালেষু সাধয়েদ্‌ব্রহ্মসাধনম্।।
অস্নাতো বা কৃতস্নাতো ভুক্তোবাপি বুভুক্ষিতঃ।
পূজয়েৎ পরমাত্মানং সদা নির্মলমানসঃ।।

পরমেশ্বরের আরাধনায় বাচিক, কায়িক ও মানসিক ভাবের বিশুদ্ধতা আবশ্যক। তাঁহার পূজাতে আবাহন নাই, বিসর্জনও নাই। সকল স্থানে ও সকল কালে ব্রহ্মসাধন করিবেক। স্নান করিয়া হউক, না করিয়া হউক, আহার করিয়া হউক বা না করিয়াই হউক, সর্বদা নির্মল মানস হইয়া পরমাত্মাকে পূজা করিবেক।

পুনরায় :

ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারোত্র ত্যজ্যগ্রাহ্যো ন বিদ্যতে।
ন কালশুদ্ধিনিয়মো ন বা স্থাননিরূপণম্।।

এই ধর্মে ভক্ষ্যাভক্ষ্য ত্যজ্যগ্রাহ্যের বিচার নাই, কালশুদ্ধির নিয়ম অথবা স্থানের নিরূপণ নাই।

পুনরায় :

ব্রাহ্মে মন্ত্রে মহেশানি বিচারো নাস্তি কুত্রচিৎ।
স্বীয়মন্ত্রং গুরুর্দদ্যাৎ শিষ্যেভ্যোহ্য বিচারয়ন্।
পিতাপি দীক্ষয়েৎ পুত্রান্ ভ্রাতা ভ্রাতৃন্ পতিস্ত্রিয়ম্ ;
মাতুলো ভাগিনেয়াংশ্চ নপ্তৃন্ মাতামহোপি চ।

হে মহেশ্বরি! ব্রহ্মমন্ত্র প্রদানে বিচার নাই। কোনো বিচার না করিয়া গুরু আপনার মন্ত্র শিষ্যকে দিবেন। পিতা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, পতি স্ত্রীকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, মাতামহ দৌহিত্রকে দীক্ষা করিবেন।

উপরে আমি সাধারণ হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া জ্ঞানকাণ্ডের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইলাম। সাধারণ হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার সময় আমি সপ্রমাণ করিয়াছি যে হিন্দু ধর্মের যে অংশ কনিষ্ঠাধিকারীর ধর্ম বলিয়া আখ্যাত, তাহার ভাব ধরিয়া বিবেচনা করিলে প্রতীত হয় যে তাহাতেও হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাইতেছে। জ্ঞানকাণ্ডে ওই শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষ রূপ অনুভূত হয়। জ্ঞানকাণ্ড হইতে উদ্ধৃত উল্লিখিত শ্লোক সকল পাঠ করিলে প্রতীত হয় যে জ্ঞানকাণ্ডের ধর্ম হইতে বিশেষত বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদের ধর্ম হইতে ব্রাহ্মধর্মে অধিরোহণ অতি সহজ কার্য্য। ব্রাহ্মধর্ম যে হিন্দু ধর্মের কত নিকটতর এবং হিন্দু ধর্ম কীরূপ সহজে ব্রাহ্মধর্মে পরিণত হইয়াছে, তাহা জ্ঞানকাণ্ডের শ্লোক সকল পাঠ করিলে বুঝা যায়। ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের সমুন্নত আকার। হিন্দু ধর্ম ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া ব্রাহ্মধর্মে পরিণত হইয়াছে। এই ধর্ম বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িক ধর্ম যেহেতু উহার সত্য সকল ধর্মে পাওয়া যায় এবং উহাতে পৃথিবীস্থ সকল জাতির অধিকার আছে। * হিন্দু ধর্ম ক্রমে ক্রমে উন্নত হইল এমন এক আকার ধারণ করিয়াছে যাহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বজনীন। ব্রাহ্মধর্ম বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িক ধর্ম কিন্তু তা বলিয়া কি তাহাকে আর হিন্দু ধর্ম বলা যাইবে না? রামচন্দ্র নামে একটি লোককে পাঁচ বৎসরের সময় দেখিয়াছিলাম, এখন তাহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর, এখন তাহার আকৃতির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, তা বলিয়া সে কি আর সেই রামচন্দ্র নহে? সেই ঋগ্বেদের সময়ের হিন্দুধর্ম ক্রমে ক্রমে উন্নত ও সংশোধিত হইয়া ব্রাহ্মধর্মাকারে পরিণত হইয়াছে, এ বলিয়া কি উহাকে আর হিন্দু ধর্ম বলা যাইবে না? ব্রাহ্মধর্ম সকল ধর্মের ঐক্য স্থল ও সকল জাতির উহাতে অধিকার আছে অতএব উহা বিশ্বজনীন ধর্ম, এ বাক্য যেমন সত্য, হিন্দুধর্ম ক্রমশঃ সংশোধিত ও উন্নত হইয়া ব্রাহ্মধর্মকারে পরিণত হইয়াছে অতএব ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের সমুন্নত আকার এই বাক্য তেমনি সত্য। একজন খ্রিস্টান ব্রহ্মবাদীর ব্রাহ্মধর্মকে খ্রিস্টীয় ধর্মের ও একজন মুসলমান ব্রহ্মবাদীরও উহাকে মুসলমান ধর্মের বিশুদ্ধ সমুন্নত আকার বলিবার যেমন অধিকার আছে, একজন হিন্দু ব্রহ্মবাদীর উহাকে হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধ সমুন্নত আকার বলিবার তেমনি অধিকার আছে। যে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা অত্যন্ত প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে জ্ঞানী লোকদিগের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, সেইব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনাই এখন বিশুদ্ধ আকারে সাধারণ লোকদিগের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে। পূর্বে কেবল অরণ্যবাসী ঋষিরা উপনিষৎ পাঠ করিতেন। এইজন্য উপনিষদের অন্যতর নাম আরণ্যক। এক্ষণে সেই উপনিষদের শ্লোক সকল লোকে পাঠ করিতেছে। তখন লোকসমাজ নিবিড় অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, নিরাকার ব্রহ্মকে সাধারণ লোকে তত ধারণ করিতে পারিত না, অতএব ঋষিরা আশঙ্কা করিতেন, যে

ব্রহ্মজ্ঞান সাধারণ লোকের হস্তে পড়িয়া বিকৃত ও দুর্দশাগ্রস্ত হইবে। এখন বিদ্যালোক সাধারণ লোকসমাজে পূর্ব অপেক্ষা অধিক বিকীর্ণ হওয়াতে ওইরূপ হওয়ার আশঙ্কা নাই। এক্ষণে উপদেশ প্রদানদ্বারা কনিষ্ঠাধিকারীদিগকে সমর্থাধিকারে উত্তোলন করিবার সুবিধা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। অতএব এক্ষণে ব্রহ্মজ্ঞানীর ইহা কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে সর্বসাধারণকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করেন।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হয় যে হিন্দু ধর্ম রত্নাকর স্বরূপ। ভারত সমুদ্রের সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। ভারত সমুদ্রে যেমন কত রত্ন রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, সেইরূপ হিন্দু ধর্মে কত সত্যরত্ন নিহিত রহিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ধর্মের নিমিত্ত হিন্দুদিগকে অন্য কোথাও যাইতে হয় না। এ বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহাশয় তাঁহার এক গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

'ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য দেশ বিশেষ কী কাল বিশেষ কী জাতি বিশেষের অপেক্ষা নাই। সকল দেশীয় ব্রহ্মবাদীদিগেরই ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকার আছে। ভারতবর্ষের পূর্বতন ব্রহ্মবাদীদিগের জ্ঞানরত্নে আমাদের অধিকার। আমরা ধর্ম বিষয়ে পৈতৃক ধনে ধনী ; সেই ধন আমাদের পরম ধন ; তাহা আমরা আমাদের পিতৃপুরুষ হইতে অপর্যাপ্ত লাভ করিয়াছি ; তাহা অন্য কোনো জাতির নিকট হইতে ভিক্ষা করিতে হইবে না। এই ভারতবর্ষ ধর্মের আদিম স্থান। বৈদিক ধর্মের ন্যায় পুরাতন ধর্ম আর কোনো দেশে আর কোনো জাতিতে নাই। পৃথিবীতে প্রথম বৈদিক ধর্মেরই আবির্ভাব। ঋষিদিগের সরল সাধু হৃদয় হইতে যে অনির্দেশ্য পুরাকালে বেদসূক্ত সকল বিনির্গত হইয়াছিল, সে কালে আর সকল দেশ অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত ছিল। ছন্দের রচনা প্রথমত এই ভারতবর্ষেই হয় এবং সেই পবিত্র রচনা ধর্মফলদাতা ঈশ্বরের চরণে অর্পিত হয়। ঈশ্বর ভারতভূমি ধর্মের আকারস্থান করিয়াছেন ; তাহার অগণ্য রত্নরাজী এখনও নিঃশেষিত হয় নাই। যেমন উত্তর হিমালয় ভারতভূমির যেমন দক্ষিণ সাগর ভারতভূমির, যেমন গঙ্গানদী ভারতভূমির তেমনি বেদ উপনিষৎ ভারতভূমির, তেমনি পুরাণও ভারতভূমির। ধর্ম লইয়া ভারতবর্ষে যত আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, এত আর কোথাও হয় নাই। ভারতবাসীদিগের ধর্ম বিষয়ে স্বাভাবিক অনুরাগ। এখানকার সকলে ধর্মকে যেমন পবিত্র ভাবে দেখিতে পায়, সে পরিমাণে আর কোনো দেশের লোকই পায় না। ধর্মেতে এমন শ্রদ্ধা, ঈশ্বরেতে এমন নির্ভর, আর কোথাও নাই। তাহারা গৃহই প্রতিষ্ঠা করুক, কোনো স্থানেই বা গমন করুক, সিদ্ধিদাতা বিধাতা পুরুষকে অগ্রে স্মরণ করিয়া সকল কর্ম আরম্ভ করে। যে দেশে ধর্মের ভাব অধিক নাই, তাহারা ইহার মর্ম কিছুই বুঝিতে পারে না। বেদের আদিম অবস্থা হইতে এইপ্রকার ধর্মের ভাব চলিয়া আসিতেছে। এক এক বিষয়ে এক জাতি গণ্য হয় ; কেহ যুদ্ধে, কেহ বাণিজ্যে, কেহ শিল্পশাস্ত্রে কেহ বা ধর্মভাবে। ভারতবর্ষে যদি আর কিছু না থাকে, তথাপি এ ধর্মভাবে সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। ভারতবর্ষবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের

লজ্জা ও সতীত্ব ইহার অধিক প্রমাণ দিতেছে। আমরা অন্য জাতির নিকট হইতে রাজকার্যের, শিল্পশাস্ত্রের, বাণিজ্য ব্যবসায়ের, শাস্ত্রবিদ্যার, উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে পারি, কিন্তু ধর্ম বিষয়ে শিক্ষার নিমিত্ত অপর জাতির। সাহায্যের কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই।'

সভাপতি মহাশয়ের এই সকল বাক্যে হিন্দু ধর্মের প্রশস্ততা ও বিশালতা সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমার এরূপ মনে হয়, যে এই ধর্মবাদীদিগের নিকট যে ইদানীন্তন কোনো কোনো জাতি আসিয়া ধর্মের কথা বলে, ধর্মোপদেশ দেয়, সে যেন জেঠার নিকট জেঠামি করা। হিন্দু ধর্মের প্রকৃতি আলোচনা করিলে বোধ হয় যে এ ধর্ম কোনোকালে বিলুপ্ত হইবে না। যতকাল ভারতবর্ষ থাকিবে, ততকাল এই ধর্ম থাকিবে। অনেকে বলেন হিন্দু ধর্ম বিনষ্ট হইবে, তাহাদের কথা অমূলক। এ ধর্মকে কে বিলুপ্ত করিতে পারে? বৌদ্ধেরা হিন্দু ধর্মকে বিলুপ্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হয় নাই। মুসলমানেরা হিন্দু ধর্মের বিনাশার্থ যৎ পরনাস্তি চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ইহার কিছুই করিতে পারে নাই। খ্রিস্টীয় মিশনারিরা এখানে ধর্ম প্রচার করিতে আসিয়াছেন, কিন্তু হিন্দু ধর্মের বল দেখিয়া তাঁহাদিগকে এখন পালাই পালাই ডাক ছাড়িতে হইয়াছে। সম্প্রতি ডফ্ সাহেব বিলাতে এক বক্তৃতা করেন তাহাতে বলিয়াছেন, যে হিন্দু দিগের দর্শন শাস্ত্র এমন ব্যাপক যে ইউরোপীয় সকল প্রকার দার্শনিক মতের অনুরূপ তাহাতে পাওয়া যায়। এরূপ বুদ্ধিমান জাতিকে খ্রিস্টীয় ধর্মে প্রবৃত্ত করানো দুষ্কর। হিন্দু ধর্ম হাতির মতো। ইহার গাত্র মশার ন্যায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা আক্রমণ করে কিন্তু একবার গা ঝাড়া দিলেই কে কোথায় উড়িয়া যায়। যত কাল 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এই মহাবাক্য ভারতে বিদ্যমান থাকিবে, ততকাল এ ধর্মকে কেহ বিলুপ্ত করিতে পারিবে না। 'আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান এষব্রহ্মবিদ্যাং বরিষ্ঠঃ' এই বাক্য যত দিন ব্রহ্মোপাসকের লক্ষণ বলিয়া ভারতে কীর্তিত হইতে থাকিবে, ততকাল হিন্দু ধর্ম বিলুপ্ত হইবে না। 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি,' 'আত্মন প্রতিকূলানি পরেষাং না সমাচরেৎ' যতকাল এই সকল উপদেশ ভারতবীসগণ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইতে থাকিবে ততকাল হিন্দুধর্ম বিলুপ্ত হইবে না। যতকাল হিন্দুধর্ম থাকিবে, ততকাল হিন্দু নাম থাকিবে। হিন্দুনাম আমরা কখনোই পরিত্যাগ করিতে পারি না। হিন্দুনামের সঙ্গে কত হৃদয়গ্রাহী ও মনোহর ভাব জড়িত রহিয়াছে। হিদু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই সরস্বতীনদীতীরবাসী আদিম আর্যগণের বরণীয় মূর্তি আবির্ভূত হয় যাঁহারা ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের নিকট সম্বন্ধ অনুভব করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, 'ত্বং হি নঃ পিতাবসো ত্বং হি নো মাতা' 'সখা পিতা পিতৃতমঃ পিতৃণাম্' 'স্বাদু সখ্যং স্বাদ্বী প্রণীতিঃ' 'ত্বং অস্মাকং তবাস্মি'। হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই তিত্তির ঋষির বরণীয় মূর্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, যিনি বলিয়া গিয়াছেন 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে বোমম্ সোহশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহব্রহ্মণা বিপশ্চিতাঃ।' হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে বরণীয় আর্যমূর্তি মাণ্ডুক্য আসিয়া

উপস্থিত হয়েন, যিনি বলিয়াছেন 'শান্তং শিবমদ্বৈতং'। যখন আমরা এই হিন্দুনাম উচ্চারণ করি তখন আমাদের স্মৃতিক্ষেত্রে ব্যাঘ্রচর্মাম্বর জটাকলাপধারী ব্যাসের বরণীয় মূর্তি আসিয়া আবির্ভূত হয়, যিনি বলিয়াছেন, 'আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ'। যখন আমরা এই হিন্দুনাম উচ্চারণ করি, তখন আমারদিগের মনশ্চক্ষু সম্মুখে মধুর স্বভাব অথচ স্বাধীনাত্মা বশিষ্ঠের বরণীয় মূর্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, যিনি বলিয়াছেন, 'যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি। অন্যং তৃণমিব ত্যজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা'। হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই নবীন দূর্বাদলশ্যাম ধীর প্রশান্ত মূর্তি আবির্ভূত হয়েন, যিনি পিতৃসত্য পালন নিমিত্ত চতুর্দশ বৎসর কাল অরণ্যে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন ও জিতেন্দ্রিয়ত্ব ও সত্যবাদিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে যুধিষ্ঠির আসিয়া আবির্ভূত হয়েন, যাঁহার নাম ভারতবর্ষে ধর্মশব্দের প্রতিবাক্য স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে সেই অলোকসামান্য পুরুষ আমাদিগের মনশ্চক্ষু সম্মুখে উপস্থিত হয়েন, যিনি যুধিষ্ঠিরকে আপনার মৃত্যু সাধনের উপায় বলিয়া দিয়া অসাধারণ মহত্ব প্রকাশ করিয়া ছিলেন এবং শরশয্যার কঠোর যন্ত্রণার মধ্য হইতে পাণ্ডবদিগকে অশেষ অমূল্য ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই নাম উচ্চারিত হইলে সেই মহামনা রাজর্ষি জনক আমাদের স্মৃতিক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েন, যিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী থাকিয়াও এক মুহূর্তও অধ্যাত্মযোগ হইতে স্খলিত হইতেন না। এই নাম উচ্চারণ করিলে মহাত্মা পুরুরবাকে স্মরণ হয়, যিনি এলেকজান্ডরের নিকট শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বন্দীভাবে নীত হইলে এবং এলেকজান্ডর 'তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব' এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, 'এক রাজা অন্য রাজার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, সেইরূপ করিবেন'। হিন্দুনাম কি মনোহর! এ নাম কি কখনও আমরা পরিত্যাগ করতে পারি? এই নাম ঐন্দ্রজালিক প্রভাব ধারণ করে। এই নাম দ্বারা সমস্ত হিন্দুগণ ভ্রাতৃসূত্রে সম্বন্ধ হইবে। এই নাম দ্বারা বাঙালি, হিন্দুস্থানি, পাঞ্জাবি, রাজপুত, মাহারাট্রা, মাদ্রাজি সমস্ত হিন্দুবর্গ একহৃদয় হইবে। তাহাদিগের সকলের এক প্রকার উন্নত কামনা হইবে, সকল প্রকার স্বাধীনতা লাভ করার জন্য তাহাদের সমবেত চেষ্টা হইবে। অতএব যে পর্যন্ত আর্য শোণিতের শেষ বিন্দু আমাদিগের শিরায় প্রবাহিত হইবে আমরা এ নাম পরিত্যাগ করিব না। আমরা হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুনাম পরিতাগ করিয়া কি ক্রীতদাসের ন্যায় অন্যজাতির অনুকরণ করিব? ক্রীতদাসের ন্যায় অন্যজাতির অনুকরণ করিলে আভ্যন্তরিক বীর্যের হানি হয় এবং কোনোমতেই স্বীয় মহত্ত্ব সাধন হইতে পারে না। আমাদের দেশের লোকেরা অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয়। এমন অনুকরণপ্রিয় যে আজি যদি চিনেরা আসিয়া আমাদের দেশের রাজা হয় তাহা হইলে তাহারা কল্য পশ্চাদ্দেশে আপাদলম্বিত দীর্ঘ বেণী রাখে। কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি তাহা কি সমস্ত হিন্দুর সম্বন্ধে খাটে? ভারতবর্ষে কি শত শত সহস্র সহস্র লোক নাই, যাহারা এইরূপ ক্রীতদাসের ন্যায় অন্যজাতিকে

অনুকরণ করিতে বিমুখ? এমন সকল উন্নত পুরুষ যদি ভারত ভূমিতে না থাকেন, তবে ভারত সমুদ্রের তরঙ্গ আসিয়া ভারতভূমিকে ডুবাইয়া দিউক্, ভারতভূমি পৃথিবীর মানচিত্র হইতে অন্তর্হিত হউক, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। আমরা কিছু নিউজিল্যান্ডবাসী নহি যে একদিনেই হেট্ কোট্ পরিয়া সকলে সাহেব সাজিয়া উঠিব। ইহা ক্রীতদাসের কার্য। আমরা কখনই এরূপ ক্রীতদাস নহি। আমাদের আভ্যন্তরিক সারবত্তা আছে, হিন্দুজাতির ভিতরে এখনো এমন সার আছে যে তাহার বলে তাহারা আপনাদিগের উন্নতি আপনারাই সাধন করিবে। হিন্দুজাতি অবশ্যই আপনা আপনি উন্নত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য জাতিদিগের সমকক্ষ হইবে। ধর্মোৎপাদ্য সভ্যতাই প্রকৃত সভ্যতা। সে সভ্যতা এখনও পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হয় নাই। আমার আশা হইতেছে যে হিন্দুজাতি পুনরায় প্রাচীন কালের ধর্মোৎপাদ্য সভ্যতা, এমন কী, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর ধর্মোৎপাদ্য সভ্যতা লাভ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া গণ্য হইবে। আমরা ত রাজ্য বিষয়ে স্বাধীনতা ভ্রষ্ট হইয়াছি, আবার কী সামাজিক রীতিনীতি বিষয়েও স্বাধীনতা হারাইতে হইবে? মহাকবি হোমার বলিয়াছেন, 'যখনই মনুষ্য পরাধীন হয়, তখনই সে অর্ধেক পুরুষত্ব হারায়'। যদি আমরা এইরূপে সর্বপ্রকারে পরাধীন হইয়া পড়ি, আর কি আমাদের উঠিবার শক্তি থাকিবে? পরাধীনতাতে মনের কি বীর্য থাকে? মনের যদি বীর্য গেল, তবে উন্নতি লাভ কী প্রকারে হইবে? হিন্দুজাতি এইরূপে সর্বপ্রকারে পরহস্তগত হইয়া কি একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে? আমার ইহা কখনোই বিশ্বাস হয় না। আমার এইরূপ আশা হইতেছে, পূর্বে যেমন হিন্দুজাতি বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনি পুনরায় সে বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা ধর্মের জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। মিল্টন তাঁহার স্বজাতীয় উন্নতির সম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন :

> Methinks I see in my mind a noble and puissant nation rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invincible locks ; methinks I see her as an eagle mewing her mighty youth and kindling her undazzled eyes at the full mid-day beam.

আমিও সেইরূপ হিন্দুজাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি 'আমি দেখিতেছি আমার সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীরকুন্তল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় নব-যৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে ; হিন্দুজাতির কীর্তি, হিন্দু জাতির গরিমা, পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে।' এই আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণ করিয়া আমি অদ্য বক্তৃতা সমাপন করিতেছি।

মিলে সবে ভারত সন্তান
একতান মন প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী
শতফণি রত্নের নিধান।
হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।।
রূপবতী সাধ্বী সতী ভারত ললনা।
কোথা দিবে তাদের তুলনা।
শর্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত ললনা।
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।।
বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ।
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন।
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারত ভূষণ।
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।।
বীরযোনি এই ভূমি বীরের জননী ;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি।
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,

গাও ভারতের জয়।
ভীষ্মদ্রোণ ভীমার্জুন নাহি কি স্মরণ?
পৃথ্বরাজ আদি বীরগণ!
ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু,
আর্তবন্ধু দুষ্টের দমন।
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।
কেন ডর, ভীরু! কর সাহস আশ্রয়,
যতোধর্মস্ততো জয়।
ছিন্ন ভিন্ন হীন বল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়।
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।।

* *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকা, ৩৩ সংখ্যা
* ওই সকল ধর্ম শেম বংশোদ্ভব জাতির মধ্যে উদিত হইয়াছিল। এইজন্য অতীতে তাহাদিগকে শেমীয়ধর্ম বলিয়া ডাকা হইল। ইহুদি ও আরবেরা ওই বংশোদ্ভব জাতি।
* *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকা, ৩৩৩ সংখ্যা।

কেশবচন্দ্র সেন

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা

শরীরের হাত দিলেই ভিতরে জীবন, কী মৃত্যু তাহা বুঝা যায়। আত্মাকেও দেখিবামাত্র তেমনি জীবিত কী মৃত, তাহা জানিতে পারা যায়। আমি পাপী কি না, বুঝিতে বরং সময় লাগে; কিন্তু জীবন আছে কীনা, অতি সহজে জানা যায়। কীসে? উত্তপ্ত কী শীতল দেখিলেই ইহা নির্ধারণ করা যায়। এই কারণেই প্রার্থনা করি, সাধন করি, কীসে আত্মা উত্তাপযুক্ত, সতেজ থাকে। অগ্নির ভিতরে জীবন থাকে বলিয়াই আমি অগ্নিকে বরণ করি, আলিঙ্গন করি ও অত্যন্ত ভালোবাসিয়া থাকি। উত্তাপ দেখিলেই ভরসা হয়, আনন্দ হয়, উৎসাহ হয়। যদি দেখি অগ্নিতেজ কমিতেছে, বুঝি, এবার এ লোক জলে ঝাঁপ দিয়া মরিবে। যদি দেখি পাঁচ বছরের উৎসাহের পর কেহ ঠান্ডা হইতেছে, বুঝিয়া লই যে, এ লোক এবার পাপ করিতে চলিল, এবার মৃত্যু আসিয়া ইহার ঘাড় ধরিবে। এইজন্যই উত্তাপবিহীন অবস্থাকে অপবিত্র অবস্থা মনে করিতাম। যেদিন প্রাতঃকালে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত না হইয়া শয্যা হইতে উঠিতাম, মৃত্যু ভাবিতাম। নরক ও শীতল ভাব, আমি একই মনে করিতাম। কী মনের চারিদিকে, কী সামাজিক অবস্থার চারিদিকে, সততই উৎসাহের অগ্নি জ্বালিয়া রাখিতাম। এক দলের কাছে সেবা করিলাম, আর একটি দল কবে হইবে, দশটি দল প্রস্তুত করিলাম আর দশটি দল প্রস্তুত করিব; ইহারই জন্য ব্যগ্র থাকিতাম। এক বিভাগে কাজ করিলাম, আর এক বিভাগে কবে কাজ করিব; কতকগুলি লোকের সঙ্গে আলাপ করিলাম, আর কতকগুলি লোকের সঙ্গে কীসে আলাপ করিতে পাইব; কতকগুলি শাস্ত্র সঙ্কলন সত্যসংগ্রহ করিলাম, পাছে সেই সত্যগুলি লইয়া থাকিলে সেগুলি পুরাতন হইয়া পড়ে, এইজন্য কীরূপে অপর কতকগুলি পড়িয়া সত্যসংগ্রহ করিব, কেবল এই চেষ্টাই ছিল। ইহাই উত্তাপের অবস্থা। ক্রমাগত নূতন ভাব লইবার, নূতন পাইবার, নূতন সম্ভোগ করিবার ইচ্ছা হইতেছে। এ লোক ক্রমাগত নূতন দিকেই দৌড়িতেছে। নূতন মাত্রই উত্তাপবিশিষ্ট; পুরাতনের অর্থই শীতল। কত ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্ম দেখিলাম; চাকুরি পুরাতন হইল, পাঠ অধ্যয়ন পুরাতন হইল, বড়ো বড়ো যুবার মৃত্যু হইল। কত উৎসাহী পুরুষ ছিলেন, পাপ

করিলেন না, নরহত্যা করিলেন না, অবশেষে জলে ডুবিয়া মরিলেন। কত ব্রাহ্ম অনেক দিন বৈরাগ্য সাধন করিলেন, অবশেষে তাঁহাদের জীবন সেই শীতল হইয়া আসিল, সংসার তাঁহাদের নিকট হইতে সুদশুদ্ধ আসক্তি আদায় করিল; টাকার লোভে শেষটা মরিতে হইল। অনেক উৎসাহী যুবা দেখিয়াছিলাম, তাঁহারা এ-বিভাগে কি ও-বিভাগে, এদলে কী ওদলে, এগ্রামে কী ওগ্রামে, কোথায় যে লুকাইয়া রহিলেন, দেখা যায় না। একসময়ে কেমন উৎসাহী বীরের ন্যায় ছিলেন; এখন এমন ঠান্ডা যে, কাছে বসিলেও উত্তাপ বোধ হয় না। এমনই ঠান্ডা যে, আপনারা কেবল মরিতেছেন, তাহা নয়; তাঁহাদের জীবন হইতে অপরের জীবনে জল প্রবিষ্ট হইতেছে। কত লোকেই তাহাতে মরিতেছে। পাছে হস্তপদ শীতল হয়, পাছে চক্ষু ঠান্ডা হয়, পাছে হৃদয় উদ্যমবিহীন হয়, ইহার জন্য আমি সর্বদা সাবধান। একটু ঠান্ডাভাব পুরাতন ভাব দেখিলাম, মনে হইল, করি কী? কাজকর্ম যে পুরাতন হইতেছে, উপাসনা যে পুরাতন হইতেছে; বলিলাম, 'দয়াময়, এ বিপদ হইতে সন্তানকে বাঁচাও।' এই বলিবামাত্র হোমের আয়োজন করিলাম, ঘি ঢালিতে লাগিলাম। ঈশ্বর যিনি অগ্নিস্বরূপ, তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে দেখি,—সমুদ্র ও নদীর উপরে আগুন ভাসিতেছে; পর্বতে আগুন জ্বলিতেছে; জীব শরীরে পর্যন্ত আগুন রহিয়াছে। নব নব সত্য অমনই এদিক হইতে, ওদিক হইতে প্রকাশিত হইল।

রবিবার, ২২শ্রাবণ, ১৮০৪ শক; ৬ আগস্ট, ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে এই বক্তৃতাটি প্রদত্ত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঔপনিষদ ব্রহ্ম

ওঁ নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ পরম ঋষিগণকে নমস্কার করি, পরম ঋষিগণকে নমস্কার করি, এবং অদ্যকার সভায় সমাগত আর্যমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করি, ব্রহ্মবাদী ঋষিরা যে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে কি একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে? অদ্য আমরা কি তাঁহাদের সহিত সমুদয় যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়াছি। বৃক্ষ হইতে যে জীর্ণ পল্লবটি ঝরিয়া পড়ে সেও বৃক্ষের মজ্জার মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রাণশক্তির সঞ্চার করিয়া যায়, সূর্যকিরণ হইতে যে তেজটুকু সে সংগ্রহ করে তাহা বৃক্ষের মধ্যে এমন করিয়া নিহিত করিয়া যায় যে মৃত কাষ্ঠও তাহা ধারণ করিয়া রাখে, আর আমাদের ব্রহ্মবিদ্ ঋষিগণ ব্রহ্ম-সূর্যলোক হইতে যে পরম তেজ, যে মহান্ সত্য আহরণ করিয়াছিলেন তাহা কি এই নানা শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন বনস্পতির, এই ভারতব্যাপী পুরাতন আর্যজাতির, মজ্জার মধ্যে সঞ্চিত করিয়া যান নাই?

তবে কেন আমরা গৃহে গৃহে আচারে অনুষ্ঠানে কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের মহাবাক্যকে প্রতি মুহূর্তে পরিহাস করিতেছি? তবে কেন আমরা বলিতেছি, নিরাকার ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানের গম্য নহেন, আমাদের ভক্তির আয়ত্ত নহেন, আমাদের কর্মানুষ্ঠানের লক্ষ্য নহেন? ঋষিরা কি এ সম্বন্ধে লেশমাত্র সংশয় রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা কি প্রত্যক্ষ এবং তাঁহাদের উপদেশ কি সুস্পষ্ট নহে? তাঁহারা বলিতেছেন :

ইহ চেৎ অবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেৎ ইহাবেদীর্মহতী বিনষ্টিঃ।

এখানে যদি তাঁহাকে জানা যায় তবেই জন্ম সত্য হয়, যদি না জানা যায় তবে 'মহতী বিনষ্টিঃ', মহা বিনাশ। অতএব ব্রহ্মকে না জানিলেই নয়। কিন্তু কে জানিয়াছে? কাহার কথায় আমরা আশ্বাস পাইব? ঋষি বলিতেছেন :

ইহৈব সন্তোহথ বিদ্মস্তৎ বয়ং
ন চেৎ অবিদির্মহতী বিনষ্টিঃ।

এখানে থাকিয়াই তাঁহাকে আমরা জানিয়াছি, যদি না জানিতাম তবে আমাদের মহতী বিনষ্টি হইত। আমরা কি সেই তত্ত্বদর্শী ঋষিদের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিব?

ইহার উত্তরে কেহ কেহ সবিনয়ে বলেন, আমরা অবিশ্বাস করি না, কিন্তু ঋষিদের সহিত আমাদের অনেক প্রভেদ ; তাঁহারা যেখানে আনন্দে বিচরণ করিতেন আমরা সেখানে নিশ্বাস গ্রহণ করতে পারি না। সেই প্রাচীন মহারণ্যবাসী বৃদ্ধ পিপ্পলাদ ঋষি এবং সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ শৈবশ্চ সত্যকামঃ, সৌর্যায়ণী চ গার্গ্যঃ, কৌশল্যশ্চাশ্বলায়নো ভার্গবো বৈদর্ভিঃ কবন্ধী কাত্যায়নস্তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণাঃ, সেই ভরদ্বাজপুত্র সুকেশা, শিবিপুত্র সত্যকাম, সৌর্যপুত্র গার্গ্য, অশ্বলপুত্র কৌশল্য, ভৃগুপুত্র বৈদর্ভি, কাত্যায়নপুত্র কবন্ধী, সেই ব্রহ্মপর ব্রহ্মনিষ্ঠ পরংব্রহ্মান্বেষমাণ ঋষিপুত্রগণ, যাঁহারা সমিৎ হস্তে বনস্পতিচ্ছায়াতলে গুরুসম্মুখে সমাসীন হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতেন তাঁহাদের সহিত আমাদের তুলনা হয় না।

না হইতে পারে, ঋষিদের সহিত আমাদের প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু সত্য এক, ধর্ম এক, ব্রহ্ম এক ; যাহাতে ঋষিজীবনের সার্থকতা, আমাদের জীবনের সার্থকতাও তাহাতেই; যাহাতে তাঁহাদের মহতী বিনষ্টি তাহাতে আমাদের পরিত্রাণ নাই। শক্তি এবং নিষ্ঠার তারতম্য অনুসারে সত্যে ধর্মে এবং ব্রহ্মে আমাদের ন্যূনাধিক অধিকার হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া অসত্য অধর্ম অব্রহ্ম আমাদের অবলম্বনীয় হইতে পারে না। ঋষিদের সহিত আমাদের ক্ষমতার প্রভেদ আছে বলিয়া তাঁহাদের অবলম্বিত পথের বিপরীত পথে গিয়া আমরা সমান ফল প্রত্যাশা করিতে পারি না। যদি তাঁহাদের এই কথা বিশ্বাস করো যে, ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি, এখানে তাঁহাকে জানিলেই জীবন সার্থক হয়, নচেৎ মহতী বিনষ্টিঃ, তবে বিনয়ের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত মহাজনপ্রদর্শিত সেই সত্যপথই অবলম্বন করিতে হইবে।

সত্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকলেরই পক্ষে এক মাত্র এবং ঋষির মুক্তিবিধানের জন্য যিনি ছিলেন আমাদের মুক্তিবিধানের জন্যও সেই একমেব অদ্বিতীয়ং তিনি আছেন। যাঁহার পিপাসা অধিক তাঁহার জন্যও নির্মল নির্ঝরিণী অভ্রভেদী অগম্য গিরিশিখর হইতে অহোরাত্র নিঃস্যন্দিত, আর যাঁহার অল্প পিপাসা এক অঞ্জলি জলেই পরিতৃপ্ত তাঁহার জন্যও সেই অক্ষয় জলধারা অবিশ্রাম বহমানা, হে পান্থ, হে গৃহী, যাহার যতটুকু ঘট লইয়া আইস, যাহার যতটুকু পিপাসা পান করিয়া যাও।

আমাদের দৃষ্টিশক্তির প্রসর সংকীর্ণ তথাপি সমুদয় সৌর জগতের একমাত্র উদ্দীপনকারী সূর্যই কি আমাদিগকে আলোক বিতরণের জন্য নাই? অবরুদ্ধ অন্ধকূপই আমাদের মতো ক্ষুদ্রকায়ার পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে, তবু কি অনন্ত আকাশ হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি?

পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র একাংশ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ জ্ঞান থাকিলেই আমাদের জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়, তবু কেন মনুষ্য চন্দ্রসূর্যগ্রহতারার অপরিমেয় রহস্য উদঘাটনের জন্য অশ্রান্ত কৌতূহলে নিরন্তর লোকলোকান্তরে আপন গবেষণা প্রেরণ করিতেছে? আমরা যতই ক্ষুদ্র হই-না কেন, তথাপি ভূমৈব সুখং, ভূম্যই আমাদের সুখ, নাল্পে সুখমস্তি, অল্পে আমাদের সুখ নাই। হঠাৎ মনে হইতে পারে ব্রহ্ম হইতে অনেক অল্পে, পরিমিত আকারবদ্ধ আয়ত্তগম্য পদার্থে আমাদের মতো স্বল্পশক্তি জীবের সুখে চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা চলে না। ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ং, যিনি উত্তরতর অর্থাৎ সকলের অতীত, যাঁহাকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, যিনি অশরীর, রোগশোকরহিত, য এতদ্‌বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি, যাঁহারা ইঁহাকে জানেন তাঁহারাই অমর হন, অথ ইতরে দুঃখমেব অপিয়ন্তি, আর-সকলে কেবল দুঃখই লাভ করেন।

তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্‌বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি।

তিনি সত্য, তিনি অমৃত, তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে, হে সৌম্য, তাঁহাকে বিদ্ধ করো :

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং—

উপনিষদে যে মহাস্ত্র ধনুর কথা আছে সেই ধনু গ্রহণ করিয়া—

শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত—

উপাসনা-দ্বারা শাণিত শর সন্ধান করিবে!

আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি!

তদ্ভাবগত চিত্তের দ্বারা ধনু আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্য-স্বরূপ সেই অক্ষর ব্রহ্মকে বিদ্ধ করো!

এই উপমাটি অতি সরল। যখন শুভ্র সবলতনু আর্যগণ আদিম ভারতবর্ষের গহন মহারণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, যখন হিংস্র পশু এবং হিংস্র দস্যুদিগের সহিত তাঁহাদের প্রাণপণ সংগ্রাম চলিতেছে, তখনকার সেই টংকারমুখর অরণ্য-নিবাসী কবির উপযুক্ত এই উপমা!

এই উপমার মধ্যে যেমন সরলতা তেমনি একটি প্রবলতা আছে। ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিতে হইবে, ইহার মধ্যে লেশমাত্র কুণ্ঠিত ভাব নাই। প্রকৃতির একান্ত সারল্য এবং ভাবের একাগ্র বেগ না থাকিলে এমন অসংকোচ বাক্য কাহারও মুখ দিয়া বাহির হয় না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-দ্বারা যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারাই এরূপ সাহসিক উপমা এমন সহজ এমন প্রবল সরলতার সহিত উচ্চারণ করিতে পারেন। মৃগ যেমন

ব্যাধের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য, ব্রহ্ম তেমনি আত্মার অনন্য লক্ষ্যস্থল। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ। প্রমাদশূন্য হইয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে এবং শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আচ্ছন্ন হইয়া যায় সেইরূপ ব্রহ্মের মধ্যে তন্ময় হইয় যাইবে।

উপমাটি যেমন সরল, উপমার বিষয়গত কথাটি তেমনি গভীর। এখন সে অরণ্য নাই, স ধনুঃশর নাই ; এখন নিরাপদ নগর-নগরী অপরূপ অস্ত্রশস্ত্রে সুরক্ষিত। কিন্তু সেই আরণ্যক ঋষিকবি যে সত্যকে সন্ধান করিয়াছেন সেই সত্য অদ্যকার সভ্য যুগের পক্ষেও দুর্লভ। আধুনিক সভ্যতা কামান-বন্দুকে ধনুঃশরকে জিতিয়াছে কিন্তু সেই কত শত শতাব্দীর পূর্ববর্তী ব্রহ্মজ্ঞানকে পশ্চাতে ফেলিতে পারে নাই। সমস্ত প্রত্যক্ষ পদার্থের মধ্যে তদেতৎ সত্যং, সেই-যে একমাত্র সত্য, যদ্ অণুভ্যোণুচ, যাহা অণু হইতেও অণু, অথচ যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ, যাহাতে লোক-সকল এবং লোকবাসী-সকল নিহিত রহিয়াছে, সেই অপ্রত্যক্ষ ধ্রুব সত্যকে শিশুতুল্য সরল ঋষিগণ অতি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন। তদমৃতং, তাহাকেই তাঁহারা অমৃত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং শিষ্যকে ডাকিয়া বলিয়াছেন তদ্ভাবগতেন চেতস্য, তদ্ভাবগত চিত্তের দ্বারা, তাঁহাকে লক্ষ করো, তদ্‌বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি, তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে, হে সৌম্য, তাঁহাকে বিদ্ধ করো! শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ, লক্ষ্যপ্রবিষ্ট শরের ন্যায় তাঁহারই মধ্যে তন্ময় হইয়া যাও।

সমস্ত আপেক্ষিক সত্যের অতীত সেই পরম সত্যকে কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারা বিচার করা সেও সামান্য কথা নহে, শুদ্ধ যদি সেই জ্ঞানের অধিকারী হইতেন তবে তাহাতেও সেই স্বল্পাশী বিরলবসন সরলপ্রকৃতি বনবাসী প্রাচীন আর্য ঋষিদের বুদ্ধিশক্তির মহৎ উৎকর্ষ প্রকাশ পাইত।

কিন্তু উপনিষদের এই ব্রহ্মজ্ঞান কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির সাধনা নহে, সকল সত্যকে অতিক্রম করিয়া ঋষি যাঁহাকে একমাত্র তদেতৎ সত্যং বলিয়াছেন, প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞদের পক্ষে তিনি কেবল জ্ঞানলভ্য একটি দার্শনিক তত্ত্বমাত্র ছিলেন না, একাগ্রচিত্ত ব্যাধের ধনু হইতে শর যেরূপ প্রবলবেগে প্রত্যক্ষ সন্ধানে লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হয়, ব্রহ্মর্ষিদের আত্মা সেই পরম সত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তন্ময় হইবার জন্য সেইরূপ আবেগের সহিত ধাবিত হইত। কেবলমাত্র সত্যনিরূপণ নহে, সেই সত্যের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল।

কারণ, সেই সত্য কেবলমাত্র সত্য নহে, তাহা অমৃত। তাহা কেবল আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র অধিকার করিয়া নাই, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের আত্মার অমরত্ব। এইজন্য সেই অমৃত পুরুষ ছাড়িয়া আমাদের আত্মার অন্য গতি নাই ইহা ঋষিরা প্রত্যক্ষ জানিয়াছেন এবং বলিয়াছেন :

স যঃ অন্যম্ আত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ।

অর্থাৎ, যিনি পরমাত্মা ব্যতীত অন্যকে আপনার প্রিয় করিয়া বলেন, প্রিয়ং রোৎস্যতীতি, তাঁহার প্রিয় বিনাশ পাইবে! যে সত্য আমাদের জ্ঞানের পক্ষে সকল সত্যের শ্রেষ্ঠ, আমাদের

আত্মার পক্ষে তাহাই সকল প্রিয়ের প্রিয়তম :

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ।
প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

এই যে সর্বাপেক্ষা অন্তরতর পরমাত্মা ইনি আমাদের পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইবে প্রিয়, অন্যসকল হইতে প্রিয়। তিনি শুষ্ক জ্ঞানমাত্র নহেন, তিনি আমাদের আত্মার প্রিয়তম।

আধুনিক হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা বলেন ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া কোনো ধর্ম সংস্থাপন হইতে পারে না, তাহা কেবল তত্ত্বজ্ঞানীদের অবলম্বনীয়, তাঁহারা উক্ত ঋষিবাক্য স্মরণ করিবেন। ইহা কেবল বাক্যমাত্র নহে, প্রীতিরসকে অতি নিবিড় নিগূঢ় রূপে আস্বাদন করিতে না পারিলে এমন উদার উন্মুক্ত ভাবে এমন সরল সবল কণ্ঠে প্রিয়ের প্রিয়ত্ব ঘোষণা করা যায় না।

তদেতৎ হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা বলেন ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া কোনো ধর্ম সংস্থাপন হইতে পারে না, তাহা কেবল তত্ত্বজ্ঞানীদের অবলম্বনীয়, তাঁহারা উক্ত ঋষিবাক্য স্মরণ করিবেন। ইহা কেবল বাক্যমাত্র নহে—প্রীতিরসকে অতি নিবিড় নিগূঢ় রূপে আস্বাদন করিতে না পারিলে এমন উদার উন্মুক্ত ভাবে এমন সরল সবল কণ্ঠে প্রিয়ের প্রিয়ত্ব ঘোষণা করা যায় না।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা ব্রহ্মর্ষি এ কথা কোনো ব্যক্তিবিশেষে বদ্ধ করিয়া বলিতেছেন না ; তিনি বলিতেছেন না, যে, তিনি আমার নিকট আমার পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য-সকল হইতে প্রিয়, তিনি বলিতেছেন আত্মার নিকটে তিনি সর্বাপেক্ষা অন্তরতর, জীবাত্মামাত্রেরই নিকট তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য-সকল হইতে প্রিয়, জীবাত্মা যখনি তাঁহাকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করে তখনি বুঝিতে পারবে তাঁহা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই।

অতএব পরমাত্মাকে যে কেবল জ্ঞানের দ্বারা জানিব তদেতৎ সত্যং, তাহা নহে ; তাঁহাকে হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করিব তদমৃতং। তাঁহাকে সকলের অপেক্ষা অধিক বলিয়া জানিব, এবং সকলের অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রীতি করিব। জ্ঞান ও প্রেম-সমেত আত্মাকে ব্রহ্মে সমর্পণ করার সাধনাই ব্রাহ্মধর্মের সাধনা। তদ্ভাবগতেন চেতসা এই সাধনা করিতে হইবে ; ইহা নীরস তত্ত্বজ্ঞান নহে, ইহা ভক্তিপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম।

উপনিষদের ঋষি যে জীবাত্মামাত্রেরই নিকট পরমাত্মাকে সর্বাপেক্ষা প্রীতিজনক বলিতেছেন তাহার অর্থ কী? যদি তাহাই হইবে তবে আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাম্যমাণ হই কেন? একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার অর্থ বুঝাইতে ইচ্ছা করি।

কোনো রসজ্ঞ ব্যক্তি যখন বলেন কাব্যরসাবতারণায় বাল্মীকি শ্রেষ্ঠ কবি, তখন এ কথা বুঝিলে চলিবে না যে, কেবল তাঁহারই নিকট বাল্মীকির কাব্যরস সর্বাপেক্ষা উপাদেয়।

তিনি বলেন সকল পাঠকের পক্ষেই এই কাব্যরস সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহাই মনুষ্যপ্রকৃতি। কিন্তু কোনো অশিক্ষিত গ্রাম্য জনপদ বাল্মীকির কাব্য অপেক্ষা যদি স্থানীয় কোনো পাঁচালি গানে অধিক সুখ অনুভব করে তবে তাহার কারণ তাহার অজ্ঞতামাত্র। সে লোক অশিক্ষাবশত বাল্মীকির কাব্য যে কী তাহা জানে না এবং সেই কাব্যের রস যেখানে, অনভিজ্ঞতাবশত, সেখানে সে প্রবেশলাভ করিতে পারে না, কিন্তু তাহার অশিক্ষাবাধা দূর করিয়া দিবামাত্র যখনি সে বাল্মীকির কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবে তখনি সে স্বভাবতই মানবপ্রকৃতির নিজগুণেই গ্রাম্য পাঁচালি অপেক্ষা বাল্মীকির কাব্যকে রমণীয় বলিয়া জ্ঞান করিবে। তেমনি সে ঋষি ব্রহ্মের অমৃতরস আস্বাদন করিয়াছেন, যিনি তাঁহাকে পৃথিবীর অন্য-সকল হইতেই প্রিয় বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি ইহা সহজেই বুঝিয়াছেন যে, ব্রহ্ম স্বভাবতই আত্মার পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রীতিদায়ক, ব্রহ্মের প্রকৃত পরিচয় পাইবামাত্র আত্মা স্বভাবতই তাঁহাকে পুত্র বিত্ত ও অন্য-সকল হইতেই প্রিয়তম বলিয়া বরণ করে।

ব্রহ্মের সহিত এই পরিচয় যে কেবল আত্মার আনন্দ-সাধনের জন্য তাহা নহে, সংসারযাত্রার পক্ষেও তাহা না হইলে নয়। ব্রহ্মকে যে ব্যক্তি বৃহৎ বলিয়া না জানিয়া সংসারকেই বৃহৎ বলিয়া জানে, সংসারযাত্রা সে সহজে নির্বাহ করিতে পারে না, সংসার তাহাকে রাক্ষসের ন্যায় গ্রাস করিয়া নিজের জঠরানলে দগ্ধ করিতে থাকে। এইজন্য ঈশোপনিষদে লিখিত হইয়াছে :

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ

ঈশ্বরের দ্বারা এই জগতের সমস্ত যাহা-কিছু আচ্ছন্ন জানিবে এবং :

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং

তাঁহার দ্বারা যাহা দত্ত, যাহা কিছু তিনি দিতেছেন, তাহাই ভোগ করিবে, পরের ধনে লোভ করিবে না।

সংসারযাত্রার এই মন্ত্র। ঈশ্বরকে সর্বত্র দর্শন করিবে, ঈশ্বরের দত্ত আনন্দ-উপকরণ উপভোগ করিবে, লোভের দ্বারা পরকে পীড়িত করিবে না।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত সংসারকে আচ্ছন্ন দেখে সংসার তাহার নিকট একমাত্র মুখ্যবস্তু নহে। সে যাহা ভোগ করে তাহা ঈশ্বরের দান বলিয়া ভোগ করে, সেই ভোগে সে ধর্মের সীমা লঙঘন করে না, নিজের ভোগমত্ততায় পরকে পীড়া দেয় না, সংসারকে যদি ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত না দেখি, সংসারকেই যদি একমাত্র মুখ্য লক্ষ্য বলিয়া জানি, তবে সংসারসুখের জন্য আমাদের লোভের অন্ত থাকে না, তবে প্রত্যেক তুচ্ছ বস্তুর জন্য হানাহানি কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়, দুঃখ হলাহল মথিত হইয়া উঠে। এই জন্য সংসারীকে

একান্ত নিষ্ঠার সহিত সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে ; কারণ, সংসারকে ব্রহ্মের দ্বারা বেষ্টিত জানিলে এবং সংসারের সমস্ত ভোগ ব্রহ্মের দান বলিয়া জানিলে তবেই কল্যাণের সহিত সংসারযাত্রা-নির্বাহ সম্ভব হয়।

পরের শ্লোকে বলিতেছেন :

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে—

কর্ম করিয়া শত বৎসর ইহলোকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে, হে নর, তোমার পক্ষে ইহার আর অন্যথা নাই, কর্মে লিপ্ত হইবে না এমন পথ নাই।

কর্ম করিতেই হইবে এবং জীবনের প্রতি উদাসীন হইবে না ; কিন্তু সর্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া আছেন ইহাই স্মরণ করিয়া কর্মের দ্বারা জীবনের শতবর্ষ যাপন করিবে। ঈশ্বর সর্বত্র আছেন অনুভব করিয়া ভোগ করিতে হইবে এবং ঈশ্বর সর্বত্র আছেন অনুভব করিয়া কর্ম করিতে হইবে।

সংসারের সমস্ত কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্মে নিরত থাকা তাহাও ঈশোপনিষদের উপদেশ নহে :

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভুয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা অর্থাৎ সংসারকর্মেরই উপাসনা করে তাহারা অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশ করে, তদপেক্ষা ভুয় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে যাহারা কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যায় নিরত।

ঈশ্বর আমাদিগকে সংসারের কর্তব্যকর্মে স্থাপিত করিয়াছেন। সেই কর্ম যদি আমরা ঈশ্বরের কর্ম বলিয়া না জানি, তবে পরমার্থের উপরে স্বার্থ বলবান হইয়া উঠে এবং আমরা অন্ধকারে পতিত হই। অতএব কর্মকেই চরম লক্ষ্য করিয়া কর্মের উপাসনা করিবে না, তাহাকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া পালন করিবে।

কিন্তু বরঞ্চ মুগ্ধভাবে সংসারের কর্ম-নির্বাহও ভালো তথাপি সংসারকে উপেক্ষা করিয়া সমস্ত কর্ম পরিহারপূর্বক কেবলমাত্র আত্মার আনন্দ-সাধনের জন্য ব্রহ্মসম্ভোগের চেষ্টা শ্রেয়স্কর নহে। তাহা আধ্যাত্মিক বিলাসিতা, তাহা ঈশ্বরের সেবা নহে।

কর্মসাধনাই একমাত্র সাধনা। সংসারের উপযোগিতা, সংসারের তাৎপর্যই তাই। মঙ্গলকর্ম সাধনেই আমাদের স্বার্থ প্রবৃত্তি সকল ক্ষয় হইয়া আমাদের লোভ মোহ আমাদের হৃদ্‌গত বন্ধন-সকলের মোচন হইয়া থাকে, আমাদের যে রিপু সকল মৃত্যুর মধ্যে আমাদিগকে

জড়িত করিয়া রাখে সেই মৃত্যুপাশ অবিশ্রাম মঙ্গলকর্মের সংঘর্ষেই ছিন্ন হইয়া যায়। কর্তব্যকর্মের সাধনাই স্বার্থপাশ হইতে মুক্তির সাধনা, এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে, ইহার আর অন্যথা নাই, কর্মে লিপ্ত হইবে না এমন পথ নাই।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্‌বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যায়ামৃতমশ্নুতে।

বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কে যিনি একত্র করিয়া জানেন তিনি অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম দ্বারা মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মলাভের দ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হন।

ইহাই সংসারধর্মের মূলমন্ত্র, কর্ম এবং ব্রহ্ম, জীবনে উভয়ের সামঞ্জস্য-সাধন। কর্মের দ্বারা আমরা ব্রহ্মের অভ্রভেদী মন্দির নির্মাণ করিতে থাকিব, ব্রহ্ম সেই মন্দির পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকিবেন। নহিলে কিসের জন্য আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাম পাইয়াছি? কেন এই পেশী, এই স্নায়ু, এই বাহুবল, এই বুদ্ধিবৃত্তি, কেন এই স্নেহপ্রেম দয়া কেন এই বিচিত্র সংসার? ইহার কি কোনো অর্থ নাই? ইহা কী সমস্তই অনর্থের হেতু? ব্রহ্ম হইতে সংসারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জানিলেই তাহা অনর্থের নিদান হইয়া উঠে এবং সংসার হইতে ব্রহ্মকে দূরে রাখিয়া তাঁহাকে একাকী সম্ভোগ করিতে চেষ্টা করিলেই আমরা আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতায় নিমগ্ন হইয়া জীবনের বিচিত্র সার্থকতা হইতে ভ্রষ্ট হই।

পিতা আমাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছেন, সেখানকার নিয়ম এবং কর্তব্য সর্বথা সুখজনক নহে। সেই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বালক পিতৃগৃহে পলাইয়া আনন্দলাভ করিতে চায়। সে বোঝে না বিদ্যালয়ে তাহার কী প্রয়োজন, সেখান হইতে পলায়নকেই সে মুক্তি বলিয়া জ্ঞান করে, কারণ পলায়নে আনন্দ আছে। মনোযোগের সহিত বিদ্যা সম্পন্ন করিয়া বিদ্যালয় হইতে মুক্তিলাভের যে আনন্দ তাহা সে জানে না। কিন্তু সুছাত্র প্রথমে পিতার স্নেহ সর্বদা স্মরণ করিয়া বিদ্যাশিক্ষার দুঃখকে গণ্য করে না, পরে বিদ্যাশিক্ষায় অগ্রসর হইবার আনন্দে সে তৃপ্ত হয়, অবশেষে কৃতকার্য হইয়া মুক্তিলাভের আনন্দে সে ধন্য হইয়া থাকে।

যিনি আমাদিগকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন সংসার-বিদ্যালয়কে অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে যেন সন্দেহ না করি, এখানকার দুঃখকাঠিন্য বিনীতভাবে গ্রহণ করিয়া, এখানকার কর্তব্য একান্তচিত্তে পালন করিয়া, পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যে ব্রহ্মামৃত লাভের সার্থকতা যেন অনুভব করি। ঈশ্বরকে সর্বত্র বিরাজমান জানিয়া সংসারের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যে মুক্তি তাহাই প্রকৃত মুক্তি। সংসারকে অপমানপূর্বক পলায়নে যে মুক্তি তাহা মুক্তির বিড়ম্বনা, তাহা একজাতীয় স্বার্থপরতা।

সকল স্বার্থপরতার চূড়ান্ত এই আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা। কারণ, সংসারের মধ্যে এমন একটি অপূর্ব কৌশল আছে যে, স্বার্থ সাধন করিতে গেলেও পদে পদে স্বার্থত্যাগ করিতে

হয়। সংসারে পরের দিকে একেবারে না তাকাইলে নিজের কার্যের ব্যাঘাত ঘটে। নৌকা যেমন গুণ দিয়া টানে তেমনি সংসারের স্বার্থবন্ধন আমাদিগকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সর্বদাই প্রতিকূল স্রোত বাহিয়া নিজের দিক হইতে পরের দিকে আর্কষণ করিতে থাকে। আমাদের স্বার্থ ক্রমশই আমাদের সন্তানের স্বার্থ, পরিবারের স্বার্থ, প্রতিবেশীর স্বার্থ, স্বদেশের স্বার্থ এবং সর্বজনের স্বার্থে অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

কিন্তু যাঁহারা সংসারের দুঃখ শোক দারিদ্র্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রলোভনে আধ্যাত্মিক বিলাসিতায় নিমগ্ন হন তাঁহাদের স্বার্থপরতা সর্বপ্রকার আঘাত হইতে সুরক্ষিত হইয়া সুদৃঢ় হইয়া উঠে।

বৃক্ষে যে ফল থাকে সে ফল বৃক্ষ হইতে রস আকর্ষণ করিয়া পরিপক্ক হইয়া উঠে। যতই সে পরিপক্ক হইতে থাকে ততই বৃক্ষের সহিত তাহার বৃন্তবন্ধন শিথিল হইয়া আসে, অবশেষে তাহার অভ্যন্তরস্থ বীজ সুপরিণত হইয়া উঠিলে বৃক্ষ হইতে সে সহজেই বিচ্ছিন্ন হইয়া বীজকে সার্থক করিয়া তোলে। আমরাও সংসারবৃক্ষ হইতে সেইরূপ বিচিত্র রস আকর্ষণ করি, মনে হইতে পারে তাহাতে সংসারের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ক্রমেই দৃঢ় হইবে, কিন্তু তাহা নহে, আত্মার যথার্থ পরিণতি হইলে বন্ধন আপনি শিথিল হইয়া আসে। ফলের সহিত আমাদের প্রভেদ এই যে, আত্মা সচেতন ; রস-নির্বাচন ও আকর্ষণ বহুল পরিমাণে আমাদের স্বায়ত্ত। আত্মার পরিণতির প্রতি লক্ষ করিয়া বিচারপূর্বক সংসার হইতে রস গ্রহণ ও বর্জন করিতে পারিলেই সংসারের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং সেই সঙ্গে আত্মার সফলতা সম্পন্ন হইলে সংসারের কল্যাণবন্ধন সহজেই শিথিল হইয়া আসে। অতএব ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত আচ্ছন্ন জানিয়া সংসারকে তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, তাঁহার দত্ত সুখসমৃদ্ধির দ্বারা ভোগ করিবে, সংসারকে শেষ পরিণাম বলিয়া ভোগ করিতে চেষ্টা করিবে না। অপর পক্ষে সংসারের বৃন্তবন্ধন বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার মঙ্গলরস হইতে আত্মাকে বঞ্চিত করিবে না। ঈশ্বর এই সংসারবৃক্ষের সহস্র তন্তুর মধ্য দিয়া আমাদের আত্মায় কল্যাণরস প্রেরণ করে ; এই জীবধারয়িতা বিপুল বনস্পতি হইতে দম্ভভরে পৃথক্ হইয়া নিজের রস নিজে যোগাইবার ক্ষমতা আমাদের হস্তে নাই।

কোনো সত্যকে অস্বীকার করিয়া আমাদের নিস্তার নাই। মত্ততার বিহ্বলতায় মাতাল বিশ্ব-সংসারকে নগণ্য করিয়া যে অন্ধ আনন্দ উপভোগ করে সে আনন্দের শ্রেয়স্করতা নাই। বিদ্যা এবং অবিদ্যা, সৎ এবং অসৎ, ব্রহ্ম এবং সংসার, উভয়কেই স্বীকার করিতে হইবে। দুঃখের হাত এড়াইবার জন্য কর্তব্যসাধন ছেদন করিবার অভিপ্রায়ে সংসারকে একেবারেই না করিয়া দিয়া একাকী আনন্দসম্ভোগে প্রবৃত্ত হওয়া একজাতীয় প্রমত্ততা। সত্যের এক দিককে উপেক্ষা করিলে অপর দিকও অসত্য হইয়া উঠে। ঈশ্বরের আদেশ পালনকে যে অস্বীকার করে, সে মুখে যাহাই বলুক, ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে না, বরঞ্চ ঈশ্বরকে মুখে অস্বীকার করিয়া যে ব্যক্তি মনুষ্যের প্রতি কর্তব্যানুষ্ঠান করে সে কঠিন কর্মের দ্বারা ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়া থাকে।

জ্ঞানে এবং ভোগে এবং কর্মে ব্রহ্মকে স্বীকার করিলেই তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হয়। সেইরূপ সর্বাঙ্গীণভাবে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার একমাত্র স্থান এই সংসার, আমাদের এই কর্মক্ষেত্র ; ইহাই আমাদের ধর্মক্ষেত্র, ইহাই ব্রহ্মের মন্দির। এখানে জগৎমণ্ডলের জ্ঞানে ঈশ্বরের জ্ঞান জগৎসৌন্দর্যের ভোগে ঈশ্বরের ভোগ এবং জগৎসংসারের কর্মে ঈশ্বরের কর্ম জড়িত রহিয়াছে ; সংসারের সেই জ্ঞান সৌন্দর্য ও ক্রিয়াকে ব্রহ্মের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া জানিলেই ব্রহ্মকে অন্তরতর করিয়া জানা যায় এবং সংসারযাত্রাও কল্যাণকর হইয়া উঠে। তখন ত্যাগ এবং ভোগের সামঞ্জস্য হয়, কাহারও ধনে লোভ থাকে না, অনর্থক বলিয়া জীবনের প্রতি উপেক্ষা জন্মে না, শতবর্ষ আয়ু যাপন করিলেও পরমায়ুর সার্থকতা উপলব্ধি হয়, এবং সেই অবস্থায় :

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যে দেখেন এবং সর্বভূতের মধ্যে পরমাত্মাকে দেখেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

গম্যস্থানের পক্ষে পথ যেমন একই কালে পরিহার্য এবং অবলম্বনীয়, ব্রহ্মলাভের পক্ষে সংসার সেইরূপ। পথকে যেমন আমরা প্রতিপদে পরিত্যাগ করি এবং আশ্রয় করি, সংসারও সেইরূপ আমাদের প্রতিপদে বর্জনীয় এবং গ্রহণীয়। পথ নাই বলিয়া চক্ষু মুদিয়া পথপ্রান্তে পড়িয়া স্বপ্ন দেখিলে গৃহলাভ হয় না, এবং পথকেই শেষ লক্ষ্য বলিয়া বসিয়া থাকিলে গৃহে গমন ঘটে না। গম্যস্থানকে যে ভালোবাসে, পথকেও সে ভালোবাসে ; পথ গম্যস্থানেরই অঙ্গ অংশ এবং আরম্ভ বলিয়া গণ্য। ব্রহ্মকে যে চায়, ব্রহ্মের সংসারকে সে উপেক্ষা করিতে পারে না, সংসারকে সে প্রীতি করে এবং সংসারের কর্মকে ব্রহ্মের কর্ম বলিয়াই জানে।

আর্যধর্মের বিশুদ্ধ আদর্শ হইতে যাঁহারা ভ্রষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা বলিবেন সংসারের সহিত যদি ব্রহ্মের যোগসাধন করিতে হয় তবে ব্রহ্মকে সংসারের উপযোগী করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে। তাই যদি হইল তবে সত্যের প্রয়োজন কী? সংসার তো আছেই, কাল্পনিক সৃষ্টির দ্বারা সেই সংসারেরই আয়তন বিস্তার করিয়া লাভ কী? আমরা অসৎ সংসারে আছি বলিয়াই আমাদের সত্যের প্রয়োজন, আমরা সংসারী বলিয়াই সেই সংসারাতীত নির্বিকার অক্ষয় পুরুষের আদর্শ উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে হইবে, সে আদর্শ বিকৃত হইতে দিলেই তাহা, সছিদ্র তরণীর ন্যায়, আমাদিগকে বিনাশ হইতে উত্তীর্ণ হইতে দেয় না। যদি সত্যকে, জ্যোতিকে, অমৃতকে আমরা অসৎ অন্ধকার এবং মৃত্যুর পরিমাপে খর্ব করিয়া আনি, তবে কাহাকে ডাকিয়া কহিব, 'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়'?

সংসারী জীবের পক্ষে একটি মাত্র প্রার্থনা আছে—সে প্রার্থনা অসৎ হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও। সত্যকে মিথ্যা করিয়া লইয়া তাহার নিকট সত্যের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ চলে না, জ্যোতিকে স্বেচ্ছাকৃত কল্পনার দ্বারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার নিকট আলোকের জন্য প্রার্থনা বিড়ম্বনা মাত্র, অমৃতকে স্বহস্তে মৃত্যুধর্মের দ্বারা বিকৃত করিয়া তাহার নিকট অমৃতের প্রত্যাশা মূঢ়তা। ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাংজগৎ, যে ব্রহ্ম সমস্ত জগতের সমস্ত পদার্থকে আচ্ছন্ন করিয়া বিরাজ করিতেছেন সংসারী সেই ব্রহ্মকেই সর্বত্র অনুভব করিবেন উপনিষদের এই অনুশাসন।

দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তি বলিবেন, উপদেশ সত্য হইতে পারে কিন্তু তাহা পালন করা কঠিন। অরূপ ব্রহ্মের মধ্যে দুঃখশোকের নির্বাপণ সহজ নহে। কিন্তু যদি সহজ না হয় তবে দুঃখনির্বাপণের, মুক্তিলাভের অন্য যে-কোনো উপায় আরও কঠিন, কঠিন কেন, অসাধ্য। স্বতঃপ্রবাহিত অগাধ স্রোতস্বিনীর মধ্যে অবগাহনস্নান যদি কঠিন হয় তবে স্বহস্তে ক্ষুদ্রতম কূপ খনন করিয়া তাহার মধ্যে অবতরণ আরও কত কঠিন, তাই বা কেন, নিজের ক্ষুদ্র-কলস পরিমিত জল নদী হইতে বহন করিয়া স্নান করা সেও দুরূহতর। যখন ব্রহ্মকে অরূপ অনন্ত অনির্বচনীয় বলিয়া জানি তখনি তাঁহার মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন অতি সহজ হয়, তখনি তাঁহার দ্বারা পরিপূর্ণরূপে পরিবৃত হইয়া আমাদের ভয় দুঃখ শোক সর্বাংশে দূর হইয়া যায়। এই জন্যই উপনিষদে আছে:

যতোবাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হইয়া আসে সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন তিনি আর কাহার হইতেও ভয় পান না। অতএব ব্রহ্মের সেই বাক্যমনের অগোচর অনন্ত পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করিলে তবেই আমাদের ভয় দুঃখ নিঃশেষে নিরস্ত হয়। তাঁহাকে বিশ্বজগতের অন্যান্য বস্তুর ন্যায় বাঙ্মনোগোচর ক্ষুদ্র করিয়া, খণ্ড করিয়া, দেখিলে আমরা সেই পরম অভয়, সেই ভূমা আনন্দ, লাভ করিতে পারি না। আমরা তো সংসারের সংকীর্ণতা-দ্বারা প্রতিহত, জটিলতা-দ্বারা উদ্‌ভ্রান্ত, খণ্ডতা-দ্বারা শতধাবিক্ষিপ্ত হইয়া আছি, আমরা জানি সংসারের 'স্রোতাংসি' সর্বাণি ভয়াবহানি', সংসারের সমুদয় স্রোত ভয়াবহ, সকলেরই মধ্যে ভয়দুঃখক্লেশ জরামৃত্যু-বিচ্ছেদের কারণ রহিয়াছে, অতএব আমরা যখন শান্তি চাই, অভয় চাই, আনন্দ চাই, অমৃত চাই, তখন সহজেই স্বভাবতই কাহাকে চাই? যাঁহাকে পাইলে শান্তিমত্যন্তমেতি, অত্যন্ত শান্তি পাওয়া যায়। তিনি কে? উপনিষৎ বলেন, 'স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোহন্যঃ'—তিনি সংসার কাল এবং আকৃতি অর্থাৎ সাকার পদার্থ হইতে পরঃ, শ্রেষ্ঠ, এবং অন্যঃ অর্থাৎ ভিন্ন। যদি তিনি সংসার কাল

ও সাকার পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ভিন্ন না হইতেন তবে তো সংসারই আমাদের যথেষ্ট ছিল, তবে তো তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন ছিল না।

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি।

বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতাকে জানিয়া অত্যন্ত শিব এবং অত্যন্ত শান্তি পাওয়া যায়। অতএব যাঁহারা বলেন আমরা সেই ভূমা-স্বরূপকে আয়ত্ত করিতে পারি না, সেই জন্য তাহাতে আমাদের স্থিতি আমাদের শান্তি নাই, তাঁহারা উপনিষৎকথিত পরম সত্য হইতে স্খলিত হইতেছেন :

যতোবাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

বাক্য মন যাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না তাঁহাতেই আমাদের পরম আনন্দ, আমাদের অনন্ত অভয়। ঋষিরা কহিতেছেন :

যৎ বাচ্য নাভ্যুদিতং যেন বাক্ অভ্যুদ্যতে
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।

যিনি বাক্য-দ্বারা উদিত নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা উদিত, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি জানো, এই যাহা কিছু উপাসনা করা যায় তাহা ব্রহ্ম নহে।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।

মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনকে জানেন, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি জানো, এই যাহা কিছু উপাসনা করা যায় তাহা ব্রহ্ম নহে। যাঁহাকে বলা যায় না, যাঁহাকে ভাবা যায় না, তাঁহাকেই জানিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণ জানা সম্ভব নহে, যদি তাঁহাকে সম্পূর্ণ জানা সম্ভব হইত তবে তাঁহাকে জানিয়া আমাদের আনন্দামৃত লাভ হইত না। তাঁহাকে আমরা অন্তরাত্মার মধ্যে এতটুকু জানি যাহাতে বুঝিতে পারি তাঁহাকে জানিয়া শেষ করা যায় না এবং তাহাতেই আমাদের আনন্দের শেষ থাকে না।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্‌বেদ তদ্‌বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ।

তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানি এমন আমি মনে করি না, না জানি যে তাহাও নহে, আমাদের মধ্যে যিনি তাঁহাকে জানেন তিনি ইহা জানেন যে, তাঁহাকে জানি এমনও নহে,

না জানি এমনও নহে।

শিশু কি তাহার মাতার সম্যক্ পরিচয় জানে? কিন্তু সে অনুভবের দ্বারা এবং এক অপূর্ব সংস্কার দ্বারা এটুকু ধ্রুব জানিয়াছে যে, তাহার ক্ষুধার শান্তি, তাহার ভয়ের নিবৃত্তি, তাহার সমস্ত আরাম মাতার নিকট। সে তাহার মাতাকে জানে এবং জানেও না। মাতার অপর্যাপ্ত স্নেহ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার সাধ্য তাহার নাই, কিন্তু যতটুকুতে তাহার তৃপ্তি ও শান্তি ততটুকু সে আস্বাদন করে এবং আস্বাদন করিয়া ফুরাইতে পারে না। আমরাও সেইরূপ ব্রহ্মকে এই জগতের মধ্যে এবং আপন অন্তরাত্মার মধ্যে কিছু জানিতে পারি এবং সেইটুকু জানাতেই ইহা জানি যে, তাঁহাকে জানিয়া শেষ করা যায় না ; জানি যে, তাঁহা হইতে বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ; এবং মাতৃ-অঙ্ক-কামী শিশুর মতো ইহাও জানিতে পারি যে, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্যান্ ন বিভেতি কদাচন, তাঁহার আনন্দ যে পাইয়াছে তাহার আর কাহারও নিকট হইতে কদাচ কোনো ভয় নাই।

যাঁহারা উপনিষৎ অবিশ্বাস করিয়া, ঋষিবাক্য অমান্য করিয়া, ব্রহ্মলাভের সহজ উপায়স্বরূপ সাকার পদার্থকে অবলম্বন করেন, তাঁহারা এ কথা বিচার করিয়া দেখেন না যে, ঐকান্তিক সহজ কঠিন বলিয়া কিছু নাই। সন্তরণ অপেক্ষা পদব্রজে চলা সহজ বলিয়া মানিয়া লইলেও এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে জলের উপর দিয়া পদব্রজে চলা সহজ নহে, সেখানে তদপেক্ষা সন্তরণ সহজ। অপ্রত্যক্ষ পদার্থকে মনন-দ্বারা জানা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ পদার্থকে চক্ষু-দ্বারা দেখা সহজ এ কথা স্বীকার্য, কিন্তু তাই বলিয়া অতীন্দ্রিয় পদার্থকে চক্ষু-দ্বারা দেখা সহজ নহে, এমনকী, তাহা অসাধ্য। তেমনি সাকার মূর্তির রূপ-ধারণা সহজ সন্দেহ নাই কিন্তু সাকার মূর্তির সাহায্যে ব্রহ্মের ধারণা একেবারেই অসাধ্য ; কারণ, স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যঃ, তিনি সংসার হইতে, কাল হইতে, সাকার পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ভিন্ন এবং সেই জন্যই তাঁহাতে সংসারাতীত দেশকালাতীত শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি, অত্যন্ত মঙ্গল এবং অত্যন্ত শান্তিলাভ হয়, অথচ তাঁহাকে পুনশ্চ আকৃতির মধ্যে বন্ধ করিয়া ধারণা করিবার চেষ্টা এত কঠিন যে, তাহা অসাধ্য, অসম্ভব, তাহা স্বতোবিরোধী।

কিন্তু সহজ কঠিনের কথা উঠে কেন? আমরা সহজ চাই, না সত্য চাই? সত্য যদি সহজ হয় তো ভালো, যদি না হয় তবু সত্য বৈ গতি নাই। পৃথিবী কর্মের পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত আছে এ-কথা ধারণা করা যদি কাহারও পক্ষে সহজ হয় তথাপি বিজ্ঞানপিপাসু সত্যের মুখ চাহিয়া তাহাকে অশ্রদ্ধেয় বলিয়া অবজ্ঞা করেন। মরুপ্রান্তরের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ ক্ষুধার্ত যখন অন্ন চায়, তখন তাহাকে বালুকাপিণ্ড আনিয়া দেওয়া সহজ ; কিন্তু সে বলে আমি তো সহজ চাই না, আমি অন্নপিণ্ড চাই, সে অন্ন এখানে যদি না পাওয়া যায়, তবে দুরূহ হইলেও তাহাকে অন্যত্র হইতে আহরণ করিতে হইবে, নহিলে আমি বাঁচিব না। তেমনি সংসারমধ্যে আমরা যখন অধ্যাত্মপিপাসা মিটাইতে চাই তখন কল্পনামরীচিকায় সে কিছুতেই

মিটে না, যত দুর্লভ হউক সেই পিপাসার জল, আত্মার একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় পরমাত্মাকেই চাই—তিনি নিরাকার নির্বিকার বাক্যমনের অগোচর হইলেও তবু তাঁহাকেই চাই, নহিলে আমাদের মুক্তি নাই। ধর্মপথ তো সহজ নহে, ব্রহ্ম লাভ তো সহজ নহে, সে কথা সকহৈল বলে, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি—সেই জন্যই মোহনিদ্রাগস্ত সংসারীর দ্বারে দাঁড়াইয়া ঋষি উচ্চস্বরে ডাকিতেছেন; উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। না উঠিলে, না জাগিলে এই ক্ষুরধার নিশিত দুর্গম দুরত্যয় পথে চক্ষু মুদিয়া চলা যায় না, আত্মার অভাব আলস্যভরে অনায়াসে মোচন হয় না—এবং ব্রহ্ম কীড়াচ্ছলে কল্পনাবাহিত মনোরথের গম্য নহেন। সংসারে যদি বিদ্যালাভ বিত্তলাভ যশোলাভ সহজ না হয়, তবে ধর্মলাভ সত্যলাভ ব্রহ্মলাভ সহজ, এমন আশ্বাস কে দিবে এবং সে আশ্বাসে কে ভুলিবে! কোন্ মূঢ় বিশ্বাস করিবে যে, মন্ত্রোচ্চারণে লোহা সোনা হইয়া যাইবে, খনি-অন্বেষণের প্রয়োজন নাই? উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত! দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি!

তবে ব্রহ্মলাভের চেষ্টা কি একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে? তবে কি এই কথা বলিয়া মনকে বুঝাইতে হইবে যে, যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্য-আশ্রয় গ্রহণ করেন, যাঁহাদের নিকট ভালোমন্দ সুন্দরকুৎসিত অন্তরবাহিরের ভেদ একেবারে ঘুচিয়া গেছে, ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মোপাসনা তাঁহাদেরই জন্য। তাই যদি হইবে তবে ব্রহ্মবাদী ঋষি ব্রহ্মচারী ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্যকে কেন অনুশাসন করিতেছেন প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ, সন্তানসূত্র ছেদন করিবে না, অর্থাৎ গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিবে। কেন শাস্ত্রকার বিশেষ করিয়া উপদেশ দিতেছেন ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ, গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন—এবং তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ, তত্ত্বজ্ঞানী হইবেন, অর্থাৎ যে নিষ্ঠার কথা কহিবেন তাহা যেন অজ্ঞাননিষ্ঠা না হয়, গৃহী যথার্থ জ্ঞানপূর্বক ব্রহ্মে নিরত হইবেন এবং যদ্‌যদ্ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ, যে যে কর্ম করিবেন তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন। অতএব শাস্ত্রের অনুশাসন এই যে, গৃহী ব্যক্তিকে কেবল ভক্তিতে নহে, জ্ঞানে, কেবল, জ্ঞানে নহে, কর্মে, হৃদয়ে মনে এবং চেষ্টায়, সর্বতোভাবে ব্রহ্মপরায়ণ হইতে হইবে। অতএব সংসারের মধ্যে থাকিয়া আমরা সর্বদা সর্বত্র ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি করিব, অন্তরাত্মার মধ্যে তাঁহার অধিষ্ঠান অনুভব করিব এবং আমাদের সমুদয় কর্ম তাঁহার সম্মুখে কৃত এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে সমর্পিত হইবে।

কিন্তু সর্বদা সর্বত্র তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিতে হইলে, চতুর্দিকের জড়বস্তুরাশিকে অপসারিত করিয়া ব্রহ্মের মধ্যেই আপনাকে সম্পূর্ণ আশ্রিত আবৃত নিমগ্ন অনুভব করিতে হইলে, তাঁহাকে সাকাররূপে কল্পনাই করা যায় না। উপনিষদে আছে, যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং, এই সমস্ত জগৎ সেই প্রাণ হইতে নিঃসৃত হইয়া সেই প্রাণের মধ্যে কম্পিত হইতেছে। অনন্ত প্রাণের মধ্যে সমস্ত বিশ্বচরাচর অহর্নিশি স্পন্দমান রহিয়াছে এই ভাব কি আমরা কোনোপ্রকার হস্তপদবিশিষ্ট মূর্তি-দ্বারা কল্পনা করিতে পারি? অথচ যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি, এই যাহা কিছু জগৎ-সমস্ত প্রাণের মধ্যে কম্পিত

হইতেছে এ কথা মনে উদয় হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তৃণগুল্মলতাপুষ্পপল্লব পশুপক্ষী মনুষ্য চন্দ্রসূর্যগ্রহনক্ষত্র, জগতের প্রত্যেক কম্পমান অণু পরমাণু এক মহাপ্রাণের ঐক্যসমুদ্রে হিল্লোলিত দেখিতে পাই, এক মহাপ্রাণের অনন্তকম্পিত বীণাতন্ত্রী হইতে এই বিপুল বিচিত্র বিশ্বসংগীত ঝংকৃত শুনিতে পাই। অনন্তপ্রাণের সেই অনির্দেশ্যতা অনির্বচনীয়তাই আমাদের চিত্তকে প্রসারিত করিয়া দেয়। সেই জগদ্ব্যাপী জগদতীত প্রাণকে কোনো নির্দিষ্ট সংকীর্ণ আকারের মধ্যে কল্পনা করিতে গেলে তখন আর তাঁহাকে আমাদের নিশ্বাসের মধ্যে পাই না, আমাদের চক্ষের নিমেষের মধ্যে পাই না, আমাদের রক্তের উত্তপ্ত প্রবাহ, আমাদের সর্বাঙ্গের বিচিত্র স্পর্শ, আমাদের দেহের প্রত্যেক স্পন্দিত কোষ, প্রত্যেক নিশ্বসিত রোমকূপের মধ্যে পাই না, আকৃতির কঠিন ব্যবধানে, মূর্তির অলঙ্ঘনীয় অন্তরালে, তিনি আমাদের নিকট হইতে আমাদের অন্তর হইতে দূরে বাহিরে গিয়া পড়েন। আমার অশরীরী অভাবনীয় প্রাণ আমার আদ্যোপ্রান্তে অখণ্ডভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, আমার পদাঙ্গুলির কোষাণুর সহিত আমার মস্তিষ্কের কোষাণুকে যোগযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, আবার আমার এই রহস্যময় প্রাণের মধ্যে সেই পরমপ্রাণ আমার শরীরকোষের প্রত্যেক স্পন্দনের সহিত সুদূরতম নক্ষত্রবর্তী বাষ্পাণুর প্রত্যেক আন্দোলনকে এক অনির্বচনীয় ঐক্যে এক অপূর্ব অপরিমেয় ছন্দোবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন, ইহা অনুভব করিয়া এবং অনুভবের শেষ করিতে না পারিয়া কি আমাদের চিত্ত পুলকিত প্রসারিত হইয়া উঠে না? কোনো মূর্তির কল্পনা কি ইহা অপেক্ষা সহজে আমাদিগকে সর্বপ্রকার ক্ষুদ্রতার বন্ধন, খণ্ডতার কারাপ্রাচীর হইতে মুক্তিদানে সহায়তা করিতে পারে, অনন্তের সহিত আমাদের এমন অন্তরতম ব্যাপকতম যোগ সংনিবদ্ধ করিতে পারে? সাকার মূর্তি আমাদিগকে সহায়তা করে না, ব্রহ্মকে দূরে লইয়া দুষ্প্রাপ্য করিয়া দেয়।

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্ অদৃশ্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে
অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ংগতো ভবতি।

যখন সাধক সেই অদৃশ্যে, অশরীরে, নির্বিশেষে, নিরাধারে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন।

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি।

কিন্তু যখন তিনি ইহাতে লেশমাত্র অন্তর অর্থাৎ দূরত্ব স্থাপন করেন তখন তিনি ভয় প্রাপ্ত হন। সেই অদৃশ্যকে দৃশ্য, অশরীরকে শরীরী, নির্বিশেষকে সবিশেষ এবং নিরাধারকে আধারবিশিষ্ট করিলে ব্রহ্মের সহিত দূরত্ব স্থাপন করা হয় এবং তখন আমাদের আত্মার অভয়প্রতিষ্ঠা চূর্ণ হইয়া যায়।

উপনিষৎ বলিতেছেন,

অস্তীতি ব্রুবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।

তিনি আছেন এই কথা যে বলে সে ছাড়া অন্য ব্যক্তি তাঁহাকে কী করিয়া উপলব্ধি করিবে? তিনি আছেন ইহার অধিক আর কী বলিবার আছে? তিনি আছেন এ কথা যখনি আমরা সর্বান্তঃকরণে সম্পূর্ণভাবে বলিতে পারি তখনই আমাদের মনোনেত্রের সম্মুখে অনন্ত শূন্য ওতপ্রোত পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তখনি যথার্থত বুঝিতে পারি যে, আমি আছি ; বুঝিতে পারি যে, আমার বিনাশ নাই ; আত্ম ও পর, জড় ও চেতন, দেশ ও কাল, নিষ্কল পবমাত্মার দ্বারা এক মুহূর্তেই অখণ্ডভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তখন আমাদের এই পুরাতন পৃথিবীর দিতে চাহিলে ইহাকে আর ধূলিপিণ্ড বলিয়া বোধ হয় না, নিশীথনভোমণ্ডলের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে চাহিলে তাহারা শুদ্ধমাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে প্রতীয়মান হয় না ; তখন আমার অন্তরাত্মা হইতে আরম্ভ করিয়া ধূলিকণা, এই ভূমিতল হইতে আরম্ভ করিয়া নক্ষত্রলোক পর্যন্ত একটি শব্দ ধ্বনিহীন গাম্ভীর্যে উদ্‌গীত হইয়া উঠে, ওঁ ; একটি বাক্য শুনিতে পাই, অস্তি, তিনি আছেন, এবং সেই একটি কথার মধ্যেই সমস্ত জগৎচরাচরের, সমস্ত কার্যকারণের সমস্ত অর্থ নিহিত পাওয়া যায়। সেই মহান অস্তি শব্দকে কোনো আকারের দ্বারা মূর্তি-দ্বারা সহজ করা যায় কি? এমন সহজ কথা কি আর-কিছু আছে যে 'তিনি আছেন'? 'আমি আছি' এ কথা যেমন জগতের সকল কথার অপেক্ষা সহজ, 'তিনি আছেন' এ কথা না বলিলে আমি আছি এ কথা যে আদ্যোপান্ত নিরর্থক মিথ্যা হইয়া যায়। আমার আত্মা বলিতেছে, আমার আত্মা বলিতেছে, তিনি আছেন। সাকার মূর্তি কি তদপেক্ষা সহজ সাক্ষ্য আর-কিছু দিতে পারে?

ব্রহ্মের সেই বিশুদ্ধ ভাব কীরূপে মনন করিতে হইবে?

নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ।

কী ঊর্ধ্বদেশ, কী তির্যক, কী মধ্যদেশ, কেহ ইঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম মহদ্‌যশ।

প্রাচীন ভারতে সংসারবাসী জীবাত্মার লক্ষ্যস্থান এই পরমাত্মাকে বিদ্ধ করিবার মন্ত্র ছিল—ওঁ।

প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।

তাঁহার প্রতিমা ছিল না, কোনো মূর্তিকল্পনা ছিল না, পূর্বতন পিতামহগণ তাঁহাকে মনন করিবার জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একটিমাত্র শব্দ আশ্রয় করিয়াছিলেন। সে শব্দ যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি পরিপূর্ণ, কোনো বিশেষ অর্থ-দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। সেই শব্দ

চিত্তকে ব্যাপ্ত করিয়া দেয়, কোনো বিশেষ আকার-দ্বারা বাধা দেয় না ; সেই একটিমাত্র ওঁ শব্দের মহাসংগীত জগৎসংসারের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিতে থাকে।

ব্রহ্মের বিশুদ্ধ আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য পিতামহগণ কীরূপ যত্নবান ছিলেন ইহা হইতেই তাহার প্রমাণ হইবে।

চিন্তার যতপ্রকার চিহ্ন আছে তন্মধ্যে ভাষাই সর্বাপেক্ষা চিন্তার অনুগামী। কিন্তু ভাষারও সীমা আছে, বিশেষ অর্থের দ্বারা সে আকারবদ্ধ, সুতরাং ভাষা আশ্রয় করিলে চিন্তাকে ভাষাগত অর্থের চারি প্রান্তের মধ্যে রুদ্ধ থাকিতে হয়।

ওঁ একটি ধ্বনিমাত্র, তাহার কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট অর্থ নাই। সেই ওঁ শব্দে ব্রহ্মের ধারণাকে কোনো অংশেই সীমাবদ্ধ করে না, সাধনা দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে যত দূর জানিয়াছি যেমন করিয়াই পাইয়াছি এই ওঁ শব্দে তাহা সমস্তই ব্যক্ত করে এবং ব্যক্ত করিয়াও সেইখানেই রেখা টানিয়া দেয় না। সংগীতের স্বর যেমন গানের কথার মধ্যে একটি অনির্বচনীয়তার সঞ্চার করে তেমনি ওঁ শব্দের পরিপূর্ণ ধ্বনি আমাদের ব্রহ্মধ্যানের মধ্যে একটি অনির্বচনীয়তার অবতারণা করিয়া থকে। বাহ্য প্রতিমা-দ্বারা আমাদের মানস ভাবকে খর্ব ও আবদ্ধ করে, কিন্তু এই ওঁ ধ্বনির দ্বারা আমাদের মনের ভাবকে উন্মুক্ত ও পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়।

সেই জন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন, ওমিতি ব্রহ্ম। ওম্ বলিতে ব্রহ্ম বুঝায়। ওমিতাদং সর্বং, এই যাহা কিছু সমস্তই ওঁ। ওঁ শব্দ সমস্তকেই সমাচ্ছন্ন করিয়া দেয়। অর্থবন্ধনহীন কেবল একটি সুগভীর ধ্বনিরূপে ওঁ শব্দ ব্রহ্মকে নির্দেশ করিতেছে। আবার ওঁ শব্দের একটি অর্থও আছে, সে অর্থ এত উদার যে তাহা মনকে আশ্রয় দান করে, অথচ কোনো সীমায় বদ্ধ করে না।

আধুনিক সমস্ত ভারতবর্ষীয় আর্য ভাষায় যেখানে আমরা হাঁ বলিয়া থাকি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় সেইখানে ওঁ শব্দের প্রয়োগ। হাঁ শব্দ ওঁ শব্দেরই রূপান্তর বলিয়া সহজেই অনুমিত হয়। উপনিষদও বলিতেছেন ওমিত্যেতদ্ অনুকৃতির্হ স্ম, ওঁ শব্দ অনুকৃতিবাচক, অর্থাৎ ইহা করো বলিলে, ওঁ অর্থাৎ হাঁ বলিয়া সেই আদেশের অনুকরণ করা হইয়া থাকে। ওঁ স্বীকারোক্তি।

এই স্বীকারোক্তি ওঁ, ব্রহ্ম-নির্দেশক শব্দরূপে গণ্য হইয়াছে। ব্রহ্মধ্যানের কেবল এইটুকু মাত্র অবলম্বন ; ওঁ, তিনি হাঁ। ইংরাজ মনীষী কার্লাইলও তাঁহাকে Everlasting Yea অর্থাৎ শাশ্বত ওঁ বলিয়াছেন। এমন প্রবল পরিপূর্ণ কথা আর কিছুই নাই ; তিনি হাঁ, ব্রহ্ম ওঁ।

আমরা কে কাহাকে স্বীকার করি সেই বুঝিয়া আত্মার মহত্ত্ব। কেহ জগতের মধ্যে একমাত্র ধনকেই স্বীকার করে, কেহ মানকে, কেহ খ্যাতিকে। আদিম আর্যগণ ইন্দ্র চন্দ্র বরুণকে ওঁ বলিয়া স্বীকার করিতেন, সেই দেবতার অস্তিত্বই তাঁহাদের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিভাত হইত। উপনিষদের ঋষিগণ বলিলেন জগতে ও জগতের বাহিরে ব্রহ্মাই

একমাত্র ওঁ, তিনিই চিরন্তন হাঁ, তিনিই Everlasting Yea। আমাদের আত্মার মধ্যে তিনি ওঁ, তিনিই হাঁ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তিনি ওঁ, তিনিই হাঁ এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেশ কালকে অতিক্রম করিয়া তিনি ওঁ, তিনিই হাঁ। এই মহৎ নিত্য এবং সর্ব্বব্যাপী যে হাঁ, ওঁ ধ্বনি ইঁহাকেই নির্দেশ করিতেছে। প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মের কোনো প্রতিমা ছিল না, কোনো চিহ্ন ছিল না, কেবল এই একটি মাত্র ক্ষুদ্র অথচ সুবৃহৎ ধ্বনি ছিল ওঁ। এই ধ্বনির সহায়ে ঋষিগণ উপাসনানিশিত আত্মাকে একাগ্রগামী শরের ন্যায় ব্রহ্মের মধ্যে নিমগ্ন করিয়া দিতেন। এই ধ্বনির সহায়ে ব্রহ্মবাদী সংসারীগণ বিশ্বজগতের যাহা কিছু সমস্তকেই ব্রহ্মের দ্বারা সমাবৃত করিয়া দেখিতেন।

ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওঁ বলিয়া সাম সকল গীত হইয়া থাকে। ওঁ আনন্দধ্বনি।

ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ওঁ আদেশবাচক। ওঁ বলিয়া ঋত্বিক্ আজ্ঞা প্রদান করেন। সমস্ত সংসারের ওপর আমাদের সমস্ত কর্ম্মের উপর মহৎ আদেশরূপে নিত্যকাল ওঁ ধ্বনিত হইতেছে। জগতের অভ্যন্তরে এবং জগৎকে অতিক্রম করিয়া যিনি সকল সত্যের পরম সত্য, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তিনি সকল আনন্দের পরমানন্দ, এবং আমাদের কর্ম্মসংসারে তিনি সকল আদেশের পরমাদেশ। তিনি ওঁ।

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।

তিনি যেখানে, সেখানে সূর্যের প্রকাশ নাই, চন্দ্রতারকের প্রকাশ নাই, বিদ্যুতের প্রকাশ নাই, এই অগ্নির প্রকাশ কোথায় ? সেই জ্যোতির্ময়ের প্রকাশেই সমস্ত প্রকাশিত, তাঁহার দীপ্তিতেই সমস্ত দীপ্যমান। তিনিই ওঁ।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ
প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

এই যে অন্তরতর পরমাত্মা তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, সকল হইতেই প্রিয়। তিনিই ওঁ।

সত্যান্ন প্রমদিতব্যং।
ধর্মান্ন প্রমদিতব্যং।
কুশলান্ন প্রমদিতব্যং।
ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যং।

সত্য হইতে স্খলিত হইবে না, ধর্ম হইতে স্খলিত হইবে না, কল্যাণ হইতে স্খলিত হইবে না, মহত্ত্ব হইতে স্খলিত হইবে না। ইহা যাঁহার অনুশাসন তিনিই ওঁ।

অনেকে বলেন, দুর্বল মানবপ্রকৃতির সর্বপ্রকার চরিতার্থতা আমরা ঈশ্বরে পাইতে চাই ; আমাদের প্রেম কেবল জ্ঞানে ও ধ্যানে পরিতৃপ্ত হয় না, সেবা করিতে চায়, আমাদের প্রকৃতির সেই স্বাভাবিক আকাঙক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা ঈশ্বরকে মূর্তিতে বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে অশন বসন ভূষণ উপহারে পূজা করিয়া থাকি।

এ কথা সত্য যে, ব্রহ্মের মধ্যে আমরা মানবপ্রকৃতির চরম চরিতার্থতা অন্বেষণ করি; কেবল ভক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা সেই চরিতার্থতা লাভ হইতে পারে না, সেই জন্যই শাস্ত্রে গৃহস্থকে ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে বলিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে বলিয়াছেন, গৃহী যে যে কর্ম করিবেন তাহা ব্রহ্মকে সমর্পণ করিবেন। সংসারের সমস্ত কর্তব্যপালনই ব্রহ্মের সেবা। যদি প্রতিমাকে অন্নবস্ত্র পুষ্পচন্দন দান করিয়া আমরা দেবসেবার আকাঙক্ষা চরিতার্থ করি তবে তাহাতে আমাদের কর্মের মহত্ত্ব লাভ না হইয়া ঠিক তাহার বিপরীত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানে আমাদিগকে সকল জ্ঞানের চরিতার্থতার দিকে লইয়া যায়, ব্রহ্মের প্রতি প্রীতি আমাদিগকে পুত্রপ্রীতি ও অন্য সকল প্রীতির চরম পরিতৃপ্তিতে লইয়া যায়, এবং ব্রহ্মের কর্মও সেইরূপ আমাদের শুভ চেষ্টাকে চরম মহত্ত্ব ও ঔদার্যের অভিমুখে আকর্ষণ করে। আমাদের জ্ঞান প্রেম ও কর্মের এইরূপ মহত্ত্বসাধনের জন্যই মনু গৃহীকে ব্রহ্মপরায়ণ হইতে উপদেশ দিয়াছেন। মানবপ্রকৃতির যথার্থ চরিতার্থতা তাহাতেই ; ভোগে নহে, খেলায় নহে। প্রতিমাকে স্নান করাইয়া, বস্ত্র পরাইয়া, অন্ন নিবেদন করিয়া, আমাদের কর্মচেষ্টার কোনো মহৎ পরিতৃপ্তি হইতেই পারে না ; তাহাতে আমাদের কর্তব্যের আদর্শকে তুচ্ছ ও সংকীর্ণ করিয়া আনে। ভক্তি ও প্রীতির উদারতা অনুসারে কর্মেরও উদারতা ঘটিয়া থাকে। পরিবারের প্রতি যাহার যে পরিমাণে প্রীতি সেই পরিবারের জন্য সেই পরিমাণে প্রাণপাত করিয়া থাকে। দেশের প্রতি যাহার ভক্তি, দেশের সর্বপ্রকার দৈন্য ও কলঙ্ক-মোচনের জন্য বিবিধ দুরূহ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া সে আপন ভক্তির স্বাভাবিক চরিতার্থতা সাধন করিয়া থাকে। ব্রহ্মের প্রতি যাহার গভীর নিষ্ঠা, সে পরিবারের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি, দেশের প্রতি, সকলের প্রতি মঙ্গলচেষ্টা নিয়োগ করিয়া ভক্তিবৃত্তিকে সফলতা দান করে। দীনকে বস্ত্রদান, ক্ষুধিতকে অন্নদান ইহাতেই আমাদের সেবাচেষ্টার সার্থকতা। প্রতিমার সম্মুখে অন্ন বস্ত্র উপহরণ করা ক্রীড়ামাত্র, তাহা কর্ম নহে ; তাহা ভক্তিবৃত্তির মোহাচ্ছন্ন বিলাসমাত্র, তাহা ভক্তিবৃত্তির সচেষ্ট সাধনা নহে। এই খেলায় যদি আমাদের মুগ্ধহৃদয়ের কোনো সুখসাধন হয় তবে সে ত আমাদের আত্মসুখ, আমাদের আত্মসেবা, তাহাতে দেবতার কর্মসাধন হয় না। আমাদের জীবনের প্রত্যেক ইচ্ছাকৃত কর্ম নিজের সুখের জন্য না করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে করা এবং তাহাতেই সুখানুভব করা দেবসেবার উচ্চ আদর্শ। সেই আদর্শকে রক্ষা করিতে হইলে জড় আদর্শকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

সত্যজ্ঞান দুরূহ, প্রকৃত নিষ্ঠা দুরূহ, মহৎ কর্মানুষ্ঠান দুরূহ সন্দেহ নাই, তাই বলিয়া তাহাকে লঘু করিয়া, ব্যর্থ করিয়া, মিথ্যা করিয়া, মনুষ্যত্বের অবমাননা করিয়া আমরা কী ফল লাভ করিয়াছি? কর্তব্যকে খর্ব করিবার অভিপ্রায়ে, জ্ঞান ভক্তি কর্মকে, মানবপ্রকৃতির সর্বোচ্চ শিখরকে কয়েক খণ্ড মৃৎপিণ্ডে পরিণত করিয়া খেলা করিতে করিতে আমরা কোন্‌খানে আসিয়া উপনীত হইয়াছি! আমরা নিজেকে অক্ষম অশক্ত নিকৃষ্ট অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়া নিশ্চেষ্ট জড়ত্বকে আনন্দে বরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা অকুণ্ঠিত স্বরে নিজেকে আধ্যাত্মিক শিশু বলিয়া প্রচার করি, এবং সর্বপ্রকার মনুষ্যোচিত কঠিন সাধনা ও মহৎপ্রয়াস হইতে নিষ্কৃতি, জ্ঞানীর নিকট হইতে মার্জনা ও ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রশ্রয় প্রত্যাশা-পূর্বক নিদ্রা ক্রীড়া ও উচ্ছৃঙ্খল কল্পনার দ্বারা সুখলালিত হইয়া নিস্তেজ নির্বীর্য হইতে থাকি ; যুক্তিকে পঙ্গু করিয়া, ভক্তিকে অন্ধ করিয়া, আত্মপ্রত্যয়কে আচ্ছন্ন করিয়া, ব্রহ্মকে চিন্তা ও চেষ্টা হইতে দূরীভূত করিয়া, হৃদয় মন আত্মার মধ্যে আলস্য এবং পরাধীনতার সহস্রবিধ বীজ বপন করিয়া, আমরা জাতীয় দুর্গতির শেষ সোপানে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছি। অদ্য আমরা ভয়ে ভীত, দীনতায় অবনত, শোক তাপে জর্জর। আমরা বিচ্ছিন্ন, বিধ্বস্ত, হীনবল। আমাদের বাহিরে লাঞ্ছনা, অন্তরে গ্লানি, চতুর্দিকেই জীর্ণতা। আমাদের বাহিরে জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যেরূপ বিচ্ছেদ, আমাদের নিজের প্রকৃতির মধ্যে, আমাদের চিত্তে বাচি ক্রিয়ায়াং, মনে বাক্যে ও কর্মে বিরোধ, শিক্ষায় ও আচরণে বিরোধ, ধর্মে এবং কর্মে ঐক্য নাই, সেই কাপুরুষতায় এবং বিচ্ছিন্নতায় আমাদের সমাজ আমাদের গৃহ আমাদের অন্তঃকরণ অসত্যে আদ্যোপান্ত জর্জরীভূত হইয়াছে। আমাদিগকে এক হইতেহইবে, সতেজ হইতে হইবে, ভয়হীন হইতে হইবে। অজ্ঞান এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা উন্নতশিরে দণ্ডায়মান হইব। কে আমাদের বল, কে আমাদের আশ্রয়? সে কোন্ সর্বব্যাপী সত্য কোন্ অদ্বিতীয় এক, যিনি আমাদিগকে জাতিতে জাতিতে ভ্রাতায় ভ্রাতায় মনে বাক্যে ও কর্মে একতা দান করিবেন? সংসারের মধ্যে আমরা লোকভয়-মৃত্যুভয়-জয়ী পরমনির্ভর পাই নাই ; সংসার গুরুভার লৌহশৃঙ্খলে আমাদের অবমানিত মস্তককে আরও অবনত করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের জড় দুর্বল দেহকে আরও গতিশক্তিবিহীন করিয়াছে। এই সকল ভয় এবং ভার এবং ক্ষুদ্রতা হইতে ব্রহ্মই আমাদের একমাত্র মুক্তি। দিনে রাত্রে সুপ্তিতে জাগরণে অন্তরে বাহিরে আমরা তাঁহার মধ্যে আবৃত নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহার মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছি, কোনো প্রবল রাজা কোনো পরম শত্রু, কোনো প্রচণ্ড উপদ্রবে তাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। অদ্য আমরা সমস্ত ভীত ধিক্‌কৃত ভারতবর্ষ কি এক হইয়া করজোড়ে ঊর্ধ্বমুখে বলিতে পারি না যে,

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।

তুমি অজাত, জন্মরহিত, কোনো ভীরু তোমার শরণাপন্ন হইতেছে, হে রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহা দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করো। তিনি রহিয়াছেন ; ভয় নাই, ভয় নাই! সম্মুখে যদি অজ্ঞান থাকে তবে দূর করো, অন্যায় থাকে তবে আক্রমণ করো। অন্ধ সংস্কার বাধাস্বরূপ থাকে তবে তাহা সবলে ভগ্ন করিয়া ফেলো ; কেবল তাঁহার মুখের দিকে চাও এবং তাহার কর্ম করো! তাহাতে যদি কেহ অপবাদ দেয় তবে সে অপবাদ ললাটে তিলক করিয়া লও, যদি দুঃখ ঘটে সে দুঃখ মুকুটরূপে শিরোধার্য করিয়া লও, যদি মৃত্যু আসন্ন হয় তবে তাহাকে অমৃত বলিয়া গ্রহণ করো। অক্ষয় আশায়, অক্ষুণ্ণ বলে, অনন্ত প্রাণের আশ্বাসে, ব্রহ্মসেবার পরম গৌরবে সংসারের সংকটপথে সরল হৃদয়ে ঋজুদেহে চলিয়া যাও। সুখের সময় বলো, অস্তি—তিনি আছেন! দুঃখের সময় বলো, অস্তি—তিনি আছেন! বিপদের সময় বলো, অস্তি—তিনি আছেন! পরমাত্মার মধ্যে আত্মার অবাধ স্বাধীনতা, অপরিসীম আনন্দ, অপরাজিত অভয়লাভ করিয়া সমস্ত অপমান দৈন্য গ্লানি নিঃশেষে প্রক্ষালিত করিয়া ফেলো! বলো, যে মহান অজ আত্মা হইতে বাক্য মন নিবৃত্ত হইয়া আসে আমি সেইখান হইতে আনন্দলাভ করিয়াছি, আমি কদাচ ভয় করি না, আমি কাহা হইতেও ভয় পাই না, আবার ন জরাঃ ন মৃত্যুঃ শোকঃ। বলো :

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্‌প্রাণশ্চক্ষুঃশ্রোত্রমথো
বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদং।
মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ
অনিরাকরণমস্তু অনিরাকরণং মেহস্তু।
তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাঃ
তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু ।।

উপনিষৎ-কথিত সর্বান্তর্যামী ব্রহ্ম আমার বাক্য প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র বল ইন্দ্রিয়, আমার সমুদয় অঙ্গকে পরিতৃপ্ত করুন! ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি, তিনি অপরিত্যক্ত থাকুন, তিনি আমা-কর্তৃক অপরিত্যক্ত থাকুন ; সেই পরমাত্মায়-নিরত আমাতে উপনিষদের যে-সকল ধর্ম তাহাই হৌক, আমাতে তাহাই হৌক!

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ।

৭ পৌষ ১৩০৬ ও ৭ পৌষ ১৩০৭ তারিখের পৌষ উৎসবে পঠিত 'ব্রহ্মাপনিষদ' ও 'ব্রহ্মমন্ত্র' ভাষণ দুটির মুদ্রিতরূপ *ঔপনিষদ ব্রহ্ম* ১৩০৮ সালের শ্রাবণ মাসে মুদ্রিত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণকথা

আজ বাংলার নবযুগের ভাববিগ্রহ, ভাগবত-পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিন। এ নাম আজিকার দিনে বহু মানুষের ইষ্টনাম। তাঁরা প্রতিদিন তাঁদের পূজার আসন থেকে এই নাম স্মরণ করে প্রণাম নিবেদন করেন, আজও করেছেন। সেই সমস্ত মানুষের প্রণামের সঙ্গে আমার প্রণাম যুক্ত করি। তিনি আমাদের পথ প্রদর্শন করুন, আমাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

বিশ্ববিধাতার এই অতি বিশাল, অপরিমেয় সৃষ্টিশালার আর কোথায় কোথায় প্রাণলীলার আশ্চর্য মহিমা ও বৈচিত্র্য প্রকটিত তা আজিও মানব-জ্ঞানের অজ্ঞাত। কিন্তু আমাদের চোখের সম্মুখেই এই মর্ত্যলোকে প্রাণলীলার আধুনিকতম পর্যায়ে যে নরলীলা প্রকটিত, তার দিকে তাকিয়ে বা তাকে রচনা করে বিশ্ববিধাতা, মনে হয়, এক আশ্চর্য আনন্দ লীলারস উপভোগ করেন। আর তার সঙ্গে নরদেহধারী আমরাও এই সৃষ্টির সঙ্গে তার স্রষ্টাকে যুক্ত করে যে আশ্চর্য আনন্দ-রস উপলব্ধি করি মনুষ্য উপলব্ধির মধ্যে তা বোধ হয় তুলনারহিত।

এই মর্ত্যলোকে অচ্ছিন্ন নরলীলার ধারায় পৃথিবীর এক এক প্রান্তে মানব ইতিহাস যেন এক একটি বিশেষ মূর্তি পরিগ্রহ করবার বাসনায় ব্যাকুল। পাশ্চাত্য দেশে ইউরোপ আমেরিকা ভূখণ্ডে মানবশক্তি বস্তুবিজ্ঞানকে আশ্রয় করে নিজেকে একটি বিশেষ স্বরূপে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর ইতিহাস তিন-চারি শত বৎসরের অধিক নয়। আবার অন্যদিকে রাশিয়া ও চিনে গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে ইতিহাসের আর এক আশ্চর্য পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। লৌকিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে সকল মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার পরীক্ষা। এই পরীক্ষা সার্থক হলে মানব ইতিহাসে আরও একটি আশ্চর্য সার্থক অধ্যায় সংযোজিত হবে তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু পর্বত সমুদ্রবেষ্টিত আমাদের জন্মভূমি এই ভারতবর্ষে ইতিহাস-পুরুষের অভিপ্রায়টি যেন ভিন্নরূপ এবং আরও স্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করি। মানব-সভ্যতা তার সার্থক অভিব্যক্তির ব্রাহ্মমুহূর্তে পৃথিবীর যে যে অংশে অভিব্যক্ত হয়েছিল আমাদের

মাতৃভূমি তার অন্যতম। অন্য সমস্ত অংশেই সভ্যতার প্রদীপ্ত উদিত সূর্য কবে অস্তমিত হয়ে গিয়েছে। সেই সব ভূখণ্ডে মানুষ যেমন সেদিনও ছিল, আজও তেমনি আছে ; কিন্তু তারা সভ্যতার সেই দীপ্তির উত্তরাধিকারী নয়, সে সভ্যতার সঙ্গে তাদের কোনো যোগ নেই, তারা মাত্র সেই দেশের অন্যকালের অধিবাসী। তার অতিরিক্ত কিছু নয়। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমি এই ভারতবর্ষে বেশ কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে যে সভ্যতার সূর্যোদয় হয়েছিল আজও তার দিনান্ত হয়নি। সেই সূর্যোদয়ই একটি দিনের যামে যামে অগ্রগতির মতো পর্যায়ে পর্যায়ে অবিচ্ছিন্নরূপে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। হয়তো পাঁচ হাজার বছর পূর্বে যে সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছিল আমরা তারই উত্তরাধিকারী। ইতিহাসের যে অভিপ্রায়টি বহুদিন পূর্বে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছিল সেই অভিপ্রায়টি অচ্ছিন্নরূপে আমাদের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের পথ আজও খুঁজে চলেছে। ইতিহাসের পক্ষে একে এক বিস্ময় বলেই মনে করি।

ইতিহাসের সেই অভিপ্রায়টির স্বরূপটি কী? পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে ইতিহাস যে স্বনামে প্রকাশিত হচ্ছে বা হতে চাচ্ছে তার থেকে সে স্বরূপটি আন্তরে বাহিরে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। ইউরোপ যেখানে বস্তুবিজ্ঞান-চর্চার মাধ্যমে বস্তুকণাকে বিভাজন করে আশ্চর্য এক শক্তিকে আবিষ্কার করে তাকে করায়ত্ত করেছে, ভারতবর্ষ সেখানে পরীক্ষানিরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে মানব মন ও চৈতন্যকে নিয়ে, আরম্ভ হয়েছে সেই তার সভ্যতাবিকাশের আদি মুহূর্ত থেকে। এরই প্রমাণ মিলবে আমাদের লৌকিক জীবনের দিকে তাকালে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমরা বিদেশে অভিযান করিনি, বহির্ভারতের কোনো দেশ জয় করিনি, কদাচিৎ বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছি, বিদেশে বাণিজ্য করে মণিমাণিক্য বা অর্থসম্পদ নিজের দেশে বহন করে আনার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠিনি। হিমালয় থেকে কন্যা-কুমারিকা এবং সৌরাষ্ট্র থেকে মণিপুর পর্যন্ত অঞ্চলে আমাদের জীবনকাল থেকে কালান্তরে বড়ো নিস্তরঙ্গ, বড়ো মন্থর, বড়ো ঘটনাহীন। হয়তো এরই মধ্যে কোনো রাজা বা ভূস্বামী পার্শ্ববর্তী কোনো রাজ্যের রাজা বা ভূস্বামীর সঙ্গে সাময়িকভাবে কিছু কলহ বা কিছু সংগ্রাম বা কিছু রক্তপাত করেছেন এই মাত্র। আমাদের জনসমাজের বৃহৎ ব্যাপক যে জীবন তা বরাবরই সমান নিরুত্তাপ ও নিস্তরঙ্গ ছিল। তবে আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে বিদেশি অভিযানকারীর অত্যাচার ও অস্ত্রাঘাত সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, যারা একদা বিদেশ থেকে অভিযানকারী হয়ে অস্ত্রহাতে এই ভূমিখণ্ডে এসেছিল, তারাই পরবর্তীকালে এই মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যে অস্ত্র পরিত্যাগ করে প্রতিবেশী হয়ে বসবাস আরম্ভ করেছে। এমনটি একবারই ঘটেনি, বারবারই ঘটেছে। এই রাজবৃত্তের অন্তরালে, আমাদের প্রতিদিনের জীবন থেকে, জীবনের সত্যকে জানবার উদ্‌ঘাটনের আকুল তৃষ্ণায় তাপিত হয়ে, নচিকেতার মতো বহু মানুষ লৌকিক সংসারের সুখ ও সঙ্গ পরিত্যাগ করে গৃহস্থ জীবনের সমান্তরালে, লোকচক্ষুর অগোচরে প্রবাহিত সন্ন্যাস-জীবনে গিয়ে প্রবেশ করেছেন।

রাজপুত্র গৌতম, মহাবীর এমনি ধারার পুণ্য নাম। সেই চির-প্রবাহিত প্রবাহে আজও ছেদ পড়েনি।

মানুষ থেকে, জনসমাজ থেকে দূরে গিয়ে তাঁরা জীবনের সত্য ও অর্থকে উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন। এই কাজে কেউ স্রষ্টা ঈশ্বরকে তাঁদের ধ্যান-ধারণার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছেন, কেউ করেননি। এই প্রচেষ্টায় কত পরীক্ষা, কত নিরীক্ষা! কত বিচিত্র পথ, কত বিচিত্র মত! এরই ফলে কেউ নিরীশ্বরবাদী, কেউ ঈশ্বরবাদী; কেউ সাকারবাদী, কেউ নিরাকারবাদী ব্রহ্মবাদী ; কেউ বৈষ্ণব, কেউ শাক্ত, কেউ শৈব, কেউ সৌর-উপাসক; কেউ তান্ত্রিক, কেউ বীরাচারী, কেউ বামাচারী। কেউ ঈশ্বরকে ভজনা করেছেন প্রিয়রূপে, কেউ সখারূপে, কেউ পিতারূপে, কেউ প্রভুরূপে, কেউ জননীরূপে। এই সাধকরা অনেকেই সত্যসন্ধান করতে গিয়ে সমুদ্রের জলে নুনের পুতুলের মতো গলে হারিয়ে গিয়ে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হয়েছেন। কেউ বা সেই আশ্চর্যকে জেনে সেই অমৃতময় আস্বাদনকে মরণশীল, পীড়িত মানুষের জন্য মানবসমাজে বহন করে এনেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই চলমান জ্যোতিষ্ক সমাজের অন্যতম প্রধান উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তবে তাঁর ক্ষেত্রে যেন এই লীলাটি একটু পৃথক ও বিচিত্র ভঙ্গীর। অবশ্য সব মহৎ সাধকের সাধনার ধারাটি সশ্রদ্ধ অনুরাগের সঙ্গে চর্চা করলে তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যকে অনুধাবন করা সম্ভব হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে তার বিশেষত্ব নিবেদন করি। তার পূর্বে একটি সর্বজনবিদিত বিষয় পুনরুক্তি করছি। বঙ্গদেশে ঈশ্বর কালিকা মূর্তিতে প্রকটিত; সর্বভারতীয় ধরনের বিভিন্ন সাধনা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের মতো বাংলাদেশে প্রচলিত থাকলেও বাংলাদেশে ঈশ্বরকে মাতৃমূর্তিতে সাধনাটিই বিশেষ স্ফূর্তিলাভ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণও ঈশ্বরকে প্রধানত মাতৃভাবেই আরাধনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে মনে হয় ভক্ত যেমন ভগবানের জন্য আকুল হন, ভগবানও ভক্তের সঙ্গলাভের ও সাধনার জন্য তেমনি আকুলভাবে যেন অপেক্ষা করছিলেন। আজ যেখানে দাঁড়িয়ে এই সুমহান সাধক ও ঈশ্বরভক্তকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, সেখান থেকে পুণ্যতোয়া গঙ্গাধারার উজানে, কিছু উত্তরে, গঙ্গার অপরতীরে ঈশ্বররূপিণী জননী শ্রীশ্রীভবতারিণী যেন ভক্ত সন্তানের জন্য খেলার আঙিনা পেতে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন পরম আগ্রহে। সেই আগ্রহ পরিপূরণের জন্যই যেন শ্রীরামকৃষ্ণ একদা গিয়ে দক্ষিণেশ্বরের অঙ্গনে সন্তানের মূর্তিতে আবির্ভূত হন। ভক্ত-ভগবানের আশ্চর্য প্রেমের লীলা আরম্ভ হল।

ঈশ্বর ও ভক্তের ব্যক্তিগত সাধনার কথাটি মাত্র উল্লেখ করেই এখানে বলতে পারি দেশের বৃহত্তর প্রয়োজনে এই আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ, লৌকিক সংজ্ঞায় যাকে পণ্ডিত বলে তা তিনি ছিলেন না, ধনীও ছিলেন না, কিন্তু তাঁকেই সেদিন জাতির প্রয়োজন ছিল। সেই দিক থেকে এ আবির্ভাব ঐতিহাসিক। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আমাদের সংস্কৃতি ও সাধনার ইতিহাস শান্ত, উচ্ছ্বাসহীন, এবং অনেক পরিমাণ অন্তঃস্রোতচারী

এবং সর্বোপরি তা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে প্রবাহিত। এই অবিচ্ছিন্ন স্রোতধারায় মধ্যে মধ্যে মন্থরতা আসে, কালের করস্পর্শে তার বেগই শুধু মন্দীভূত হয় না তাতে সহস্র ভয়ার্ত ও ক্ষুদ্রচিত্তের অবিলতা ও আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়। জীবনজলে বিষ-জর্জরতা অনুভব করি। তখনই যেন কোনো ঐশ্বরিক প্রসাদে অথবা এই ভূমিখণ্ডে ইতিহাসের বিশিষ্ট প্রয়োজনে এক বা একাধিক পুরুষ আবির্ভূত হয়ে তাঁদের সাধনমহিমার শক্তিতে সেই পুঞ্জীভূত আবর্জনা ও আফিসতাকে দূর ও পরিষ্কার করে তাকে কালোচিত মূর্তিদান করে যান। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সামান্য কিছুদূর উজানে গেলেই তার বহু উদাহরণ দৃষ্টিতে আসবে। মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বে আর একজন তেজস্বী পুরুষ এই বাংলাদেশেই ভাগীরথীর ধারার আরও খানিকটা উত্তরে নবদ্বীপধামে আবির্ভূত হয়ে হরিচরণস্রুত নামের পুণ্য ধারায় বাঙালির জীবনের আবর্জনা একবার পরিষ্কার করে দিয়ে হরিনামের পাদপীঠ রচনা করে গিয়েছিলেন। তার সঞ্জীবনীতে বাঙালি জাতি তখনকার মতো বেঁচে গিয়েছিল। শুধু বাঁচা নয়। নতুন করে সঞ্জীবিত হয়েছিল। আজও তাহার রেশ অনুভব করি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবার একবার এমনি আবির্ভাবের যেন প্রয়োজন ঘটেছিল। তার কিছুকাল পূর্বে দেশের পুরাতন রাজশক্তি বিধ্বস্ত ও ধ্বংস হয়েছে; তার স্থলে আবির্ভূত হয়েছে সমুদ্রপার থেকে আগত নবীন এক আগন্তুক রাজশক্তি। তার হাতে শুধু কঠিন শাসনদণ্ডই ছিল না, তার সে শাসনযন্ত্র ছিল সুশৃঙ্খল। সেই সঙ্গে সে সমুদ্রপার থেকে নিয়ে এসেছিল পাশ্চাত্য বস্তুতন্ত্রবাদ ও এক অভিনব দর্শন। তার সম্মুখে আমাদের প্রাচীন সংস্কার, ধ্যান ধারণা, সবই প্রবল আঘাত খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে চলেছে। আমাদের ধ্যান ধারণা সেদিন একদিকে সংস্কারের অন্ধকারে আবৃত, সমাজদেহ জীর্ণ। অন্য দিকে নবীন বিদেশি সংস্কৃতির জয়ধ্বজা আমাদেরই এক অংশ সগৌরবে, সদম্ভ মূঢ়তার সঙ্গে বহন করে চলেছি। আমাদের অপরাংশ মূক, পঙ্গু, সমস্ত বিশ্বাসসংশয়ে বিমূঢ়। সেই মুহূর্তে ইতিহাসের অমোঘ অভিপ্রায়ে সর্বগ্রন্থি মোচনকারী, সর্বসংশয় ছেদনকারী উপলব্ধি নিয়ে আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। একদিকে যেমন রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র এক নবধর্মের প্রবর্তন করলেন, অন্যদিকে আমাদের সনাতন ধ্যানধারণা ও উপলব্ধির অঙ্গ থেকে সঞ্চিত মালিন্য ও আবর্জনাকে বিদূরিত করে তাকে কালোচিত নবীন এক অম্লান মূর্তিতে তিনি স্থাপন করলেন। ভারতের সনাতন উপলব্ধি দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গণে জননী শ্রীশ্রীভবতারিণীর শ্রীপদপ্রান্তে পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে বাণীমূর্তি লাভ করল। পরবর্তীকালে এরই কর্মকাণ্ড রচিত হল তাঁর প্রিয়তম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের হাতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে বাণী প্রচার করেছেন তা ভারতের শুধু কেন, তা মনুষ্যসভ্যতার নির্মলতম ও সরলতম বাণী। তাই এক দিকে সে তাঁরই জীবনের বাণী। তিনি নিজে তাঁর

কোনো বাণী লিপিবদ্ধ করেননি, করার প্রয়োজনও বোধ করেননি। গঙ্গোত্রীর উৎস-মুখ কি গঙ্গাধারার অঞ্জলিকে কমণ্ডলুতে ধারণ করে রাখার প্রয়োজন বোধ করে? তিনিও করেননি। তবে আমাদের মহাসৌভাগ্য, তাঁরই এক ভক্ত আমাদের জন্য তার কিছু কিছু গ্রন্থাকারে গ্রন্থন করে গিয়েছেন। আমি বিশ্বাস করি, শ্রীম কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' কয়েক খণ্ড চৈতন্যচরিতামৃতের' মতোই আমাদের কাছে মহা শ্লাঘার সামগ্রী এব আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে মহামূল্য সংযোজন। যাঁরা এই মহাগ্রন্থ পাঠ করেছেন, তাঁরা জানেন, এই গ্রন্থগুলির মধ্যে যে অত্যন্ত কঠিন, জটিল ও গূঢ় উপলব্ধির কথা রয়েছে তা কতখানি শিশুপাঠ্য, কত সরল, কত সহজ ও কত কাব্যময়! পড়ামাত্র অনুভব হয় যে, যিনি এই বাণী উচ্চারণ করে গিয়েছেন তাঁর উপলব্ধি কত ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী, তা কত সরল ও সহজ! এগুলি যিশুর বাণীর সমতুল্য বলে মনে করলে অন্যায় হবে না। এবং আমি বিশ্বাস করি আমাদের হৃদয় শুকিয়ে গেলে এই বাণীর ভৃঙ্গারের কাছে সশ্রদ্ধ অঞ্জলি পাতালে এক মুহূর্তে সকল সংশয়-নিরসনকারী অমৃতধারা পেতে বিলম্ব হবে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ভক্ত গ্রন্থকর্তা শ্রীমকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বসংশয় মোচনকারী, সর্বগ্রন্থি ছেদনকারী অমৃতবাণী আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনার কল্যাণে সনাতনকে নবীন, নির্মল মূর্তিতে আবিষ্কার করে আমাদের সম্মুখে স্থাপন করে গিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে সমাজদেহের বহু গ্লানি বিদূরিত হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণই আমাদিগকে স্বামী বিবেকানন্দকে আশীর্বাদস্বরূপ দান করে গিয়েছেন, এ সবই সত্য, অতি সত্য। তার জন্য তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই। কিন্তু এহ বাহ্য। তিনি আমাদের মনে যে প্রেমের আসনে আজও আসীন তা কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা থেকে পৃথক।

ব্যক্তি হিসাবে তাঁর মূর্তি কল্পনা করতে গেলেই তাঁকে এক অতি সাধারণ, কিন্তু এক আশ্চর্য মূর্তিতে দেখতে পাই। সেখানে তিনি এবং শ্রীশ্রীভবতারিণী অচ্ছেদ্য এবং অভিন্ন। সে এক আশ্চর্য ভালোবাসার লীলা! সেই লীলায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, রাজরাজেশ্বর, জননী শ্রীশ্রীভবতারিণীর মূর্তিতে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তাঁর হাতের দেওয়া খাদ্য গ্রহণ করে নিজে তৃপ্ত হয়েছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ-বিগ্রহের আধারে যে সন্তানরূপী শিশু অনন্তকাল মায়ের জন্য ব্যাকুলহস্ত সম্প্রসারিত করেছে তাকে কৃতকৃতার্থ করেছেন। কল্পনা করি, সকল মানবদৃষ্টির অন্তরালে তিনি মাকে অনুরোধ করেছেন, যশোদা নাচত তোরে বলে নীলমণি, একবার তেমনি করে নাচ দেখি মা! মা সন্তানের সে অনুরোধ শিরোধার্য করে কন্যারূপে নেচেও হয়তো পরম প্রীতিলাভ করেছেন।

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি উৎসব সভায় (১৮।২।৬৯) প্রদত্ত ভাষণ।

বিনয় সরকার

হিন্দুধর্মের দিগ্‌বিজয় ও রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য

আজ ৬ই জুন, ১৯৩৬। উনত্রিশ বৎসর পূর্বে এই দিনে আমাদের এই মালদহে 'জাতীয় শিক্ষা সমিতি' জন্মগ্রহণ করে। মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির জন্ম উপলক্ষ্যে 'বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে অন্যান্য অনেক কথার ভিতর ছিল 'দিগ্‌বিজয়ে'র কথা। বলিয়াছিলাম, 'দেখ্‌ব ভারতের ধর্মনেতারা দেশ হ'তে দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হবেন।'

উনত্রিশ বৎসর পর ঠিক সেই তারিখে আমি মালদহের রামকৃষ্ণ মহোৎসবে খাড়া আছি। আজ আমার মুখে আর কোনো কথা বাহির হইবে পারে? দিগ্‌বিজয়ের কথা লইয়া জন্মিয়াছি, সেই দিগ্‌বিজয়ের কথাই পাড়িব। হিন্দুধর্মের দিগ্‌বিজয় আজ আমার মুদ্দা।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে যখন মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি কায়েম হয় তখন বিবেকানন্দের মৃত্যু হইয়াছে পাঁচ বৎসর। তখনও বিবেকানন্দের শিষ্যেরা গুন্‌তিতে পুরু নয়। তখনও রামকৃষ্ণ মিশন বাংলা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বস্তুত আজকাল যে আকারে রামকৃষ্ণ মিশন চলিতেছে তাহা ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে শুরুই হয় নাই। কিন্তু এই উনত্রিশ বৎসরের ভিতর কী দেখিতেছি? আজ বাংলাদেশের নানা স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনের ২০টা কর্মকেন্দ্র হইতে বিংশ শতাব্দীর নবীন হিন্দুধর্মের ও নবীন আধ্যাত্মিকতা প্রচার সাধিত হইতেছে। নয়া বাংলার হিন্দুধর্ম ও হিন্দু আধ্যাত্মিকতা আজ বাংলা দেশের বাহিরে ভারত-বিজয়ী হইতে পারিয়াছে। ভারতের জনপদে-জনপদে আজ ৪৬টা রামকৃষ্ণ-স্মৃতিমণ্ডিত কর্মকেন্দ্র চলিতেছে। আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ, বম্বে, মান্দ্রাজ, মহীশূর রাজ্য, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য, কোচিন রাজ্য এবং মালাবার অঞ্চল সর্বত্রই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিনিধিরা একালের বঙ্গদর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। এই বৎসরই পাঞ্জাবে এবং নবগঠিত সিন্ধুপ্রদেশেও রামকৃষ্ণ মিশনের স্থায়ী কর্মকেন্দ্র কায়েম হইবে।

এইখানে বলিয়া রাখা ভালো যে, মধ্যযুগে বাঙালি চৈতন্যের ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা বাংলা দেশের বাহিরেও প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু উড়িশা ও আসাম ছাড়া ভারতের আর কোথাও চৈতন্যপন্থী হিন্দু নরনারী দেখা দেয় নাই। বাঙালির ইতিহাসে আজ প্রথম দেখিতেছি যে, বাঙালির চিন্তাও কর্মরাশি অবাঙালি ভারতীয় নরনারীর জীবনে সুবিস্তৃতরূপে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতে একটা 'বাঙালি যুগে'র সূত্রপাত দেখা যাইতেছে। 'ভারতে' এত দিনে বাঙালি জাতের 'ঠিকানা' কায়েম হইতে চলিল। বাংলার নরনারীর পক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন একটা যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছে। * লেখকের 'বিশ্বসভ্যতায় 'বাঙালি-যুগের' প্রবর্তক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' ('আর্থিক উন্নতি', জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩, মে-জুন ১৯৩৬)।

ভারতের বাহিরে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ চলিতেছে, লঙ্কায়। ব্রহ্মদেশে রামকৃষ্ণের নিশান খাড়া দেখিয়া আসিয়াছি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর, রেঙ্গুনে। মালয় জনপদের সিঙ্গাপুর বন্দরেও এই ঝাণ্ডা উড়িতেছে।

বিবেকানন্দের দিগ্‌বিজয় শুরু হয় মার্কিন মুল্লুকে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে। আমেরিকায় আজকাল বেদান্ত চর্চা চলিতেছে ১৩-১৪টি কেন্দ্রে নিত্যনৈমিত্তিক ভাবে। এই গেল উত্তর আমেরিকার কথা। দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনিশভাষী আর্জেন্টিনা দেশে রামকৃষ্ণের নামে আশ্রম পরিচালিত হইতেছে। জার্মানিতে মিশনের প্রতিনিধি গিয়াছেন জার্মান দর্শনসেবীদের নিমন্ত্রণে। বিলাতের ইংরেজ নরনারীও রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের নামে কেন্দ্র কায়েম করিতে উৎসাহ দিয়াছে। তাহা ছাড়া পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, সুইট্‌সার্ল্যান্ড ইত্যাদি দেশে কেন্দ্র গঠনের ব্যবস্থা হইতেছে।

দেশ-বিদেশের নানা কেন্দ্রে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিষ্যেরা স্থায়িরূপে মোতায়েন আছেন। এই সকল প্রতিনিধিদের ভিতর শতকরা পনেরো জন মাদ্রাজি। অন্যান্য সকলেই এক প্রকার বাঙালি।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় ও বাংলা দেশের বহুসংখ্যক পল্লিতে রামকৃষ্ণের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইতেছে। এইরূপ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইতেছে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই। অপর দিকে লঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, মালয় ইত্যাদি ভারত-সংলগ্ন এশিয়ায় উৎসব কায়েম হইতেছে। এই উপলক্ষ্যে এশিয়ার চিন, জাপান ইত্যাদি দেশ হইতে কলিকাতায় বেলুড় মঠের জন্য শুভাকাঙ্ক্ষা আসিতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব আফ্রিকা ইত্যাদি ভূখণ্ডে উৎসবের ব্যবস্থা হইতেছে। অধিকন্তু ইয়োরামেরিকার নানা দেশেও রামকৃষ্ণশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে খ্রিস্টিয়ান নরনারী নবীন হিন্দুধর্মের ও নবীন হিন্দু আধ্যাত্মিকতার সংবর্ধনা করিতেছে। সে সকল দেশে রামকৃষ্ণ মিশনের কোনো স্থায়ী বা অস্থায়ী কর্মকেন্দ্র নাই সেই সকল দেশেও আজ রামকৃষ্ণ-কথা-গুল্‌জার।

সুতরাং দেখিতেছি যে, 'ভারতের ধর্মনেতারা' সত্যসত্যই 'দেশ হতে দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত' হইয়াছিলেন, আর দিগ্‌বিজয় সাধিত হইয়াছেও। সেই দিগ্‌বিজয়ের চিহ্নও তো

দেখিতেছি জগতের কেন্দ্রে-কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যে। এই হিন্দু সাম্রাজ্যের মারফৎ দেশ-বিদেশের নরনারী বাংলার ও অবশিষ্ট ভারতের নরনারীর সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগ, আত্মার কোলাকুলি, সংস্কৃতির বিনিময় চালাইতেছে। রাষ্ট্রিক আর আর্থিক কর্মক্ষেত্রে বাঙালিরা দুনিয়ায় আজ যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন,—এই বৎসর ত্রিশেকের ভিতর তাহারা বিংশ শতাব্দীর বিশ্বব্যাপী নবীন হিন্দু সাম্রাজ্য কায়েম করিয়া ছাড়িয়াছে। নবীন বঙ্গ-দর্শন, নবীন বঙ্গ-ধর্ম, নবীন বঙ্গ-সংস্কৃতি, নবীন বঙ্গের সৃষ্টি-সম্পদ, নবীন বঙ্গের আধ্যাত্মিকতা আজ দুনিয়ার নরনারীর জীবনে ছাপ মারিতে পারিতেছে।

জয় রামকৃষ্ণের জয়, জয় বিবেকানন্দের জয়, জয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জয়। যে-সকল কর্মবীর ও চিন্তাবীর 'স্বামী'রা এই বিপুল সংস্কৃতি সাম্রাজ্য, ধর্ম সাম্রাজ্য ও আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য দেশ-বিদেশে কায়েম করিতে সমর্থ হইয়াছেন সেই সকল সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা রামকৃষ্ণ ভক্ত বিবেকানন্দ-পন্থীরা একালের ভারতীয় নরনারীর প্রণম্য।.বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় কর্মনিষ্ঠা ও চিন্তাসম্পদের তালিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের শ'পাঁচেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সর্বথা সংবর্ধনাযোগ্য ও স্মরণীয় মহাপুরুষ। আমরা বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় কৃতি স্ত্রী-পুরুষদের নাম করিবার সময় সাধারণত বিজ্ঞানসেবী, সাহিত্যসেবী, রাষ্ট্রসেবী, বাণিজ্যসেবী, শিল্পসেবী ইত্যাদি লোকের কথা মনে আনিয়া থাকি। বাস্তবিক পক্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের 'স্বামী' রাও সেই সঙ্গেই সর্বথা উল্লেখযোগ্য।

হিন্দুধর্ম দিগ্‌বিজয়ের ধর্ম। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের (৭।১৫) ঋষিরা জানিতেন. 'নানাশ্রান্তায় শ্রীরস্তি।' চলিয়া চলিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া যে-লোকটা হয়রান-পরেষান হয় নাই সেই লোকটার নসিবে শ্রী নাই, সম্পদ নাই। তাঁহাদের জীবনের আসল কথা ছিল, চল্, 'আগে চল্ আগে চল্ ভাই', 'চরৈবেতি', 'চরৈবেতি'। বর্তমান লেখকের বোলচালে

ছুটাছুটি কর্চে সদা উদ্বেগে ভরা পরাণে তারা,
শান্তি তারা চাখে না কখনো জানে না আরাম ক্লান্তিহারা।

এইরূপ ছুটাছুটি আর 'চরৈবেতি'র ফল আজ পাঁচ-ছয় হাজার বৎসর পর কী দেখিতেছি? দেখিতেছি যে, হিন্দুধর্ম পল্লি হইতে পল্লিতে গিয়াছে, জনপদ হইতে জনপদে গিয়াছে, দেশ হইতে দেশে গিয়াছে। অসংখ্য অনার্য আর্যে পরিণত হইয়াছে., অসংখ্য অহিন্দুকে হিন্দু করা হইয়াছে, অসংখ্য অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণের ইজ্জৎ দেওয়া হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষ আর্য, সনাতন বা হিন্দুধর্মের তাঁবে আসিয়াছে। ভারতের বাহিরে, উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম, চারদিক তামাম এশিয়ায় হিন্দুধর্মের এক্তিয়ার কায়েম হইয়াছে। প্রাচীন 'বৃহত্তর ভারত'

হিন্দুধর্মের ও হিন্দু-সংস্কৃতির দিগ্‌বিজয়ে গঠিত। সেই দিগ্‌বিজয় আজও চলিতেছে। আজও ভারতের পাহাড়ে জঙ্গলে 'আদিম' নরনারী লাখে-লাখে হিন্দু হইতেছে, আর্য্য-সংস্কৃতির চৌহদ্দিতে প্রবেশ করিতেছে। আজও এশিয়ায়, আফ্রিকায়, ইয়োরমেরিকায় হিন্দু-সংস্কৃতির 'চরৈবেতি' দেখা যাইতেছে। দুনিয়ার রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য এই নবীন হিন্দু সাম্রাজ্যেরই,— আধুনিক 'বৃহত্তর ভারতের'ই অন্যতম প্রতিমূর্ত্তি।

শক্তিযোগ ও পৌরুষ

হিন্দুধর্ম শক্তিযোগের ধর্ম। অথর্ববেদের (১২।১।৫৪) পুরুষ দুনিয়াকে লক্ষ করিয়া বলিতেছে:

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাষহি।।

অর্থাৎ

পরাক্রমের মূর্তি আমি
সর্বশ্রেষ্ঠ নামে আমায় জানে সবে ধরাতে।
জেতা আমি বিশ্বজয়ী ;
জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

পরাক্রম, শক্তি, আত্মপ্রতিষ্ঠা, বিশ্ববিজয়, এই সবই হইল হিন্দু নরনারীর পক্ষে মুড়ি-মুড়কি স্বরূপ। এই মুড়ি-মুড়কির জোরেই হিন্দু-নরনারী সারা জগৎকে দখলে আনিয়াছে। বলিয়াছে অহংকারের সহিত,

রে দুনিয়া মেরে গোড় পর সো যাও,
রে জাহাঁ মেরে কব্‌জে মে আ যাও।

হিন্দুধর্ম পৌরুষের ধর্ম, পুরুষকারের ধর্ম, 'বাপকা বেটা'র ধর্ম।

অশেষ সংগ্রামের ধর্ম

হিন্দুধর্ম অফুরন্ত আশার ধর্ম। হিন্দু নরনারী প্রতি মুহূর্তেই নতুন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। কোনো মুহূর্তকেই হিন্দু তাহার জীবনের চরম অবস্থা বিবেচনা করে না। প্রচুর উন্নতির পরও হিন্দু চায় আরও উন্নতি। উন্নতির সীমানা দেখা হিন্দুধর্মের কোষ্ঠীতে পাওয়া যায় না। দিগ্‌বিজয়ের পরও দিগ্‌বিজয় কামনা করা হইল হিন্দু নরনারীর সনাতন প্রার্থনা। ভগবানের নিকট হিন্দু যে-সকল প্রার্থনা চালাইতে অভ্যস্ত তাহার আসল মুদ্দা নিম্নরূপ :

অসতো মা সদ্‌গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।' (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ১।৩।২৮)

হিন্দুরা সর্বদাই এক-একটা অসতের ঘাড় মট্‌কাইবার জন্য লালায়িত। তাহার ঠাঁইয়ে চায় তাহারা এক-একটা নতুন সৎ কায়েম করিতে! হিন্দুর চোখে প্রতি মুহূর্তেই এক-একটা অন্ধকার আসিয়া খাড়া হয়। এই অন্ধকারকে ধ্বংস করিয়া তাহার রাজ্যে এক-একটা নয়া জ্যোতি ছড়াইবার ব্যবস্থা করা হিন্দুধর্মের মামুলি কথা। প্রতি মুহূর্তেই হিন্দু নরনারী চায় মৃত্যুঞ্জয়ী হইতে। মৃত্যুকে জুতাইয়া দুরস্ত করিয়া, মৃত্যুর তোআক্কা না রাখিয়া, মৃত্যুভয়ে অস্থির না হইয়া, সাহসের সহিত কাজ করিতে-করিতে,—হিন্দু নরনারী চায় প্রতি মুহূর্তই নতুন-নতুন অমৃত বা নতুন-নতুন জীবন চাখিতে। ফি বার অমৃত বা জীবন চাখিবার পরই হিন্দু প্রস্তুত হয় নতুন একটা মৃত্যু, নতুন একটা কাপুরুষতা, নতুন একটা দারিদ্র্য, নতুন একটা অস্বাস্থ্য, নতুন একটা অবসাদ নৈরাশ্য-দুর্বলতার সঙ্গে লড়িতে। ইহাই হিন্দু জীবনের গতি।

সকল দিক হইতেই হিন্দুধর্ম অসীম উন্নতির ধর্ম, অন্তহীন কর্মনিষ্ঠার ধর্ম, অশেষ সংগ্রামের ধর্ম। ইহারই নাম,

এত উচ্চে উঠেছি তবু উচ্চতমের অনেক দেরি!

'উচ্চতম'কে পাকড়াও করা হিন্দু মেজাজে অসম্ভভ। চাই কেবল সাধনার পর সাধনা, সাধনার সিঁড়ি, সাধনার স্রোতে।

খানিকটা বাড়্‌তি ঘটিয়াছে বলিয়া খাতিরজমা হইয়া বসিবার সময় নাই। কোনো কোনো দিকে কিছু কিছু উন্নতি দেখা যাইতেছে বলিয়া নিষ্কর্মাভাবে নাকে তেল দেওয়া যাউক, এই কথা হিন্দুর মুখ হইতে বাহির হওয়া অসম্ভব। হিন্দু দেখিতে পায় নতুন-নতুন অসৎ, নতুন-নতুন তমঃ, নতুন-নতুন মৃত্যুর অবসাদ। অতএব লাগিয়া যায় হিন্দু নরনারী বাড়্‌তির পরে ও বাড়্‌তির কাজে। দিগ্‌বিজয়ের পরেও চায় হিন্দু নতুন দিগ্‌বিজয়।

চাই নতুন দিগ্‌বিজয়

আজ বাংলার হিন্দুকে দিগ্‌বিজয়ের কথা ভাবিতে হইবে। দুনিয়ায় রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য কায়েম হইয়াছে। এই সাম্রাজ্য দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতের ভিতরেই, বাংলাদেশের ভিতরেই হিন্দুধর্মের দিগ্‌বিজয় আবশ্যক। নতুন-নতুন অনার্যকে আর্যের সিঁড়িতে আনিয়া খাড়া করা যাইতে পারে। সম্প্রতি সেকথা বলিতেছি না। সাঁওতাল,

ওরাওঁ, খাঁসিয়া, গারো ইত্যাদি 'আদিম' জাতিকে হিন্দু-সংস্কৃতির অন্তর্গত করিবার কথা বলিতেছি না। এই সবও চলিতেছে। এই সকল দিকে কাজ বাড়ানো আবশ্যকও। আজ বলিতেছি 'সনাতন' হিন্দু নরনারীর পরিবারে পরিবারে হিন্দুধর্মের গভীরতর প্রবেশের কথা। সনাতন হিন্দুরা আজও ষোল আনা হিন্দু হইতে পারে নাই। প্রত্যেক হিন্দুকে পুরোপুরি হিন্দু হইতে হইবে। হিন্দুধর্মের গভীরতর আত্মপ্রকাশকেই বলিতেছি হিন্দুধর্মের নতুন দিগ্‌বিজয়। অর্থাৎ তথাকথিত হিন্দু নরনারীকে খাঁটি ও গভীরভাবে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করার কথা পাড়িতেছি।

'যত মত, তত পথ'

এই নতুন দিগ্‌বিজয়ের জন্য পথ তৈয়ারি হইয়াই আছে। রামকৃষ্ণের দৌলতে বাংলার হিন্দু একটা নতুন মন্তর পাইয়াছে। আমরা আওড়াইতে শিখিয়াছি, 'যত মত, তত পথ'। ভাল কথা। এই মন্তরের ব্যাখ্যা আবশ্যক জীবনের কর্মক্ষেত্রে। মন্তরটা প্রয়োগ করা চাই প্রতিদিনকার প্রত্যেক উঠা-বসায়। প্রতিদিনকার কাজে আমরা দেখিতে চাই যে, বাস্তবিক পক্ষে সব কয়টা মতই সম্মানযোগ্য, কোনো মতই ফেলিতব্য নয়। অধিকন্তু আমার পথটাই একমাত্র পথ নয়, আর তোমার পথটাও একমাত্র পথ নয়। দুনিয়ায় পথ হাজার-হাজার। অতএব জগতের কোনো পথই তুচ্ছ, বর্জনীয়, অস্পৃশ্য নয়। যে লোকটা যে পথে চলিতে চায়, দাও তাহাকে সেই পথে চলিতে। সুতরাং হিন্দু 'সমাজে' 'ম্লেচ্ছ' বা 'অস্পৃশ্য' ইত্যাদি শব্দের আওয়াজ শুনিতে পাওয়া উচিত নয়। হিন্দুর জীবন হইতে 'ম্লেচ্ছ' আর 'অস্পৃশ্য' বস্তু দুইটা খেদাইয়া দেওয়া কর্তব্য।

'যত মত, তত পথ'-বাণী বাঙালি হিন্দুর মুড়োয় নতুন ঘি ঢালিতে পারিয়াছে। বাঙালি হিন্দুর মাথা কিছু কিছু পরিষ্কার হইয়াছে। বাংলার হিন্দু ইহার প্রভাবে আধ্যাত্মিক হিসাবে খানিকটা 'উদার' হইতে শিখিয়াছে। কিন্তু একমাত্র 'আধ্যাত্মিক' উদারতায় পেট ভরিবে না। 'যত মত, তত পথ' আওড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে 'সামাজিক' জীব হিসাবেও বাঙালি হিন্দুর উন্নত হওয়া আবশ্যক। নানা শ্রেণির ও নানা ধর্মের নরনারীর সঙ্গে লেনদেন চালাইবার কাজে 'যত মত, তত পথ'। মন্তর এখনো বাঙালি-হিন্দুর প্রাণের মন্তরে পরিণত হইতে পারে নাই। এই বাণীর উপরে 'সামাজিক' উদারতার বনিয়াদ গড়িয়া উঠুক। তাহা হইলে হিন্দুধর্মের দিগ্‌বিজয় কতকগুলি নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রে মূর্তি দেখাইতে পারিবে। রামকৃষ্ণকে বাঙালি হিন্দু আজও পুরোপুরি কাজে লাগাইতে পারে নাই। কথাটা বিনা গোঁজামিলে জানিয়া রাখা উচিত যে, রামকৃষ্ণের বাণী এখনও বাঙালি হিন্দুর পুরোপুরি মরমে পশে নাই।

আম্বেদকার বনাম সনাতনী

অস্পৃশ্য জাতিপুঞ্জের দরদ বুকে লইয়া জন্মাবধি-অস্পৃশ্য মারাঠা পণ্ডিত আম্বেদকার সনাতন হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছেন। ১৯৩২ সনে তাঁহার বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের তীব্র উত্তেজনা চলিতেছিল। সেই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের এই মালদহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঘটনাচক্রে ১৮ তারিখের সভায় এই অধমও উপস্থিত ছিল। সেইদিন আলটপ্‌কাভাবে সভাক্ষেত্রে প্রকাশ্যরূপে বাংলার হিন্দু নরনারীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'আম্বেদকার আপনাদের বিরুদ্ধে লড়িতেছেন আর আপনারা আম্বেদকারের বিরুদ্ধে লড়িতেছেন। কিন্তু আপনারা প্রত্যেকে নিজ-নিজ বুকে হাত দিয়ে বলিতে সাহস করেন কী যে, আপনারা আম্বেদকারের চেয়ে বেশি স্বদেশ সেবক?'

বাংলার মুসলমান

আজ ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে আবার মালদহেই রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যের পতাকা তলে দাঁড়াইয়া বাংলা দেশের সমগ্র হিন্দু সমাজকে সেই প্রশ্নেরই জুড়িদার একটা নতুন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি—'মুসলমানকে সামাজিক হিসাবে অস্পৃশ্য বিবেচনা করিলে হিন্দু নরনারীর বাড়তি সুযোগ সাধিত হইবে কি?' বাংলা দেশের যাঁহারা হিন্দুধর্মের দিগ্‌বিজয় কামনা করেন তাঁহারা এই 'সামাজিক' প্রশ্নটার জবাব দিতে প্রস্তুত হউন।

চোখ খুলিয়া পথে হাঁটিতে শুরু করিলেই দেখিব যে, মুসলমান নরনারীর জীবনে আর হিন্দু নরনারীর জীবনে মিল, সাদৃশ্য ও ঐক্য আছে অসংখ্য।

প্রথমেই জানিয়া রাখা ভালো যে, স্বাস্থ্যের তরফ হইতে হিন্দু-মুসলমানে একপ্রকার কোনো তফাত নাই। দুই ধর্মের লোকই মরে প্রায় সমান সমান। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে হাজার করা হিন্দু মরিয়াছিল ২০.৪ আর মুসলমান মরিয়াছিল ২০.১। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে মুসলমান মরিয়াছিল ২৪.৩ আর হিন্দু মরিয়াছিল ২৩.১। জীবনের আদর্শ, সমাজের সভ্যতা-ভব্যতা ইত্যাদি যত-কিছু বোলচাল থাকিতে পারে সব হজম করিয়াও কাঠখোট্টাভাবে এই অঙ্কগুলির দিকে নজর ফেলা ভালো। শারীরিক সম্পদে আর স্বাস্থ্য-সম্পদে যাঁহা মুসলমান, তাঁহা হিন্দু। 'মোটা কাজের' জন্য এই দুইয়ের ভিতর উনিশ-বিশ করিতে বসা সময় নষ্ট করা মাত্র।

ইস্‌লামে হিন্দুত্ব

একালের বাঙালি মুসলমানেরা 'খোদা-প্রাপ্তির' জন্য যেরূপ সোপান বা 'শরফুল-ইন্‌সান'

রচনা করিতে অভ্যস্ত তাহার ভিতর বাঙালি হিন্দুও ভগবৎ-প্রাপ্তির সূত্র ছাড়া আর কিছু পাইবে না। খোদা-প্রাপ্তির জন্য প্রথম আবশ্যক 'সিদ্‌কে তলব' অর্থাৎ প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা। সে কী চিজ্? আরবি ছাড়িয়া সোজা বাংলায় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

'দুনিয়া ও আখেরাতের (পরকালের) প্রত্যাশী না হওয়াই প্রকৃত দরবেশের চিহ্ন। যে খোদায় আকাঙ্ক্ষী সে তাহারই মুখাপেক্ষী। দুনিয়া ও আখেরাতে তাহার কাজ নাই' (কোরাণ, পারা ৭ সুরা অল্ আম, রুকু ৫, আয়ত ৪২)। 'খোদাতালার প্রেমকে হৃদয়ে স্থান দিতে হইলে, হৃদয়কে সকল প্রকার আকাঙ্ক্ষা ও অভিলাষ হইতে শূন্য করা আবশ্যক।'

মুসলমান 'এবাদাত' বা সাধনার পথিকেরা জানেন যে, 'পরকালের সুখ-শান্তিময় ঘর তাহারাই পায় যাহারা এই পৃথিবীতে নিরীহ, নির্লোভ ও নির্বিবাদী।' * কাজেমদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী (অনুবাদক),—'শান্তিসোপান বা পান্থ-প্রদীপ' (ঢাকা), পৃষ্ঠা ৫৮-৬৭। সংসার-লোভী মানুষ হইতে দূরে থাকা ইস্‌লাম-সাধকগণের পক্ষে অতি জরুরি বিধান। হিন্দু বৈরাগ্যের চরম কথাই বাঙালি মুসলমানেরা তাহাদের কোরাণ হইতে সংগ্রহ করিতে অভ্যস্ত।

মীর মশার্‌রফ হোসেন প্রণীত *বিষাদ সিন্ধু*, মোজাম্মেল হক প্রণীত 'তাপস-কাহিনী' ও 'মহর্ষি মনসুর' ইত্যাদি বই বাঙালি মুসলমানদের অতি প্রিয়। এই সমুদয়ের ভিতর হিন্দুরা নিজেদের সব কিছুই পাইবে। লোক ও জায়গার নাম ছাড়া এই সকল কিচ্ছার ভিতর আছে বিলকুল হিন্দুত্ব। বুঝিতে হইবে যে, খাঁটি ইস্‌লাম-সাহিত্যের প্রাণের কথাগুলো হিন্দুয়ানিতে ভরপুর। কাজেই মুসলমানদের ধর্মে আর হিন্দুধর্মে আস্‌মান-পাতাল ফারাক মালুম হয় না। বাঙালি হিন্দু একটুকু বাড়্‌তি সাধন করিয়া ইস্‌লাম সাহিত্যে প্রবেশ করুন। তাহা হইলে হিন্দুধর্মের দিগ্‌বিজয়ই সাধিত হইবে আর হিন্দুসমাজেরই শক্তিবৃদ্ধির সুযোগগুলো আবিষ্কৃত হইতে থাকিবে। বাঙালি মুসলমানেরা হিন্দু ধর্ম, দেবদেবী ও সাহিত্যের যতখানি জানে বাঙালি হিন্দুরা মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তার দশভাগের একভাগও জানে না। মুসলমান ধর্মকে সাধারণত দেশবিদেশে, দুনিয়ার সর্বত্র, যতটা খাটো ও তুচ্ছ বিবেচনা করা দস্তুর প্রকৃত প্রস্তাবে এই ধর্মের হালচাল সেরূপ নয়। আমার মত ঠিক উল্টো। দুনিয়ার যে-কোনো ধর্মের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিধানের সঙ্গে ইস্‌লাম সমানে-সমানে পাঞ্জা কষিয়া চলিতে অধিকারী। বাংলার হিন্দু এই কথাটা রপ্ত করিতে অভ্যস্ত হউন। ইস্‌লাম সম্বন্ধে নিরেট জ্ঞানলাভ করিলে হিন্দুর মাথাটা পরিষ্কার হইয়া আসিবে, চরিত্রও উন্নত হইবে, আর স্বদেশ সেবার কাজেও আমরা বেশ কিছু পাকিয়া উঠিতে পারিব।

যাঁহা হিন্দু তাঁহা মুসলমান

কতকগুলো অতিমাত্রায় গভীর বিষয়েও মুসলমান হৃদয় হইতে হিন্দু হৃদয়ে বিনা শুল্কে চলাফেরা করা সহজ। দুয়ের স্বাভাবিক ঐক্য এতই বেশি।

অনেক দিন ধরিয়া মুসলমানেরা ইংরেজি 'ভাষা' শিক্ষার বিরোধী। আজও এই বিরোধ পুরোপুরি ঘুচে নাই। ইংরেজি শিখিলে মুসলমানেরা খ্রিস্টিয়ান গ্রন্থ বাইবেল পড়া শুরু করিতে পারে! তাহা হইলে তাহারা খ্রিস্টিয়ান হইয়া যাইতে পারে! মুসলমানদের এই ভয় জবর। কিন্তু এই ধরনের ভয়টা মুসলমানদেরই একচেটিয়া নয়। হিন্দুরাও প্রথম প্রথম এই ভয়ে অস্থির হইয়াছিল কিনা রামমোহনের যুগ তাহার সাক্ষী। আজও পাড়াগাঁয়ে হিন্দুমহলে এই 'জুজু'। কিছু কিছু দেখা যায়। অর্থাৎ বাইবেল-বিভীষিকায় হিন্দু আর মুসলমান এক। খ্রিস্টিয়ানি-বিদ্বেষে হিন্দু আর মুসলমান পুরাদস্তুর ভারত-জননীর যমজ সন্তান।

মুসলমানেরা আজকাল 'পাশ্চাত্য' শিক্ষার ভয়ে বেশ-কিছু জড়সড়। পাশ্চাত্যের আলোকওয়ালা মুসলমান স্ত্রী-পুরুষেরা নাকি ধর্মহীন, আধ্যাত্মিকতাহীন, জড়বাদী জানোয়ারে পরিণত হইতেছে! পাশ্চাত্য-বিভীষিকায় হিন্দুরা মুসলমানের পশ্চাৎপদ কী? মজার কথা, হিন্দুসমাজের তথাকথিত দার্শনিকগণ যেখানে-সেখানে লম্বা গলায় বক্তৃতা মারেন না কী যে, পাশ্চাত্য জীবন ষোল আনা জড়নিষ্ঠ আর প্রাচ্য জীবনে জড়নিষ্ঠা বিলকুল নাই? বস্তুত, প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে ফারাক প্রচার করিয়া প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠতা আর পাশ্চাত্যের নিকৃষ্টতা জাহির করা যাঁহা হিন্দুর তাঁহা মুসলমানের এক মস্ত বাতিক? কাজেই এই দিকেও দেখিতেছি হিন্দু আত্মায় আর মুসলমান আত্মায় সমঝৌতা খুব নিবিড়। হিন্দু-মুসলমানে 'হরিহর' এক আত্মা।

মহানন্দার উপর আজও পুল তৈয়ারি হইল না। কিন্তু জীবন-দরিয়ার হিন্দু কিনারা হইতে মুসলমান কিনারায় পারাপারি করিবার জন্য নিরেট পুল তৈয়ারি আছে শত-শত বৎসর ধরিয়া।

মুসলমানদের রীতিনীতি

এইবার কিছুক্ষণ মুসলমানদের পাড়ায়-পাড়ায় গিয়া পায়চারি করিয়া আসি। বিয়েতে 'গায়ে হলুদ' দেওয়া মুসলমান সমাজের রেওয়াজ। এমনকি 'সাত পাক' খাইতেও মুসলমানেরা নারাজ নয়। মালদহিয়া 'লবান্' (নবান্ন) বাঙালি মুসলমানেরও বেশ রপ্ত হইয়া গিয়াছে। বাপ-মা মারা গেলে অশৌচ পালন করা মুসলমানদের দস্তুর। এমনকি 'ভাই ফোঁটা', 'জামাই ষষ্ঠী' ইত্যাদি অনুষ্ঠানে মুসলমানদের দিল্ কম নাচে না। হিন্দু দেবদেবীর নিকট মানত দিতে মুসলমানেরা অভ্যস্ত। তুলশীতলা, বেলতলা ইত্যাদি সংস্রবে গাছের মাহাত্ম্য মুসলমানেরাও বোঝে। দশহরার সময় লোহার সিন্দুকে সিন্দুরের আল্পনা চালাইতে মুসলমানেরাও সিদ্ধহস্ত। এমনকি দুর্গা পূজায়ও মুসলমানেরা মশগুল হয়। জন্মাষ্টমীর মিছিলে মুসলমানদের সহযোগ আছে। কালী, মনসা, শীতলা দেবীর পূজা করিয়া হিন্দুদের মতো মুসলমানেরাও কলেরা, বসন্ত ইত্যাদির হাম্লা হইতে আত্মরক্ষা করিতে জানে।

হিন্দুর পক্ষে মুসলমান সমাজের আর একটা বড়ো কথা বলিতেছি। মাসে এমনকী

একবার মাত্র গোরু খায় এমন মুসলমানের সংখ্যাও যারপরনাই কম। আসল কথা, এই সংখ্যা মুষ্টিমেয়। জেলায়-জেলায় এই তরফ হইতে খোঁজ চালাইয়া দেখা যাইতে পারে। বর্ধমান, যশোহর ইত্যাদি জেলা হইতে কিছু-কিছু খবর লইয়াছি।

বাংলা দেশের সবকয়টা জেলার আর তাহার সবকয়টা সাবডিভিশন বা পরগনার খতিয়ান করিয়া বেড়াই নাই। বর্তমান আলোচনায় তাহার প্রয়োজন নাই। কিন্তু বাঙালি মুসলমানদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, লেনদেন ইত্যাদির ভিতর হিন্দুরা অহিন্দু বা ম্লেচ্ছ মাল বড়ো বেশি পাইবে না। মুসলমানেরা যে সকল পারিবারিক ও সামাজিক রেওয়াজ চালাইয়া থাকে তাহার অনেকগুলোর ভিতরই হিন্দু-নরনারীর সুপরিচিত এবং অতি প্রিয় রেওয়াজ দেখা যায়। প্রত্যেক জেলার ভিতরই কোনো না কোনো গ্রামে কোনো না কোনো মুসলমান পরিবারে তথাকথিত হিন্দুয়ানি বেশ সুস্পষ্ট। মুসলমান নরনারীর নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে আর আটপৌরে ঘরকন্নায় হিন্দু রীতিনীতি বিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত জবরদস্ত আকারেই ছিল। আজও বাংলা দেশের নানা পল্লিতে নানা মুসলমান পরিবারে হিন্দুসমাজের আচার ব্যবহার পুরাদস্তুর বজায় আছে।

এই সকল কথা 'প্রত্যেক' বাঙালি মুসলমান পরিবার সম্বন্ধেই খাটে এইরূপ বলিতেছি না। বলিতেছি এই মাত্র যে, খুঁটিয়া খুঁটিয়া খোঁজ চালাইলে বাংলা দেশের বহুসংখ্যক পল্লিতে হাজার হাজার মুসলমান পরিবারে এই সকল হিন্দু রীতিনীতির অস্তিত্ব মালুম হইবে। জোর-জবরদস্তি করিয়া মুসলমানেরা যদি হিন্দু-বিরোধী আন্দোলন চালাইতে অগ্রসর না হন তাহা হইলে দুনিয়ার লোকেরা মুসলমান সমাজের হিন্দুয়ানি আরও অনেক দিন ধরিয়া দেখিতে পাইবে।

এই সকল কথার মতলব অতি সোজা। মুসলমানকে হিন্দুদের তরফ হইতে 'সামাজিক' জীব হিসাবে বর্জনীয় ও অস্পৃশ্য সমঝিয়া রাখা আহাম্মুকি। বরং মুসলমানদের সঙ্গে সামাজিক মিলনের পথগুলা ঢুঁড়িয়া বাহির করা হিন্দু স্বদেশ-সেবকদের অন্যতম কর্তব্য হওয়া উচিত। মুসলমানদের কর্তব্যকর্তব্য নির্দেশ করা বর্তমানে আমার ধান্ধা নয়। সম্প্রতি হিন্দু হিসাবে হিন্দুর কর্তব্য আলোচনা করিতেছি। মিলনের পথ সমাজের ভিতর যদি না থাকিত তাহা হইলে সেই সব নতুন ফরিদ সৃষ্টি করাই আমাদের কর্তব্য থাকিত। কিন্তু দেখিতেছি যে, এই সব পথ ও পুল বহুদিন ধরিয়া বাংলার পল্লিতে-পল্লিতে মজুত আছে। কাজেই সেইগুলো সম্বন্ধে নেহাৎ চোখ বুজিয়া থাকা কোনো মতেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সেই সবের সদ্‌ব্যবহার করিবার দিকেই আমাদের মর্জি চলা উচিত।

হিন্দুসমাজের 'মুসলমান-বিধি'

বাঙালি-হিন্দুসমাজের মুসলমানের সঙ্গে লেনদেন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পাঁতি প্রচারিত হওয়া আবশ্যক:

১. মুসলমানের ছোঁয়া অথবা রান্না খাইলে হিন্দু-নরনারীর জাত মারা যাইবে না। ছোঁয়াছুঁয়ির গণ্ডগোলে হিন্দুদের আর্থিক ক্ষতি কীরূপ হয় তাহার একটা ছোটো দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিদেশি পুঁজিতে পরিচালিত ফ্যাক্টরির মালিকদের নিকট হইতে খবর পাইয়াছি যে, তাঁহারা মাঝে মাঝে শয়ে শয়ে হিন্দু মজুর বরখাস্ত করিতে বাধ্য হন। কেননা হিন্দু মজুরদের ভিতরকার "বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি" সমস্যায় ফ্যাক্টরির কাজে ক্ষতি হয়। এই সকল মজুরদের কেহ অমুকের কুয়ায় জল তুলিতে অরাজি, কেহ অমুকের পাশের বাড়িতে থাকিতে অরাজি ইত্যাদি। এই ছুঁৎ-মার্গের দৌরাত্ম্যে বিদেশী পুঁজিপতি ও ম্যানেজারেরা হিন্দু মজুরদেরকে 'দূরাদস্পর্শনং বরং' বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত।

২. মুসলমানের বেটি বিবাহ করিলে হিন্দু পুরুষের জাত মারা যাইবে না।

৩. হিন্দুর বেটির সহিত মুসলমানের বিবাহ হইলে হিন্দু বেটির জাত মারা যাইবে না। মুসলমান আইনের ব্যবস্থায় এইরূপ বিবাহ সত্ত্বেও হিন্দু বেটি ইচ্ছা করিলে হিন্দু থাকিয়া যাইতে পারে।

৪. হিন্দু সমাজ বিবাহের নিয়মে সেকালের শাস্ত্র ছাড়িয়া একালের সরকারি কানুন (১৯২৩) মানিয়া চলিতে অভ্যস্ত হউক। এই কানুনের মোট কথা নিম্নরূপ, যে জাত বা সমাজ বা ধর্মেই বিবাহ কর না কেন, তোমার নিজের ধর্মে জলাঞ্জলি দিতে হইবে না।

৫. মুসলমানের ঘরে হিন্দু বেটিকে দু-চার-দশ মাস থাকিতে হইলেও হিন্দু বেটির জাত মারা যাইবে না।

৬. এই সকল ক্ষেত্রে কোনো প্রকার 'প্রায়শ্চিত্ত', 'শুদ্ধি', আচার বা সংস্কার আবশ্যক হইবে না।

হিন্দু সমাজের জন্য এই যে 'মুসলমান-বিধি' জারি করা যাইতেছে, তাহা অনেকটা হিন্দু-সমাজের জন্য অত্যাবশ্যক 'অস্পৃশ্য-বিধি'রই জুড়িদার স্বরূপ।

খাওয়া দাওয়া, বিবাহ করা এই সব কাজ জোর-জবরদস্তির জিনিস নয়। যখন তখন যেখানে সেখানে হিন্দুকে মুসলমানের রান্না খাইতেই হইবে এরূপ কথা বলা হইতেছে না। বলা হইতেছে এই যে, যখনই খাওয়া হউক না কেন, তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত আর শুদ্ধি আবশ্যক হইবে না। বিবাহ সম্বন্ধেও সেই কথা। রোজ রোজ ডজন ডজন হিন্দু-মুসলমানে বিবাহ ঘটাইতে হইবে এমন পাঁতি প্রচার করিতেছি না। বলিতেছি যে, যেখানে-যেখানে এইরূপ ঘটে সেই সকল স্থলে ঝাড়ফুঁকের কথা তুলিতে হইবে না। সমাজের অলিতে-গলিতে এইরূপ বিধান প্রচারিত হইয়া গেলেই হিন্দু নরনারী বুক ফুলাইয়া চলিতে পারিবে। এই পাঁতি যতদিন সুপ্রচারিত না হয় ততদিন মুসলমানদের সঙ্গে লেনদেনে হিন্দু সমাজের পেটে ভয় থাকিবেই থাকিবে।

এই ভয় খেদাইয়া না দিলে হিন্দু সমাজে যথার্থ আধ্যাত্মিকতার ও শক্তিমত্তার ঘর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

৭. হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিকে মুসলমানেরা ছুঁইলে অথবা অপমান করিলে দেবদেবীর জাত মারা যাইবে না।

৮. হিন্দু মন্দিরে গোরু কোর্বাণি হইলেও মন্দিরের জাত মারা যাইবে না।

একালের হিন্দু সমাজ

'মুসলমান-বিধি'র প্রস্তাবগুলো এক হিসাবে 'হাতি ঘোড়া' নয়। বাস্তবিক পক্ষে নেহাত মামুলি কথাই বলা হইতেছে। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে অনেক হিন্দুই মুসলমানের ছোঁয়া মাল খাইয়া থাকে। মুসলমানের রান্না খাইয়া যে সকল হিন্দু মানুষ বা নামজাদা হইয়াছে তাহাদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে হইতেছে ষোল আনা হিন্দুদের ঘরে। এই সকল হিন্দু বা হিন্দুর আত্মীয়দেরকে যাঁহারা এক ঘরে করিতে খাড়া হন শেষ পর্যন্ত তাঁহারাই একঘরে হইয়া পড়িতেছেন। বর্তমান ভারতে আর বিশেষত বাংলা দেশে যে সকল হিন্দু স্বদেশি ও স্বরাজ আন্দোলনে, মায় ধর্মের আন্দোলনে, পাণ্ডা স্বরূপ তাঁহাদের অনেকের পেটেই মুসলমানী খানা গিজির-গিজির করিয়া থাকে। এই ধরনের হিন্দুর সঙ্গে অসহযোগ চালাইতে হইলে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের হিন্দু সংস্কৃতি পটল তুলিতে বাধ্য হইবে। বস্তুত এই সকল মুসলমান ঘেঁষা হিন্দুরাই বাঙালি ও অবাঙালি হিন্দু সমাজের, সাহিত্যের, শিক্ষাদীক্ষার আর শিল্পবাণিজ্যের ধুরন্ধর।

ভারতের বাহিরে দুনিয়ার জনপদে-জনপদে যে-সকল হিন্দু নরনারী দেখিয়া আসিয়াছি তাহারা কোন্ প্রকার জীব? তাহারা সকলেই মুসলমানের ছোঁয়া রান্না খায়। মুসলমানী খানায় তাঁহাদের অনেকেরই কোনো আপত্তি নাই। মুসলমান লেড়কিও তাহারা সহজেই আত্মস্থ করে। বস্তুত বিয়ের সময় এই সকল প্রবাসী হিন্দুরা কনের চোদ্দ পুরুষের কোষ্ঠী দেখিতে প্রলুব্ধ হয় না। বর্ণ-জাতি-ধর্ম-নিরপেক্ষ হইয়া এই সকল ভারতের বহির্ভূত হিন্দুরা বিবাহ করিতেছে। এই রীতিতে গড়িয়া উঠিতেছে এক বিশ্বব্যাপী 'বৃহত্তর ভারত।' অথচ এই সকল 'আচারশূন্য,' 'বর্ণাশ্রমহীন,' 'বর্ণ-সঙ্কর' শীল হিন্দুরা নিজেদেরকে হিন্দু ছাড়া আর কিছু ভাবে না। হিন্দু ধর্মের বিস্তারে তাহারা বিশেষ উৎসাহী। হিন্দু সংস্কৃতির দিগ্‌বিজয় তাহারা চালাইতেছে। দুনিয়ায় বিপুল রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য ক্রমে-ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে। রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যকে বাড়তির পথে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা যাঁহারা করিতেছেন তাঁহাদের ভিতর কেহই মুসলমান অথবা অন্য কোনো ধর্মের বা জাতের লোককে কোনো প্রকারে অস্পৃশ্য বা ম্লেচ্ছ বিবেচনা করেন না।

দেশ-বিদেশে এই যদি হিন্দু নরনারীর ঝোঁক হয় তাহা হইলে বাংলা দেশের গ্রামে

গ্রামে সেই ঝোঁকটার স্বপক্ষে সর্বজনীন ফর্মান জারি করাই যুক্তিসঙ্গত। এইরূপ পাঁতি প্রচার করিবার জন্য আজ হাজার হাজার হিন্দুসেবক আবশ্যক।

সমাজ বনাম ধর্ম

আর্থিক ক্ষেত্রে, সরকারি চাকরির আবহাওয়ায়, অন্যান রাষ্ট্রিক কর্মকাণ্ডে মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর সদ্ভাব বাড়াইবার প্রণালীগুলো আলোচনা করা আজ আমার উদ্দেশ্য নয়। অধিকন্তু পূর্বে বলিয়াছি যে, মুসলমান নরনারীর কর্তব্য বাৎলাইতে আসি নাই। আমি হিন্দু ধর্মের উদারতাকে হিন্দু সমাজের ভিতর টানিয়া আনিবার মতলবেই এই সকল কথা বলিতেছি। হিন্দু সমাজকে উদার ও যুক্তিনিষ্ঠ বনিয়াদের উপর খাড়া করিতে পারিলে হিন্দু-নরনারীর রক্ত সাফ্ হইয়া আসিবে। হিন্দু সমাজ যার পর নাই শক্তিশালী হইবে। সেই শক্তিমান হিন্দুসমাজ জগদ্‌বরেণ্য হইতে বাধ্য। আজ আমার একমাত্র লক্ষ্য, হিন্দু সমাজের অঙ্গে অঙ্গে শক্তি ও সামর্থ্যের লাল্‌সা পরিবেষণ করা, কমসে কম্ এই পরিবেষণের জন্য আন্দোলন রুজু করা।

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা

সাধারণত ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা এই শব্দ দুটি প্রায় এক অর্থে অথবা ঘেঁষাঘেঁষি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া ধর্ম (= আধ্যাত্মিকতা)কে মানুষের জীবনে একদম পুরাপুরি স্বতন্ত্র এবং 'উচ্চতর' ইজ্জৎ দেওয়া হইয়া থাকে। মানুষের জীবনে অন্যান্য যাহা কিছু দেখা যায় তাহা হইতে ধর্ম (= আধ্যাত্মিকতা) কে যোলো আনা আলগারূপে বিবৃত করা দস্তুর। সেই সমুদয় কাজ আর চিন্তার ইজ্জৎও দুনিয়ার সাধারণ নরনারীর চিন্তায় বেশকিছু খাটো।

আমার বিবেচনায় ধর্ম = আধ্যাত্মিকতা নামক 'ইকুয়েশন' বা সাম্য-সম্বন্ধ গ্রহণীয় নয়। ধর্মকে আধ্যাত্মিকতার ঘেঁষা কোনো চিজ সমঝিতে আমি অভ্যস্ত নই। আমার বিচারে মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিকতা বিহীন কোনো প্রকার কাজ বা চিন্তা থাকিতেই পারে না।*

বিষয়টা সহজে বুঝিবার জন্য সাময়িকভাবে নিম্নের ছবিটা প্রকাশ করিতেছি:

মানুষের সৃষ্টি

(আধ্যাত্মিকতা)

(ক) আর্থিক	(খ) রাষ্ট্রিক	(গ) সামাজিক	(ঘ) মানসিক
অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান	অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান	অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান	অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান

('সংস্কৃতি')

(১) সাহিত্য (২) শিল্প (৩) দর্শন (৪) বিজ্ঞান (৫) ধর্ম (৬) (৭) দেবতা পূজাউপাসনা সাধনা

মানুষের সৃষ্টিমাত্রই আধ্যাত্মিক। কেননা মানুষের আত্মা যেখানে কর্তৃত্ব করে না সেখানে সৃষ্টি হয় না। দুনিয়ার উপর আত্মার অধিকার স্থাপনকে বলি সৃষ্টি। তাহারই অপর নাম আধ্যাত্মিকতা।

আধ্যাত্মিকতা অর্থাৎ সৃষ্টি অসংখ্য মূর্তিতে দেখা দেয়। সেই সৃষ্টিগুলোকে সহজে চলনসই চার শ্রেণিতে বিভক্ত করিলাম : (ক) আর্থিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, (খ) রাষ্ট্রিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান (গ) সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, (ঘ) মানসিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান। এক কথায় (ঘ)-কে সংস্কৃতি বা কৃষ্টি বলিতেছি।

সংস্কৃতির ভিতর পড়ে অসংখ্য অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান। একটার নাম সাহিত্য, আর একটার নাম শিল্প ইত্যাদি। ধর্ম এই সকল সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের অন্যতম। ধর্ম বলিতে বুঝি দেবতা, পূজা, উপাসনা, সাধনা ইত্যাদি বিষয়ক চিন্তা ও কর্ম। অতএব ধর্ম হইল মানুষের হাজার হাজার আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির (অর্থাৎ সৃষ্টিকর্মের) অন্যতম অভিব্যক্তি।

সংসারের আদি হইতে আজ পর্যন্ত মানুষ চিরকালই সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। অর্থাৎ প্রাচীনতম মানুষও আধ্যাত্মিক ছিল। আর একালের আদিমতম মানুষও আধ্যাত্মিক বটে। আধ্যাত্মিকতাশূন্য মানুষ থাকিতেই পারে না। অপর দিকে খাওয়া-পরা, দেশ শাসন করা ইত্যাদির মতন দেবতা কল্পনা করা, দেবতার পূজা করা ইত্যাদি কাজও মানুষের পক্ষে অতি প্রাচীন। অর্থাৎ ধর্মহীন মানুষ কোনোদিন ছিল না। আজকালকার অতি-আদিম মানুষও ধর্মহীন হয়। সুতরাং

ধর্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ

'হিতোপদেশে'র এই বয়েৎটা পুরোপুরি সত্য।

আমার বিশ্বাস, মানুষ আধ্যাত্মিক হিসাবে যুগের পর যুগ ধরিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর এই ঘোরতর 'কলিযুগে'ও আধ্যাত্মিকতা কমে নাই। বরং আধ্যাত্মিকতার বাড়তিই দেখিতেছি। সেইরূপ বাড়তি দেখিতেছি মানুষের ধর্মজীবনেও। প্রাচীন ও মধ্য যুগের নরনারীর চেয়ে বর্তমান কালের নরনারী কম ধার্মিক নয়, বেশি ধার্মিক। অর্থাৎ এমনকি যান্ত্রিক এবং অন্যান্য সভ্যতার 'চাপে পড়িয়া' ও কী ধর্ম, কী আধ্যাত্মিকতা দুয়েরই আকার-প্রকার বাড়িয়া গিয়াছে। কোনোটাই ঘাটতির দিকে নয়।

বলা বাহুল্য, এই সকল আলোচনা অনেকটা পারিভাষিকের মামলা। তর্কশাস্ত্রের এই গণ্ডগোলে অনেক সময়েই প্রবেশ করিবার প্রয়োজন হয় না। বর্তমান ক্ষেত্রে ধর্মের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সম্বন্ধ আর মানুষের অন্যান্য কাজ ও চিন্তার সঙ্গে এই দুই চিজের যোগাযোগ

আলোচনা করিবার জন্য সকলকে ডাকিতেছি না। যাঁহার যেরূপ মর্জি তিনি সেই অর্থেই ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা বুঝিতে থাকুন। এই আলোচনার ভিতর পারিভাষিক শব্দগুলো কী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তারা খতাইয়া না দেখিলেও চলিবে। ধর্ম আর আধ্যাত্মিকতা ঘেঁষাঘেঁষি এইরূপ বুঝিয়া লইলেও সম্প্রতি কোনো গোলযোগ উপস্থিত হইবে না।

হিন্দুধর্ম ও হিন্দু দেবদেবী অমর

পাছে কেহ ভুল বুঝেন এইজন্য কথাটা স্পষ্টাস্পষ্টি বলিয়া রাখিতেছি। হিন্দু 'ধর্ম' অমর, কিন্তু হিন্দু 'সমাজ' বর্তমানে যে অবস্থায় রহিয়াছে তাহাকে 'ভদ্রলোকের পাতে' দেওয়া অসম্ভব। এরূপ নীচাশয়, ঘৃণ্য. অমানুষিক ও নিষ্ঠুর 'সামাজিক' ব্যবস্থা দুনিয়ার কোথাও চোখে পড়ে নাই। মান্ধাতার আমলে অথবা মধ্যযুগে ভারতের হিন্দু 'সমাজ' কীরূপ ছিল চোখে দেখি নাই। কল্পনাও করিতে পারি না। কিন্তু চোখের সম্মুখে হিন্দু সমাজের বিধিনিষেধ, অনুলোম-প্রতিলোম, জল-চল, মন্দির-চল ইত্যাদি সংক্রান্ত যাহা-কিছু নজরে পড়িতেছে তাহাতে মানুষের ব্যক্তিত্ব আর সংযমশক্তি দুইই এক সঙ্গে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। এই সমাজের বিধানে মনুষ্যত্বের বিন্দুমাত্র ঢুঁড়িয়া পাই না বলিলেই চলে। যতদিন এই 'সামাজিক' বিধানগুলি জারি থাকিবে ততদিন হিন্দুধর্মের অন্তর্গত নরনারী দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইতে থাকিবে। সেই দুর্বলতা হইতে হিন্দুজাতিকে বাঁচাইতে পারা রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

অপর দিকে হিন্দু সাহিত্যের উপনিষৎ, বেদান্ত আর গীতা যতদিন আছে ততদিন হিন্দু 'ধর্ম' দুনিয়ায় দিগ্‌বিজয়ের পর দিগ্‌বিজয় চালাইবেই চালাইবে। কেননা ইহার ভিতর আছে মানুষকে ব্যক্তিত্বনিষ্ঠ করার মন্ত্র। মানুষকে দেবতা, ভগবান, পরমেশ্বরের মর্যাদা দিয়া এই 'ধর্ম' সংসারে আশা, কর্মনিষ্ঠা আর সৃষ্টির আনন্দ বাঁটিয়াছে। নতুন নতুন দেশে নতুন নতুন অবস্থার ভিতর মাথাওয়ালা নরনারী উপনিষৎ, বেদান্ত আর গীতার ব্যক্তিত্ব-নিষ্ঠার নতুন নতুন ব্যাখ্যা চালাইয়া মানুষকে নতুন নতুন কর্তব্যের পথ দেখাইতে পারিবে। মানুষের অধ্যাত্ম-শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিতেছি হিন্দু সাহিত্যের এই সকল 'ধর্ম' গ্রন্থে।

অধিকন্তু দেবতা, পূজা, উপাসনা, সাধন-ভজন ইত্যাদির দিকে তাকাইলেও হিন্দু 'ধর্মে'র ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। হিন্দুধর্মের দেবদেবীগুলো টিকিয়া যাইবে এইরূপ বিশ্বাস করিতে ভয় পাইতেছি না। তেত্রিশ কোটি দেবতার সংসারে যদি তিনশো কোটি দেবদেবী আসিয়াও জুটে তাহাও মানুষের মগজ হজম করিতে পারিবে। কেননা নতুন নতুন দেবদেবী নতুন নতুন সুকুমার-শিল্পেরই রসদ জোগাইবে মাত্র। মানুষের আত্মা এই বাড়তিতে বাধা দিবে না। নতুন নতুন মূর্তি ছবি পট, নতুন নতুন আটচালা মন্দির অট্টালিকা, নতুন নতুন মন্তর গান কথকতা কীর্তন প্রার্থনা, নতুন নতুন নাচ, নতুন

নতুন বাজনা, নতুন নতুন বক্তৃতা প্রবন্ধ গ্রন্থ ; এই সবই হইবে নতুন নতুন দেবদেবীর বস্তুনিষ্ঠ নিদর্শন। এইগুলি দেশের সংস্কৃতির অন্তর্গতরূপে সমাদৃত হইবারই কথা। অধিকন্তু একালের 'সর্বজনীন দুর্গা পূজা,' 'সর্বজনীন সরস্বতী পূজা' ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থায় দেবদেবী-সংক্রান্ত ধর্ম লোক-চিত্তে বেশি বেশি প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিবে। তাহা ছাড়া, ইস্কুল-পাঠশালায় ম্যাট্রিক বাড়তির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত পড়ুয়াদের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার অন্যতম ফল হইবে হিন্দুধর্ম, হিন্দুসাহিত্য ও হিন্দুসংস্কৃতির প্রতি জনগণের অনুরাগ বৃদ্ধি, এক কথায় হিন্দুত্বের বাড়তি। কাজেই হিন্দু 'ধর্ম' সকল তরফ হইতেই অমরতা লইয়া জন্মিয়াছে। ভবিষ্যতে ইহার মার নাই। বরং সর্বদাই হিন্দু 'ধর্ম' বাড়তির পথে চলিতে থাকিবে।

হিন্দু 'সমাজ' আর টেঁকসই নয়

কিন্তু মানুষের চেহারাওয়ালা জীব মানুষের অস্পৃশ্য, ইহা যে-সমাজের বিধান সেই 'সমাজ'কে বাঁচাইয়া রাখা বিংশ শতাব্দীতে চলিবে না। হিন্দু 'সমাজ' আর টেঁকসই নয়। যে-সমাজের আইন-কানুন ব্যক্তিমাত্রকে সংকীর্ণচেতা করিয়া তোলে সেই সমাজকে তাহার নরনারী খোলাখুলি আর অজ্ঞাতসারেও 'কলা দেখাইয়া' চলিতে বাধ্য। এখনই অধিকাংশ হিন্দু নরনারী প্রাণে-প্রাণে হিন্দু-সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া জীবনযাত্রা চালাইতেছে। আর কিছুদিন পর এই হিন্দু সমাজ-লীলা সংবরণ করিয়া বসিবে। অর্থাৎ ইহারক বিধি-নিষেধ কেহ সম্মান করিতে রাজি থাকিবে না। অতএব হিন্দু সমাজের সেবকগণ নিজ নিজ কর্তব্য পালনে অগ্রসর হউন।

'ধর্ম' উদার ও মহান্ অথচ 'সমাজ' জঘন্য ও সংকীর্ণ, এই সমস্যাই বিংশ শতাব্দীর নয়া বাংলাকে ভাবাইয়া তুলিতেছে। মীমাংসা চাই-ই চাই। মীমাংসার পথ অতি সোজা। ইস্কুল-পাঠশালায়, সংবাদপত্রে, কংগ্রেসে কাউন্সিলে, আন্তর্জাতিক মেলামেশায় বাঙালি-হিন্দুর মুড়ো ও কলিজা হাজার প্রকার উদারতা লাভ করিতেছে। সেই উদারতা তো হিন্দু 'ধর্মের'ই চিরন্তন সত্য। আর বর্তমানে রামকৃষ্ণের প্রভাবে সেই উদারতা হিন্দুধর্মের গোড়ার কথায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ও চিন্তাক্ষেত্রে যে উদারতা বাঙালি হিন্দু আটপৌরে জিনিস হইতে চলিয়াছে সেই উদারতা একমাত্র 'সমাজে' নাই, এই অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থা নয়। এই অসামঞ্জস্য ও 'বেখাপ্পা' অবস্থা আধ্যাত্মিক বিপ্লবের আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেছে। সেই আবহাওয়াই নির্যাতিত ও বিদ্রোহী আম্বেদকার হিন্দু সমাজের যথার্থ সেবক ও সুহৃদ্। সনাতন-সমাজপন্থীরা চোখের ঠুলি খুলিয়া সংসার নিরীক্ষণ করুন।

যে-যুগের অবতারের মুখে হিন্দু বলিতে শিখিয়াছে 'যত মত, তত পথ' সেই যুগের

হিন্দু-'সমাজে' কোনো লোকই নিজ পথ ছাড়া অপর পথের পথিককে অস্পৃশ্য ও ম্লেচ্ছ বিবেচনা করিতে পারিবে না। হিন্দু মাত্রেরই মগজে ক্রমশ প্রবেশ করিতে বাধ্য যে, হয় 'যত মত, তত পথ' মিথ্যা কথা, না হয় অন্যান্য পথের পথিকেরাও সকলেই ষোল আনা মানুষ। সকলের মাথায়ই আজ নতুন করিয়া প্রবেশ করিতেছে চণ্ডীদাসের বাণী :

সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ
তাহার উপরে নাই।

এক মুড়োর ভিতর দুই পরস্পর-বিরোধী চিন্তা ঠাঁই পাইবে না। অতএব হিন্দুরা 'সমাজ'কে 'ধর্মে'র আদর্শে 'যত মত তত পথ' -মাফিক ভাঙিয়া গড়িবেই গড়িবে।

একালের হিন্দু ঋষি আম্বেদকার

হিন্দু সমাজের সংস্কার ও উদ্ধার সাধন করিবে কে বা কাহারা? সনাতনীরা নয়, ব্রাহ্মণেরা নয়, তথাকথিত উচ্চবর্ণ বা উচ্চ জাতের লোকেরা নয়। হিন্দু সমাজকে মেরামত করিবে, হিন্দু সমাজকে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া ঢালিয়া সাজাইবে অস্পৃশ্য, পদদলিত, শিয়াল-কুকুরের মতো উপেক্ষিত, আর অমানুষিকভাবে অবদমিত 'ছোটো লোকেরা'। তাহার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সকলেই আম্বেদকারকে বিংশ শতাব্দীর নবীন হিন্দু ঋষিরূপে পূজা করিতেছে। কেননা রক্তমাংসের মানুষ মাত্রেই স্বীকার করে যে,

গানে বক্তৃতায় বা কথার জোরে সাহস-আশা বাড়ালে আমার,
অগ্নিহোতা মধুচ্ছন্দার আগুন-মূর্তি দেখি তোমার।

আম্বেদকারের জাত বা দল বা পেটোয়ারাই হিন্দুসমাজকে দুরস্ত করিয়া নয়া দিগ্‌বিজয়ের জন্য খাড়া করিয়া তুলিবে। আম্বেদকারের মতো লোকই যুগে যুগে ভারতের জনপদে-জনপদে আবির্ভূত হইয়া হিন্দুর সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বাড়তির পথে ঠেলিয়া তুলিয়াছে। আম্বেদকার সেই সকল যুগান্তর-সাধনকারী হিন্দু ঋষিদেরই বর্তমান প্রতিনিধি। সনাতনীদের ভিতর যাঁহাদের মগজে ঘি আছে আর যাঁহাদের হৃদয়ে মানুষের রক্ত আছে তাঁহারা আম্বেদকরকে অগ্রণী করিয়া হিন্দু সমাজের ওলট-পালট সাধনে আগুয়ান হউন। আম্বেদকার নির্যাতিত হিন্দুর বাণীমূর্তি। সে জবরদস্ত 'বাপ্‌কা বেটা।' অতএব আম্বেদকার হিন্দু মাত্রের প্রণম্য।

হিন্দু সমাজের সকল প্রকার গলদের কথা আলোচনা করা এই রচনার বহির্ভূত। গলদগুলা কাটিয়া ফেলিবার সহজ বা কঠিন উপায় সমূহের বিবরণ দিতেই আসি নাই। হিন্দু সমাজকে

খোল্-নল্‌চে দুইই বদলাইতে হইবে, শুধু এই কথাটা বলিবার জন্যই বর্তমানে কলম ধরিয়াছি। দু একটা গলদ ও দাওয়াই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ-কিছু বলিয়া গেলাম মাত্র। 'বিদ্রোহীদের' লেজুড় ধরিয়া হিন্দুসমাজকে ভাঙিবার জন্য 'সনাতনী'রা উঠিয়া পড়িয়া লাগুন। সনাতনীদের বুকের পাটা অত চওড়া কী?

অপ্রিয় কথার বেপারি

আম্বেদকার আজ কোটি কোটি নির্যাতিত নরনারীকে হিন্দু সমাজ ও ধর্মের বিরুদ্ধে লড়িতে আর হিন্দুধর্মের বাহিরে চলিয়া যাইতে ডাকিতেছেন। এই অবস্থায় একটা নয়া ধর্ম ভারতে দেখা দিতেও পারে। নতুন একটা ধর্ম বা সমাজ কায়েম করা অতি কঠিন কিছু নয়। বলাই আছে:

জল-পাহাড়ে খেত্-খনিতে টুঁড়ে যারা নয়া মাল,
তাজা প্রাণে গড়ছে তারা নয়া ধর্ম সমাজ কাল।

আম্বেদকারের এই 'জেহাদ্'-মাফিক কাজ করিবার জন্য অগণিত নরনারী প্রস্তুত হইতেছে। মামুলি চোখে আম্বেদকারের মতো হিন্দু-শত্রু আর কেহ নাই। আমি ঠিক সেই সময়েই এই আম্বেদকারকে হিন্দু-সেবক আর হিন্দু-সুহৃৎ বলিতেছি! আর বলিতেছি যে, নির্যাতিতের ক্রন্দনের ভিতরেই আর বিদ্রোহীদের হুঙ্কারের ভিতরেই সত্য আছে, সত্য নাই সনাতনীদের বিধানে। অধিকন্তু আম্বেদকারের বাণী হজম করিয়া দাঁড়াইলেই হিন্দু সমাজ মজবুত হইতে পারিবে। বলা বাহুল্য আমার মতোন আহাম্মুক কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

বাংলার মুসলমানেরাও আজ বাঙালি হিন্দুদের বিরুদ্ধে ব্রতবদ্ধ। অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, বঙ্গজীবনের কোনো কর্মক্ষেত্রেই হিন্দু টিকির পাশে বা পশ্চাতে বা সামনে মুসলমান দাড়ি দেখিতে পাই না। মুসলমানের হাতে যে দু-একটা নতুন প্রতিষ্ঠান কায়েম হইতেছে তাহার চৌহদ্দির ভিতর হিন্দুর প্রবেশ যেন এক প্রকার নিষিদ্ধ। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের অসহযোগ প্রায় চরমে গিয়া ঠেকিয়াছে। হিন্দুগুলা বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়া মরিলেই যেন বোধ হয় বহুসংখ্যক মুসলমানের 'আপদ শান্তি' হয়। আফ্‌শোষের কথা। কিন্তু এইরূপই দেখা যাইতেছে বাংলা দেশের আবহাওয়ায়। অতএব সহজ দৃষ্টিতে মুসলমানেরা হিন্দুর শত্রু। কিন্তু এই দুর্যোগের সময়েও, বহু বহু হিন্দু-বিদ্বেষী মুসলমানের চড়া মেজাজ দেখিবার পরও আমি হিন্দুকে বলিতেছি যে, মুসলমানের আত্মায় আর হিন্দুর আত্মায় জোড়া লাগাইবার সুযোগ আছে। হিন্দুচিত্তের সঙ্গে মুসলমান চিত্তের সাঁকো-বাঁধাবাঁধি চলিতে পারে। মুসলমানের স্পর্শ বরদাস্ত করিয়া উঠিতে পারিলেই হিন্দুসমাজ বিশ্ববিজয়ী হইবে। বুঝাই যাইতেছে যে, আর এক দফা আহাম্মুকির চূড়ান্ত দেখাইয়া ছাড়িলাম!

লোক-প্রিয় কথা এই উনত্রিশ বৎসরের ভিতর একদিনও বলিয়াছি কিনা সন্দেহ। দেশ-বিদেশে সারা জীবন অপ্রিয় কথার বেপারিভাবে কাটাইতেছি। সার্বজনিক মত-মাফিক যেটা সত্য তাহার ভিতর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্য ঢুঁড়িয়া পাই নাই। আজ হিন্দু নরনারীর অতি-প্রিয় ধারণাগুলিকে সম্মানযোগ্য সম্‌ঝিতে পারিলাম না। অতএব অতিমাত্রায় অপ্রিয় কথাই বকিয়া যাইতেছি। পূর্বে-পূর্বে দেখিয়াছি যে, যে সব কথা লোকজনের পছন্দসই হইল না সেই সব কথা পাঁচ-সাত-দশ-পনেরো বছরের ভিতর সাধারণ্যে অনেকটা স্বীকৃত হইয়াছে। এমনকি প্রথমবার বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ১৯২৫-২৭ খ্রিস্টাব্দে যে সকল সার্বজনিক মতের বিরোধী বোলচাল ঝাড়িয়া লোক-প্রিয় কথার যমরূপে চলাফেরা করিয়াছি সেই সকল বোলচালও ইতিমধ্যেই রামা-ইস্‌মাইল-আবদুল-যদুর মুখে কিছু কিছু যেখানে-সেখানে চলিতেছে। অপ্রিয় কথা বেশি দিন অপ্রিয় থাকে না।

আজ হিন্দু সমাজের খোল-নলচে বদলাইবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে ঠোঁটকাটারূপে যে-সকল কথা বলিয়া হিন্দু নরনারীর ঝাঁটা খাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিলাম সেই সকল কথাও আগামী পাঁচ-সাত-দশ-পনেরো বছরের ভিতরই বহুসংখ্যক হিন্দু-সেবকের প্রাণের কথায় পরিণত হইবে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই বাঙালি-হিন্দুর মগজ এই বিষয়ে গোঁজামিলপূর্ণ চিন্তার দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

* লেখকের 'দি এক্সপ্যানশন অব স্পিরিচুয়্যালিটি অ্যাজ আ ফ্যাক্ট অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিভিলিজেশন' (*প্রবুদ্ধ ভারত*, মে ১৯৩৬)। এই প্রবন্ধ রেঙ্গুনের রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত ধর্মসম্মেলনের (৮—১০ এপ্রিল ১৯৩৬) সভাপতির অভিভাষণ রূপে লিখিত। পরে মাহেশদহের রামকৃষ্ণ উৎসবে ৬ জুন ১৯৩৬ তারিখে বাংলায় প্রদত্ত।

ইতিহাস

যদুনাথ সরকার

সভাপতির অভিভাষণ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত

আমার জীবনকাল এখন এক শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ অতিক্রম করিতে চলিল। তাহার উপর আমার কতকগুলি আরব্ধ গবেষণা কার্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সুতরাং আজ আমি পরিষদের সেবা হইতে বিদায় লইবার ন্যায্য দাবি করিতে পারি।

যদিও আমি এই প্রতিষ্ঠানের সহকারী সভাপতি প্রথম বার নির্বাচিত হই ২৭ বৎসর পূর্বে, সেটা নামমাত্র ছিল, মফস্বলবাসীরূপে। কিন্তু কলিকাতায় বাস আরম্ভ করিয়া গত এগারো বৎসর ধরিয়া সভাপতি ও সহকারী সভাপতিরূপে আমি ইহার পরিচালনার কাজ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে করিতে পারিয়াছি। স্বর্গীয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আমার সঙ্গে পালাক্রমে সভাপতি ও সহকারী সভাপতির পদ গ্রহণ করায়, তাঁহার শেষ জীবনে সাহিত্য পরিষদের যে আশ্চর্য উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহার সব প্রচেষ্টায় তাঁহার সহযোগ লাভ করিয়া, তাঁহার কার্য সফল করিতে সাহায্য করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। কর্ম জীবনের অন্তে আজ আমি এখানকার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ ভুলিয়া যাইতেছি; কিশোর বয়সে আমরা দুজন প্রেসিডেন্সি কলেজে আগপাছ সহপাঠী ছিলাম; জীবন-সন্ধ্যায় আমাদের দুজনের এই যুক্ত চেষ্টার সফলতার আনন্দই আজ আমার মনে আর সব স্মৃতিকে মুছিয়া ফেলিতেছে।

এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণের সম্পত্তি। এরূপ প্রতিষ্ঠানের গৌরব—গৌরব কেন, সুস্থ জীবন পর্যন্ত নির্ভর করে কর্মীদলের সমবেত চেষ্টা ও উচ্চ চরিত্রের উপর। যখন এক দল লোক একই মহান উদ্দেশ্য সম্মুখে ধরিয়া, ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং স্বার্থহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ সম্পূর্ণ দমন করিয়া, কোন ক্ষেত্রে জনহিতকর কাজ করেন, এবং ক্রমাগত কয়েক বছর ধরিয়া ওই কাজটি অবিচ্ছিন্নভাবে চালাইতে সক্ষম হন, তখনই তাঁহারা নিজেদের পরিকল্পিত কার্যটিকে সফলতায় পৌঁছাইতে পারেন। নহিলে তাঁহাদের সাধনার সিদ্ধি সম্ভব নহে। এইরূপ ক্রমাগত সুব্যবস্থা না

থাকিলে সেই প্রতিষ্ঠানটি বৎসর বৎসর এক নূতন ওলটপালটের ফলে ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া চলিতে থাকে। ফ্রান্সদেশের গণতন্ত্রে গত ২১ বৎসরে ৪২ বার ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিমণ্ডলের ভাঙা-গড়া হয় ; এবং তাহার ফল ফ্রান্সের বর্তমান দুর্দশা।

এইরূপ এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ জনসেবার প্রণালীকে দল পাকানো বলিয়া নিন্দা করিবার পূর্বে ইহার কৃতকার্যগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। ক্ষমতার যে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা দিয়াই সেই ক্ষমতার নৈতিক মূল্য বোঝা যায়। বাহিরের জগতে যেসব প্রলয়ঝঞ্ঝা গত সাত বৎসর বাংলার উপর দিয়া গিয়াছে, তাহা আপনারা জানেন, অর্থহ্রাস, লোকনাশ, বাড়িঘর হইতে উচ্ছেদ, সংস্কৃতির কাজে বিপত্তি, এ সব আপনারা সকলেই বঙ্গের সব ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ; এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ও ইহার কোন্‌টি হইতে অব্যাহতি পায় নাই। তাহার উপর কতকগুলি আভ্যন্তরিক কারণে পরিষদের কার্যপরিচালনা সব সময় সহজ বা সুখপ্রদ হয় নাই।

কিন্তু হীরেনবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বনিম্ন কার্যনির্বাহক এবং বেতনভোগী কর্মচারী পর্যন্ত যাঁহারা সকলে অক্লান্ত চেষ্টায় সফলতার এই উচ্চ চূড়ায় তুলিয়াছেন, আমার কর্মজীবনের সন্ধ্যাকালে তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। একজন জগৎবিখ্যাত ইংরাজ স্থপতির সমাধিফলকে লেখা আছে, 'ইঁহার স্মৃতিচিহ্ন যদি চাও, তবে এই মন্দিরের চারিদিকে তাকাও।' সেই মতো যদি কেহ আমাকে বলেন, 'তুমি যে কর্মীদের এত প্রশংসা করিলে, তাঁহারা এমনকী করিয়াছেন?' তবে তাহার উত্তরে আমি বলিব :

> তাঁহাদের কীর্তির জন্য দেখুন, এই পরিষদ্ হলের বর্তমান রূপ, এই রমেশ ভবনের দ্বিতল গৃহ, এই সব সুষ্ঠু সংস্করণ বঙ্গসাহিত্য, রত্ন গ্রন্থমালা ও সাহিত্যিক জীবনী ও প্রমাণপঞ্জী,- আর আজকের উদ্বৃত্তপত্রে প্রকাশিত আমাদের পুঁজির অঙ্ক এবং বারো বৎসর আগে ওই ওই ফান্ডের কি দশা ছিল।

আমাদের বয়স্ক সদস্যদের স্মরণ থাকিবে, বারো বৎসর আগে পরিষদের আর্থিক অবস্থা কী ভীষণ শঙ্কাজনক ছিল ; তখন কর্মচারীদের বেতন দু-মাস করিয়া বাকি থাকিত, কাগজের দাম, দৈনিক খরচ ও প্রেসের দেনার জের চলিত ; এর উপর স্থায়ী তহবিল হইতে সাময়িকভাবে ধার লইয়া তাহাতে ও বাজার-দেনার আট হাজার টাকা ঘাটতি পড়িয়াছিল। দেনা শোধের পথ দেখা যাইত না, আট-নয় হাজার টাকার উপর অনাদায়ী মাসিক চাঁদা খাতায় লেখামাত্র ছিল। আর, আজ ক'বৎসর ধরিয়া সব কর্মচারীই ঠিক সময়ে বেতন পাইতেছেন, দুঃসময় দেখিয়া সকলকেই বেতন বৃদ্ধি, ভাতা এবং বোনাস দিয়া রক্ষা করিয়া হৃষ্টচিত্তের কাজ পাওয়া যাইতেছে। স্থায়ী তহবিলের সব পূর্বঋণ শোধ করিয়া, ওই তহবিল বাড়াইয়া ষোল হাজার করা হইয়াছে।

১৩৫৪ বঙ্গাব্দে ঝাড়গ্রামের বদান্য রাজা নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর দশ হাজার টাকা দান করিয়া সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশের এক ফান্ড স্থাপিত করেন। এই সাত বৎসরে পরিষদের কর্মীদের পরিচালনায় ফান্ডের মূলধন বাড়িয়া ১৩৮০০ টাকা হইয়াছে, এবং ফান্ডের স্বপ্রকাশিত ২৬,০০০ টাকা দামের পুস্তক বিক্রয়ের জন্য মজুদ আছে, অর্থাৎ সমস্ত খরচ বাদে ফান্ডের মূলধন প্রায় চারি গুণ হইয়াছে। সর্বপ্রথমে লালগোলার বদান্য মহারাজ স্যর যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর একটি প্রকাশন-ফান্ড স্থাপন করিয়াছিলেন। পরিষদের এই আজন্ম-সুহৃদ্ শতায়ু হইয়াও আমাদের আশীর্বাদ করিতেছেন ; তাঁহাকে এবং স্বর্গীয় মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্রকে আজ আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

কিন্তু উচ্চ অট্টালিকা বা স্ফীত কোষাগার দিয়া সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠানকে বিচার করা হয় না। আমার গত এগারো বৎসরে বঙ্গ সাহিত্যের সেবায় কি কাজ করিয়াছি, তাহাই দেখি। বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ সেবকদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলি প্রথমে সুন্দর সংস্করণে ছাপা হয়, আমাদের অর্থে নহে, কিন্তু আমাদের কর্মীদের যত্নে। তারপর আমাদের নিজস্ব মাইকেল, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, ভারতচন্দ্র এ সকলের গ্রন্থাবলির পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণ শেষ করিয়া রামমোহনের বাংলা গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছি, একখানি মুদ্রিত হইয়াছে। এরপর রামমোহন শেষ এবং হেমচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী আরম্ভ করা যাইবে স্থির হইয়াছে। আলালের ঘরের দুলালের পরিষৎ সংস্করণ দুই বার ছাপিতে হইতেছে, বঙ্কিম ও মাইকেলের কতকগুলি গ্রন্থ দ্বিতীয়, এমনকী, তৃতীয় বার প্রকাশিত করিতে বাধ্য হইয়াছি ; কারণ, পণ্ডিতসমাজে ও শিক্ষাজগতে সাহিত্য-পরিষদের সংস্করণই প্রামাণিক বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। সঞ্জীবচন্দ্রের *পালামৌ* শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ আকারে আমরা ছাপিয়াছি। সাহিত্য-সাধক-চরিত-মালার পঞ্চাশ সংখ্যা বাহির হইয়াছে এবং কোনো কোনো খণ্ড দুই তিন বার ছাপিতে হইয়াছে।

ইংরেজি ১৮৬৭ হইতে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে সকল উল্লেখযোগ্য বাংলা বই প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার বিশুদ্ধ তালিকা বহু পরিশ্রমে সংকলন করা হইতেছে। ইহা ছাপিলে আমাদের সাহিত্য-গবেষণাকারীদের বিশেষ সুবিধা হইবে। পরিষদ্ এই সব কাজ কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সাহায্য না লইয়া সম্পন্ন করিয়াছে, যাহার দৃষ্টান্ত অন্য দেশে দুর্লভ।

সম্পত্তি রক্ষার দিক হইতে গত কয়েক বৎসরে নিয়মাবলি ও ট্রস্টডীড় (ন্যাসপত্র) সরকারের নির্দেশ অনুসারে সংশোধিত করা হইয়াছে, নূতন নিয়মের দ্বারা কাজের সুব্যবস্থা ও পরিষদের স্বার্থরক্ষা করার পথ সুগম করা হইয়াছে। আইনের কাজে স্বর্গীয় হীরেন্দ্রবাবুর মতো সুহৃদ্-সহায়কের পদ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত সুচারুরূপে পূরণ করিয়াছেন।

এই সুদীর্ঘ কাল অতি ঘনিষ্ঠভাবে সাহিত্য পরিষদের কার্য দেখিয়া, ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে কটি কথা আমার মনে স্থান পাইয়াছে, তাহাই বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ

করিব।

প্রথমত, আমাদের তরুণ আগ্রহশীল কর্মী চাই। আপনাদিগের সভাপতিগণ অনেক বর্ষ ধরিয়া বাহাত্তরের নিকটে বা তদূর্ধ্ব পৌঁছিয়াছেন, সহকারী সভাপতিগণও প্রায়শই তদ্রূপ। এগুলি যেন ভব্যতার খাতিরে করা হয় ধরিলাম। কিন্তু প্রকৃত কর্মীগণ তরুণ না হইলে প্রতিষ্ঠান পঙ্গু হইয়া ক্রমে মারা যায়। আমরা নানা বিভাগে পরিশ্রমী, সজাগ, স্বার্থত্যাগী, যুবক সাহিত্য-সেবক চাই। আমাদের ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, দীনেশচন্দ্র ও চিন্তাহরণ, সকলেই পরিণতবয়স্ক, বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছেন। ইঁহাদের স্থান লইবার মতো লোক কোথায় তৈয়ারি হইতেছে, আমি তো দেখিলাম না। দ্বিতীয়ত একজন শিক্ষিত সাহিত্যিক অথচ কর্মকুশল বেতনভোগী সেক্রেটারি আবশ্যক, যিনি প্রত্যহ তিন চারি ঘণ্টা করিয়া পরিষদে আসিয়া কার্যপরিচালনা করিবেন। রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর এ জন্য একজন পণ্ডিত প্রফেসরকে মাসিক দেড় শত টাকা পাথেয় দিয়া নিযুক্ত করিয়া এই দু-তিন বৎসরে আরও কার্যে বেশ উন্নতি করিয়াছে। তৃতীয়ত আমাদের স্থায়ী তহবিলে যদি আরও দশ-বারো হাজার টাকা বাড়ানো যায়, তবে উহার সুদ হইতে অন্তত অর্ধেক মাসিক বেতন পূরণ হইবে; কর্মচারীরা নিশ্চিন্ত হইয়া কাজ করিবে। চতুর্থত, আরও একজন লাইব্রেরিয়ান আবশ্যক, কারণ, গ্রন্থসংখ্যা বাড়িয়াছে এবং দ্রুতবেগে অসম্ভব বাড়িতেছে। এগুলির যত্ন ও রক্ষা করার জন্য বেহারারা যথেষ্ট নহে। পঞ্চমত, আমেরিকার বিখ্যাত পুস্তকাগারে যেমন মহাপণ্ডিত উপদেষ্টা বসিয়া থাকেন, সেইরূপ পাঠে সাহায্যকারী অধ্যাপকদের কিছুক্ষণ করিয়া যদি পরিষদে আনিয়া বসানো যায়, তবেই আমাদের এই বিশাল গ্রন্থাগার সার্থকজীবন এবং ফলপ্রসূ হইবে। এজন্য তাঁহাদের কিছু দক্ষিণা দিতে হইবে। ষষ্ঠ, কলাগৃহের দ্রব্য ও মুদ্রাগুলির বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত ও মুদ্রণ করা অত্যাবশ্যক। ইহাতে বিলম্ব করিলে আমাদের দুর্নাম ও পার্থিব ক্ষতি হইবে। আমাদের ইংরাজি পুস্তক সংগ্রহও অমূল্য, তাহার ক্যাটালগ ছাপিতে হইবে। সপ্তমত, সকলের উপর চাই সদস্যগণের মধ্যে সহানুভূতি ও সাহচর্যের স্পৃহা, সমবেত চেষ্টা করিবার আগ্রহ, প্রকৃত সাহিত্যসেবীর মনোবৃত্তি। ইহার অভাবে কোটি টাকার প্রতিষ্ঠানও বন্ধ হইয়া যায়, কালের কঠোর শাসনে প্রাণ হারায়। এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ স্থিরবুদ্ধি কর্মঠ সেবকগণ পাইব, এই আশায় বুক বাঁধিয়া আছি। ইহাই আমার বিদায়-প্রার্থনা।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়

বিংশ শতাব্দীর প্রথমে আমাদের দেশে এইরূপ একটি মতবাদ প্রচলিত হয় যে মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে উভয়ই স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া এমন একটি নূতন ভারতীয় সংস্কৃতিকে পরিণত হইয়াছে যাহাকে হিন্দুও বলা যায় না, মুসলমানও বলা যায় না। এক শত বৎসর পূর্বেও এই মত প্রচলিত ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি তদানীন্তন বাংলার শ্রেষ্ঠ নায়কগণ ইহার ঠিক বিপরীত মতই পোষণ করিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত যে ইহাদের ধারণাই বলবৎ ছিল, বাংলা সাহিত্যে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রধানত হিন্দু রাজনীতিক নেতারাই এই নূতন মতের প্রচারে অগ্রণী ছিলেন। ভারতের একজন সর্বজনমান্য রাজনীতিক নেতা এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে অ্যাংলো স্যাকসন, জুট, ডেন ও নর্মান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির মিলনে যেমন ইংরেজ জাতির উদ্ভব হইয়াছে ঠিক সেইরূপে হিন্দু-মুসলমান একেবারে মিলিয়া (coalesced) একটি ভারতীয় জাতি গঠন করিয়াছে। এটি যে একটি বাঞ্ছনীয় আদর্শ তাহা হয়তো সকলেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ইহা বাস্তব সত্য কী না। নর্মানরা ইংল্যান্ড জয় করিয়া সেখানে বসবাস করার ঊর্ধ্ব পক্ষে দুই এক শতাব্দীর মধ্যেই ইংরেজ এমন একটি অখণ্ড জাতি হইয়া উঠিল যে তাহাদের মধ্যে কাহারা জুট, কাহারা ডেন, কাহারা স্যাকসন, কাহারা নর্মান তাহা নির্ণয় করার কোনো সাধ্য ছিল না। মুসলমানদের পূর্বে যে গ্রিক, শক, পহ্লব, কুশান, হূন প্রভৃতি বিদেশি জাতি ভারতবর্ষে আসিয়াছিল তাহারা সত্যই এইভাবে হিন্দুদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু বাংলা দেশে সাত শত বৎসর একত্র বাস করার পরও বাঙালিদের মধ্যে কে হিন্দু কে মুসলমান ইহা স্থির করিতে সাত মিনিট সময়ও লাগে না। হিন্দু রাজনীতিক নেতারা আরও বলিয়াছেন যে,

> মুসলমান শাসনকে বিদেশি শাসন বলা ঠিক নহে—বস্তুত ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে আমরা কখনো মনে করি নাই যে আমরা পরাজিত বা পরাধীন জাতি।

এ ক্ষেত্রেও রাজা রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত বাংলার সকল বিশিষ্ট নায়কেরাই সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করিয়াছেন।

ক্রমাগত দেশপূজ্য নেতাদের প্রচারের ফলে বেশির ভাগ হিন্দুদের মনেই এই দুইটি মতের সত্যতা সম্বন্ধে কোনো সংশয় জাগে না। অবশ্য মুসলমানেরা ইহার কোনো মতই বিশ্বাস করে নাই এবং ইসলামীয় সংস্কৃতি যে হিন্দু সংস্কৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং মুসলমান যুগে যে মুসলমানেরাই প্রভু এবং হিন্দুরা তাহাদের দাস ছিল—এই দুইটি সত্য মানিয়া লইতে এবং প্রচার করিতে কোনোদিনই দ্বিধা বোধ করে নাই। পাকিস্তান যে ইসলাম রাজ্য এবং ইসলামীয় সংস্কৃতির ভিত্তির ওপরই যে ইহা প্রতিষ্ঠিত—ইহা পাকিস্তানের সংবিধানে স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং হিন্দু নেতাদের মতে আজ পাকিস্তানে ইসলামি সংস্কৃতি আছে, ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতি আছে—কেবল হিন্দু সংস্কৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে, জগতে ইহার কোনো পৃথক সত্তা আর নাই। যেহেতু এই গুরুতর এবং অনেকটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক মিলনের ফলেই ঘটিয়াছে বলিয়া প্রচার করা হয়, সেইজন্যই এই দুই ক্ষেত্রে মিলনের প্রকৃত ইতিহাস কী তাহার আলোচনা প্রয়োজন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে হিন্দু ও ইসলাম সংস্কৃতি উভয়ই ধর্মকেন্দ্রিক এবং মধ্যযুগ ধর্মান্ধতার যুগ—অর্থাৎ নির্বিচারে ধর্মের অনুশাসন মানিয়া লওয়াই ছিল এ যুগের রীতি। ইসলামে ধর্ম ও রাষ্ট্রের নায়ক একই এবং উভয়ই শাস্ত্রের বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই শাস্ত্রে মুসলিম রাজ্যে অমুসলমানদের সম্বন্ধে অতিশয় স্পষ্ট করিয়া লিখিত আছে। এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারমর্ম অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি :

> মুসলমান শাস্ত্রমতে কেবল এক ধর্ম, এক জাতি এবং একজন সর্বময় কর্তা থাকিতে পারে। সুতরাং মুসলমান রাষ্ট্রে অমুসলমানের কোনো স্থান নাই। ইহুদি এবং খ্রিস্টান ধর্মের লোকদের কতক সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল, কারণ হজরত বিশ্বাস করিতেন যে বাইবেল ভগবানের বাণী। কিন্তু তাহারাও পূর্ণ নাগরিকতার দাবি করিতে পারিত না। হিন্দু ও পারস্য দেশের জরথুস্ত্র-মতাবলম্বীদের মুসলমান রাষ্ট্রে কোনো স্থানই ছিল না। তাহাদিগকে জিম্মি (Zimmi) বলা হইত এবং মুসলমান প্রভুদের অধীনে হীন দাসের ন্যায় জীবনযাপন করিতে হইত। অমুসলমান মাত্রেই মুসলমানদের শত্রু এবং অমুসলমানদের সংখ্যা এবং শক্তি লাঘব করাই মুসলমানদের স্বার্থ। অমুসলমানদের একেবারে সমূলে ধ্বংস করাই

মুসলমান ধর্মের আদর্শ রাষ্ট্রনীতি এবং আফগানিস্তান, পারস্য ও পশ্চিম এশিয়ায় এই আদর্শ প্রায় কার্যে পরিণত হইয়াছে—কারণ এই সকল দেশে অমুসলমানদের একেবারে চিহ্ন নাই, অথবা মুষ্টিমেয় সংখ্যা আছে। কোরানের মতে বিধর্মীরা যতক্ষণ বিনীতভাবে জিজিয়া কর দিতে স্বীকৃত না হইবে ততক্ষণ তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। অর্থাৎ মুসলমান রাজ্যে হিন্দুকে তাহার জন্মভূমিতে বাস করিতে হইলে মাথা পিছু একটি বাৎসরিক কর দিতে হইবে। এই জিজিয়া কর দেওয়া ছাড়াও মুসলমান শাস্ত্রে হিন্দুর প্রতি আরও বহু নিগ্রহ ও লাঞ্ছনার নির্দেশ আছে।

কুড়িটি ভিন্ন ভিন্ন দফায় হিন্দু কী করিতে পারিবে না তাহার তালিকা দেওয়া আছে। ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি নিষেধাজ্ঞা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

১. কোনো দেব-দেবীর মূর্তির জন্য মন্দির নির্মাণ করা।
২. মুসলমান পথিককে হিন্দু মন্দিরে বাস করিতে বাধা দেওয়া।
৩. কোনো হিন্দুর মুসলমানদের বাড়ির নিকটে বাড়ি করা বা মুসলমানের ন্যায় পোশাক পরা।

ধর্মান্তর সম্বন্ধে বিধি এই যে কোনো হিন্দু ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হইলে তাহাকে বাধা দিবে না—কিন্তু যদি কেহ কোনো মুসলমানকে অন্য ধর্মে দীক্ষা দেয় তবে যে-কোনো মুসলমান তাহাকে এবং উক্ত ধর্মান্তরিত মুসলমানকে স্বহস্তে বধ করিতে পারিবে।

হিন্দুদের ইতিহাস নাই। সুতরাং অত্যাচারের চিহ্ন স্বরূপ এই সকল বিধি-নিষেধগুলি কতদূর এবং কী পরিমাণে প্রয়োগ করা হইত তাহা পুরাপুরি জানিবার উপায় নাই। কিন্তু মুসলমানদের লেখা ইতিহাস হইতেই জানা যায় যে জিজিয়া কর প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং হিন্দুরা রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় এবং সামাজিক কোনো অধিকারই দাবি করিতে পারিত না। এবিষয়ে শাসকদের অনুগ্রহের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইত। মুসলমানদের ইতিহাস হইতেই আরও জানা যায় যে হিন্দুর দেবমূর্তি ভাঙিয়া তাহা মস্‌জিদে উঠিবার সোপান-রূপে ব্যবহার করা হইত। হিন্দুর মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস তো চিরাচরিত প্রথা হইয়া উঠিয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে সিন্ধুদেশ-বিজয়ী মুসলিম নেতা মহম্মদ কাশিম হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁ হিন্দু মন্দির ভাঙিতে উৎসাহ দেখাইয়াছেন। অনেক স্থলে হিন্দু মন্দির ভাঙিয়া তাহারই উপাদান দিয়া মসজিদ নির্মিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁও তাহাই করিয়াছেন।

সুতরাং ভারতে—তথা বাংলায়—যে মুসলমান শাসকেরা কোরানের নির্দেশ মানিয়া চলিতেন তাহা অবিশ্বাসের কোনো কারণ নাই। বাংলা দেশে যে হিন্দুরা নিগ্রহ ভোগ

করিত ইব্‌ন বতুতা তাহা লিখিয়া গিয়াছেন।

অনেকে মনে করেন এবং কেহ কেহ এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে প্রথম আক্রমণের সময় মুসলমানেরা অনেক অত্যাচার করিয়াছে সত্য, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা আপস রফা হইয়াছিল এবং উভয়ে পাশাপাশি শান্তিতে বাস করার এবং অনেক হিন্দু মুসলমান হইলেও পূর্বেকার সংস্কৃতি অনেকটা বজায় রাখার ফলে একটি নূতন সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছিল।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় মুসলমানেরা বাংলা জয় করিতে আরম্ভ করে এবং এই শতকের শেষে প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশই তাহারা অধিকার করে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ কীরূপ ছিল তাহা বিবৃত করিলে বোঝা যাইবে যে প্রায় তিন শত বৎসরের পরস্পর সান্নিধ্য কী ফল প্রসব করিয়াছিল।

প্রথমে রাজনীতিক অধিকারের কথা বলি। এই তিন শত বৎসর এবং তাহার পরের তিন শত বৎসরের মধ্যে, মাত্র একজন হিন্দু—রাজা গণেশ—পঞ্চদশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলার সুলতান হইয়াছিলেন। এই সময় সুফি সম্প্রদায় অর্থাৎ দরবেশদের বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। এই দরবেশদের নেতা নুরকুতব আলম রাজা গণেশকে দমন করিবার জন্য জৌনপুরের মুসলমান সুলতান ইব্রাহিম শার্কিকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম এই :

> প্রায় ৩০০ বছর বাদে ঐস্লামিক ভূমি বাংলাদেশে বিশ্বাস (ধর্ম)-ধ্বংসকারী কাফেরদের কালো ছায়া পড়াতে দেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। মুসলমানরা অমর্যাদায় মধ্যে পতিত হয়েছে। দেশের প্রতিটি কোণে ইসলামের প্রদীপ তার জ্যোতি বিকিরণ করে প্রকৃত পথ প্রদর্শন করত, কানস রায় (অর্থাৎ রাজা গণেশ) অবিশ্বাসের যে ঝড় বইয়ে দিয়েছে তাতে তা নিভে গেছে। ... ইসলামের পীঠস্থানের যখন এই অবস্থা হয়েছে তখন আপনি কেন বেশ শান্ত ও সুখী মনে সিংহাসনে বসে রয়েছেন? উঠুন এবং ধর্মের সাহায্যে এগিয়ে আসুন। ধর্মের জন্য আমির তৈমুর দিল্লি শহর ধ্বংস করেছিলেন। বাংলায় কাফেরি আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে আর আপনি আপনার তলোয়ার খাপে ভরে রেখেছেন। আর এক ঘণ্টাও সিংহাসনে বসে বিশ্রাম করেন না। আসুন, এসে বিধর্মীকে আপনার অসি দিয়ে উচ্ছেদ করুন।

জৌনপুরের সুলতান এই চিঠি পাইয়া আশরফ্ সিমনানি নামে স্থানীয় একজন বিখ্যাত দরবেশের কাছে এই সম্বন্ধে তাঁহার কর্তব্য কী জানিতে চাহিলেন। এই দরবেশ লিখিলেন :

> ধার্মিক রাজাদের পক্ষে মুসলমান ধর্মের রক্ষার জন্যে সৈন্য বাহিনী পরিচালনা করার অপেক্ষা আনন্দের কাজ আর কিছুই নাই। আপনি বাংলা আক্রমণের জন্য সৈন্য সমবেত

করেছেন, আমি আপনার সাফল্য কামনা করি।

ইহার পরের ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ বর্তমান প্রসঙ্গে অনাবশ্যক। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে রাজা গণেশ ইব্রাহিম শার্কিকে বাধা দিতে পারিলেন না এবং ইব্রাহিম রাজা গণেশের পুত্রকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া বাংলায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। গণেশের পূর্বপুরুষেরা মুসলমান বিজয়ের অনেক পূর্বেই বাংলার জমিদার ছিলেন। তথাপি মুসলমানেরা এই সম্ভ্রান্ত বংশীয় হিন্দুকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিল না। কিন্তু তাঁহার পুত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে তাহাকে সুলতান বলিয়া স্বীকার করিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দুই তিন শত বৎসর একত্রে বাস করার ফলেও রাজনীতিক ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রভেদ পূর্বের মতোই ছিল।

কিন্তু কোনো হিন্দু রাজা হওয়া তো দূরের কথা ইহার সম্ভাবনা-মাত্রেই মুসলমান সুলতান কিরূপ বিচলিত হইতেন চৈতন্যদেবের প্রায় সমসাময়িক কবি জয়ানন্দ প্রণীত চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। চৈতন্যের জন্মের অনতিকালপূর্বে এক মিথ্যা গুজব রটিল যে গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হইবে। ইহা শুনিয়া সুলতান আজ্ঞা দিলেন— 'নবদ্বীপ উচ্ছন্ন কর'। ইহার ফলে হিন্দু সংস্কৃতির এই প্রধান কেন্দ্রে হিন্দুর প্রতি কিরূপ অত্যাচার হইয়াছিল জয়ানন্দ তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি:

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধনপ্রাণ লয়ে তার জাতি নাশ করে।।
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে।
ঘর দ্বার লোটে তার সেই পাশে বান্ধে।।
দেইলে দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী।
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত।।
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ।।
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে।।
গৌড়েশ্বর বিদ্যামানে দিল মিথ্যাবাদ।
নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিব প্রমাদ।।
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে।

নিশ্চিন্তে না থাকিও প্রমাদ হব পাছে।।
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা।
গন্ধর্বে লিখন আছে ধনুর্ময় প্রজা।।
এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল।
নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল।।
বিশারদসুত সার্বভৌম ভট্টাচার্য।
স্ববংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড় রাজ্য।।
উৎকলে প্রতাপরুদ্র ধনুর্ময় রাজা।
রত্ন সিংহাসনে সার্বভৌমে কৈল পূজা।।

রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির প্রমাণ-স্বরূপ অনেকেই হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগের উল্লেখ করেন। কোনো কোনো সুলতান সম্বন্ধে একথা সত্য হইলেও সাধারণ হিসাবে এই ধারণা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। কারণ সুলতানদের ওপর সুফি দরবেশদের খুব প্রভাব ছিল এবং তাঁহারা উচ্চপদে হিন্দুদের নিয়োগের খুবই বিরোধী ছিলেন। এ বিষয়ে সুফি দরবেশ হজরত মৌলানা মুজফ্‌ফর সাম্‌স্‌ বল্খি বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহার একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

> ধর্মশাস্ত্রে আছে যে মুসলমানেরা কখনও অমুসলমানকে বিশ্বাস করিবে না এবং মন্ত্রী-পদে নিযুক্ত করিবে না। কাফেরকে ছোটো-খাটো কাজ দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহাকে 'ওয়ালি' (প্রধান পরিদর্শক বা রাজ্যপাল) পদে নিযুক্ত করিবে না কারণ তাহা হইলে মুসলমানদের ওপরও তাহারা কর্তৃত্ব করিবে। ইহার বিরুদ্ধে কোরান, হদিস্‌ ও অন্যান্য গ্রন্থেও স্পষ্ট নির্দেশ আছে। পরাজিত হিন্দুরা নতশিরে তাহাদের নিজের জমি-জমার শাসন সংরক্ষণ করিতে পারে। কিন্তু মুসলমান রাজ্যে তাহাদিগকে এমন সব পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে যাহাতে তাহারা মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব করিতেছে। এইরূপ ব্যবস্থা একেবারেই অনুচিত।

সুফি দরবেশের চিঠিতে যে ফল হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে। যাহার কাছে এই চিঠি লেখা হইয়াছিল সেই সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ্‌ ও তাঁহার পুত্র সৈফুদ্দিন হম্‌জা শাহের রাজত্বকালে চিন সম্রাটের প্রেরিত দূত কয়েকবার বাংলা দেশে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের একদলের দোভাষী ছিলেন মা-হুয়ান। তিনি লিখিয়াছেন যে সুলতান ও ছোটো বড়ো অমাত্যেরা সকলেই মুসলমান। বস্তুত বিস্তৃত চিনা বিবরণী পড়িলে মনেই হয় না যে এ দেশে হিন্দুদের কোনো প্রকার প্রতিপত্তি ছিল। আগাগোড়া মুসলমানদের কথায় ভরা। পঞ্চদশ শতাব্দেও রাজ্যশাসন-কার্যে হিন্দুদের স্থান কোথায়

ছিল ইহা হইতে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

বাংলায় তিন শতের অধিক বৎসর-ব্যাপী সুলতানি শাসনে খুব অল্পসংখ্যক কয়েকজন সুলতানই হিন্দুদিগকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু হিন্দুর উচ্চপদে নিয়োগ বা হিন্দু পণ্ডিতদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন যে সব সময়েই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতি-সম্বন্ধের সূচনা করে এরূপ বিশ্বাস করার সংগত কারণ নাই। সুলতান জলালুদ্দিন একজন হিন্দুকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং বিখ্যাত পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্রকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অথচ তিনি হিন্দুদের উপর বিষম অত্যাচার করিতেন। সুলতান রুকনুদ্দিন বারবক শাহ ও সুলতান হোসেন শাহ অনেক হিন্দুকে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হোসেন শাহ যখন ওড়িশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন তখন হিন্দু মন্ত্রী সনাতনকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে বলিলেন। সনাতন বলিলেন 'আপনি ওড়িশায় যাইয়া হিন্দুর দেবমন্দির ভাঙিবেন—আমি আপনার সঙ্গে যাইতে পারিব না।' ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সুলতান সনাতনকে কারাবদ্ধ করিলেন। এই সনাতন ছিলেন শ্রীচৈতন্যের প্রিয় শিষ্য। চৈতন্যের ব্যক্তিত্বের প্রভাব সনাতনকে স্পর্শ করিয়াছিলেন। কিন্তু হোসেন শাহের মতো উদার ধর্মমতের জন্য প্রসিদ্ধ সুলতানও সনাতনের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা হইতে মনে হয় যে হিন্দু উচ্চপদে নিযুক্ত হইলেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতি-সম্বন্ধের অনুমান করা যুক্তিযুক্ত নহে।

বাংলা দেশে মোগল রাজ্যশাসন প্রতিষ্ঠা হইবার পরও বাঙালি হিন্দুরা কোনো উচ্চপদে নিযুক্ত হইত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মুর্শিদকুলি খাঁর আমল হইতেই হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগের প্রথা প্রথম প্রচলিত হয়। কিন্তু ইহা হিন্দুর প্রতি প্রীতি-বশত নহে—অন্য গূঢ় রাজনীতিক কারণ ছিল। মুর্শিদকুলি ও আলিবর্দি উভয়েই হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিবার জন্য কুখ্যাত ছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হিন্দুর উচ্চ রাজপদে নিয়োগ হউক না কেন ইহা বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। তখন মোগল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইয়াছে এবং পঞ্চাশ বৎসর পার হইবার পূর্বেই বাংলায় মুসলমান রাজ্যের অবসান হয়।

বাংলা দেশে মধ্যযুগের এই রাজনীতিক পটভূমিকা যে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মিলনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

মুসলমান ধর্মশাস্ত্র অনুসারে রাজনীতিক ব্যাপারে হিন্দুদের কোনো অধিকার বা মর্যাদা ছিল না এবং এই নীতি বাস্তব পক্ষে কতদূর অনুসৃত হইয়াছিল তাহা দেখা গেল। ধর্মবিষয়ে মুসলমান রাজ্যে হিন্দুর অবস্থা যে আরও শোচনীয় ছিল মুসলমানদের লিখিত ইতিহাস ও বাংলা সাহিত্যে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। দেবদেবীর মূর্তিপূজা এবং তাহার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা—ইহাই ছিল ধর্মপ্রাণ হিন্দুর জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসনে ইহা ধ্বংস করাই ছিল মুসলমানদের প্রধান কর্তব্য। কার্যক্ষেত্রে

সুলতান ও তাঁহার মুসলমান কর্মচারীরা কেবল মন্দির দেবমূর্তি ভাঙিয়া ও দেবমূর্তির অশেষ লাঞ্ছনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসের ও ধর্মানুষ্ঠানের উপর এই কঠোর আঘাত যে কতদূর মর্মান্তিক হইয়াছিল তাহা বুঝিতে হইলে মধ্যযুগের হিন্দুর সংস্কৃতি যে কীরূপ ধর্মকেন্দ্রিক ছিল তাহা স্মরণ করিতে হইবে। এই ধর্মের প্রতি অত্যাচার কতদূর পৌঁছিয়াছিল তাহা না জানিলে হিন্দুর উপর ইহার প্রতিক্রিয়া এবং কেন যে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সংস্কৃতির মিলন বা মিশ্রণ কখনও সম্ভবপর হয় নাই, মধ্যযুগের এই তথ্যটি বোঝা যাইবে না। সাধারণের মধ্যেও ইহার সম্বন্ধে জ্ঞান খুব বেশি নহে। সুতরাং প্রমাণ-স্বরূপ কয়েকটি সমসাময়িক কাব্যের সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করিলেও যে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মধ্যে মূলগত প্রভেদ ছিল এ বিষয়ে মুসলমানদের মতামত পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পঞ্চদশ শতকে বাংলায় সুপরিচিত মিথিলার কবি বিদ্যাপতি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি :

> হিন্দু ও তুরুকের বাস কাছাকাছি। কিন্তু একের ধর্মে অপরের উপহাস। একের বাঙ্ (আজান), অপরের বেদ। কারও সমাজে মেলামেশা, কারও সমাজে ভেদ। একের পণ্ডিত ওঝা, অপরের পণ্ডিত খোজা। একের নকত, অপরের রোজা। একের তাম্রকুণ্ড, অপরের কুঁজা। একের নমাজ, অপরের পূজা। কত তুরুক রাস্তায় যেতে বেগার ধরে। ব্রাহ্মণ বটুকে ধরে এনে তার মাথায় চড়িয়ে দেয় গোরুর রাঙ্। ফোঁটা চাটে, পৈতা ছেঁড়ে, ঘোড়ার উপর চায় চড়াতে। ধোয়া উড়ি ধানে মদ চোলাই করে, দেউল ভেঙে মসজিদ বানায়। গোরে ও গোমঠে মহী হল পূর্ণ, পা দেবার একটুও স্থান নেই। হিন্দুকে বলে, দূরে নিকালো। তুরুক ছোটো হলেও বড়কে মারতে যায়।

বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গল রচিত হয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে। গ্রন্থারম্ভে কবি সুলতান হোসেন শাহকে নৃপতি-তিলক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং আরও লিখিয়াছেন :

> রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত্য।

কিন্তু এই সুখের রাজ্যেও মুসলমান কাজিদের যে বীভৎস অত্যাচারে হিন্দুরা প্রপীড়িত হইত তাহার সবিস্তার বর্ণনা এই গ্রন্থেই আছে। হোসেন হাটি গ্রামের হাসেন হোসেন নামে দুই ভাই ছিল কাজি। হোসেনের শালা হালদারের কাজ করিত। তাঁহার সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন :

> সর্বক্ষণ হোসেনের আগে আগে আসে।

তাহার ভয়ে হিন্দু সব পলায় তরাসে।।
যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত।
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজির সাক্ষাৎ।।
বৃক্ষতলে থুইয়া মারে বজ্র কিল।
পাথরের প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল।।
পরেরে মারিতে কিবা পরের লাগে ব্যথা।
চোপাড় চাপড় মারে দেয় ঘাড়কাতা।।
যে যে ব্রাহ্মণের পৈতা দেখে তারা কান্ধে।
পেয়াদা বেটা লাগ পাইলে তার গলায় বান্ধে।।
ব্রাহ্মণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে।
কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুতু দেয় মুখে।।

এই গ্রামের তকাই মোল্লা একদিন দেখিল একটি কুটিরের মধ্যে কতকগুলি রাখাল বালক ঢাক ঢোল মৃদঙ্গ বাজাইয়া মনসার ঘট পূজা করিতেছে। সে ক্রুদ্ধ হইয়া ঘট ভাঙিতে অগ্রসর হইলে রাখাল বালকেরা তাহাকে প্রহার করিল এবং কাজির কাছে নালিশ করিবে না এই শপথ করায় মুক্তি দিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে দুই কাজির কাছে গিয়া সব বলিল। কুপিত হইয়া কাজি বলিল :

হারামজাত হিন্দুর এত বড়ো প্রাণ।
আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান।।
গোটে গোটে ধরিব গিয়া যতেক ছেমরা।
এড়া রুটি খাওয়াইয়া করিব জাতি মারা।।

তখন হাসান হোসেন দুই ভাই পাইক বরকন্দাজ লইয়া রওয়ানা হইল। তাহাদের মাতা ছিলেন এক হিন্দুর কন্যা—পূর্বতন কাজি তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। এই রমণী পুত্রদিগকে নিষেধ করিলেন কিন্তু তাহারা শুনিল না। রাখালবালকগণকে বাঁধিয়া আনা হইল।

কাজি বলে আরে বেটা ভূতের গোলাম।
পীর থাকিতে কেন ভূতেরে সেলাম।।

ওদিকে তাহার অনুচরেরা রাখালদের কুটির ভাঙিল এবং মনসার ঘট গুঁড়া গুঁড়া করিয়া ফেলিল। যে কুম্ভকার ঘট গড়াইয়াছিল তাহাকেও গ্রেফতার করা হইল।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে নবদ্বীপের কাজি হিন্দুদের ওপর যেরূপ অত্যাচার করিতেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। অন্যান্য

বৈষ্ণব গ্রন্থেও আছে। পথে যাইতে যাইতে কাজি শুনিলেন গৃহ মধ্যে বাদ্য-সহযোগে কীর্তন হইতেছে। তাহার পরের কথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :

কাজি বলে 'ধর ধর আজি করে'। কার্য।
আজি বা কি করে তোর নিমাই-আচার্য।।
আথে-ব্যথে পলাইল নাগরিয়াগণ।
মহাত্রাসে কেশ কেহো না করে বন্ধন।।
যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে।
ভাঙিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে।।
কাজি বলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া।
করিব ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া।।
ক্ষমা করি যাও আজি, দৈবে হৈল রাতি।
আর দিন নাগালি পাইলে লৈব জাতি।।
এইমত প্রতিদিন দুষ্টগণ লৈয়া।
নগর ভ্রময়ে কাজি কীর্তন চাহিয়া।

এই সময় আলাউদ্দিন হোসেন শাহ বাংলায় সুলতান ছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মের প্রতি উদারতার জন্য বর্তমান যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক হিন্দুরা তাঁহাকে হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষী বলিয়াই মনে করিত। তিনি বাল্যকালে এক ব্রাহ্মণের অধীনে কাজ করিতেন এবং কার্যে অবহেলার জন্য ব্রাহ্মণ তাঁহাকে চাবুক মারিয়াছিলেন। সুলতান হওয়ার পর তিনি মুসলমান-স্পৃষ্ট জল খাওয়াইয়া ওই ব্রাহ্মণের জাতি মারিয়াছিলেন। হোসেন শাহের মন্ত্রী সনাতন তাঁহার সঙ্গে ওড়িশায় যান নাই, কারণ তিনি যে সেখানে মন্দির ধ্বংস করিবেন ইহা সনাতন জানিতেন। শ্রীচৈতন্য রাজধানী গৌড়ের নিকট রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলে কোতোয়াল হোসেন শাহের নিকট গিয়া নিবেদন করিল যে বহু লোক এক হিন্দু সন্ন্যাসীর সঙ্গে জুটিয়াছে। হোসেন শাহ বলিলেন যে অর্থলোভ ছাড়াও বহুলোক যাঁহার সঙ্গ কামনা করে, তিনি নিশ্চয়ই একজন গোঁসাই—সুতরাং কর্মচারীদের হুকুম দিলেন কেহ যেন তাঁহার ওপর কোনো অত্যাচার না করেন। কিন্তু রাজসভার হিন্দুগণ এই আশ্বাসে ভুলিলেন না। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আছে :

সবে মেলি এক স্থানে বসিয়া নিভৃতে।
লাগিলেন যুক্তিবাদ মন্ত্রণা করিতে।।
স্বভাবেই রাজা মহা-কাল-যবন।
মহা-তমোগুণ-বুদ্ধি হয় ঘনে-ঘন।।

ওড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক কত কত করিল প্রমাদ।।
দৈবে আসি সত্ত্বগুণ উপজিল মনে।
তেঁই ভাল কহিলেক আমা সবা স্থানে।।
আর কোন পাত্র আসি কুমন্ত্রণা দিলে।
আর-বার কুবুদ্ধি আসিয়া পাছে মিলে।।

এই পরামর্শ অনুসারে তাঁহারা গোপনে এক ব্রাহ্মণের মারফত শ্রীচৈতন্যকে অনুরোধ করিলেন, তিনি যেন অবিলম্বে এই স্থান পরিত্যাগ করেন।
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আছে যে সুলতান হোসেনের দুইজন প্রধান হিন্দু অমাত্য, রূপ সনাতন দুই ভাই, গোপনে মধ্যরাত্রে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারাও চৈতন্যকে স্থান ত্যাগ করিতে বলিলেন।

ইঁহা-হৈতে চল প্রভু। ইহা নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড় রাজ।।
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি। ২০৮

সে যুগে উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কর্মচারীদের মনের ভাব রূপ ও সনাতনের নিম্নলিখিত উক্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রভুর কৃপা প্রার্থনা করিয়া তাঁহারা বলিলেন—

জগাই-মাধাই হৈতে কোটি-কোটি গুণে।
অধম পতিত পাপী আমি দুই জনে।। ১৮৫
ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছসেবী করি ম্লেচ্ছকর্ম।
গোব্রাহ্মণদ্রোহি-সঙ্গে আমার সঙ্গম।। ১৮৬

(টীকাকারের মতে এখানে 'ম্লেচ্ছজাতি'র অর্থ ম্লেচ্ছের ন্যায় হীন কর্মকারী)

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধ কীরূপ ছিল রূপসনাতনের এই উক্তি হইতেই তাহা কতকটা বুঝা যাইবে। মুসলমানেরা যেমন ধর্মের অনুশাসনে হিন্দুমন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করিত, হিন্দুরাও তেমনি ধর্মের অনুশাসনে মুসলমানদিগকে ম্লেচ্ছ যবন জ্ঞানে তাহাদের সকল প্রকার সংস্পর্শ পরিহার করিত। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আছে যে চৈতন্য যখন কাজির বাড়ির বাগান ধ্বংসের পর তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন তখন কাজি বলিলেন :

গ্রামসম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা।

দেহসম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রামসম্বন্ধ সাঁচা।। ১৪২
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা।
সেসম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।। ১৪৩

ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে সকালে প্রতিবেশী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে উদার সামাজিক সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই উদারতা মৌখিক ভদ্রতা ব্যতীত কার্যে কোনো পক্ষেই প্রকাশ পাইত না। যখন কাজি শুনিলেন নিমাই পণ্ডিত বড়ো দল লইয়া কীর্তন করিতে বাহির হইয়াছেন তখন ভাগিনেয় সম্বন্ধ ভুলিয়া কাজি বলিলেন, 'নিমাই পণ্ডিত' :

মোরে লঙ্ঘি হিন্দুয়ানি করে।
তবে জাতি নিমু আজি সবার নগরে।।[২]

অন্যদিকে এই 'কাজি মামা' নিমাই পণ্ডিতের বাড়ি আসিলে যে আসনে বসিতেন তাহা অশুদ্ধ হইত—পান বা খাদ্য দিয়া আপ্যায়িত করিবার কোনো প্রশ্নই উঠিত না। কাজি যে হিন্দুর জাতি মারার ভয় দেখাইয়াছিলেন সে কাজটি খুবই সহজ ছিল। কোনো মতে হিন্দুকে একবার মুসলমানের স্পৃষ্ট কোনো পানীয় বা খাদ্য দ্রব্য জোর করিয়া মুখে দিলেই সে পতিত হইত—আর তাহার হিন্দু বলিয়া গণ্য হইবার উপায় ছিল না।

ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হয়। এই কাব্যে কবি মোগল সম্রাট জাহাঙ্গিরের মুখ দিয়া হিন্দুধর্মের যে নিন্দাবাদ করাইয়াছেন তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে হিন্দুধর্মের প্রতি মুসলমানদের মনোভাব মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত প্রায় একরূপই ছিল। সেনাপতি মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিয়া বাহশাহের নিকট গেলে বাদশাহ খুব খুশি হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—কী পুরস্কার চাও? মান সিংহ বলিলেন, যুদ্ধের সময় তাঁহার রসদ ফুরাইয়া গিয়াছিল—ভবানন্দ মজুমদার এক সপ্তাহের রসদ দিয়া সৈন্যদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছে, তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ (প্রতাপাদিত্যের) রাজ্য দিব অঙ্গীকার করিয়াছি। বাদশাহের কাছে আমি এই পুরস্কার প্রার্থনা করি। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া জাহাঙ্গির হিন্দু-ধর্মের যথেষ্ট নিন্দা করিয়া অবশেষে বলিলেন :

দেহ জ্বলি যায় মোর বামণ দেখিয়া।
বামণেরে রাজ্য দিতে বল কি বুঝিয়া।।
কাফর বাঙালি হিন্দু বেদীন বামণ।
তাহারে রাজাই দিতে নাহি লয় মন।।

মুসলমানের ধর্মের সহিত তুলনামুলক বিচার করিয়া ও নানা আচার অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিয়া বাদশাহ মন্তব্য করিলেন :

হায় হায় আখেরে কী হইবে হিন্দুর।

সুতরাং তিনি মনের মহৎ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন :

আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই।
সুন্নত দেওয়াই আর কলমা পড়াই।।

অন্নদা-মঙ্গলে উদ্ধৃত মান সিংহ ও জাহাঙ্গিরের কথোপকথন যে কাল্পনিক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই উক্তি, ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্বেও মুসলমানেরা হিন্দুধর্মকে কি চোখে দেখিতেন, অন্তত সে সম্বন্ধে হিন্দুর মনে কিরূপ ধারণা ছিল, তাহার প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। বাংলার নবাব আলিবর্দির হিন্দুধর্মের উপর অত্যাচারের যেরূপ বর্ণনা অন্নদা-মঙ্গলের গ্রন্থ সূচনায় আছে তাহাও এই সিদ্ধান্তের পরিপোষক। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ বহু মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং অনেক হিন্দুর জাতি নাশ করিয়াছিলেন।

হিন্দু সযত্নে মুসলমানের সহিত সর্বপ্রকার সম্বন্ধ পরিহার করিয়া চলিত এবং তাহাকে ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করিত। চতুর্দশ শতকে ইব্‌ন্ বতুতা নামে একজন বিদেশি মুসলমান ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া তাহার একটি বিবরণী লিখিয়াছেন।

হিন্দুদের সম্বন্ধে তিনি বলেন :

আমি সিংহলদ্বীপে যাইয়া দেখিলাম সেখানে কাফের-রা (অর্থাৎ অমুসলমানেরা) মুসলমান ফকিরদের সম্মান করে এবং নিজেদের বাড়িতে তাহাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। কিন্তু ভারতের হিন্দুগণ তাহাদের বাড়িতে থাকিতে দেয় না। এবং নিজেদের বাসনে তাহাদের খাইতে বা পান করিতে দেয় না—অবশ্য তাহারা এই সব ফকিরদিগকে প্রহার বা অপমান করে না। কোনো কোনো সময় ঠেকিয়া আমরা হিন্দুদিগকে আমাদের জন্যে ভাত রান্ধিতে বলিয়াছি। তাহারা নিজেদের পাত্রে রান্ধিয়া আনিয়া দূর হইতে কলাপাতার উপর ভাত ডাল ঢালিয়া দিয়া চলিয়া যাইত। খাওয়ার পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা কুকুর বিড়ালে খাইত। কোনো শিশু যদি ইহা ছুঁইত তাহা হইলে তাহাকে প্রহার করা হইত এবং পরে গোবর খাওয়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইত।

বাংলা দেশে যে ইহা কত কঠোর ছিল তাহার সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান অনেকেরই আছে। কেবলমাত্র মুসলমানি খানার গন্ধ নাকে যাওয়ার জন্য অনেকের জাতি গিয়াছে এরূপ প্রবাদও আছে।

হিন্দুরা যেমন মুসলমানদের ধর্মের গোঁড়ামির জন্য তাহাদিগকে ঘৃণা করিত এবং ম্লেচ্ছ বলিয়া তাহাদের খাদ্য পানীয়াদি এবং আচার-ব্যবহার বর্জন ও সর্বপ্রকারে তাহাদের সংস্পর্শ পরিহার করিয়া চলিত, মুসলমান সমাজেও তেমনি হিন্দুর এই সামাজিক গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। যবন হরিদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইল:

যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভাল মতে তারে আনি করহ বিচার।।
মুলুকের পিতা হরিদাসকে বলিলেন :
"কত ভাগ্যে দেখ তুমি হঞাছ যবন।
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন।।
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশ-জাত।।
জাতি ধর্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।
পরলোকে কেমনে বা পাইবা নিস্তার।।

মুসলমানেরা জোর করিয়া হিন্দু মেয়েকে ধরিয়া আনিয়া প্রথমে তাহাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিত, তাহার পর ইসলামি ধর্মমতে বিবাহ করিত। কেহ কেহ মনে করেন যে এই জন্যই হিন্দুদের মধ্যে বালিকা বয়সে বিবাহ ও অবরোধ প্রথা খুব কড়াকড়িভাবে প্রতিপালিত হইত। এইরূপ আহারাদি ও অন্যান্য বিষয়েও হিন্দুরা যাহাতে চিরন্তন প্রথা লঙ্ঘন করিয়া মুসলমান সমাজের দিকে বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি দেখাইতে না পারে তাহার জন্য সামাজিক বিধি-নিষেধ কঠোর হইতে কঠোরতর হইতে লাগিল। ইচ্ছাকৃত তো দূরের কথা, এ বিষয়ে অনিচ্ছাকৃত সামাজিক অপরাধেও হিন্দুরা সমাজে পতিত হইত। একবার দৈব-দুর্বিপাকে কেহ মুসলমানের ভক্ষ্য ও পানীয় গ্রহণ করিলে বা হিন্দু স্ত্রীলোককে মুসলমান বলপূর্বক স্পর্শ করিলে তাহারা সপরিবারে সমাজচ্যুত হইত এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাহাদের গত্যন্তর ছিল না। এই সমুদয় কারণে যে হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে এবং মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতেছে তাহা হিন্দু সমাজপতিরা বুঝিতেন, কিন্তু তাঁহারা হিন্দুত্ব রক্ষা করিবার জন্য হিন্দুকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহাদের এই পদ্ধতি ভালো কী মন্দ তাহা বিচার করিতে চাহি না, কিন্তু কোটি কোটি হিন্দুর বিনিময়ে তাঁহারা যে হিন্দুর ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহারা সুদৃঢ় বাঁধ বাঁধিয়া ইসলামের সংস্কৃতি প্রবাহ রোধ করিতে চাহিয়াছিলেন। বাঁধের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র হইলেও যে স্রোতের গতি দুর্বার হইয়া বাঁধ ভাঙিয়া পড়িবে এই আশঙ্কায় কোনো রন্ধ্রপথ রাখেন

নাই। কঠোর নিয়মের বন্ধন হইতে বিন্দুমাত্র ভ্রষ্ট হইলেও নির্মম হস্তে নিজের প্রিয়জনকে ত্যাগ করিয়াছেন। কৃত্রিম সামাজিক প্রাচীর গড়িয়া হিন্দুর জন্য এক বিরাট অচলায়তন গড়িয়াছিলেন। এইরূপে মধ্যযুগে বাংলায় যে রাজনীতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা যে হিন্দু ও ইসলাম সংস্কৃতির মিলন বা মিশ্রণের অনুকূল ছিল না—বরং বিশেষভাবে পরিপন্থী ছিল তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। অতঃপর বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ কোনো মিলন বা মিশ্রণ ঘটিয়াছিল কিনা তাহা পরীক্ষা করা যাউক।

পূর্বেই বলিয়াছি মধ্যযুগের সংস্কৃতি ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। সুতরাং ধর্মের দিক দিয়া এই মিলন কতদূর ঘটিয়াছিল সর্বপ্রথমে তাহার বিচার করাই কর্তব্য। এইরূপ মিলনের ফলে হিন্দু ধর্মের কোনো পরিবর্তন হইয়াছিল এরূপ মনে করিবার কোনোই কারণ নেই। কেহ কেহ মনে করেন যে উদার ভক্তিবাদ, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে এক ভগবানে বিশ্বাস, এবং উচ্চনীচ হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি কৃত্রিম ভেদ অগ্রাহ্য করিয়া এক অখণ্ড মানবতাবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে, কবির, নানক প্রভৃতি মহাজনেরা প্রচার করিয়াছিলেন তাহাই হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির প্রতীক। বর্তমান প্রসঙ্গে এই গুরুতর বিষয়টির আলোচনার প্রয়োজন নাই। বাংলা দেশে একমাত্র শ্রীচৈতন্যকেই উক্ত মহাজনদের পর্যায়ভুক্ত করা হয় এবং কেহ কেহ তাঁহার ধর্ম মতে ইসলামীয় প্রভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে চৈতন্য যদিও 'জাতিভেদ' খুব বেশি মানিতেন না, তিনি সামাজিকভাবে ইহা একেবারে ত্যাগ করেন নাই এবং পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সমাজ মোটামুটিভাবে জাতিভেদ গ্রহণ করিয়াছিল। মূর্তি পূজারও যে তিনি বিরোধী ছিলেন না—পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে বিগ্রহ দর্শনে তাঁহার ভাবাবেশ ইহা প্রমাণ করে। তিনি যে দেব-দেবীতে বিশ্বাস করিতেন, কৃষ্ণভক্তিই তাহার সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং যে তিনটি বিষয়ে কবীর, নানক প্রভৃতি জোর দিয়াছিলেন, চৈতন্যের উপর তাহার প্রভাব দেখা যায় না। তিনি স্ত্রী, শূদ্র, চণ্ডাল, যবন প্রভৃতি সকলকেই কৃষ্ণভক্তিতে দীক্ষিতে করিবেন এইরূপ আশা পোষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আশা সফল হয় নাই এবং ভারতবর্ষের অন্যত্রও যেমন, বাংলা দেশেও তেমনি, রক্ষণশীল হিন্দু ও মুসলমানেরা ইহাতে সায় দেয় নাই। সুতরাং ইহা বাংলার মুসলমান ও হিন্দু সংস্কৃতিতে কোনো স্থায়ী রেখাপাত করে নাই এবং হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মধ্যে কোনো রূপ যোগাযোগের সূত্র হয় নাই। মধ্যযুগের বাংলাদেশে এই উদার ভাব কয়েকটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে আবদ্ধ ছিল, সে কথা পরে বলিব।

কেহ কেহ মনে করেন সুফি দরবেশ ফকিরেরা ধর্মে উদারমতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাংলাদেশে সুফি দরবেশদের রাজনীতি সম্বন্ধে—অন্তত হিন্দুদের দিক হইতে—এরূপ বিশ্বাস করা কঠিন।

একথা সত্য যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই সাধু সন্ন্যাসী পির ফকিরের সম্মান ছিল। ইহা হইতে হিন্দু সংস্কৃতির কোনো পরিবর্তন অনুমান করিবার হেতু নাই। কারণ ইহা হিন্দুর চিরাচরিত প্রথা। ইব্‌ন বতুতার বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে হিন্দুরা মুসলমান পির ফকিরকে সম্মান করিত বটে, কিন্তু তাহাদের স্পর্শ এড়াইয়া চলিত।

মুসলমান পিরের প্রতি হিন্দুর ভক্তির আরও কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। পির দরবেশদের যে সুলতানের উপর যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং অনেক দরবেশ যে নিজেরাই সুলতানের সাহায্যে হিন্দু রাজ্য জয় করিয়াছেন তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে।[১] সুতরাং ভয় হইতেও অনেকটা ভক্তির ভাব আসিয়াছিল। শ্রীহট্ট-বিজেতা প্রবল প্রতাপান্বিত শেখ জালালুদ্দিন তব্রিজি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ছড়াটি 'শেখ-শুভোদয়া' গ্রন্থে পাওয়া যায়।

মকদম সেক শাহ জলাল তবরেজ তব পতে করোঁ পরণাম।
চৌদীশ মধ্যে জানিবে যাহার নাম।
বারেক রক্ষা করো মোর ধন প্রাণ
দেশে গেলে দিব তোমার নামে অর্ধেক দান।

আর একটি কারণ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

> পিরদিগের সিদ্ধাইয়ের প্রতি জনসাধারণের ভয় ভক্তি মুসলমান ধর্মের দান নহে। ইহা এ দেশের জনসাধারণেরও স্বাভাবিক মনোবৃত্তি। বৌদ্ধ ও শৈব তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যদিগের প্রভাবে সিদ্ধাইয়ের প্রতি জনসাধারণের যে মোহ ছিল তাহারই ইহা রূপান্তর।

পূর্বেই বলিয়াছি যে হিন্দু সিদ্ধাচার্যগণের আবাসস্থানেই পিরের আস্তানা গড়িয়া উঠায় এই মোহ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দেবদেবীর যে রূপ জনসাধারণের ভক্তির উদ্রেক করে তাহা হইতেছে প্রধানত বিপদ বা বিপদের ভয় হইতে উদ্ধার-কর্তা এবং ধনসম্পদ-দাতা। আধি-ব্যাধির হাত হইতে ত্রাণের জন্য চণ্ডী, কালী, শীতলা, মনসা—এবং ধনসম্পদ ও সন্ততি লাভের উদ্দেশ্যে হরি, ষষ্ঠী, সত্যনারায়ণ প্রভৃতির পূজা এবং নানাবিধ ব্রত বাংলার লৌকিক ধর্ম অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বিপদে পড়িলে ভগবানের দোহাই দিতে হয়—তখন অনেকের মনেই হিন্দুর ভগবান কি মুসলমানের ভগবান এ প্রভেদ থাকে না। ক্ষেমানন্দের রচিত মনসার ভাসানে দেখা যায় যে লখীন্দরকে মনসার কোপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার লৌহনির্মিত বাসরঘরে হিন্দুস্থানি রক্ষাকবচ ও অন্যান্য মন্ত্রপূত দ্রব্যের সঙ্গে একখানি কোরানও

রাখা হইয়াছিল। কথিত আছে নবাব মিরজাফরের মৃত্যুকালে তাঁহাকে কিরীটেশ্বরীর পাদোদক পান করানো হইয়াছিল। জলমগ্ন ব্যক্তি তৃণ অবলম্বন করিয়াও বাঁচিতে চাহে। সুতরাং বিপদে আপদে হিন্দু সন্ন্যাসী ও মুসলমান ফকিরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা অস্বাভাবিক নহে। গল্প আছে যে জনৈক ব্যক্তি দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধনের সমর্থনে বলিয়াছিলেন যে ইহাতে পরকালের উপকার হইবে। ইহার প্রতিবাদে একজন বলিলেন যে পরকাল আছে ইহার নিশ্চয়তা কী? উত্তর হইল—না থাকে তো কোনো কথাই নাই। তোমার আমার একই গতি। কিন্তু যদি থাকে তবে তোমার অনন্ত নরক, আমার অনন্ত স্বর্গ—এই মহৎ ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় না হয় একটু দৈহিক কষ্টই সহ্য করিলাম। এই মনোবৃত্তি জনসাধারণের মনে প্রবল হওয়াতেই, হিন্দুরা পিরের শিরনি দেয়, মুসলমানেরা মন্দিরে ভোগ দেয়; ঊনবিংশ শতাব্দীতেও জনৈক মুসলমান জমিদার নিজ বাড়িতে কালী পূজা করিয়াছেন এবং ঢাকায় কোনো মুসলমান মহা ধুমধাম করিয়া শীতলা দেবীর পূজার অনুষ্ঠান করিতেন। কিন্তু এই সমুদয়ের ফলে মুসলিম ধর্মমতের কোনো পরিবর্তন হয় নাই। হিন্দুবিদ্বেষী সম্রাট ঔরংজেবের পৌত্র বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি হোলির উৎসবে যোগ দিতেন শুনিয়া ঔরংজেব তাঁহাকে ভর্ৎসনা করেন এবং তাঁহার হোলি উৎসবে যোগদান বন্ধ হয়।

যাঁহারা ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমন্বয়ের সন্ধান করেন, এই শ্রেণির কতকগুলি দৃষ্টান্ত ছাড়া তাঁহাদের আর কোনো সম্বল নাই। সত্যপিরের পূজা তাঁহাদের ব্রহ্মাস্ত্র। তাঁহারা বলেন যে সত্যপির পূজার মধ্য দিয়া হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের একটা সামাজিক রফার চেষ্টা হইতেছিল। চেষ্টা হইয়া থাকিলেও তাহা সফল হয় নাই। এখন পর্যন্তও হিন্দুরা বলে সত্যনারায়ণ আর মুসলমানেরা বলে সত্যপির। হিন্দুর বাড়িতে সত্যনারায়ণের পূজা অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠানের মতোই হয়। একই লৌকিক কাহিনিতে বিশ্বাস করিয়া হিন্দু ও মুসলমান ধনসম্পদ লাভের জন্য সত্যনারায়ণ ও সত্যপিরের পূজা দিবে ইহা পূর্বোক্ত মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। ধর্মসমন্বয় বা ধর্মবিশ্বাসের মিশ্রণ হইয়া নূতন ধর্মমতের প্রবর্তনের সঙ্গে ইহার কোনো সম্বন্ধ নাই। হিন্দুধর্মের যাহা মূল নীতি, অর্থাৎ দেবদেবীর মূর্তিপূজা ও তদানুষঙ্গিক, বেদ, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রে অচল বিশ্বাস, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সাহায্যে পূজা-পার্বণ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধ, পরলোকে বিশ্বাস—ইহার কোনোটির ওপর মুসলমান প্রভাবের কোনো চিহ্নই দেখা যায় না—১২০০ খ্রিস্টাব্দেও যাহা ছিল ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে তাহার কোনো পরিবর্তন হয় নাই। অবশ্য মূল কাঠামো বজায় রাখিয়া ভিতরে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইয়াছে। যেমন দুর্গাপূজা এখন একটি মহোৎসবে পরিণত হইয়াছে। কালীপূজার প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু এ সকলই হিন্দুধর্মের আভ্যন্তরিক পরিবর্তন—ইহার উপর ইসলামের কোনো প্রভাবই নাই, এবং

প্রভাব থাকাও সম্ভব নহে—কারণ হিন্দুরা সযত্নে ইসলাম ধর্মের সংস্পর্শ এড়াইয়া চলিত।

সমাজ সম্বন্ধেও ঠিক ওই একই কথা বলিতে হইবে। হিন্দু সমাজের প্রধান প্রধান কয়টি বিশেষত্ব—যেমন জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা, স্ত্রীলোকের প্রতি অবিচার ও অত্যাচার অর্থাৎ বিধবা-বিবাহ নিষেধ, বাল-বিধবা কঠোরতা, কৌলীন্য প্রথা, সতীদাহ, স্বামীর সম্পত্তিতে অনধিকার প্রভৃতি মুসলমানদের মধ্যে ছিল না। প্রতিবেশী মুসলমান সমাজের দৃষ্টান্তে এই প্রথাগুলির অনৌচিত্য ও অপকারিতা হিন্দুর মনে ইহাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে ইহাই স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যাশা করা যায়। কিন্তু কার্যত বিপরীত ফলই হইয়াছিল। জাতিভেদের কঠোরতা এবং স্ত্রীলোকের প্রতি অবিচার বাড়িয়াই গিয়াছিল। বাল্যবিবাহের প্রসার হইয়াছিল এবং স্ত্রীলোকের অক্ষর পরিচয় যে অকাল-বৈধব্যের কারণ, মধ্যযুগে এই বিশ্বাস দৃঢ় ধর্মসংস্কারে পরিণত হইয়াছিল। ভক্ষ্য, পানীয়, ভোজনপ্রণালী, বিবাহাদি লৌকিক সংস্কার, মৃতের সৎকার, বিশেষ বিশেষ তিথিতে ও পর্বে নানাবিধ সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দুর উপর ইসলাম ধর্মের বা মুসলমান সমাজের কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। যাহারা রাজ দরবারের সহিত সংসৃষ্ট ছিল তাহাদের পোশাক পরিচ্ছদ কতকটা মুসলমানি ধরনের ছিল—কিন্তু বিরাট হিন্দুসমাজে ইহার প্রভাব, স্থান ও সংখ্যায় খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। কয়েকটি শহর ব্যতীত গ্রামে ইহার প্রচলন ছিল না।

সাহিত্যের দিক দিয়া আলোচনা করিলেও ঠিক একই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হয়। বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা করিয়াছেন, এবং ইহার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের আদর্শ ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। হিন্দুদের বাংলা সাহিত্য হিন্দুধর্ম ও সংস্কার দ্বারা অনুপ্রাণিত। রোসাং বা আরাকান রাজসভায় চট্টগ্রামের যে কয়জন মুসলমান বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বাংলা সাহিত্যে প্রেরণা জোগাইয়াছে ফারসি সাহিত্য। ইহার ফলে ধর্ম-গন্ধ-লেশ-হীন সাধারণ নরনারীর চিত্তবৃত্তি ও মানবীয় প্রেমের কাহিনিই ইহার প্রধান উপজীব্য ছিল। অর্থাৎ ইহাতে রোমান্টিক সাহিত্যের বীজ ছিল। কিন্তু হিন্দু ইহা গ্রহণ করে নাই, সে যুগের হিন্দুর বাংলা সাহিত্যে ইহার কোনো প্রভাবই লক্ষ করা যায় না। অথচ উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাবে এই রোমান্টিক সাহিত্যই বাংলা সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছিল। বর্তমান কালের একজন মুসলমান সাহিত্যিক, ডা. এনামুল হক, দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে এই আরাকানি সাহিত্যের প্রভাব কেবল মুসলমানদের উপরই দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ কী? ধর্মের গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা কী সাহিত্যেও সংক্রামিত হইয়া উঠে? তাঁহার এই অনুমান যে অনেকটা সত্য তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে মুসলমান সাহিত্যকের বাংলা গ্রন্থের পুথিগুলি প্রায় সবই

মুসলমানদের বাড়ি হইতে সংগ্রহীত হইয়াছে। ম্লেচ্ছের সাহিত্যও যে হিন্দুরা অন্যান্য ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট দ্রব্যের ন্যায়ই পরিহার করিয়াছে—ইহা অনুচিত ও অপ্রিয় হইলেও সত্য। আলাওলের পদ্মাবতী ও অন্যান্য মুসলমান রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ আধুনিক সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে, কিন্তু মধ্যযুগের হিন্দুরা তাহা আদর করিয়াছে বা তাহা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে এরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বর্তমানকালে একটি নূতন ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা হইতেছে। ডা. এনামুল হক লিখিয়াছেন :

> খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে গৌড়ের সুলতান ও আমীর ওমরাহদের উৎসাহে বাংলা সাহিত্য দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে রোসাং রাজসভার মুসলমান আমির ও ওমরাহগণ বাংলা সাহিত্যকে আমল না দিলে ইহার দীনতা ঘুচিত না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে বাংলায় মুসলমানদের যতখানি হাত রহিয়াছে হিন্দুদের ততখানি নহে।

অথচ এই লেখকই নিজে স্বীকার করিয়াছেন যে রোসং অর্থাৎ আরাকান রাজসভার মুসলমান সাহিত্যিকেরা বাংলা সাহিত্যে যে রোমান্টিক রীতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন, হিন্দুরা তাহা গ্রহণ করে নাই—এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছি। যে আরাকানি সাহিত্য অতি অল্পদিন পূর্বেও প্রায় অখ্যাত ও অজ্ঞাত ছিল, এবং হিন্দুরা যাহাকে কোনো দিন কোনো স্বীকৃতিই দেয় নাই, তাহা না থাকিলে মধ্যযুগে হিন্দুরা যে বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা অসম্ভব হইত বা তাহার দীনতা ঘুচিত না, ইহা স্বীকার করা কঠিন।

লেখকের প্রথম উক্তিটি অর্থাৎ মুসলমান সুলতান ও আমির ওমরাহের উৎসাহেই যে বাংলা সাহিত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে—ইহা পুনরুক্তির ফলে লোকের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার আলোচনা আবশ্যক।

বাংলা দেশে প্রায় ছয়শত বৎসর ব্যাপী মুসলমান রাজত্বের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক সুলতান ও তাঁহাদের অনুচরের সংখ্যা সম্ভবত ছয়জনের বেশি নহে। এ পর্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে সুলতানদের মধ্যে রুকনুদ্দিন বারবক শাহ, হোসেন শাহ্, তাঁহার পুত্র নসরত শাহ ও পৌত্র ফিরোজ শাহ্ এই চারিজন এবং আমির ওমরাহদের মধ্যে হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ ও তাঁহার পুত্র ছুটি খান—এই দুই জন। অর্থাৎ হোসেন শাহের সম্পর্কিত ব্যক্তি ছাড়া আর মাত্র একজন।

কবি কৃত্তিবাসকেও একজন গৌড়রাজ সংবর্ধনা করিয়াছিলেন—কিন্তু তিনি হিন্দু কি মুসলমান তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই এবং বর্তমান প্রসঙ্গে প্রয়োজনও নাই।

রাজদর্শনের পূর্বেই তিনি বাংলা রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং গৌড় রাজের পৃষ্ঠপোষণ তাঁহার কাব্যের জন্য কোনো কৃতিত্বের দাবি করিতে পারে না।

এই কয়েকটি বাস্তব ঘটনা মনে রাখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে মুসলমান সুলতান ও ওমরাহদের উৎসাহেই যে বাংলা সাহিত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এই যুক্তি কত অসার।

কিন্তু কেহ কেহ ইহা অপেক্ষাও বেশি দাবি করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত *History of Bengal* দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃষ্ঠা ১৪৩-১৪৪) সুলতান হোসেন শাহের বংশ সম্বন্ধে অধ্যাপক হবিবুল্লা যে উক্তি করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

> Thus was a new dynasty established under whose enlightened rule the creative genius of the Bengali people reached its zenith. It was a period in which the vernacular found its due recognition as the literary medium through which the repressed intellect of Bengal was to find its release.

ইহার পর শ্রীগৌরাঙ্গ এবং বৈষ্ণব ধর্ম ও পদাবলির উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন :

> With this renaissance, the rulers of the house of Husain Shah are inseparably connected. It is almost impossible to conceive of the rise of Vaishnavism or the development of Bengali literature of this period without recalling to mind the tolerant and enlightened rule of the Muslim Lord of Gaur.

এই প্রকার অযৌক্তিক ভাবোচ্ছ্বাসের উপর মন্তব্য অনাবশ্যক। কিন্তু একটি বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত এবং আচার্য যদুনাথ সরকার সম্পাদিত ইতিহাসের কোনো উক্তিই উপেক্ষা করা যায় না—কারণ সাধারণ লোকে ইহা সত্য বলিয়া মনে করিতে পারে। সুতরাং সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন।

হোসেন শাহের রাজ্যকাল ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে। ইহার পূর্বেই চণ্ডীদাসের পদাবলি, কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ, বিজয়গুপ্তের মনসা-মঙ্গল ও মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

বিপ্রদাস পিপলাই হোসেন শাহের রাজত্ব লাভের দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার মনসা-মঙ্গল রচনা করেন। প্রসিদ্ধ বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যে কেবল কবীন্দ্র পরমেশ্বর হোসেন শাহের সময়ে বাংলা মহাভারতের অনুবাদ রচনা করেন। সুতরাং যে মনস্বিতা এবং সাহিত্যক ও কবি প্রতিভার সৃজনী শক্তি এতদিন রুদ্ধগতি হইয়াছিল তাহা

হোসেন শাহি রাজত্বেই বাংলার সাহিত্যের মাধ্যমে প্রথমে আত্ম প্রকাশের সুযোগ পাইল অথবা চরম উন্নতি লাভ করিল এইরূপ সিদ্ধান্তের সমর্থন করা অসম্ভব।

তাহার পর বৈষ্ণব ধর্মের কথা। অধ্যাপক হবিবুল্লা বলিয়াছেন যে হোসেন শাহের রাজত্বের মতো উদার ও পরধর্ম-সহিষ্ণু শাসন না থাকিলে বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুদয় ও প্রসার সম্ভবপর হইত না। হোসেন শাহের রাজত্বে বৈষ্ণবদের প্রতি কাজির অত্যাচারের কথা পূর্বে বলিয়াছি—কাজির অত্যাচারের বিরোধিতা করিয়াই চৈতন্যকে কীর্তনের সহযোগে হরিনাম প্রচার করিতে হইয়াছে। হোসেন শাহের হাতে অনিষ্টের আশঙ্কায় ভক্ত বৈষ্ণবেরা শ্রীচৈতন্যকে গৌড়ের সীমানা হইতে দূরে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বড়ো কথা এই যে শ্রীচৈতন্য দীক্ষার পরে চব্বিশ বৎসর (১৫১০-৩৩ খ্রি.) জীবিত ছিলেন—ইহার মধ্যে সর্বসাকুল্যে পূর্ণ একটি বৎসরও তিনি হোসেন শাহি রাজ্যে অর্থাৎ বাংলায় কাটান নাই—হিন্দু রাজ্য ওড়িশায়ই বেশির ভাগ সময় কাটাইয়াছেন।

এই সমুদয় আলোচনা করিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে হোসেন শাহের ন্যায় রাজা না থাকিলে যে বৈষ্ণব ধর্ম ও বাংলা সাহিত্যের উত্থান ও প্রগতি একেবারে অসম্ভব হইত এরূপ উক্তি নিতান্ত অসার ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

অধ্যাপক হবিবুল্লা সম্ভবত তাঁহার এই উক্তির সমর্থনেই বলিয়াছেন যে বাঙালি হিন্দুরা হোসেন শাহ্‌কে 'নৃপতি তিলক', 'জগৎ ভূষণ', এবং 'কৃষ্ণের অবতার' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফিরোজ তুঘলক, সিকন্দর লোদি ও আওরঙ্গজেবের দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও যাহারা 'দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো' বলিতে কুণ্ঠিত হয় না তাহাদের পক্ষে ইহা অস্বাভাবিক নহে। তবে হোসেন শাহকে ওই সকল উপাধি হিন্দু জনসাধারণ নহে, কয়েকজন বাঙালি সাহিত্যিক দিয়াছেন। অথচ ইঁহারই একজন হিন্দু ধর্মানুষ্ঠানের উপর মুসলমান রাজকর্মচারীর অত্যাচারের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। সুতরাং এই স্তুতির কতটুকু ন্যায্যত : হোসেন শাহের প্রাপ্য এবং কতটুকু মধ্য যুগের বাঙালির দীর্ঘ দাসত্বজনিত নৈতিক অধঃপতনের পরিচায়ক তাহা নির্ণয় করা শক্ত। মধ্যযুগের শেষে বাংলার ইংরেজ গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস যখন কাশীর মহারাজা চৈৎসিংহের ও অযোধ্যার বেগমদের প্রতি অত্যাচার এবং অন্যান্য অপরাধে বিলাতে পার্লামেন্টের নিকট অভিযুক্ত হইয়াছিলেন তখন কাশীবাসী পণ্ডিতেরা তাঁহার গুণগান গাহিয়া এক প্রশংসাপত্র দেন। কাশীবাসী বাঙালি পণ্ডিতেরা স্বতন্ত্র আর একখানি প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। তাহার মর্ম এই যে, হেস্টিংসের অর্থের প্রতি কোনো লোভ ছিল না এবং কখনও কাহারও অনিষ্ট করেন নাই (কদাপি কস্যচিদপি হানিং নেহিতবানিতি)। সুতরাং মধ্যযুগে বাংলার—তথা ভারতের—পণ্ডিত বা সাহিত্যিকের এই শ্রেণির উক্তির মূল্য কতটুকু তাহা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য ইহা মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য নহে। প্রাচীন যুগেও ছিল, বর্তমান যুগেও

আছে।

মোটের উপর বলা যায় যে ৫/৬ জন মুসলমান সুলতান ও আমির বাংলা সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং কতগুলি আরবি ও ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বাংলা সাহিত্যের উপর ইসলামের আর কোনো প্রভাবই দেখা যায় না। যে একটি বিষয়ে হিন্দু সাহিত্য অতিশয় অপরিণত ও মুসলমানি সাহিত্য খুবই উন্নত ছিল, সেইটি ইতিহাস রচনা। কিন্তু বাঙালি হিন্দু-মুসলমানদের দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির ন্যায় এইটিও গ্রহণ করে নাই।

শিল্প ও সংগীতের দিক দিয়া হিন্দু সংস্কৃতির উপর ইসলামের প্রভাব সম্বন্ধে বেশি বলার প্রয়োজন নাই। চিত্রকলা, স্থাপত্য বা ভাস্কর্য শিল্পে মধ্যযুগের বাঙালি হিন্দুরা বিশিষ্ট কোনো নিদর্শন রাখিয়া যায় নাই। যাহা আছে তাহাতে ইসলামের বিশেষ কোনো প্রভাব নাই। সংগীত সম্বন্ধে বাঙালি হিন্দুরা প্রধানত কীর্তন ও ভক্তিমূলক রামপ্রসাদী সংগীত প্রভৃতি নূতন আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছিল। মুসলমানেরা যে সমুদয় নূতন ঢঙের সংগীত আমদানি করিয়াছিল বাঙালি হিন্দুরা মধ্যযুগে তাহা কতটা আত্মসাৎ করিয়াছিল তাহা আমার জানা নাই।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে সহজেই প্রতীতি হইবে যে সংস্কৃতি বলিতে আমরা যাহা বুঝি বা বুঝা উচিত—সে দিক দিয়া বিচার করিলে হিন্দু সংস্কৃতি মুসলমান সংস্কৃতির দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হইয়াছে এরূপ কোনো প্রমাণ বিদ্যমান নাই। মধ্যযুগে বাংলায় হিন্দু সংস্কৃতির যুগোচিত পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু এই পরিবর্তন অভ্যন্তরীণ ও স্বাভাবিক কারণেই ঘটিয়াছে, তাহাতে ইসলামের বিশেষ কোনো প্রভাব লক্ষ করা যায় না। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানেরা বাংলায় যে হিন্দু সংস্কৃতি দেখিয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তাহার মূল কাঠামো প্রায় একই ছিল—যাহা কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহার উপর মুসলমানের বিশেষ কোনো প্রভাব দেখা যায় না। সুতরাং মধ্যযুগে হিন্দু সংস্কৃতি বিলুপ্ত হইয়া মুসলমান সংস্কৃতির সহিত মিশ্রণের ফলে এক নূতন ভারতীয় সংস্কৃতির সৃষ্টি হইয়াছে—এই অতি আধুনিক বিশ্বাসটি অন্তত বাংলা দেশের পক্ষে একেবারে ভিত্তিহীন। প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য এই যে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশে—তথা ভারতে—একটি মাত্র সংস্কৃতিই ছিল, সুতরাং তাহাকে ভারতীয় সংস্কৃতি বলা যাইতে পারে। মুসলমানেরা স্বাতন্ত্র্য বুঝাইবার জন্য ইহাকে হিন্দু সংস্কৃতি বলিত। সেই হিন্দু সংস্কৃতি এখনও বজায় আছে। অন্তত বাংলা দেশে মুসলমানের প্রভাবে তাহার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু মুসলমানদের সম্বন্ধে ঠিক এই কথা বলা চলে না।

বাংলায় মুসলমান সমাজে হিন্দুর প্রভাবে মধ্যযুগে অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল। তাহার কারণ বাংলার অধিকাংশ মুসলমানই ছিল ধর্মান্তরিত হিন্দু এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেও তাহারা পুরাতন আচার, ব্যবহার, সংস্কার ও বিশ্বাস একেবারে সম্পূর্ণরূপে

ত্যাগ করিতে পারে নাই।

হিন্দুদের গুরুবাদ ও সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তি এবং তান্ত্রিক মতে গুরুর অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস—এই সমুদয় ইসলামে সংক্রামিত হইয়াছে। সুফি পির সম্প্রদায় বাংলার বাহিরেও ছিল কিন্তু বাংলায় ইহাদের সম্বন্ধে ধারণার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে এবং ইঁহারা অনেকটা তান্ত্রিক গুরুর আসন গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু সংস্কারের ফলে পঞ্চপিরের সৃষ্টি হইয়াছে—মানিক পির, ঘোড়া পির, কুম্ভীর পির, মদারি (মৎস্য বা কচ্ছপ) পির ইত্যাদি। হিন্দু পুরোহিতের আদর্শে মোল্লা নামে এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। বুদ্ধ ও বিষ্ণু পদের পূজা-প্রথার প্রভাবে হজরত মুহম্মদের পদ-চিহ্ন পূজা বা ভক্তির বস্তু হইয়াছে। এই সমুদয় প্রথা বা বিশ্বাস ইসলাম ধর্মের অনুমোদিত নহে।.

মধ্যযুগের মুসলমান সাহিত্য হইতে যে সামাজিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে হিন্দু সমাজের খুবই প্রভাব দেখা যায়। পুরাপুরি জাতিভেদ না হইলেও হিন্দুর অনুকরণে সমাজে উচ্চ-নীচ শ্রেণির উদ্ভব হইয়াছিল একথা পূর্বেই বলিয়াছি। অনেক ব্যবসায় পৈতৃক বৃত্তিতে পরিণত হইয়া জাতির সৃষ্টির হইয়াছিল। কোনো কোনো মুসলমান সম্প্রদায়ে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয় ছিল।

বিবাহের সময়ে প্রচলিত হিন্দু প্রথার অনেকগুলি মুসলমান সমাজে ঢুকিয়াছিল। কয়েকটি দৃষ্টান্ত—যথা বিবাহের পূর্বে কন্যাস্নান ও নানা কেলি-কৌতুক রঙ্গ, মেয়েদের অলংকার, কপালে সিন্দুর বিন্দু ও চন্দনের ফোঁটা দেওয়া, চুলের খোঁপায় ফুল, শাড়ি পরিধান, বাদ্যযন্ত্র ও বাজির ব্যবহার ইত্যাদি। বর বিশেষ বস্ত্র অলংকার পরিয়া কনের বাড়িতে যাইত। রমণীরা মাঙ্গলিক প্রদীপ জ্বালাইয়া ধান্য দূর্বা দিয়া বর বরণ করিত এবং অধিবাস ও মঙ্গল-ঘটের ব্যবস্থা ছিল। যাত্রাকালে শুভ ও অশুভ বস্তু দর্শন, ভূত প্রেতে বিশ্বাস, জ্যোতিষ গণনার ওপর নির্ভরশীলতা, মাথায় হাত দিয়া শপথ করা, পূজ্যপাদ ব্যক্তিকে পায়ে হাত দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, শিশুর অন্নপ্রাশন প্রভৃতি এমন বহু হিন্দু প্রথা বাংলার মুসলমান সমাজে প্রচলিত ছিল যাহা মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে অনুমোদিত নহে।

মুসলমানেরা যে বাংলা সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাতেও হিন্দুর প্রভাব যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ডা. এনামুল হক প্রায় ৬০/৭০ জন মুসলমান লেখকের বৈষ্ণব পদাবলি সংগ্রহ করিয়াছেন। মুসলমান সাহিত্যে কর্মফলভোগ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

সপ্তদশ শতকে সৈয়দ মোহাম্মদ আকবর একখানি সুন্দর ও বৃহৎ কাব্য রচনা করেন। এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে তিনি হিন্দু ও মুসলমান ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার হাতে ফিরিস্তা (দেবদূত) নারদে, আল্লাহ, ঈশ্বরে, পয়গম্বর (Prophet) দেবতায়, আদম (Adam) অনাদিনরে, (মা)

হাওয়া (Eve) কালীতে, হজরত মুহম্মদ চৈতন্যাবতারে, খাজা খিজির বাসুদেবে, আসহাবগণ (হজরতের সহচর) দ্বাদশ গোপালে, আওলিয়া আম্বিয়া (মুসলিম সাধু) মুনিতে, কোরান পুরাণে, এবং পীর মুরশিদ ওস্তাদ গুরুতে পরিণত হইয়াছে।

এই সমুদয় হইতে এরূপ মনে করা অসংগত নয় যে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত অনেক হিন্দুর মনে তাহাদের প্রাচীন ও নবীন ধর্ম-সংস্কারের মধ্যে একটা আপস রফা বা সামঞ্জস্যের ভাব জাগিয়াছিল। 'ধর্মপূজা-বিধানে' হিন্দুবিদ্বেষী ধর্মঠাকুরের ভক্তগণের মধ্যেও ইহার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে কোনো স্থায়ী ফল লাভ হয় নাই।

মুসলমান সুলতানেরা বাংলা দেশে যে সমুদয় মসজিদ, সমাধি প্রভৃতি ইমারত নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে স্থানীয় প্রভাব-জনিত অনেকদ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। ইহা যে কতকাংশে বা অনেকাংশে হিন্দু স্থপতি প্রণালীর পরিচায়ক অনেকে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বস্তুত ইসলামিক সাংস্কৃতিক অর্থাৎ ধর্ম, সমাজ, শিল্প ও সাহিত্য যে হিন্দু সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 'ভারতীয় ইসলাম' (Indian Islam) গ্রন্থের প্রণেতা মিঃ টাইটাস সমগ্র বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

> When all is said, there seems to be little doubt that Hinduism has wrought a far greater change in Islam than Islam has wrought in Hinduism, which still continues to pursue the even tenor of its way with a complancency and confidence that are amazing.

মধ্যযুগে মুসলমান ও হিন্দু সংস্কৃতির সমন্বয় না হইলেও উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ছিল। এই দুই সংস্কৃতিই ধর্মকেন্দ্রিক এবং দুয়ের মধ্যেই ধর্মান্ধতা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। উভয়ের মধ্যেই শিক্ষার, বিশেষত ধর্মশিক্ষার, আদর্শ উচ্চ ছিল এবং বন্দোবস্তও যথেষ্ট ছিল। হিন্দুর জ্ঞান প্রধানত ভারতবর্ষের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। মুসলমান জগৎ ছাড়া মুসলমানেরা অন্যদেশের সহিত বিশেষ কোনো সম্বন্ধ রাখিত না। পাশ্চাত্য জগতে এই সময়ে নূতন নূতন চিন্তাধারার বিকাশ ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতি সাধন হইতেছিল, কিন্তু ইহার কোনো সংবাদই ভারতে—তথা বাংলায়—পৌঁছায় নাই। যে সময়ে ইউরোপে নিউটন, লাইবনিৎজ, বেকন প্রভৃতি মানুষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করিতে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময় বাঙালি হিন্দুর মনীষা নব্যন্যায়ের শুষ্ক তর্কে এবং স্বকীয়া ও পরকীয়া প্রেমের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠতা বিচারে ব্যস্ত ছিল।

প্রতিবেশী চিনের তুলনায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে জ্ঞানও বাঙালির খুবই অল্প ছিল। চিনদেশের তিনটি আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীতে যুগান্তর হইয়াছিল। মুদ্রণ-যন্ত্র,

আগ্নেয়াস্ত্র ও চুম্বক দিগ্‌দর্শনযন্ত্র যথাক্রমে শিক্ষা ও চিন্তাজগতে, যুদ্ধে ও সমুদ্রযাত্রায় অদ্ভুত উন্নতি করিয়াছিল এবং তাহার ফলে পাশ্চাত্য রেনেসাঁস বা সভ্যতার নবজাগরণ আসিয়াছিল। কিন্তু প্রতিবেশী বাংলায় চিনের এ আবিষ্কারের খবর পৌঁছে নাই, অথচ এই সব আবিষ্কারের পরে বহু চিন দূত বাংলার সুলতানের দরবারে আসিয়াছিল।

কেবল একটি বিষয়ে বাংলা দেশে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতে অধিকতর উন্নতি দেখা যায়। মোগল বাবর যখন লোদি সুলতান ও রাজপুত বীর রাণাসঙ্গকে পরাজিত করিয়া ভারত জয় করেন তখন তিনি যুদ্ধে কামান ব্যবহার করিয়াছিলেন—তাঁহার প্রতিপক্ষের এই অস্ত্র সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান ছিল না। কিন্তু বাংলা দেশে ইহার প্রচলন ছিল এবং বাবর তাঁহার আত্মজীবনীতে বাঙালি গোলন্দাজদের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

উপসংহারের বক্তব্য এই যে মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মিশ্রণ হয় নাই—এ কথা সত্য। কিন্তু ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে তাহারা চিরকালই দুইটি বিরোধী শত্রুদলের মতো অবস্থান করিত। অনেক স্থানে ও অনেক সময়েই যে তাহারা মিত্রভাবাপন্ন প্রতিবেশীর ন্যায় বাস করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব ও সৌজন্যের বহু দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান সমাজ কখনও মিত্র ও সৎ প্রতিবেশীর গণ্ডি ছাড়াইয়া এক পরিবারভুক্ত ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে নাই। তাহার কারণ তাহাদের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাভাবাপন্ন। মুসলমানের ধর্মবিশ্বাস ও হিন্দুর সামাজিক সংস্কারের গুরুতর পরিবর্তন না হইলে এই প্রকার মিশ্রণ সম্ভবপর হইবে না। এই ঐতিহাসিক সত্য প্রতিষ্ঠাই আমার এই সুদীর্ঘ আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। অতীতের ইতিহাসের অনেক অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতে হইয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে যদিও তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিবার নহে, তথাপি তাহা অতীতের সত্য মাত্র, চিরন্তন সত্য নহে। কারণ একই দেশ, সমাজ বা সম্প্রদায়ের ইতিহাসে যুগে যুগে বহু ও গভীর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইতিহাস আমাদের দৃষ্টি অতীতের দিকে ফিরাইয়া ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করে—কিন্তু অমোঘ নিয়তির মতো কোনো নির্দিষ্ট পথেই চলিবার ইঙ্গিত করে না। আমার এই বক্তৃতার শ্রোতা, পাঠক ও বিশেষত বিরুদ্ধ সমালোচকদিগকে আমি এই কয়টি কথা স্মরণ রাখিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করি।

কমলা বক্তৃতামালার অংশবিশেষ

নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়

অভিভাষণ

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন অষ্টাবিংশতিতম অধিবেশন

সমবেত সুধীমণ্ডলি ও বন্ধুগণ,

আপনারা আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন ও প্রীতি গ্রহণ করুন। নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের এই অষ্টাবিংশতিতম অধিবেশনে ইতিহাস-শাখার সভাপতিপদে বরণ করে আপনারা আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন তার মূল্য সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺রমাপ্রসাদ চন্দ, ৺ননীগোপাল মজুমদার, ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ প্রখ্যাত ঐতিহাসিকবর্গের দ্বারা যে শাখা-সভাপতির আসন পূর্বে অলঙ্কৃত হয়েছে সেখানে আমার মতো সামান্য ইতিহাসসেবীকে আপনারা সাদরে উন্নীত করেছেন—সেটা কি কম কথা? তবে পাছে আপনাদের সৌজন্য ও আতিথেয়তার অমর্যাদা হয় তাই বিনয় ও কৃতজ্ঞতাসূচক প্রথাসম্মত প্রবচনগুলি আর পুনরুচ্চারণ করব না। শুধু এইটুকু বলবার অনুমতি চাই যে আমি আপনাদের সদয়-সহযোগিতা ও সহানুভূতি কামনা করি, কারণ তা না পেলে স্বকীয় কর্তব্য সম্পাদন করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

এই ইতিহাস-শাখার শুভানুধ্যায়ী পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে বর্তমান বৎসরে দুর্ভাগ্যবশত আমরা একাধিক কৃতী ঐতিহাসিক হারিয়েছি। প্রথমেই তাঁদের পুণ্য-স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। ৺জীবনচন্দ্র তালুকদার দিল্লিতে ত্রয়োদশ অধিবেশনে এই শাখার সভাপতিত্ব করেন—তিনি কয়েক মাস পূর্বে পরলোকগত হয়েছেন। তাঁর মতো মনস্বী পণ্ডিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক-অধ্যাপক বাংলার বাইরে বিরল। তাঁর মৃত্যুতে প্রবাসী বাঙালি সমাজ ও এই সম্মেলন বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাংলার প্রসিদ্ধ-ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সম্প্রতি স্বর্গত হয়েছেন। তাঁর আশ্চর্য অধ্যবসায়

ও অসাধারণ ঐতিহাসিক প্রতিভার নিকট ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রের ঋণ অপরিসীম। তাঁর লোকান্তরগমনে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হয়েছে তা সত্যই অপূরণীয়।

আজকের এই অধিবেশনে এসে প্রত্যেক ইতিহাস-ছাত্রের প্রথমেই মনে পড়বে ওড়িশার অনন্যসাধারণ ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য। উৎকল-কলিঙ্গ-সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতা ও গৌরব ভারতের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। ওড়িশার ইতিহাস প্রাক্-বৈদিক ও প্রাক্-মহেঞ্জোদরীয় যুগ হতে মধ্যযুগ পর্যন্ত আশ্চর্য সৃজনীশক্তি ও অসাধারণ মৌলিকতার সাক্ষ্য দেয়। সামরিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে, এবং সাহিত্য, কলা, ধর্ম, নীতি ও সমাজব্যবস্থাপনায় ওড়িশার ঐতিহাসিক-পরম্পরা সত্যই চিরস্মরণীয়। দুঃখের বিষয় উৎকলের গৌরবোজ্জ্বল অতীত সম্বন্ধে সম্যক্ অনুসন্ধান এখনো সম্ভব হয়নি এবং যেটুকু গবেষণা হয়েছে তাও খুব বেশি দিনের নয় এবং তার অনেকাংশই হয় অসম্পূর্ণ কিংবা অগভীর। ওড়িশা সম্বন্ধে তাই অল্পকাল পূর্বেও বহু ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন ধারণা প্রচলিত ছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হান্টার সাহেব এমন সব অমূলক কথা লিখে গেছেন যা আজ হাস্যকর বলে মনে হবে। একটি উদাহরণ পড়ে শোনাই :

> The people fought no great battle for human liberty, nor have they succeeded even in the more primary task of subduing the forces of nature to the control of man. To them the world stands indebted for not a single discovery which arguments the comforts or mitigates the calamities of life. Even in literature, the peculiar glory of the Indian race, they have won no conspicuous triumph. They have written no famous epic ; they have struck out no separate school of philosophy ; they have elaborated no new system of law.

সমগ্র প্রদেশবাসীদের মস্তকে অজ্ঞতাবশত কলঙ্ক লেপনের এই হল চূড়ান্ত নিদর্শন। এই থেকেই বোঝা যাবে যে ব্রিটিশ আমলে ওড়িশা সম্বন্ধে অন্যায় ও বিকৃত ধারণার অন্ত ছিল না।

এই সম্পর্কে আমি গভীর খেদ ও লজ্জার সহিত স্বীকার করছি যে সাধারণ বাঙালিও একদিন অহংসর্বস্বভাবের উত্তেজনায় ওড়িশাবাসীদের সম্বন্ধে অত্যন্ত অভব্য বিদ্রূপোক্তি করতে কুণ্ঠিত হয়নি। জানি না এখনও সেই ধরনের নিন্দনীয় মনোবৃত্তি বিদ্যমান কি না, যদি থাকে তাহলে আমি আজ এই সুযোগে সাধারণ বাঙালি হিসাবে উৎকলবাসীদের নিকট করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তবে আমাদের পরম সৌভাগ্য এই যে একাধিক কৃতি বাঙালি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের প্রচেষ্টায় এটা এখন প্রমাণিত হয়েছে যে অতীতের উৎকল-কলিঙ্গ শুধু বীর-প্রসবিনীই নয়, বরং ভারতীয় সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রস্থল। উৎকলবাসীদের কর্ম, চিন্তা ও আদর্শের অনবদ্য সংযোগ

বস্তুত সর্ব-ভারতীয় সংস্কৃতির এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। উৎকল-কলিঙ্গের ধর্ম-প্রতিষ্ঠায় যে অপূর্ব মানবিকতা, শিল্পসমন্বয়ে যে বিস্ময়কর উদ্ভাবনী প্রতিভা, বহির্বাণিজ্য, নৌশক্তি ও ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টায় যে অদম্য সাহসিকতা, সাহিত্যরচনায় যে সরস মৌলিকতা ও রাষ্ট্রিক সংগঠনে যে বলিষ্ঠ মনীষার পরিচয় আমরা ইতিহাসে পাই তার প্রতি আমরা শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না করে পারি না। আজকের দিনে আমাদের এই প্রার্থনা যে মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী উৎকলবাসীদের পূর্বগৌরব সত্বর পুনরুজ্জীবিত হোক।

এইবার আমি আধুনিক ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। প্রায় দুইশত বর্ষের অধীনতার পর ভারত যে ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ হতে মুক্তিলাভ করেছে তার তত্ত্বানুসন্ধান ও মূল্যনিরূপণের বিশেষ প্রয়োজন আছে—যেহেতু ব্রিটিশ যুগের হিসাব-নিকাশ না করা হলে আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতার ভিত্তি সুদৃঢ় করা যাবে না। এই কাজটা অবশ্য সহজ নয় এবং এই সম্পর্কে মতভেদেরও যথেষ্ট অবসর আছে, কারণ ব্রিটিশ শাসন দীর্ঘকালব্যাপী ছিল শুধু তাই নয়, বরং আধুনিক ভারতের গতিশীল ইতিহাসের সহিত তা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এই ঘটনাত্মক জটিলতা ও বৈচিত্র্যের জন্যই ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ ও প্রভাব সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হয়েছে।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন অনেকের চক্ষে দস্যুতা, প্রতারণা ও কূটনীতির এক বিরাট নিদর্শন, যার ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের পরম্পরা একরূপ নষ্ট হতে বসেছিল। আবার অনেকে মনে করেন যে ভারতে ব্রিটিশ শাসন জাতির পক্ষে এক ঈশ্বরীয় অবদান যার কল্যাণে আমরা রাষ্ট্রিক জীবনে এক নূতন সত্যাত্মক শক্তি অর্জন করেছি; যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ* উপন্যাসে চিকিৎসক বলছেন, 'ইংরেজ রাজ্য না হইলে সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।' কেউ কেউ বলেন যে ভারতের সুদীর্ঘ ও স্মরণাতীত ইতিহাসে ব্রিটিশ শাসন একটি ক্ষুদ্র আকস্মিক ঘটনা, যার আরম্ভ যেমন হঠাৎ হয়েছে, শেষও তেমনই অকস্মাৎ হয়েছে—অর্থাৎ আমাদের জাতীয় জীবনের উপর এর যদি কোনো প্রভাব দেখা দিয়ে থাকে তা মূলত অকিঞ্চিৎকর। আবার যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি মার্কসীয় মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁরা বলেন যে ভারতে ব্রিটিশের অভ্যুদয় এক অবশ্যম্ভাবী ঐতিহাসিক সংঘটন। মার্কস স্বয়ং তাঁর ভারত সম্বন্ধীয় পত্রাবলিতে লেখেন যে ব্রিটেন এক হিসাবে অজ্ঞাতে ভারতের কল্যাণ-সাধন করেছে, তার কারণ তার সাম্রাজ্যনীতির দুটি দিকই (অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক ও সৃষ্টিমূলক) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এশিয়ার নবজাগরণ ও পাশ্চাত্য অর্থতান্ত্রিকতার গোড়াপত্তন করেছে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করলে এটা সহজেই প্রতিপন্ন করা যায় যে উপর্যুক্ত মতগুলির প্রত্যেকটিই একাঙ্গী বা আংশিকরূপে সত্য। যদিও এটা কেউই অস্বীকার করেন না যে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আসলে একটা সামরিক জোরজুলুম মাত্র, কিন্তু এটাও সত্য যে বহুদিন পর্যন্ত এই বিদেশি শাসন জনসাধারণের কেবল সমর্থনই নয়,

বরং স্বতঃপ্রবৃত্ত রাজভক্তিও আকর্ষণ করেছে। আর এও সত্য যে এই শাসনের ফলে আমাদের জাতীয় জীবনে নবজন্ম এসেছে। তবে এ কথা বলা যায় যে একে ঈশ্বরীয় অবদান বলে মনে করা অর্থহীন। আর এ কথাও সম্পূর্ণ ঠিক নয় যে ব্রিটিশ শাসন ভারতের ইতিহাসে এক নগণ্য ঘটনা। যাঁরা এরূপ কথা বলেন তাঁরা আধুনিক ইতিহাসের মূলতত্ত্ব বোঝেন না। তারপর মার্কসীয় বিশ্লেষণও একদিক দিয়ে মৌলিক হলেও সর্বত বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাছাড়া মার্কস এ কথাও সিদ্ধ করেননি যে ব্রিটেনের তথাকথিত ভারতকল্যাণ ব্রত এবং তার ধনতান্ত্রিক সভ্যতা ও পুঁজিবাদের বর্বরতার মধ্যে কোনো অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক সম্ভব কি না।

ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব আধুনিক যুগে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশের এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। যদিও ভারতজয়ের ব্যাপারে ইংরেজের পক্ষে কোনো দুর্লঙ্ঘ্য বাধা উপস্থিত হয়নি এবং ভারতজয় একরূপ অপ্রত্যাশিতরূপে সহজসাধ্য হয়েছিল, তবু একথা বলা যেতে পারে যে গোড়ায় ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে এদেশে আসেনি। এখানকার তৎকালীন অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতিই তাদের সহায় হল। শাসনব্যাপারে ইংরেজ নূতন নূতন সিদ্ধান্ত বা নীতি সমাবেশ করল এবং তার দরুন জনতার প্রভূত লাভ ও উন্নতি কতক বিষয়ে সম্ভব হল। কিন্তু একথা বললে ভুল হবে যে বিদেশি শাসক যা কিছু করল তার পিছনে ছিল নিছক পরোপকার বা প্রজাহিত সাধনের উদার মনোভাব। দেশের উন্নতি ইংরেজের কাম্য ছিল ঠিক ততটাই যতটা তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য দরকার ছিল। ব্রিটিশ পুঁজিপতির বাণিজ্যবিস্তার ও কাঁচামালের চাহিদা মেটানোর জন্য দেশের যতটা শ্রীবৃদ্ধি আবশ্যক ততটাই ব্রিটিশ শাসক চেয়েছিল, এর বেশি নয়। এই উদ্দেশ্য পূর্তির জন্য দেশের সনাতন কুটিরশিল্পাত্মক আর্থিক ব্যবস্থা তারা সমূলে নষ্ট করল এবং আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থার ভিত্তি পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা ও ধর্মপ্রচারের দ্বারা শিথিল করতে বিমুখ হয়নি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নির্মম চাপে ও বিজাতীয় শাসনের উৎকট স্বার্থান্ধতার দরুন দেশে এবং একটা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নবজাগরণের সূচনা হল যা বিদেশি শাসক স্বপ্নেও হয়তো কল্পনা করেনি। ইংরেজি শিক্ষিত নবীন মধ্যবিত্ত সমাজের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে এদেশে এমন একদলের প্রাধান্য ঘটল যাদের চক্ষে ছিল পাশ্চাত্য রাষ্ট্রীয়তার মোহ ও মনে ছিল পাশ্চাত্য যুক্তিনিষ্ঠার সাহসিকতা। এই নূতন সমাজ সব কিছু বিচারবুদ্ধির দ্বারা দেখতে ও বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হল। এইভাবে ভারতের মনোজগতে যে ক্রান্তি এল তারই অন্যতম পরিণাম নব্য ভারতের রাষ্ট্রীয় অভ্যুদয়।

এই নব জাগরণের মূলে পাশ্চাত্য প্রভাব থাকলেও একথা ঠিক যে ভারতের প্রাচীন ভাবধারা এর দরুন বিনষ্ট হয়নি। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও খ্রিস্টধর্মের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এল ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের নব জাগৃতি। ব্রিটিশ শাসকের ভেদ-নীতি,

বর্ণদ্বেষ ও সভ্যতাভিমান এমন এক আবহাওয়ার সৃষ্টি করল যার ফলে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের উন্মেষ হয়েছে। ইংরেজের ঘর-ভাঙা ভেদনীতি কেবল অনৈক্যই আনেনি, বরং একতার সৃষ্টিও সম্ভব করেছে। ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম স্থায়ী পরিণাম জাতীয় জীবনে উদারনৈতিকতা ও বিবেকশীলতার উদ্বোধন। এই নূতন বিচারনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয়দের মনে আনল সেই ক্ষমতা যার বলে তারা ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথকভাবে কল্পনা করতে পারল। তবে এই ক্ষমতা যার বলে তারা ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথকভাবে কল্পনা করতে পারল। তবে এই ক্ষমতা সর্বাঙ্গীণরূপে বিপ্লবাত্মক হয়নি, বিদেশি শাসনের মাঝে তা হওয়াও সম্ভব ছিল না। ফলে দেখা দেয় এক নবীন প্রাচীনতাবাদ ও সঙ্কীর্ণ প্রতিক্রিয়াশীলতা। এরই প্রভাবে অনেকে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে নূতন করে পরীক্ষা করে তার গরিমা সম্বন্ধে সন্দিহান হল এবং অনেকে পাশ্চাত্য জড়বাদের বিরোধী হয়ে উঠল। প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার আকর্ষণে জন্ম নিল আমাদের ধার্মিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক আত্মোপলব্ধি ও আত্মাভিমান। এই প্রতিক্রিয়ার পটভূমিকায় আমরা পাই রামমোহন, শ্রীরামকৃষ্ণ, দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দের মতো ধুরন্ধর অগ্রণীদের—যাঁদের চিন্তা ও সাধনা এই কথাটিকে প্রমাণিত করে যে ভারতের আধ্যাত্মিক বনিয়াদ প্রকৃতই এত মজবুত যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ তাকে শেষ পর্যন্ত উন্মূলিত করতে পারল না।

ব্রিটিশ শাসন যেমন একদিক দিয়ে আনল ঐক্য, তেমনই আনল সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা, সামন্তবাদ ও ভেদবুদ্ধি, কারণ ইংরেজের লক্ষ্য ছিল শাসনমূলক একীকরণ, কিন্তু নৈতিক বিভাজন ও পৃথকীকরণ। সেই জন্য ব্রিটিশ শাসনের ফলে হল হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সৃষ্টি, দেশী রাজন্যবর্গের ও জমিদারের সামন্ততান্ত্রিক নব-প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন লঘুসংখ্যকদের আত্মকেন্দ্রিক অধিকারবোধ ও সর্বোপরি শ্বেতাঙ্গের একাধিপত্য। এই নীতিরই চরম পরিণাম ভারতের বিভাজন। যদিও আইন-শাসনের প্রবর্তনা ব্রিটিশ শাসকের অন্যতম কীর্তি, কিন্তু ইংরেজের আইননিষ্ঠার ভিতরে ছিল গলদ—অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি ও স্বার্থের প্রেরণা। বর্ণবৈষম্য ও অধিকারপার্থক্য এই আইনানুবর্তিতাকে দূষিত করেছিল এবং এরই ফলে আইন আদালতের প্রাচুর্য সত্ত্বেও আইনের প্রকৃত মহিমা নষ্ট হয়—শাসনের ছলে আসে বেআইনি আইন ও আইনের নামে অত্যাচার।

যে-কোনো দিক দিয়ে বিচার করা যাক না কেন ব্রিটিশ শাসনের গ্লানি অনস্বীকার্য। ভারতের প্রাচীন পল্লিসঙ্ঘ ও পল্লিস্বাধীনতার লোপ ইংরেজের রাজত্বকালে হয়েছে। অর্থনৈতিক শোষণের ফলে জনসাধারণের চরম দুর্দশা ব্রিটিশ ভারতের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। সামরিক ক্ষেত্রে যেভাবে ইংরেজ ভাড়াটে সিপাহি সৈন্য তৈরি করে জাতির বাহুবল হরণ করে তা কে না জানে? সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইংরেজের উদাসীনতা সর্বজনবিদিত।

ধর্মব্যাপারে নিরপেক্ষতার ভান করে কিভাবে ইংরেজ খ্রিস্টান ও মুসলমানের প্রতিপক্ষপাত প্রদর্শন করেছে, তা বলা নিষ্প্রয়োজন। উচ্চ রাজনৈতিক, বৈদেশিক ও সামরিক চাকরি এদেশের লোকের দুষ্প্রাপ্য, এমনকী অপ্রাপ্য ছিল। রাষ্ট্রীয় অধিকার আদায় করতে ভারতীয়দের কত বাধা ও দমন সহ্য করতে হয়েছে তা আবালবৃদ্ধবনিতা জানে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত ব্রিটেনের চাপে কীভাবে স্বার্থবলিদান করতে বাধ্য হয়েছে ও ভারতীয়রা ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে কীরূপ লাঞ্ছিত হয়েছে তা কে ভুলতে পারে?

অতএব ব্রিটিশ শাসনের ইতিবৃত্ত গৌরবের কাহিনি নয়। দেশের শোচনীয় দারিদ্র্য ব্রিটিশ শাসনের পরিণাম। জনসাধারণের নিরক্ষরতার দায়িত্বও ইংরেজের। রাজনীতিকেরা বলবেন যে ব্রিটিশ ভেদনীতির ফলে দেশ সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত ও অবশেষে বিভক্ত হয়েছে। সমাজসংস্কারকেরা বলবেন যে ব্রিটিশ শাসনের জন্য এদেশে নানারূপ দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার, মোকদ্দমাবাজি প্রভৃতির বৃদ্ধি হয়েছে। ধার্মিক নেতারা বলবেন যে এদেশে নাস্তিকতা, অধার্মিকতা ও জড়বাদের প্রসার ইংরেজের শাসনের দরুনই হয়েছে। কলারসিক ও শিল্পীরা বলবেন যে ভারতীয় আদর্শের পরম্পরা ইংরেজই নষ্ট করেছে। ব্যবসায়ীরা বলবেন যে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ইংরেজের জন্যই অবসন্ন বা মৃতপ্রায়। এসব সত্য কথা—তবু এ কথাও স্বীকার না করে উপায় নেই যে ব্রিটিশ শাসনের একটা অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলতর দিক আছে। ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে ইংরেজ পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা আমাদের রাজনৈতিক চেতনাকে প্রবুদ্ধ করেছে, দেশের আধুনিকীকরণ সম্পূর্ণ করেছে; ও রাষ্ট্রিক ঐক্যের সূত্রে সমস্ত দেশকে একীকৃত করেছে। রেল, ডাক, তার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সাধনের দ্বারা দেশের উন্নয়ন ইংরেজের অবদান। যারা পূর্বে হীন, অবনমিত ও অত্যাচারিত ছিল তাদের উন্নতিসাধনও কতকাংশে ইংরেজ করেছে। নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইংরেজদের কৃতিত্ব কম নয়। দেশে স্থায়ী শান্তিরক্ষা ও শৃঙ্খলাস্থাপন ব্রিটিশ শাসনের মহান কীর্তি। মোটকথা ভারতের ইতিহাসে ব্রিটিশ যুগের স্থান এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তা সহজে ভোলবার নয়। আজকের নবীন ভারত যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তার ভালো, মন্দ অনেকটাই ব্রিটিশ শাসনের সাক্ষাৎ সৃষ্টি বা পরোক্ষ পরিণতি।

এই সম্পর্কে এও স্বীকার করতে হয় যে আমাদের ইতিহাস-বোধ জাগ্রত হয়েছে ব্রিটিশ যুগে এবং বিদেশি ইতিহাসকারের প্রচেষ্টায় ভারতে ঐতিহাসিক গবেষণার সূত্রপাত হোলো। সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাঁদের রচনা বহুলাংশে ভ্রান্তিজনক হলেও এর গুরুত্ব আমরা স্বীকার করি। এই সব রচনার মধ্য দিয়ে আমরা জাতীয় স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছি। কিন্তু এ কথাও সত্য যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতের ইতিহাসের আমূল সংস্কার হয়েছে। জাতীয় ইতিহাস এতকাল বৈদেশিক স্বার্থের সুবিধার জন্য লেখা হয়েছে, এখন নূতন করে নিরপেক্ষ দৃষ্টির আলোকে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে

দেশের ইতিহাস লিখতে হবে।

ইতিহাস পুনর্নির্মাণ যে কতটা সঙ্কটসঙ্কুল তা আমরা অনেকেই ভুলে যাই। ইতিহাস সংস্কার ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বার্থ, বর্ণগত স্বাভিমান, ধর্মগত গোঁড়ামি, প্রদেশগত অহমিকা ও জাতিগত আবেগপ্রবণতা যে কত বড়ো অন্তরায় হতে পারে তা এখনও অনেকে বোঝেন না। তাছাড়া দলগত প্রয়োজনে বা কোনো বিশেষ মতবাদ প্রতিপাদনের জন্য যদি ইতিহাস লেখা হয় তাও যে কতটা বিপজ্জনক হবে তা বলাই বাহুল্য। বস্তুত যদি কোনো প্রকার স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা ইতিহাস সংস্কার অনুপ্রাণিত হয় তাহলে ইতিহাস আর সত্যানুসন্ধান থাকবে না—তা হবে কপোলকল্পনা বা প্রচারসাহিত্য। ঐতিহাসিকের দৃষ্টি যদি পক্ষপাতশূন্য, মোহমুক্ত ও নির্ভীক না হয়—তাহলে তথ্যানুসন্ধান ও সত্যনির্ধারণ হবে কেমন করে? ঐতিহাসিক গবেষণা যদি কোনোরূপ দলাদলির অন্তর্গত হয় তাহলে ইতিহাস ছেলেখেলায় পরিণত হবে, কারণ জাতীয়-পরিষদে যে দলের প্রাধান্য থাকবে তখন সেই দলের নেতাদের খেয়াল ও মর্জি মাফিক ইতিহাস নুতন করে লেখা হবে। যাঁরা ইতিহাসকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে চান তাঁদের নিকট এরূপ সম্ভাবনা সত্যিই বিভীষিকাজনক। এই সম্পর্কে আমি বর্তমান কংগ্রেসি সরকার কর্তৃক প্রযোজিত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সরকারি অর্থে রচিত ও প্রকাশিত ইতিহাসে নিরপেক্ষতা ও সত্যনিষ্ঠা কতদুর বজায় থাকতে পারে তা বিচার্য। এই ইতিহাস যে কোনো ব্যক্তি বা দলবিশেষের মহিমাকীর্তনে পর্যবসিত হবে না তা কি আমরা জোর গলায় বলতে পারি? পুরাকালে ইতিবৃত্ত যাঁরা লিখতেন তাঁরা হয়তো একাধিক ক্ষেত্রে সত্য গোপন বা অতিরঞ্জন করেছেন পৃষ্ঠপোষক সম্রাটের ভয়ে বা খাতিরে, কারণ পৃষ্ঠপোষকের কৃপার উপরই তাঁদের জীবিকানির্বাহ নির্ভর করত। এখন ইতিহাস বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত হতে চলেছে—অতএব দেশের যাঁরা নেতৃস্থানীয় তাঁদের মনে রাখতে হবে যে ঐতিহাসিক সত্যের স্থান সকল দাবিদাওয়ার উপরে এবং ঐতিহাসিকদের স্তাবক প্রচারশিল্পীরূপে গণ্য করলে শুধু ইতিহাসের আদর্শই ক্ষুণ্ণ হবে না—দেশ এবং রাষ্ট্রের সমূহ ক্ষতি হবে তাতে। ইতিহাসের উদ্দেশ্য দল বা রাষ্ট্রের সাময়িক চিত্তবিনোদন করা নয়—তার কাজ আসলে অনাগত ভবিষ্যতের জন্য আমাদের সতর্ক করা, ও সত্যের মাধ্যমে জাতির সৃষ্টিপ্রতিভাকে সর্বদা জাগরূক রাখা।

ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি ও সাম্প্রদায়িকতার কী শোচনীয় পরিণতি হতে পারে তার উদাহরণ দেখি গত বৎসরের নিখিল-পাকিস্তান ইতিহাস সম্মেলনের প্রকাশিত বিবরণীতে। পাকিস্তানি ঐতিহাসিকেরা ঘোষণা করেছেন যে ভারতের মুসলিম যুগের ইতিহাস অ-মুসলমান এবং বিশেষ করে হিন্দু লেখকের হাতে বিকৃত হয়েছে। যে বাবে ও ভাষায় ইন্দো-পাকিস্তান ইতিহাস শাখার সভাপতি ডক্টর কুরেশি তাঁর অভিভাষণে এই অভিযোগ করেন তার এক নমুনা শুনুন। তিনি বলেন,

> We gave to this land (India) a system of government and standard of efficiency in the administration which had not been known before.....by removing the tyranny of Sanskrit, which had been a dead language for centuries, over the Hindu mind, we opened the flood-gates of intellectual, literary and spiritual activity. In the realm of religion, contact with Islam gave logic and method to Hindu speculative thought which had never been disciplined into national channels to such an extent before..... It was under our rule that religious massacres came to an end and men and women for the first time realised that they had the fullest freedom to practise their religion..... Yet what has been the reward? We have been maligned and abused, our achievement and contribution alike belittled..... Today our kith and kin left behind in India are persecuted and despised ; all those who now form the bulk of the Pakistani nation are fortunately free from tyranny, but they are targets of misrepresentation and hatred no less that the Muslim minority living in a state of dread and suspensc in our neighbouring country.

ঐতিহাসিক গবেষণায় এইরূপ বিদ্বেষমূলক মিথ্যাভাষণ যে কতটা বিষময় হতে পারে আশা করি পাকিস্তানি ঐতিহাসিকেরা একদিন তা বুঝবেন।

এইবার রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি-সঙ্ঘ কর্তৃক পরিকল্পিত মানব ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার মনে করি, কারণ এই বিষয়ে আমাদের দেশে ঐতিহাসিক মহলে এখনও তেমন অনুসন্ধিৎসা দেখা যায়নি। আনন্দের কথা যে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ও এই ইতিহাস-শাখার প্রাক্তন সভাপতি ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার এই ইতিহাস রচনায় সহযোগিতা করবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন। তাঁকে আমরা সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই। বিভিন্ন দেশের প্রায় পাঁচশত ঐতিহাসিক মানব-জাতির ইতিহাস রচনায় যোগ দেবেন, এবং এই ব্যাপারে মোট ব্যয় হবে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা। এই ইতিহাস রচনার মূল উদ্দেশ্য প্রধানত মানব-সভ্যতার ক্রমোন্নতির পক্ষপাতশূন্য আলোচনা। এ যাবৎ মানব-ইতিহাসের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজনৈতিক ঘটনাপরম্পরা। রাষ্ট্রপুঞ্জের এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হলে এটা প্রমাণিত হবে যে মানব-সভ্যতার বিকাশ ও প্রগতি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। আমরা আশা করি ভারতের প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা এই পরিকল্পনার ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন, কারণ বিশ্বের ইতিহাসে ভারতের অবদানের তথ্য ও মূলসূত্র তাঁরাই সঠিক নির্ণয় করতে পারবেন।

আমার বক্তব্য শেষ করার পূর্বে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথার অবতারণা করব।

সেটি হচ্ছে বাংলা ভাষার মাধ্যমে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রচারের প্রয়োজনীয়তা। একদিন বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করে বলেছিলেন, 'বাঙ্গালী আজকাল বড় হইতে চায়। হায়! বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক স্মৃতি কই?' সুখের বিষয় আজ বাঙালি ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন, ও ইতিহাসচর্চায় বাংলাদেশ এখন ভারতে অগ্রণী। ঐতিহাসিক গবেষণায় বাঙালি আজ যে স্থান অধিকার করেছে, তা যেমন বাঙলার গৌরব, তেমনই ভারতের গৌরব। কিন্তু দুঃখের বিষয় খুব অল্প ঐতিহাসিক লেখাই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। এটি গভীর পরিতাপের বিষয়। শুধু বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্যই নয়, বাঙালির ঐতিহাসিক বোধ প্রোৎসাহিত করবার ও অটুট রাখবার জন্যও মাতৃভাষায় ইতিহাস রচনার আবশ্যকতা আছে। আশ্বাসের কথা এই যে শ্রদ্ধেয় আচার্য যদুনাথ সরকার ও ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ বাংলার শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকেরা এইদিকে মনোযোগ দিয়েছেন, ও তাঁদের প্রযোজনায় ও নেতৃত্বে কলিকাতায় বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। এই পরিষদ ও এর ত্রৈমাসিক পত্রিকা, 'ইতিহাস', বাঙালি জনসাধারণের মনে ঐতিহাসিক সচেতনতা জাগিয়ে তুলুক এই কামনাই করি। এই প্রসঙ্গে আমি দুঃখের সহিত বলতে বাধ্য যে এই পরিষদ প্রবাসী বাঙালির নিকট আশানুরূপ সহানুভূতি পায়নি ও এর পত্রিকার গ্রাহক বাংলার বাইরে বিরল বললেও অত্যুক্তি হবে না। আমি প্রত্যেক ইতিহাসানুরাগী প্রবাসী বাঙালির দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করি।

এইবার আমার সামান্য ভাষণ সমাপ্ত করছি। আমার বক্তব্যের দোষত্রুটি আপনারা নিজগুণে ক্ষমা করবেন। আপনাদের সস্নেহ সহানুভূতি ও প্রোৎসাহন লাভ করে আমি কৃতার্থবোধ করছি।

বন্দে মাতরম্